ভারতী

সচিত্র মাসিক পত্রিকা

সম্পাদক—

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

(১৩২৭ কার্ত্তিক হইতে চৈত্র)

প্রতি সংখ্যার মূল্য ।/০]   ভারতী কার্য্যালয়,   [বার্ষিক মূল্য ৩৸০

২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১৩২৭ সালের

ভারতীর বর্ণানুক্রমিক সূচী

(কার্ত্তিক—চৈত্র)

চিত্র সূচী



ভারতী

৪৪শ বর্ষ] কার্তিক, ১৩২৭ [৭ম সংখ্যা

বারোয়ারি উপন্যাস

১৮

দুর্গামণির পরামর্শ-মতো সতীশ মৈত্র-মশায়কে একটা তার কোরে উত্তরের অপেক্ষায় রইলো; কিন্তু মৈত্র-মশায় তখন যোগেন মিত্তিরকে নিয়ে কলকাতায় রওনা হয়েছেন, কাজেই সতীশের তার বিনা-উত্তরে কালিগাঁয়ে যেমন গিয়েছিল, তেমনি ফিরে এল। কালিগাঁয়ের পাঁচ ক্রোশ দূরে বেলতলী-ষ্টেশনের পোষ্ট-মাষ্টার সতীশের তারের জবাব লিখলেন—"এড্রেসী নট্ ফাউণ্ড।"

টেলিগ্রাফের তারের মতো লম্বাটানা নিস্ফল গোলাপি কাগজটা হাতে কোরে সতীশকে শুকনো-মুখে আসতে দেখেই দুর্গামণি বুঝলেন, খবর খারাপ। তিনি আর কোনো কথা না শুধিয়ে সতীশকে বল্লেন—"বাবা, আমি একবার দেশে যাবো, কোনোগতিকে আমাকে সেখানে পাঠাতে পারিস্?"

সতীশ খানিক ভেবে বল্লে—"পারি। রাণাগঞ্জের সতীশবাবুর স্ত্রীর অসুখ; দেখতে তাঁর মা কলকাতায় যাচ্ছেন; তুমি তাঁদের সঙ্গে গেলে বেলতলিতে তাঁরা তোমায় নামিয়ে গাড়ি চড়িয়ে দিতে পারেন। কিন্তু তুমি দেশে যাবে কি করতে? এখানে তো বেশ একরকম—"

দুর্গামণি সতীশের কথায় বাধা দিয়ে বোলে উঠলেন—"না না, আমার না গেলে চলবে না। আর-একটি ভালো মেয়ে দেখে তোর আবার বিয়ে দিতে হবে।"

কমলার দুর্নাম রটিয়ে বেনামি চিঠিটা পাওয়া অবধি সতীশের মাথায় সন্ন্যাস-করবার একটা প্ল্যান ক্রমাগত ঘুরছিল; এবং এই প্ল্যানটা নিয়ে সে তার গুরুদেব আত্মানন্দ স্বামীজীর সঙ্গেও ইতিমধ্যে দু-একবার খুব গম্ভীরভাবে আলোচনা কোরে একরকম সংসার ত্যাগ করাই স্থির করেছে; কিন্তু আজ হঠাৎ তার মা তাকে আর-একবার সংসারের ফাঁদ-কলে ফেলার

কোথায় আছেন জানতে পেরে সতীশ বিষম ভাবিত হয়েই দুর্গামণিকে কিছু আর না বোলে-কয়েই সোজা গুরুজীর আখড়ার মুখে দুপুর-রোদে একটা ভাঙা ছাতা-মাথায় বেরিয়ে পড়লো।

গোমতী নদীর ধারেই দিব্বি একটা ছোটো-খাটো ইমারতে সতীশের গুরুজী গুরু-মাতার সঙ্গে আখড়া বেঁধে অনেকগুলি বাঙালী উকিল আর কেরানি চেলার সেবা নিয়ে সুখে বাস করছেন। দুপুরের রোদে তেতে-পুড়ে সতীশ সেখানে হাজির। গুরুজী তখন আহারের পর মৃগচর্ম্মের আসনে আধ-বসা আধ-শোয়া অবস্থায় ভাগবতের পুঁথিকে বালিশ কোরে নিত্য-নৈমিত্তিক ধ্যানে ছিলেন; কাজেই সতীশকে বাইরে অপেক্ষা করতে হলো।

আখড়ার বারাণ্ডার সামনেই গোমতী নদী মস্ত একটা বাঁক টেনে চলে গেছে; তার ওপারে ধূধূ মাঠ; সেই মাঠে গোটা-কতক রোগা গোরু শুকনো ঘাস খুঁজে-খুঁজে চোরে বেড়াচ্ছে;—এই ছবিটা দেখতে-দেখতে বাংলার একটা পণ্ডগ্রামের বর কন্যার গোটা-কতক দিন সতীশের মনের মধ্যে আজ এমন স্পষ্ট হয়ে আনাগোনা করতে লাগলো যে এক-সময়ে তার সন্ন্যাসের প্ল্যান গোমতীর স্রোত ধোরে কতদূরে ভেসে গেল তার ঠিকানাই নেই। হঠাৎ ঘরের মধ্যে মোটা গলার একটা হুঙ্কার শুনে চমকে-উঠে সতীশ বুঝলে, গুরুজী জেগেছেন। সে আস্তে-আস্তে ছাতা আর জুতো বাইরে রেখে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলে। তখন বেলা প্রায় তিনটে।

দূর থেকে গুরুজীকে ঢিপ্ কোরে একটা প্রণাম দিয়ে মাটির উপরে সতীশ সোজা হয়ে বসলে, গুরুজী ঘুমে-ভারি দুই চোখ সতীশের দিকে ফিরিয়ে বল্লেন—"বসো, খবর কি?"

সতীশ হাতদুটো খানিকটা জোড় কোরে, খানিকটা মুঠো কোরে উদাস সুরে বল্লে—"বড় বিপদ স্বামীজী! মা আবার আমার বিবাহ দেবার জন্তে দেশে চলেছেন—মেয়ে দেখতে।"

গুরু "হুঁ!" বোলে কেবল একটা নিশ্বাস ফেলেই আসন ছেড়ে ওঠবার উপক্রম করছেন দেখে সতীশ একেবারে তাঁর পা জড়িয়ে বল্লে—"আমার এখন কি উপায় হবে ঠাকুর?"

গুরু আকাশের দিকে দুটো ঝাঁকড়া ভুরু খুব-খানিকটা তুলে বল্লেন—"বাপু, সংসার মায়াময়! সেখানে আশঙ্কার অন্ত নেই, জ্বালাও অত্যন্ত। আমি ত বলি তুমি সোজা বেরিয়ে পড; আর দেরি কোরো না।"

সতীশ মুখটা অত্যন্ত কাচুমাচু কোরে বল্লে—"কিন্তু আমি যে দুই সমস্যার মধ্যে পড়লুম! এদিকে মাতৃ-আজ্ঞা—বিয়ে করতে; ওদিকে প্রভু বলছেন, সংসার ছাড়তে!"

গুরু একটু গম্ভীর হয়ে বল্লেন—"তাহলে মাতৃ-আজ্ঞাই পালন কর। মুক্তির আশা ছেড়ে দেও।"

এই 'ছেড়ে দেও' কথাতেই গুরুর বাক্যে রাগ একটুখানি ঝিলিক্ দিয়ে গেল। সতীশ আরো কাচুমাচু হয়ে বল্লে—"তা কি হয়? আমি সংসার না করাই তো স্থির করেছি কিন্তু—"

গুরুজী মস্ত একটা হাই তুলে তুড়ি দিয়ে বল্লেন—"ওই কিন্তুই হলো সর্ব্বনাশের মূল! এইটুকু থাকে বোলে সাধন কোরেও তিন

জন্মের পূর্ব্বে মুক্তিলাভ করতে কাউকে বড় একটা দেখলুম না।"

সতীশ অবাক হয়ে বল্লে—"বলেন কি! তিন জন্ম কঠোর সাধনা কোরে তবে?"

"তিনটে জন্ম আন্দাজ লাগে দেখছি।"

সতীশ নিশ্বাস ফেলে বল্লে—"তাহলে আমার তো কোনো আশাই নেই দেখছি! তিনের উপরে তিন জন্মেও আমার 'কিন্তু' ঘোচে কি না সন্দেহ!"

আত্মানন্দ খুব গম্ভীর হয়ে বল্লেন—"গুরুতে ভক্তি-নিষ্ঠা রেখে, তাঁর আদেশ পালন কোরে চল্লে, এক জন্মেই মুক্তি পাওয়া যেতে পারে।"

সতীশ অত্যন্ত কাতর স্বরে বল্লে—"মনে যে 'কিন্তু' আপনা আপনি ওঠে! না হলে আপনার আদেশ তো আমি যথাযথ পালন করছি।"

আত্মানন্দ শুধোলেন—"কি বিষয়ে তোমার কিন্তু হচ্ছে শুনি?"

সতীশ বোলে চল্‌লো—"অনেকগুলো বিষয়ে 'কিন্তু' রয়েছে। সর্ব্বপ্রধান—হচ্ছে আমার স্ত্রীর চরিত্রসম্বন্ধে, ওই বেনামি চিঠিটার উপরে। তার পর দ্বিতীয়—সংসার করা, কি নয়? নির্জ্জন বাসে যাওয়া, কি বাসায় বসে সাধন করা? সবার চেয়ে শক্ত কিন্তুটা হচ্ছে চাকরি ছেড়ে মাকে অনাহারে মারা, এবং কমলাকে ছেড়ে নিজেও মরা কি না?"

সতীশ যোদে তেতে-পুড়ে এসেছিল, আর গুরু ছিলেন ঠাণ্ডা ঘরখানিতে ঘুমিয়ে; কাজেই গুরু অতি কোমল স্বরে ডাকলেন—"সুধীর, বাবা, এদিকে এস তো।" গেরুয়া-আলখাল্লা-পরা নেড়া-মাথা ধীরানন্দ বাবাজী একটা লোটা-হাতে উপস্থিত হলেন। আত্মানন্দ সতীশকে দেখিয়ে বল্‌লেন—"বাবা সুধীর, একে একটু জল-টল খাইয়ে ঠাণ্ডা কোরে আন্; আমি ততক্ষণ হাত-মুখগুলো ধুয়ে আসি।"

সতীশ গুরুজীর খড়ম-জোড়াটা এগিয়ে দিলে তিনি খটাস্-খটাস্ কোরে অন্দরের দিকে চলে গেলেন। একটা বাঁদর খড়মের শব্দে ঘুম ভেঙে গুরুজীর বৈকালি-ভোগের প্রসাদ কথার লোভে ঝুপ্ কোরে ছাদের উপরে লাফিয়ে পড়লো।

সতীশ নিশ্বাস ফেলে ধীরানন্দের দিকে চেয়ে বল্‌লে—"আমার ভাই, মুক্তি নেই! গুরু বল্লেন, অন্তত তিন জন্ম কেরাকি'র করতে হবে।"

ধীরানন্দ হেসে বল্লেন—"আর আমি যদি এমন ওষুধ বাৎলে দিই যাতে এক-জন্মেই মুক্তি, তো কি দিবি?"

সতীশ কাতর হয়ে বল্লে—"আমার আর কি আছে? জন্ম-জন্ম তোর কেনা-গোলাম হয়ে রইবো।"

ধীরানন্দ সতীশের পিঠ চাপড়ে বল্লে—"আরে এক জন্মেই মুক্তি পেলি তো জন্ম, আবার জন্ম আসে কেমন কোরে? বৃন্দাবনে চলে যা; সেখানে ময়ূর বাঁদর সব এক-জন্মে মুক্তিলাভ করছে দেখতে পাবি।"

সতীশ গম্ভীরভাবে বল্লে—"কিন্তু গুরু যে বলেন আমাকে হিমালয় গিয়ে নির্জ্জন বাস করতে। আচ্ছা ভাই, তোর কি মনে হয়? কমলাকে ছেড়ে, মাকে ছেড়ে, এখনি যদি চলে যাই, তবে তাদের উপর অবিচার করা হবে না?"

ধীরানন্দ একটু হেসে বল্লে—"যদি চাকরিতে

একেবারে ইস্তফা দিয়ে পালাও, তবেই অধিকার হবে; না হলে 'সিক্ লিভ্' নিয়ে কিছুদিন গা-ঢাকা হোলে এই নানা দুর্ভাবনা থেকে মুক্তি তো পাবিই, আর-একটু মাথাটা ঠাণ্ডা হয়েও আসতে পারবি।"

সতীশ উৎসাহের সঙ্গে বোলে উঠলো—"তোর কথাতেই রাজি। আজ ছুটির দরখাস্ত দিয়ে মাকে বাড়ি পাঠিয়ে আসবো।"

ধীরানন্দ হেসে বল্লে—"যা করতে হয় এইখানে বসে কর্। বাসায় গেলে আবার মনটা 'কিন্ত' করতে পারে। চল্ এখন কিছু খাবি।"

সতীশ মাথা নীচু কোরে ভাবতে-ভাবতে সুধীরের পিছনে পিছনে আখড়ার উঠোন পেরিয়ে একটা পোড়ো বাগানের খিড়কির পারে সুধীরের ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

১৯

একবার বিয়ে করতেই সতীশের আপত্তি ছিল; কেবল কমলার দেখা পাওয়া গিয়েছিল বোলেই সেবারে দুর্গামণি সতীশকে বাঁধতে পেরেছিলেন। বাঁধন একটুখানি আল্‌গা হতেই সতীশের বৈরাগ্য-রোগটা আবার দেখা দিয়েছে; এবং আত্মারাম স্বামী ও স্ত্রী দুজনেই সতীশের ধর্ম্মপ্রদীপ ক্রমেই উস্কে তুলে যাচ্ছেন; কাজেই দ্বিতীয় বার বিয়েতে সতীশ ঘাড় পাতবে না, দুর্গামণি বেশ জানতেন; কিন্তু তবু লক্ষ্ণৌয়ের বাসাটায় বসে না থেকে, জগদীশপুরে ফিরে গেলে তিনি যে একটা-কিছু উপায় করতে পারবেন, সেটা তাঁর ধ্রুববিশ্বাস। আর সেই জন্যেই দুর্গামণি সতীশের শ্বশুর-বাড়ি থেকে ফেরার অপেক্ষায় না থেকে নিজের কাপড়-চোপড় বাক্স-পেঁট্‌রা গোছাতে বসে গেলেন।

সন্ধ্যা হয়ে এল। কাছারির ফেরতা বড়-বড় দাড়িওয়ালা নাজির আর কাজিরা আল্‌পাকার জোব্বা আর মোড়াসা মাথায় সরু গলিটার মধ্যে নিজের-নিজের শরীরখানায় ফিরে আসছে। একাগাড়িগুলো ঝাঁকানি দিতে-দিতে পাথরের রাস্তায় খট্-খট্ খটাস্ শব্দ কোরে আর ঝিন্-ঝিন্ ঘুঙুর বাজিয়ে কোতোয়ালী থেকে বেরিয়ে সোজা সহরের বাইরে চলেছে—টিক্‌টিকির মতো খোলা-অবস্থায় তরো-বেতরো সোয়ারী নিয়ে। সতীশদের বাড়ীর সামনের বাড়ীর লাল কাঠের একটা ছোট বারাণ্ডায় একটা নাচনী নানা-রঙের ওড়না-ঘাঘরায় যেন সবুজ টিয়া পাখীটি সেজে একটা গড়গড়ায় কেবলি টান দিচ্ছে; আর নীচে একটা পানওয়ালার দোকানে লাপকান চুড়িদার-লপেটা-পরা অনেকগুলো মাদ্রাসা থেকে ছুটি-পাওয়া খান ও খানানের ভিড় জমেছে। রাস্তার ওধারে নবাবী-আমলের একটা ইমামবারা ধুলো আর সন্ধ্যার আলোর মাঝে একটা ঝাপ্‌সা রঙের গম্বুজ দিয়ে অনেকটা আকাশ ঢেকে রয়েছে। দূর থেকে একটা বিউগিল্ ভোঁ ভোঁ কোরে একটা একঘেয়ে বিজাতীয় সুর সহরের সব গোলমালের উপরে ছড়িয়ে বাজতে লেগেছে। দুর্গামণি আপনার বাসার দোতলার গরাদে-দেওয়া জান্‌লার ধারে বসে সতীশের আসার অপেক্ষা করছেন, এমন সময় সুধীর ওরফে ধীরানন্দ বা ধীরেন-বাবাজী এসে বল্লে—"মা, আপনার কি সমস্ত গোছানো হয়েছে? ও-পাড়ায় সতীশবাবুরা ষ্টেশনে যাচ্ছেন। চলুন, আপনাকেও তাঁদের কাছে পৌঁছে দিয়ে আসি।"

দুর্গামণি একটু অবাক হয়ে বল্লেন—"আর আমার সতীশ এল না? তার সঙ্গে দেখা না কোরে—"

সুধীর আল্‌খাল্লার পকেট থেকে একটা চিরকুট কাগজ বার কোরে দুর্গামণির হাতে দিয়ে বল্লে—"পড়ে দেখুন, সতীশ কি লিখেছে।"

দুর্গামণি বল্লেন—"তুমি পড়ে শোনাও বাবা, আমি পড়তে পারিনে। সে ভালো আছে তো?"

সুধীর চিঠি পড়তে লাগলো। চিঠির মর্ম্মটা এই—

"মা, আমি বুঝেছি, তুমি কেন দেশে যাচ্ছ। স্থির জেনো আমি আর সংসার করবো না। তোমার আদেশে আমি প্রথম-সংসার পেতেছিলেম—শুধু তোমার আদেশ বলে মিথ্যে বলা হয়, সেবারে আমারো একটু তাড়া ছিল সত্যি—কিন্তু বিধির ইচ্ছা অন্য-রকম। তিনি আমাকে পাকে-চক্রে মুক্ত কোরে দিয়েছেন। এ ক'টা দিন যেন নভেলের কটা পরিচ্ছেদ উল্টে-পাল্টে পড়ে গিয়েছি! এখন স্বাধীনভাবে জীবনের আসল লক্ষ্য-সাধন করবার আমার সময় এসেছে, বুঝছি। আর গুরুদেবও এই কথা বলেন। সুতরাং তাঁরি আদেশ শিরোধার্য্য কোরে আমি কিছুদিনের জন্যে হিমালয়ের কোনো নির্জ্জন বাসে সাধন-ভজন করতে চল্লেম। আমাকে ক্ষমা কোরো। এই আমার গুরু-ভাই ধীরানন্দ, ইনি তোমায় সতীশবাবুদের কাছে ষ্টেশনে পৌঁছে দেবেন। সমস্ত বন্দোবস্ত আমি ঠিক কোরে দিয়েছি। ইতি সেবকাধম সতীশ।"

অত বড় চিঠিখানার মধ্যে কেবল হিমালয় আর সাধন—এই দুটি কথা দুর্গামণি বুঝলেন। আর বুঝলেন, তাঁকে দেশে যেতে হবে, সতীশ আসবে না। এমন কোরে সতীশ পালাবে, দুর্গামণি স্বপ্নেও ভাবেন নি। তিনি আঁচলে চোখ মুছে চল্লেন। ধীরেন-বাবাজী পোঁটলা-পুঁটলি মুটের মাথায় চাপিয়ে একাগাড়ির পর্দ্দাটা নামিয়ে দিয়ে সতীশের মাকে ষ্টেশনে ওঠাতে সঙ্গে চল্লো।

সতীশের স্বভাবটা বরাবরই কেমন-একটু বৈরিগী-গোছের। হঠাৎ কমলাকে দেখবামাত্র রূপের নেশা তাকে পেয়ে বসেছিল; এবং কমলা আসা অবধি সতীশের বৈরাগ্য-বারিধি প্রেমবারিধি হয়ে একেবারে উছলে উঠেছিল এবং ক্রমেই সংসারের কূলের দিকে তার মনের ঢেউগুলোও এগিয়ে আসছিল, এটা দুর্গামণি যেমন লক্ষ্য করেছিলেন, এমন আর কেউ নয়। কিন্তু আজ তাঁর লক্ষ্মী-বৌ কমলার চাঁদমুখটি সরে গেছে; সতীশকে নিয়ে তার বৈরাগ্য আর-একবার অকূলের দিকে ফেরবার উপক্রম করছে। ছেলের গলায় আর-একটি সংসার না ঝুলিয়ে দিলে সে পালাবে, এটা দুর্গামণি বুঝেই কমলার শূন্য আসনটি আর একটি লক্ষ্মী বৌ দিয়ে ভর্ত্তি করবার চেষ্টায় দেশের মুখে ছুটলেন—সতীশকে বোঝাবার বা দেখবার অপেক্ষা না রেখেই।

ওদিকে সতীশ কমলা-সম্বন্ধে নিদারুণ চিঠিটা পেয়েও বিশ্বাস করেনি, কমলা এমটা করবে! সে মনে-মনে ব্যথা পাচ্ছিল, কিন্তু তবু এক-এক-সময় তার ভিতর থেকে কে যেন বলছিল—যা হবার তা তো হয়ে গেল; এখন আর কেন? যেদিকে পথাই

তালো। সাধের বাঁধন যখন ছিল, তখন ছিল; কিন্তু এখন যখন সেটা আপনা-হতেই খস্‌লো, তখন বুঝতে হবে সেটা গুরুকৃপা-বলেই ঘটেছে; অতএব এই মহা সুযোগ; আর সংসারে ফেরা নয়! আবার মনে হয়, কমলা কি সত্যি দোষী? একটা বেনামি চিঠির উপরে নির্ভর কোরে তাকে চিরকালের মতো ভাসিয়ে দেওয়া কি উচিত হয়? এক-একবার সতীশ মনে করে, সবিশেষ তদন্ত করার জন্তে একবার তার কালিগাঁয়ে যাওয়াটা হিমালয় যাওয়ার চেয়ে বেশি দরকারি, কিন্তু তখনি মনে একটা ত্রাস জাগে—গুজবটা যদি সত্যি হয়!

সতীশ এমনি হিমালয় ও কালিগাঁ দুটোর মধ্যে দুলছে; আর একবার আফিস, একবার খালি বাসা, একবার গুরুর আখড়ায় যাতায়াত করছে।

ও, আর, আর, গাড়ি পাঞ্জাব-মেলে রূপান্তরিত হয়ে দুর্গামণিকে বেলুড়েতে নামিয়ে কলকাতায় পৌঁছে যাবার হপ্তা-খানেক হয়ে গেলেও সতীশ-ছোকরা যেখানকার সেইখানেই রইলো,—এক-পাও হিমাচলের দিকে গেল না। কিন্তু মনটি তার মুক্তির জন্তে ধড়ফড় করছে, সেটা তার মুখ দেখেই আখড়া ও আফিসের সবাই বুঝলে। ছুটিটা মঞ্জুর হয়ে এলে সতীশ কোন্ দিকে নড়বে,—উত্তর-পূর্ব্বে, না দক্ষিণ-পূর্ব্বে, সেটা নিয়ে তার পরিচিতদের মহলে বাজি খেলাও চলতে সুরু হয়ে গেল—সতীশের সামনে এবং আড়ালে।

২০

সতীশ যখন এইরকম দোদুল্যমান অবস্থায়, সেই সময় ওধারে অরুণ সকালে উঠে কমলার চিঠি বুকের পকেট নিয়ে ক্ষিতীশের চায়ের টেবিলে এসে বসলো। এ-আলাপ, সে-আলাপ, খবরের কাগজ, চায়ের পেয়ালা, সিগারেটের ধোঁয়া আর বাইরের গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি ও সার্সি-বন্ধ ঘরের ভ্যাপ্‌সা গরমের মধ্যে এক-সময় ক্ষিতীশ অরুণকে শুধোলে, "এই বৃষ্টিতেই কি অরুণ দেশে যাবে?" অরুণ ঘাড় নেড়ে বল্লে—"না, একবার সতীশের সঙ্গে দেখা কোরে তবে দেশে যাব।"

ক্ষিতীশ বোলে উঠলো—"লক্ষ্ণৌ যাবে নাকি? সেখানে তো সতীশবাবু নেই। আমরা সেদিন খোঁজ নিয়ে এলেম, তিনি স্ত্রীর অসুখের ছুতো করে তাঁর মাকে নিয়ে জগদীশপুরে চলে গেছেন।"

অরুণ চায়ের পেয়ালাটা নামিয়ে রেখে বলে উঠলো—"না, আমি জগদীশপুরে যাচ্ছি—সাতটা উনপঞ্চাশের গাড়িতে। দিদিকে একবার বোলে আসি।"

কমলার সঙ্গে দেখা কোরে অরুণ ফিরে এল—একটা সিগারেট ধরিয়ে মুখে দিয়ে, আর গোটা-আষ্টেক যায় দেশালায়ের বাক্সটা ডোরাটানা টুইলের কোটটার পকেটে ফেলে। হরেনকে বল্লে—"হরেনদা চলুম।" তারপর চটি-জুতোটা চটাস্-চটাস্ করতে-করতে বেরিয়ে গেল। ক্ষিতীশ খানিক চুপ কোরে থেকে বল্লে—"অরুণ কি সতীশবাবুর দেখা পাবেন?"

হরেন বল্লে—"পেতেও পারে।"

ক্ষিতীশ খানিক অন্যমনস্ক থেকে বোলে উঠলো—"আমার কেমন মনে হচ্ছে, এ যাত্রায় অরুণও নিরাশ হবে।"

হবেন কোনো জবাব না দিয়ে আপনার মনে কি ভাবতে লাগলো।

সকাল সাতটা উনপঞ্চাশের প্যাসেঞ্জার বেলা একটায় বেলতলিঙে অরুণকে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল। অরুণ তার ব্যাগ আর ছাতাটা প্ল্যাটফরমের সাদা কাঠের রেলিঙের গায়ে ঠেসিয়ে রেখে একখানা গাড়ির সন্ধান করতে ফটকের দিকে চলেছে, দেখলে, একদল যাত্রাওয়ালা ষ্টেশনের দুটো কেরাঞ্চি আর চারখানা গোরুর গাড়ি দখল কোরে কাগজের ফুল, সাজ-ঘরের তোরঙ্গ, হারমোনিয়ামের বাক্স ইত্যাদিতে বোঝাই হয়ে ফ্লুট বাজাতে-বাজাতে পান চিবোতে-চিবোতে রৈরৈ কোরে চল্লো। সব-শেষে অরুণের চেনা একটা মুটে দুটো এ্যাসেটিলেন গ্যাসের বাতি মাথায় কোরে যাচ্ছিল; সে অরুণকে ডেকে বল্লে—"কালিগাঁয়ে যাবে ন্যকি বাবু? দেন আমার হাতে ব্যাগটা। গাড়ি পাওয়া যাবে না।"

"জগদীশপুরে যেতে হবে।" বোলে অরুণ মুটেকে ব্যাগটা দিয়ে বল্লে—"সতীশের বাসায় চল্।"

"সতীশবাবুতো নেই। বাসায় মাঠাকরুণ একলা আছেন।" বোলে-মুটে হন্‌হন্ কোরে এগিয়ে চল্লো।

অরুণ একবার ভাবলে—তবে আর গিয়ে কি লাভ? আবার বল্লে—"তাই চল্; মা-দুর্গাকে দেখে না হয় কালিগাঁয়েই যাবো একবার।"

ভাদরের আকাশ মেঘলা হলেও বাতাসের লেশমাত্র ছিল না। তার উপর সামনে যাত্রাওয়ালাদের চলতি গাড়িগুলো মেঠো রাস্তায় বিষম ধুলো উড়িয়েছে। অরুণ একটার পর একটা সিগারেট পোড়াচ্ছে আর রাস্তার অধিকারীকে অভিশাপ দিতে-দিতে চলেছে।, তার মুটে সদর-রাস্তা ছেড়ে হাঁটা-পথে কোন্ দিক দিয়ে কোথায় যে গেছে, তার আর দেখা নেই। এমন সময় সামনের একখানা কেরাঞ্চি গাড়ি চাকা ভেঙে হঠাৎ রাস্তার মাঝে কাৎ হয়ে পড়লো। গাড়ির ছাদ থেকে গোটা-কতক ফ্লুট ক্লারিওনেট আপনার-আপনার বাক্স ছেড়ে এবং গাড়ির মধ্যে থেকে নিজেদের আসন ছেড়ে গোটা-ছয়েক ছোকরা এবং আধা-বয়সী যাত্রার দলের বাবু পানের পিক্-মাখা সার্ট আর পমস্থ নিয়ে ছিটকে ধুলোয় পড়লো। অরুণ এই দুর্ঘটনার দিকে দৃকপাত না কোরে হন্‌হন্ কোরে সোজা বেরিয়ে গেল। তারপর আর-এক-সময়ে অরুণ দেখলে, রাস্তার ধারে আর-একটা ঠিকে-ঘোড়া ঘোড়া ছিঁড়ে কেবলি লাথ্ ছুঁড়ছে আর গাড়ির মধ্যেকার লোকগুলো কেবলি ঘোড়া আর গাড়োয়ানকে গাল পাড়ছে; কেউ বা গানও ধরেছে। এমনি নানা ঘটনার মাঝ দিয়ে, ধুলোয় আর ঘামে মিলিয়ে একটা আধ্-শুকনো আধ্-ভিজে চেহারা নিয়ে অরুণ গ্রামে পৌছলো—বেলা সাড়ে চারটের।

গ্রামের একটিমাত্র রাস্তা; তারি দুধারে ঘর-বাড়ি, দোকান-পাট, পঞ্চাননতলা, ঠিকে-গাড়ির আস্তাবোল, ইস্কুল-বাড়ি, ডাক্তার-খানা সবতই—আর একটা চেরিটেবল্ ডিস্পেন্সারি—যেখানে কুইনাইনের বদলে ময়দা ময়দার গুঁড়ো দেওয়া হয়, আর একটা "জগদীশ হল ও পবলিক্ লাইব্রেরি এণ্ড ক্লব।" সেখানে প্রবন্ধ পাঠ, বারোয়ারী

পূজো, করপোরেশন মিটিং, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের গলায় মাল্যদান ও ওইদিন থিয়েটার যাত্রা বা বায়স্কোপে স্ত্রীস্বাধীনতাও কখনো-কখনো হয়ে থাকে।

অরুণ তেতে-পুড়ে এই লাইব্রেরীর গায়ে সতীশের বাড়ীর সদর দরজায় এসে দেখলে তার মুটে দাঁড়িয়ে আছে। অরুণ একবার দরজাটায় নাড়া দিয়ে একটা হাঁক দিলে—"মা-দুর্গা ঘরে আছেন ?"

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দু'তিন বার হেঁকেও যখন কারু সাড়া পেলে না, তখন মুটের দিকে চেয়ে অরুণ বল্লে—"তুই যে বল্লি, মা ঘরে আছেন ?"

মুটের উত্তর হলো—"আছেন কিন্তু সকাল থেকে জ্বরে বেহোঁস।"

"এতক্ষণ বলতে হয়বে গাধা!" বোলে অরুণ দরজাটা ধাক্কা দিয়ে খুলে, বাড়ীর মধ্যে দাওয়ার উপরে ব্যাগটা রেখে, ভাড়ার পয়সা মুটের হাতে দিয়ে, অরুণ লোকটাকে একবার ডাক্তারবাবুকে ডেকে আন্‌তে পাঠিয়ে ঘরে ঢুকলো।

অন্ধকার ছোট ঘরটির মধ্যে দুর্গামণি শুয়েছিলেন। অরুণ গিয়ে আস্তে-আস্তে তাঁর পায়ে হাত দিতে চম্‌কে উঠে দুর্গামণি বলে উঠলেন—"কে সতীশ ?"

অরুণ তাঁর কাছে সরে বসে বল্লে—"সতীশ তো নয়, আমি এসেছি, মা-দুর্গা!"

"অরুণ!"—বোলে দুর্গামণি তাঁর রোগা হাতখানি অরুণের কোলে ফেলে শুধোলেন—"বাড়ীর সব ভালো ? আমার—"বোলেই সতীশের মা চুপ করলেন। একফোঁটা জল চোখের কোণে গড়িয়ে এল।

অরুণ তাড়াতাড়ি বোলে উঠলো—"তোমার বৌমা ভালো আছেন, জেঠোমা। গঙ্গাস্নান করতে গিয়ে ভিড়ে হারিয়ে গিয়েছিল; হরেনদাদা দ্যাখে—রাস্তায় বসে কাঁদছে। সে আর তার বন্ধু ক্ষিতীশ তাকে নিজেদের সঙ্গে নিয়ে গিয়ে ডাক্তার দেখিয়ে তাকে ভয়ানক অসুখ থেকে বাঁচিয়েছে।"

দুর্গামণি অরুণের দিকে চেয়ে শুধোলেন "—এখন বৌমা ?"

"এখন দিদি আমারি কাছে আছে।" বোলেই অরুণ চাদরে একবার নিজের মুখটা বেশ কোরে মুছে নিলে।

দুর্গামণি একটা নিশ্বাস ফেলে বল্লেন—"তবে সে গুজোবটা ?"

"সবই মিথ্যা!" বোলেই চট-কোরে অরুণ দাঁড়িয়ে উঠে বল্লে—"আমি একবার বাইরে দেখি, ডাক্তার এল বুঝি।"

দুর্গামণির সামনে বসে থাকা আর নিরাপদ নয় বুঝে অরুণ ডাক্তারকে সঙ্গে কোরে তবে ঘরে ঢুকলো এবার। ডাক্তারের মুখে অরুণ শুনলে, দুর্গামণির টাইফয়েড; কেউ নর্স না করলে চলবে না। এটুকুও ডাক্তার বল্লেন যে একটু দুর্নামের দরুণ পাড়ার মেয়েরা কেউ এঁর সেবা করতে রাজি নয়। ডাক্তারের কথায় বাধা দিয়ে অরুণ বলে উঠলো—"সে কথা থাক। আজ রাতটার মতো আপনি আপনার হিন্দুস্থানী দাসীটাকে এঁর কাছে পাঠিয়ে দিন। আমি আজই কলকাতা থেকে নর্স আনতে চল্লুম। আমার আসা পর্য্যন্ত আপনি এঁকে দেখবেন কিনা বলুন ?"

"নিশ্চয় দেখবো।" বলে ডাক্তার চলে গেলেন।

ডাক্তারকে বিদায় কোরে অরুণ দুর্গামণির কাছে এসে বল্লে—"মা, সতীশের ঠিকানাটা কি? তাকে তার করতে হবে।"

দুর্গামণি বল্লেন—"সে তো তার পাবেনা; বিবাগী হয়ে কোথায় হিমালয় গেছে।"

অরুণ বল্লে—"তবে উপায়? আমি তোমার জন্তে কলকাতা থেকে নর্স আনিগে।"

নর্সের কথা শুনেই দুর্গামণি ভুরু কুঁচকে বল্লেন—"না, না, নর্স কাজ নেই! তোমা কেউ—"

অরুণ দুর্গামণির মুখের কাছে মুখ নিয়ে শুধোলে—"দিদিকে আনবো মা-দুর্গা?"

"সেই ভালো।" বোলে দুর্গামণি চোখ বন্ধ করে আস্তে বল্লেন—"বৌমাকে বলিস, আমি গুজোব-কথা, বেনামি-চিঠিতে একটুও বিশ্বাস করিনি, করবোও না। সতীলক্ষ্মী আমার বৌ।"

অরুণের চোখ ছল্-ছল্ কোরে এল। সেই সময় ডাক্তারের দাসী রামদাসিয়া এসে উপস্থিত দেখে অরুণ বল্লে—"আজ রাতের মতো এই দাসীটাকে তোমার কাছে রেখে যাই; কাল দিদিকে এনে দিচ্ছি। আমার ব্যাগটা এইখানেই রইলো।"

দুর্গামণির পায়ের ধূলো নিয়ে অরুণ বেরোবে, দুর্গামণি রামদাসিয়াকে বল্লেন—"ও ঘরে বাতাসা আর ডাব আছে, অরুণকে খেয়ে যেতে বল্।"

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে অরুণ দু-খানা বাতাসা চিবিয়ে ডাবের সমস্তটা গলার মধ্যে ঢেলে দিয়ে মুখ মুছতে-মুছতে সোজা আবার ষ্টেশনের দিকে চল্লো।

পব্লিক লাইব্রেরীর কাছটায় অরুণের বন্ধু যতীন একটা এসেটিলিনের হাণ্ডা খাটাচ্ছে ব্যস্ত ছিল; অরুণকে দেখে বলে উঠলো—"কিরে কোথায় চলেছিস্? শুকনো দেখি যে। খবর কি? পড়াশুনা চলছে কেমন? আজ রাতে বারোয়ারী পুজো; যাত্রা হবে; আসিস্—বুঝলি!" এমনি নানা প্রশ্নের অরুণ একটি-মাত্র উত্তর দিয়ে গেল—"মা-দুর্গার বড় অসুখ।"

ক্রমশঃ

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনের মাহাদানী*

মহারাষ্ট্র সাম্রাজ্যের দপ্তরখানায় অনেক প্রাচীন কাগজ-পত্র আছে, ঐ সকল কাগজ হইতে সেখানকার রাজ্যশাসন-পদ্ধতি-বিষয়ক সকল তথ্য জানিতে পারা যায়। গ্রামের পাটীলের পাওনা হইতে পেশবার পাওনা পর্য্যন্ত গ্রামবাসীগণের সমস্ত দেনার তালিকা ঐ সকল কাগজ হইতে তৈয়ার করা যায়। বাঙ্গালা নদী-মাতৃক দেশ। প্রতি দশবৎসরেই এখানকার নদীর গতির পরিবর্ত্তন হয়, প্রকৃতির এই খাম-খেয়ালের ফলে আমাদের অনেক পুরাতন গ্রামনগরের চিহ্নমাত্রও আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তাছাড়া

* আগামী সংখ্যায় লেখক—শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

এখানকার আবহাওয়াও অত্যন্ত খারাপ। এই সকল কারণেই এখানে প্রাচীন কাগজ-পত্র বেশী পাওয়া যায় নাই। মারাঠী কাগজ-পত্র হইতে জানিতে পারি, সেখানকার সমস্ত ব্যবসায়ীকেই পণ্যের জন্য কি পরিমাণ কর দিতে হইত। পেশবা-যুগে গোয়ালা-দিগকে ঘী এবং তেলীদিগকে তেলের অংশ রাজসরকারে দিতে হইত। ফিরুজ সাহ তুঘলক যে সকল কর গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে 'রওঘন-ই-জরদ্,' হলুদে তেল বা ঘৃতের উল্লেখ আছে, সাধারণ তেলের উল্লেখ ত আছেই। অন্যান্য মুসলমান নৃপতি-গণের আবওয়াবের তালিকা হইতেও 'রওঘন' বাদ যায় নাই। বাঙ্গালার গ্রামে গ্রামে এই সকল কর কি প্রণালীতে আদায় করা হইত, তাহা কোন প্রাচীন সরকারী দলীল হইতে জানিবার উপায় নাই। কিন্তু অনেক সময় প্রাচীন সাহিত্যে দেশের ইতিহাসের অনেক উপাদান পাওয়া যায়। মহাকবি চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনেও এইরূপ ঐতিহাসিক তথ্যের অভাব নাই। পাঠান রাজত্বকালে গ্রামে গ্রামে ব্যবসায়ীর পণ্যের মূল্যের অনুপাতে কিরূপে কর আদায় করা হইত তাহার বিবরণ কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের দান-খণ্ড হইতে সঙ্কলন করা যাইতে পারে।

কৃষ্ণের প্রণয়-প্রস্তাব লইয়া বড়াই রাধার নিকট গিয়া প্রত্যাখ্যাত, ও লাঞ্ছিত হইয়া আসিয়াছেন। কৃষ্ণ ইহার প্রতিশোধ লইতে চাহেন আবার রাধাকেও পাইতে চাহেন। তিনি বড়াইকে বলিলেন, রাধাকে লইয়া মথুরার হাটে যদি ঘৃত বেচিতে যাইও, আমি পথে মাহাদানী বা ট্যাক্স-দারোগা সাজিয়া দাঁড়াইয়া থাকিব, দান-কর আদায়ের ছলে তাহার পথরোধ করিয়া তাহাকে লাঞ্ছিত করিব। সেকালে পথে দাঁড়াইয়া হাট ও বাজার গামী ব্যবসায়ীর নিকট হইতে এই 'মাহাদানীরা' কিরূপে কর আদায় করিতেন, তাহার একটি সুন্দর চিত্র মহাকবি কৃষ্ণ-রাধিকার বাদ-প্রতিবাদ ছলে অঙ্কিত করিয়াছেন।—

সুন্দরি রাধা শুন সমুখে
পুছো মোঞ হৃষীকেশ।
কথাঁ না এসসি কথাঁ তোর ঘর
জাইবেঁ কোমন দেশে। ল রাধা ॥ ১ ॥
গোকুলে থাকোঁ মো গোআল জাতী
তোহ্মা না পুছহ কিকে।
ষোল শতগোপী পসার সাজিআঁ
মথুরা জাওঁ থো বিকে ॥ ২ ॥
শুনাহো রাধা মাথার চুপড়ী
দেখোঁ মো তোহ্মার পসারা।
কোন বধূ লআঁ জাহা মথুরা
তাহার দেহ বিচারা ॥ ৩ ॥
ঘৃত দধি দুধ আওর ঘোল
এ সব মোর পসারা।
তোহ্মে না কমন কারণে কাহ্নাঞি
চাহ ইহার বিচারা ॥ ৪ ॥
তোঞ ন জানসি মোঞ মাহাদানী
এদান সব আহ্মারে।
তাত্তে ষোল পণ দিআঁ মাহাদান
চল মথুরা নগরে ॥ ৫ ॥
বিষম কালে বিষম গুণী
হেন বিপরীত বাণী।
আনেক সমএ মথুরার পথে
ঘৃত দুধে মাহাদানী ॥ ৬ ॥

আজলী রাধা   তোঁ আবালী বড়ী
হেব পাড়ী পরমানে।
আপন চিহ্নিআঁ   দিআঁ বাহা দান
রাখহ আপন মানে ॥ ৭ ॥
পুরুবেঁ শুনী এঁ   বা রাম রাজ্য
সে হৈল কংসের দেশে।
বসিল জনে   কড়ী—
(ইহার পর ১৯।১ পাতা নাই)
—মাহাদানী   এতকালে শুনী
হেন আচারিত বাণী।
তোর জপমাত্র   লাজনাহি তাত্র
শুন দেব চক্রপাণী ॥ ১৬ ॥
ক্রোধে কাহ্নাঞি   রাধার অঞ্চলে
ধরি মনে মনে হাসে।
বাসলী চরণ   শিরে বন্দিআ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ১৭ ॥
(শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন পৃঃ ৩৬।৩৬)।

দুঃখের বিষয় গ্রন্থখানি খণ্ডিত, সকল পৃষ্ঠা নাই, তাই রাম-রাজ্য তুল্য কংসের রাজ্যেও মাহাদানী কেন হ'ল, দধি দুধের উপর আবার তাহে রোপণ করিয়া মাশুল কেন হইল তাহার কারণ এখানে দেওয়া নাই। শ্রীরাধার প্রত্যুত্তর হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে মথুরার হাটের পথে মাহাদানীর উপস্থিতি নিত্য-নৈমিত্তিক সাধারণ ব্যাপার নহে এবং ঘৃত-দুধের উপর মাশুল লওয়াটা অসাধারণ অত্যাচার বলিয়াই পরিগণিত হইত। 'আবালী' গোয়ালিনীর অঞ্চল ধরাটা অবশ্য 'মাহাদানীর' আইন-সঙ্গত অধিকারের মধ্যে ছিল না, তবে বৈষ্ণব কবি তাঁহার প্রিয় প্রেমের দেবতাটিকে অনেক অধিকারই দিয়াছেন, তাঁহারই বলে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক রাধার এই লাঞ্ছনা। রাজ-কোষে অর্থের বিশেষ অনটন হইলেই রাজার অভাব এইরূপ মাশুল আদায় করিয়া পূরণ করিবার ব্যবস্থা ছিল, এবং কোন লোকের নিকট হইতে কিছু অগ্রিম টাকা লইয়া এই মাশুল বা মাহাদান তাহাকে ইজারা দেওয়া হইত, তাহারও প্রমাণ শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনে আছে।—

কিনা মোক হৈল এতকালে।
মাহাদানী হৈলেন গোকুলে ॥ ধ্রু ॥
অনেক কড়ীর পসারী।
হাট জাইতেঁ না পাইলোঁ মথুরা ॥
রাজা কংসে করিব গোহারী।
তবেঁ কাহ্ন দেখাঁ যাবোঁ ধরী ॥ ২ ॥
নিতি নিতি দধি বিকে জাওঁ।
দানের সুধা নাহি পাওঁ।
এবে রাজা ধনের কাতর।
চাহে যবেঁ দুধে দিবোঁ কর ॥ ৩ ॥
পুনশ্চ—
শুনহ সুন্দরি রাধা পাঞীর বাখান।
ষোল শত কুড়বাটে মোর মাহাদান ॥ ১ ॥
এবেঁ রাজা হৈল ধনের কাতর।
পথে মাহাদানী থুইল হেন আছিবর ॥ ২ ॥
এবং—মোরে দান দিআঁ যাহা সুন্দরি রাধা ॥
*   *   *   *   *
অলক্ষ্য না বোলোঁ বোলোঁ সত্যপরমান
শতেক কুড়িএঁ রাধা নৈলোঁ মাহাদান

মহাদান গ্রহণের ব্যবস্থা যে সর্ব্বদা হইত না, তাহার উল্লেখ আরও দুই এক স্থলে আছে। যথা—

নিতি নিতি রাধা যাসি বিকে।
মোর মাহাদান ভাদাসি কিকে ॥ ১ ॥

নিলজ বড় গোকুলের কাহ্ন।
কোণ চিহ্নে তোর মাহাদান ॥ ২ ॥
ঘৃত দধি দুধ তোর পসার।
মাহাদান কিকে ভাগে আহ্মার ॥ ৩ ॥
বিধর কালে বিধর গুনী।
ঘৃত দধি দুধে বসে মাহাদানী ॥ ৪ ॥
পুছিআঁ চাহা বলভদ্র ভাই।
মোর মাহাদান তোহ্মার ঠাই ॥ ৫ ॥
কিবা পুছিবোঁ মোএঁ বলভদ্র।
তোহ্মাথো আধিক সে আছিদর ॥ ৬ ॥
বড়ার ঝি তোর ভাল নহে মতী।
* * * * ॥ ৭ ॥
এ লোক ও লোক সে জন মাত্র।
সেহি এহা পথে মাহাদানী বোলোএ ॥ ৮॥
বার বরিষের আহ্মার দান।
কাঢ়িআঁ তোমার লইবোঁ পরাণ ॥ ৯ ॥

দেখা যাইতেছে যে বার বৎসরেও মাহাদানের ভাষাদি হইত না। কারণ কৃষ্ণ বারবারই বার বৎসরের দান দাবী করিতেছেন—

বারহ বরিষেকের মোর মাহাদান।
শুন তোহ্মে আলে রাধা পাঞী পরমাণ ॥১॥
* * *
বারহ বরিষের দান শুনহ মুগধী
মোহোর কহমে তোহ্মা আনি দিল বিধী ॥৫॥

মাহাদান কেবল পথে আদায় হইত না, হাটেও যথারীতি মাশুল আদায় করা হইত। কৃষ্ণ-কীর্ত্তনে 'বাটদান' 'হাটদান' উভয়েরই উল্লেখ আছে।

বাটদান হটদান লইলোঁ। রাজঘরে।
তেকারণে আইলোঁ। মোএঁ যমুনার তীরে ॥
নিতি নিতি যাহা তোহ্মে মথুরা নগরে।
সব হবিবান দান দেহত আহ্মারে ॥ ১ ॥
দিবেহেঁ দধির দান শুনহ গোআলিনী।
কংসের বিষএ আহ্মে হইএ মাহাদানী ॥৩॥৪॥

মাহারাষ্ট্রের ট্যাক্স-দারোগারা কিন্তু কেবল দধি দুধ তেল ঘিয়ু উপর কর লইয়াই সন্তুষ্ট হইতেন না। তাঁহারা সকল প্রকার বণিকের নিকট হইতেই সকল প্রকার পণ্যের জন্যই কর আদায় করিতেন—যদি না তাহাদের সহিত ছাড়-পত্র থাকিত। বাঙ্গালা দেশেও যে বহুমূল্য পণ্যগুলি কর হইতে অব্যাহতি পাইত না, তাহাও বঙ্গীয় মহকবির অজ্ঞাত ছিল না, তাই তিনি রাধার রূপবর্ণনাচ্ছলে কৃষ্ণকে দিয়া বলাইতেছেন—

হাতে খড়ী করী বোলোঁ। মো কাহ্ন
আইস লে রাধা লেখা করি দান ॥ ১ ॥
আছঠ হাথ কলেবর তোর।
দুই কোটি দান তাহাত মোর ॥ ২ ॥
মার্গিত কুসুম মাল-রচনে।
এ হতে আহ্মার লক্ষক দানে ॥ ৩ ॥
চামর জিনিআঁ চিকুর তোরে।
এহার দাম দুই লাখ মোরে ॥ ৪ ॥
সিসের সিন্দুর ভুবন মোহে।
এহার দান তিন লক্ষ হএ ॥ ৫ ॥
নির্ম্মল শশি তোর মুখ দেখোঁ।
এহার দান চারি লাখ লেখোঁ ॥
নীল উৎপল তোর-নয়নে।
এহাত মোর পঞ্চ লাখ দানে ॥ ৭ ॥
গরুড় সমান তোহোর নাশা।
এহাত ছয় লক্ষ দানের আশা ॥ ৮ ॥
শ্রবণ কুণ্ডল শোভএ তোরে।
এহার দান সাত লক্ষ মোরে ॥ ৯ ॥
মাণিক জিনিয়া দশন শোহে।
এহার দান আঠ লাখ মহে ॥ ১০ ॥

বিম্বফল তুল তোর আধরে।
নব লক্ষ দান তাত আক্ষারে ॥ ১১ ॥
কণ্ঠদেশে তোর কম্বু সমানে।
দশলক্ষ হএ এহা ত দানে ॥ ১২ ॥
বাহু মৃণাল কমল করে।
এগার লক্ষ দান তাহারে ॥ ১৩ ॥
মুখ পাঁতি তোর চন্দ্রিকা জিনে।
বার লক্ষ হএ এহার দানে ॥ ১৪ ॥
শ্রীফল যুগল তোহোর তান।
এহার দান তের লক্ষ ধনে ॥ ১৫ ॥
ত্রিবলি মাঝা বাএ হেলে তোরে।
চৌদ লক্ষ দান এহাত মোরে ॥ ১৫ ॥
উরু তোর রাম কদলী সমানে।
পঞ্চদশ লক্ষ এহার দানে ॥ ১৭ ॥
পদযুগ থল কমল আকারে।
ষোল লক্ষ দান তাহাত আক্ষারে ॥ ১৮ ॥
হেম পাট জিনি ....
চৌষাট্টি লাখ তাত মোর দানে ॥ ১৯ ॥

সুতরাং দেখা যাইতেছে চামর, মানিক, কম্বু, মৃণাল, শ্রীফল, হেমপাট, প্রভৃতি সকল বহুমূল্য দ্রব্যের জন্যই কর দিতে হইত। আবার মাহাদানীকে কেহ ফাঁকি দিয়া এক সকল বহুমূল্য দ্রব্য লুকাইয়া না লইয়া যায় তাহার প্রতিও তাঁহার প্রখর দৃষ্টি ছিল। তিনি সকলের পসরা নামাইয়া পোটলা পুটলি তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া দেখিতেন।

সোনার কটুআ ছুটি মাণিকে পুরীআঁ।
নেত বসন তাত ওহাড়ন দিআঁ ॥
আক্ষা ভাণ্ডী লআঁ যাহ আমুল ভাণ্ডার
ফাঙ্গুলী খুচাআঁ নেবোঁ তাহার বিচার ॥ ২ ॥

সুতরাং মাহাদানীরা বণিকদিগের উপর মাঝে মাঝে একটু অত্যাচার যে করিতেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

হিসাব করিবার জন্য পাঁজিপুথি খড়ি প্রভৃতি সরঞ্জাম মহাদানী মহোদয়ের নিকট প্রস্তুত থাকিত।

হাতে খড়ি কবী বোলোঁ মোকাহ্ন।
আইসল রাধা লেখা করি দান ॥ ১ ॥

আবার রাধা বলিতেছেন—

মিছা খড়ি পাড়ু কাহ্নাঞি কপট নাটে।
কংশ শুনিলে পড়ি যাইবে টাটে ॥ ১ ॥
কিসোর রূপগুণ তৈল মথুরার পথে।
পাঁজী পুথী তোক্ষার চিরিবোঁ বামহাতে ॥

চণ্ডীদাস সংস্কৃত জানিতেন, সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিবার মত জ্ঞান তাঁহার ছিল। দান শব্দটি সংস্কৃত সুতরাং আপত্তি হইতে পারে যে মাহাদানী মহাশয় হয়ত হিন্দু-যুগের কোন সংস্কৃত গ্রন্থ বর্ণিত রাজকর্মচারীর প্রতিকৃতি মাত্র। কিন্তু এ সংশয়ের নিরসন দুরূহ নহে। মাহাদানী শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন যে "ষোলশত কুড় ঘাটে মোর মাহাদান।" এই কুড়ঘাটগুলি পাঠান যুগের পরিচায়ক না হইয়া যায় না। কবিরা আপনাদের কাব্যে অনেক সময় সমসাময়িক সমাজের চিত্রই অঙ্কিত করিয়া থাকিবেন। চণ্ডীদাসের মাহাদানী কৃষ্ণ পাঠান-যুগের ট্যাক্স-দারোগার হুবহু চিত্র না হইতে পারেন, কিন্তু ঐরূপে হাটে ঘাটে ও বাটে পসারিণীর পসরা নামাইয়া ভাণ্ড প্রতি মাশুল আদায় করার প্রথা হয় বোধ চণ্ডীদাসের জীবিত কালেই প্রচলিত ছিল এবং জীবিত মাহাদানীদের আদর্শ সম্মুখে ছিল বলিয়াই তিনি মাহাদানীর কুড়ঘর, ভাণ্ডে ষোলপণ প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া একটি সুন্দর আলেখ্য চিত্রিত করিয়াছেন।

কৃষ্ণ-কীর্ত্তন গ্রন্থখানি কাব্যরসিক ও ভাষাতত্ত্ববিদের পরম আদরের বস্তু। ইহার রুচি যতই নীতিবিগর্হিত হউক না কেন, ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহের নিমিত্ত প্রত্ন-জিজ্ঞাসুগণও এই গ্রন্থখানি আদর করিয়া পাঠ করিতে হইবে। আমাদের এই প্রাচীন দলীল বর্জ্জিত বঙ্গদেশের রাজ্য-শাসন পদ্ধতির মাল-মসলা প্রাচীন সাহিত্য হইতেই সংগ্রহ করিতে হইবে। সে সঙ্কলন একেবারে নিখুঁত না হইতে, পারে কিন্তু একেবারে বিশ্বাসের অযোগ্যও হইবে না।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন

চক্র

ত্রয়োদশ বর্ষীয় এক বালকের সঙ্গে দালানে বাহির হইয়া আসিয়া জগদ্ধাত্রী ডাকিলেন, "বৌমা। অ বৌমা।" তাঁহার সে উচ্চ কণ্ঠস্বরে অপ্রসন্নতা বেশ স্পষ্টই ফুটিয়া উঠিল।

শীলেদের প্রকাণ্ড চক-মিলানো বাড়ী—অন্দর-মহলের দ্বিতলে বারান্দায় মোটা মোটা জোড়া থামের পাশে কাঠের রেলিং ধরিয়া একটি দশম বর্ষীয়া বালিকা দাঁড়াইয়া ছিল। বাটীর গৃহিণীর ডাক শুনিয়া সে মেয়েটি ঈষৎ অগ্রসর হইয়া আসিল। তাহার পরিহিত পাঁচপেড়ে নীলাম্বরী শাড়ীর প্রান্তটুকু তাহার মাথার খাটো চুলের উপর ঢাকা ছিল, তাহা সেই রূপই রহিল, আর বেশী বাড়িল না। বালিকার ক্ষুদ্র ললাট ভ্রূকুটি-কুঞ্চিত হইল, সে তীব্র চঞ্চল নেত্রে শাশুড়ীর সমভিব্যাহারী বালকের পানে বারেক কুটিল কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কি মা?"

"আজ আবার তুমি বিনুর গায়ে হাত তুলেছ? দেখ দেখি, বাছার মুখখানা আঁচড়ে পিচড়ে কি করে দিয়েছ। ছি ছি ছি। তোমায় যত বলি, যত শেখাই, কিছুতেই কি তুমি কিছু শিখবে না বাছা? এমন করলে আমি তোমার কি করে পেরে উঠ্‌বো!"

তিরস্কৃতা বধূমাতা বারেক তাচ্ছল্য-ভরে স্বামীর মুখের উপর নিজের কীর্ত্তি-চিহ্ন দেখিয়া লইল। সদ্য নখক্ষত তখনও রক্ত-সজল রহিয়াছে। দেখিয়া সে কিছুমাত্র লজ্জা বোধ করিল না, বরং তীব্র রোষে জ্বলিয়া উঠিয়া তীক্ষ্ণ স্বরে কহিল, "আহা গো! আমিই যেন শুধু ঐ রকম করে দিয়েছি, ওঁর কচি খোকা ছেলেটি যেন কিছুই করেন নি। এই দেখ না, আমার পিঠে বুকে খামচে ছাল তুলে নিয়েছে কে,—কে?" এই বলিয়া সে সত্য সত্যই এমন এক প্রমাণ বাহির করিয়া দেখাইল, যাহার পর বিচারককে বিচারের রায় উল্টাইয়া দিতেই হয়!

"হ্যাঁরে হতভাগা, তুইও তো ওকে মেরেছিস্ খুব, দেখ্, দেখি, খুনে কোথাকার!" মাতার সহানুভূতি পাইয়া পুত্র এতক্ষণ ক্ষোভমান হইয়া দাঁড়াইয়া ফুলিতেছিল, এখন

মায়ের সহানুভূতির গতি সহসা পরিবর্তিত দেখিয়া নিজের দিকটাকে রক্ষা করিবার চেষ্টায় অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া ক্রন্দন-বিজড়িত উচ্চকণ্ঠে প্রতিবাদ তুলিয়া সে বলিল, "ও যে আমায় আগে মেরেচে, তার বেলায়— ?"

"মিথ্যুক ! মিথ্যুক। আমি আগে মেরেচি ! না মা, ওর সব মিথ্যে কথা। তুমি শুনো না। ও আগে আমার চুল ধরে টেনেছিল,—এমন জোরে টেনেছিল,— যে আর-একটু হলেই আমি মুখ থুবড়ে পড়ে যেতুম।"

"হস্ ! চুল ধরে টান্‌লে নাকি আবার কেউ মুখ থুবড়ে পড়ে যায়। মুখ থুবড়ে যে পড়ে,সে তো ধাক্কা খেলে। শুন্‌চো মা, কার কথা মিথ্যে—নিজের কানেই তুমি শুনতে পাচ্চো। তা আমি তো আর খুব জোরে চুল ধরে টানি নি—ও কেন আমার মুখে অত জোরে আঁচড়ে দিলে ? উঃ। যা জ্বালা করচে—" বলিয়া বালক আহত স্থানে হাত বুলাইল।

তাহা দেখিয়া মা বলিলেন, "সত্যি বাছা, তুমি একেবারে মুখখানায় কিছু রাখোনি। মেয়েমানুষের অত দস্যিপনা কেন ?"

বধূ এইবার কান্নার ক্রোধে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়া সগর্জ্জনে উত্তর দিল, "ও তোমার আপনার ছেলেটি কি না, তুমি তো ওর দিক টানবেই। ও যখন আমার চুল ধরে টান্‌লে, তখন বুঝি কিছু দোষ হলো না ?—হ্যাঁ, যত দোষ সব আমার বেলায় !"

"তুই কেন আমার কলম ভেঙে দিলি, রাক্ষুসী ?"

"খুব করেছি। তুই আমার কাপড় ছিঁড়ে দিস্‌নি ?—হ্যাঁ, এতক্ষণ মাকে সে কথা বলিসনি বলে,—না ? এই দেখ না মা, আমার কাপড় শুকোচ্ছিল, এই থেকে কতখানি ছিঁড়ে নিয়ে কালি মোছা হয়েছে,—তাই তো আমি কলম ভেঙে দিয়েছি। বেশ করেছি—আবার দেখতে পেলেই দেব।"

"আমিও তো তাই চুল ধরে টেনেছি—এবার এমন চুপিচুপি পেছন থেকে এক টান দেব সুবিধে পেলেই যে, ধপাস্ করে পড়ে সখের সব চুড়িগুলি মুড়্‌মুড়্ করে ভেঙে যাবে। দেখবে তখন মজা।"

"তবে আমিই বা মারবো না কেন ?"

"মা, আমিও বলে রাখ্‌চি, এবার ওর যত কাপড় আছে সব আমি কুটি কুটি করে ছিঁড়ে রেখে দেবো, ওর চুল কেটে নেব, ওর পিঠের চামড়া বেতের বাড়ী তুলে নেব, তবে আমার নাম।"—এই বলিয়া জগদ্ধাত্রী ঠাকুরাণীর সেই বিনয় নামধারী পুত্রটি মহাবেগে বোধ করি বেত্রান্বেষণেই প্রস্থান করিল। তখন অপর-পক্ষও মহা আস্ফালনে আততায়ীর বিরুদ্ধে কিরূপে শোধ তোলা যাইতে পারে, তাহারই ব্যবস্থায় জিহ্বায় একেবারে মা সরস্বতীর বৈঠক বসাইয়া দিল। সে তাহার বইয়ে আগুন ধরাইয়া দিবে, ঘুড়ি ছিঁড়িয়া ফেলিবে, দোয়াত ভাঙিয়া, আরও কত কি করিয়া তাহাকে ক্ষতিগ্রস্ত এবং মাষ্টারের নিকট মার খাওয়াইয়া যে নিজের নাম রক্ষা করিবে ইত্যাদি ইত্যাদি। গৃহিণী আর কি করিবেন ? তিনি অগত্যা একটু হাসিয়া "ছুটোই সমান জুটেচে" বলিয়া বধূর দিকে একটা হাত বাড়াইয়া ডাকিলেন, "আয় পাগলি, আয়। আমার পাকা চুল তুলে দিবি, আয়—"

"হ্যাঃ আমি দিলুম তো! কেন আমি তোমার পাকাচুল তুলে দেব? তুমি কি আমার মা? তুমি যার মা, তাকে তোমার চুল তুলে দিতে বলোগে না, সে দেবে এখন। আমি আমার বাবার চুল তুলে দেব, তোমার তো দেব না,—তুমি ভারী একচোখি।"

"হারামজাদির মুখ দেখ। কি এক-চোখোমি করেছি রে ক্ষ্যাপার বেটি? নে, আয়, এখুনি আবার ছুটোতে লেগে যাবে। একদণ্ড যে চোখ বুজে শোব, সে তো কপাল যোটি নেই। কাল থেকে ছুটোকে ছু'ঘরে দোর বন্ধ করে রেখে দিয়ে তবে নিজে শোব। দাঁড়া না।"

"আমি কাল ভাত খেয়েই সইমাদের বাড়ী পালিয়ে গি'য়ে লুকিয়ে থাকবো, তুমি ঘুমিয়ে পড়লে পা টিপে-টিপে না এসে—"

"আচ্ছা, এখন তো আর নয়,—সে তখন যা হয় করিস্। কি মেয়েই যে তুই হয়েছিস্, ঊর্ম্মিলা। লোকে কি বল্‌বে, বল্ দেখি? লোকেদের বউরা কেমন শান্ত লক্ষ্মী, আর তুই দিন দিন যেন ধিঙ্গি হচ্ছিস্।"

"বেশ করচি, ধিঙ্গি হচ্ছি। তুমি ওদের লক্ষ্মী বউ একটা চেয়ে নাও না বাবু, এতই যদি ভাল লেগে থাকে। আমায় না হয় দূর করে দাও বাড়ী থেকে।

"বালাই! ষাট্" বলিয়া স্নেহময়ী শাশুড়ী হাসিতে লাগিলেন। বধূর ধিঙ্গিপদ প্রাপ্তির আসল হেতুই যে ঐ সর্ব্ব-অপরাধ-সমর্থনকারী সর্ব্বনেশে হাসি, এটুকু জানা থাকিলেও ইহাকে পরিহার করিতে তাঁহার সামর্থ্য ছিল না। বালিকা বধূর তাই এত প্রশ্রয়।

রাত্রে শয়ন-মন্দিরে মায়ের ছুই পাশ ছুই জনে অধিকার করিয়া শুইত। সে রাত্রেও তাই হইল। বিনয় মায়ের গলা জড়াইয়া মাকে নিজের দিকে ফিরাইবার চেষ্টা করিতেছিল, ঊর্ম্মিলাও তদনুকরণ করিতে যাওয়ায় সে তাহার হাতটা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিল, "খবরদার, আমার মার গায়ে হাত দিস্‌নে, দিলে তোর হাত ভেঙ্গে দেব।"

ঊর্ম্মিলা এ শাসনে অভ্যস্ত, সে নির্ভয়ে উত্তর দিল, "ইস্; ওঁর একলার মা কি না!"

"একলার না তো কি? তুইই তো তখন বলেছিস্, আমি মার আপনার ছেলে—তাহলেই হলো না, মা তোর পর?"

"হাঁ, হলো বই কি! কক্ষনো হলো না,—হ্যাঁ মা, হলো মা? তুমি ওর একলার মা, মা? আমার মা নও?"

জগদ্ধাত্রী বধূকে নিজের বুকে টানিয়া লইয়া তাহার মুখে চুম্বন করিয়া হাসিয়া কহিলেন, "নাঃ, কে বলে,—আমি তোদের দুজনকারই মা।"

"শুন্‌তে পেলে! মা তুমি কাকে বেশী ভালবাস মা?"

মা পুনরায় সেই রকম পরম পরিতুষ্ট স্নেহের হাসি হাসিলেন, উত্তর দিলেন—

"দুজনকেই সমান ভালবাসি রে।"

বিনয় সদম্ভে কহিল, "উহুঃ, তোমার মনে নেই মা, তুমি আমাকেই ওর চাইতে একটুখানি বেশী ভালবাস। সেই যে আমার অসুখের সময় তুমি দিন রাত আমার কাছে থাকতে, কেবলি হরিকে ডাকতে—

ওর কাছে শুতে মা, আমি ভাল হলে কত সন্দেশ বাতাসা হরির লুট দিয়ে ছিলে।"

মা শুধু একটু হাসিলেন। কিন্তু অংশী-দারটি এ অপমান সহ্য করিল না, সেও তেমনি আগ্রহে আর একটি উদাহরণ বাহির করিল।

"আমার পান-বসন্তর সময় ডাক্তারবাবু মাকে আমার কাছে আসতে বারণ করেছিলেন, মা কি তা শুনেছিল? তোমার তো শুধু জ্বর, সে তো ছোঁয়াচে নয়,আমার কাছে তবু মা দিন-রাত থাকতেন, থাকতে না তুমি মা?"

মা তাড়াতাড়ি বলিয়া ফেলিলেন, "তা থাকবো না বাছা, তোমার মা বাপ কেউ কাছে নেই,—আমিই তো এখন তোমার মা। সে মা যা করতো, আমি কি তা না করে থাকতে পারি। উঃ, যা অসুখ করেছিল— পোয়াতির বাছাকে যে শীতলা শেতল করে দিয়েছেন, এই আমার মহাভাগ্য।" জননী কৃতজ্ঞতা গদ্‌গদ স্বরে এই বলিয়া সেই রক্ষাকারিণী দেবীর উদ্দেশে দুই হাত যোড় করিয়া নিজের ললাট স্পর্শ করিলেন। তা দেখিয়া তাঁহার এই দুটি সন্তানও তাঁহার অনুকরণ করিল এবং এই আকস্মিক দেব-ভক্তির অতর্কিত আবির্ভাবে উভয়ের চিত্তেই কেমন করিয়া তাহাদের অজ্ঞাতে একটা যেন শান্তি রসের প্রবাহ বহিয়া গেল। তখন তাহারা পরস্পরকে হঠাইতে পারা সম্ভব নয় দেখিয়াই হোক, অথবা যে জন্যই হোক, একটা মধ্য পথ অবলম্বন করিল। বিনয় কহিল, "আয় তবে, আজকের মত দুজনে ভাব করি—বল্ ভাব—"

"ভাব।"

"তোর সঙ্গে আমার ভাব। মা, এবার একটা গল্প—"

'ভাবে'র প্রকৃত উদ্দেশ্য বোধ করি ইহাই। ঝগড়া চলিলে গল্প শোনায় বাধা পড়ে। তা এমন ঝগড়া ও ভাব তাহাদের এই বিবাহিত দুইটি বৎসর ব্যাপিয়া নিত্যই চলিতেছে। কতবারই গাড়ী ডাকিয়া আড়ি হয়;—কতবারই ডাব আনিয়া ভাব হইয়া যায়। তা তাহারা তো দুটি কচি ছেলে,— সমস্ত সংসারই তো এইরূপ সন্ধি-বিচ্ছেদ মিলন-বিরহাত্মক!

৩

বিপিনবিহারী শীল দেশের মধ্যে একজন বিশেষ গণ্য-মান্য বর্দ্ধিষ্ণু লোক। তাঁহার চালানী ও তেজারতির মস্ত কারবার। তাছাড়া সামান্য কয়েকখানি তালুক ইত্যাদিও আছে। ঘরে ছেলেদের অন্ন-বস্ত্রের অভাব নাই। কিন্তু আধুনিক কালের অধিকাংশ পিতার ন্যায় তিনিও ছেলেদের স্কুল-কলেজে লেখা-পড়া শেখানোর পক্ষপাতী হইয়া পড়ায়, বড় ছেলেটি প্রথমে কলিকাত-বাসী হয় এবং পরে পিতার বিনানুমতিতে বিলাত পর্য্যন্ত পলাইয়া গিয়া ব্যারিষ্টার হইয়া ফিরিয়া কলিকাতাতেই প্রাক্‌টিস্ আরম্ভ করিয়াছে। রাগ বাক্যার করিয়াও পিতা তাহার খরচ চালাইতেছেন। বিদেশে গিয়া যে সভ্যতাসেটি তিনি করিয়া আসিয়াছেন, নিজের উপার্জ্জনে তাহারই খরচ আঁটে না। ছোট ছেলে বিনয়কুমারের উপর আশা-ভরসা ইহাদের কোনদিনই বেশী ছিল না, এখন আরও একটু কমিয়াছে। বড় ছেলে বিলাতে বসিয়াই

অনেক মালবার-শোণিত-মিশ্রিত ইউরেশিয় কন্যা বিবাহ করিয়া বসিলে, দশ বৎসরের ছোট ছেলে বিনয়কুমারের এখানে এক সাত বৎসরের স্ব-ঘরের মেয়ের সহিত শুভবিবাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন করানো হয়। আমাদের পূর্ব্বোল্লিখিত নায়ক-নায়িকাই এই শুভবিবাহে সবদ্ধ দম্পতী, বিনয়কুমার ও ঊর্ম্মিলা।

দশটা বাজিলে স্নান সারিতে বাটীর মধ্যে আসা বিপিনবিহারীর চিরন্তন নিয়ম। তা ঘড়িতে সেই দশটা বাজিতে না বাজিতেই পুত্রবধূ ঊর্ম্মিলাসুন্দরী সেই বাহিরের বৈঠকখানা ঘরে দর্শন দিয়া উচ্চকণ্ঠে হাঁকিলেন, "ওগো বাবা, আজ কি তোমার চান করবার সময় হবে না নাকি গো?"

এই রকম সে প্রায়ই ডাকিতে আসে। বারণ করিয়া কোন ফল পাওয়া যায় নাই।

বিপিনবাবু তখন চোখের উপর চশমা লাগাইয়া কি সব কতকগুলা পুরাতন হিসাবের কাগজ-পত্র-পর্য্যবেক্ষণে নিবিষ্ট ছিলেন; সাম্‌নে এক তাড়া খেরো-বাঁধা খাতাপত্র বিছাইয়া তেজারতির গোমস্তা বসিয়া; বধূ-ঠাকুরাণীর সশব্দ আগমন ও সদর্প আহ্বান-শব্দে কুণ্ঠিত হইয়া সে বেচারী মাথাটা একটু হেঁট করিল। চব্বিশ ঘণ্টাই শুনিয়া শুনিয়া কর্ত্তার অভ্যাস, তাই এ ডাক তাঁহার কানে পশিলেও মনে পৌঁছিল না। তিনি দুইটা সই ঠিক এক রকম দেখাইতেছে কি না, একমনে তাহাই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মিলাইতে লাগিলেন।

"বাবা-! বলি, ও বাবা, ডাক্‌চি, তা কথা কইছো না যে বড়? শুন্‌তে পাচ্ছনা, না কি?

"বিপিনবাবু অর্দ্ধ-অন্যমনস্কভাবে উত্তর দিলেন, "অ্যাঁ? কিরে পাগ্‌লি?"

"মা—গো! এতক্ষণ পরে বলা হলো কিনা,—কিরে পাগ্‌লি! চান-টান করতে হবে না বুঝি আজ?"

"হাঁরে, হবে বই কি। এই যে যাই।"

জবাব দিয়া বৃদ্ধ যথাকার্য্যেই ডুবিয়া রহিলেন। তখন ঊর্ম্মিলা বিশেষ রাগিয়াছে, সে দরজায় ধাক্কা দিয়া একটা চমকপ্রদ শব্দ করিয়া সরোষ গর্জ্জনে চেঁচাইয়া উঠিল, "বাবারে বাবা! ছেলে যেন এক্‌জামিনের পড়া পড়ছেন! এই চল্লুম আমি, থাকো তুমি তোমার বই নিয়ে বসে।" বিপিনবাবু শশব্যস্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ খাতাপত্র ভূমে নিক্ষেপ করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। ভৎর্সিত বালকের মত করুণ কণ্ঠে প্রস্থানোদ্যতা বালিকা-বধূর পানে চাহিয়া ডাকিলেন, "ওরে, না রে না, যাস্‌নি, যাস্‌নি—এই যে আমি উঠেছিরে! ওহে গোষ্ঠ, তুমি ওসব এখন তুলে টুলে রেখে দাও। এরপর এক সময় ওসব নিয়ে আবার বসা যাবে এখন, এখন আর হচ্ছে না, আমার ছোট্ট-মা-টি এখন বেজায় ক্ষেপেছে।"

ঊর্ম্মিলা চলিয়া যাইতে যাইতে ফিরিয়া আসিতেছিল, তাহার সম্বন্ধে শ্বশুরের মন্তব্যটুকু কানে ঢুকিতেই সদ্যস্নাত স্কন্ধবিলম্বী তিজা চুলের রাশি নাড়া দিয়া ঝাঁকিয়া কহিল, "হ্যাঁ, আবার বলা হচ্ছে,—ক্ষেপেছে! ক্ষেপবে না তো কি? সেই কখন্ থেকে ডাকাডাকি করে গলা কাটাচ্ছি—বলতো, রাগ হয় না, বুঝি?"

বিপিনবিহারী চটি জুতা দুইটার মধ্যে পা গলাইতে গলাইতে হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন,

"আয়তো দেখি, গলাটা কতখানি কাটলো ? কৈ, কোথাও দেখতে পাচ্ছি না তো !" এই বলিয়া হাসি-হাসি-মুখে সমীপবর্ত্তিনী বধূর কণ্ঠ-মালা-পরা কণ্ঠের দিকে দৃষ্টি বিস্ফারিত করিয়া চাহিয়া দেখিলেন এবং অল্প-একটু মাথা নাড়িয়া যেন আত্মগতভাবেই কহিলেন, "হায়রে, ও শানায়ে গলা না কি আবার কাটিবে !" মন্তব্য শুনিয়া ঊর্ম্মিলা খিল্ খিল্ করিয়া এবং বৃদ্ধ গোমস্তা মুচকিয়া হাসিয়া ফেলিল। ঊর্ম্মিলা-শ্বশুরের হাত ধরিয়া টানাটানি করিয়া বলিল, "যাও,তুমি বড্ড দুষ্টু হয়েছ। অমন করে কথা বলো ত তোমার সঙ্গে আড়ি দেব, তা কিন্তু বলে রাখছি।"

"তা হলে আমি যদি বসে কাঁদি ?" বিপিনবিহারী ততক্ষণে বৈঠকখানা ঘর হইতে বাহির হইয়া সম্মুখস্থ বারান্দা দিয়া অন্দরের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন। ঊর্ম্মিলা শ্বশুরের হাত ধরিয়া তাঁহাকে টানিয়া লইয়া যাইতে যাইতে বৃদ্ধ-বালকটির মুখে সেই সলিন্ উক্তি শুনিয়াই তৎক্ষণাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল, এবং দুষ্টামি-মাখানো সমস্ত মুখখানিকে তাহার এক মুহূর্ত্তেই গভীর করুণামণ্ডিত স্নেহে উদ্ভাসিত করিয়া পূর্ণনেত্র শ্বশুরের মুখে স্থাপন করিয়া বলিয়া উঠিল, "বাবা, বাবা, তুমি কেঁদো না। একটুও কেঁদো না। আমি কি কখনও তোমার সঙ্গে আড়ি করে থাকতে পারি ? তুমিই বল তো, পারি কি ? সে বরং মার সঙ্গে হলেও হতে পারে, তোমার সঙ্গে হবে না।"

বিপিনবিহারীর চোখের কোণগুলা হঠাৎ যেন সন্ধ্যাকার বালকের মতই তাঁহার এই ক্ষুদ্র মায়ের এই সান্ত্বনা-স্নেহ-প্রকাশে আর্দ্র হইয়া আসিল। তিনিও নিবিড় স্নেহভরে তিন নীড়ের ক্ষুদ্র পাখীটিকে নিজের কাছে টানিয়া লইয়া তাহার মাথার চুলের উপর নত হইয়া চুম্বন করিলেন ; তারপর মমতা-মথিত মৃদুকণ্ঠে কেবল মাত্র কয়টি কথা উচ্চারণ করিলেন, "তুমি যে আমার মা !"

কথা কহিতে কহিতে দুইজনে বাটীর মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিল। বাবুকে আসিতে দেখিয়া বাবুর চাকর মধু ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া তেলের বাটি ও তেল-ধুতি-হাতে ছুটিয়া আসিল। তখন শীতকাল, রৌদ্রে সেবিত বারান্দার ছোট একটি পাটি পাতিয়া তেল মাখা বিপিনবাবুর নিয়ম। গড়গড়ার তামাক সাজা ছিল, আসিতে একটু বিলম্ব হইয়াছে, আগুন ঈষৎ নিষ্প্রভ। ঊর্ম্মিলা সেদিকে বারেক চাহিয়াই মধুকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, "ও তামাক সব পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। যা, তুই শীগগির এক ছিলিম তামাক সেজে নিয়ে আয়, আমি ততক্ষণ বাবুকে তেল মাখাই।"

বলিয়া তেলের বাটি টানিয়া লইয়া শ্বশুরের পায়ের খানিকটায় সে তেল মাখাইয়া দিল। মধু কি বলিতে যাইতেছিল, ঊর্ম্মিলা বাম হাত নাড়া দিয়া অপ্রসন্ন স্বরে বলিল, "না, ও পুড়ে গেছে। তুই ভাল করে সেজে নিয়ে আয় গে যা।"

এই ক্ষুদ্র মনিবটীর হুকুম যে কত-বড় অলঙ্ঘ্য মধুর, মধু'র তাহা ভালোরূপই জানা ছিল, সে অসন্তুষ্ট হইলেও আর দ্বিরুক্তি করিল না। কলিকাটা উঠাইয়া লইয়া অপ্রসন্নতা-ব্যঞ্জক সশব্দ চরণে চলিয়া গেল এবং ফিরিতেও যথা-সাধ্য বিলম্ব করিয়া প্রতিশোধ তুলিবার চেষ্টা করিল।

মধু দৃষ্টির বাহির হইয়া গেলে শ্বশুরের নগ্ন পিঠের উপর তেলমাখা হাতখানা বুলাইতে বুলাইতে বধূ ডাকিল, "বাবা !"

বিপিনবাবু তখন তামাকের তৃষ্ণায় ঈষৎ বিষণ্ণ। মুখের নিকট প্রসারিত চুম্বন-প্রয়াসী আলবোলার নল মুহুর্মুহু সাদরে আহ্বান করিতেছে—অথচ প্রেয়সী প্রাণময়ী নহেন ! অন্যমনস্কভাবে তিনি উত্তর দিলেন, "মা !"

"সত্যি, বাবা ?"

"কি মা ?"

উর্ম্মিলা একটু ইতস্তত করিল, পরে বলিল, "এই যে তুমি বল্লে ?" বিপিনবিহারী ঈষৎ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বল্লুম, রে ?"

"মাগো ! তুমি বড্ড ভুলে যাও ! এই এখুনি বল্লে না ?"

"হ্যাঁ বলেছি তো রে ! তবে বুড়ো হয়েছি কি না, তাই কি যে বলি, মনে থাকে না। তবে আর মা হয়ে কি হলো, যদি বুড়ো ছেলের ভুল-টুলই না শুধরে দিবি !"

উর্ম্মিলা মুখের আপ্রান্ত কল্যাণময় স্নেহ-হাস্যে মণ্ডিত করিয়া জোরে জোরে পিঠের উপর তৈলাক্ত হস্ত ঘর্ষণ করিয়া সাগ্রহে বলিয়া উঠিল, "হ্যাঁ, ঐ কথা ! ঐ কথাটা কি সত্যি বাবা ?"

"কই, কোন্ কথা রে ?"

"আঃ, বড্ড বোকা তুমি !" এই বলিয়া ঝঙ্কার তুলিয়াই হঠাৎ বিনীত ও কোমল কণ্ঠে সে ঈষৎ যেন লজ্জার সহিত পুনরায় প্রশ্ন করিল, "সত্যি কি আমি তোমার মা হই ?"

বিপিন বাবু উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন, হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "শোন একবার কথা ! মা হয়ে আবার বেটি বলে কি না, সত্যিকারের মা হই ? মা বুঝি কারু আবার মিথ্যেকারের হয় ?"

উর্ম্মিলা এই উত্তরে অত্যন্ত খুসী হইল। আনন্দাতিশয্যে যে কি করিবে কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া খুব খানিকটা তৈল লইয়া সেই সদ্য-সাব্যস্ত হওয়া বৃদ্ধ ছেলের সঙ্কীর্ণ পৃষ্ঠে সে চাপড়াইয়া দিল। বিপিন বাবু হাসিয়া কহিলেন, "মাগো, আবার কি আমায় তুই তেলে-ঝোলে শক্ত করছিস মা ? কত তেল ঢালছিস্, বল্ দেখি ?"

তখন নিজের কীর্ত্তি চোখে পড়িতে লজ্জা পাইয়া মা-ঠাকুরাণী ছেলের সেই তৈল-সিক্ত পিঠের উপরই নিজের লজ্জিত মুখখানা লুকাইয়া ফেলিল, এবং এই উপায়েই তাঁহার পিঠের তিনভাগ তেল বধূর মুখে মাথায় ও কাপড়ে উঠিয়া আসিয়া উহাকে রক্ষা করিল। এদিকে ততক্ষণে তামাক সাজিয়া মধুও আসিয়া পৌছিয়াছে।

ক্রমশঃ

শ্রীঅনুরূপা দেবী।

আলোর পাথার

কে বাজালে মাঝ্‌-দিনে আজ প্রহর-রাতের সুর সাহানা !
শঙ্খ গৌর মেঘের মেলায় হংস-চিলের মিলায় ডানা।
ঝর্ণা-কাঠির গম্বুজেতে ময়না জেগে স্বপ্ন দেখে,
শিউলি-ফুলি হাওয়ায় ভেসে ঘাসের ফুলে ফড়িং ঠেকে।

গাছের গোড়া গোলটি ক'রে নিকিয়ে ছায়া তার নিভৃতে,
সেই চাতালে রাখাল আসে একটুকু গা গড়িয়ে নিতে।
জলের তালে দুল্‌ছে মাঝি বাঁধা নায়ের ছই-তলাতে,
টুন্‌টুনি-ধায় একলা কেবল করম্‌চা-ডাল টল্‌মলাতে।

পালান্‌-ছোঁয়া শাঁওলা ঘাসে বাছুর গোরু চর্‌ছে পালে,
নাড়িয়ে দু'কাণ তাড়িয়ে মাছি লোটন্ ল্যাজের ঝেপ্‌কাতালে,
দীঘির জলে রূপোর ঝিলিক্ দেখছে ব'সে মাছরাঙা সে,
ঢল্‌-নামা জল থিতায় গাঙের যার ডাঙা তার পাড়ভাঙা যে।

পত্তন্-আঁটা পতর নিয়ে চলছে গেতো বোঝাই ভরা,—
মাঝাট বেলার গোড়েন্ সুরে গোড় দিয়েছে নেইক ত্বরা।
দূর কিনারার পাঁজর-খোলা মেরামতের নৌকোখানা
প'ড়ে প'ড়ে খেয়াল ভাখে বন্যাদিনের প্রলয় হানা !

চরের পরে ঝিমায় কাছিম, চোখের পাতে মোতির দানা,
পিঠেতে তার ঝিমায় ব'সে শামুক-খুলি পাখীর ছানা।
মরালী ধায় লহর তুলে মরাল তাহার ফেরে পাছে,
সোনন্‌-চাঁপার নিথর মোহে মগজটা তার ভ'রে আছে।

মাঝা আলোর সাজন সাজে, বিজন পেয়ে মুগ্ধ চোখে,—
বাজন বাজে বুকের তালে,—আয়নাতে মুখ দেখ্‌ছে ও কে !
আতর-ভরা চাওনি দিয়ে আপ্‌নাকে ও বরণ করে,
চাপাই আলো সাতনরোকার ঝাঁপার রে ওর চরণ পরে।

আলোর আতর খিতিয়ে বুঝি এই অপরূপ রূপ পেয়েছে,
রূপের ধূপের সৌরভে আস্‌মান ছেয়েছে প্রাণ ছেয়েছে,
আস্‌মানে আর পরাণে আজ সোনার পোড়েন্ সোনার টানা,
শুক্তি-ধবল মেঘের মেলায় হংস-মিথুন মিলায় ডানা।"

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

প্রিয়ার উদ্দেশে*

যাক্ সব চুকে গেছে। আমার কল্পনা-প্রবণ মস্তিষ্কে সেটা শুধু একটা স্বপ্নের মত জেগেছিল। পরস্পরের কাছে আমাদের বিদায় নেওয়া হয়ে গেছে—আর কিছু তোমায় জানাই নি। কতবার বলি-বলি করে বলা হয় নি—প্রতি সন্ধ্যায় তোমার কাছ থেকে ফিরে এসে নিজেকে শত রকমে দোষী করেছি, সারা রাত ধরে ভেবেছি, আবার যখন দেখা হবে, তখন কেমন করে তোমার কাছে সব কথা গুছিয়ে বলব। কিন্তু রাতের আসা-যাওয়ার ত একটা শেষ আছে। তোমার সঙ্গে মিলনের শেষ সন্ধ্যা কেটে গেছে। কিন্তু তোমায় কিছুই বলিনি। কাল যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে যাবো, তোমার সঙ্গে প্রথম মিলনের দিন যেমন অচেনা ছিলুম, অপরিচয়ের সেই সমস্ত ব্যবধান আবার আমাদের মাঝখানে জেগে উঠবে।

আমার মনে হয় হয়ত তুমি আমার মনের কথা সব বুঝেছ। তুমি না জানলে কি আর তোমায় এত ভালবাসতে পারি! কিন্তু না—তোমায় যে কিছু বলিনি তাই ভেবে আমি খুব খুসী হয়ে উঠছি। কোন্ অধিকারে তোমায় ভালবাসা জানাব—নিজের জীবনের 'পরে যার কোনো হাত নেই—মাসের শেষে বাঁচ্‌ব কিনা তাই জানি না! এ সব জেনে-শুনেও কোনো মেয়েকে ভালবাসা জানাতে যাওয়া আমার কাছে নিতান্ত অপৌরুষের বলে মনে হয়।

কথাটাকে নিজের কাছে বেশ স্পষ্ট করে নিতে চাই, যাতে সেটা কাঁটার মত সময়-অসময়ে মনের মাঝে না বাজে, কাজের বিঘ্ন না ঘটায়! ধর, তোমায় আমার প্রেমের কথা জানাতুম আর তুমি যদি আমার ভালবাসাকে বরণ করে নিতে—তার ফল হতো কি? সে ত কেবল দুঃখ! যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত দুজনে একত্র হতে পারতুম না, আর এই সুদীর্ঘ সময় তোমার কাছে কত নিঃসঙ্গ কত নির্জ্জন মনে হোত। তুমি কেবলই ভাবতে, কেমন করে আমি ভাল থাকব, নিরাপদে থাকব! অথচ ভাবনাই সার হোত। আমি যদি আহত হতুম, তুমি আমায় মৃত মনে করে

---

* Love of an Unknown Soldier—Published by John Lane, London.

নিজের জীবনকে সর্ব্ব-গৌরব-বঞ্চিত মনে করতে। আমি আহত হলে তুমি ত আর আমার কাছে থাকতে পেতে না—তোমার তো নিজের একটা কর্ম্মক্ষেত্র আছে, প্রাত্যহিক কর্ত্তব্য আছে—সুদূর মার্কিন থেকে এসে তোমরা যে অসহায় ফরাসী শিশুদের সেবার ভার নিয়েছ। তার পর ধর আমি হয়ত বিকলাঙ্গ হতে পারি—ফরাসীর পক্ষে যুদ্ধের আঘাত-চিহ্ন তার প্রসাধন—আত্মোৎসর্গরূপ নব ধর্ম্মের সে যে বিগ্রহ। আমাদের কাছে কিন্তু তা একেবারে বীভৎস। বিকলাঙ্গ লোককে সারা জীবনের সঙ্গী করে নেবার দুঃখ দেবার মত হীনতা আমার নেই—আর সত্যি বলতে কি, রোজ তুমি আমায় দেখে অন্তরে অন্তরে কষ্ট পাবে, তা আমি কোন্ চোখে দেখ্‌ব? শেষ কথা এই, যুদ্ধে আমি মরতেও পারি—তারই বা ঠিক কি? যদি তোমায় বিয়ে করতুম, তাহলে সর্ব্বসুখ থেকে বঞ্চিত করে তোমার জীবন কেবল ব্যর্থতায় ভরিয়ে তুলতুম। না, তোমায় ভালবাসার কথা যে কিছু জানাই নি, তাই ভেবে আজ আমি বড় খুসী।

আবার দেখ—যদি বা মুখ ফুটে বলতুম, তুমি হয়ত আমার উপর বিরক্ত হতে, রাগ করতে, আমার প্রত্যাখ্যান করতে; কারণ আমি তার চেয়ে বেশী পাবার মোটেই উপযুক্ত নই। তোমার পক্ষে আমায় প্রত্যাখ্যান করাটাই উপযুক্ত হোত, কারণ যুদ্ধের সময় এই রকমের বাগ্‌দান, এই সব তাড়াতাড়ি বিয়ে, আমার কাছে ভারি বিসদৃশ ঠেকে—এগুলোকে আমি একটুও বিশ্বাস করতে পারি না। কিন্তু সত্যি বলি—অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ থেকে কে যেন কেঁদে কেঁদে উঠছে। যৌবনের প্রথম জাগরণের সমস্ত চাঞ্চল্যকে একটা 'না' দিয়ে নিরস্ত করি কেমন করে? না, এ সব নিয়ে আর ভাব্‌ব না—ভাবতে গেলে মন একেবারে বিকল হয়ে ওঠে।

এখনও কিন্তু তোমায় বলবার সময় আছে। শুধু টেলিফোনের রিসিভারটা উঠিয়ে নিয়ে তোমায় বলা—আচ্ছা, যদি বলি—তুমি তা হলে কি জবাব দাও? বিবাহ-প্রস্তাবের একটা অদ্ভুত উপায় বটে। রাত দুটোয় জেগে উঠে প্রেতের মত একটা ক্ষীণ গলার আওয়াজ শুনছি—আপনি অমুক—? আজ সারা সন্ধ্যেটা যে আপনার সঙ্গে ছিল, আমি সেই লোক—শুধু আজ সন্ধ্যে কেন, প্যারিসে ছুটীতে এসে যত সন্ধ্যে কাটিয়েছি—আমি যে আপনাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলেছি, সে শুধু একটা কথা জিজ্ঞাসা করবার জন্তে—আপনি কি আমায় বিয়ে করতে পারেন?

এ জীবনে যা কিছু হতে পারত তা আর ভাব্‌ব না—স্মৃতিই শুধু আমার কাছে প্রিয় হয়ে থাক্। মাটীর নীচে স্যাঁতা ট্রেঞ্চে ব'সে শীতে যখন মনটা নিরানন্দ হয়ে উঠবে, তখন গত দিনের সুখ-স্মৃতিটুকু কত প্রিয় হয়ে উঠবে। তোমার সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাতের সযত্ন গল্প রচনা করে নিজেকে শোনাব—তোমার সঙ্গে দেখা করবার কথা দিয়ে কেমন করে ঘটনাচক্রে সে কথা রেখে রেখেছি, সেই গল্প।

মাস কয়েক আগেকার—সে রাত্রের কথা কি তোমার মনে পড়ে? বড় আজব

হয়ে ব্রিটিশ মিশনে আমি আমেরিকা গিয়েছিলুম। তার কিছুদিন আগে আমেরিকা আমাদের দলভুক্ত হয়েছে। ট্রেঞ্চের মধ্যে মানব আত্মার গৌরব ব্যাখ্যা করাই ছিল আমার কাজ। বক্তৃতার শেষে হলটা যখন প্রায় খালি হয়ে এসেছে, কে একজন, তোমায় নিয়ে এসে আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলে। শুনলুম যুদ্ধের অত্যাচারে যে সব শিশু নিঃসহায় হয়েছে তাদের সেবার ভার নেবার জন্তে তুমি একদল মেয়ের সঙ্গে ফ্রান্সে যাত্রা করছ। তোমার চোখের পানে চাইলুম। কি দেখলুম? সে রহস্যময় দৃষ্টি আমি কোনোকালে ভুলতে পারব না—আমার সামনে তুমি দাঁড়িয়েছিলে—দীর্ঘ, ঋজু একটি তন্বী, গোলাপের সরু ডালের উপর ছোট একটি কুঁড়ির মত—পাপড়িগুলো তখনও যেন ভাল করে খোলে নি। যুদ্ধে যে সব গ্রাম ও নগর নষ্ট হয়ে ধ্বংস-স্তূপে পরিণত হয়েছে তাদের কথা আমি বেশ জানি—এই ধ্বংসের কাজে আমিও অনেক সাহায্য করেছি। কামানের গোলার ঘায়ে মাটি ফেটে যে-সব গর্ত্ত হয়েছে, তার মধ্যে এখনও কত শত শব পচছে। কিন্তু সে ছবির মধ্যে সেই বিকট বীভৎসতার মধ্যে তোমাকে দাঁড় করাতে পারলুম না—তোমার সুকোমল সুললিত লাবণ্য যেন সেখানে কোনোমতেই খাপ খায় না।

তখন কি বলেছিলুম জানি না—তা আমার মনে নেই—ফরাসীদের ধুলো-ঘাঁটা ছেলেদের অপরিচ্ছন্নতার কথা বোধ করি—নিতান্ত বাজে, একেবারে অবান্তর নিশ্চয়ই। হস্তমর্দ্দন কর-মর্দ্দনের পর আমরা পরস্পরের কাছে বিদায় নিলুম। সে রাতটা কিন্তু জেগে জেগে নানা ভাবনায় কাটাতে হয়েছিল—পরদিন তোমার শুভযাত্রা জ্ঞাপন করে টেলিফোন ধরলুম, সে শুধু তোমার মধুর কণ্ঠস্বর শোনবার লোভে। তুমি তখন জাহাজে চড়েছ—তখন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলুম, ফ্রান্সে ফিরে গিয়ে যেমন করেই হোক তোমার সঙ্গে দেখা করব। কেমন করে যে তা সম্ভব হতে পারে তা আমি নিজেই ঠিক করে উঠতে পারিনি। নিজের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলুম—এবং সে প্রতিজ্ঞা আমি পালন করেছি।

এই কি অদৃষ্ট। কোথায় সেই জল-কাদার রাজ্য থেকে প্যারীতে ছুটী পেলুম, অথচ তখন আমার ছুটী পাবার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। অবশ্য ছুটী পাবার একমাত্র কারণ, যে আমার উপরওয়ালা অনেকেই এ জীবন থেকে অবসর নিয়েছেন, বাকি যাঁরা আছেন তাঁরা বড় একটা ছুটীর আশায় ছিলেন। প্যারীতে আসবার পথে মনে হয়েছিল এবার হয়ত তাকে দেখতে পাব। মাত্র একটি মেয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল—তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে শুনলুম, তুমি তার সঙ্গেই আছ—বোধ হয় এরই নাম ভাগ্য। আমার কিন্তু মনে হয় এর মধ্যে আরও কিছু আছে।

প্রথম দিন তোমার সঙ্গে দেখা হল না; পরের দিনই কিন্তু তুমি নিজে এসে আমায় ডাকলে। আমার জন্তে পথ বয়ে আসার কষ্ট তুমি নিয়েছ, এই ব্যাপারটি আমার কাছে শুভ লক্ষণ বলে মনে হল। খুব স্পষ্ট না

হলেও এটা বুঝলুম, তোমার আমার সেই হঠাৎ পরিচয় একটা আকস্মিক ব্যাপার নয়, আমাদের চারিদিকে যেন একটা রহস্যের জাল বোনা চল্‌ছে, আমার সম্বন্ধে তাই যেন তোমার এত কৌতূহল। সেটা আমার আত্মগর্ব্বও হতে পারে, কিন্তু আত্মগর্ব্বকে ছাপিয়ে আরও একটা কিছু যেন এর মধ্যে ছিল। আত্ম-গর্ব্বেরই বা দোষ কি, বলো? সৈনিকের জীবন ত জান—কোথায় কোন্ যুদ্ধক্ষেত্রে দীর্ঘ স্বপ্নের মত দিন কাটে—অতীত জীবনের সকল গৌরব ও আপদসঙ্কুল ভবিষ্যতের প্রারম্ভটুকু ত সেইখানেই কাটে। জীবনের এই স্বল্পতাকে এমনি করে মূল্যবান করে তোলাই ত তার স্বভাব।

তোমার সঙ্গে যেদিন দেখা হল, সে দিন রবিবার। আমি খুব সাহস করে তোমায় দ্বিপ্রহরে আহারে নিমন্ত্রণ করলুম এবং তুমি সে নিমন্ত্রণ নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ করে আমাকে একেবারে অবাক করে দিলে।

মনে হচ্ছে, তোমায় ডাকতে Champ Elysees যাবার পথে আমার প্রতি পদক্ষেপ আর প্রতি মনোভাব আমার মনে গাঁথা আছে। কোমর-বন্ধ আর জামার বোতাম ঘসে মেজে পরিষ্কার করতে আমার যে কত সময় গেছে, তুমি তা ভাবতেই পারবে না! সত্যি পুরুষরা এই রকম! তুমি বোধ হয় খুব হাস্‌ছ—কিন্তু তুমিও বোধ হয় নিজেকে রমণীয় করে তোলবার চেষ্টায় এই রকমেই সময় কাটিয়েছ। যদি না-ও কাটিয়ে থাক তবুও এই কথাটা ভাবতে ভালো লাগছে।

মনের মাঝে কি তোলাপাড়াই চলছিল! সরলভাবে সব কথা বলুবে কি? আমার অন্তরটা একেবারে গুলিয়ে গিয়েছিল। আমার মনোভাবটা গড়ে উঠেছিল, আশা, বাসনা, সন্দেহ আর তোমার কাছে পাছে অদ্ভুত কিছু ঠেকি এই ভয়ে। তোমার জন্যে আমার বড্ড মন কেমন করছিল—তোমায় পাবার বাসনায় আমার সমস্ত দেহ-মন ভরে উঠেছিল। আশা হচ্ছিল যে তোমারও মনে হয়তো এমনিধারা এই বাসনাই জাগছে। সন্দেহটা কেন, জান? মনের মাঝে তোমার যে মূর্ত্তি গড়ে তুলেছি, তোমায় দেখে পাছে সেটার দুর্লভত্ব নষ্ট হয়ে যায়, পাছে তা সাধারণ হয়ে পড়ে। আমার স্পর্দ্ধা দেখেছ? অবিশ্বাসের আর জায়গা পাই-নি। আমি নাকি আশঙ্কা করছিলুম তুমি হয়ত সাধারণ মেয়ের মত—দশজনের মত, জগতে যাদের সঙ্গে প্রত্যহ দেখা হয়! আর তোমার কাছে পাছে অদ্ভুত কিছু ঠেকি বলে এই চিন্তা বীভিষিকার মত আমায় পেয়ে বসেছিল। কি জানি মেয়েদের এই ভাব হয় কিনা! দেখেছ, ভাল-বাসায় পড়লে পুরুষকে কি ভয়ানক অসুবিধা পোয়াতে হয়? তার ভালবাসায় প্রতিদান পাবে কি না সে বিষয়ে সে মোটেই নিশ্চিত নয়। আর আমার ত এ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হবার কোনো অধিকারই নেই—মুখের আলাপ ছাড়া আর সব বিষয়েই তোমার কাছে আমি একজন অপরিচিত বই আর কি।

তোমার হোটেলে গেলুম। দরোয়ানকে যখন তোমার কথা জিজ্ঞাসা করলুম, সে আমার দিকে একটু সন্দিগ্ধভাবে তাকিয়ে কড়া সুরে জানালে যে আমায় আসার খবর তোমায় দেবে। তোমার কাছ থেকে ফিরে নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেই যেন বল্লে যে শ্রীমতী

এখনই নামবেন। আমি অপেক্ষা করতে লাগলুম। কতক্ষণ অপেক্ষা করেছিলুম, তার ঠিক নেই—খুব সম্ভব পাঁচ মিনিট; কিন্তু সে সময়টা দীর্ঘ এক শতাব্দীর মত মনে হল। একটা করে সেকেণ্ড টিক্ করে চলে যায়, আর নিজের ব্যবহারে নিজের উপর বিরক্ত হয়ে উঠি—কত সামান্য পরিচয়ে তোমার উপর জুলুম করছি, এতে আমায় তুমি কত আহাম্মক মনে করবে, তাই ভাবছি।

সিঁড়িতে তোমার পায়ের শব্দ শুনতে পেলুম। মৃদু একটুখানি খসখস শব্দ—তার পর দেখি তোমার সুকোমল কর আমার পানে প্রসারিত ক'রে সামনে এসে দাঁড়িয়েছ—বালিকার মত সহজ, বন্ধুর মত স্বচ্ছ। সে হাতখানি স্পর্শ করলুম—এক অপূর্ব্ব পুলক আমার সর্ব্বাঙ্গে বিদ্যুতের মত খেলে গেল। মনে হল যেন বেঁচে উঠলুম—দীর্ঘ দারুণ পরিশ্রমের সমস্ত ক্লান্তির পরে বিশ্রামের আবেশ সুখের মত আমার উপর নেমে এল। যুদ্ধের বর্ব্বরতা, শীত আর যুদ্ধক্ষেত্রের নানা বিধ দুর্গতি থেকে মুক্তির দিনগুলো হাস পাতালে শুয়ে শুয়ে পোহাবার যে সুখ, এ যেন তাই। এ সব যা লিখেছি এতে কিছু বলা হচ্ছে না। এ একেবারে অসম্পূর্ণ—যা আমি অনুভব করেছি তার কণামাত্রও এ চিঠিতে প্রকাশ করতে পারছি না। তোমার হাতের স্পর্শের কথা বলছি, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, তোমার চোখের মমতা-মাখা দৃষ্টিই আমায় সব চেয়ে অভিভূত করেছিল।

প্রথম মিলনের লজ্জা ও সঙ্কোচ তখন ঘুচেছে—বায়ু-বিক্ষিপ্ত তুষার-কণা আমাদের মুখে এসে লাগছে—সহরের বিস্তৃত রাজপথের উপর আমরা বেড়াচ্ছি। একটা ট্রামে উঠে আমরা সব গোল করে ফেল্লুম—আবার আর একটা ট্রাম চড়ে কোথায় যাবো, ঠিক করলুম। সব সময়টা আমরা গল্প করছিলুম, প্রশ্ন তুলছিলুম। আর পরস্পরের উত্তরের অবকাশে আবার নতুন প্রশ্ন জেগে উঠছিল। তারপর ট্রাম থেকে নেমে চলার আনন্দে আমরা খুব বেড়াতে লাগলুম। তোমাকে আমার পাশে পাওয়ায় আমার মনে কতখানি গর্ব্ব জমা হয়েছিল তা তুমি লক্ষ্যই করনি। কত লোক থেকে-থেকে তোমার দিকে চাইছিল—না, তুমি ত কখনও লক্ষ্য কর না—তোমার একটিই সব-চেয়ে আমায় ভাল লাগে—তোমার নিজের সম্বন্ধে এই আনন্দময় ঔদাসীন্য। আচ্ছা, আমার ছবিখানা একবার কল্পনা কর। আমি তখন সমস্ত গ্লানি, যুদ্ধ-ক্ষেত্রের সমস্ত মালিন্য থেকে মুক্ত হয়ে এসেছি যেখানে মানুষের একমাত্র ভাবনা, কেমন করে বীরের মত মরব—যেখানে মেয়ে বা শিশুর দেখা কোন কালেই মেলে না—মানুষ যেখানে মনের কোমলতাকে প্রশ্রয় দিতে সাহস পায় না, পাছে কাপুরুষ বলে যায়—যেখানে আত্মার সৌন্দর্য্য ছাড়া আর কোনো সৌন্দর্য্য নেই,—যেখানে ভবিষ্যতের সকল উচ্চ আশা অবলুপ্ত। বাইবেলের সেই কুষ্টে লাজারসের (Lazarus) মত আমি যেন নবজীবন লাভ করে পারি সহরের সেরা সুন্দরীর পাশে পাশে বেড়াচ্ছি। এতদিন জীবনের সমস্ত সৌন্দর্য্য, সমস্ত আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়ে ধুলোকাদা আর মলিনতার মধ্যে যে পড়েছিল, তার কাছে এর চেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় আর

কি হতে পারে? আচ্ছা, তোমার কি মনে হয়?

Cafeতে lunch খেতে গিয়ে কত যে মজা হল তোমার মনে আছে? কি খাব তাই ঠিক করতে গিয়ে কি ব্যাপারটাই হল! আমার ফরাসী বলতে বাধছিল বলে তুমি মুখ টিপে টিপে হাসছিলে, শেষে নিজে কথা করে আমার সে যাত্রা বাঁচালে—অদ্ভুত লোকগুলোকে দেখে আমরা কি রকম হাসছিলুম—সবাই যে ভদ্র, তা নয়, কিন্তু বেশ অদ্ভুত বলে মনে হল। আর আমরাই বা কোন্ অধিকারে অপরের দিকে চেয়ে হাসি—পৃথিবীর কোন্ পারাপার থেকে অকস্মাৎ কিসের ফেরে আমরা ত দুজনে কাছাকাছি হয়েছি! সেটা কি সব চেয়ে অদ্ভুত নয়?

Cafe থেকে যখন বেরুলুম তখন বরফ পড়ছে—নরম ফুলকো বরফের কণা হীরের টুকরোর মত তোমার চুলে আর আমার পশমের উপর চক্ চক্ করছিল। তোমায় ছেড়ে দিতে ইচ্ছে হচ্ছিল না তাই Luxemburg বেড়াতে যাবার প্রস্তাব করলুম। ভাগ্যক্রমে একটা ভাড়াটে মোটর গাড়ীও পাওয়া গেল—দরজা বন্ধ—সেই আমরা একলা হলুম। সে এক বিচিত্র অনুভূতি! আমাদের কথা জড়িয়ে গেল; আমরা দুজনে একেবারে চুপ হয়ে গেলুম—বুকের মাঝে যেন ঝড় বইছিল! এই বাইরের জগৎ থেকে তফাৎ হওয়া, এই একলা হওয়া,—যা আমি ভয় করছিলুম, অথচ মাসের পর মাস মনে মনে এইটেকেই বেশী করে চাইছিলুম। তোমার সম্বন্ধে আমি অতিমাত্রায় সচেতন হয়ে উঠলুম, তোমার সৌন্দর্য্য আমার পক্ষে পীড়াদায়ক হয়ে উঠ্‌ল—আমায় যেন ভিতরে ভিতরে আঘাত করলে! আমি তখন ভাবছিলুম—সে ভাবনা আজও আমায় ছাড়েনি—হয়ত তুমি আমার মনের কথা বুঝতে পেরেছ। তোমায় যেন এখনও প্রত্যক্ষ দেখছি, বরফ-ঢাকা জানলার গায়ে তোমার একপাশ বেশ উজ্জ্বল, আর দেখছি তোমার মুক্তধরের অচঞ্চল বিরতি। সে সময়ে তোমায় একেবারে অপ্রাপ্য বলে মনে হয়েছিল—স্বপ্নের মত তুমি হঠাত নিমেষে শূন্যে মিলিয়ে যেতে পার! মাথার মধ্যে নানা কথা চলা-ফেরা করছিল, কত যে কাণাকাণি! কিন্তু কথাগুলো এমনি সত্য যে মুখ ফুটে বল্লে ভারি হাস্যকর শোনাত, নিশ্চয়ই। আর সময়ও ত খুব বেশী ছিল না। আমি ভাবছিলুম, যদি কপালে থাকে তবে আমার ছুটী ফুরোবার আগেই আমাদের বিয়ে হয়ে যাবে।

আবার যখন ভিড়ের মাঝখানে এসে পড়লুম, আমাদের চিন্তার ধারা বদলে গেল—চিন্তার গতিও যেন বাড়্‌ল। পরস্পরকে আর ভয়ের চোখে দেখলুম না—আমাদের মাঝ থেকে ভয়ের ব্যবধান ঘুচলো। গ্যালারিতে একখানা ছবির সামনে আমরা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলুম—ছেলেদের ঘরের টেবিলের মাঝখানে বাতি জ্বলছে, ছেলেরা চার পাশে খেলছে, আর পাণ্ডুর চাঁদ জানালায় উঁকি দিচ্ছে। ছবি দেখে ঘরের কথা, স্মৃতির-ভাণ্ডারে-জমা অনেক ব্যথা মনে জাগ্‌ল। ছবিখানা একজন বড় শিল্পীর আঁকা—অক্সফোর্ডে পড়বার সময় তাঁকে দেখেছিলুম। তোমাকে ত সেই Chestnut এর ডাল চুরির কথা বলেছি—তাঁর একখানি ছবির

পিছনের দৃশ্য তৈরী করবার জন্যে জোরে উঠে warden এর বাগান থেকে ডালটি চুরি করতে হয়েছিল।

Luxemburg বাগানের মধ্যে আমরা বেড়াতে লাগলুম—কি সুন্দর যে! যুদ্ধ যেন কোথায় দূরে সরে গেছে। পথ পিছল ছিল বলে তোমার হাত ধরে সাহায্য করেছিলুম, অথচ তোমার অনিচ্ছুক হাত দুখানি আমার হাতে রাখায় মনে মনে ভারি হাসি আসছিল। পুকুরের উপর বরফ জমে গেছে—লোকেরা সেখানে ভিড় করে স্কেট করছে, বুড়ো-ছেলে-মেয়ে-সৈনিক সবাই চীৎকার করছে, আছাড় খাচ্ছে, তাদের আনন্দ আর ধরে না!

Boule Miche দিয়ে Notre Dame এর দিকে অগ্রসর হলুম; মেয়েরা সেখানে প্রার্থনা করছে—লোকান্তরিত যাঁরা, তাঁদের জন্যে। ক্রমে আমরা সীন নদীর তীরের দিকে চল্লুম—অস্তগামী সূর্য্যের অন্তিম কিরণ যেন রক্তধারার মত সীন বয়ে চলেছে। মৃত্যুর সঙ্গে বোঝাপড়া করবার ত সময় আসেনি—আমাদের বয়স খুব ত বেশী নয়। সেই সময়ে তুমি বল্লে, আর কোথায় তোমার নিমন্ত্রণ আছে। অমনি মনের মধ্যে একটা যে স্ফূর্ত্তি এতক্ষণ জমা হয়েছিল তা এক নিমিষে নষ্ট হয়ে গেল।

"আপনাকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসতে পারি?"

"বেশ ত!"

তাড়াতাড়ি একটা taxiতে লাফিয়ে উঠলুম—আমি প্রাণপণ চেষ্টা করছিলুম যাতে তোমায় না ছাড়তে হয়—"রাত্রে কি করবেন ঠিক করেছেন?" তুমি থিয়েটারে যাবে ঠিক করেছিলে—একখানা টিকিট বাড়তি ছিল—আমায় তুমি সঙ্গে যাবার নিমন্ত্রণ করলে। মনে মনে ভাবলুম, আমার জন্যে তোমার কিছু দরদ আছে—বিদায় নেবার পর এই চিন্তাটাই মনের মাঝে গানের মত বাজছিল।

তুমি কত আস্তে আস্তে এল! বোধ হয় সে রাত্রে আমি ও জিনিষটি প্রথম লক্ষ্য করি—তোমার আসার শব্দ ত কেউ শুনতে পায় না। এই তুমি নেই, আবার দেখি, তুমি সামনে এসে দাঁড়িয়েছ—তোমার চোখ দুটি যেন সদাই একটি শান্ত মৌন হাসিতে সমুজ্জ্বল! তারা যেন যা-কিছু জানবার সব জেনেছে, আর এই হতবুদ্ধি গোলমেলে জগতের নানা ব্যাপারে ভারী আমোদ পাচ্ছে। জীবন যে তোমায় কোনদিন ব্যস্ত করেছে, তা আমি ভাবতেই পারি না। আমার মনে যে সব কথা জাগছিল, তা যদি তোমায় বলতুম, তা হলে তোমার মুখের আর চোখের ভাবের কিছু কি পরিবর্ত্তন হোত? কি জানি!

প্রথম থেকেই তুমি আমায় এত বিশ্বাস করেছিলে, প্রেমিকের পক্ষে বোধ করি সেটি শুভলক্ষণ। সব চেয়ে আশ্চর্য্য ঠেকছে এই যে, যুদ্ধে কামানের মুখে এগিয়ে জয় করে' আচম্বিত-মৃত্যু-সম্ভাবনার সারাক্ষণ নির্ব্বিকার থেকে শেষে এক তরুণীর কাছে কেঁপে কেঁপে সারা হচ্ছি।

তোমায় এতক্ষণ ধরে যা লিখেছি, তা পড়ে দেখ্‌ব বলে লেখা থামালুম—আচ্ছা, আমি লিখছি কেন? তুমি ত এ সব কোনো দিনই পড়বে না। ঘণ্টা দুই আগে ত তোমায় এ সব কথা বল্লেই পারতুম! এখন ত

অনেক দেরী হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে আমরা দু-এক ছত্র লিখ্‌ব এমনি কথা হয়েছে—আমরা ত এমনি করেই বলি। তার চেয়ে বেশী কিছু লেখা যাবে না। তোমায় আমি যে চিঠি পাঠাবো, তা একেবারে কেতা-দুরস্ত আর যতদূর সম্ভব ছোট—পরিমিত—পুরুষ বা মহিলাকে যেমন করে লিখি ঠিক তেমনি করেই লিখ্‌ব। কিন্তু তবু হ্যাঁ, একটা যে মনে আমার সব চেয়ে বেশী করে বাজে—এই বোধ হয় তোমার সঙ্গে শেষ দেখা—তোমার কাছে শেষ বিদায় নেওয়া! যুদ্ধের মুখ থেকে ফিরে আসবার কপাল ক'জনের? যে গোলার ঘায়ে আমার জীবন যাবে, তা বোধ হয় এতক্ষণে জার্মান বারুদখানায় জমা হয়ে গেছে। ট্রেঞ্চের ধার দিয়ে চলেছি—কি একটা ছুটে এল, জোরে একটা ধাক্কা লাগ্‌ল—অন্ধকার—ব্যস্ সব শেষ। অমন করে সংক্ষেপে বিদায় নেওয়াটা আমার কাছে ভারী বিশ্রী ঠেকছে—পরস্পরের সুখের আশা জ্ঞাপন করে ধন্যবাদ—হাতের একটু স্পর্শ—তার পর সব কথা অ-বলা রেখে অসীম শূন্যতার পানে বেরিয়ে পড়া!

তুমি ত আর এ-সব কোন কালেই পড়বে না—তাই একটা মজা করব মনে করেছি। যা সব লিখছি, তোমায় তা পাঠাব না। এই রকম করে চিঠি লিখে মনের সব কথা বলে যাব। যদি বাঁচি, যুদ্ধের শেষে একদিন হঠাৎ তুমি সব চিঠিগুলোই পেয়ে যাবে—আর যদি তার আগেই মরি তাহলে তুমি কিছুই জানবে না—আমার এই গোপন প্রেম তোমায় কোন ব্যথাই দেবে না। তোমার সম্বন্ধে এখন নানা স্বপ্ন দেখি,—সেই শেলের গর্ত্তের মধ্যে! সেই অবাস্তব জগতে! মনে হয় তুমি প্রকৃতই আমারি!

চুপ করে থেকে বোধ হয় ভাল করিনি। বোধ হয় একটা মিথ্যা গর্ব্বের বশে আমি নীরব ছিলুম। সৈনিকদের বিয়ের সম্বন্ধে সেদিন তোমার এক বন্ধুর সঙ্গে কথা হচ্ছিল—আমি বলছিলুম, সে কাজটা নিতান্ত স্বার্থপরতা। তিনি প্রথম নীরব ছিলেন, যেন মোটেই মনোযোগ দিচ্ছেন না; তারপর হঠাৎ আমার দিকে ফিরে অপ্রত্যাশিত ক্রোধে আমায় বল্লেন—"তাকে আমি বিয়ে করেই ঠিক করতুম।" তাঁর গল্পটা আমি পরে শুনলুম—এক ফরাসী সেনানায়কের সঙ্গে বাগ্‌দান হয়েছিল, তারপর তিনি মারা গেছেন। ইনি এখন রেড-ক্রসে যোগ দিয়েছেন, এবং এ যাবৎ যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে একান্তমনে এগিয়ে আসছেন। কি অশান্তিই তিনি বহন করেছেন! আচ্ছা, বিদায়ের সময় আমরা যেমন করে হেসেছিলুম এঁরাও কি সেই রকম করে হেসেছিলেন?

শেষ ক'দিন আমরা কি সুখেই ছিলুম—পরস্পরের মধ্যে কত সে লজ্জা! সেই সব অতীত সুখের কাহিনীতে স্মৃতি আমার ভরপুর—বিচারবুদ্ধি বা অভিজ্ঞতার পাকা রঙে নষ্ট হয়ে যায় নি। আজ রাত্রে—আজ শেষ রাত্রে সুখের চরম হয়েছে। আমাদের প্রিয় cafe-এ গিয়েছিলুম—বরকে ঢাকা, প্রথম রবিবারে সেই যেখানে যাই। যাবার সময় পথে যেতে এত দেরী হয়ে গেল যে গিয়ে দেখি অপেরার প্রথম দৃশ্য অভিনয় হয়ে গেছে। তাতে আমরা মোটেই ক্ষুণ্ণ হই নি, অন্তত আমি ত নই। তোমার কাছে বেশীক্ষণ থাকতে পাব

বলেই ত অপেরায় যাবার প্রস্তাব করেছিলুম। সন্ধ্যা রাত্রিটা কি শীগগির কাটল! আবার boulevard-এ বেরিয়ে পড়লুম। তোমার বাড়ী পৌঁছে দেবার সময় হয়েছে—অদৃষ্ট ট্যাক্সি পাবার চেষ্টায় আমরা কি মজাটাই করলুম! শেষ একটা বাড়ীর গাড়ীর শোফেয়ারকে ঘুষ দিয়ে গাড়ী পেলুম। সেই শেষ মুহূর্ত্তে তুমি কি আমার কাছ থেকে কিছু আশা করেছিলে? আমি শুনলুম, আমি নিজে সব নিতান্ত সাধারণ কথা বলে যাচ্ছি, কিন্তু সে গলার স্বর যেন আমার নয়। কথা বলেই চলেছি—কত দেরী হয়ে গেল—হঠাৎ এত দিনের অন্তরঙ্গ—তার পর আমরা থমকে থেমে গেলুম, ভিতরে ভিতরে চঞ্চল হয়ে উঠলুম। তুমি বল্লে, "বিদায়"—আমিও তার প্রতিধ্বনি তুললুম। "চিঠি লিখতে ভুলবেন না ত?" হাত দুখানি আমার মুঠোর মাঝ থেকে টেনে নিয়ে তুমি মাথা নাড়লে, তারপর পিছন ফিরে দৌড়ে উপরে উঠে গেলে।

তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে মন আমার ভারী খুসী হয়ে উঠেছে। যে বেদনা বহন করে আমি যুদ্ধে ফিরে যাবো তার জন্যেও আমি খুসী। আমার মন-প্রাণ যে একান্ত নিঃসঙ্গ আর ফাঁকা ছিল, তার উপর এর আগে আমি কোন মেয়েকে কোনদিন ভালবাসিনি। এখন ত ভাবতে পারে!—সে বোধ হয় জানতে পেরেছে, কেন, আমি তার কাছে সব কথা মুখ ফুটে বলি নি! হয়ত সেও এমনি করে আমার কথা মনে করছে। তোমার সম্বন্ধে কত গল্পই নিজের কাছে বলব, যেন তুমি সত্যই আমার! তোমার মুখখানি আমার সঙ্গেই থাকবে—তোমার কণ্ঠস্বর, তোমার স্নিগ্ধ-মধুর ব্যবহার সব, সবই। এবার আমি আমাকে ছাপিয়ে উঠব, তোমাকে যে আমি দেখেছি! যদি মরি, খুসী হয়ে খুসী হয়ে মরতে পারব।

রাত অনেক হয়ে গেছে—এখনি আবার সব জেগে উঠবে। ঘণ্টা পাঁচের মধ্যেই আমায় সহর ছেড়ে যেতে হবে। তোমায় খুব কাছে ভাবতে ইচ্ছে করছে—এত কাছে যেন কথা কইতে পারি—দেখেছ টেলিফোনের লোভ এখনো সামলাতে পারি নি। কিন্তু হায়রে, প্যারি আর যুদ্ধক্ষেত্রে প্রথম সার কামানের মাঝে কোন টেলিফোনের লাইন নেই!

প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়।

অবতার

১

চিকিৎসা ও বুজরুগি শক্তির জন্য, পাবী নগরে ডাক্তার বাল্‌থাজার শোরবেমোর খুব পসার হইয়াছে; সত্যই হোক্, মিথ্যাই হোক্ তাঁর এই-সব আজগুবি কাণ্ডের দরুণ, সর্ব্বত্রই তাঁর এখন আদর সম্মান। কিন্তু রোগী পাইবার চেষ্টা দূরে থাক্, তাঁর নিকট রোগী আসিলে, দরজা বন্ধ করিয়া উঁহাদিগকে তাড়াইয়া দেন, অথবা এরূপ ঔষধ-পত্র লিখিয়া দেন যাহা অতি অদ্ভুত এবং এরূপ নিয়ম

ব্যবস্থার কথা বলেন যাহা পালন করা অসম্ভব। 'নিউমোনিয়া', 'এপেণ্ডিসাইটিস', 'টাইফয়েড'— এই-সব চলিত সাদামাটা, সাধারণ ইতর জনোচিত রোগে আক্রান্ত রোগীদিগকে অত্যন্ত অবজ্ঞার সহিত তাহাদের আগেকার ডাক্তারদের নিকট ফিরিয়া পাঠাইয়া দেন। দুরারোগ্য উৎকট সৌখীন রোগে আক্রান্ত রোগীরই তিনি চিকিৎসা করেন, এবং তাঁর চিকিৎসায় রোগী অভাবনীয়রূপে আরোগ্য লাভ করে। রোগ-শয্যার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, তিনি এক-পেয়ালা জলে ফুঁ দিয়া মায়ামন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে নানা প্রকার মুদ্রাভঙ্গী করেন। মুমূর্ষুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শক্ত, আড়ষ্ট ও ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে, উহাকে সমাধি ভূমিতে লইয়া যাইবার উদ্যোগ চলিতেছে;—সেই সময় উহার যন্ত্রণায় আড়ষ্ট দৃঢ়বদ্ধ চিবুক শিথিল করিয়া দিয়া ঐ মন্ত্রপূত জলের কয়েক ফোঁটা উহাকে গিলাইয়া দেওয়া হয়, তাহার পরেই রোগীর দেহের স্বাভাবিক নমনীয়তা, স্বাস্থ্যের রং আবার ফিরিয়া আসে। রোগী শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া বিস্মিতভাবে চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। তাই লোকেরা ওকে সবাই মৃত্যুর ডাক্তার বলে, মৃতসঞ্জীবনের ডাক্তার বলে। এখনো ডাক্তার লেরবোনো সব সময়ে এই সব রোগের চিকিৎসা করিতে সম্মত হন না; অনেক সময় ধনী মুমূর্ষু রোগীদের নিকট হইতে প্রভূত অর্থের অঙ্গীকার পাইলেও উহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করেন। যদি কোন জননী তার একমাত্র সন্তানের জীবনের জন্য তাঁহাকে কাতর অনুনয় করে, কোন প্রেমিক তার প্রাণ-প্রিয়ার প্রেমলাভে হতাশ হইয়া তাঁহার সাহায্য চাহে, অথবা যদি তিনি মনে করেন, যে ব্যক্তির জীবন সঙ্কটাপন্ন তাহার জীবন কাব্যের পক্ষে, বিজ্ঞানের পক্ষে, বিশ্বমানবের উন্নতির পক্ষে, বিশেষ প্রয়োজনীয়, তবেই তিনি তার মৃত্যুর সহিত যুঝাযুঝি করিতে সম্মত হন।

এইরূপে তিনি 'ক্রুপ'-রোগে রুদ্ধ-শ্বাস একটি কোলের শিশুকে, যক্ষার শেষ-অবস্থায় উপনীত একটি রূপসী ললনাকে, সুরা-বিকারগ্রস্ত একজন কবিকে, মস্তিষ্কের রক্ত-জমাট-রোগে আক্রান্ত একজন যন্ত্র-উদ্ভাবককে বাঁচাইয়া দিয়াছেন। তাঁর আবিষ্কারের হদিশটি তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্তিকার গর্ভে নিহিত হইবে, তাঁহার আচরণে এইরূপ মনে হয়। আবার তিনি এরূপ কথাও বলেন যে, প্রকৃতিকে উল্টাইবার চেষ্টা করা উচিত নহে, কতকগুলি লোকের মরাই উচিত—তাহাদের মৃত্যুর যুক্তিসঙ্গত হেতু আছে; তাহাদের মৃত্যুতে যদি বাধা দেওয়া যায় তাহা হইলে সমস্ত বিশ্ব-যন্ত্রে একটা বিশৃঙ্খলা ঘটিতে পারে। এখন স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছ, ডাক্তার লেরবোনো একজন সৃষ্টিছাড়া লোক, বাতিকগ্রস্ত লোক, তাঁর এই বাতিকটা তিনি পুরাপুরি ভারতবর্ষ হইতে অর্জন করিয়া আনিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার সম্মোহনকারীর খ্যাতিটা চিকিৎসকের খ্যাতিকেও অতিক্রম করিয়াছিল। অল্পসংখ্যক বাছাবাছা লোকের সম্মুখে তিনি কয়েকবার বৈঠক দিয়াছিলেন, সেই বৈঠকে এমন সব অদ্ভুত ব্যাপার প্রদর্শন করিয়াছিলেন, যাহাতে করিয়া লোকের সম্ভব-অসম্ভবের সমস্ত সংস্কার ওলট-পালট হইয়া গিয়াছিল, এবং প্রসিদ্ধ বাজিকর ক্যাগলিয়স্ত্রোর অদ্ভুত ঐন্দ্রজালিক ব্যাপারকেও অতিক্রম করিয়াছিল।

ডাক্তার একটা পুরাতন হোটেলের এক-তলায় বাস করিতেন। আগেকার দস্তুরমত তাঁর ঘরগুলা সারি-সারি এক লাইনে অবস্থিত। সেই-সব ঘরের উঁচু জানলা হইতে নীচের বাগান দেখা যায়। বাগানে বড় বড় গাছ; গাছের গুঁড়িগুলা কালো,—লম্বা লম্বা সবুজ পাতার ঢাকা। শক্তিমান কতকগুলা তাপ-প্রবাহ যন্ত্রের মুখ হইতে তাপের অনন্ত প্রবাহ বাহির হইয়া বড় বড় ঘরগুলাকে গরম রাখিয়াছে। এখন ঘরের তাপ মান ৩৫ হইতে ৪০ ডিগ্রী। ভারতবর্ষের প্রখর গ্রীষ্মের উত্তাপে অভ্যস্ত ডাক্তার শেরবোনো, আমাদের দেশে ফ্যাকাসে সূর্য্যকিরণে, থরথর করিয়া কাঁপিতেন—ঠিক সেই ভ্রমণকারীদের মত যাহারা নীল-নদীর উদ্ভবস্থান মধ্য আফ্রিকা হইতে 'কেরো'তে ফিরিয়া আসিয়া শীতে কাঁপিতে থাকে। তিনি গাড়ী বন্ধ-সন্ধ না করিয়া গৃহের বাহির হইতেন না; এবং শীত-কাতুরের ন্যায় সর্ব্বশরীর পশু-লোমের আলখাল্লায় আচ্ছাদন করিয়া গরম-জলে-ভরা একটা টিনের চোঙার উপর পা রাখিতেন।

তাঁর এই ঘরগুলিতে কতকগুলা অনুচ্চ পালঙ্ক ছাড়া আর কোন আস্‌বাব ছিল না। পালঙ্কগুলা মালাবার দেশের ছিট-কাপড়ে আচ্ছাদিত,—তার উপর অদ্ভুত-আকৃতি হস্তী ও কাল্পনিক বিহঙ্গাদির চিত্র অঙ্কিত, ও সিংহলের আদিমবাসীদিগের দ্বারা রূঢ় ধরণে রং-করা ও সোনার গিল্টি করা; বিদেশী ফুলে-ভরা কতকগুলা জাপানী ফুলদানী এবং মেজের তক্তার উপর, ঘরের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত,শতরঞ্চি বিছানো রহিয়াছে। কালো-সাদা ফুল-কাটা এই বিশালায়ত শতরঞ্চি কারাগারের মধ্যে ঠগেরা বুনিয়াছে। তাহারা যে সোনের রসিতে গলায় ফাঁস লাগাইত, সেই সোনের সূতা দিয়া ইহার বুনানি হইয়াছে। পাথরের ও কাঁসার কতকগুলা হিন্দু-দেবদেবীর মূর্ত্তি রহিয়াছে; বাদামি আকারের দীর্ঘ চোখ—নাকে মাকড়ি—হাস্যময় স্থূল ওষ্ঠাধর, মুক্তার মালা নাভি পর্য্যন্ত ঝুলিয়া রহিয়াছে; উঁহাদের লক্ষণ অদ্ভুত ও রহস্যময়; মূর্ত্তিগুলা তলদেশস্থ বেদি-কার উপর আসনপিঁড়ি হইয়া বসিয়া আছে। দেবালয়ের গায়ে গায়ে জল-রঙের চিত্র-পট ঝুলিতেছে; এই সকল চিত্র কলিকাতা কিংবা লক্ষ্ণৌর পটুয়াদের হাতের আঁকা। মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নরসিংহ, বামন, রাম, কৃষ্ণ (যাকে কোন কোন স্বপ্ন-দর্শক হিন্দুখৃষ্ট মনে করেন) বুদ্ধ, কল্কি এই নয় অবতারের চিত্র। সর্ব্বশেষে নারায়ণের মূর্ত্তি—ক্ষীর-সমুদ্রের মধ্যে কুণ্ডলীকৃত পঞ্চশীর্ষ-সর্প-বেদিকার উপর নিদ্রিত—কোন এক সময়ে শ্বেত-অশ্বের উপর আরোহণ করিয়া শেষ-অবতার কল্কির মূর্ত্তি ধারণ করিয়া জগতের প্রলয়সাধন করিবেন তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছেন।

সব-ঘরের পিছনে যে ঘর—সেই ঘরটি আরও বেশী করিয়া গরম করা; সেই ঘরে পাশাপাশি সংস্কৃত-পুঁথিতে বেষ্টিত হইয়া রাত্রিকাল শেরবোনো বাস করেন। পুঁথির অক্ষরগুলা পাতলা পাতলা কাষ্ঠফল-কের উপর, লোহার লেখনীর দ্বারা উৎকীর্ণ; কাষ্ঠ-ফলকে ছিদ্র আছে, সেই ছিদ্রের মধ্যে দড়ি চালাইয়া, ফলকগুলা একত্র গ্রথিত হইয়াছে।

আমরা য়ুরোপে যাহাকে পুস্তক বলি, এ

সেরূপ ধরণের নহে। একটা বৈদ্যুতিক-যন্ত্র—তাহা সোনালি ফুল-কাটা কতকগুলা বোতলে ভরা; বোতলের কাচের মুখে হাতল লাগান আছে—ঐ হাতলের দ্বারা উহা ঘুরান যায়। এই চঞ্চল ও জটিল যন্ত্রটার ছায়ামূর্ত্তি ঘরের মাঝখানে মাথা তুলিয়া রহিয়াছে। পাশে সম্মোহন কার্য্য-সংক্রান্ত একটা ছোট কাঠের টব; তাহার মধ্যে একটা ধাতুময় বলয় ডোবান আছে এবং উহা হইতে অনেকগুলা লোহ শলাকা বাহির হইয়াছে। শেরবোনো একজন হাতুড়ে ছাড়া আর কিছুই নহে; সেজন্য শেরবোনোর প্রকৃত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় কোন উদ্যোগ ছিল না। কিন্তু তবু পূর্ব্বেকার 'আল্‌কেমি'-রাসায়নিকের পরীক্ষাগারে প্রবেশ করিলে মনের যে রকম ভাব হইত, তাঁর এই আজগুবী ধরণের পরীক্ষাগারে প্রবেশ করিলে মনে সেইরূপ একটা ভাব না হইয়া যায় না।

কোণ্ট ওলাফ-লাবিনস্কি লোক মুখে শুনিয়াছিলেন, এই ডাক্তারের অনেক অলৌকিক চেষ্টা সফল হইয়াছে; তাই তাঁর অতি-বিশ্বাস-প্রবণ কৌতূহল উদ্দীপ্ত হইল। তিনি ডাক্তারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন।

যখন কোণ্ট ডাক্তারের গৃহে প্রবেশ করিলেন, তখন তাঁর অনুভব হইল যেন একটা অস্পষ্ট অগ্নিশিখা তাঁহাকে ঘিরিয়া আছে, তাহার সমস্ত শরীরের রক্ত মাথার দিকে প্রবাহিত হইল, তাঁহার রগের শিরাগুলা দব্‌দব্‌ করিতে লাগিল; ঘরের দুঃসহ উত্তাপে তাঁর যেন শ্বাসরোধ হইল। প্রদীপে যে তেল পুড়িতেছিল, ফুলদানীতে যাভাদীপের যে সব মসলাদার বৃহৎ পুষ্প দুলিতেছিল—সেই তেল ও পুষ্পের তীব্র গন্ধে তাঁর মাথা ধরিয়া গেল। মাতালের মত টলিতে টলিতে, ডাক্তারের অভিমুখে কোণ্ট কিয়ৎপদ অগ্রসর হইলেন। ডাক্তার শেরবোনো সন্ন্যাসীদিগের মত আসন-পিঁড়ি হইয়া পালঙ্কে বসিয়াছিলেন। পরিচ্ছদে আচ্ছাদিত ডাক্তারের শীর্ণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যে ভাবে দেখা যাইতেছিল, দেখিলে মনে হয় যেন একটা মাকড়শা জালের মধ্যে থাকিয়া তাহার শিকারের উদ্দেশ্যে নিশ্চলভাবে বসিয়া আছে। কোণ্টকে দেখিবামাত্র তাঁহার ফস্‌ফরস-দীপ্ত চোখ-দুটো সহসা জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু পরক্ষণেই ইচ্ছা করিয়া উহা নিভাইয়া দিলেন। তাহার পর ডাক্তার, ওলাফের দিকে হাত বাড়াইয়া দিলেন। ওলাফ অস্বোয়াস্তি অনুভব করিতেছেন, ডাক্তার বুঝিতে পারিয়াছিলেন—তাই, দুই তিনবার হাতের 'ঝাড়া' দিয়া তাঁহার চারিদিকে বসন্তের আব-হাওয়া উৎপাদন করিলেন,—এই উত্তপ্ত জ্বালাময় নরকের মধ্যে সুশীতল স্বর্গের আবির্ভাব ঘটাইলেন।

"এখন ও আপনি ভাল বোধ কর্‌চেন? আপনি বল্টিকের তুষার-শীতল হাওয়ায় অভ্যস্ত, তাই ঘরের এই উত্তপ্ত হাওয়া, কামারের কারখানায় হাপরের জলন্ত হাওয়ার মত আপনার মনে হচ্চে—কিন্তু ভারতের প্রখর সূর্য্যকিরণে দগ্ধ-বিদগ্ধ যে আমি, এই উত্তাপেও আমি শীতে কাঁপছিলাম।"

কোণ্ট ওলাফ একটা ইঙ্গিত করিয়া প্রকাশ করিলেন যে এখন আর তাহার গরমে কষ্ট হইতেছে না।

ডাক্তার অতি সরলভাবে বলিলেন,—

"আপনি অবশ্য আমার "ঝাড়া-ফেওয়া"র কথা, আমার সম্মোহন বিদ্যার কথা শুনেছেন ?— তবে কি একটা নমুনা এখন দেখতে ইচ্ছা করেন ?"

কোঁণ্ট উত্তর করিলেন :—

"আমার কৌতুহল ওরূপ ছেলে-মানুষি ধরণের নয়। যিনি একজন বিজ্ঞানের সম্রাট্, তাঁর উপর আমার শ্রদ্ধা ভক্তি উহা অপেক্ষা অনেকটা বেশী।"

—"বৈজ্ঞানিক বল্‌লে যে অর্থ বোঝায় আমি সে অর্থে একজন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত নই, বরং বিজ্ঞান যে সকল জিনিসকে অবজ্ঞা করে সেই সকল জিনিসের অনুশীলন ক'রে আমি অপ্রযুক্ত কতকগুলি গূঢ় শক্তিকে আয়ত্ত করেছি, এবং তার থেকে এমন-সব ব্যাপার দেখাতে পারি যা প্রাকৃতিক হ'লেও অত্যন্ত বিস্ময়জনক বলে মনে হয়। বিড়াল যেমন ইঁদুর ধরবার জন্ত থাপ্ টি মেরে বসে থাকে, আমিও তেমনি অপেক্ষা করে থেকে সময় বুঝে তীক্ষ্ণ দৃষ্টির প্রভাবে, কোন আত্মার বস্তু ঝট্ করে ধরে ফেলতে পারি; সেই আত্মাটি তখন সব কথা খুলে আমাকে বলে;—তাতেই আমার কাজ হাসিল হয়, আমি তার কতক-গুলি কথা মনে ক'রে রাখি। আত্মাই সব, জড়-জগৎ শুধু একটা বাহ্য আবির্ভাব। বিশ্বজগৎ সম্ভবত ঈশ্বরের একটা স্বপ্নমাত্র অথবা অসীমের মধ্যে, শব্দ-ব্রহ্ম হতে নিঃসৃত একটা বহির্বিকাশ মাত্র। আমি ইচ্ছামত শরীরকে চামড়ার মত সঙ্কুচিত করতে পারি, জীবনীশক্তিকে আটকাতে পারি বা দ্রুত চালিয়ে দিতে পারি, আমি আকাশকে বিলোপ করতে পারি, ক্লোরোফর্ম প্রভৃতির সাহায্য না নিয়েও কষ্টকে নষ্ট করতে পারি। মানসিক তড়িৎ এই যে ইচ্ছা-শক্তি, এই ইচ্ছা-শক্তিতে সজ্জিত হ'য়ে আমি জীবন দান করি, কাউকে বা বজ্রাঘাতে ধরাশায়ী করি। আমার চক্ষের সমক্ষে কোনও জিনিসই অস্বচ্ছ নয়; আমি চিন্তার রশ্মিগুলি স্পষ্ট দেখ্‌তে পাই। যেমন বেলোয়ারি কাচের কলমের মধ্য দিয়ে বিশ্লিষ্ট সূর্য্যালোকের বর্ণচ্ছটা পর্দার উপর প্রক্ষিপ্ত হয়, সেইরূপ আমার অদৃশ্য বেলোয়ারি কলমের দিয়ে আমি ঐ চিন্তা-রশ্মিগুলি আমার সাদা মস্তিষ্ক-পটের উপর ইচ্ছাশক্তির বলে প্রতিফলিত করতে পারি। কিন্তু ভারতের সিদ্ধপুরুষ যোগীরা যাহা করেন তাহার কাছে এ সব কিছুই নয়। আমরা য়ুরোপের লোক,—আমরা অত্যন্ত লঘু-প্রকৃতি, অত্যন্ত বিক্ষিপ্তচিত্ত, অত্যন্ত অসার; আমাদের কাদা-মাটির কারাগারটি আমাদের নিকট এতই প্রিয় যে, আমরা অনন্ত ও অসীমের বৃহৎ জানলা-গুলো খুলতে পারি নে। তথাপি আমার পরীক্ষা হতে আমি কতকগুলি আশ্চর্য্য ফল পেয়েছি. তা দেখ্‌লে আপনি নিজেই বিচার করতে পারবেন।"

এই কথা বলিয়া ডাক্তার শেয়বোলো একটা বড় দরজার টাঙানো একটা পর্দার শিকের উপর দিয়া কতকগুলা আঙ্‌টা সরাইয়া দিবামাত্র ঘরের পশ্চাদ্ভাগের একটি প্রচ্ছন্ন কুঠরী বাহির হইয়া পড়িল। তাঁহার টেপাইয়ের উপর সুরাসারের অগ্নিশিখা জ্বলিতেছিল, তাহার আলোকে কোঁণ্ট ওলাফ্ যে দৃশ্য দেখিলেন তাহা অতি ভীষণ, তাহা দেখিয়া এমন যে সাহসী পুরুষ কোঁণ্ট তাঁহারও সর্ব্বাঙ্গ

শিহরিয়া উঠিল। একটা কালো টেবিলের উপর কটিদেশ পর্য্যন্ত নগ্ন একটি যুবাপুরুষ শয়ান—শবের মতো নিশ্চল। শরশয্যাশায়ী ভীষ্মের মতো তাহার দেহে কতকগুলো শলাকা বিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, কিন্তু তাহা হইতে এক-বিন্দুও রক্ত ঝরিতেছে না। দেখিলে মনে হয় যেন কোন ধর্ম্মবীর 'মার্টারের' মূর্ত্তি, কেবল ক্ষতস্থানে চিত্রকর যেন লাল রং দিতে ভুলিয়া গিয়াছে।

ওলাফ্ মনে মনে ভাবিলেন, এই ডাক্তার বোধ হয় শিবের একজন ভক্ত উপাসক—এই লোকটিকে বোধ হয় শিবের নিকট বলি দিবার মৎলব করিয়াছে।

"ওর কিছুই কষ্ট হচ্চে না; ওর গায়ে চিম্‌টি কেটে দেখুন, ওর মুখের একটি পেশীও নড়বে না।" এই কথা বলিয়া আলপিনের গদি হইতে আল্‌পিন বাহির করিবার মত ডাক্তার উহার গাত্র হইতে শলাকাগুলো বাহির করিয়া লইলেন। উহার উপর তাড়াতাড়ি কয়বার হস্ত-সঞ্চালনের পর বা 'ঝাড়া' দিবার পর, উহার ওষ্ঠাধরে যোগানন্দের একটি মৃদু-মধুর হাসির রেখা দেখা দিল—যেন সে একটা সুখস্বপ্ন হইতে জাগিয়া উঠিয়াছে। একটা ইঙ্গিত করিয়া ডাক্তার শেরবোনো তাকে ছুটি দিলেন। কাঠের কারু-কার্য্য-ভূষিত ঐ প্রচ্ছন্ন প্রকোষ্ঠের কাষ্ঠ-কাঠামের মধ্যস্থিত একটা কাটা দরজা দিয়া সে প্রস্থান করিল। মৃদু হাসির ছলে ডাক্তার, মুখের বলি-রেখা-গুলা বেশী পাকাইয়া বলিলেন,—

"আমি ওর একটা পা কিংবা হাত কেটে ফেল্‌তে পারতাম,—ও টেরও পেত না। আমি তা করলাম না, কেন না, আমি এখনো সৃষ্টি করতে পারি নে। এ বিষয়ে মানুষ টিকটিকি হতেও অধম, মানুষের এতটা শক্তি-বিশিষ্ট জীবন-রস নেই যে কাটা অঙ্গ আবার নতুন করে গড়ে তুলতে পারে। আমি সৃষ্টি করতে পারিনে বটে কিন্তু আমি নবযৌবন এনে দিতে পারি।" এই কথা বলিয়া তিনি এক বৃদ্ধা রমণীর অবগুণ্ঠন উঠাইয়া লইলেন; কালো মার্ব্বেল টেবিলের অনতিদূরে, সেই বৃদ্ধা এক আরাম-কেদারায় চৌম্বক নিদ্রায় নিদ্রিত ছিল; তাহার মুখশ্রী, মনে হয়, একসময়ে সুন্দর ছিল, এখন শুষ্ক ম্লান হইয়া গিয়াছে, এবং তাহার বাহুর, তাহার স্কন্ধের, তাহার বক্ষের শীর্ণ গঠনের উপর কালের উপদ্রব স্পষ্ট লক্ষিত হয়। ডাক্তার স্বীয় নীল তারার প্রখর স্থির দৃষ্টি খুব আগ্রহের সহিত, কয়েক মিনিট ধরিয়া তাহার উপর নিবদ্ধ করিলেন; ক্ষীণ-রেখাগুলি আবার পূর্ব্ববৎ সরল হইয়া উঠিল; কুমারী-সুলভ বক্ষের সুগোল-গঠন আবার ফিরিয়া আসিল। কণ্ঠের শীর্ণতা আবার শুভ্রবর্ণ সাটিন্-আভ মাংসে ভরিয়া গেল। গাল বেশ সুগোল হইল; এবং পিচ্ ফলের ন্যায় ঈষৎ গোল ও পেলব হইয়া যৌবনের তারুণ্যভাব ধারণ করিল; উন্মীলিত নেত্রযুগল, একপ্রকার সজীব তরল রসে ভরিয়া গিয়া ঝিক্‌মিক্ করিতে লাগিল। যেন যাদুমন্ত্রে বার্দ্ধক্যের মুখসটা খসিয়া গেল, এবং বহুকাল-অন্তর্হিতা সেই সুন্দরী যুবতীকে আবার দেখিতে পাওয়া গেল। এই রূপান্তর-দর্শনে কোণ্ট হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছিলেন; ডাক্তার তাঁহাকে বলিলেন :—

"আপনি কি বিশ্বাস করেন, এই জলে যৌবনের উৎস হইতে নিঃসৃত অলৌকিক জল-ধারার কতকটা জলে এই রূপান্তর ঘটিয়াছে? আমি বিশ্বাস করি, কেননা, মানুষ নূতন কিছুই উদ্ভাবন করতে পারে না, মানুষের প্রত্যেক স্বপ্নই একটা ভবিষ্যৎ দর্শন কিংবা একটা অতীতের স্মৃতি।—কিন্তু আমার ইচ্ছাবলে এই মূর্ত্তিটিকে প্রকৃতে পরিণত করেছিলাম, এখন মুহূর্ত্তের জন্য ওকে ছেড়ে দেওয়া যাক্। আর ঐ কোণে যে মেয়েটি বেশ শান্তভাবে নিদ্রা যাচ্ছে, এখন ওর সঙ্গে একটু পরামর্শ করা যাক্। ঐ মেয়েটির ডলফির পুরোহিতের চেয়েও দূর-দৃষ্টি। বোহিমিয়া প্রদেশে আপনার যে পাঁচটি দুর্গ-প্রাসাদ আছে তারই কোন-একটি প্রাসাদে ওকে আপনি পাঠিয়ে দিতে পারেন, আপনার দেরাজে সব-চেয়ে গোপনীয় জিনিস কি আছে ওকে জিজ্ঞাসা করুন—এ বলে দেবে। সেখানে পৌঁছতে ওর আত্মার এক-সেকেণ্ডেরও বেশী লাগবে না। যাই হোক্, ব্যাপারটা খুবই আশ্চর্য্য বটে; কেন না ঐ একই সময়ের মধ্যে তাড়িৎ ৭০ মাইল লীগ্ অতিক্রম করে, আর, রেলের-গাড়ীর কাছে ঘোড়ার গাড়ী যে রকম, চিন্তার কাছে তাড়িৎশক্তিও সেই রকম। আপনার সঙ্গে ওর সম্বন্ধ নিবদ্ধ করবার জন্য আপনি ওর হাতে হাত দিন, আপনার প্রশ্নটি সম্বন্ধে ওকে জিজ্ঞাসা করাও আবশ্যক হবে না। ও আপনার মনোগত প্রশ্ন এম্‌নিই জানতে পারবে।'

কোণ্ট মনে মনে যে-প্রশ্ন করিলেন, ঐ মেয়েটি অতি ক্ষীণ স্বরে তাহার উত্তর দিল :—

"সিডার কাঠের সিন্দুকের ভিতর, অতিসূক্ষ্ম বালিস, গুঁড়ার মত এক টুক্‌রা মাটি আছে তার উপর একটা ছোট পায়ের ছাপ্ দেখা যায়।"

ডাক্তার তাঁর স্বপ্নদর্শী মেয়েটির অভ্রান্ততায় যেন দৃঢ়নিশ্চয় এই ভাবে কোন দ্বিধা না করিয়াই বলিলেন :—

—"মেয়েটি ঠিক্ বলেছে কি না?"

কোণ্টের গাল লাল হইয়া উঠিল। বস্তুত তাহাদের ভালবাসার প্রথম অবস্থায়, একটা উপবনের বালুময় পথে একটি তরুণী প্রাণেশ্বরীর পায়ের যে ছাপ্ পড়িয়াছিল, বালুময় মাটিসমেত সেই ছাপ্‌টি কোণ্ট উঠাইয়া লইয়া ঝিনুক ও রূপা খচিত একটা বাক্সের ভিতর, সেই ছাপ-সমেত মৃত্তিকাখণ্ড স্মৃতি-চিহ্নস্বরূপ সযত্নে রাখিয়া দিয়াছিলেন। এবং উহার অতিক্ষুদ্র চাবিটি একটি খুব সরু চেনে বদ্ধ হইয়া তাঁহার গলায় ঝুলিত।

শিষ্টাচারে অভ্যস্ত ডাক্তার, কোণ্টের লজ্জা-সঙ্কোচ লক্ষ্য করিয়া আর পীড়াপীড়ি করিলেন না, এবং তাঁহাকে একটা টেবিলের অভিমুখে লইয়া গেলেন। ঐ টেবিলের উপর হীরকের ন্যায় স্বচ্ছ খানিকটা জল রাখা হইয়াছিল।

"যে ঐন্দ্রজালিক আর্শিতে, মেফিস্টোফেলিস্ ফৌষ্টকে হেলেনের মূর্ত্তি দেখিয়েছিল, সেই আর্শির কথা বোধ হয় আপনি শুনেছেন; আমার রেশমী মোজার মধ্যে ঘোড়ার খুর ও আমার টুপিতে দুইটা কুঁকড়োর পালক না থাকলেও, একটা আশ্চর্য্য কাণ্ড দেখিয়ে আপনাকে নির্দ্দোষ আমোদ দিতে পারি। এই জল-পাত্রের

উপর আপনি ঝুঁকে থাকুন, আর যে রমণীকে আপনি এখানে আনতে চান, একাগ্রচিত্তে তাঁকে চিন্তা করুন। জীবিত হোক্, বা মৃত হোক্, দূরে থাকুক বা নিকটে থাকুক—জগতের শেষ-প্রান্ত থেকে, ইতিহাসের গহন রসাতল থেকে সে আপনার ডাকে এখানে এসে উপস্থিত হবে।"

ডাক্তারের কথা-মত কোণ্ট জল-পাত্রের উপর ঝুঁকিয়া রহিলেন। একটু পরেই তাঁহার দৃষ্টির প্রভাবে, পাত্রের জল বিক্ষুব্ধ হইয়া 'ওপাল'-মণির বর্ণ ধারণ করিল, জল-পাত্রের কিনারাটা পেলোয়ারি কলমে বিশিষ্ট বিচিত্র বর্ণচ্ছটায় বিভূষিত হইল তাহা যেন একটা ছবির ফ্রেমের মত হইল। ছবি আগেই আঁকা হইয়া গিয়াছে—কেবল উহা সাদাটে মেঘে আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে।

ক্রমে কুয়াশাটা মিলাইয়া গেল। অমনি স্বচ্ছ জলের উপর এক তরুণীর ছবি ফুটিয়া উঠিল। পরিধানে আলখাল্লার ন্যায় একটা শিথিল পরিচ্ছদ, নেত্রযুগলের বর্ণ সমুদ্র-হরিৎ, কুঞ্চিত স্বর্ণ-কুন্তল, পিয়ানোর পর্দা-গুলোর উপর চঞ্চল সুন্দর হাতদুটি ছুটিয়া বেড়াইতেছে। ছবিখানি এমন চমৎকার আঁকা যে, তাহা দেখিলে গুণী চিত্রকরেরাও ঈর্ষান্বিত হইয়া যাইত।—

ইনিই রাণী প্রাস্কোভি লাবিনস্কা; কোণ্টের আবেগময় আহ্বান শুনিয়া আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। ডাক্তার, কোণ্ট ওলাফের হস্ত গ্রহণ করিয়া সম্মোহন-জল-পাত্রের একটা পায়ার উপরে উহা স্থাপিত করিলেন। বৈদ্যুতিক চুম্বক-শক্তিতে ভরা ঐ ধাতুখণ্ড একটু স্পর্শ করিবামাত্র কোণ্ট যেন বজ্রাহত হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেলেন।

ডাক্তার উঁহাকে বাহুর দ্বারা জড়াইয়া ধরিলেন, এবং হাল্কা পালকের মতো উঠাইয়া লইয়া একটা পালঙ্কের উপর শোয়াইয়া দিলেন। তারপর ঘণ্টা বাজাইয়া ভৃত্যকে ডাকিলেন। ভৃত্য দরজার চৌকাঠে আসিয়া দাঁড়াইল। ডাক্তার বলিলেন—

"অক্টেভকে এখানে নিয়ে আয়।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

জন্তু-সভা

বা

জন্তুজাতীয় মহাসমিতি

জন্তু-সভার প্রথম অধিবেশনের অস্থায়ী সম্পাদক সজারুর চতুষ্পদীকা টিপ্পনী যথা:—

(প্রস্তাবনা)

সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা—এ কেবল কথার কথা। জীব-সৃষ্টি হয়ে অবধি, মত আর সেই আদিকালের বদ্দিবুড়ি থেকে আরম্ভ ক'রে এ-পর্যন্ত মানুষরা মুখেই ব'লে আসছে 'জীবে দয়া,' কিন্তু কাজের বেলায় আমাদের কাউকে দেখে জীভে তাদের জল আসে—চোখে নয়, এটা জানা কথা, কাজেই মানুষ যতই জীভ,

নেহে বলুক 'জীবে দয়া', করছে ঠিক এর উল্টোটা। এই কারণে যত জীব-জন্তু, এমন-কি পোকামাকড় তারা পর্য্যন্ত জ্বালাতন হয়ে উঠেছে। এক্ষেত্রে মানুষের সঙ্গে আর ভাব রাখা চলে না, বাস্তবিক মানুষের চেয়ে আমরা কমটা কিসে যে চিরদিন তাদের শাসনে চলতে হবে, হুকুমের চাকর?

মানুষদের সঙ্গে কোনো আর বাধা-বাধকতা না রাখাই স্থির ক'রে, ছোট-বড় সব জানোয়ার মিলে এক সভা গঠন করা গেছে, যার নাম হচ্ছে—সর্ব্ব তাড়না জান্তব হিতকরী জাতীয় মহাসমিতি বা জেন্তু-সভা।

ইতিমধ্যেই সভাটির প্রতিষ্ঠা হয়ে গেছে। গত পূর্ণিমায় আলিপুরের সরকারি চিড়িয়া-খানার গোল-চানকাতে এই সভার প্রথম অধিবেশনের বন্দোবস্ত করা গিয়েছিল, কেননা পৃথিবীর জীব-জন্তুকে একত্র করার পক্ষে এমন স্থান আর দ্বিতীয় নাস্তি। একথা বলাই বাহুল্য যে, সেদিনের সভার কার্য্য পাগৰ প্রথা-মতো যতদূর সম্ভব বাধাড়ম্বর ইত্যাদি দ্বারায় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ক'রে তোল্‌বার জন্যে প্রাণপণের ত্রুটি করেনি।

(অভিভাষণ)

স্বাধীনতার মহামন্ত্রে অনুপ্রাণিত হয়ে মহাপুরুষ বীর বনমানুষ—তিনি উৎপীড়িত জীব জগৎকে মুক্তি দিতেই যেন বাসন্তী পূর্ণিমার দিনে গভীর রজনীতে বিশ্ব যখন ঘুমে ঘুমায়িত, সেই শুভমুহূর্তে পশুশালার তালাবদ্ধ লৌহ-পিঞ্জরাবলীর অর্গলাদি ও লৌহ-শলাকা-সঙ্কুল শৃঙ্খলাবদ্ধ দ্বারাদি উন্মুক্ত ক'রে দিয়ে গেলেন। আজীবন বন্দী, চিরদিন বদ্ধ জীব মুক্তির মধুরাস্বাদ পেয়ে বীর-রসের রুধিরা-স্বাদে বলীয়ান হ'ল ও উন্মুক্ত আকাশ-তলে পুনরায় দাঁড়িয়ে সিংহনাদ হ্রেষা বৃংহিত চীৎকার চিচিকার করে একে একে এসে জান্তবীয় ভৈরব চক্রে স্ব স্ব স্থান অধিকার ক'রে বস্‌ল। জাতি-নির্ব্বিশেষে গৃহপালিত গবাদি চক্রের সম্মুখ ভাগে, শার্দ্দূলাদি বন্যগণ চক্রের পশ্চাতে এবং সরীসৃপাদি ভূচরগণ চক্রের তলদেশ ও জলচর খেচরগণ চক্রের ঊর্দ্ধদেশ আশ্রয় করলেন, আর বিরাট এই জেন্তু-সভার কার্য্যাবলী নিরীক্ষণ করবার মানসেই যেন চন্দ্রমা সেদিন পূর্ণকলায় উদ্ভাসিত হয়ে, অন্ধকার তরুশিখর ছাড়িয়ে ক্রমে আকাশে আরোহণ করতে থাক্‌লেন। (সাধু সাধু) মানুষদের মধ্যে রাষ্ট্র নীতি সমাজ-সংস্কার এমনি-সব ব্যাপার নিয়ে বিরাট সভা অনেক হয়েছে এবং সে সব সভায় খিটিমিটি ঝগড়াঝাটি হাতাহাতি গালাগালি এমন-কি জুতো-মারামারিও হ'তে বাকি নেই, কিন্তু জন্তু আমাদের এই জেন্তু-সভায় বড় বড় হাতী-ভাল্লুক ঘাড়-জাঁড়াদের কথা দূরে থাক্, মশা মাছি টিকটিকিটি পর্য্যন্ত যে শান্ত-শিষ্ট ভাব দেখিয়েছেন তা কোনোকালে কোনো সভায় গিয়ে মানুষ পারেনি, পারবেও না। হেড়েকোর ডাকের মধ্যে কে-জানে সেদিন কেমন-একটি অপূর্ব্ব-কোমল সুর লেগেছিল অনুগানের তিন সপ্তকে যতগুলি কোমল-কালো সুর সবগুলি একই সঙ্গে। আর রাজহংসের গলা থেকে কড়ি সুরের ঝরণা কারুণ্যরসে সবাইকে বিগলিত প্রায় ক'রে দিয়েছিল। (বেশ, বেশ, আহা!)

প্রার্থনা

কী অপূর্ব্ব সঙ্গীত, কী স্বর্গীয় সুধাময় সুস্বর! আহা কী দেখ্‌লেম, কী শুন্‌লেম, জীবন ধন্য হ'ল, আত্মা পবিত্র হ'ল, দেহ মন জুড়িয়ে গেল! শান্তিঃ, শান্তিঃ, চারিদিকে শান্তিঃ। উত্তরে শান্তি, দক্ষিণে শান্তি, পূবে শান্তি, পশ্চিমে শান্তি, ঊর্দ্ধে শান্তি, অধে শান্তি, ভিতরে শান্তি, বাহিরে শান্তি, অন্তরের অন্তরে গভীর প্রেম বিপুল শান্তি। হে পশুপতি, তুমি কত করুণাময়, তুমিই ধন্য, ধন্য তোমার সৃষ্টি, অবোধ অবোলা জীবজন্তুদেরও প্রাণে এত মায়া, এত ভালোবাসা, এত প্রেম, এমন গভীর পরহিতৈষণা—আহা! মানুষ দেখ, শেখ, ধন্য হও, শান্তিময় জীবংচাতু, সঙ্গীত!

জাতীয় সঙ্গীত

আর না—আর না—
ভালোরে তোলো ফণা—মেলোরে মেলো ডানা
আর না—আর না—
হাম্বর হাম্বর গবজনে,
কাঁপুক অম্বর ক্ষণে ক্ষণে,
ত্রাসিত মানব রণে-বনে
উঠুক ভীষণ কান্না,
আর না—আর না—
(কোরাস)
খাপদাম্বিনী, মাপহাম্বিনী,
শিংঅশালিনী গো!
নখমালিনি হো
ম্যা ম্যা পাঁ পোঁ
পিচকৃচক্ কাঁ্য কোঁ। (করতালি)

ঘুণাক্ষর রিপোর্ট

সভার আরম্ভেই ছোট-বড় খাদ্যখাদক অভেদে সমস্ত জীব-জন্তুতে মিলে কোলাকুলি, সে এক অদ্ভুতপূর্ব্ব অভাবনীয় দৃশ্য, সকলেই এমন আবিষ্ট হয়েছিলেন যে আলিঙ্গন-চুম্বনের হুলোড় হয়ে গেল! আর কোলাকুলি গলাগলি পাকড়া-পাকড়ি থেকে দু-একটা রক্তপাত যে ঘটেনি, তা নয়। আমাদের শৃগাল ভায়া এমনি প্রেমভরে পাতি-পুকুরের কাঁস গিরির গলা জড়িয়ে ধরেছিলেন যে, তাতে ক'রে গিরির সরুগলা তখনি বাতাহত মৃণাল-দণ্ডের মতো ভেঙে পড়্‌লো, নেকড়ে-বাঘের সঙ্গে কোলাকুলিতে ভেড়ার, আর গো-বাঘার সঙ্গে জাপ্‌টা জাপটিতে ঘোড়ার সেই একই দশা হয়েছিল। প্রতিপক্ষেরা হয়তো বল্‌বেন, যে খায় আর যাকে খায় এ দুজনে কো লাকুলি কর্‌তে গেলেই এই ফল, কিন্তু আমরা জোরের সঙ্গে বল্‌তে পারি প্রেমের আতিশয্যই হচ্ছে এই সামান্য দুর্ঘটনার মূল, তাছাড়া বৃহৎ কাজে এমন হয়েই থাকে। সুতরাং এ-সব ছোটখাট দুর্ঘটনাতে মন না দিয়ে সভ্যগণকে সভার কাজ চালিয়ে যেতে অনুরোধ ক'রে গগনভেদপক্ষী—তিনি তারস্বরে যে তিন মহাপ্রাণ জীব জেন্তু-সভার সূত্রপাতেই স্বাধীনতার জন্যে প্রাণ দিলেন, তাঁদের অমর আত্মার কল্যাণের জন্য পশুপাত-স্তোত্র পাঠ ক'রে এক মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতা কর্‌লেন।

জার্মেনের মহাহবিব খেতহস্তীর 'সর্ব্বজীবে দয়া' নামে প্রবন্ধ পাঠ এবং জীব হিংসা-নিবারণ-কল্পে এক পিঞ্জরাপোলের প্রস্তাব করার কথা ছিল, কিন্তু বক্তৃতা-মঞ্চে

ভূঁড়ি যাব মুখেই তাঁর গোদা-পায়ের চাপনে একটা উইঢিপি নাম পিপীলিকা-বংশ ধ্বংস হয়ে গেল, যেহেতু হস্তী। সেটা খবরই হ'ল না। কোলা ব্যাং কট্‌কট্ ক'রে দু'কথা শুনিয়ে হস্তীর দৃষ্টি এই দুর্ঘটনার দিকে আকর্ষণ করায়, সেই ঠোকায় নিকায় পাঠ ক'রে অনুতাপ করতে থাকলেন, কাজেই তাঁর ঐ প্রস্তাব-দুটোই আর সভাতে উপস্থিত করা হ'ল না।

শেষ

পরিশেষে বক্তব্য যে, তোতারাম বাবাজী যেমন কইলেন, সম্পাদক সজারু চতুষ্পদীতে তাই লিখে দিলেন। এই রিপোর্টে অবিশ্বাসের কোনো কারণ নেই, কেননা এ জানা কথা যে, তোতা—তিনি যা শোনেন তাই আউড়ে যেতে একেবারে পাকা। আর মাছি, তিনি মাছি-মারা কাপি যখন নিয়েছেন, তখন এতে ভুল-ভ্রান্তি নাই বল্লেও চলে। সেই আমাদের বক্তব্যের পাত্র মাছি ও তোতারাম, তাদের আসল নাম-ধাম প্রকাশ করা গেল না, কেননা ইদানীং তাঁরা রাজনীতি সমাজনীতি এ সব থেকে আড়ালে আবডালে থাকাই মানস করেছেন, কেবল আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধেই এবারের মতো এঁরা আমাদের সভায় রিপোর্টার ও ক্যাপিষ্টে পদ গ্রহণ ক'রে-ছিলেন। অপর পৃষ্ঠায় তোতারামের বিস্তারিত রিপোর্ট প্রকাশিত হ'ল। ইতি

অস্থায়ী সম্পাদক
সজারু

জন্তু-সভার বিস্তারিত বিবরণী

চট্টগ্রামের কুঁকড়ো, কালেজ-স্কোয়ারের তোতা-পণ্ডিত এবং মিষ্টার হনুম্যান অফ্ কলা-গাছি দ্বারায় লিখিত ও প্রকাশিত।

সভার স্থান—আলিপুর চিড়িয়াখানার গোলবাগিচা।

কাল—ইলেবন্ থার্টি পি-এম, মুনডে, সাউথ মে পাঁচুখালি।

কার্য্য-তালিকা—(ক) সভাপতি-নির্ব্বাচন। (খ) মানব-জাতিকে জাতিচ্যুত করার প্রস্তাব এবং তদ্বিষয়ে কি উপায় অবলম্বনীয়। সে বিষয়ে গবেষণা। যাহারা মানব-জাতির দফা-রফায় মত দিবেন, তাঁহারা বামহস্ত উঠাইবেন, যাঁহারা মানব জাতির সহিত রফা করিয়া চলিতে চাহেন, তাঁহারা দক্ষিণ হস্ত উঠাইবেন। (গ) প্রধান প্রধান বক্তাগণের নাম—সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, হস্তী, হরবোলা, শৃগাল, কুক্কুর ইত্যাদি (ঘ) চিড়িয়াখানার ডাক্তারদের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ ও তাঁহার স্মৃতি-রক্ষার জন্য চাঁদা-সংগ্রহ এবং মৃত ডাক্তারের স্থানে মানুষ না হইয়া ঐ পদে কোনো পশু কেন না বসেন, এই মর্ম্মে পার্লামেণ্ট মহাসভায় শোকপ্রকাশকারী এক ল্যামেণ্টেশন্ দরখাস্ত প্রেরণ ও এদেশে রীতিমত আজিটেসন্ বা আন্দোলন করার প্রস্তাব।

সুচিখোলার থেকে আরম্ভ ক'রে যেখান-কার যত মধুর আর রকের পালক-ধারীদের চিড়িয়াখানা আছে, সবগুলো থেকে মোড়ল মাতব্বর নামজাদা খগেন্দ্রগণ তো এসেছেনই, তা ছাড়া ঝাঁটা-গোঁফ লম্বাদাড়ি খাড়িখাজা চুলোপুঁটি মাকড়-খোকড় ফিড়িং-ফাড়িং কাগা-বগা কেউ আর আসতে কসুর করেন নি।

আলিপুরের অত-বড় যে বাগান, তার

অলি-গলি মাঠ-ময়দান একেবারে জীবে জীবারণ্য হয়ে গেছে—শিং ঝুঁটি আর ল্যাজে গিস্ গিস্ করছে, কিন্তু সভার পূর্ব্বদিনে চিড়িয়াখানার সিবিল-সার্জ্জনের হঠাৎ মশার কামড়ে অকালে মৃত্যু হওয়ায় সকলের মুখেই—এমন-কি উদ্যানের তরু-লতাগুলির উপরেও—যেন কি-যেন কি-একটা বিষাদের ছায়া পড়েছে। ওর মধ্যে যারা ডাক্তারকে আন্তরিক ভক্তি-শ্রদ্ধা করতেন এমন-সব সুসভ্য জানোয়ার, তাঁরা অশৌচ চিহ্ন কাছা প'রেই এসেছেন আর দাম্‌ড়া নব্য জানোয়ারের দল, তারা কাছা-কোঁচা তুচ্ছ বর্জ্জন ক'রে বাহুর উপরে কালো এক-একটুকরো ফিতে লাগিয়ে গোমসা মুখে এদিক ওদিক করছে। এখানে-ওখানে চোম্‌রা-চোম্‌রা সভ্য অন্তরা দল বেঁধে খুব উৎসাহের সঙ্গে "সভার কাজ" কি ভাবে চল্‌বে, কি কি নিয়ম-কানুন হবে, কাকেই বা সভাপতি করা যাবে, এই-সব নানা দরকারী তর্ক-বিতর্কে ব্যস্ত রয়েছেন। হেট্‌-কোট্‌-চশমাতে ফিট্‌ফাট্‌ মিষ্টার হনুমানকে আস্‌তে দেখে গাছতলায় বনমানুষ ব'লে উঠ্‌লেন,—"ইনি যে মানুষের নিকট-সম্পর্কে কেউ, সেটা বোঝাতে এঁর যে বিশেষ চেষ্টা রয়েছে তা বেশই বোঝাচ্ছে উঁর বেশ।"

বহুরূপী বল্লেন—'মানুষের অনুকরণটা কিন্তু করেছে দিব্বি।'

বনমানুষ চোখ মট্‌কে বল্লেন—'অনুকরণ এক, আর হনুকরণ অন্য জিনিষ।'

ঘাসের মধ্যে থেকে সাপ ফোঁস ক'রে ব'লে উঠ্‌ল—'ইস্, ভঙ্গিমা দেখ! লজ্জা নেই, ছস্!'

বুড়ো দাঁড়কাক গাছের উপর থেকে জবাব দিলে—'ছ্যাঃ, মানুষের চাল-চোল বাঁদরে কখনো সাজে? ভারতচন্দ্র তো স্পষ্টই ব'লে গেছেন 'যার যাচা তারে সাজে'।'

হুতুম-পেঁচা দাঁড়কাককে সাধুবাদ দিয়ে হনুর দিকে চেয়ে কেবলি বল্‌তে থাক্‌লো—'হুয়ো হুয়ো, সাত-নকলে আসল ভেস্তা।'

গোদাচিল সে ছড়াও জানেনা পড়াও পড়েনা, কিন্তু তবু কাক আর পেঁচার দিকে চেয়ে গম্ভীরভাবে ঘাড় নাড়্‌ছে দেখে, হর-বোলা পাখী চিলকে ঠেস্ দিয়ে ব'লে উঠ্‌লো—'পণ্ডিতে পণ্ডিতে যুদ্ধ-সমস্যা পুরায়, মূর্খে নাহি বুঝে তাহা ফুল-ফুল চায়!' বহুরূপীর বিশ্বাস ছিল রংতামাসায় তার মতো কেউ নেই, কিন্তু হরবোলা গোদাচিলের সঙ্গে ভালো রং ক'রে নিলে দেখে হিংসেতে বেচারা প্রথমে আগা-গোড়া রাঙা—তারপর একেবারে নীলবর্ণ হয়ে গেল।

এই সময় ধ্যান ভেঙে কচ্ছপ খোলা থেকে মুখটি বার ক'রে ব'লে উঠ্‌লেন—'বুঝেচো কিনা, জীবনটা অতি-প্রকাণ্ড একটা স্বপ্ন-বিশেষ, এরি-জন্যে আবার ঝগড়া-ঝাটি মারা-মারি! আপনার মধ্যে আপনি একবার তলিয়ে দেখ দেখি, জগৎই বা কি তুমিই বা কে আর—জগৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি'—ব'লেই কচ্ছপ ঘুমিয়ে পড়্‌লেন। আকাশ থেকে একদল তাল-চড়াই কিচ্‌মিচ ক'রে ব'লে উঠ্‌লো,—'হেসে খেলে নাওরে যাদু মনের সুখে।' নতুন-পালক-ওঠা পিঁপড়ে, পোষা-যায়-না এমন মিহি সুরে একবার বল্লে—'কবে যাবে তুমি শিঙে ফুঁকে,' তারপরেই সে আকাশে উড়ে পড়্‌লো আর সঙ্গে সঙ্গেই তার পীপ্‌ড়ে-লীলাও সাঙ্গ হ'ল। ঝিঁঝোঁ-পোকা

এই দেখে ঝাঁটা-গোঁফ ফুলিয়ে আওড়ালে—
'পীঁপ্ড়ের পালক ওঠে মরিবার তরে।'

এইবার সভার কার্য্যারম্ভের ঘণ্টা পড়্লো। জীব-জন্তু যে যেখানে ছিলেন একে একে গোল চান্‌কাতে এসে তালি দেবার জন্যে লেজ আর বক্তৃতা শোন্‌বার জন্যে কান খাড়া ক'রে বসলেন। সবাই চুপচাপ রয়েছেন, এমন সময় গাধা, তিনি হঠাৎ 'গোল হচ্চে' ব'লে চীৎকার ক'রে উঠ্‌লেন। একটা কানা মাছ ছাড়া গাধার কাছে আর কেউ গোল শোনে নি, গোল চানকাতে সবাই গোল হয়েই চুপচাপ বসেছিল। কিন্তু তবু গাধা 'চোপ চোপ' শব্দে আসর সরগরম ক'রে তোল্‌বার চেষ্টা করতে থাক্‌লেন। গাধার বন্ধুবান্ধবরা মিলে তাঁর জন্যে একটা বক্তৃতা লিখে দিয়েছিল, কেবল গলার জোরেই তিনি সবাইকে মাতিয়ে তুল্‌তে পারবেন এই বিশ্বাসে প্রথম বক্তৃতার ভার গাধার উপরেই পড়েছিল। দু চারজন দুষ্টু জন্তু কাণাকাণি করতে লাগ্‌লো কেমন ক'রে পিছন হটে উন্নতির পথে অগ্রসর হ'তে হবে, গাধা এই বিষয়েই বল্‌বেন। যাহোক গর্দ্দভ, কে কোথায় বাহবা দিচ্চে তার একটুও হাততালি যেন না এড়িয়ে যায় এই মৎলবে দুই কান খাড়া ক'রে, লেজ নেড়ে বক্তৃতা সুরু কর্‌লেন।

"লম্বাকান জাত্‌ভাইগণ, চার-ঠেং দুই-ঠেং স্বদেশী-বিদেশী পাড়াপড়্‌সী ও বনবাসিগণ, আজিকার এই জন্তু-সভায় সভাপতি নির্ব্বাচন হ'ল একটি প্রধান কাজ। এটা কারো জান্‌তে বাকি নেই যে যিনি আজ এ সভায় সভাপতি হবেন, তাঁকে গুরুতর কাজের ভার নিতে হবেই হবে। মানুষের কাছে দাসত্ব করতে করতে দুঃখের বোঝা বইতে বইতে আমাদের চারখানা পা ভেঙে পড়বার যোগাড় হয়েছে, পিঠ ধনুকের মতো বেঁকে গিয়েছে, এ অবস্থায় সব জীবের ভার লাঘব ক'রে নিজের স্কন্ধে নিতে পারে এমন-একজন আমি ছাড়া আর কে আছে? আমরা চতুর্দ্দশ পুরুষেরও চতুর্দ্দশ-পুরুষ ধ'রে ভারই বহন ক'রে আস্‌ছি, দেবতা থেকে ধোপার মোট পর্য্যন্ত কি না আমাদের বইতে হচ্চে, ভার বইতে বইতে পিঠে কড়া পড়ে গেল এমন যে, সেটা বংশগত একটা গুণের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেল আমাদের। অতএব এস আর্ত্ত আত্মীয়-কুটুম্ব, এস দেশী-বিদেশী পাড়াপড়্‌সী, যে যেখানে আছ সবাই মিলে সভাপতির গুরু-ভার আমার উপরে চাপিয়ে দাও, আমি অনায়াসে তোমাদের সব কার্য্যভার, বিপদভার, আপদভার, আনন্দ-ভার গ্রহণ করছি, দাও। এটা তোমাদের ভাবনা ক'রে বসতে হবে না যে, যেমন সইতে তেমনি বইতে, তেমনি আবার গোঁসা ক'রে নিজে গোঁ বজায় রাখ্‌তে আর কিছুর উপরে পদাঘাত করতে, গাধার মতো আজন্ম-সিদ্ধ কেউ নেই—"

গাধা ব'লে চলেছেন এমন সময় জীরাফ্‌ তাঁর রেলের মতো গলাটা উঁচিয়ে ব'লে উঠ্‌লেন —"চিরটাকাল মানুষের গোলামি আর ময়ের বাড়ীর যাত্রীদের গাড়ী টেনে এসে এখন জেন্তু-সভার সভাপতি হ'তে চায় গাধা, এ কি আস্পর্দ্ধা!"

জীরাফের কথায় গাধা ভীষণ চটে অভ্যাস-মতো জোড়াপায়ে লাথি চালাতে যাবেন, এমন সময় ভল্লুক 'থামো থামো' ব'লে এক ধমকে গাধাকে বসিয়ে দিয়ে নিজে বল্‌তে সুরু কর্‌লেন—

"ভাই সকল, একে এই কল্‌কাতার দুরন্ত গরমে তিষ্ঠানো ভার, তার উপর তোমরা সবাই যদি গরম হয়ে উঠে হাতাহাতি লাথা-লাথি করতে থাক, তবে আমাকেও পৃথিবীর শেষ বরফের দেশে ফিরে যেতে হবে, যাবার পূর্ব্বে দু-চার চড়া কথা শুনিয়ে। বরফের দেশে তিমিসিম্ আমি যথেষ্ট খেতে পাই, কেবল তোমাদের মুখ চেয়েই আমি কষ্ট ক'রে—এক রকম উপোস ক'রেই—এখানে কাটাচ্ছি, এখন সবাই যদি মানুষের মতো অগ্নিমূর্ত্তি হয়ে এই সভার মধ্যেকার এবং প্রত্যেকের প্রাণের মধ্যেকার জমাট প্রেমের ক্ষীণধারাটি পর্য্যন্ত শুকিয়ে ফেলবার চেষ্টা কর, তবে ভালো হবে না বলছি।"

বরফের দেশের ভালুকের গলা পেয়ে উত্তর আর দক্ষিণ সাগরের 'শীল'মাছগুলো কাঁপছে দেখে, সিংহ 'চোপরও' ব'লে ভল্লুককে থামিয়ে দিলেন। এই ফাঁকে রতা-শেয়ালটা কখন্ গিয়ে বক্তার মাচায় উঠে জাঁকিয়ে বক্তৃতা আরম্ভ ক'রে দিলে! দু-এক কথায় শেয়াল সব জানোয়ারদের বুঝিয়ে দিলে যে, পশুপতির যেমন ত্রিশূল, ইন্দ্রের যেমন বজ্র, প্রজাপতির যেমন কমণ্ডলু, তেম্‌নি সভাপতির একটা অস্ত্র হচ্ছে ঘণ্টা, আর সেই ঘণ্টা একমাত্র ধর্ম্মের ষাঁড়ের গলাতেই ঝোলানো দেখা যাচ্ছে, অতএব ষাঁড়ই সভাপতি হবার একমাত্র উপযুক্ত পাত্র!"

সর্ব্বসম্মতিক্রমে ষাঁড়ই গলঘণ্টা আর গল-কম্বল দুলিয়ে সভাপতির আসনে গিয়ে বস্‌লেন। ডালকুত্তো এতক্ষণ ঘুমিয়েছিল, ঘণ্টার শব্দে হঠাৎ চম্‌কে উঠে ভাব্‌লে তার মনিব আফিসের বাবুকে ডাকতে বুঝি ঘণ্টা দিলেন, অম্‌নি কুত্তোটা 'কোই হায়' ব'লে হাঁক দিয়ে চারিদিক চাইতে লাগ্‌লো। কুত্তোর রকম দেখে নেকড়ে-বাঘ একবার নাক সিঁট্‌কে মুখ ফেরালে। বেরাল হাঁসের একটা কলম কেড়ে রাক্তের শিশিয়ে ডিজে গা একবার ঝাড়া দিয়ে, সট্‌পট্ নোট নিতে লেগে গেল। তোতাপাখী গিয়ে বক্তা আর শ্রোতা দুইজনের মধ্যে বসে রিপোর্ট নিতে লাগ্‌লেন—

এইবার রক্তমাখা কটা-চুল সিংহ ঝাঁকড়া মাথা ঝাড়া দিয়ে গম্ভীর মুখে সভার মধ্যিখানে উঠে বলতে শুরু করলেন। যেন মেঘ ডাকছে এম্‌নি গুরু-গম্ভীর আওয়াজে সিংহনাদ ক'রে তিনি মানুষের অত্যাচার আর অবিচারের কথা বর্ণনা ক'রে বল্লেন—"এই মানুষের হাত থেকে বাঁচ্‌বার এক রাস্তা, আর সে রাস্তা তোমাদের সবার জন্তে খোলা রয়েছে! এস আমার সঙ্গে জন-মানব-শূন্য সুদূর খাণ্ডব বনে। অতি-নির্জ্জন সে স্থান তেপান্তর মাঠে ঘেরা, মরুভূমির মধ্যেকার ওয়েসিস্ সেটি, বর্ব্বর মানুষগুলো তার ত্রিসীমানায় যেতে পারে না এমন দুর্গম ভীষণ সে স্থান! মানুষের যত বড়াই লোকালয়ের চারখানা দেওয়ালের মধ্যে, ফাঁকায় আর নিরালায় পেলেই আমরা তাদের ঘাড় মট্‌কে রক্ত পান করি।"—এই সময় বাঘের দিকে চেয়ে একটা গরু হুবার গলা-খাঁকানি দিতে, সিংহ একটুখানি মুচ্‌কে হেসে বল্লেন—"এ-কথা আমি কাউকে ইঙ্গিত কিম্বা ঠেস্ দিয়ে বল্‌ছিনে, সত্যিই বলি মানুষের মধ্যে সিংহ-বিক্রম এমন কে আছে যে রণে বনে আমাদের সামনে এগোতে পারে!"

সুন্দর-বনের বাঘ এই শুনে কাষ্ঠহাসি

হেসে খাঁটা-গোঁফ দু'বার মুচড়ে একবার ভাঙা গলায় বাহবা ব'লে হাততালি দিলে তারপর সিংহ মরুভূমির চমৎকার শোভা শান্তি মুক্তি আর নির্ভর আনন্দময় জীবনের একটি বিচিত্র বর্ণনা দিয়ে বক্তৃতা বন্ধ করলেন।

হাতি উঠে প্রস্তাব করলেন যে, সকলকে নিয়ে ছোট-নাগপুরে নাগাপর্বতে যাওয়াই ঠিক, কেননা সেখানে হাতি চোখের গাছ যথেষ্ট পাওয়া যায়, দাঁতে চিবিয়ে খাবার সামগ্রীর কোনদিন কারুর অভাব হবে না, তবে খাবার-জলের একটু কষ্ট হবে, কিন্তু যদি উট মোষ হাতি আর মশা এঁরা মোষক কুজো পিচকিরি আর নল ভ'রে ভ'রে পাহাড়ে তুলে দেন, তবে জলার জল সমস্তই পাহাড়ে গিয়ে উঠবে জালা জালা, আবের জল কষ্টও সঙ্গে সঙ্গে দূর হবে।'

হাতির প্রতিবাদ ক'রে জল-হস্তী ব'লে উঠলেন—"জলার জল জলাতে থাকলেই মঙ্গল, মিষ্টিও থাকবে ঠাণ্ডাও থাকবে, নয়তো হাতিরা সবাই গিয়ে জলায় জল তুলতে নামলে জল কাদায় এমন ঘোলা হবে যে, সে জল কারুর আর মুখে দিতে হবে না।'

কুকুর এই সময় হঠাৎ মাথা গরম ক'রে চেঁচিয়ে উঠলো—"তোমরা যাই বল আমি বো বলি, সহরে থাকায় যেমন সুখ এমন আর কোথাও নয়।"

গো-বাঘা, নেকড়ে আর হেড়েল তিনজনে পড়ে কুকুরের কোটের লেজ ধ'রে টেনে বসালে। তখন সুন্দর-বনের বাঘ হুঙ্কার দিয়ে মাচায় লাফিয়ে উঠে লেজ আছড়ে বক্তৃতা আরম্ভ করলে—"আমরা লড়াই দেবো, খুন জখম রক্তপাত করবো, মানুষের জাত-কে জাত পৃথিবী থেকে লোপ ক'রে দেবো। এসো সব বড় বড় জানোয়ার সেনাপতি হয়ে এগিয়ে এসো, আর ছোটখাটো জীবজন্তু, তোমরাও ভয়ে পিছিও না।' ছোট হ'লে কি হয়, গ্রীসের ইতিহাস যদি পড়ে দেখ তবে দেখবে, অত-বড় 'টেবাগোনা' তাকেও জনকতক খরগোস মিলে রসাতলে পাঠিয়েছিল, বীর আলেকজান্দার তুচ্ছ একটুখানি মশের গোয়ালার কাছে পরাভূত হ'লেন, আর আমাদের হনুমান বানরের লঙ্কা দগ্ধ করলেন, কাঠবেরালী সমুদ্র বাঁধলেন, এতটুকু লাঙলের ফলায় অতবড় সত্রু-বংশটা ধ্বংস হয়ে গেল। ঝোপ বুঝে কোপ মারতে পারলে টুনটুনিও হাতিকে সাবড়ে দিতে পারে, আর আমরা মানুষগুলোকে নির্বংশ করতে পারবো না? আর নিস্তার নেই, জগৎ-জোড়া মানব রাজত্ব এতবারই শেষ হ'ল দেখছি। দুরন্ত মানুষ বন সব কেটে কি অত্যাচারই না করছে জন্তুদের উপরে। আমাদের ঘর-ছাড়া করছে, জঙ্গল জ্বালিয়ে দিচ্ছে, মাঠ সব চষে ফেলছে। নিজেদের ঘর ওঠাতে, ক্ষেত বসাতে, গলিজ সহর ওঠাতে, রেলগাড়ী চালাতে, চুলো ধরাতে, গোরূপা পৃথিবী—যিনি জীবজন্তু সবার মায়ের তুল্য, তাঁরও বুকে লাঙল আর কোদাল বসাতে মানুষ একটুও ইতস্ততঃ করছে না, আর নিজের গায়ে শক্তি বাড়াবে ব'লে মানুষ খাড় মটুকে পুড়িয়ে ঝলসে পাখী থেকে আরম্ভ ক'রে জলের তলাকার শুগ কীটা পর্য্যন্ত—কার মাংস যে না খাচ্ছে তাতো জানিনে। দুহাতে ডাইনে-বাঁয়ে মানুষ সব জন্তুকে খুন ক'রে চলেছে। হরিণ আর বাঘ মেরে ছাল ছাড়িয়ে নিয়ে তার উপরে বসে

যোগ যাগ না করলে তাদের ধর্মকর্মই হয় না, জলের কুমীর ডাঙার বাঘ মেরে এদের নখের ছুরিকবচ ধারণ ক'রে আর আমাদের চর্বি মালিশ ক'রে, তারা নিজেদের গায়ের বাত সারাতে চলে। চিড়িয়াখানায় আমাদের বন্ধ রেখে তারা মজা দেখে, আর বেস্ত অবস্থায় খাঁচায় বন্ধ থেকে যখন আমরা আধপেটা খেয়ে খেয়ে শুকিয়ে মরি, তখন আমাদের ছালখানার মধ্যে খড় পুরে যাদুঘরে কাচের সিন্দুকে, আর নানা ভঙ্গীতে সংগ্রহ মতো আমাদের সাজিয়ে রাখে, এমনি বজ্জাত মানুষগুলো। দাও তাদের ঘাড় মটকে, খাও তাদের মাথাগুলো কড়মড়িয়ে চিবিয়ে।"

বাঘের বক্তৃতা শুনে কচি পাঠাগুলোর চোখ দিয়ে দর দর ক'রে জল পড়তে লাগলো, দেখে বাঘের নিজের জিভেও জল এলো, বাঘের নখগুলো এতক্ষণ থাবার মধ্যে গুটিসুটি হয়ে বসেছিল, পাঁঠার ভক্তি দেখে ধারালো সব নখ যেন সেই ছাগলছানাদের আশীর্বাদ করার জন্যে বেরিয়ে এল। বাঘ ভাবে গদ গদ হয়ে ছাগলটির দিকে হাত বাড়িয়ে ব'লে চল্লেন—"আহা বাছা কাঁদবে বইকি, মানুষ নিজের ছেলে মেয়ের বিয়েতে তোমার মা-বাপ দুজনকেই কালিঘাটে হাড়কাটে বলি দিয়ে নিজের জ্ঞাতি-ভোজন করিয়ে যথেষ্ট আমোদ পেয়েছে, লেজা মুড়ো ছাল চামড়া এমন-কি ক্ষুর-কখানাও তারা ফেলতে দেয়নি, এমন চেটেপুটে তারা পাঁঠার ঝোল খেয়ে গেছে যে আমি যে বাঘ—আমিও তেমনটি করতে লজ্জা পাই; কি লজ্জা কি লজ্জা! এই সসাগরা পৃথিবী তো এককালে আমাদেরই ছিল—তখন তো কোনো বালাই ছিল না—খাও দাও সুখে ঘর কন্না করো। মানুষ যেমনি এল অমনি সঙ্গে সঙ্গে এল তীর বন্দুক, আর এল হঠাৎ মৃত্যু, হঠাৎ অপঘাত মৃত্যু, অপমৃত্যু, দুঃখ-শোক, ভয় ভাবনা আর যন্ত্রণা বনবাসীদের অদৃষ্ট। বন্ধুগণ, একতার ধ্বজা তোলো, ছেড়ুবিড সব লেজ ঊর্দ্ধ আকাশের দিকে, বল একসুরে 'জয় জীব জন্তু জঙ্গলম্।' চুলোয় যাক্ মানুষের প্রতাপ।" হালুম হালুম ক'রে তিনবার হাঁক দিয়ে বাঘ আসন গ্রহণ করলেন।

ঘোড়দৌড়ের মাঠ থেকে পেন্সন-পাওয়া পিঁজরাপোলের একটা বেতো ঘোড়া খোঁড়াতে খোঁড়াতে এসে বলে—"ভদ্র বনচরগণ, বাক্‌নীতি ক্ষেত্র আমার নয়, কেননা সবুজ ক্ষেতে আর মাঠে বাজির খেলা নিয়েই আমি সারা-জীবনটাই প্রায় কাটিয়েছি, অতএব আমি—আমার এ জীবনে মানুষের সম্পর্কে এসে কি দুঃখ পেয়েছি, সেইটুকুই কেবল বলি। একদিন ছিল যখন তাজা ঘোড়া ব'লে মানুষ আমাকে সোনার গামলাতে বাজার হালে দানাপানি দিয়েছে, তারপর একদিন এল যখন কেবলি অনাদর আর চাবুক আর হাড়ভাঙা খাটুনি। ইন্দ্রের উচ্চৈঃশ্রবার বংশধর আমি, আমার শিরায় শিরায় রক্তের বদলে সোমরস চলেছে—সবুজ ঘাসের, সবুজ পত্রের কাঁচা আর টাটকা রস। কিন্তু হায় তবুও আমি আমার মানুষ-মনিবকে ঘোড়দৌড়ের বাজি-খেলার জুয়োচুরীতে জিতিয়ে দিতে অপারগ হলেম। মনিব হতাশ হয়ে আমাকে গোলামের মতো বাজারে নিয়ে বিক্রি ক'রে গেল। কিন্তু তখনো দুর্দ্দশার চরম হয়নি, আমি রাজার ডাক-গাড়ী টানবার ভার পেলুম।

আর যাই হোক সুখ আর মান-সম্ভ্রমের হানি তখনো বড় একটা হয়নি, কিন্তু যেদিন থেকে মানুষ কলের গাড়ির ডাক এনে হাজির করলে, সেইদিন থেকে আমার অন্ন গেল, দুঃখের পর দুঃখ, দুর্দ্দশার পর দুর্দ্দশায় আমি মরণাপন্ন হয়ে টিকে-গাড়ির আস্তাবল থেকে মুনিসিপ্যালের ময়লা-গাড়ি টানতে টানতে খোঁড়া হয়ে শেষে পিঁজরাপোলে গিয়ে পড়লেম। এখন মলেই বাঁচি, কিন্তু তার পূর্ব্বে আমি তোমাদের সকলকে অনুরোধ করছি, তোমরা যেমন ক'রে পারো কলের গাড়ির রাস্তা বন্ধ কর,আর সভা থেকে একটা একটা খোলা গোচারণের মাঠের ব্যবস্থা কর—যাতে-ক'রে চতুষ্পদ আমরা আর একবার সবুজপত্র সবুজ ঘাসের আস্বাদ পেয়ে, নবজীবন লাভ ক'রে শ্রেষ্ঠ-সভাকে ধন্যবাদ দিতে দিতে পক্ষিরাজ ঘোড়া-রূপে স্বর্গ-পথে যাত্রা করি। উচ্চৈঃশ্রবার শেষ-সন্তান আমরা, বাস্তবিকই আপনাদের কৃপাপাত্র এ বিষয়ে সন্দেহ নাস্তি।"

সভাপতি ষাঁড় ঘোড়ার দুঃখ-কাহিনী আর গোচারণের মাঠগুলির কথা শুনে এতই কাতর হ'লেন যে, দশমিনিটের মতো সভার কাজ বন্ধ রাখ্‌বার জন্যে তিনি ঘণ্টা দিয়ে, একবার বাইরে বিশ্রাম করতে চল্লেন। জল-চরগণ এই সময় একবার খালে-বিলে নেমে জলযোগ ক'রে নিতে লাগ্‌লো; খেচরদের মধ্যে কেউ কেউ উড়ে উড়ে একটু হাওয়া খেয়ে নিলে, আর উভচর আর স্থলচর, তারা—কেউ স্থল-পদ্মের ডাঁটা, কেউ-বা মাছের কাঁটা, কেউ মুরগীর ঠেং, কেউ-বা তার চেয়ে মোটা হাড় দাঁতে ভেঙে চট্‌পট্‌ ব্রেক-ফাষ্ট ক'রে নিতে লাগ্‌লো।

দশ-মিনিটের পরে আবার টুং টাং ক'রে গলঘণ্টা বাজিয়ে ষাঁড় মাঠ থেকে এসে মাচায় ঢুকলেন, সবাই যে যার জায়গায় বস্‌লে, ব্যাঙেশ্বরী রাগিণীতে রায় বাঘিনীদের জাতীয় সঙ্গীত আরম্ভ হ'ল :—

(রাগিণী ব্যাঙেশ্বরী)

নীলাং অম্বরাং মেঘৈর্মেদুরাং নমামি

। তোমারে।

ঘটা-জালিকা মেঘমালিকা বায়ুরূপিকা

কেশা ধরণী জনম-দায়িনী।

জগজ্জন-মন-মোহিনী, পশুপতি-শিশুপালিনী

। জয়।

(কোরাস)

মংলং জলং ফিড়িং ফড়িং

ঘ্যাঁ চর্ চর্ কটাক্ জল্।

মাথার উপরে আকাশ আরো নীল হয়ে উঠুক, নিশাচরদের সুখের রাত্রি নিরাপদ হয়ে থাকুক, মশার গুঞ্জন মাছির ভোঁন ভোঁন দিনে-রাতে শোনা যাক্, পৃথিবীর বুকে কেঁচোমাটি কুণ্ডলী পাকিয়ে রমণীর খোঁপার মতো শোভা পাক্, উইঢিবির কীর্ত্তিস্তম্ভ মেঘও ছাড়িয়ে উঠুক, সুরে এম্‌নি-সব নানা প্রার্থনা জানিয়ে চাতক-পাখী গান শেষ করবার পূর্ব্বেই সবাই চেঁচিয়ে উঠলো—"বাজে, বোকোনা, কাজের কথা কও, কাজ কাজ কাজ।" গাধা ব'লে উঠ্‌লেন—"ওহে পক্ষি, ওই রাগিণীতে 'গা' আর 'ধা' দুটো সুরই তুমি একেবারে বাদ দিয়ে গেয়েছো! ওটা ভুল হ'ল, ব্যাঙেশ্বরী ওতে ফুটলোই না।"

কাঙ্গারুদের উট্ প্রস্তাব করলে—"যাতে ক'রে মানুষ নিজের পায়ে হাঁটতে শেখে ও হাঁটতে-শেখার অভ্যাস হয় এবং ভবিষ্যতে

বড় বড় জানোয়ারদিগের পুচ্ছে না হওয়ায় উটেও পাবে ঐরূপ একটা বন্দোবস্ত সভা উটকে ভুবস্ত যাতে করা হয়, আমি তাহার জন্য প্রস্তাব করিতেছি'. এবং সভ্যগণের ও সভাপতির দৃষ্টি এ বিষয়ে আকর্ষণ করিতেছি।"

সভাপতি ষাঁড় দেখলেন সত্যিই প্রস্তাবটা উট করেছেন মন্দ নয়, তিনি উৎসাহিত হ'য়ে উটকে ডেকে শুধোলেন—"এই ভালো কাজে সভা হাত দিলে তুরস্কের পেক এবং কাফ্রিস্থানের উটপাখী এঁরা কিছু অর্থ-সাহায্য ও সহানুভূতি দেখাতে রাজি কি না।" অষ্ট্রিচ ও পেক জুয়ানেট গম্ভীর মুখে চুপ রইলেন আর কান্দাহারের উট 'তোবা' ব'লে দু'বার ঘাড় নাড়লে, হাঁ-না কিছুই বোঝা গেল না। শূয়োর উঠে বল্লেন—"মানুষগুলো যতদিন না বৈষ্ণবধর্ম নেয়, আর কসাইখানাগুলো বন্ধ ক'রে তাদের মধ্যে কেবল কুমড়ো-বলি চলিত হয়, ততদিন জীবের দুঃখ ঘোচা শক্ত। ধর্মের নামে কেউ মারবে গরু, কেউ শূয়োর, কেউ পাঁঠা —এ হ'লে জীবের রক্ষে কোনোকালে অসম্ভব।"

বন-বরাহ ঠেস্ দিয়ে ব'লে উঠলেন—"শূয়োর যা বল্লেন ঠিক বটে, কিন্তু কসাইখানার সঙ্গে আরো-সব নানা জায়গায় নানা আবর্জনা মানুষেরা জীবকে দুঃখ দেবার জন্যে জড়ো করেছে, সেগুলো সম্বন্ধে শূয়োর কি বলেন?"

শূয়োর ঘোঁৎ ঘোঁৎ ক'রে দু'বার গলা খাঁকারি দিয়ে বরাহের কথার একটা কড়া জবাব দেবেন, এমন সময় সভাপতি ষাঁড় দুজনকে থামিয়ে বল্লেন—"থাক্, ঘরে কে কি খায় না খায় সে নিয়ে প্রকাশ্য সভায় আপনাদের উচিত হয় না ঝগড়া করা।"

এইবার শৃগাল উঠলেন—এতক্ষণ তিনি কে কি বলে মন দিয়ে শুনছিলেন আর মোট-বইয়ে টুকছিলেন—আঙুরের লতার মাচার ভর দিয়ে ত্রিভঙ্গ হ'য়ে দাঁড়িয়ে শেয়াল আরম্ভ করলেন—"পূর্ব্ব পূর্ব্ব বক্তারা যা ব'লে প্রস্তাব ক'রে গেলেন, তার সম্বন্ধে দু'চারটে কথা ব'লে আমি ক্ষান্ত হবো, কিন্তু সেই সব প্রস্তাব নিয়ে নাড়া-চাড়া করার পূর্ব্বে আমি উপস্থিত সভ্যগণকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। এ জীবনে আমি অনেক সভায় গিয়েছি, কিন্তু এমন একপ্রাণে একমনে লেজ-নাড়া আমি কোথাও দেখিনি, দেখবো না। মানুষের নিজের লেজ নেই। পাছে অন্যের লেজ দেখলে তারা হিংসেতে জ্বলতে থাকে, মানুষ চায় সবাই তাদের মতো নির্লজ্জ লেজ কাটা হ'য়ে থাকুক। কাজেই ঘোড়ার লেজ তারা ছাঁটে, কুকুরের লেজও, গরুর লেজ, মহিষের লেজ কিছুই বাদ দেয় না।'

শেয়ালের কথা শুনে মুড়া-লেজ তালকুত্তো চেঁচিয়ে উঠলো—"ঠিক বলেছ দাদা—তোমাকেও তারা ছাড়ে না!" শেয়াল সে কথায় কান না দিয়ে ব'লে চল্লেন..."এখন কাজের কথা হোক...সিংহের প্রস্তাব-মতো খাণ্ডব-বনে একটা স্বতন্ত্র পশু রাজত্ব স্থাপন করলে মন্দ হয় না, কিন্তু এটা আমাদের ভুললে চলবে না যে, খাণ্ডব-বন যুধিষ্ঠিরের আমলে যেমন ছিল এখন আর তেমন নিরাপদ নেই; প্রথমতঃ জায়গাটা দুরন্ত গরম, সেই গ্রীষ্মপ্রধান দেশের মাঝখানে, যেখানে গরমের দিনে 'লু' চলে। ছাগল ভেড়া

খরগোস এম্‌নি-সব ছোট অথচ বড়দের বিশেষ কাজে লাগে, এমন-সব জন্তুরা সেখানে টিক্‌তেই পারবে না, এর উপর সেখানে দাবানলের ভয় আছে, প্রাণটি খাণ্ডবদহন হয়ে থাকে। কুকুর যে সহরে থাকারই প্রস্তাব করেছেন, সেটা আরামের দিক দিয়ে দেখতে গেলে মন্দ নয়, কিন্তু কুকুর চিরদিনই মানুষ-ঘেঁসা এখনো খুঁজ্‌লে হয় তো তাঁর গলার কলারে একটা বেয়াড়া রকমের নাম দেখা যাবে।" কুকুর কথাটা শুনে ঘাড় চুলকোতে লাগ্‌লো, হ'বোলা পাখী সুর ক'রে বল্লে—"কানকাটা না হ'লে কি মানুষের সঙ্গে কুটুম্বিতে হয় গা?" শেয়াল ব'লে চল্লো—"বাঘের তেজস্বী ভাষা শুনে আমারো একবার মনে হয়েছিল - লেগে যাই কোমর বেঁধে লড়ায়ে। এক হিসেবে লড়াই মন্দ নয়,—লড়ে বেঁচে আস্‌তে পার্‌লে। নয়তো কতকগুলো অনাথ অনাথা নিয়ে না লড়ার দলকে বড় বিপদেই ফেলে যাওয়া হয়; ঘরে ঘরে অনাথ-ভাণ্ডারের চাঁদার খাতা গিয়ে ভদ্র জীবদের একটি বিপদ ঘটায়, কাজেই বল্‌তে হচ্ছে লড়াই পুরোপুরি ভালো নয়, ওতে মন্দ ও মিশেল আছে, বিশেষ সত্যের জয় যে সব সময় তা নয়। শূয়োর যা বলেছেন তার মধ্যে ভালো-মন্দ দুই আছে, আর বরাহের প্রস্তাব হগসাহেবের বাজারের উন্নতির জন্যে তুলে রাখ্‌লে মন্দ হয় না, শূয়োর আর বরাহের কথায় যতই সার থাক্ না, রাজনীতি-ক্ষেত্রে সেটা কোনো উপকারে আস্‌বে না! কাজেই সকলে দেখছেন শান্তি কিম্বা যুদ্ধ, অথবা সিংহের প্রস্তাব-মতো স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন—এ তিনই জীব-সমাজের সবার পক্ষে সমান ফল দেবে না। একথা একবাক্যে স্বীকার কর্‌তে হবে যে, কোথাও একটা গোল আছে এবং সে গোলটা মিটে করা দরকার (সাধু সাধু)। আমি যে উপায় বাৎলাবো সেটা সম্পূর্ণ নতুন, আর এ-পর্য্যন্ত পশু-সমাজে তার কোনো পরীক্ষা হয়নি (শোনো শোনো, চুপচুপ)—এস, আমরা সকলে জ্ঞানলাভের জন্যে উঠে প'ড়ে লাগি—কেননা জ্ঞানের আর বিজ্ঞানের পথই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ পথ, 'জ্ঞানাৎপরতরং নহি'—মানুষেরা এই কথা বলেছে; কেননা আমরা মানব-জাতির ইতিহাস থেকে এটা শিখে নেবো, আমাদেরই-বা কেননা বিশ্ববিদ্যালয় থাকবে, জাতীয় মহাসমিতি থাক্‌বে, আর থাকবে একটা মুখপত্র যেখানে পরে পরে আমরা নিজেদের অভাব-অভিযোগ-গুলো জগতে বিশ্ব-সমাজের সামনে ধ'রে দিতে পারি, আমাদের আশা, উদ্যম, রীতি-নীতি, ঘরের কথা, বাইরের কথা সবই যেমনি ছাপার অক্ষরে মুদ্রিত হয়ে সবার চোখে পড়বে?

মাতব্বরদের মধ্যে যারা প্রাণীতত্ত্ব নিয়ে নাড়া-চাড়া করে, তারা মনে করে দু-একটা মরা জানোয়ার নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি ক'রে আমাদের হাড়হদ্দ সবই জেনে নেবে, সেটা বড় ভুল। জানোয়ারের কথা এক জানোয়ারেই লিখ্‌তে পারে, কিসে তাদের সুখ কোথায় তাদের ব্যথা সে কেবল তারাই খুলে বল্‌তে পারে, যাদের যাদের সুখ-দুঃখ আনন্দময় জীবন গুলো মানুষের চাপনে গুঁড়িয়ে ধুলো হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে।" এইখানে আবেগে শৃগালের কণ্ঠরোধ হ'ল, তিনি একটু আঙুরের রসে গলা ভিজিয়ে আবার সুরু কর্‌লেন—"আমাদের দুঃখ-কাহিনী আমাদেরই লিখ্‌তে

হবে, সেজন্যে এখন থেকে প্রস্তুত হওয়া চাইই চাই!" শৃগাল উৎসাহের সঙ্গে আরো বল্‌তে চলেছেন এমন সময় সভাপতি সভা-ভঙ্গের ঘণ্টা দিয়ে হঠাৎ মাঠের দিকে প্রস্থান্ করলেন—সভাপতিকে ধন্যবাদ দেবার প্রস্তাব হওয়ার আগেই। কাজেই অসময়ে সভা থেকে সবাইকে চ'লে যেতে হ'ল, কোনো প্রস্তাবই সমর্থন, গ্রহণ কিম্বা কিছুই হ'ল না।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

(ফরাসী হইতে চুরি)

যৌবনের ছিট

পুঁথিপাটা নিয়ে সহরের বাইরে মাঠের মাঝখানে যে ডাকবাংলাটাতে আমি গিয়ে আশ্রয় নিলাম তা' থেকে কুড়ি গজ আন্দাজ দূরে নদী। বাড়ীর সুমুখের কাঁকরদার রাস্তাটা যেখানে সহরের দিকে মোড় ফিরেছে, সেইখানে, ঝাউবনের মধ্যে, নদীর পাড় ঘেঁসে একটা, বোতামের কল দিন-রাত খটখট করে মানুষের কানে তালা লাগিয়ে দেয়।—অবশ্য সহরের বাইরে এদিকটাতে মানুষ বল্‌তে কেবল আমি, আর সেই বোতামের কলটার মালিক। একলা বসে বসে যখন আর ভালো লাগ্‌ত না, এক-একদিন খুব ইচ্ছে হত, লোকটির সঙ্গে পরিচয় করি, কিন্তু আমার রাত্রের ঘুমের ব্যাঘাত সমস্ত রাত ধরে আমার দিনের বেলাকার সেই ইচ্ছার কানে কুমন্ত্রণা দিয়ে দিয়ে তাকে বিমুখ করে দিত।

লোকটির নাম শচীপতি। তাঁকে প্রথম যেদিন দেখি, সেইদিনই, কেন জানিনে, আমার মনে হয়েছিল, পাকা চুলের সাদা একখানি চাদর মাকে মুখে টেনে দিয়ে তাঁর কাঁচা বয়েস যেন ঘুমিয়ে পড়ে স্বপ্ন দেখছে। তাঁর যাবার বেলা যে বয়ে গেছে, সেদিকে তাঁর একটুকুও হুঁস নেই।

এ বয়সেও প্রতি অঙ্গ তাঁর স্বাস্থ্যে নিটোল, শরীরের বাঁধ শক্ত মজবুত কর্মিষ্ঠ। আর রমণীর মতো সুন্দর কমনীয় মুখটিতে একটা আশ্চর্য্য হাসি যেন দুঃখের তাপে চটচটে হয়ে লেগে গিয়েছে, কিছুতে ছাড়ানো যাচ্ছে না।

আর দেখ্‌তাম, বিকাল হতেই একটি পাতা-ছেঁড়া পুরানো বই হাতে করে ঝাউ-বনে ঘেরা বাড়ীটার ছায়াস্তরাল থেকে গেটের কপাট সরিয়ে তিনি বাইরের সোনালী আলোয় বেরিয়ে আসেন, আমার বাড়ীর সুমুখ দিয়ে যে রাস্তাটা ছোট-একটি-মাঠ পার হয়ে একটা পুরানো পোড়ো বাড়ীর কাছাকাছি গিয়ে শেষ হয়েছে, সেই রাস্তা ধরে গিয়ে সেই পোড়ো বাড়ীটার সামনে তিনি থম্‌কে দাঁড়ান, তারপর একবার চকিত চোখে চারপাশটা দেখে নিয়ে চোরের মতো লঘু অথচ ক্ষিপ্র পদে ভিতরে গিয়ে ঢোকেন।......

আমার কাজে মন বসে না। খোলা জান্‌লায় অসাড় হয়ে দাঁড়িয়ে আমায় মিনিটের পর মিনিট কাটিয়ে থাকে।

এমনি করে যখন দিনে হয় না কাজ আর রাতে হয় না ঘুম, তখন একদিন আর না পেরে ভাব্‌লাম, যাই, লোকটার সঙ্গে কোনো অছিলাতে একটুখানি ঝগড়া করে আসি।... শচীপতি বাড়ীতেই ছিলেন, খবর পেয়ে ছুটে এসে অনাবশ্যক উত্তেজনার সঙ্গে আমার অভ্যর্থনা করলেন। এতকাল তাঁর এত কাছে রয়েছি, তবু দেখ্‌লাম, আমার সম্বন্ধে একেবারে কোনো কথাই তাঁর জানা নেই। আমি দু এক কথায় আমার পরিচয় দিয়ে বল্‌লাম, বসে বসে ভালো লাগে না তাই তাঁর কলটাকে দেখ্‌ব বলে এসেছি। জামার গুটানো আস্তিনটাকে নামিয়ে কালিমাখা হাতেই আমার হাত চেপে ধরে তিনি আমায় টেনে নিয়ে চল্‌লেন, যেখানকার যা সব আমায় বুঝিয়ে দিয়ে-দিয়ে সমস্ত বাড়ীটা আমায় দেখিয়ে নিয়ে বেড়াতে লাগ্‌লেন। আমি সত্যি সত্যি কৌতুহলী হয়েই দেখ্‌ছিলাম; হঠাৎ এক জায়গায় কল-কব্জার ভিড়ের মধ্যে কি-একটা ত্রুটি ধরতে পেরে ঝুঁকে পড়ে টুকটাক করে তিনি সেটাকে সারতে লেগে গেলেন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার পা ধরে গেল। আমার সম্বন্ধে তাঁকে সচেতন করবার জন্যে কাঠের লাঠিটাকে বার-কতক মেঝের উপর জোরে জোরে ঠুক্‌লাম, তারপর অনেকক্ষণ ধরে অনাবশ্যক জুতোর শব্দ করে পায়চারি করে বেড়িয়ে, মনের বিরক্তিকে ঠোঁটে চেপে বেরিয়ে চলে এলাম।

রাত্তিরে বোতামের কলের খটখট কানে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে স্বপ্ন দেখ্‌লাম, এতদিন যে শব্দকে নীরস অর্থহীন বলে মনে করেছি, আজ তার ভিতরকার মানে কেমনি আমার কাছে যেন স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কি আশ্চর্য্য, এতকাল এই জলের মতো ভাষা আমি বুঝতে পারিনি!

ঘুম ভাঙ্‌তেই জান্‌লা খুলে বোতামের কলটার দিকে চেয়ে চোখ তুল্‌লাম। কে যেন অদৃশ্য হাতে ক্রমাগত সেইদিকে আমায় টান্‌তে লাগ্‌ল। কাল যে খুব প্রীত হয়ে ফিরিনি সে কথা একটুও মনে হলো না।

এর পর রোজই একবার করে যাই; কিন্তু কলের কাজে শচীপতি এত ব্যস্ত থাকেন যে ভালো আছি কি না সে খবরটুকু নেবার পর্য্যন্ত এক-একদিন তাঁর অবসর হয়ে ওঠে না। আমার সঙ্গে চোখোচোখি হলে একটু কেবল হেসে এমনভাবে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে চলে যান যেন চিরজীবন ধরে তাঁর এই কলটার মধ্যেই আমি আছি।

বিরক্ত হয়ে আমি একবার যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলাম, কিন্তু দেখ্‌লাম, সামনে দাঁড়িয়ে যাঁর চোখে পড়িনি, আড়াল থেকেই কল করে আমার সম্বন্ধে তার উপলব্ধি সজাগ হয়ে উঠ্‌ল। আমি যেদিন যাইনি, বাড়ী বয়ে তিনি তা জান্‌তে এলেন। ভোরবেলা কাজে বেরিয়ে ছিলাম, ফিরে এসে শুন্‌লাম, এইটুকু সময়ের মধ্যে তিন-তিনবার তিনি আমার খোঁজ করে গেছেন।— নিজে এ সম্বন্ধে তাঁকে অবশ্য কিছু বল্‌তে শুনিনি।

অদ্ভুত লোক! কোনো-কিছুতে মন নেই, অথচ উনি মনস্বী। যেন সর্ব্বস্ব পুঁজি নিয়ে জীবনের সুরুতে মস্ত একটা বাজি রেখেছিলেন, জিত্‌লে সে পুঁজি সহস্রগুণ হয়ে ফিরবে, হার জিত এখনো সাব্যস্ত হয়নি! একটা অতলস্পর্শ রস-সমুদ্র কি-এক-রকমে জমাট বরফ হয়ে গেছে; আয়তন ঠিকই আছে, পানার্থীর আশা নেই।

কিছু আশা না করেই এই সৃষ্টিছাড়া লোকটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে আমি মিশ্তে লাগলাম। আমি যুবা, শতাপতি বৃদ্ধ, এ সত্ত্বেও আমাদের বন্ধুত্ব হলো। তার একটা কারণ, এক জায়গায় আমাদের মস্ত একটা মিল ছিল;—আমরা দুজনেই অবিবাহিত। কিন্তু বিবাহ করবেন না এরকম কোনো সঙ্কল্প তাঁর আছে, এমন কথা কোনোদিন তিনি বল্তেন না। তর্কের বেলায় প্রচুর লোক মন দিয়ে নিষ্কৃতি পেত, কাজের বেলায় সেই গচ্ছার প্রত্যেক কড়িটি সুদ শুদ্ধ আদায় করে নেওয়া ছিল তাঁর স্বভাব। এই ভাবে নিজের ভাবী পত্নী সম্বন্ধে দিনের পর দিন নানক যুবক বৃদ্ধ ভিন্ন সমাজে প্রচুর পরিহাস রসের সৃষ্টি করেও যে অবধি তিনি অবিবাহিতই থেকে গেলেন।

আমার সঙ্গে কথা কইবার তাঁর অবসর হলেই আমরা প্রণয়ের কথা পাড়্তাম। মেয়েদের দিক্ থেকে প্রথমেই যথেষ্ট সম্মতির সাড়ার প্রয়োজন আছে কি না, এ কথার জবাবে তিনি বল্তেন—কোথাও কোথাও আছে, যেখানে তারা তাদের প্রণয়ীদের চেয়ে সামাজিক বা অন্য কোনো হিসাবে খানিকটা উন্নত, সেখানে স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম করেও তাদেরই প্রথমটা অগ্রসর হতে হবে, এই ছিল তাঁর মত। প্রেমের অকুতোভয় হওয়াই উচিত, কিন্তু সে প্রত্যাখ্যান সইতে পারে, অবজ্ঞা সইতে পারে না, সেজন্যে তাকে সাহস দেবার দরকার আছে।.. ......তিনি এও বিশ্বাস করতেন, আমাদের দেশের দেহ-মন, সমাজ ও রাষ্ট্রের যে অস্বাস্থ্য, তার প্রতিকার মেয়েদের অবরোধ-মুক্তির মধ্যে রয়েছে। এদেশের মেয়ে-পুরুষ মানুষে মানুষে স্বাভাবিক সম্বন্ধের জায়গাটিতে যতদিন মিল্তে না পারবে, ততদিন স্বাভাবিক মানুষের যে স্বাস্থ্য—স্বাভাবিক মানুষের যে সুস্থতা—কোনো-রকমের সাধনার-দ্বারাই তাকে পাবার চেষ্টা আমাদের সার্থক হবে না। আমরা যে পুরুষ, এটা মনে করিয়ে দিতে মেয়েরা আমাদের পাশে নেই বলেই বৃহত্তর জীবনেও সমস্ত চিন্তার এবং কর্মের ক্ষেত্রে আমরা কাপুরুষ বনে গিয়েছি, আরো যাব। ঝাউবনে ঘেরা বোতাম-কল আর সেই পুরানো পোড়ো বাড়ীটার মাঝখানকার পথে পায়চারি করতে করতে এমনি আরও সহস্র বিষয়ে আমাদের আলোচনা চল্ত। স্কুলের কাজের তাগিদ না এলে কোনোদিন তাঁকে ক্লান্তি বোধ করতে দেখ্তাম না।

একটু একটু করে তাঁর জীবনের একটি নিগূঢ় অশ্রু-ভরা অধ্যায়কে তাঁর অজস্র হাসি-পরিহাসের মধ্যে দিয়ে তিনি আমার কাছে অনাবৃত করে ধরতে লাগলেন। যখন আর-একটু হলেই সে ইতিহাসের একেবারে গোড়াটাকে আমার পাওয়া হয়, এমনি সময় আমার এক বন্ধুর অসুখের খবর পেয়ে কিছু-দিনের জন্যে আমায় ভাগলপুর চলে যেতে হলো। সে সেরে উঠ্তে উঠ্তে পূজোর ছুটি আসন্ন হয়ে এল, মাঝখানকার কটা দিন ছুটি বাড়িয়ে নিয়ে এই ফাঁকে একবার পশ্চিম-টাকে দেখে নিতে বেরিয়ে পড়্লাম।

ফিরে এসে দেখি, পথের পাশের পাতাঝরা শাখাবিরল গাছের আশ্রয়ে বসন্তের একঝাঁক যাত্রী-পাখীর মতো, সেই পুরানো জীর্ণ বাড়ী-

টার এতদিনকার স্তব্ধ নিদ্রাকে সচকিত করে পাড়ায় একদল নতুন লোকের সমাগম হয়েছে। তাঁদের সববাইকেই ঠিক নতুন লোক বলা চলে না;—পরিবারের যিনি গৃহিণী, তিনি এখানকারই মেয়ে, পীড়িত অক্ষম স্বামী আর একপাল ছেলেপিলে নিয়ে তাঁর পিতার পরিত্যক্ত বাস্তুভিটের আশ্রয়ে মাথা গুঁজতে এসেছেন।

কেন জানিনে, আমার মনে হলো, এদের সঙ্গে শচীপতির জীবনের কোন্-এক জায়গায় একটুখানি যেন যোগ আছে। শচীপতিকে বল্‌তে তিনি হেসে আমাকে একটা থাক্কা দিয়ে বল্‌লেন, 'দূর পাগল!'—তারপর নিজের তৈরি নতুন প্যাটার্ণের কতকগুলি বোতামকে আলোর কাছে ধরে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে অতিরিক্ত মনোযোগের সঙ্গে দেখ্‌তে লাগ্‌লেন।

আমি একটু অপ্রতিভ হলাম। প্রতিজ্ঞা কর্‌লাম, এ সম্বন্ধে তাঁকে কোনোদিনই আর কিছু বলা হবে না। কিন্তু তা কি পারা যায়? স্পষ্ট দেখ্‌তে পাই, আমরা আর ঠিক সেই আগেকার মতন করে মিল্‌তে পারিনে।—পোড়ো বাড়ীটার কাছাকাছি নদীর উঁচু পাড়ের উপর দাঁড়িয়ে আগেকার মতো সূর্য্যাস্তের শোভা দেখ্‌তে তাঁকে আর নিতে পারিনে। আর সর্ব্বদাই বোধ হয়, তিনি আমার আসার কারণ জান্‌তে চান, যেন আমি নিজের কতকগুলি গুরুতর প্রয়োজনেই তাঁর কাছে চিরকাল আসা-যাওয়া কর্‌ছি। কলের কাজেও যে তাঁর মন আছে, এমনও মনে হয় না।

তাই বাধ্য হয়ে আরেকদিন হাস্‌তে হাস্‌তে সেদিনকার প্রশ্নের পুনরুক্তি কর্‌তে হলো। এবার তিনি অযথা চটে গিয়ে চোখ মুখ লাল করে বল্‌লেন, 'আমার ঢের কাজ আছে, মস্করা করে আমার দিন কাটে না, জানো? তোমার যদি অন্য কোনো কাজ না থাকে, তুমি যেতে পারো।'

রাত্রে শুয়ে শুয়ে মনে হলো, বোতামের কলটার সেই জলের মতো ভাষা আজ আবার কেবলি যেন কেমন ঘুলিয়ে যাচ্ছে; প্রাণান্ত চেষ্টা করেও তার বক্তব্যটাকে সে স্পষ্ট কর্‌তে পারচে না।

আমি যে অপমান বোধ করিনি, তা নয়, তবু জোর করেই বোতামের কলটা নিত্যকার মতো আমায় টান্‌তে লাগ্‌ল। ব্যবসা করা যাদের মতলব তারা চিনির ব্যবসা করে কি করিতকার করে হাতে কিছু এসে যায় না, অবশ্য যদি লাভের অঙ্কটা সমান থাকে। এ ক্ষেত্রে আমার লাভ ছিল কৌতুক; সব অবস্থাতে সেটা সমানই জোটবার কথা। তবু সমস্ত দিনটা ইতস্তত করেই কাটালাম। তার পর বিকেলের দিকে কাপড় চোপড় নিয়ে তৈরি হচ্ছি এমন সময় শচীপতির চিঠি নিয়ে তাঁর কলের পিয়ন দরজায় এসে হাঁক দিলে। যদি সে-সময় কেউ এসে বল্‌ত শচীপতির বোতামের কলটা ক্রমাগত কাজ করে করে হাঁপিয়ে গিয়ে খাতা নিয়ে নিরিবিলিতে কবিতা লিখ্‌তে বসে গেছে,—তবে যে রকম আশ্চর্য্য বোধ কর্‌তাম, তাঁর কাছ থেকে বারো পৃষ্ঠার মস্ত বড় ভারী এই চিঠিখানি পেয়ে তার চেয়ে বড় কম আশ্চর্য্য হলাম না!

শ্রীক্রিতাজনেষু—

আমার কালকের অভদ্র ব্যবহারের পর তুমি আর আমার বাড়ীর ছায়াও মাড়াবে না

তা আমি জানি। আমিই বা কোন্ মুখে তোমায় আর আস্‌তে বল্‌ব? আমার তখন কি হয়েছিল জানিনে, কিন্তু ভগবান জানেন, তোমাকে আঘাত করা আমার অভিপ্রায় ছিল না। সম্ভবত আমার জীবনে এখন এত বেদনা যে বেদনাবোধের শক্তিটুকু পর্যন্ত আমি খুইয়েছি, নিজের বেলাতেও যেমন, পরের বেলাতেও তেমনি।

তবে আমি কত বড় হতভাগা তা জানলে হয়ত তুমি আমায় ক্ষমা করবে। সেই আশাতে লিখ্‌চি।

তোমার অনুমান যথার্থ। আমি এখনো আশ্চর্য হচ্ছি এই ভেবে, এ অনুমান তুমি কেমন করে করতে পারলে। চৌদ্দ বৎসর যে কথাকে অন্ধকার মনের গোপনতায় কেবল আলিঙ্গন করে কষ্টে বাঁচিয়ে রেখেছি, বাইরের আলোকে একটি দিনের জন্যে যার কাছে ঘেঁস্‌তে দিইনি, এত অনায়াসে তুমি তাকে জেনে ফেলবে, তোমাকে ডেকে কাছে বসিয়ে বল্‌তে পারার সুখটুকুও তুমি আমায় পেতে দেবে না, এ কেউ সইতে পারে? তুমি হলে কি করতে? কিন্তু তার আগে সমস্ত অবস্থাটা তোমার ভালো করে জেনে নেওয়া চাই।

বয়সে আমরা দু-এক মাসের ছোট-বড়। খুব ছেলেবেলায়, আমার এক মাসতুত বোনের বিয়ের নিমন্ত্রণে গিয়ে তার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয়। আমি যে সেই থেকেই তাকে মনে করে রেখেছিলাম, সেটা কিছু আর তার জানা ছিল না,—কেমন করে থাক্‌বে?

আমি কিন্তু সেই প্রথম দেখার দিনটি থেকেই আমার চিরজীবনের পরমাশ্চর্যের মতো প্রতি মুহূর্ত তাকে মনে করেছি। সেই শিশু বয়সে সময় না হতেই প্রেমের কাছ থেকে যে ঋণ আগাম নিয়েছিলাম, এত বয়স ধরে বসে বসে সেইটেকেই আমাকে শোধ করতে হচ্ছে বুঝি বা!

পৃথিবীটা যে এত বিশ্রী রকমের বড়, সে বয়সে ও সে কথাটা আর জানা ছিল না, তাই কোথাও মেয়েদের জটলা দেখ্‌লেই আমার মুখ লাল হয়ে উঠ্‌ত, মনে হত, সে নিশ্চয় এর মধ্যে আছে, আমি সে জায়গার ত্রিসীমায় ঘেঁস্‌তে পারতাম না। কোনো জনসমাবেশের জায়গায় গেলে মনে হত চারদিক থেকে নয়নময় হয়ে সে যেন আমায় দেখ্‌চে, আমার ঠোঁট কাঁপতে থাক্‌ত, আমি ঘেমে উঠ্‌তাম। রেলে স্টীমারে যেতে আস্‌তে, হঠাৎ কোথাও একটা পুকুরের পাড়ে ঘনবনের ছায়ায় স্নিগ্ধ-শান্তিভরা একটি গৃহ দেখে মনে হত, এই বাড়ীখানিতেই সে থাকে, নিশ্চয়। স্পষ্ট দেখ্‌তাম, জলপাই গাছের ছায়ায় অন্দরের দেউড়ির কাছে তার ছোট ভাই খুকুকে কোলে করে সে দাঁড়িয়ে আছে। ঘাটের পথে বাসনের বোঝা নিয়ে তার আনাগোনার পায়ের চিহ্নগুলিকে আমি গুনে বলে দিতে পারতাম। বাড়ীটিকে যতক্ষণ দেখা যেত, আমার চোখে পলক পড়্‌ত না, তারপর গ্রাম-প্রান্তের বনাঞ্চলের অন্তরালে সেটা লুকিয়ে চোখের আড়াল হয়ে গেলে বেদনাতুর মাথাটাকে যে-কোনো এক জায়গায় গুঁজে দিয়ে ভাব্‌তাম, তার এত কাছে এসেও তাকে জানিয়ে যাওয়া হলো না। মনে হত, কোন্-একটা বিপুল-

কায় দৈত্য আমার জীবনের প্রিয়তম স্থানটি থেকে আমায় যেন জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে,—আমার বুকের শিরায় শিরায় তার টান কঠোর হয়ে বাজ্‌ত।

কল্পনায় তাকে এত বেশী করে পেলাম যে বাস্তব জগৎটার জন্যে একটি কানাকড়িও উদ্বৃত্ত রইল না। দীর্ঘ ছয় বৎসরে একটি দিনের জন্তে তার দেখা পেলাম না। তার পর দেখা যখন হলো তখন ঠোঁটের কপাটের উপর আসন্ন-যৌবনের কালো-হরফের পরোয়ানা এসে পৌঁছেচে। আমাদের বাড়ী পেয়ারা গাছ ছিল, কোঁচড়-ভরা পেয়ারা নিয়ে গিয়ে তার সঙ্গে ভাব কর্‌লাম। সে খুসি হয়ে আমায় তার মায়ের কাছে নিয়ে গেল; তার ছোট ভাই খুদু তখন বেশ বড়-সড় হয়েছিল, তার সঙ্গে আমার পরিচয় করে দিলে; তারপর আমাকে যথেষ্ট আপ্যায়িত করা হয়েছে মনে করে নিশ্চিন্ত হয়ে পাড়ার দু-তিনটি মেয়েকে জুটিয়ে খিড়কির পুকুরের পারে পেয়ারাগুলোর সদ্গতি কর্‌তে চলে গেল।

পরদিন ইস্কুল যাবার পথে তাদের বাড়ীর দেউড়ির গোড়ায় তাকে দেখ্‌লাম; সম্ভবত পালিয়ে এসে খানিকটা আচার তার মাকে লুকিয়ে সে খাচ্ছিল, আমার দিকে চেয়ে প্রথমটা চম্‌কে উঠে তারপর নিজের ভুল বুঝ্‌তে পেরে একটু হাস্‌লে। সেই হাসিটুকুকেই আমি সারা গায়ে বুলিয়ে নিয়ে চলে গেলাম। আমার সমস্ত কাজ এবং অকাজ আমায় সেদিন আর স্পর্শ কর্‌তে পার্‌লে না।

বাড়ীতে বড়ুনি সয়ে, রাশি রাশি রকমারি আচার লুট করে নিয়ে গিয়ে তাকে দিতে লাগ্‌লাম। চুপি চুপি তাকে তাদের খিড়্‌কির বাগানে ডেকে নিয়ে যেতাম, খুসীতে তার মুখে হাসি যেন ফেনিল সরবতের মতো উপ্‌চে উঠ্‌তে থাকত। একটা চাল্‌তা গাছের ঠেলে-ওঠা শিকড়ের উপর দুজনে পাশাপাশি পা ছড়িয়ে বসে আচার খেতে খেতে কত রাজ্যের গল্প যে আমরা জুড়ে দিতাম, তার ঠিক নেই। আমি যে দিকটায় বস্‌তাম, সেদিকটায় ছিল কতগুলো বিষ-পিঁপড়ের চলা-ফেরার রাস্তা। আমার অসহায় অবস্থাটা সে হতভাগাগুলো টের পেয়েছিল কি না জানিনে, দিব্যি নবাবের মতো আমার পা বেয়ে উঠে মনের সাধ মিটিয়ে তারা আমায় কামড়াত, তবু তার পাশটি থেকে আমি একচুল নড়্‌তাম না। সে ক্রমে আমায় একটু একটু খাতির কর্‌তে লাগ্‌ল। আমার তরুণ মনের সমস্ত আগ্রহ এবং নির্ভরতা দিয়ে তারই উপর বিরাট একটা স্বপ্নের ইমারত আমি রচনা কর্‌লাম। জেগে-ঘুমিয়ে আমার দিন কাট্‌তে লাগ্‌ল।

একদিন শুন্‌লাম, তার বিয়ের সম্বন্ধ এসেচে। তার সঙ্গে দেখা কর্‌তে গিয়ে তাকে পেলাম না। তারপর আরও কয়েকটা দিন তার শোবার ঘরটা থেকে সে বেরুল না। আমি ভাবলাম, বুঝি আমার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হবার দুঃখকে আমার সুমুখে লুকোতে পার্‌বে না বলে সে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখ্‌চে! তাকে উত্ত্যক্ত না করে যে লোকটির সঙ্গে তার সম্বন্ধ হচ্ছিল, চট্‌ করে কাপড়-চোপড় পরে নিয়ে তার সঙ্গে দেখা কর্‌লাম। লোকটির নাম কালীপদ

বন্ধু, এম-এতে দু-দুটো পাশ দিয়ে উকিল হয়ে সবে সে সহরে এসে বসেছিল। মস্ত পণ্ডিত লোক বলে চারদিকে তখন তার খুব নামডাক। আমায় যত্ন করে নিয়ে বসিয়ে, আমি কেন এসেচি, তা সে জানতে চাইলে। গৌরচন্দ্রিকা আমি ভালোও বাসি না, আর তা করবার মতো মনের অবস্থাও তখন আমার ছিল না, তাই একেবারেই বল্লাম, 'আমি সুরবালাকে ভালোবাসি।'

সে হো হো করে হেসে উঠে বললে, 'বটে। তুমি তার কে হও? ভাই বুঝি?'

আমি মুখটাকে গম্ভীর করে বল্লাম, 'আজ্ঞে না, আমাদের এক পাড়াতে বাড়ী।'

সে বল্লে, 'তা বেশ বেশ। পাড়ার সব ছেলে-মেয়েরাই তাকে খুব ভালোবাসে, বুঝি?'

এ প্রশ্নে আমার এত অপমান বোধ হ'লো যে আর এক মুহূর্ত সেখানে দেরী না করে আমি উঠে বেরিয়ে চলে এলাম। পরপর কি করা উচিত সেটা ঠিক করতে না পেরে সুরবালাদের বাড়ী গিয়ে হাজির হলাম। সে তখন চুল বাঁধা শেষ করে উঠে আয়না চিরুণী তুলে ঘরে নিয়ে গিয়ে রাখবার উপক্রম করচে। আমায় দেখে থমকে দাঁড়াল। আমার সমস্ত শরীরের মধ্যে তার সেই রুদ্ধ গতিবেগের ধাক্কাটা বিদ্যুতের মতো খাড়া দিয়ে দিয়ে বয়ে গেল। বল্লাম, 'শোনো!'

সে হয়ত ভাবলে, পেয়ারা কি আচার। চট্ করে একবার আমার হাতটার দিকে তাকিয়ে নিয়ে পা টিপে ছুটে এগিয়ে এসে বল্লে, 'কি?'

আমি তাকে খিড়কির পুকুরের পারে খুব একটা নিভৃত জায়গায় নিয়ে গেলাম, তারপর দুহাতে শক্ত করে তার হাত-দুটোকে চেপে ধরে তাকে—তাকে বল্লাম। কি বলেছিলাম মনে নেই। কিছু কি বলতে পেরেছিলাম? তবু সে গ্রীবা বাঁকিয়ে চোখ পাকিয়ে বল্লে, 'কী?'

আমি হাত-দুটি জোড় করে বল্লাম, 'দোহাই তোমার। তুমি ইচ্ছে হলে আমায় দ্বিগুণ করে ফিরিয়ে দিতে পার, কিন্তু আমায় অবজ্ঞা করবার তোমার কোনো অধিকার নেই।'

সে ঠোট চেপে একটুখানি হেসে বল্লে, 'তুমি তাহলে কি চাও?'

বল্লাম, 'তোমায়।'

সে হাসতে হাসতেই বল্লে, 'তোমার কি আছে, কি দিয়ে তুমি আমায় বাঁধতে আশা কর?'

সেই বয়সেও আমি বুঝেছিলাম, সমস্ত তুচ্ছ নগণ্য জীবনের মধ্যবর্তী অসীম সম্ভাবনাকে বিকশিত করে তুলতে এক প্রেমই পারে, এবং এই সম্ভাবনার দিক দিয়ে বিচার করলে পৃথিবীতে বড় ছোটর কোনো তফাৎই নেই, সেই জন্যই বোধ হয় যে-প্রেম খাঁটি তার চোখে কিছুই অসুন্দর নয়, অকিঞ্চিৎকর নয়।—এই কথাগুলোকে প্যাঁচালো অস্ফুট করে তাকে আমি বোঝাতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু সে কি ভালো বেসেছিল যে বুঝবে? বুঝল না বলেই সে প্রতিবাদও করলে না, মুখটাকে বাঁকিয়ে বল্লে, 'তুমি ত সেদিনকার ছেলে, আমার চেয়েও বয়সে ছোট—'

আমি গলায় সুরে আগ্রহ ভরে তাড়াতাড়ি বললাম, 'আমি চিরকালই ত আর ছোট থাক্‌ব না।'

সে আমার এ কথায় অত্যন্ত আমোদ পেয়ে হাসির তুফানে বেণুশাখার মতো নুয়ে নুয়ে পড়্‌তে লাগ্‌ল। তারপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বল্‌লে, 'বেশ গো বেশ, তুমি বড় হতে হতে আমার চেয়েও যেদিন অনেকখানি বড় হবে, সেইদিন এসো। আজ তাহলে যাওয়া যাক্, কি বল? মা-গো, একরত্তি একটা ছেলে তার কত ঢঙের কথা।'

চাঁদিয়াচাতে প্রাচীরের যেন অভাব ছিল, তার উপর আবার এই একটা বয়সের প্রাচীর।—আর এ একেবারে অসহ্য। এমন বাধা কেন থাক্‌বে যাকে ভাঙ্‌বার উপায় নেই? কিছু না পাই, খালি হাতে ফিরতে হয় তাতে যায় আসে না, কিন্তু সম্ভাবনার কেন শেষ থাক্‌বে? তপশ্চর্য্যার অধিকার থেকে কেন বঞ্চিত হব?

হার মান্‌তে হলো; কাঁদি আসছিল, হার মান্‌তে।

তারপর তাদের বিয়ে হয়ে গেল। স্বামীর ঘর কর্‌তে যেদিন চলে যাবে সেদিন আমার মায়ের সঙ্গে সে দেখা কর্‌তে এল। পাশের ঘরে তার পরিচিত গলার স্বর অনেকক্ষণ ধরে শোনা গেল। তার সুন্দর ছোট মুখখানি, ঋজু নিটোল গ্রীবা, পাতলা টুকটুকে দুটি ঠোঁট ধ্বনির রূপ নিয়ে আমার সর্ব্বাঙ্গকে এসে যেন স্পর্শ কর্‌ছিল; আমি অনড় আড়ষ্ট হয়ে পড়ে ছিলাম। হঠাৎ ঝুপ্ করে একটা ছেঁড়া মলাটের বই আমার বুকের কাছটায় এসে পড়্‌ল। চম্‌কে উঠে বসে পড়্‌লাম। চকিতে দরজার উপর তার দেহজ্যোতির একটি রেখা টেনে দিয়ে আমার জীবন থেকে উল্কার মতো চিরদিনের জন্যে সে ছুটে বেরিয়ে চলে গেল —চির-দিন।

বইটিকে কিছুদিন আগে আমার কাছ থেকে সে পড়্‌তে চেয়ে নিয়েছিল; দেওয়া-নেওয়ার পালা চুকিয়ে দিয়ে গেল।……

আবার শুয়ে পড়ে বুকের কাছ থেকে হাত দিয়ে আস্তে আস্তে বইটাকে আমি ঠেলে দিলাম, ঝুপ করে মেঝের উপর পড়ে গিয়ে তার বুক-খোলা পাতার ভাঁজের মধ্য থেকে বেরিয়ে পড়্‌ল, সুরবালা।—সুরবালার ছবি!

না গো না, এ তার অপরাধ নয়। সে কিছুই দিয়ে গেল না।—যাবার বেলা আমার 'না-পাওয়ার' দুঃখকে এই ছবিটির মধ্য দিয়ে লুকিয়ে'অক্ষয় করে সে রেখে গেল। আজও বইটির পাতার সেই ভাঁজের মধ্যে সেই ছবিটি আমার কাছে আছে। দুঃখীর ভগবান যদি কেউ থাকেন, তবে এইটিকে ছাড়পত্র করে নিয়ে তাঁর দরজায় আমি ঢুক্‌ব।

কিন্তু শোনো,—যারা ভালোবাসে, তাদের অন্তরটা যেন বস্তুহীন, শূন্যের মতো; একটা-কিছু দিয়ে সেটাকে ভরাতে হয়, নইলে তারা বাঁচ্‌তে পারে না। আমার জীবনের ফাঁক-টাকে আমি টাকা দিয়ে ভরাতে প্রবৃত্ত হলাম। কিন্তু দেখ্‌লাম, টাকা জমে স্তূপা-কার হয়ে ওঠে, তাতে জীবনের ফাঁক ভরে না, জীবন কেবল ভারাক্রান্ত হয়। সুতরাং আবার সুরবালার সঙ্গে দেখা কর্‌লাম। ভাব্‌লাম, দিয়ে যে ভর্‌তে পার্‌লে না, নিয়ে অন্তত সে রেহাই দিতে পার্‌বে।

তখন তারা ভারি দুরবস্থায় পড়েছে। তার স্বামী কালীপদ এর-ওকে দু-ছুটো পাশ দিয়েছিল, আইনের কূটতর্কেও তার সঙ্গে এঁটে উঠতে পারে সে অঞ্চলে এমন কেউ তখনকার দিনে ছিল না। কিন্তু কপালের লিখন, হঠাৎ সে ব্যামোয় পড়ল। ডাক্তারেরা বললে, খুব বেশী বয়স পর্য্যন্তও সে বেঁচে যেতে পারে, কিন্তু কাজ করা লেখাপড়া আর চলবে না। কজা-ভাঙা দরজার মতো চিরকালটা প্রতি মুহূর্তে একটা অনিশ্চয়তা নিয়ে তাকে বেঁচে থাকতে হবে।

আমি সেই ছেলে-বয়স থেকেই জীবনের সকল দিকে আর-সকলের থেকে কেমন-একটু আলাদা।—আমি নিজে সেটা জানি। সব জিনিষকেই সহজ স্বাভাবিকতার দৃষ্টি দিয়ে দেখা আমারা স্বভাব, অন্ধের মতো হ'য়ে কোনো-কিছুকেই খুব চেষ্টা ক'রেও আমি দেখতে পারিনে। তা ছাড়া আমি লোক বা ভালো বুঝি, আগুপাছু না ভেবেই তা করে যাই। সুরবালার সঙ্গে দেখা করতে আমায় একটুও বেগ পেতে হলো না, কালীপদর আমাকে মনে ছিল, নিজে সঙ্গে করে তার কাছে সে আমায় পৌঁছে দিয়ে এল। আমি একেবারেই কাজের কথা পাড়লাম। বললাম, 'তোমার মেয়েটিকে তার এবারকার জন্মদিনে আমার নদীপাড়ের বাগানখানা আমি উপহার দিতে চাই। তুমি আমাকে বঞ্চিত করেছিলে, এই নিরপরাধ শিশুটিকে বঞ্চিত করো না।'

সে বললে, 'আমার মেয়েকে এত কাঙাল তুমি কি জন্যে ভাবচ যে তোমার এই অনুগ্রহের দান না পেলে সে নিজেকে বঞ্চিত মনে করবে? এ-সমস্ত কথা বলবার অধিকার তোমায় কে দিয়েছে? তুমি যাও।'

এক মুহূর্তে আমার এতদিনকার প্রাণপাতের পুরস্কার, আমার বাড়ী-ঘর-বাগান যোতজমের ফল সমস্ত কী নগণ্য নিরর্থকই না হয়ে গেল। তার উপর আমি রাগ করতেও পারলাম না; আমি আমার তুচ্ছ সম্পদ নিয়ে তাকে অপমান করতে গিয়েছিলাম, আমায় ফিরিয়ে দিয়ে তার যে কি মূল্য, আমায় সে তা জানিয়ে দিলে। কোনো-রকমেই সে যে সুলভ হয়নি, তার সম্বন্ধে সেই গর্ব্বের সুখটুকু আছে বলেই ত আমার উদ্দেশ্যহীন তপশ্চর্য্যা তার ব্যর্থতার বোঝা বহন করে দিন থেকে দিনে এগিয়ে চলতে পারছে, নইলে সে কি বাঁচত?

নদীর পাড় ধরে লক্ষ্যহীনের মতো ঘুরে বেড়িয়ে অনেক রাত করে বাড়ী ফিরে এসে আলোটাকে ধরাতে যাচ্ছি, এমন সময় কালীপদ এসে ঘরে ঢুকল। একথা ওকথার পর বার-কয় কেশে, এদিক ওদিক চেয়ে, হাত কচলে সে বললে, 'তোমাদের মধ্যে আজ যা কথা হয়েছে সব আমি শুনেছি। সুরবালা ছেলেমানুষ, তার বুদ্ধি-সুদ্ধি যে কি রকম কাঁচা, তা ত তুমিও জানো। তার কথা ধরতে নেই। তুমি তার আজকের ব্যবহারে কিছু মনে করো না।'

আমি চুপ করে শুনে বাতিটাকে উস্কে দিতে দিতে বললাম, 'আমি কিছু মনে করিনি।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে এক টিপ নস্য নিয়ে মুখে একটুখানি হাসি এনে সে বললে, 'আমাদের মেয়েটিকে তুমি তার মায়ের

অপরাধের ভাগী করো না যেন। বল্‌তে গেলে তুমি ত তার বাবা।'

কালীপদ কি মতলবে এসেচে সেটা আঁচ কর্‌তে পেয়ে আমার মনটা তিক্ততায় ভরে উঠ্‌ল। তার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে আস্তে আস্তে বল্‌লাম, 'আমি তার যে-ই হই, তাকে আমার কিছু দেবার নেই। আমাকে কোনদিন সে জান্‌বে না।'

সে বল্‌লে, 'জান্‌বে। তোমাকে জান্‌তে দিতে হবে। তুমি যদি তাকে ভালোবেসে থাকো তবে তোমার ভালোবাসাতে প্রীতির দেবতার নিয়মে তার দাবী দাঁড়িয়ে গেছে। ইচ্ছে করলেই তুমি তাকে বঞ্চিত কর্‌তে পার না।'

খুব উঁচু রকমের একটা-কিছু বেশ লাগসই করে বলা গেছে, এই রকম একটা ভাবের গর্ব্বে সে মিটমিটে চোখে আমার দিকে চেয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌ল। আমি এবার আর আমার বিরক্তি লুকোবার চেষ্টা না করেই বল্‌লাম, 'দেখুন, আমার মনে আছে বড় বেদনা।— অনেকদিনকার একটা ভুলের মোহ আমার ছুটেচে। প্রলোভনের মধ্যে আমায় আর টান্‌বেন না। আমায় মুক্তি দিন।'

সে দাঁত খিঁচিয়ে নিজ মূর্ত্তি ধরে বল্‌লে, 'তুমি তা বল্‌তে পারো। কিন্তু তুমি জানো এটা পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ, জানো অগ্নিশুদ্ধির মধ্যে দিয়ে এসেও স্বয়ং সীতাদেবীকে এই দেশে বিনা-অপরাধে কি গুরুদণ্ড বহন কর্‌তে হয়েছিল? সুরবালা মেমসাহেব নয়, সে এই দেশেরই মেয়ে। তুমি যদি তার সমস্ত ভার না গ্রহণ কর, তবে আমি তাকে লোক-জানাজানি করে ত্যাগ কর্‌ব, সে কথা আগে থাকতে বলে রাখ্‌চি।'

আমি চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে আবেগ-ভরা গলায় বল্‌লাম, 'তুমি কিছুতে তা পার্‌বে না।'

সে ঠোঁট বাঁকিয়ে একটুখানি হেসে বল্‌লে, 'আচ্ছা, সে দেখা যাবে।'

আরও একবার হার মান্‌তে হলো। এমনই অদৃষ্ট করে এসেছিলাম সর্ব্বস্ব দিয়ে দিয়ে ফতুর হয়ে গেলাম, সে-দায়েও পরাজয়ের কলঙ্ক অক্ষয় হয়ে লেগে রইল। তখন থেকে এই কুড়ি বৎসর নিয়মিত-ভাবে প্রতি মাসের একটি নির্দ্দিষ্ট দিনে রেলষ্টেশনের প্লাটফর্মে কালীপদর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। আমার মাসান্তের সমস্ত পুঁজিপাটা নীরবেই তার হাতে আমি তুলে দিয়েছি, সে ফিরে গিয়ে গাড়ীতে উঠে বস্‌তে না বস্‌তে গার্ডের শিটি পড়েছে। সুরবালা কেমন আছে, সে বেঁচে আছে কি না, সে কথাটি পর্য্যন্ত জান্‌তে চাওয়ার অবসর কোনো দিন আমার হয়ে ওঠেনি।

কিন্তু কালীপদর সম্বন্ধে আমার মনে যে অনুপায় বিরোধ জমা হয়েছিল, সেটা ক্রমে কেটে গেল। সে দুটো এম-এ পাশ দিয়েছিল। যোগ্যতার দিক্ দিয়ে বিচার কর্‌লে সুরবালা তার উপযুক্ত বরই পেয়েছিল। দেখ্‌তেও সে ছিল রাজপুত্রের মতো,—তার কাছে আমি? অমন শরীরের মধ্যে কি করে যে অমন মারাত্মক রোগ লুকিয়ে আত্ম-গোপন করে ছিল ভাব্‌লে আশ্চর্য্য হতে হয়। আহা বেচারা! তা ছাড়া আজ ভাব্‌চি, আমার কাছ থেকে টাকাটা আদায় কর্‌বার এই ফিকির করে সে আমার বন্ধুর কাজই ত করেছিল, আমার জীবনটা কাজে লেগে

গেল। আমি ত দিতেই চেয়েছিলাম, তারা হাত পেতে না নিয়ে না-হয় ফাঁকি দিয়েই নিয়েছে। নেওয়া নিয়ে কথা। পাবার গরজ ত কোনকালেই আমার ছিল না।

আমি বুঝিয়ে বলতে পারব না, কিন্তু টের পেয়েছি। তার উপর আজ জানতে পারছি, —আছে, সে বেঁচে আছে। আমার খুব কাছেই সে আছে। তাকে দেখতে পাইনি, তবু তার সেই পুরানো দিনের নিঃশ্বাসের অস্ফুট সৌরভ আমি যেন অনুভব করতে পারচি। ঐদিকে তাকালেই আমার মনে হয়, বাতায়নে তার শুভ্র সুডৌল বাহুটির একটি-দুটি আন্দোলন থেকে থেকে যেন আমার চোখে পড়ে; সে যেন দাঁড়িয়ে থেকে থেকে হঠাৎ ছুটে পালিয়ে যায়, তার কালো চুলের বোঝা দুলিয়ে যায়, বাতায়নের শূন্যতা পশ্চাতে পড়ে হাহাকার করতে থাকে।

সে আছে, আমার এত কাছে সে আছে।...জানো, ডাক্তার কি বলেছে? বলেছে, আমার রক্তের চাপ এখনো পঁচিশ বৎসরের যুবকের মতো। কম করে আরো কুড়ি বৎসর আমার পরমায়ু। আরো কুড়ি বৎসর আমার এই জীবনটাকে তার কাজে আমি লাগিয়ে যেতে পারব; এ যে কী সুখ!...

শচীপতি।

আহা, বৃদ্ধ! নিজের দুর্ভাগ্যের ইতিহাস বলতে বসে নিজের সুখকেই প্রতিপন্ন করে তিনি থেমেছেন। তখনি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম, কিন্তু তাঁকে বাড়ীতে পেলাম না। সে রাত্রে দোতালের কলের খটখটানিকে জীবিত মানুষের হৃৎস্পন্দনের মতো মনে হতে লাগল।

তারই কয়েকটা দিন পরে একদিন সন্ধ্যাবেলা হঠাৎ কালীপদর মৃত্যু হলো। শচীপতি সেদিন কিছুতেই আমাকে ছেড়ে দিলেন না। আমার মনে হলো, রাত্রে লুকিয়ে লুকিয়ে তিনি কাঁদলেন। আর ঘুরে ঘুরে কেবলই কালীপদর কথা। সে এম-এতে দু-দুটো পাশ দিয়েছিল, ব্যারাম না পড়লে দেশশুদ্ধ লোক আজ তাকে এক-ডাকে চিনত, তার উপর অমন রাজ-পুত্রের মতো চেহারা—আরো কত কি।

ভোরবেলা তাঁকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে একটু ঠাণ্ডা করে রেখে বাড়ী চলে এলাম। ডাকের চিঠিগুলোকে দেখে, গোটাদুই চুরুট ভস্ম করে স্নানের যোগাড় করচি, এরই মধ্যে তিনি আমার বাড়ী এসে উপস্থিত। আমি স্নানাহার ভুলে গিয়ে তাঁকে ঘরে এনে বসালাম। ভয়ানক ব্যস্ত হয়ে অসহায় দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে তিনি প্রথমেই প্রশ্ন করলেন, 'তাদের এর-পর চলবে কেমন করে? আমি জানি, কালীপদ স্বর-বালাকে কিছু জানতে দেয়নি, লুকিয়ে মাসের পর মাস আমার দানকে সে গ্রহণ করেছে। সুরো জানতে পেলে রসাতল করবে।—এখন উপায়?'

আমি ভেবে বললাম, 'এরপর লুকিয়ে দান করার পালাটা উঠে গেল। এখন দানের গর্বে বুক ফুলিয়ে একেবারে তাঁর মুখোমুখি আপনাকে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। মেয়েদের আমি যতটুকু জানি তাতে আমার মনে হয়, আপনার এই কুড়ি বৎসরের আস্পর্ধা মহত্ত্ব ও

মিত্রার ইতিহাস শুন্‌লে তাঁর মন হয়ত নরম হবে। তা যদি না হয়, তবে আপনাকে তিনি অন্তত ক্ষমা কর্‌বেন। এ ছাড়া আর কোনো পথ আমি ত দেখ্‌তে পাচ্ছি না।'

মাথা নীচু করে ভাব্‌তে ভাব্‌তে তিনি বাড়ী চলে গেলেন। তারপর একদিন সন্ধ্যার মুখে আমাকে ডেকে সঙ্গে নিয়ে—দেবীদর্শনে যাত্রা কর্‌লেন। ভাঙা বাড়ীটার দেয়ালগুলো সেদিন আমাদের দেখে অস্তর-খসা ইটের দাঁত বার করে যেন বড় দুঃখের হাসি হেসে উঠ্‌ল। আমি দেউড়ির বাইরে ছড়ি ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম, শচীপতি কিছুক্ষণ আমার হাতটিকে ধরে থেকে সহাস্য বিব্রত দৃষ্টিতে বারবার আমার দিকে ফিরে তাকাতে তাকাতে ভিতরে গিয়ে ঢুক্‌লেন।

একটা হাঁড়ির তলায় কতকগুলো ডালের সঙ্গে কেমন করে লবঙ্গ মরিচ প্রভৃতি কি কতগুলো মিশে ছিল, একটি মেয়ে বারান্দার এক কোণে একটা কুলোতে তাই ঢেলে নিয়ে মাথা নীচু করে বাছ্‌তে বসেছিল, তার সুমুখে গিয়ে দাঁড়িয়ে শচীপতি ডাক্‌লেন, 'সুরো!'

মেয়েটি মাথা তুলে চেয়েই চম্‌কে কুলোর সমস্ত ডাল মাটিতে ছড়িয়ে ফেলে উঠে পড়্‌ল, তারপর ছুটে ঘরের দরজার কাছে গিয়ে দেওয়ালে ঠেস্ দিয়ে দাঁড়িয়ে ভয়-জড়ানো কান্নার সুরে ডাক্‌লে, 'ও মা!'

সেলাই হাতে নিয়ে একটি বৃদ্ধা তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। তাঁর কোটরগত চোখদুটির মধ্যে শচীপতি নিজের দৃষ্টিকে যেন রোপিত কর্‌তে লাগ্‌লেন। কিন্তু সে কেবল ছুটি নিমেষ। তারপর ভূত দেখ্‌লে লোকের যেমন হয়, সেই-রকম করে টল্‌তে টল্‌তে বেরিয়ে এসে তিনি দুহাত দিয়ে জড়িয়ে আমাকে আশ্রয় কর্‌লেন।...যে তরুণী সুরবালা এই দীর্ঘ চৌত্রিশ বৎসর তাঁর কর্ম্মে উদ্দীপনা দিয়েছে, শ্রান্তিতে চিন্তাসুখের অমিয়ধারা জুগিয়েছে, যার স্মৃতি অশ্রু হয়ে ঝরে জরাগ্রস্ত দেহের নীচে অজর প্রাণের তারুণ্যকে সতেজ করে বাঁচিয়ে রেখেছে এতদিন, তার জায়গায় এই লোলচর্ম্ম পলিত-কেশ দন্তপংক্তি-হীনা নারী!

বাড়ী এসে আয়নার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে পাকাচুলগুলোর মধ্যে আঙুল চালাতে চালাতে মুখে ভারী করুণ একটু হাসি এনে তিনি বল্‌লেন, 'মেয়েটা বোধ হয় আমার সাদা চুল-গুলো দেখেই ভয় পেয়ে গেল, কি বল...?'

একটু পরেই একটা চেয়ার নিয়ে আমার দিকে ঘুরে বসে বল্‌লেন, 'সত্যি, মেয়েটাকে অমন করে ভয় পাইয়ে দিলাম। আমার সুরবালাকে মনে পড়্‌ল। আমি একটা আস্ত গাধা, কি বল...?'

তখনি উঠে গিয়ে একটা ছেঁড়া ময়লা পুরানো বইয়ের পাতার ভাঁজের মধ্যে থেকে একটি ছবি বার করে এনে আমার কাছে ধরে তিনি বল্‌লেন, 'তুমি মেয়েটিকে দেখেছ ত? সত্যি করে বল দেখি, আমার ভুল হতে পারে কি না?' তারপর আমার উত্তরের জন্যে অপেক্ষা না করেই ছবিটিকে হাতে নিয়ে তিনি ধ্যানস্থ হয়ে পড়্‌লেন। আমি তাঁকে সেই অবস্থায় রেখে পা টিপে বেরিয়ে চলে এলাম।

পরের দিন তাঁর সঙ্গে দেখা কর্‌তে এসে দেখি, শরৎশেষের ঝরা পাতার মতো সেই

ছবিটিকে শতশত-টুকরা করে ঘরময় ছড়িয়ে, আয়নার দিকে ঘুরে, শিথিল মাথাটাকে দুই করতলের মধ্যে নিয়ে তিনি বসে আছেন। তাঁর দেহের সর্বাঙ্গে বার্দ্ধক্য এসে পৌঁছেছে। আজ আর অন্যদিনের মতো আমাকে দেখে তাঁর চোখদুটি স্নিগ্ধ প্রসন্নতায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল না। আমারও মনে হতে লাগল, এক রাত্রিতেই তিনি যেন আমার কাছ থেকে অনেকখানি দূরে সরে চলে গিয়েছেন, কোনদিনই আমি আর তাঁর নাগাল পাব না। তার সঙ্গে ঠিক আগেকার জায়গাটিতে মিলতে পারব না।

বিকেলের দিকে লাঠি ভর দিয়ে দিয়ে আবার তিনি সেই পুরোনো ভাঙা বাড়ীটাতে এসে হাজির হলেন। পাছে পড়ে যান এই ভয়ে আমাকেও সঙ্গে আসতে হলো। সুরবালা সেলাই নিয়ে বারান্দায় বসেছিলেন, তারই নীচেকার উঠানে লাঠি-গাছটার উপর বসে পড়ে শচীপতি একেবারেই বললেন, 'তোমাকে ভাবা আমার বোধ হয় এই শেষ, কিন্তু তোমাদের জন্যে শেষ পর্যন্তই আমি ভাবতে পারব। যে-কটাদিন আছি এই অধিকারটুকু তুমি আমায় দিয়ো।'

সুরবালা সেলাই তুলে উঠে পড়ে বললেন, 'আমার স্বামী যতদিন বেঁচে ছিলেন, তুমি বেশ ভালো মানুষটি হয়ে ছিলে, আজ আবার অসহায় পেয়ে আমাকে অপমান করতে এসেছ। আমার ছেলেমেয়েরা এখনই হয়ত স্কুল থেকে বাড়ী এসে পড়বে, তুমি যাও। আমার ভাবনা যাঁর ভাববার ছিল তিনি যথেষ্ট করে তা ভেবে রেখে গেছেন। এ সান্ত্বনাটুকুমাত্র তোমায় আমি দিতে পারি।'

একটু হেসে, চুপ করে মাথা নীচু করে থেকে, মনের সমস্ত মিনতি ভরে শচীপতি বললেন, 'আচ্ছা, বেশ, যাচ্ছি। কিন্তু কেবল একটিবার তুমি আমার বাড়ীতে চল, একটি দণ্ডের জন্য। দেখবে, জীবনের আরম্ভে চৌত্রিশ বৎসর আগে তোমার জন্যে যা-কিছু আমি জুটিয়েছিলাম, সব যেমনকার তেমনি রয়েছে, বইয়ের মলাটটি অবধি বদলানো হয়নি। তারপর এত এতকাল যে ঐশ্বর্য্য আমার জমে উঠেছে, শুকনো ডাল যে মুঞ্জরিত হয়েছে, ফুল ফুটেছে, ফল ধরেছে, সে কার যাদু-কাঠির স্পর্শে? তোমাকে তা বলে লাভ নেই জানি, তবু একটিবার তোমায় কেবল দেখিয়ে দিয়ে এ-সমস্ত আমি ত্যাগ করব। তুমি নিয়ো না, কিন্তু তোমার জিনিষ তোমাকে বুঝিয়ে দিয়ে ঋণমুক্ত হয়ে আমায় মরতে দাও, নইলে মরেও আমার আত্মার মুক্তি হবে না। তুমি চলো।'

সুরবালা নাকি সুরে টেনে টেনে বললেন, 'সে কি করে হবে? সমাজ ত আছে। তুমি কি আমায় লোকলজ্জা ছাড়তে বল?'

লোকলজ্জা? এই জরাগ্রস্ত মৃত্যুমুখ লোলচর্ম বৃদ্ধ বৃদ্ধার।...শচীপতি উচ্চকণ্ঠে বিকট অট্টহাস্য করে উঠলেন, দিবসের প'ড়ে-আসা রোদ সে হাসির শব্দে ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেল। কদর্য্য সমাজ, অন্ধ সমাজ, ঘৃণিত সমাজ, যে নিজের কুৎসিত কল্পনাকে ভয় ক'রে অবোধ শিশুকেও পাষাণ-শৃঙ্খল বাঁধে, নিরুপায় বার্দ্ধক্যকেও নিশ্চিন্ত হয়ে রেহাই দেয় না। হাতের লাঠিটাকে ঠক ঠক করে ঠুকতে ঠুকতে যেন হাওয়ার আগে তিনি বাড়ী ফিরে চললেন, আমি ব্যস্ত হয়ে ধরতে গেলাম,

আমায় ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলেন। খানিক-দূর গিয়ে মাঝপথে থেমে আবার একবার ভাঙা-বাড়ীটার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বিকট স্বরে তিনি হেসে উঠ্লেন, নদীর ওপারে প্রতিধ্বনির পরম্পরা সেই হাসির শব্দকে দূর থেকে দূরে ব্যস্ত ত্রস্ত হয়ে বহন কর্তে লাগ্ল। ঘরের সিঁড়ি উঠ্তে হাসির ক্লান্তিতে তার পা টল্তে লাগ্ল, কোন রকমে নিজেকে সাম্লে, পড়্তে পড়্তে এগিয়ে গিয়ে বোতামের কলটার গোড়ায় মুখ থুবড়ে তিনি পড়ে গেলেন। রাত্রি ভোর হবার আগেই ডাক্তারের ভবিষ্যৎ বাণী ব্যর্থ হয়ে গেল।

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী।

ভোম্‌রার গান

কে আসে গুন্‌গুনিয়ে, চেনে তায় কমল চেনে।
অরসিক হল্ চেনে তার রসিক চেনে রস-ভিয়েনে।
কালো তার অঙ্গেরি রঙ্
মাখা তার পরাগ কিরণ,
চলে যায় বাজে সারং হিয়ার সোহাগে হাওয়ায় টেনে।

আসে যায় আনমনে ও দুলিয়ে কলি
চেনে ও ফুল-মুলুকের অলি-গলি।
ওরি মন্তরের কমল
মেলে তায় তার শত দল,
হৃদয়ের সাত-মহলা খুলে তায় বন্ধু মেনে।

তুলে ঢেউ গুঞ্জ-গাথায় কুঞ্জে ঘোরে
মধু-বিষ মিশিয়ে বিধি গড়্লে ওরে,
জানে ও হুল্ ফোটাতে
জানে ও ফুল ছোটাতে
পারে ও ফুল ফোটাতে প্রাণের তারে পলক হেনে।

শ্রীনবকুমার কবিরত্ন।

চয়ন

মনের বয়স

সমবয়সী ছেলেদের মধ্যে কেউ প্রতিভাশালী, কেউ নির্বোধ হয় কেন, এই নিয়ে বৈজ্ঞানিকরা অনেক মাথা ঘামিয়ে স্থির করেছেন যে, মনের বয়সের কম-বেশীর জন্যই এই তারতম্য হয়। যেমন কোন ছেলের বয়স, হয়তো জন্ম-তারিখ থেকে হিসেব ক'রে ঠিক দশবছর হয়েছে, কিন্তু তার মনটা ঠিক বয়সের সঙ্গে-সঙ্গে দশ বছরের মত বেড়ে উঠতে না পেরে হয় তো প্রায় তিন বছর পেছিয়ে এখনও সাত বছরের কোটাতেই পড়ে আছে। আবার কোনও কোনও ছেলের বয়স হয় তো সবে দশবছর, কিন্তু তার মনটা বয়সের চেয়েও আগে বেড়ে উঠে তেরো-চোদ্দোর নাগালে গিয়ে পৌঁছেছে। এই সব ছেলেই জগতে একদিন প্রতিভাশালী লোক ব'লে পরিগণিত হয় আর পূর্ব্বোক্ত ছেলেরা নির্ব্বোধ ব'লে অভিহিত হয়ে থাকে।

ছেলেদের সঙ্গে সামান্য দু'চার কথা ক'য়েই বুঝতে পারা যায় যে, সে কি ধরের ছেলে, অর্থাৎ তার বয়সের সঙ্গে মনের সামঞ্জস্য আছে কিনা? যদি থাকে, তবে বুঝতে হবে যে ভবিষ্যতে সে একজন সাধারণ লোক ব'লেই পরিগণিত হবে; কিন্তু মন যদি তার বয়সের চেয়ে পেছিয়ে পড়ে থাকে তবে সে নির্বোধ হবে নিশ্চয়; আর তার মনের বয়স যদি তার নিজের বয়সকে ছাড়িয়ে এগিয়ে চলেছে দেখা যায়, তাহলে নিঃসন্দেহে ভবিষ্যদ্বাণী করা যেতে পারে যে, সে একদিন প্রতিভাশালী ব'লে গণ্য হবে। এই রকম যেমন "তোমার নাম কি?" এই প্রশ্নের জবাব যে-কোন একটি তিনবছরের ছেলে দিতে পারে। "তুমি খোকা না খুকী?" একটী চার বছরের ছেলে অনায়াসে এ প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারে। "তোমার বয়স কত?" জিজ্ঞাসা করলে একটী পাঁচবছরের ছেলের পক্ষে সঠিক জবাব দেওয়া সম্ভব। কিন্তু তাদের গোটাকতক সামান্য রকম ঠকানো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেই তাদের মনের বয়সটা সহজেই ধরা পড়বে। যেমন জনকতক সাত আট বছরের ছেলেকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়—"আচ্ছা বল দেখি, রাম শ্যামের চেয়ে যদি বেশী খেতে পারে, আর শ্যাম, যদু চেয়ে বেশী খেতে পারে, তাহলে সব-চেয়ে বেশী খেতে পারে কে?" "একমণ তুলো বেশী হাল্‌কা, না একমণ সোনা বেশী হাল্‌কা?" "বরফ কিসের মতন ঠাণ্ডা?"—"তিনের ডবল যদি ছয় হয়, তাহলে সাড়ে-তিনের ডবল কত হবে?" 'বল' কত রকম আছে?—ইত্যাদি।

তেরো-চৌদ্দ বছরের ছেলেদের পরীক্ষা করতে হ'লে কতকগুলো সহজ সমস্যাপূরণ করতে দিতে হয়, যেমন—"যদু মধুকে ডেকে বললে, তুমি যদি আজ ইস্কুলে যাও তাহ'লে আমিই বাড়ীতে থাকি; আর আমি যদি বাড়ীতে থাকি, তাহ'লে তুমিই ইস্কুলে যাও, এখন বল দেখি, কে ইস্কুলে গেল আর কে বাড়ীতে রইল?"—কিম্বা "মণি কণী ষ্টেশনের দিকে যেতে যেতে মণি বললে, দেখ কণী, আজ যদি তাই ট্রেণখানা 'লেট' হয় তাহ'লে আমরা দেশে গিয়ে বাবার দেখা পাব না, কিন্তু ট্রেণ-

খানা যদি 'লেট' না হয় তাহ'লে আমরা বোধ হয় ট্রেণ ফেল্ হবো।' তারপর ষ্টেশনে গিয়ে তারা বুঝ্‌তে পারলে না যে ট্রেণখানা 'লেট' হয়েছে, কি, হয় নি। এখন তোমরা কেউ বল্‌তে পার যে তারা দেশে গিয়ে দাদার দেখা পেয়েছিল কি না?"—এ ছাড়া অঙ্ক, কথার মানে, ছবির মন্ম, এ-সব জিজ্ঞাসা ক'রেও মনের বয়স ধরা যায়—; আর একটা সহজ উপায় হচ্ছে তাদের গল্প বল্‌তে বল্‌তে ভাব ভিতর ইচ্ছে ক'রে মাঝেমাঝে কিছুকিছু ভুল জবানবন্দী ক'রে যাওয়া। যেমন, "একজন নিঃসন্তান সওদাগর তিনটি ছেলে রেখে মারা গেল, তাদের একজন চোখে কিছু দেখতে পায়না, আর দু'জন অন্ধ! একদিন তারা তিন ভাই পরামর্শ ক'রে দেশ-ভ্রমণ করতে বেরুলো। অনেক দূর যেতে যেতে তারা দেখলে, সাম্‌নে একটা মস্ত নদী শুকিয়ে রয়েছে, ধূ ধূ করছে বালির রাশ। তিন ভাই তখন কি করে, মালকোচা বেঁধে অনেক কষ্টে সাঁতার কেটে নদীটা পার হ'ল"—ইত্যাদি।

বিলাতে ছেলেদের ইস্কুলে ভর্ত্তি করবার সময় এখন এই ভাবে তাদের পরীক্ষা ক'রে নেওয়া হয়। যে ছেলেদের যেমন মনের বয়স, সেই হিসাবে শ্রেণী-বিভাগ ক'রে, যে, যে বিষয়ে শিক্ষালাভের উপযুক্ত তাকে তদনুরূপ শিক্ষা দেওয়া হয়। আমাদের এখানকার মত মুড়ি-মিছরির একদর সাব্যস্ত ক'রে ঘোড়া আর ভেড়াকে এক ক্লাসে ভর্ত্তি ক'রে নেয় না।

মনের বয়স হিসাবে—শ্রেণী-বিভাগ ক'রে যোগ্যতা-অনুসারে বিশেষ বিশেষ বিষয় শিক্ষা দেওয়ার একটা মস্ত সুফল দেখা যায় এই,—যে, পরবর্ত্তী জীবনে সংসারে প্রবেশ ক'রে সে-সব ছেলেকে প্রায়ই ব্যর্থ বা অকৃতকার্য্য হতে হয় না; কেন না তারা তখন ঠিক তাদের উপযুক্ত কাজটিই বেছে নিতে পারে।

মুখ-দর্পণ

পাতলা লম্বাটে মুখ মানসিক ও দৈহিক শক্তির চিহ্ন, কিন্তু মুখখানা যদি চৌকো আর বেঁটে হয়—তাহলে সেটি তার নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচায়ক।

পাতলা-মুখো লোকের চিবুকটা যদি বেশ চৌকোনা দেখা যায়, তাহলে বুঝতে হবে যে, তার ইচ্ছা-শক্তি খুব প্রবল আর তার ভিতর একটা কোন নূতন কাজের সূত্রপাত করবার ক্ষমতা আছে। এমন-কি সে কাজে সে-রকম লোক অনেকদূর পর্য্যন্ত এগিয়েও যেতে পারে, কিন্তু চৌকো আর বেঁটে লোকেরা বাঁধা রাস্তা ছাড়া এক পা চল্‌তে পারে না, আর সেই গতানুগতিক পথেই তারা চিরকাল আটকে পড়ে থাকে।

যাদের মুখ ঠিক গোল নয় অথচ বাদামীও নয়, দু'য়ের মাঝামাঝি—চোখ-দুটীর চাউনি বেশ খোলা আর ভুরুর রেখা খুব স্পষ্ট ও সমান, তারা প্রায়ই ব্যবসাদার, কাজের লোক হয়।

যাদের চওড়া কপাল ঠিক চোখের উপর

থেকেই আরম্ভ হয়েছে তারা সঙ্গীত-বিদ্যার পারদর্শী। যাদের কপাল সঙ্কীর্ণ তাদের মন বড় দুর্ব্বল ও অস্থির। যাদের কপালের উপর দিক ক্রমশঃ ঢালু হয়ে গেছে, অর্থাৎ চোখের উপর দিকটা উঁচু, কিন্তু মাথার দিকে ক্রমশঃ নীচু হয়ে পড়েছে—তারা কাণ্ডজ্ঞান-হীন নির্ব্বোধ, লোকের কুৎসা ক'রে বেড়াতেই ভালবাসে, কিন্তু উপকার করতেও চায়—যদি বোঝে যে, তাতে নিজের কোনও ক্ষতি হবে না।

চোখই হচ্ছে মানুষ চেনবার প্রধান উপায়। যাদের দুটি আয়ত ইন্দীবর নয়নে বেশ সরল সুন্দর দৃষ্টি—তাদের খুব কমনীয় নির্ম্মল স্বভাব। যাদের ক্ষুদ্র চোখ সঙ্কীর্ণ, তারা ধূর্ত্ত, প্রবঞ্চক, কুঁড়ে আর স্বার্থপর হয়, যাদের চোখ এই দু-রকমের মাঝামাঝি অর্থাৎ খুব ডাগরও নয় বা বেশী সঙ্কীর্ণও নয়, তারা বিশ্বাসী সাদাসিধে খাড়া লোক।

যাদের নাকটি বেশ বাঁশীর মতো, তাদের মনের জোর আছে—দৃঢ়-সঙ্কল্প আছে—আর কার্য্য-কুশলতাও যথেষ্ট।

যাদের নাকটী সরু ছুঁচালো, তাদের সকল বিষয়ে কৌতূহলের মাত্রাটা একটু অধিক। খাটো নাকওয়ালা লোকেরা ধৃষ্ট, প্রগল্ভ ও নির্লজ্জ হয়। নাক যাদের চ্যাপ্টা তাদের প্রকৃতিতে গুণ্ডামির ভাবটা প্রবল থাকে।

ঠোঁট-পুরু লোকেরা নিতান্ত তামসিক ভাবাপন্ন, বিষয়ভোগ-লালসা-লিপ্ত—বিলাসী ও পেটুক হয়। পাত্‌লা ঠোঁট যাদের, তাদের ইচ্ছাশক্তি খুব প্রবল হয় বটে, কিন্তু মেজাজ বড় খারাপ হয়।

মদনের ফুলধনুর মতো সুন্দর অধরপুট যার, তার মুখখানি যদি বেশ দৃঢ় সুগঠিত হয়, তবে সে আদর্শ-চরিত্র লোক হয়। তার অন্তরের মধ্যে বিশ্বের কল্যাণ-কামনা নিহিত থাকে। সে আশুতোষ, সদানন্দ, সংবেদনশীল, সকলের দুঃখে সহানুভূতি-সম্পন্ন, অকপট আন্তরিকতার পরিপূর্ণ, ন্যায় ও সত্যের অবতার।

চৌকো চিবুক যার, সে এই সংসারে সহজে দুঃখ-ঝঞ্ঝার সঙ্গে অমিতবিক্রমে যুদ্ধ ক'রে, বিজয়গৌরবে উন্নতির মুখে এগিয়ে যেতে পারে। যাদের চিবুক গোল, তারা অলস ও বিলাসী হয়। যাদের চিবুক অভ্যন্তরগত অর্থাৎ ভিতরদিকে সঙ্কুচিত, তারা দুর্ব্বল হয় ও সকল কাজেই ইতস্ততঃ করে।

মাথার দিকে ঘেঁসা ছোট ছোট কান যাদের, তাদের মানসিক সৌন্দর্য্য ও উৎকর্ষ দেখা যায়। সুকুমার কলা-বিদ্যার উপর তাদের ঝোঁক থাকে আর চরিত্র বিশুদ্ধ হয়। বড় বড় ঝোলা-কান একগুঁয়েমি, বোকামি ও পাশবিক প্রবৃত্তির পরিচায়ক। কোন কোন লোক কান নাড়্‌তে পারে। যারা এই শক্তির পরিচয় দেয়, তারা অল্পদিনমাত্র মানুষ হয়েছে। তাদের প্রকৃতিতে অজ্ঞাত পশুভাবও অত্যন্ত প্রবল থাকে। কান যে মানুষের বংশ-পরিচয়ের ধারা নির্ণয় ক'রে দিতে পারে, নৃতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা সম্প্রতি তা আবিষ্কার করেছেন। তাঁরা বলেন, আঙুলের ছাপ্-চেনার মত, কেবল কান দেখেই—অদূর-ভবিষ্যতে অপরাধীদের সনাক্ত করা চলবে।

শ্রীনরেন্দ্র দেব।

সেকালের দুটি দৃশ্য

সংহারকর্ত্তা ভিসুভিয়াস, খৃষ্টিয় ১৯ শতাব্দীতে সুন্দরী পম্পিনগরীকে বিরাট এক চিতায় তলায় চাপা দিয়াছিল; এবং মানুষ তাই সযত্নে স্বপ্নের মত আবার তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়াছে, এ কথা এখন সকলেরই জানা আছে। কিন্তু সেই আবিষ্কারের পর, অল্পকাল পূর্ব্বেই পম্পির আর এক নূতন অংশ আবার খনকদের কোদালের মুখে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। তাহার মধ্যে প্রধান হইতেছে Street of Abundance নামে একটি রাস্তা।

পম্পি ইতিহাসের সেইদিনের একটি মূর্তিমান সাক্ষীর মত—যে দিন আর নাই, আর আসিবে না। তাহার ধ্বংসস্তূপের মধ্যে একটি আশ্চর্য্য সত্য দর্শকের মনকে বারংবার আঘাত দেয়। আজ দুই হাজার বৎসরের শিক্ষা অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান বিজ্ঞানের পরেও, একালের উন্নতি-গর্ব্বিত মানব-সভ্যতা সেই সুদূর-অতীতের স্মৃতি-মাত্রসার মানুষগুলিকে বড় বেশী পিছনে ফেলিতে পারে নাই। বরং সৌন্দর্য্যবোধে এবং কলাজ্ঞানে একালের চেয়ে সেকাল যে অধিক উন্নত ছিল, পম্পির এই নবাবিষ্কৃত রাজপথে পদে পদে তাহাই প্রমাণিত হয়।

ভিসুভিয়াসের অগ্নি-উদ্গারে পম্পি নগর যখন ধ্বংস হয়, নগরের বাসিন্দাদের চিত্ত তখন এক রাজনৈতিক আন্দোলনে বিক্ষুব্ধ ছিল। একালে রাজনৈতিক নেতারা নির্ব্বাচনের সময়ে খবরের কাগজ ও পুস্তকের দ্বারা আপনার বক্তব্য জনসাধারণের সামনে খুলিয়া বলেন। কিন্তু পম্পি যে-যুগের সহর, সে যুগে মুদ্রাযন্ত্রের সৃষ্টি হয় নাই। তাই তখনকার নেতারা কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট বাড়ীর দেওয়ালের উপর আপনাদের আবেদন লিখিয়া, সাধারণকে নিজের নিজের দলে টানিবার চেষ্টা করিতেন। এই প্রতিযোগিতার মধ্যে



পম্পির একটি পুরানো বাড়ীর ভিতরের দৃশ্য



দুহাজার বৎসরের পুরানো মানুষের মূর্তি। মাটি থেকে খুঁড়ে বার করা।

এমন-সব ব্যাপারও ঘটত, যাহাতে একালের আমরা কিছু হাসিয়াও লইতে পারি। কারণ, সে যুগের নেতারা প্রতিপক্ষের আবেদন সকলের চোখের আড়ালে রাখিবার জন্য, তাহার উপরে লুকাইয়া চুণকাম করাইয়া আপনাদের আবেদন দাগিয়া দিতেও সঙ্কুচিত হইতেন না—একালে যেমন দেওয়ালে-মারা এক ব্যবসায়ীর বিজ্ঞাপনের 'প্লাকার্ডের' উপরও অন্য ব্যবসায়ীর লোকেরা আসিয়া আপনাদের বিজ্ঞাপন মারিয়া দিয়া যায়।

কেবল পম্পি নয়, তাহার সঙ্গে হার্কুলেনিয়াম নামে আর-একটি সহরও ভিসুভিয়াসের জলন্ত ক্রোধে ভস্মস্তূপে আত্মগোপন করিয়াছিল। কিন্তু সে সহরটি এখনো একশো-ফুট গভীর কঠিন গন্ধক, মাটি ও ভস্মরাশির ভিতরে সমাধিস্থ হইয়া আছে। তবে পম্পির উপরকার আবরণটা তেমন শক্ত ছিল না বলিয়াই মানুষ সহজে তাহার কঙ্কালকে খুঁড়িয়া বাহির করিতে পারিয়াছে।

পম্পির খনন-কার্য্য এখনো শেষ হয় নাই। প্রথম খনন আরম্ভ হইয়াছিল ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে। প্রথম সাত-বৎসরেই পম্পির ভিতর হইতে সাতশো আটত্রিশখানা ছাব, সাড়ে-তিনশো পাথরের মূর্ত্তি এবং একহাজার ছয়শো সাতচল্লিশটি অন্যান্য খুচরা দ্রব্য পাওয়া গিয়াছিল। তারপরে আজ-পর্য্যন্ত যে আরো কত শিল্প-বিচিত্র দ্রব্যাদি এখান হইতে পাওয়া গিয়াছে, তাহার আর সংখ্যা হয় না। শুনা যাইতেছে, হার্কুলানিয়ামকেও শীঘ্রই পুনরুদ্ধার করিবার চেষ্টা হইবে।

পম্পির সাধারণ আকার অনেকটা ডিমের মত। ইহার চারিধারে পাঁচিলের বেড় ছিল প্রায় তিন মাইল। সহরের রাস্তাগুলি তেমন চওড়া ছিল না (সব-চেয়ে চওড়া রাস্তাটি বত্রিশ ফুট মাত্র চওড়া ছিল) বটে, কিন্তু প্রত্যেক রাস্তাই পাথর-বাঁধানো হইত। কিন্তু পম্পির রাস্তাগুলি সরু হইলেও সুন্দর ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। পম্পি ধ্বংস হইবার দেড়-হাজার বৎসর পরেও, লণ্ডন ও প্যারি সহরের পথ-ঘাটগুলি বেশী-চওড়া হইলেও—



পম্পির একটি রাজপথের ধ্বংসাবশেষ

তাহাদের অবস্থা। পম্পি রাজপথে চেয়ে ফুটের বেশী যাবার ছিল।

সেই পুরাতন দিনেও সহর হিসাবে পম্পির স্থান প্রথম শ্রেণীতে ছিল না। কিন্তু পম্পির ধ্বংসাবশেষের ভিতর হইতে যে-সব সামগ্রী পাওয়া গিয়াছে, তাহা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, আধুনিক প্রথম শ্রেণীর নগরগুলিতে সভ্যতা ও বিলাসিতার যে-সকল উপকরণ দেখা যায়, প্রাচীন পাম্পি-নগরে তাহার অধিকাংশই বিদ্যমান ছিল।

পম্পির অনেকগুলি প্রকাণ্ড অট্টালিকা ভগ্নাবস্থায় আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাদের আকার, গঠন-কৌশল ও কারুকার্য্য এখনো সকলকে মোহিত করে। এখানকার সব-চেয়ে বড় প্রাসাদটির আকার দৈর্ঘ্যে একশো আশি ফুট ও চওড়ায় আশি ফুট। অধিকাংশ অট্টালিকাতেই যথেচ্ছভাবে যেখানে-সেখানে উঁচুদরের মার্ব্বেল পাথর ব্যবহৃত হইয়াছে। পম্পি-নগরে চারটি রঙ্গালয়ও পাওয়া গিয়াছে। তাহাদের একটিতে এক সঙ্গে পাঁচহাজার ও আর একটিতে দেড় হাজার লোকের স্থান সঙ্কুলান হইতে পারে। এখানে দর্শকরা ধাতুনির্ম্মিত টিকেট ব্যবহার করিত। অন্যান্য বিখ্যাত অভিনেতার সঙ্গে রোটিকা নামে একজন জনপ্রিয় অভিনেত্রীর নামও জানিতে পারা গিয়াছে। গ্লাডিয়েটররা যেখানে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিত, সেই "অ্যাম্পিথিয়েটার"টিও কম বড় নয়। তাহার ভিতরে একসঙ্গে বিশহাজার লোকের জায়গা হইত।

পম্পির ছোট বড় অসংখ্য বাড়ীর দেওয়ালেই শত শত ভিত্তি-চিত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। এ-সব ছবির বিষয়-বৈচিত্র্যও অপূর্ব্ব,—পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক কাহিনী, প্রাকৃতিক ও কাল্পনিক দৃশ্য—সমস্ত বিষয়ই চিত্রকরের বিচিত্র তুলিকা-স্পর্শ লাভ করিয়াছে।



পাম্পির একটি পুরাতন থামওয়ালা প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ

পাম্পির পুনরাবিষ্কারের পরে, নানা লোকের দ্বারা তাহার কলা-ভাণ্ডার লুণ্ঠিত হইত। কিন্তু সেই অবাধ-লুণ্ঠন এখন বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রত্নতাত্ত্বিকরা এখন ইতস্ততঃ-বিকীর্ণ ভগ্নাংশগুলি যথাস্থানে জোড়াতাড়া দিয়া সাজাইয়া, মেরামত করিয়া, অনেক পুরাতন ঘর-বাড়ীর মূর্ত্তি আবার সম্পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছেন। অগ্ন্যুৎপাতের সময় ভয়ত্রস্ত বাসিন্দারা পলাইতে পলাইতে যেখানে-সেখানে পড়িয়া মরিয়াছিল, তাহাদের ছাইচাপা কঠিন দেহগুলিকে এখনো ঠিক মত সেই জায়গায় সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। একজায়গায় একটি চাকর গাছে চড়িতেছিল, সেই সময় তপ্ত ভস্মরাশি আসিয়া গাছসুদ্ধ তাহাকে পুঁতিয়া ফেলে,—সেই-অবস্থায় সে বেচারীর দেহটি এখনো দেখিতে পাওয়া যায়। একটি দেওয়ালে কোন শিশু বাড়ীর কর্তার নামটি খুদিয়া রাখিয়াছিল—সেটিও আজ পর্য্যন্ত টিকিয়া আছে।

* * * *

প্রত্নতত্ত্ববিদগণের দ্বারা রোমের আর একটি গুপ্ত ঐশ্বর্য্য, এই সবে আবিষ্কৃত হইয়াছে। এটি প্রাচীন রোমের একটি রাজকীয় স্নানাগার। ভ্রাতৃহত্যাকারী সম্রাট কারাকালার দ্বারা ২১৬ খৃষ্টাব্দে এটি নির্ম্মিত হইয়াছিল—অর্থাৎ পাম্পির সমাধি-লাভের একশো-সতেরো বৎসর পরে। সুতরাং এই অপূর্ব্ব স্নানাগারটিকেও প্রায় সেই সময়েরই সভ্যতার নিদর্শন বলিয়া ধরিতে হইবে। আর বাস্তবিক-কথাও তাই। কারণ পাম্পির



পম্পির একটি প্রাসাদের বিস্তৃত কক্ষ

ভাঙা কঙ্কালের উপরে যে সৌন্দর্য্যের অবশেষ দেখা যায়, ঠিক সেই একই আদর্শের সৌন্দর্য্য কারাকাল্লার স্নানাগারের সর্ব্বত্রই অভিব্যক্ত হইয়াছে।

এই স্নানাগারটি ছিল প্রকাণ্ড—লম্বায় ও চওড়ায় ১০৫০ ও ১৩৯০ ফুট। প্রাচীন রোমবাসীরা স্নানগৃহে অতুল বিলাসিতার পরিচয় দিতেন এবং সেই বিলাসিতার সৌন্দর্য্য এখানে আবার চরমে উঠিয়াছিল। এই বিরাট স্নানাগারের তলায় ১০৫৩৫ ফুটব্যাপী অসংখ্য সুড়ঙ্গ-পথ ছিল। সেই সব পথ দিয়া ক্রীতদাসরা সকলের অগোচরে আনাগোনা করিত। তাহাদের কর্ত্তব্য ছিল, স্নানাগারের বিভিন্ন গৃহে দরকার-মত জল ও আলোর ব্যবস্থা করা। সেই-সব সুড়ঙ্গ-পথ দেখিলে সেকালের স্থপতিবিদগণের আশ্চর্য্য শক্তি ও কৌশলের কথা ভাবিয়া স্তম্ভিত হইতে হয়।

এই স্নানাগারেরও এখন ভগ্নদশা। নিষ্ঠুর কাল ও অসভ্য মানুষ একসঙ্গে ইহার উপরে অত্যাচার করিয়াছে। সেই বহুকালব্যাপী অত্যাচার ও যথেচ্ছ লুণ্ঠনের ফলে, স্নানাগারের অমূল্য কারুকার্য্য-খচিত মর্ম্মর শিলাপট ও প্রতিমূর্ত্তিগুলি এখন কোথায় অদৃশ্য বা দেশদেশান্তরে প্রেরিত হইয়াছে, নয় তো ভাঙিয়া-চুরিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়া আছে। এখানকার একটি হাত-পা-মাথা ভাঙা মূর্ত্তি দেখিয়া, একসময়ে শিল্পী-শ্রেষ্ঠ মাইকেল এঞ্জেলোর মনেও অপূর্ব্ব বিস্ময় ও ভাষাতীত প্রশংসা জাগিয়া উঠিয়াছিল।

শ্রীপ্রসাদদাস রায়।

ম্যাপ আঁকা

মানচিত্র আঁকার কথা বড়-বেশী শোনা যায় না বটে, কিন্তু একালে মানচিত্র একটা দরকারি জিনিষ।

পৃথিবীর সব-চেয়ে পুরানো মানচিত্র আছে, টিউরিন সহরের যাদুঘরে। এই মানচিত্রখানি প্রাচীন মিশরের গাছের পাতায় আঁকা। তাহাতে নানারকমের লেখা-রেখা চিহ্নের সঙ্গে নদ-নদী আঁকা আছে,—এমন কি জলের কুমীর ও মাছ পর্য্যন্ত বাদ পড়ে নাই! সেই মানচিত্রখানির অঙ্কন-কাল ১৩১০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দ!

মানচিত্র আঁকায় মানুষের দক্ষতা এখন এত-বেশী হইয়া উঠিয়াছে যে, সমগ্র ইংলণ্ডের খুব অজ-পাড়াগাঁয়েরও কোন্ কোণে ক'টা গাছ আছে, ম্যাপ দেখিয়া অনায়াসে তাহা জানা যায়! বিলাতে যে সব ম্যাপে পঁচিশ ইঞ্চির স্কেলে এক এক মাইল ধরা হইয়াছে, তাহাতে সারা দেশের প্রত্যেক কুঁড়েঘর, গাছ বা ঝোপঝাড় পর্য্যন্ত অঙ্কিত আছে!

তামার পাতে ম্যাপ খোদাই করা হয়। আগে লিথোগ্রাফের পাথরে ফেলিয়া ম্যাপ ছাপা হইত—এখন হয় অ্যালুমিনিয়ামের পাতের উপরে। ভিন্ন ভিন্ন পাতে ছাপাইয়া ম্যাপকে রঙিন করা হয়। প্রথমে খুব বড় স্কেলে ম্যাপ আঁকিয়া, তারপর আলোক-চিত্রের সাহায্যে তাহাকে ছোট করিয়া আনার দরুন ম্যাপের প্রত্যেকটি রেখা হয় খুব স্পষ্ট ও ঝরঝরে। অনেক সময়ে এক-একখানি মানচিত্র আঁকিতে ত্রিশ-চল্লিশজন বিশেষ বিশেষ বিষয়ে অভিজ্ঞ চিত্রকরের দরকার হয়।

ফ্রান্সের লুভ্র্ নামক বিখ্যাত চিত্রশালায় পৃথিবীর মধ্যে সব-চেয়ে দামী ও আশ্চর্য্য মানচিত্র আছে। এই মানচিত্রখানি রুসিয়ার শেষ-সম্রাট ফরাসী জাতিকে উপহার দিয়াছিলেন। ইহার আকার সবদিকেই চল্লিশ ইঞ্চি করিয়া। শ্লেট-পাথরী রঙের "জ্যাস্পার" মণির ফ্রেমে তাহা বাঁধানো। সমস্ত ম্যাপখানিকে পাকা সোনায় গড়া এবং দামী রত্নের বোতামে আঁটা! ম্যাপের সমুদ্রের ছবি মরকতের দ্বারা আঁকা এবং মূল্যবান চুনা-পান্না বসাইয়া নগর বুঝানো হইয়াছে। এই মানচিত্রখানির আনুমানিক মূল্য বাইশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকার কম নয়!

লেখার সময়

"রোম-সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন" নামে বিখ্যাত ইতিহাসখানি রচনা করিতে গিবনের সময় লাগিয়াছিল ত্রিশ বৎসর। কেবলমাত্র প্রত্যেক খণ্ড লিখিতেই তাঁহাকে দুই বৎসর করিয়া সময় ব্যয় করিতে হইয়াছিল।

হার্ব্বার্ট স্পেন্সারের দার্শনিক পুস্তক-গুলির নাম ভিন্ন ভিন্ন বটে, কিন্তু ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁহার Social Statics হইতে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত Man versus the State পর্য্যন্ত আটখানি

পুস্তকের মূল বিষয় এক (Society is an organism subject to evolution)। সুতরাং এই একটি বিষয়কে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করিতে তাঁহারও সময় লাগিয়াছিল প্রায় সুদীর্ঘ ত্রিশটি বৎসর।

বিখ্যাত ঔপন্যাসিক জোসেফ হেন্‌রি সর্ট্‌হাউসের John Inglesant নামে উপন্যাসখানি পাকা সাতটি বৎসর ধরিয়া লিখিতে হইয়াছিল।

বিশ্ব-সাহিত্যের অনেক ভালো ভালো কবিতা অল্প সময়ের মধ্যে লেখা হইয়াছে বটে, কিন্তু "In Memoriam" লিখিতে টেনিসনের অন্ততঃ দশ বৎসর কাটিয়া গিয়াছিল। ধরিতে গেলে, প্রায় ত্রিশবার এই কাব্যখানিকে টেনিসন নূতন করিয়া লিখিয়াছিলেন।

কিন্তু আকার-হিসাবে Gray's Elegy অধিকতর দীর্ঘকালব্যাপী রচনার ফল। এই কবিতাটিতে লাইন আছে মোটে একশো আটাশটি। কিন্তু এইটুকু কাব্যের জন্য গ্রে সাতবৎসর ধরিয়া একমনে লিখিয়াছিলেন।

বিরোধী দৃষ্টান্তও অনেক আছে। একালের এইচ জি ওয়েল্‌স্‌ বলেন, একদিনে তিনি দশ হাজার পর্য্যন্ত শব্দ লিখিয়াছেন। কনান ডয়েল একটানা বারোহাজার পর্য্যন্ত শব্দ লিখিয়া, তবে ডেস্ক্‌ ছাড়িয়া উঠিয়াছেন।

ষ্টিভেন্‌সন অনেক সময়ে একটি কথা বদলাইবার জন্য পাতা-কে-পাতা নূতন করিয়া লিখিতেন বটে, কিন্তু তাঁহার বিখ্যাত উপন্যাস Jekyll and Hyde মাত্র সাতদিনে সমাপ্ত হইয়াছিল।

স্কটের তাড়াতাড়ি লিখিবার শক্তির কথা সকলেই জানেন। ডুমাস্‌ কিন্তু এদিকে কম বাহাদুর নন। অনেক কাল ধরিয়া প্রতি সপ্তাহেই তিনি এক-একখানি করিয়া নূতন উপন্যাস লিখিয়াছিলেন।

আমাদের বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথ আশ্চর্য্য তাড়াতাড়ি লিখিতে পারেন। গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও রাজকৃষ্ণ রায় কিন্তু এ-বিষয়ে আর সব বাঙালী লেখকের উপরে টেক্কা দিয়াছেন।

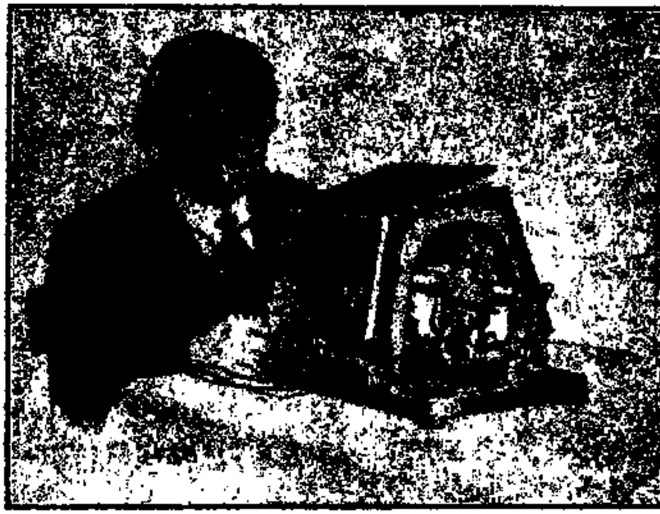
"অপ্টোফোঁ"

যা অন্ধদের সাধারণ ছাপার বই পড়্‌বার যন্ত্র।

সম্প্রতি 'অপ্‌টোফোন্‌ নামে অন্ধদের পড়বার এক যন্ত্র তৈরি হয়েছে! এই যন্ত্র দিয়ে অন্ধরা দৃষ্টি-শক্তি-সম্পন্ন লোকেদের মত ছাপার সমস্ত বই, এমন-কি টাইপ্‌রাইটারে ছাপা চিঠি-পত্রের হরফ পর্য্যন্ত পড়তে পারবে।

এতদিন অন্ধরা—"ব্রেইল্‌" সাহেবের প্রবর্ত্তিত উঁচু উঁচু ছাপার হরফে আঙুল বুলিয়ে পড়ত—এ-রকম বই ছাপারও অসুবিধা এবং আকারেও সেগুলি অত্যন্ত বড় আর ভারী হ'ত, সেজন্যে অন্ধদের সাহিত্য পৃথিবীতে বড়ই অল্প হ'য়েছিল; কিন্তু এখন এই যন্ত্রের সাহায্যে, পৃথিবীর যাবতীয় জ্ঞান-ভাণ্ডার আজ দৃষ্টিহীনেদের কাছে অবাধে উন্মুক্ত হ'ল।

যন্ত্রটীর উপর বই রাখবার একটী কাঁচের



অন্ধের ছাপানো বইয়ের পাঠ-শোনা।

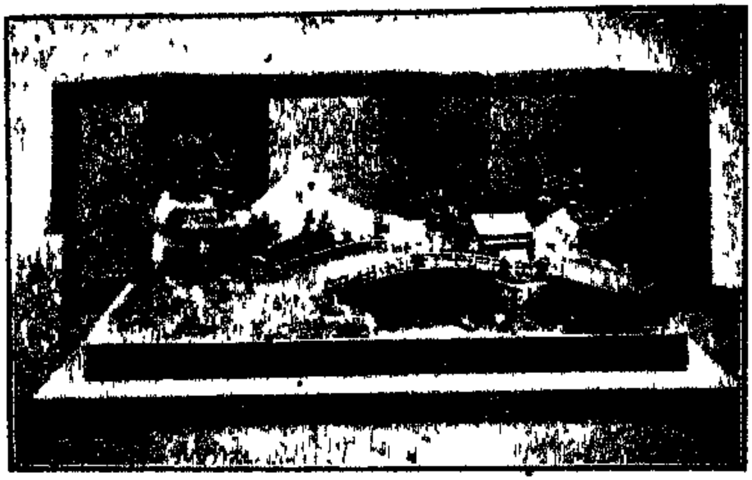
প্লেট বসান থাকে, সেই কাচের প্লেটে বইয়ের পাতাখানা উপুড় ক'রে আটকে দিতে হয়। প্রত্যেক অক্ষরের উপর পর-পর আলো ফেল্‌বার বিশেষ ব্যবস্থা আছে। এই আলো প'ড়ে ছাপার বর্ণমালাকে সুরের বর্ণমালায় পরিবর্ত্তিত ক'রে দেয়। এই সুর টেলি-ফোনের রিসিভারের মত একটা যন্ত্র দিয়ে অন্ধ পাঠকের কানে পৌঁছায়। অন্ধদের শ্রবণ-শক্তির স্বাভাবিক প্রাখর্য্য বশতঃ এই সুরের বর্ণমালা কিছুদিনের অভ্যাসেই তাদের আয়ত্ত হ'য়ে আসে। টেলিগ্রাফের বাবুরা "টরে-টক্কা," "টরে-টক্কার" ভাষা যেমন সহজেই বুঝতে পারেন, তেমনি "অপ্‌টোফোনের" সুর লিপিতে অভ্যস্ত অন্ধও অক্ষরের সুরের সাড়া সহজেই বুঝতে পারবে। এর সাহায্যে মিনিটে পঁচিশটা কথা পর্য্যন্ত সহজে "পড়তে" পারা যায় দেখা গিয়েছে।

শ্রীবামাপদ বসু।

'ইকেবানা'

জাপান ললিত কলার লীলা-নিকেতন। দৈনন্দিন জীবনের অতি তুচ্ছ ব্যাপারও যেখানে শ্রীসম্পদে সমুজ্জল, সেখানে ফুলের আদর যে খুবই, ইহা আর বিচিত্র কি। ফুল ও ডাল-পাতায় স্তবক-রচনা সেখানকার একটি বিশেষ আর্ট এই আর্টের জাপানী নাম 'ইকেবানা'।

ইকেবানার প্রবর্ত্তক জাপানের রাজকুমার শোটোকু তাইশি (৫৭৩—৬২১খৃঃ)। অনেক শ্রেষ্ঠ ভারতীয় আচার্য্যের সংস্রব-কালে ইনি



সগ্রাম ধরা

বিবেচিত। জাপানে বৌদ্ধ মহাযান সম্প্রদায়ের প্রভাব-বিস্তারে ইঁহারা যথেষ্ট সহায়তা করেন।

অধুনা মেয়েদের মধ্যেই ইকেবানার চর্চা নিবদ্ধ। সকল উচ্চ বালিকা-বিদ্যালয়ে এই বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয়। রাজ পরিবারের এবং সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলাদের জন্য একটি বিশেষ শিক্ষণীয় বিদ্যা। নগরে ও গ্রামে, কোথাও এই বিদ্যার শিক্ষক বা ছাত্রীর অভাব নাই।

প্রাচীন কালে কিন্তু কেবল মহিলাদের মধ্যেই এই সুকুমার বিদ্যার অভ্যাস ও আদর নিবদ্ধ ছিল না। দার্শনিক, সাংকেতিক, ধর্ম্মযাজক, রাষ্ট্রনৈতিক, ওমরাহ প্রভৃতির মধ্যেও অনেকে এই বিদ্যার বিশিষ্ট অনুরাগী ছিলেন।

জাপানে ফুল বেশী জন্মায় না, সুগন্ধি ফুল তো একান্ত বিরল। অথচ সেখানে ফুলের আদর অসীম। সে দেশের অসংখ্য গৃহ পুষ্পপত্রের বহু বিচিত্র পরিকল্পনায় রমণীয়। অন্তরে ইহারা নিরন্তর মহম্মদের উক্তি স্মরণ করিতেছে—

জোটে যদি মোটে একটি পয়সা
খাদ্য কিনিয়ো ক্ষুধার লাগি,
দুটি যদি জোটে, তবে অর্দ্ধেকে
ফুল কিনে নিয়ো, হে অনুরাগী।

বাজারে বিকায় ফল তণ্ডুল
সে শুধু মিটায় দেহের ক্ষুধা,
হৃদয়-প্রাণের ক্ষুধা নাশে ফুল
দুনিয়ার মাঝে সেই ত সুধা।*

ইকেবানা বা পুষ্প পরিকল্পনা প্রধানতঃ একটি ত্রিভুজের আকার ধারণ করে। এই তিনটি ভুজকে যথাক্রমে 'তেন্' বা স্বর্গ, 'চি' বা ধরিত্রী এবং 'জিন্' বা মানব আখ্যা দেওয়া হয়। এই মূল তিনটি ভুজের সহিত

* শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্তের "ফুলের ফসল"



ফুলগাছের কেয়ারি

যথাক্রমে দুই, চার বা ছয়টি সহ-ভুজ যোগ করা যাইতে পারে। মোট সংখ্যা সর্ব্বদাই অবিভাজ্য থাকে, যথা—পাঁচ, সাত, নয়। প্রাচীন কালে এই ভুজগুলির নানাপ্রকার নামকরণ হইত, যথা—বদান্যতা, বিশ্বস্ততা, জ্ঞান, সত্যবাদিতা, সৌজন্য। অথবা সূর্য্য, চন্দ্র, তারা ইত্যাদি; বা ধরিত্রী, অগ্নি, জল, ধাতু ইত্যাদি; কখনো বা রংয়ের নাম, যেমন হরিদ্রা, নীল, লাল ইত্যাদি। আর এক মতে এই পুষ্প-পরিকল্পনার পাঁচটি ভুজকে যথাক্রমে হৃদয়, সাহায্য, অতিথি, কৌশল ও সমাপ্তি আখ্যা দেওয়া হয়। কথিত আছে, এই বিদ্যা যাঁহারা চর্চ্চা করেন তাঁহারা ধর্ম্মভাব, সংযম, নম্রতা এবং মানসিক শান্তির অধিকারী হন।

পুষ্পের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান স্থান পদ্মের। তবে উহা সাধারণত ব্যবহার হয় না। এই পরিকল্পনায় ফুলের সঙ্গে থাকে তিনটি পাতা। একটি অর্দ্ধভুক্ত, একটি সতেজ, তৃতীয়টি কুঞ্চিত বিকশোন্মুখ। এই প্রকারে অতীত, বর্ত্তমান ও অনাগতকে সুকৌশলে রূপ-দান করা হয়।

জাপানের ও পাশ্চাত্য দেশের পুষ্প-রচনায় প্রভেদ এই যে, অন্যান্য দেশের মত, কেবল পুষ্পপত্র দ্বারা উহা রচিত হয় না। ডালপালা ফুল সমস্ত দিয়া অল্প পরিসরের মধ্যে বিশেষ বিশেষ ফুলগাছের কাঠামোটি ফুটাইয়া তোলা হয়।

ছোট ছোট ডালপালার খণ্ড ব্যবহৃত হয়। সেগুলি যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করেন শিল্পী—ঐ বিশেষ বৃক্ষের স্বাভাবিক গঠন-ভঙ্গিমার অনুযায়ী। ইহা কি-পরিমাণ সূক্ষ্ম-পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি-সাপেক্ষ, তাহা সহজেই অনুমেয়।

ছোটর মধ্যে বড়র আকৃতি ফুটাইয়া তোলা যেমন সুন্দর পরিপাটি, যে-আধারে 'ইকেবানা' রাখা হয়, সেগুলিও তেমনি চমৎকার—সাধারণত বাঁশ বা কাঠের তৈয়ারি, এবং তাহার উপর নানা মনোরম চিত্র উৎকীর্ণ।

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রশ্নোত্তর

(সংস্কৃত হইতে)

ভালবাসার' জিনিস কি আছে জগতে ?
কি দেখি' অধিক সুখ ?
—হরিণ-নয়নী তরুণী প্রিয়ার
প্রেম-প্রসন্ন মুখ।
কোন্ আঘ্রাণ তোষে প্রাণ ?—তার
ঘনিষ্ঠ নিশ্বাস।
শ্রবণে অমৃত কিসে বা বরিষে ?
—তার সে মুখের ভাষ।

মধুর চেয়েও মধুর কি ?—তার
অধর-পুষ্পরস !
পরশে অমৃত ?—চন্দন-ঘন
তনুর সুপরশ।
যেখানে ধরিয়া কোন্ ধনে হিয়া
সব চেয়ে হয় সুখী ?
মরমীরা কয়,—তার নাম হয়
প্রেয়সী ইন্দুমুখী।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

সঙ্কলন

শিল্পীর সাধনা

একার বৎসর বয়সে ইরাণ-তুরাণের বাদশা হুসেন শাহ যখন সাতার-সংখ্যক বেগমের পাণি-পীড়ন করলেন, তখন -তখন কে জান্ত যে তাঁরই রাজপ্রাসাদে আরব্য উপন্যাসের নিছক রূপকথাগুলোর একটা এসে নিজের বাস্তবতা প্রমাণ করে' যাবে।

সে যাই হোক্। বাদশা নতুন বেগমের পাণি পীড়ন করে' তাঁর হারেমে পুরলেন, এদিকে সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দরবারের আমীর ওমরাহদের মধ্যে কেমন করে' জানাজানি হয়ে গেল যে, নতুন বেগমের মত সুন্দরী ত্রিভুবনে নেই। অপ্সরী?—অপ্সরীরা ত সব চির-যৌবনা। যা চিরদিনের, যার ক্ষয়বৃদ্ধি নেই, যা স্থির, তা হাজার সুন্দর হোক, কিন্তু তাতে মোহের অবসর নেই। ফুলগুলো ফুটে উঠে ঝরে' যায় বলেই ত ওর সৌন্দর্য্য মুহূর্তের তরে নিবিড়তম হ'য়ে দেখা দেয়,' সেই জন্যেই ওর মোহ অনন্ত কালের। নতুন বেগমের ভোমরা রঙের রেশমী চুলের রাশ যে একদিন শণের নুড়ি হ'য়ে উঠবে—তার আঙুরের রসে ভিজানো বিম্বফল রঙের ঠোঁট-দুখানি যে একদিন শুকিয়ে চামড়ার মত হ'য়ে উঠবে—তাজা ফুলের মত গালদুটো শুকনো পাতার মত কুঁচড়ে যাবে—চোখের কোণ থেকে তড়িৎ চাহনি যে আর চলবে না—তার ভুরু যে আর দুলবে না, গ্রীবা যে আর হেলবে না, কল যে আর টলবে না—এই চিন্তাই যে হুসেন শাহ্‌রে চতুর্ব্বর্গ মাতিয়ে তুলেছে। সুতরাং অপ্সরী?—নতুন বেগমের সঙ্গে অপ্সরীর তুলনাই হয় না। অপ্সরী ত সবাই—মানব-মানবীর মধ্যেও এমন রূপ আর কখনও সৃষ্ট হয় নি—আর ভবিষ্যতেও হবে কিনা সে বিষয়ে বাদশা হুসেন শাহের ঘোর সন্দেহ।

কিন্তু আমীর-ওমরাহদের মধ্যে নতুন বেগমের রূপের কথা রটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা আপশোষের কথাও জেগে উঠল। এমন সুন্দরী যে নতুন বেগম—যার দেহে বিশ্বকর্ম্মা তাঁর শ্রেষ্ঠ প্রতিভার ছাপ অঙ্কিত

করে' দিয়েছেন—যার তুল্য সুন্দরী ললনারা পৃথিবীতে নেই, অমরাবতীতে নেই, গন্ধর্বলোকে নেই—তেমন রূপ একদিনের জন্যেও কারো নয়নগোচর হবে না, এই হচ্ছে তাঁদের আপশোষের কথা। তাঁদের মধ্যে দু' একজনা দার্শনিক ওমরাহ তাঁদের কপাল-শুভ্র দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে গালিচায় বুনোনো রঙিন ময়ূর গুলোকে নিরীক্ষণ করে' করে' বলতে লাগলেন—তা আসলে সৌন্দর্য্য জিনিষটা সকলের জন্যেই হওয়া উচিত —বিশেষত রূপ দেখলে রূপের কোনো ক্ষতি নেই অথচ দর্শকের মহা লাভ।

আমীর ওমরাহদের কানাকানি বাদশা হুশেন শাহের কানে পৌঁছিতে বড় বিশেষ বিলম্ব হ'ল না, হুশেন শাহ ছিলেন প্রজারঞ্জক রাজা। কাজেই আমীর ওমরাহদের এই আপশোষের কারণ দূর করবার জন্য ইচ্ছা করলেন। তাই মনস্থ করলেন যে, নতুন বেগমের একখানি পূর্ণায়তন তস্‌বীর অঙ্কিত করিয়ে তাঁর খাস দরবারের বিশাল কক্ষে মসনদের পিছনে দেয়ালের গায়ে ঝুলিয়ে দেবেন। বাদশা মনে মনে এই ব্যবস্থা ঠিক করেই তাঁর প্রধান উজিরকে ডাকলেন— "ফজলু খাঁ।"

ফজলু খাঁ পাকিয়ের মাথার উপরকার বরফের মত সাদা লম্বা দাড়ি দোলিয়ে এসে কুর্ণিস করে দাঁড়াল— "জাঁহাপনা"—

বাদশা বললেন—"উজির, বর্তমানে এ সসাগরা পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী কে?"

উজির হাতের পাঁচ আঙুল তাঁর লম্বা দাড়ির মধ্যে চালাতে চালাতে স্মৃতিশক্তিটাকে উগ্র করে' নিয়ে উত্তর করলেন—"জাঁহাপনা, বর্তমানে এ সসাগরা পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী হচ্ছে হিন্দুস্থানের মোগল রাজসভার চিত্রকর—নাম দৌলত খেঁ।"

হিন্দুস্থানের নাম শুনে বাদশা মুহূর্তের জন্যে চিন্তান্বিত হলেন—যেন তাঁর মনে কোন সংশয় উদিত হয়েছে; কিন্তু তৎক্ষণাৎ যেন সে সংশয়ের একটা সমাধান করে' বললেন—"ফজলু খাঁ, মোগল-রাজসভার চিত্রশিল্পী ইরান-তুরানের বাদশার দরবারের ডাক পেলে ইস্পাহানে আসবে কি?"

ফজলু খাঁ তাঁর উষ্ণীষ হেলিয়ে কুর্ণিশ করে বললেন —"প্রবল প্রতাপান্বিত সুজনের রক্ষক দুর্জনের শাসক ইরান তুরানের বাদশা হুশেন শাহের যে আজ্ঞা।"

তার পরদিন পূব-গগনে উষাসুন্দরী যখন আপনার অবগুণ্ঠন উন্মোচন করবেন কি করবেন না ভাবছিলেন, তখন ইস্পাহানের প্রশস্ত পাথর-বাঁধা রাজপথ কাঁপিয়ে বাদশার পাঞ্জাঙ্কিত পত্র নিয়ে তুরুক সোয়ার কাবুলের পথে হিন্দুস্থান অভিমুখে যাত্রা করল। দ্রুতগামী অশ্বখুরের খটাখট শব্দে নিদ্রিত নাগরিকেরা চকিত হয়ে উঠে বসল। বেলা হ'লে ইস্পাহানের বাজারে বাজারে রটে গেল যে, হিন্দুস্থান থেকে চিত্রকর আসছে—নতুন বেগমের তসবীর আঁকবার জন্যে।

(২)

বাদশা আমীর ওমরাহদের নিয়ে তাঁর খাস-দরবারে বসে' ছিলেন। ইরান-তুরানের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি জায়েনউদ্দিন সেদিন হেমন্ত সন্ধ্যার মত করুণ কণ্ঠস্বরে বাদশা সমীপে সুন্দরী তরুণীর অশ্রুভেজা ম্যাজিক কালো আঁখি-ছায়ার মত একটা নব-রচিত গজল্ সারেঙ্গী সহযোগে গান করছিলেন। গজল্ বলছিল— "রূপোর জোয়ারী লেগেছে—এমনি নিবিড় জোছনা, যেন মনে হয় তা মুঠো বেঁধে বলা পাকিয়ে ছিল ছোঁড়াছুঁড়ি খেলা যায়, শিশির-ভেজা পাতায় পাতায় জোছনা ছলুকে উঠে পিছলে পড়ছে—দূর এলবুরুজ পাহাড়তলীর বুলবুলেরা সব আর সেদিন ঘুমুতে যায় নি—তাদের কান্নার সুর যেন জ্যোছনার বুক চিরে চিরে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে—এমনি রাতে নিঠুরা পিয়ারী কাহার বাঁধন আল্‌গা করে' কাউকে কিছু না বলে' ক'রে কোন্ অজানার পথ ধরে' কোথায় চলে' গেল— কোথায় গেল……"

চারিদিক মেঘে মেঘে ছেয়ে গিয়েছে—কালো কালো মেঘ, বিদ্যুৎ-বুকে-করা মেঘ। এলবুরুজ পাহাড়তলীতে ময়ূরের দল পেখম তুলে নৃত্য করে' করে' তাদের কেকা-রবে চারিদিক মুখর করে' তুলেছে। বারি ঝরতে আরম্ভ করল,—ঝর্ ঝর্ ঝর্—বিরাম নেই বিরতি নেই—ঝড়-ঝিল্লিকার কার আক্রোশ—কোন্ অজানার কোন্ অশরীরীর—ক্রুদ্ধ গর্জন—বুকের মধ্যে যেন ধ্বসে

কে যে বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছে—এমন দিন তবুও পিয়ারী ফিরে এল না—কেন এল না"

পিয়ারী কেমন করে' ফিরবে—পিয়ারী যে পথ ধরে' গিয়েছে সে ত ফেরবার পথ নয়—সে যে অবুঝ বাধারই পথ সে পথ—সে যে মরণের পথ"

সারেঙ্গীর মিঠি সুরের সঙ্গে কবির মিঠি সুর মিলে গজলের ব্যথাভরা কাহিনী বাদশার দরবারের প্রশস্ত কক্ষের কোণে কোণে কোন্ হারিয়ে যাওয়া কাকে খুঁজে বেড়াতে লাগল। যে আমীর ওমরাহেরা যুবক, তাদের কি একটা ব্যথার আনন্দে বুক দুলে উঠল, টলে উঠল—বাদশার খুড়ো আশী বছর বয়সের বৃদ্ধ বৈরাম খাঁর পর্য্যন্ত সুর্মা ঢাকা চোখদুটো ছল্ ছল্ করে' উঠল। গান শেষ করে কবি সারেঙ্গী ও ছড়টা গালিচার উপরে নামিয়ে রাখলেন—চারিদিকে নিস্তব্ধতা, কেবল সদ্য সমাপ্ত গজলের সুর বাতাসের বুক চিরে আকাশের গায়ে গায়ে একটা রেশের চিহ্ন এঁকে দিয়ে ফিরে দূর হতে দূরান্তরে চলে যেতে লাগল—মুহূর্ত্ত ধরে' যেন কারো নিশ্বাস প্রশ্বাসও পড়ছে না—এমনি নিবিড় নিস্তব্ধতা। তারপর দরবারের সবাই যেন হঠাৎ চমক ভেঙে জেগে সমস্বরে বলে উঠলেন—"ক্যাবাৎ ক্যাবাৎ!"

বাদশা প্রসন্ন হাস্যে কবির দিকে ফিরে বললেন—"তাহের, তোমার কাব্য-সাধনা, সঙ্গীত সাধনা, যন্ত্র সাধনা, সবই সার্থক!"

কবি তাহের তাঁর বিনম্র শির আরও নত করে' কি বলতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় উজির কমরু খাঁ প্রবেশ করে' বাদশা সমীপে নিবেদন করলেন—"জাঁহাপনা, হিন্দুস্থান হ'তে কোনও রাজসভার চিত্রশিল্পী গোকুল দেব ইরাণ তুরাণের বাদশা, দুর্ব্বলের রক্ষক, দুর্জ্জনের শাসক প্রবল প্রতাপান্বিত হুজুর শাহের দরবারে হাজির।"

বাদশা বললেন—"তাকে এইখানে নিয়ে আসা হোক।"

উজির তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে গেলেন, আবার পরক্ষণেই ফিরে এলেন—সবাই দেখলেন, তাঁর সঙ্গে প্রবেশ করল এক অতি সুন্দর তরুণ যুবক।

অতি সুন্দর তরুণ যুবক। তার চোখদুটোতে যেন বিদ্যুতের রেখা টানা—কুঞ্চিত কেশ গুচ্ছে গুচ্ছে এসে তার বলিষ্ঠ স্কন্ধ ছেয়ে ফেলেছে—অতি চিক্কণ গোঁফের রেখার চিহ্ন তার স্ফুটনোন্মুখ যৌবনের ঘোষণা করছে আঙুলগুলো যেন ছবির মত সুশ্রী—বাদশা বিস্ময় প্রকাশ করে' বললেন—"এই যুবক পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চিত্রকর?"

যুবক তার মাথা অবনত করল, উজির কমরু খাঁ উত্তর দিলেন 'হাঁ জাঁহাপনা।'

"এমনি তরুণ বয়সে!"

উজির উত্তর দিলেন 'জাঁহাপনা, প্রতিভাশালী তরুণের গলেই তাঁর বরমাল্য প্রদান করতে ভালবাসেন।'

বাদশা প্রসন্ন দৃষ্টিতে শিল্পীর দিকে ফিরে বললেন—"সুন্দর বিদেশী যুবক চিত্রবিদ্যায় তোমার কতদূর পারদর্শিতা?"

"যুবক উত্তর দিলে—'জাঁহাপনা, কবি, চিত্রকর, গায়ক এদের পারদর্শিতার মাপকাঠি অন্যের কাছে। আমার যে কি রকম পারদর্শিতা তা আমি নিজে কেমন করে' বলব? তবে আমার অঙ্কিত চিত্রে হিন্দুস্থানের অনেক নৃপতি অনুগ্রহ করে' সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।"

বাদশা বললেন—"শোন যুবক, ইসলাম রমণী কোনদিন বিধর্ম্মী পুরুষের কাছে তার মুখাবরণ উন্মোচন করবে না, শাস্ত্রের নিষেধ—না দেখে তুমি তার আলেখ্য অঙ্কিত করতে পারবে?'

শিল্পী বিস্মিত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলে—"না দেখে কি করে' ছবি আঁকা চলতে পারে জাঁহাপনা?"

বাধা দিয়ে বাদশা জিজ্ঞাসার সুরে বললেন—"কেবল তার বর্ণনা শুনে।"

যুবক বললে—"এমন কবি কে আছে জাঁহাপনা, যে শব্দ অর্থ ও সুর দিয়ে রক্তমাংস ও বর্ণকে এমনি করে' মূর্ত্তিমান করে' তুলতে পারে যা আবার রঙে ও তুলিতে পরিবর্ত্তিত করা যেতে পারে?"

গৌরবান্বিত দৃষ্টিতে বাদশা উত্তর দিলেন—"বিদেশী যুবক! আছে, ইরাণ-তুরাণের শ্রেষ্ঠ কবি—তার

কণ্ঠস্বরে শরৎ-উষার উজ্জ্বল আকাশ সান্ধ্য গগনের মত রাঙিত হ'য়ে ওঠে—হেমন্ত-সন্ধ্যার করুণ রাগিণী বসন্ত উষার মত হাস্যময় হ'য়ে ওঠে—যার সারেঙ্গীর আলাপে প্রচণ্ড নিদাঘে বর্ষার শৈত্য আমন্ত্রণ করে' আনে—শীতের শুভ্র মাটিতে সবুজের রঙ জাগিয়ে তোলে—এবং তুমি নিজেই বিচার করবে"—বাদশা কবি তাজেরকে গান করতে আদেশ করলেন।

সারেঙ্গীর সুর জেগে উঠল—কিশোরী প্রিয়ার সলজ্জ চাহনির মত মিষ্টি তার রেশমী চুলের স্পর্শের মত মোলায়েম—সে সুরের রেশ প্রিয়ার অঙ্গের স্পর্শেরই মত শ্রবণেন্দ্রিয়কে বুলিয়ে যায়।

"সুরমা-আঁকা চোখ—পিয়ারি সে কেমন চাতুরি?—রজনীর কালো আঁধারের মাঝে পুঞ্জ মেঘের বুক থেকে বিদ্যুৎ কেমন ঝিলিক হানে?—তাই পিয়ারীর কালো চোখের চার পাশে সুরমা আঁকা পিয়ারীর কালো চোখের তারা সে মেঘ—চোখের পাতায় আঁকা সুরমা সে রজনীর আঁধার—পিয়ারীর দৃষ্টি সে বিদ্যুৎ—সে বিদ্যুৎ কেমন উজ্জ্বল, কেমন নিবিড়, কেমন তীব্র—সুরমা-আঁকা চোখ—পিয়ারি সে কেমন চাতুরি?"

"সুরমা-আঁকা চোখ—পিয়ারি জানি জানি সে কেমন চাতুরী। পিয়ারী যে চোখ-দুটোতে সুরমা মেখে তার সারা দেহের আকাঙ্ক্ষারাশিকে গোপন করতে চায়—তার মনের শঙ্কা সংকোচ সরম স্পষ্ট করে' তুলতে চায়—তার চঞ্চল দৃষ্টিকে নিবিড় করতে চায়—তার চাঞ্চল্যময় দৃষ্টিকে ব্যথা-ভরা দেখতে চায়—সুরমা-আঁকা চোখ—পিয়ারি জানি জানি সে কেমন চাতুরী।"

গান থামল—রইল শুধু একটা সূচী-সূক্ষ্ম রেশের আধ-লুপ্ত আধ-সুপ্ত রণন্।

তরুণ চিত্রকর প্রশংসমান নেত্রে বললে—"ইরাণ-তুরাণের কবি, হিন্দুস্থানের চিত্রকরের অভিবাদন গ্রহণ করুন।" তারপর বাদশার দিকে ফিরে বললে—"জাঁহাপনা, কবি তাজেরের ক্ষমতা অসাধারণ। কবির সুরে সুরে আমার তুলি চলবে—তাঁর গানের সঙ্গে সঙ্গে নতুন বেগমের ছবি ফুটে উঠবে—তাঁর চোখ জেগে উঠবে—তাঁর বুক দুলে উঠবে—হাতে তাঁর গোলাপ ফুটবে—হাতে তাঁর চাঁপার কলি জাগবে—পায়ে তাঁর রক্তকমল বিকশিত হবে—তাঁর ওড়্না উড়বে, বেণী দুলবে, ঘাগ্‌রা দুলবে, কিন্তু তাঁর আত্মার কথা আমি বলতে পারব না জাঁহাপনা। কবি তাজেরের সুরের সঙ্গে সঙ্গে নতুন বেগমের বাহিরটুকেই আমি দিতে পারব—জাঁহাপনা, তাঁর আত্মার সন্ধান আমি দিতে পারব না।"

বাদশা জিজ্ঞাসা করলেন—"কেন শিল্পী?"

শিল্পী উত্তর দিলে—"জাঁহাপনা, আত্মা যে সামনা সামনি দেখবার জিনিষ—হাজার বর্ণনাতেও তার আসল পরিচয় নেই। শিল্পীর আত্মা দিয়ে নতুন বেগমের আত্মা স্পর্শ করতে না পারলে তার তুলির সঙ্গে তা কখনও ধরা পড়বে না। এ আত্মায় আত্মায় স্পর্শ অনুবাদের ভিতর দিয়ে হ'তে পারে না। জাঁহাপনা, আমি ছবি আঁকব, কিন্তু তাতে আত্মার সন্ধান করবেন না।"

বাদশা বলে' উঠলেন—"কিন্তু নতুন বেগমের যে দেহের চাইতে আত্মা সুন্দর—আত্মা সুন্দর বলেই ত তার দেহ সুন্দর—সেই আত্মাকে বাদ দিয়ে শুধু দেহের ছবি আঁকা—যেন গন্ধ বাদ দিয়ে গোলাপ ফোটান—নেশা বাদ দিয়ে মদ চোঁয়ান; কিন্তু বিধর্মীর কাছে ইস্‌লাম রমণী কেমন করে' মুখ খুলবে?—উপায় কি?" বাদশা তাঁর দরবারের আমীর ওমরাহ্‌দের দিকে তাকিয়ে উজিরকে সম্বোধন করে বললেন—"বৈরাম খাঁ, উপায় কি?"

ইরাণ সাম্রাজ্যের প্রধান উজির বিমনা হলেন। আমীর ওমরাহ্‌রা পরস্পরের মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগলেন। সভা নিস্তব্ধ—চারিদিকে একটুকু শব্দ নেই। সেই নিস্তব্ধতার মাঝে বৈরাম খাঁ তাঁর সুদীর্ঘ শরীর নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। তার পর তাঁর দীর্ঘোন্নত শরীর বেঁকিয়ে কুর্ণিস করে' বললেন—জাঁহাপনা, উপায় আছে। নতুন বেগমকে বিধর্মীর সামনে মুখ খুলতে হবে না—তা একখানি দর্পণের সামনে করলেই চলবে। সেই দর্পণে প্রতিবিম্বিত নতুন বেগমকে দেখলেই শিল্পীর উদ্দেশ্য সফল হবে। পর্দাও রক্ষা হবে—দর্পণও ঢাকা থাকবে না।"

বৈরাম খাঁর কথা শুনে সবার বিমর্ষ মুখ প্রসন্ন হয়ে উঠল। বাদশা প্রশংসমান নেত্রে খুল্লতাত বৈরাম খাঁর দিকে তাকিয়ে উজিরকে লক্ষ্য করে বললেন—"ফজলু খাঁ, খুল্লতাত বৈরাম খাঁর যুক্তি গৃহীত হোক।"

সভাভঙ্গ হ'ল। আমীর ওমরাহরা বৈরাম খাঁর বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করতে করতে নিজ নিজ আবাসে ফিরলেন।

(৩৭)

দ্বারে দ্বারে পুরু রেশমি পরদা—তারি পাশে পাশে উলঙ্গ কৃপাণ হাতে যমদূতের মত কালো হাবসী খোজা। এখানে বুঝি ক্ষুদ্র মধুমক্ষিকাটিরও প্রবেশ করবার পথ নেই। এখানে বুঝি আর কোন শব্দ নেই, কেবল দুধের মত সাদা কঠিন পাথরের উপরে রক্ত কমলের মত রাঙা কোমল পা ফেলে চলে'-যাওয়া রূপসীদের নূপুর নিক্কণ, কেবল বিলাসিত তনুর ভঙ্গীতে ভঙ্গীতে তাদের অঙ্গ-স্পর্শ সুখে বিহ্বল ঘাগরার খস্ খস্ শব্দ, কেবল তাদের কৌতুক উচ্ছ্বাসে উদ্বেল হাসির ছন্দময় পিচকিরি, কেবল কত কত উৎস হতে উচ্ছ্বসিত গোলাপজলের বিরতিহীন ঝর্ ঝর্ শব্দ। এখানে বুঝি আর কোন গন্ধ নেই—কেবল কত কত তরুণীদের নিশ্বাস-বিচ্ছুরিত সুরভি, কেবল তাদের সুদীর্ঘ সুদীর্ঘ বেণী-কুন্তল হতে উৎসারিত অগুরুর গন্ধাবলেপ, কেবল তাদের সারা অঙ্গ হতে উৎক্ষিপ্ত এক আবেশময় আঘ্রাণ। এখানে বুঝি আর কোন রূপ নেই, কেবল সদ্য ফোটা গোলাপরাশির স্তবক, কেবল ফুল্ল প্রস্ফুটিত চম্পকদলের উগ্রতা। এখানে বুঝি আর কোন রস নেই, কেবল সাকির আপন-ভোলা বিহ্বলতা, কেবল সিরাজির সকল-ভোলা মাদকতা। মানুষ জীবনকে ধরে' রাখতে পারে না, কিন্তু যৌবনকে ধরে' রাখতে চায়। এমনি বাদশার হারেম।

এখানে কত কত রূপসী তরুণীর কমল-চোখের কোমল দৃষ্টি কুয়াশায় ঢেকে গেল—কোমল মুখের কমল-হাসি শুকিয়ে উঠল—গ্রীবা আর হেল্‌ল না, বুক আর দুল্‌ল না, চরণ আর চল্‌ল না; কিন্তু শেষ নেই, আবার কত কত নব নব তরুণী এসে তাদের রূপ-যৌবন দিয়ে এখানটাকে ভরে' তুল্‌ল। বাদশা হুসেন শাহের কালো চুল শাদা হ'য়ে গেল, মস্তকাবুর গণ্ড শীর্ণ হয়ে পড়ল, তড়িতাভাবে দৃষ্টি মলিন হয়ে উঠল; কিন্তু এখানটায় তাঁর রূপ-যৌবনের সম্ভার অব্যাহত। এমনি তর্কীণ-তুফানের বাদশার হারেম।

সেই হারেমে কত কত দ্বারে কত কত পরদা সরিয়ে কত কত কক্ষ অতিক্রম করে' কত কত হাবসী খোজার ক্রূর শার্দ্দূল দৃষ্টির সামনে দিয়ে তরুণ শিল্পী বাদশা হুসেন শাহ ও উজির ফজলু খাঁর সঙ্গে প্রবেশ করল। হারেমে বিদেশী বিধর্মীর আভাস পেয়ে বেগমদের পোষা ময়ূরের দল একবার তীব্র কেকারবে যেন তাদের আপত্তি জানিয়ে দিল। তার পর হারেমের এক প্রান্ত হতে এক প্রান্ত পর্য্যন্ত বাদ্যযন্ত্র থেমে গিয়ে যেন একটা পুরু নিস্তব্ধতার যবনিকা বিছিয়ে গেল। কত কত মরাল গতির ছন্দে ছন্দে শিঞ্জিনী শিঞ্জনীর অর্দ্ধেক ফুটে আর অর্দ্ধ ফোটার অবসর পেলে না—কত কত হাসির পিচ্‌কিরি মাঝপথে এসে হঠাৎ চকিতে থেমে গেল—যেন সজীব যা যেখানে ছিল সব সেই সেইখানেই সেই অবস্থাতেই সহসা প্রস্তরের মত কঠিন হ'য়ে গেল—চারিদিকে কেবল নিস্তব্ধতা—সেই নিবিড় নিস্তব্ধতার মাঝে কেবল গোলাপ-বারির ঝর্ ঝর্ শব্দ। সেই নিস্তব্ধতার মাঝে বাদশা শিল্পী ও উজিরকে নিয়ে একটি প্রকাণ্ড কক্ষে প্রবেশ করলেন।

কক্ষের এক পার্শ্বে দেয়ালে-গাঁথা এক সুবৃহৎ দর্পণ—একটা ক্রূরচক্ষু ঘোর রক্তবর্ণ সাটিনের মাঝখানে জড়োয়া কাজের একটা প্রকাণ্ড অর্দ্ধচন্দ্র আঁকা পরদার অন্তরালে ঢাকা। বাদশা উজির ও শিল্পী তিন জনে এসে সেই দর্পণের সামনা সামনি কক্ষের অপর প্রান্তে দাঁড়ালেন। অদৃশ্য হস্তের টানে পরদা সরে গেল। স্বর্ণখচিত সিংহাসনে উপবিষ্ট নতুন বেগমের প্রতিবিম্ব দর্পণের গায়ে ফুটে উঠল—

যেন মসী-লিপ্ত অমাবস্যার অন্ধকারের বিরাট গহ্বর হতে শরৎ পূর্ণিমার লক্ষ চাঁদ সহসা একসঙ্গে জেগে উঠল—যেন কঠিন রসহীন প্রাণহীন পাষাণের বুক চিরে একসঙ্গে-ফোটা বসোরাই গোলাপ ফুটে উঠল—যেন ঘোর অমানিশার পুঞ্জ মেঘের বুক চিরে

বিদ্যুতের রেখা ফুটে অচঞ্চল হয়ে চারিদিক উদ্ভাসিত করে' রাখল—যেন—। বাদশা বললেন—"শিল্পী, এই তোমার আলেখ্য।"

বাদশা শিল্পীর দিকে চোখ ফিরিয়ে দেখলেন, বুঝলেন, তাঁর কথা শিল্পীর কানে যায় নি—তার দৃষ্টি দর্পণে নিবদ্ধ—শিল্পী মন্ত্রমুগ্ধ—বাহ্যজগত তার কাছে লোপ পেয়েছে। বাদশার ঠোঁট দুখানিতে একটা তৃপ্তির, একটা গৌরবের, যেন একটা বিজয়ের নিঃশব্দ হাসির রেখা অঙ্কিত হ'য়ে গেল।

শিল্পীর দৃষ্টিতে কি ছিল—দর্পণে প্রতিবিম্বিত মূর্তির অবনত চোখ দুটি ধীরে ধীরে যেন মন্ত্রচালিত হ'য়ে উত্তোলিত হয়ে মন্ত্রমুগ্ধ শিল্পীর প্রতি নিবদ্ধ হ'ল—সেই চোখ দুটিতে বিস্ময়ের একটা ক্ষণিক প্রভা যেন মুহূর্তের জন্য খেলে গেল—তাঁর পর আজীবন সংগোপিত অনন্ত গোপন আকাঙ্ক্ষা আকুলতার আড়াল থেকে দুটি তরুণ চোখ আর দুটি তরুণ চোখের সঙ্গে মিলিত হ'ল—দর্পণের মূর্তি যেন তার রক্তে রক্তে একটা পুলক নিয়ে কেঁপে উঠল—শিল্পীর স্নায়ুতে স্নায়ুতে যেন একটা তড়িৎ প্রবাহ চারিয়ে গেল—তার পর নারীর দৃষ্টি অবনত হ'য়ে গেল—পুরুষের চোখে পলক পড়ল না। দর্পণের মসৃণ গায়ের উপরে মনে হ'ল কে যেন সিঁদুর ঢেলে দিল। অদৃশ্য হস্তের টানে পরদায় দর্পণ ঢাকা পড়ল। শিল্পী চমক ভেঙে জেগে উঠল—দেখলে চারিদিক যেন সন্ধ্যার মত মলিন হ'য়ে উঠেছে।

বাদশা বললেন—"শিল্পী—"

তরুণ যুবক সংযত স্বরে বললে—"জাঁহাপনা, আমি হিন্দুস্থানের রাজন্যবর্গের অনেক অনেক অন্তঃপুর-মহিলাদের দেখেছি কিন্তু এমন রূপ কখনও আমার নয়নগোচর হয়নি।"

স্মিত হাস্যে বাদশা বললেন—"শিল্পী, যা চোখে দেখলে, তাই যদি চিত্রপটে ফুটিয়ে তুলতে পার, তবে লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা তোমার পুরস্কার।"

শিল্পী উত্তর করলে—"জাঁহাপনা আমাকে ছয় মাস সময় দিন। আর আমি চাই একটি নির্জন নিভৃত স্থান, অতি নিভৃত, যেখানে বাইরের জগতের রাগ-রঙ্গ হাসি-অশ্রু আমার প্রাণে কোন ঢেউ-ই তুলবার সুযোগ পাবে না যেখানে একান্ত ভাবে থাকব আমি আর আমার আলেখ্য।"

বাদশা উজিরের দিকে ফিরে বললেন—"কাল, মতিমঞ্জিলে শিল্পীর বাসস্থান নির্দিষ্ট হোক্।"

তিনজনে হারেম ত্যাগ করলেন।

আবার তরুণীদের কলকণ্ঠ ফুটে উঠল। তাদের পায়ে পায়ে কত কত নাচ নিয়ে নূপুর-নিক্কণ জেগে উঠল, তাদের হাস্যোচ্ছ্বাস কক্ষে কক্ষে রণিত হ'য়ে উঠল; কিন্তু সেদিন সেই হারেমে একটি নিভৃত কক্ষে একটি তরুণীর অন্তরে অন্তরে একটা নবীন স্বপ্নের আভাসে যে একটা নব তন্ত্রী বাজতে লাগল, তার সঙ্গে সেই তুচ্ছ প্রতিদিনকার উদ্দেশ্যহীন হাসি-গানের কোনই মিল রইল না।

(৪)

সসাগরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চিত্রকর সে, দেশ-বিদেশে কোটী কোটী নর নারীর মুখে মুখে তার নাম ফিরে বেড়াচ্ছে; কিন্তু সে নিজে এতদিন কোথায় ছিল? কোথায় আপন-ভোলা হ'য়ে ঘুরছিল? কি জীবন সে এতদিন যাপন করেছে? কি জীবন? কোন্ একান্ত বাইরে বাইরে সে তুলি আর রঙ নিয়ে কেবল কি-এক তুচ্ছ খেলা করে' বেড়িয়েছে? শিল্পী সে, কিন্তু এই এতদিন তার কাছ থেকে জীবনের অমৃতের উৎস এমনি করে' গুপ্ত হয়েছিল যে, তার অস্তিত্বের সন্দেহমাত্র তার মনে জাগে নি। তার তুলির মুখে কত কত সুন্দরীর ভোমরা-কালো আঁখি-তারা বিশ্ব-বিমোহিনী দৃষ্টি নিয়ে জেগে উঠেছে, তার তুলির সোহাগে সোহাগে কত কত তরুণীর হৃদয়ের উপরে অঞ্চল-ঢাকা ভরা-বুক আধ-আভাস নিয়ে মাথা তুলেছে, তার তুলির আদরে আদরে কত কত কমলের মত হাত চাঁপার কলির মত আঙুল নিয়ে ফুটে উঠেছে, কিন্তু তার পিছনে কি ছিল? আজ সে সে জানে যে, তার পিছনে ছিল তার কেবল অপূর্ণতা—আর অপূর্ণতা—আর অপূর্ণতা। তার পিছনে ছিল না শিল্পী তার মনখানি নিয়ে, ছিল না শিল্পীর নিগূঢ় জীবনের নিবিড় চরম আনন্দের অনুভূতি, ছিল না শিল্পীর

নিজেকে নিঃশেষে ঢেলে দেওয়া। সে কেমন করে' কাটিয়েছে, কেমন করে'!—এই অসম্পূর্ণতা নিয়ে, এই বিরাট শূন্যতা নিয়ে—কেমন করে সে এতদিন ছিল, কেবল এই রঙ তুলি ও চিত্রপটের বিরাট ব্যর্থতাভরা ব্যঙ্গ নিয়ে? হায়! তার নিগূঢ় আনন্দের উৎসটি এতদিন কে এমন করে' নিষ্ঠুরভাবে তার অলক্ষ্য করে' রেখেছিল।

কিন্তু আজ তার কোন্ নিগূঢ় অন্তরের গোপন কক্ষে কোন্ একটা মণি-মুক্তা-খচিত বীণার স্বর্ণ-তারে কার অদৃশ্য অঙ্গুলির স্পর্শ পড়ল—সেই স্পর্শে যে সুর বেজে উঠল—সেই সুরে তার আজ এ কি হ'য়ে গেল! এ কি বেদনা, এ কি আনন্দ! তা ত আজ তার বুঝবারও ক্ষমতা নেই—আজ যে কেমন তার বেদনা আর আনন্দ একেবারে জড়িয়ে গেছে, দুটোকে আর ত তার আলাদা করবার উপায় নেই—আজ যে কেমন তার মনে হচ্ছে, বেদনাও আনন্দ—আনন্দও বেদনা। মৌকুল, মৌকুল, এতদিন কোন্ মরুভূমির মধ্যে পিপাসা-নিবারণের জন্যে ঘুরে ঘুরে মরছিলে!

ঐ যে নিগূঢ় গোপন বীণার তারে ঝঙ্কার—কি ঐশ্বর্য্যময় সে ঝঙ্কার—সেই ঝঙ্কারের সঙ্গে সঙ্গে যে আজ এক নিমেষে সব নিবিড় অর্থপূর্ণ হয়ে উঠল—চোখে যে কিসের অঞ্জন লেগে গেল—এই ধরিত্রীর মাটিতে মাটিতে এত গান, এত সুখ, এত সৌন্দর্য্য—এই যে মতি-মঞ্জিল, ঐ যে তরুশ্রেণী, ঐ যে কুসুমকুঞ্জ, ঐ যে লতাবিতান—সব যেন কেমন উজ্জ্বল, কেমন সজীব হ'য়ে উঠল। শিল্পী, শিল্পী, তুমি এতদিন কোন্ অন্ধ-করা অরণ্যে কেবল মুক্তির পথ খুঁজে মরছিলে!

দুটি তরুণ চোখ!আর দুটি তরুণ চোখ—তাদের মিলনে এম্‌নি রহস্যের সৃষ্টি, এম্‌নি অমৃতের উৎস, এমনি দিকে দিকে পুলক জেগে উঠল, আকাশে বাতাসে হিল্লোল খেলে গেল, জল স্থল রঙিন হয়ে উঠল।

সে আজ ছবি আঁকবে—নতুন বেগমের। নতুন বেগম! না—না—না—নতুন বেগম কে? তাকে ত সে তেমন করে' জানে না—তার সঙ্গে ত শিল্পীর কোনই পরিচয় হয়নি। না—না—সে নতুন বেগম নয়—ইরাণ-তুরাণের কেউ নয় বাদশা হুসেন শাহের কেউ নয়,—তার হারেমের কেউ নয়—সে যে শিল্পীর নিভৃত গোপন মনের মন্দিরের দেবী—যে কোমল স্পর্শে তার হৃদয়-বীণায় মোহন রাগিণী বাজিয়ে তুলেছে—তার দৃষ্টিসম্পাতে তার হৃদয় পদ্ম প্রত্যেক দলটি নিয়ে ফুটে উঠেছে। না—না—সে নতুন বেগম নয়—ইরাণ-তুরাণের কেউ নয়—বাদশা হুসেন শাহের কেউ নয়—তার হারেমের কেউ নয়—সে যে শিল্পীর নিভৃত গোপন হৃদয়-মন্দিরের প্রণয়িনী—যার গণ্ড কপোল কণ্ঠ শিল্পীর দৃষ্টিতে লাজ-লালিমার রক্তিমাভায় ছেয়ে গিয়েছে—যে শিল্পীর দিঠি-বিনিময়ে তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে পুলক নিয়ে কেঁপে উঠেছে—না সে বৃদ্ধ হুসেন শাহের নতুন বেগম নয়—সে যে চির-তারুণ্যের জীবন-মন্দিরে যুগযুগান্তরের সঙ্গিনী!

তারি, কেবল তারি ছবি সে আঁকবে? নতুন বেগম? নতুন বেগম বলে কেউ এই পৃথিবীতে নেই—নেই—নেই। নেই—এই ব্রহ্মাণ্ডে ইরাণ-তুরাণ বলে' কোন স্থান নেই—বাদশা হুসেন শাহ বলে' কোন ব্যক্তি নেই…তার হারেম বলে কোন কারাগার নেই—সেখানে নতুন বেগম বলে' কোন বন্দিনী নেই। আছে শুধু অনন্ত শূন্য অনন্ত অবসরের মাঝে দুটি তরুণী, দুটি প্রেমিক প্রেমিকা…আছে শুধু দুটি হৃদয়, আঁখি, একটি অনন্তকালের নিবিড় চুম্বন। এই, আর কিছুই নয়।

কেবল তারই ছবি সে আঁকবে। যে-ছবি সে আঁকবে…কেবলই কি তুচ্ছ রঙ দিয়ে? তুচ্ছ রঙ দিয়ে! তার হৃদয়-শোণিতের বিন্দুতে বিন্দুতে যে আলেখ্যের প্রত্যেক অণু পরমাণু প্রাণ পাবে…তার নিশ্বাসে নিশ্বাসে যে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জেগে উঠবে, তার আত্মার স্পর্শে স্পর্শে তা চিত্রপটে ফুটে উঠবে…তুচ্ছ তুলি আর রঙ?…না।

শিল্পী এক মনে মতিমঞ্জিলে ছবি আঁকতে লাগল।

ধীরে ধীরে তার কাছে বাহ্যজগত লোপ পেয়ে গেল। মতিমঞ্জিল তার বিস্তীর্ণ উদ্যান—বিশাল তরুশ্রেণী—নিবিড় লতাবিতান, সব অদৃশ্য হ'য়ে গেল—রইল শুধু তার চোখের সামনে একটি তরুণীর মূর্ত্তি—চুম্বন যার নিবিড়, দৃষ্টি যার গভীর, বক্ষে যার ইঙ্গিত, কণ্ঠে যার সঙ্গীত, অধর যার বিরহ-কাতর, চরণ যার মিলন-বাঁধা।

শিল্পী এক মনে ছবি আঁকতে লাগল।

(৫)

দেখতে দেখতে ছ'মাস কেটে গেল।

গোধূলির স্বর্ণে স্বর্ণে পশ্চিমাকাশে গৈরিক ওড়্না উড়িয়ে পূরবী রাগিণী বেজে উঠেছে...বাদশা হুশেন শাহ্ স্বজনু খাঁকে সঙ্গে নিয়ে মতিমঞ্জিলে এসে উপস্থিত হলেন। শিল্পীকে বললেন..."শিল্পী, তোমার ছ'মাস শেষ।"

শিল্পী আভূমি প্রণত হ'য়ে উত্তর দিলে..."জাঁহাপনা, আলেখ্যও শেষ।"

বাদশা বললেন, "আজ হিন্দুস্থানের চিত্রকরের ক্ষমতা কতদূর, তার বিচার হবে শিল্পী!"

শিল্পী বিনম্র শিরে বহু কক্ষ অতিক্রম করে' বাদশা ও উজীরকে মতিমঞ্জিলের নিভৃততম অংশে একটি কক্ষে নিয়ে এল। গোধূলি-লগ্নে কক্ষের মধ্যে আঁধার হ'য়ে এসেছে। শিল্পী রৌপ্য দীপদানে দুটি দীপ জ্বালিয়ে তার চিত্রপটের দু'পাশে রক্ষা করল। চিত্রপটের উপরে পরদা ঢাকা।

পরদা-ঢাকা চিত্রপটের সামনে এসে বাদশা ও উজির দাঁড়ালেন। শিল্পী ধীরে ধীরে চিত্রপটের উপর থেকে পরদা সরিয়ে নিয়ে একপাশে এসে দাঁড়াল।

বাদশার কোষে অসি ঝন্‌ঝন্ করে' বেজে উঠল, তাঁর হাতের আকর্ষণে খাপ থেকে তা অর্দ্ধেক বেরিয়ে এল।

শিল্পী তৃপ্তির হাসে শান্তস্বরে বললে—"জাঁহাপনা এ আলেখ্য মাত্র।

ইরাণ-তুরাণের বাদশা লজ্জিত হ'য়ে তরবারি আবার খাপে পুরলেন। কণ্ঠ হ'তে বহুমূল্য মণিহার খুলে শিল্পীর গলায় পরিয়ে দিলেন। তারপর বাদশা আর উজির দু'জনে বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে আলেখ্যের দিকে তাকিয়ে রইলেন। এ ত রঙ দিয়ে আঁকা ছবি নয়—এ যে মূর্ত্তিমান রক্তমাংসের শরীর! কে বলবে নতুন বেগম আজ বাদশা হুশেন শাহের হারেমে—সে আজ মতিমঞ্জিলের একটি নিভৃত কক্ষে রত্নখচিত সিংহাসনে উপবিষ্টা!

প্রথম বিস্ময়ের কথঞ্চিৎ উপশমে বাদশা বললেন... "শিল্পী, তোমার শক্তি অলৌকিক, ঐশ্বরিক...লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রার পরিবর্ত্তে পাঁচ লক্ষ তোমার পুরস্কার—হিন্দুস্থানের নৃপতিরা না বলে ইরাণ-তুরাণের বাদশা গুণের আদর করতে জানে না! আর শিল্পী, কাল প্রাতে অনুচরবর্গ নিয়ে কোতোয়াল আসবে, আলেখ্য রাজপ্রাসাদে স্থানান্তরিত করবার জন্যে.. সেজন্যে প্রস্তুত হয়ে থেকো। শিল্পী, তুমি নতুন বেগমের ছবি আঁকনি, দ্বিতীয় নতুন বেগমের সৃষ্টি করেছ।"

বাদশা ও উজির মতিমঞ্জিল ত্যাগ করলেন।

ওঃ প্রলয়! মুহূর্ত্তের মধ্যে শিল্পীর পায়ের নীচে কার কক্ষতল প্রলয়-ঘূর্ণনে ঘুরতে লাগল! কক্ষের আসবাব সব তার চোখের সুমুখে যেন মত্ত হ'য়ে নাচতে লাগল, চারিদিকের দেয়াল যেন দুল্‌তে লাগল, দীপ-দানে দীপ যেন মরণাহত মানুষের হাসির মত বীভৎস হ'য়ে উঠল, শিল্পী টল্‌তে টল্‌তে চিত্রপটের সাম্‌নে মেঝের উপর বসে পড়ল।

স্বপ্ন! স্বপ্ন! সব স্বপ্ন...আপনার চারিদিকে স্বপ্নের জাল বুনে এতদিন কি প্রবঞ্চনার মাঝেই না সে এই ছ'মাস কাটিয়েছে!...কোথায় সে? কে সে—মিথ্যা...মিথ্যা...সব মিথ্যা। তার চাইতে অনেক বেশি সত্যি, লক্ষ কোটী গুণ সত্যি, ভয়ঙ্কররূপে সত্যি, এই ইরাণ-তুরাণ, ইরাণ-তুরাণের বাদশা হুশেন শাহ, হুশেন শাহের হারেম, আর সেই হারেমে বন্দিনী নতুন বেগম—সত্যি সত্যি ওগো অতি সত্যি, নিষ্ঠুর ভাবে সত্যি, নির্ম্মম ভাবে সত্যি, মৃত্যুর মত সত্যি।

সেই হুশেন শাহের রাজপ্রাসাদে এই আলেখ্য স্থানান্তরিত হবে কাল—একটি মাত্র রজনীর অবসানে। এই আলেখ্য, যে আলেখ্যের প্রতি অণুতে অণুতে তার অস্তিত্ব বিছিয়ে আছে, যে আলেখ্য মাসে মাসে দিনে দিনে নিমেষে নিমেষে আপনার প্রত্যেক চিন্তাটি দিয়ে, প্রত্যেক নিশ্বাসটি দিয়ে, প্রত্যেক ইচ্ছাটি দিয়ে, প্রত্যেক আকাঙ্ক্ষাটি দিয়ে, সে জাগিয়ে তুলেছে—তাই একজনের একটি মাত্র কথায় চিরদিনের মতো তার কাছ থেকে অপসারিত হবে। বাদশার আমদরবারে এই আলেখ্য ঝুলবে, লক্ষ লোকের চোখের তৃপ্তির জন্যে—তার জন্যে রইবে শুধু লক্ষ কণ্ঠে অজস্র বাহবা। শিরা হ'তে বিন্দু বিন্দু করে' রক্ত দুইয়ে বাহবা লাভ! না—না—চাই

সে বাহবা, চাইনে লক্ষ দশ লক্ষ, কোটী লক্ষ, সুবর্ণ মুক্তা, আমায় ফিরিয়ে দাও—ফিরিয়ে দাও কেবল এই আলেখ্যখানা।

বাতুল—বাতুল, এই আলেখ্য? ওরে শিল্পী, ওরে মূর্খ মৌতুল, কোথায় তোর মানসী কোথায়? এই আলেখ্য? তোর মানসী যে প্রত্যেক নিমেষটিতে বাদশা হুসেন শাহের অন্তঃপুরবাসিনী, সূর্য্যের আলোর পর্য্যন্ত যার মুখ দেখবার অধিকার নেই, এই আলেখ্য? জড় —জড়—কেবল রঙ আর রঙ আর রঙ—রঙ—জড়—অতি জড়। জড়? না—না—কে বললে জড়? ওরে নাস্তিক—ঐ যে, ঐ যে বুক দুলছে না কি?, ঐ যে চোখের পাতায় অশ্রুবিন্দু কাঁপছে, ঐ যে ঠোঁট দুখানি পাংশু হ'য়ে উঠল—জড়? নয়—নয় কিছুতেই নয়—ঐ যে দীর্ঘ নিশ্বাসে বুক দমে গেল—ঐ যে ঘাঘরার প্রান্তটা কেঁপে উঠল না কি? পাগল—পাগল—এ যে একেবারেই জড়—শক্তিহীন, গতিহীন, ইচ্ছাহীন!

শিল্পী উদভ্রান্ত দৃষ্টিতে সেই কক্ষতলে বসে আলেখ্যের দিকে অ,নমেষ চোখে চেয়ে রইল। ঐ ঠোঁট দুখানি যদি একবার কেবল একবার মাত্র নড়ে ওঠে, একবার মাত্র ডাকে—"শিল্পী"। ঐ চোখের তারা দুটি যদি কেবল এক্টিমাত্র নিমেষের জন্তে চঞ্চল হ'য়ে ওঠে, যদি—যদি—যদি—আঃ কি নিষ্ঠুর শাণিত তরবারির একটুকু স্পর্শে তার সূক্ষ্ম কোমল স্বপ্নের জাল একেবারে ছিন্ন ভিন্ন হ'য়ে অদৃশ্য হ'য়ে গেল, হাওয়ায় মিশিয়ে গেল। শিল্পী নিস্তব্ধ হ'য়ে বসেই রইল—দণ্ডের পর দণ্ড কেটে যেতে লাগল, সন্ধ্যার আঁধার ধীরে ধীরে নিবিড় কালো হ'য়ে উঠল, মতিমঞ্জিলের বৃক্ষে বৃক্ষে পাখীর ডাক সব নীরব হ'য়ে গেল, দণ্ডে দণ্ডে প্রহর কাটতে লাগল, শিল্পী ক্লান্ত দেহ মন নিয়ে ধীরে ধীরে কখন্ নিদ্রাভিভূত হ'য়ে গালিচার উপরে ঢলে পড়ল তা জানলও না।

* * * *

এদিকে মধ্যরজনীর নীরবতাকে মুখরতায় ভরিয়ে দিয়ে বাদশা হুসেন শাহ্‌র হারেমে মহা উৎসব চল্‌ছে। সহস্র দীপালোকে রাত্রির অন্ধকার দূর হ'য়েছে, অথচ তা দিনের একান্ত স্পষ্টতায় কোন দিকেই সমাপ্তি টানে নি—সবই যেন রহস্যময়, আভাসময়, ইঙ্গিতময়। বেলোয়ারী ঝাড়ের ঠুন্‌ঠান্‌, বলয় কঙ্কনের ঠিনি ঠিনি, নূপুর নিক্কনের রিনি-ঝিনি। কত কত রূপসী তরুণী হীরে মণি মুক্তা জহরতে ভূষিত। প্রত্যেক অঙ্গ সঞ্চালনে দীপ-রশ্মিস্পর্শে তাদের আর সারা দেহ হ'তে যেন তারার টুকরো ছিটিয়ে ছিটিয়ে পড়ছে। তাদের নিবিড় কালো আঁখিতারা হ'তে অবিরাম ক্ষরিত হচ্ছে অমৃত ও হলাহল, জীবন ও মৃত্যু—ঐ যে দেখা যায় তাদের আবেশবিহ্বল আঁখি পাতে পাতে অঙ্কিত অমরার সিংহাসন আর গম্ভীর গহন রসাতলের বিরাট গহ্বর।

অসংখ্য তরুণী রূপসী তাদের রূপের ডালি নিয়ে, চটুল চাহনি নিয়ে, হাসির তরঙ্গ তুলে, উঠছে, বসছে, ঘুরছে, ফিরছে, চলছে। এই তরুণীদের মেলার মধ্যে বৃদ্ধ হুসেন শাহ্।

কি নিষ্ঠুর উৎসব! কি নির্ম্মম এই অসংখ্য তরুণী-দের একটি বৃদ্ধকে ঘিরে তাদের আশা আকাঙ্ক্ষা সাধ আহ্লাদের সমাপ্তি! না জানি ঐ চটুল চাহনীর পিছনে কত শত দীর্ঘ নিশ্বাস সংগোপিত, ঐ হাল্‌কা হাসির পশ্চাতে কত কত হতাশার গুরুভার জটিল, কত কত জীবনের ব্যর্থতা, ঐ উৎসব রজনীর পশ্চাতে আপনার কতো ক্লান্তির হিসেব টেনে চলেছে! প্রবল প্রতাপ-শালী হুসেন শাহ্, ঐ বিরাট ব্যর্থতায় বিনিময়ে কিছু দান করবার ক্ষমতা তোমার হাতে নেই।

নতুন বেগম গান গাচ্ছিল—কি করুণ কি কোমল সে সুর! যেন তার আঁখির পাতে বিশ্বের অশ্রুরাশি থমকে রয়েছে, যেন তার ঠোঁটের কোণে সারা জগতের বিষাদ গুমরে মরছে, আর তার কণ্ঠস্বরে কি মিষ্টি বীণার তানেই অশ্রুসাগর উথলে উঠছে।

"ওগো অচেনা, তুমি এমনি পরিচিত—এতদিন তবে কোথায় ছিলে? যখন প্রথম বুল্‌বুল্ ডেকেছিল, যখন প্রথম সিরাজির স্পর্শ স্নায়ুতে স্নায়ুতে চারিয়ে গিয়েছিল, যেদিন প্রথম দিগন্তের কোণে কোণে চোখ দুটি তোমার সন্ধানে ফিরছিল, সেদিন তুমি কোথায় ছিলে—কোথায় ছিলে?—"

"বুল্‌বুল্‌কে খাঁচায় পুরে দিলে, সিরাজি অবরুদ্ধ-

মণ্ডিত শিরায় রক্তিম হ'ল, চোখের সামনে আঁধার নেমে এল, অচেনা তুমি আজ কেমন করে' কোথায় থেকে এল ?—"

"ওগো পরিচিত—কেবলই জল ঝরবে, মেঘ থেকে কেবলই জল ঝরবে, জোছ্‌না আর খেলবে না, ফুল আর ফুটবে না, বুলবুল্ আর ডাকবে না, ওগো তুমি চির-পরিচিত—

"ও"—গান আর শেষ হ'ল না। সহসা নতুন বেগম দু-হাতে বুক চেপে গালিচার উপরে লুটিয়ে পড়ল, তার মুখ পাংশুবর্ণ হ'য়ে গেছে, চোখের তড়িৎ মলিন হয়ে গেছে।

বাদশা হুসেন শাহ চক্ষের পলকে এসে লুণ্ঠিতা নতুন বেগমের পাশে নতজানু হ'য়ে বসলেন—দেখলেন নতুন বেগম অতি কষ্টে নিশ্বাস প্রশ্বাস নিচ্ছে। বাদশা শঙ্কিত কণ্ঠে ডাকলেন—"পিয়ারী, পিয়ারী—"

হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে অতি কষ্টে নতুন বেগম উত্তর দিলে—"জাঁহাপনা, বাঁদীর গোস্তাকি মাপ করবেন। বুকের ভিতরটা হৃদ্‌পিণ্ডটা যেন কে চেপে চেপে ধরছে—", বেগমের শ্বাস ফুরিয়ে এল, আর কিছু ফুটল না।

তৎক্ষণাৎ বাঁদীরা ধরাধরি করে' নতুন বেগমকে কক্ষান্তরে নিয়ে গেল, শয্যায় শায়িত করে' দিলে, প্রতি মুহূর্তে তার শ্বাসকষ্ট উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হ'তে লাগল। হাকিমের জন্যে লোক প্রেরিত হল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই নতুন বেগমের যেন নিশ্বাস প্রশ্বাসের কষ্টের খানিকটা উপশম হ'ল, তার মুখ থেকে ধীরে ধীরে যন্ত্রণার চিহ্ন দূরীভূত হ'য়ে গেল, শান্তির নিশ্বাস ফেলে নতুন বেগম ধীরে ধীরে চোখ দুটি নিমীলিত করল, ধীরে ধীরে তার রক্তিম ঠোঁটে রঙিনতর একটা হাসির রেখা অঙ্কিত হ'য়ে গেল।

হাকিম এলেন, নিদ্রিতা নতুন বেগমের নাড়ী স্পর্শ করলেন, একটা বিস্ময়ের ক্ষণিক আভা তাঁর চোখ দুটোতে খেলে গেল, আত্মসম্বরণ করে' তিনি আবার দ্বিগুণ মনোযোগের সঙ্গে নাড়ী অনুভব করলেন, তার পর ধীরে ধীরে হাতখানিকে শয্যায় নামিয়ে রাখলেন। গম্ভীর কণ্ঠে হুসেন শাহের দিকে ফিরে বললেন—"ইরাণ-তুরাণের প্রবল পরাক্রান্ত বাদশা জাঁহাপনা, নতুন বেগম এ নশ্বর জগত ত্যাগ করে' বেহেস্তের পথে যাত্রা করেছেন।"

বাদশার মুখ দিয়ে কথা সরল না।

* * * *

শিল্পী স্বপ্ন দেখছিল। হিমাদ্রির কোন্ গহন গভীর নির্জ্জন গুহায় একমনে সে আপনার মানসীর ছবি আঁকছিল। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর সে অনাহারে অনিদ্রায় ছবি আঁকছিল। সহস্র বৎসর পরে তার ছবি আঁকা শেষ হ'ল। তখন শিল্পী সভয়ে দেখলে, এ ত আর কেউ নয়—এ যে নতুন বেগম। দেখতে দেখতে গিরিগুহা পরিবর্ত্তিত হ'য়ে মতিমঞ্জিল হ'য়ে গেল। হতাশায় শিল্পী তার অঙ্কিত আলেখ্যের সামনে লুটিয়ে পড়ল।

সহসা শিল্পী দেখলে ছবিতে আঁকা ওড়না যেন একটু কেঁপে উঠল, আলেখ্যের চোখের পাতা মিটমিট্ করে' উঠল, চোখের তারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল, ঠোঁট দুটো নড়ে উঠল, ধীরে ধীরে আঁকা মানসী-মূর্ত্তি চিত্রপট থেকে কক্ষতলে নেমে পড়ল, তার কানে এসে বাজল "শিল্পী—"

শিল্পী ঘুম থেকে চমকে উঠল, জেগে দেখলে, তার সামনে দাঁড়িয়ে এক তরুণী স্মিত মুখে তার মুখ দেখলে, ভয়ে বিস্ময়ে তার মুখ থেকে বেরিয়ে পড়ল—"নতুন বেগম !"

স্বপ্নময়ী বললে—"শিল্পী, নতুন বেগম মরেছে, আমি তোমার প্রণয়িনী, এস—রাত আর বেশি নেই—"

নিমেষে শিল্পীর ঘুমের ঘোর কেটে গেল—তার দেহের প্রত্যেক অণু-পরমাণু জাগ্রত হ'য়ে উঠল, তার শিরায় শিরায় তড়িৎ চারিয়ে গেল। এত স্বপ্ন নয়—এ যে সত্যি—অতি সত্যি। তৎক্ষণাৎ তরুণ যুবক উঠে দাঁড়াল, তরুণীর হাত ধরে' বাইরে বেরিয়ে এলো। রজনীর শেষ শুকতারা পূব গগনে জ্বল্-জ্বল্ করছিল। সেই শুকতারার আলোকে আলোকে প্রেমিক প্রেমিকা হাত ধরাধরি করে' দূর দিগন্তে কোথায় মিলিয়ে গেল।

(৬)

মানুষের হাজার শোক হোক্ রাজার রাজকার্য্য

বন্ধ থাকে না। পরদিন বাদশা হুকুম দিলেন শাহ্‌ কোতোয়ালকে মতিমঞ্জিল থেকে নতুন বেগমের তস্বীর আনবার জন্য পাঠালেন। কোতোয়াল অনুচরবর্গ নিয়ে মতিমঞ্জিল উদ্দেশ্যে চললেন। যথাসময়ে ফিরে এসে বাদশাসমীপে নিবেদন করলেন—"জাঁহাপনা, মতিমঞ্জিলে শিল্পীর সাক্ষাৎ পাওয়া গেল না।"

বাদশা বিস্মিত হলেন, উজিরকে সঙ্গে নিয়ে মতিমঞ্জিল উদ্দেশে যাত্রা করলেন। এসে দেখলেন শিল্পী অদৃশ্য। শিল্পী যে কক্ষে ছবি আঁকছিল সেই কক্ষে দুজনে প্রবেশ করলেন। দেখলেন কেউ কোথাও নেই। আপনার স্থানে পরদা ঢাকা চিত্রপট—তার দুপাশে রজতাধারে তৈলহীন প্রদীপ দুটিতে সলতের ভস্মাবশেষ।

বাদশা চিত্রপট দেখে হৃষ্ট হলেন। বল্লেন—"উজির, চিত্রকর না থাক, চিত্রপট রয়েছে—তাই আমাদের যথেষ্ট। চিত্রকর যদি পুরস্কার প্রত্যাশা না করে সে দোষ ইরাণ তুরাণের বাদশার নয়—" বলতে বলতে তিনি চিত্রপটের পরদা অপসারিত করলেন।

বাদশার মুখের কথা মুখেই মিলিয়ে গেল। দু'জনে মন্ত্র মুগ্ধের মত ছবির দিকে তাকিয়ে রইলেন। চিত্রপটে রত্নখচিত সিংহাসন যেমন আঁকা ছিল তেমনি আছে, কিন্তু তার উপকার নতুন বেগমের চিহ্নমাত্র নেই।

রত্নসিংহাসনের রত্নগুলো যেন প্রাণ পেয়ে জল্‌ জল্‌ করছে।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

সবুজপত্র। ভাদ্র, ১৩২১

পথের গান

কাজল আঁখির রূপালি সূতায়
বুনে' বুনে' পথখানি,
নীলাম্বরীর আঁচল ভিজায়ে
ফিরে গেছে অভিমানী।
বিজুরির জরী-ফিতেটি সে ওই
ফেলে গেছে চুল খুলে',—
শরৎ-মেঘের শাদা কস্তার
কে তার বুনিয়া থুলে।
আল্‌তার টোপ্—বাস ফুলে ছোপ্‌
পড়েছে চরণ থেকে,
এইখান দিয়ে চলে' সে গিয়েছে
এই খান দিয়ে বেঁকে।

দুলায়ে দিলে কে হাসির দোলায়
কাশের ও' দুধে হাসি,
কনক থালে সোনার শোলোক
রচনা করিছে চাষী।
ঝুম্‌কা জবার বেলোয়ারী ঝাড়—
কিসে আলোর মায়া?
গন্ধ তৈলে বনের মিছিলে
ঝুলায়ে দেখেছে কা'মা?
আলোক-লতার দেখন-হাসি সে
বুক জুড়ে' আছে বসি';—
দুই চোখ ঢেকে আঁচলে—এদিকে
গিয়েছে কি রূপসী!

পাখী-হারা কোন্ পাখীর করুণ
　　ক্রন্দনে বন-থল
মরমবেদনায় সাড়া দিয়ে দিয়ে
　　কেঁদে' মরে অবিরল।
নিথর পাতার শিয়রে ঘুমায়
　　নিশ্চল ছায়াখানি,—
ঘুমের স্বপনে বন-কৌতুক
　　সকলি ফেলিছে জানি!
ললাট ঘামিয়া চন্দন-চুয়া
　　পড়েছে কচুর পাতে,
এই পথ ঘুরে চলে সে গিয়েছে
　　দারুণ রোদের তাতে!

শ্যাম-সরোবরে সন্ধ্যা-মেঘের
　　রাঙা ছায়াটুকু পড়ে,
নিবিড় সোহাগ—স্বপ্ন যৌবন
　　ঝাঁকড়ি' আঁকড়ি' ধরে!
তরু-বীথিকায় ফাঁকে দেখা যায়
　　টুকরো আকাশখানি—
জীবনের ছোট প্রহরের শুধু
　　একটুকু জানাজানি!
অংশুমালীর মুকুটের সোনা
　　ঠিকরি' পড়িছে কোথা,
না জানি সে কোন্ রহস্য-দ্বার
　　খুঁজিতে গিয়েছে কোথা!

ঝিল্লির গানে—ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে
　　ঘুমিয়ে পড়েছে পাখী,
নীলিমার মায়া-মন্তর তা'র
　　জড়িয়ে ধরেছে আঁখি।
বনের মাথায় পাতায় পাতায়
　　ঝলসি' উঠিছে কি যে?—
ছড়িয়ে গেছে কি তা'রি কণ্ঠের
　　সোনার কণ্ঠী ছিঁড়ে'।
কালি চন্দ্রের খালি বুকখানি,
　　তিমিরে হারায় দিক্!
এরি মাঝ দিয়ে চুপে চুপে সে গো
　　চলে গেছে ঠিক্—ঠিক্!

সোনার হারায়ে রোসর করেছি
　　আজিকে পথেরে তাই,
এত কি পথের রহস্য ওগো,
　　অন্ত কি এর নাই!
নিঝুম রাত্রির উদাসী আঁখির,
　　সীমাহীন দিঠি পরে
অধরের হাসি অশ্রু মিশিয়া
　　একি কৌতুক করে!
কই আমি! কই ঘন-কুন্তলা!
　　পথ কই,—পথ কই!
চিত্ত-মরমে নিত্য ছড়ায়
　　গানের সুরটি ওই!

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

অপরাধী

বিশ বৎসরের পূর্ব্বেকার কথা বলিতেছি। মুঙ্গেরের কলেজে পড়িতাম। বয়স আমার তখন আঠারো কি উনিশ।

গোরাবাজারের ওদিকে ফুটবল ম্যাচ দেখিতে গিয়াছিলাম। হঠাৎ সারা আকাশ মেঘে ছাইয়া ঝড় তুলিয়া মুষলধারে বৃষ্টি নামিল। মাথা বাঁচাইবার উদ্দেশে দিগ্বিদিকের জ্ঞান হারাইয়া একদিকে ছুট্ দিলাম। পিছনে ডাক শুনিলাম,—আমাদের বাড়ী আসুন, অজিত বাবু। চাহিয়া দেখি, অশ্বিনী। আমাদেরই সহপাঠী সে, পাশের একটা বাংলার বারান্দা হইতে আমায় ডাকিতেছে। সানন্দে তাহার আতিথ্য গ্রহণ করিয়া সাগ্রহে তাহার বাড়ী গিয়া উঠিলাম। অশ্বিনীরা নেটিভ ক্রীশ্চান্। বাঙ্গালীপাড়ার বাহিরে থাকে। ছোট কটেজের মধ্যে একটু কম্পাউণ্ডও আছে, মেঝের উপর ঝরঝরে পরিষ্কার বাংলাখানি—তারী পরিচ্ছন্ন। কম্পাউণ্ডে লাল নীল নানারঙের ফুলে-ভরা ছোট বাগান—ঠিক যেন একখানি ছবি!

ভিজা কাপড় বদলাইয়া মাথায় ব্রুশ্ চালাইয়া ভদ্রলোক সাজিয়া ভিতরে আসিয়া বসিলাম।

অশ্বিনীর বিধবা মা আসিয়া সস্নেহে অভ্যর্থনা করিলেন—কি মধুর স্নেহকরুণায় তাঁহার মুখখানি ঝলমল্ করিতেছে—শান্ত সুন্দর শ্রীতে সমুজ্জ্বল, যেন ম্যাডোনার মূর্ত্তি। একবার দেখিলে জীবনে সে মূর্ত্তি ভোলা যায় না। পরক্ষণেই অশ্বিনী ডাকিল,—বেবা।

টক্‌টকে লাল রঙের শাড়ীতে আপনার দেহখানিকে আবৃত করিয়া রাজ্যের লজ্জা গায়ে মাখিয়া এক বালিকা কক্ষে প্রবেশ করিল। অস্তগামী সূর্য্যের কিরণচ্ছটায় সমস্ত আকাশ যেমন এক অপূর্ব্ব স্নিগ্ধ বর্ণে আপনাকে রঞ্জিত করিয়া তোলে, বালিকার সর্ব্বাঙ্গে তেমনি এক অপরূপ রূপের হিল্লোল। তাহার সে অপরূপ রূপের জ্যোৎস্নায় প্রলয়ান্ধকারে আচ্ছন্ন সেই ঘরখানি মুহূর্ত্তে যেমনি চকিত উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। কুঞ্চিত কৃষ্ণকেশে দোদুল বেণী, মাথার উপর টক্‌টকে লাল ফিতায় খোঁপা বাঁধা—সে এক অপূর্ব্ব শোভা। আমি তাহার পানে চাহিয়া চকিতে চোখ নামাইলাম।

অশ্বিনী বলিল,—ইনিই অজিত বাবু, কলেজ-টীমে খেলেন। সেদিন গোরাদের সঙ্গে কলেজের যে ম্যাচ দেখেছ, তাতে গোরারা যে গোল খেয়ে হেরে গেল—সেই গোলটি ইনিই দিয়েছিলেন। এঁকে চা খাওয়াও দেখি। এর অভ্যর্থনার ভার তোমার উপর।

সলজ্জ মধুর ভঙ্গীতে ঘাড় নাড়িয়া বেবা বাহির হইয়া গেল। যাইবার সময় তাহার চোখ আর ঠোঁটের কোণে যে আনন্দের দীপ্তি ফুটিয়া উঠিয়াছিল, সেটুকু আমার লক্ষ্য এড়ায় নাই—আমার মনে হইল, যেন হাসির একটা জীবন্ত বিদ্যুৎ-শিখা আমার সম্মুখ হইতে সরিয়া গেল! এই জ্যোৎস্নাময়ী বালিকার হাতের তৈয়ারী চায়ে সেদিন অমৃতের স্বাদ পাইলাম!

অনেক রাত্রে বৃষ্টি থামিলে বাড়ী ফিরিলাম। সে রাত্রে ঘুমটার বড় ব্যাঘাত হইল। কেবলি রেবার সেই সুন্দর মুখ আমার প্রথম যৌবনের সমস্ত বাসনা-কামনার প্রদীপটিতে, শিখার মত জল্ জল্ করিতে লাগিল। রেবা ক্রীশ্চান, ক্রীশ্চান, ক্রীশ্চান,—এই কথাটা বার বার মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিয়া তীক্ষ্ণ ছুরির মতই আমার সমস্ত আশা সমস্ত কল্পনাকে ক্ষত-বিক্ষত রক্তাক্ত করিয়া তুলিল।

ইহার পর হইতে অখিনীর সহিত ঘনিষ্ঠতা আমার খুবই বাড়িয়া উঠিল। নানা ছুতা-নাতায় তাহার বাড়ী গিয়া হাজির হইতাম—সন্ধ্যার চায়ের টেবিলে স্পোর্টিংয়ের নানা অবান্তর আলোচনায় ঘড়িতে কখন্ যে দশটা এগারোটা বাজিয়া যাইত, সেদিকে কাহারো হুঁস থাকিত না। আমি শুধু রেবার রূপসুধা আর তাহার হাতের তৈয়ারী চা পান করিয়া আমার সেই প্রথম যৌবনের সুদুর্লভ মুহূর্ত্তগুলিকে এক বিচিত্র রমণীয়তায় পরিপূর্ণ করিয়া বাড়ী ফিরিতাম।

প্রাণে তৃপ্তিই কি তেমন পাইতাম! অসহ্য বেদনা বোধ হইত, যখন বুঝিতাম, এই রেবাকে কোনদিন আমার পাইবার আশা নাই! সে ক্রীশ্চান্! এই রেবা,—কোথায় কাহার হাতে আপনার ঐ অনিন্দ্য-সুন্দর জীবন-পুষ্পটি উৎসর্গ করিয়া দিবে—তখন কোথায় থাকিবে সে, আর কোথাই বা আমি! হায়রে, এখনকার এই মুহূর্ত্তগুলার সকল স্মৃতিই তখন অতীতের কোন্ অতল গহ্বরে তলাইয়া যাইবে! বেশী ভাবিতেও পারিতামনা। স্বার্থের বিষে সমস্ত মনটা বিষাইয়া উঠিত। রাত্রে বাড়ী ফিরিবার সময় কতবার মনে করিতাম, আর না, রেবাকে আর দেখিব না! নৈরাশ্যের আগুনে এ বাসনায় ইন্ধন মিথ্যা আর কেন জোগাই! রেবা পরের, রেবা সুদূরের! কিন্তু পরদিন আবার কলেজের ছুটি হইলেই রেবার সেই তরুণ রূপের মোহ কি প্রবল আকর্ষণে আমায় আবার তাহারই গৃহের দ্বারে টানিয়া আনিত! ওঃ, সে কি ভীষণ মুহূর্ত্তগুলা! নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া কেবলি আঘাত পাইতাম। তবুও সে আঘাত পাইবার আগ্রহে আবার সে-যুদ্ধে মাতিয়া উঠিতাম। আমি যেন পাগল হইয়াছিলাম।

আর পারিলাম না—একদিন ভাবিলাম, রেবাকে সব কথা খুলিয়া বলি,—যদি বুঝাইতে পারি,—কি তীব্র পিপাসা, কি প্রবল অনুরাগ আমার প্রাণে! হোক্ সে ক্রীশ্চান! অন্তরের এই যে প্রবল আকর্ষণ, সে কি মানুষের হাতে-গড়া এই ধর্ম্মের কৃত্রিম বেড়াটাকে ভাঙ্গিতে পারিবে না—ভাঙ্গিয়া দুইজনকে এক করিয়া দিবে না? রেবা মানুষ, আমিও মানুষ। তবে?

একদিন একটা সুযোগ মিলিল। সেদিন অখিনী কোথায় কি কাজে বাহির হইয়া গিয়াছিল, কলেজেও আসে নাই। ব্যাপার কি জানিবার জন্য কলেজের ছুটির পর তাহার বাড়ীতে আসিয়া হাজির হইলাম। অখিনীর মা বলিলেন,—রেবার বিয়ের কথা হচ্ছে—অখিনী তাই ছেলেটিকে দেখতে গেছে সাহেবগঞ্জে—।

আমার বুকে যেন কে মুগুরের ঘা মারিল! রেবার বিয়ে!

অখিনীর মা বলিলেন,—রেবা, চা এনে

যাও। তিনি চলিয়া গেলেন ; রেবা চা লইয়া আসিল।

সন্ধ্যার ম্লান ছায়া তখন ধীরে ধীরে ঘনাইয়া আসিতেছিল। কাছেই এক সাহেবের বাঙলা হইতে পিয়ানোর ঝঙ্কারে একটা মাতাল সুর উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়া সমস্ত বাতাসটাকেও মাতাইয়া তুলিয়াছিল। আমার প্রাণও সে সুরে মাতাল হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার উপর সম্মুখে দাঁড়াইয়া রেবা—তাহার তারুণ্যের অপূর্ব্ব দীপ্তি লইয়া! গোধূলির সেই মৃদু আভায় তাহাকে কি অপূর্ব্বই যে দেখাইতেছিল!

পাগলের মত রেবার হাত ধরিয়া ডাকিলাম—রেবা—

স্বরটা সব বাহির হইয়াছিল কি না, জানি না—সে স্বরে আমার হৃদয়ের সমস্ত আবেগ অসহ্য আশঙ্কায়-উদ্বেগে একেবারে মূর্চ্ছাতুর হইয়া পড়িল।

রেবা ভয়-চকিতভাবে আমার পানে চাহিল। তাহার দুই চোখ বিস্ময়ে পরিপূর্ণ। আমি বলিলাম,—রেবা, আমি তোমায় ভালবাসি, বড় ভালবাসি। হও তুমি ক্রীশ্চান—তাতে কি বাধা? আমিও ক্রীশ্চান হতে রাজী আছি। রেবা—রেবা—

গুছাইয়া ঠিক এই কয়টা কথাই বলিয়াছিলাম কি না, জানি না। তবে এই ভাবের কথাগুলাই আমার মনের মধ্যে ভাষায় ফুটিবার জন্য আতালি-পাতালি করিতেছিল। তারপর এক-নিশ্বাসে আরো কত কথা যে বলিয়া গেলাম,

রেবা স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল—কোন কথা বলিল না। আমি তাহার মুখের পানে সাগ্রহ পিপাসু দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলাম। তাহার রক্তিম কপোলে ক্ষণে ক্ষণে লজ্জার সুরক্তিম আভা ফুটিয়া উঠিতেছিল, তাহার চোখের পাতা ক্ষণে ক্ষণে মুদিয়া আসিতেছিল।

হঠাৎ একটি নিশ্বাস ফেলিয়া রেবা বিদ্যুৎ-শিখার মতই সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। তারপর আমি কতক্ষণ যে মূক মৌন পুতুলের মত সেখানে বসিয়া ছিলাম, জানি না। হঠাৎ ঘড়িতে দশটা বাজিতেছে শুনিয়া আমার চেতনা হইল। আমি চোরের মত নিঃশব্দে বাহির হইলাম। ফ্লোরের নীচে এক-ঝাড় হাস্নুহানার পাশে শান-বাঁধানো ছোট চাতালটার উপর রেবা চুপ করিয়া বসিয়াছিল। ওখানে রেবা কি করিতেছে! মন কৌতূহলী হইলেও পা সেদিকে গেল না। সটান্ পথে আসিয়া দাঁড়াইলাম। পথে আসিয়া ভাবিলাম, এ কি করিলাম! মুহূর্ত্তের দুর্ব্বলতায় ক্ষণিক উত্তেজনায় একটা বালিকার কাছে এমনভাবে—ছি!

দারুণ ধিক্কারে সমস্ত মন ভরিয়া উঠিল। রেবা কি ভাবিল? পাছে পরদিন অশ্বিনীর সঙ্গে দেখা হইলে এ কথা ওঠে, সেই ভয়ে কলেজে গেলাম না। বৈকালে কষ্টহারিণী ঘাটের দিকে চলিয়া গেলাম। বাসায় ফিরিয়া শুনিলাম, অশ্বিনী কি জরুরি কাজে আমায় খুঁজিতে আসিয়াছিল। বুকটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল! তারপর দুই-তিনদিন কলেজের ছুটি ছিল—বাসা ছাড়িয়া ফাঁকে ফাঁকে ঘুরিয়া বেড়াইলাম;—রোজই অশ্বিনী আসিয়া দুই তিনবার আমার খোঁজ করিয়া গিয়াছে।—কেন? কেন? কেন? আমার দোলায় মন দুলিয়া উঠিত—আবার এক দারুণ লজ্জা মনটাকে চাপিয়া ধরিত। এমনি আলাতন হইয়া একটা কারের

অছিলা তুলিয়া একদিন হঠাৎ কলিকাতায় পলাইলাম।

চট্ করিয়া ফেরা গেল না। বাড়ীতে অকস্মাৎ নানা অসুখ-বিসুখের হাঙ্গামা আসিয়া আমায় প্রায় দুই মাস বাড়ীতে আটক করিয়া রাখিল। খাঁচার পাখীর মতই পড়িয়া ছটফট করিলাম—অশ্বিনী কেন আমার খোঁজে আসিয়াছিল? তবে কি রেবাকে পাওয়া সম্ভব? তবে কি মুঙ্গেরে ছুটিয়া যাইব? একটা চিঠি লিখিব? কি জানি, হয়ত হাতের নাগালে পাইয়াও কামনার ধনটিকে চিরদিনের জন্যই খোয়াইয়া বসিলাম।

তার পর মুঙ্গেরে ফিরিলাম, একেবারে পূজার পর, কলেজ খুলিলে। ফিরিয়া সন্ধ্যার সময় অত্যন্ত সন্তর্পণে অশ্বিনীদের পাড়ার দিকে চলিলাম। ঐ যে বাড়ী দেখা যায়। সেই বাড়ী! আমার মাথার মধ্যে রক্তটা ছলাৎ করিয়া নাচিয়া উঠিল। কম্পিত চরণে অগ্রসর হইলাম। এ কি, ফটকের সম্মুখে ছোট ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া এক সাহেব-বালক বেড়াইতেছে যে,—সঙ্গে এক তরুণী মেম। ফটকের সম্মুখে দেখি, কাঠের ছোট সাইনবোর্ড, তাহাতে একটা বিলাতী নাম লেখা। কে যেন আমায় নিমেষে কোন্ উচ্চ পর্ব্বত-শিখা হইতে একেবারে অতলস্পর্শ অন্ধকার গহ্বরে ঠেলিয়া দিল।

নিকটেই এক ভুট্টাওয়ালার দোকান। সেখানে সন্ধান লইতে গিয়া দেখি, অশ্বিনীদের বাড়ীর সেই লখিয়া দাইটা এককোণে বসিয়া ভুট্টা সেঁকিতেছে। তাহার মুখে শুনিলাম—অশ্বিনী আজ মাসখানেক হইল,—বোনের বিবাহ দিবার পরই—কি-একটা চাকরি লইয়া রেঙ্গুনে চলিয়া গিয়াছে—বিধবা মাও সঙ্গে গিয়াছেন। যাইবার সময় বাড়ীটা বিক্রয় করিয়া গিয়াছে। বিবাহটা একরকম গোলমালের মধ্যেই সারা হইয়াছে—অশ্বিনী, রেবা কি মা—কাহারও মত ছিল না। জামাইয়ের বাপের কাছে বাড়ীটা বাঁধা ছিল—তাহারা মামলা-মকর্দ্দমা করিয়া ক্রোক দিবার চেষ্টায় ছিল, তাই এই বিবাহ দিয়া সেসব দায় এড়াইয়া বাঁচিয়াছে। কলেজে বন্ধুদের মুখে শুনিলাম,—আমি চলিয়া গেলে অশ্বিনী পাগলের মত আমার সন্ধান করিয়াছিল। আমার কলিকাতার ঠিকানা কেহ জানিত না—কাজেই বলিতে পারে নাই—আমার সঙ্গে অশ্বিনীর নাকি এই বিবাহের ব্যাপারেই ভারী একটি পরামর্শ ছিল! রেবাকে যে কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তবে কি তাহারই জবাব অশ্বিনী দিতে আসিয়াছিল! তবে কি রেবার কাছে আপনাকে ধরা দিয়াছিলাম,—সেই ভরসায় দেনার দায় কাটাইবার জন্য বেচারা অশ্বিনী আমারই কাছে ছুটিয়া আসিয়াছিল! কে জানে!

তারপর আজ বিশবৎসর পরের কথা বলিতে বসিয়াছি। সংসারের প্রবল ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া কোথায় গিয়াছে রেবা, আর আমার তরুণ যৌবনের সেই অরুণ-স্বপ্ন! দুই মেয়ের বিবাহ দিয়া নাতি-পুতি লইয়া আমি এখন দস্তুর-মত সংসার ফাঁদিয়া বসিয়াছি। বাংলা নভেলে প্রেমের কথা পড়িলে গাঁজাখুরি বলিয়া সে বই ছুড়িয়া ফেলিয়া দি; এক-এ পাশ করিয়া হঠাৎ ধনী শ্বশুরের নজরে পড়িয়া তাঁহার এক কন্যার সহিত অনেকগুলি

টাকা ঘরে তুলিয়া পরম পরিতৃপ্তিতে কাল কাটাইতেছি। মফঃস্বলে ডাক্তারি চাকরি করি—পরিশ্রম কম, খাতির খুব,—বেশ নিশ্চিন্ত আরামে দিন কাটিতেছে।

এই চাকরিতে ঘুরিতে ঘুরিতে আজ চারমাস হইল, জামালপুরে আসিয়া উঠিয়াছি।

সেদিন সন্ধ্যার সময় গৃহিণীর হাতের তৈয়ারী চপ-কাটলেটটা সুখাদ্য মুখে তুলিয়াছি, এমন সময় খপর আসিল, এক জরুরি এ্যাক্সিডেণ্ট কেসে এখনই বাহিরে যাইতে হইবে।

ভাড়া-গাড়ী দাঁড়াইয়াছিল—গাড়ীতে গিয়া উঠিলাম। গৃহিণী মুখ ভার করিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু উপায় ছিল না। বাঙালী স্ত্রীরা কর্ত্তব্যের ডাক—এই জিনিষটার অর্থ বোঝে না। তাহারা চায়, স্বামীগুলি তাহাদের হাতে মাথা গুঁজিয়া আদর-সোহাগ লইয়াই—কিন্তু সে কথা থাক্।

রেলোয়ে-ব্যারাকের ধারে গিয়া একটা জীর্ণ বাংলার সম্মুখে গাড়ী থামিল। গাড়ী হইতে নামিয়া জীর্ণ বাংলার মধ্যে ঢুকিয়া দেখি, সম্মুখেই পাঁচ-সাতটি ছেলেমেয়ে খেলা করিতেছে—ছিন্ন মলিন বেশ,—সুকুমার মূর্ত্তিগুলি জরাজীর্ণ। তাহাদের ঘেরিয়া, সমস্ত স্থানটাকে ঘেরিয়া দারিদ্র্যের বিকট শীর্ণ কঙ্কালখানা যেন খট্ খট্ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

ভিতরে গেলাম। রোগশয্যায় শায়িতা এক তরুণী—রোগী, ইহাকেই দেখিতে হইবে। বয়স বেশী নয়—তবে দারিদ্র্য আর অভাবে স্বাস্থ্য চর্ম্ম বিশ্রী কর্কশ হইয়া গিয়াছে—রূপ ম্লান, চোখের নীচে কালি পড়িয়াছে—তরুণী এককালে সুন্দরী ছিল বটে—এখন সৌন্দর্য্যের একটা খোলস্ মাত্র তাহার অঙ্গে লাগিয়া আছে। তরুণী অচেতন পড়িয়া আছে। ব্যাপার শুনিলাম—মাতাল লম্পট স্বামী পয়সার জন্য তর্জ্জন করিয়া স্ত্রীর কাছে যখন পয়সা পায় নাই, তখন জুতা-শুদ্ধ পা তুলিয়া নিতান্ত পাষণ্ডের মতই পদাঘাতে বেচারীকে জর্জ্জরিত করিয়া গিয়াছে। খানিকক্ষণ শুশ্রূষার পর রোগীর চেতনা হইল। রোগী চোখ মেলিয়া চাহিল। এ কি—এ যে আমার পরিচিত দৃষ্টি। কোথায় দেখিয়াছি? চমকিয়া উঠিলাম। ঠিক!—এ যে রেবা! সবিস্ময়ে ডাকিলাম—রেবা—

না, ভুল নয়। তরুণী আমার পানে ফিরিয়া চাহিল—চাহিয়া চাহিয়া মৃদু স্বরে বলিল—অজিতবাবু—

তারপর দুইজনেই নির্ব্বাক। কাহারো মুখে কথা নাই। রেবার দুই-ডাগর চোখের কোণে মুক্তার মত দুই বিন্দু জল ফুটিয়া উঠিল। ফোঁটা বড় হইল—তারপর দুই গাল বহিয়া ঝরিয়া পড়িল। আমার বুক ফাটিয়া কতদিনকার একটা বিস্মৃতপ্রায় রুদ্ধ বেদনা তীব্র নিশ্বাসে ফুটিয়া বাহির হইল। আমি দুই হাতে রেবার চোখের জল মুছিয়া বলিলাম,—রেবা, তোমার এই দশা!

আমার বুকের উপর এক অসহ্য বেদনা পাহাড়ের মত চাপিয়া বসিয়াছিল—চোখে জল আসিল।

রেবা আকাশের পানে একটা হাত উঠাইল, তারপর ধীরে ধীরে বলিল,—ঈশ্বর ইচ্ছা!

কোন কথা বলিলাম না—বলিবার শক্তিও ছিল না। এই রেবা—সেই রেবা! এক

অতর্কিত মুহূর্ত্তে ক্ষণিকের উত্তেজনায় যাহাকে বলিয়াছিলাম—

জিজ্ঞাসা করিলাম—অশ্বিনী কোথায় ?

—জানি না। এই বিয়ের ব্যাপার নিয়েই, দাদার রাগ হয়। এ বিয়েতে কারো মত ছিল না। দাদাও এ বিয়ে বন্ধ করতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু হল না—সবই প্রভুর ইচ্ছা !

হারে স্বার্থপর ! বর্ব্বর কাপুরুষ ! এই বিবাহ বন্ধ করার চেষ্টাটা হয়ত তোর সেই কথাটাকেই কেন্দ্র করিয়া ! কে আমার সর্ব্বাঙ্গে তীব্র কশাঘাত করিল।

আমি আজ ঐশ্বর্য্যের প্রাচুর্য্যের মধ্যে—আর আমার সেই প্রথম-যৌবনের কামনার ধন রেবা—! কেন তাহাকে সেই সন্ধ্যায় আশার উচ্ছ্বাসে মাতাইয়া ভুলিয়াছিলাম ! তার পর কাপুরুষের মত পলাইয়া—ছি !

রেবাকে বলিলাম,—আমার ওখানে তুমি চল—যাবে রেবা ?

রেবা বলিল,—না।

—আমার বাড়ীতে না হয় না গেলে, আমার বাড়ীর কাছে অন্য বাড়ীতে থাকবে,—আমার দেখবার সুবিধা হবে। ছেলেমেয়েদের জন্যেও—?

তবু সেই এক উত্তর—না।

ঠিক ! ঠিক জবাব দিয়াছ রেবা। নারী, এই তেজেই দুর্ব্বল অসহায় হইয়াও লক্ষ্মীছাড়া বিশ্বে নিজেকে তুমি খাড়া রাখিয়াছ !

ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া উঠিলাম। উঠিয়া বাহিরে আসিলাম। গাড়ীতে উঠিব, এমন সময় দশ-এগারো বছরের একটি মেয়ে ছুটিয়া আসিয়া আমার হাতে চারিটা টাকা গুঁজিয়া দিল, দিয়া বলিল,—আপনার ভিজিট !

কোন কথা বলিলাম না, বলিতে পারিলাম না—হাতটাও সরাইতে পারিলাম না। গরম আগুনের মত বোধ হইলেও টাকা চারিটা হাতেই রহিল।

গাড়ী চলিল। সন্ধ্যার অন্ধকার তখন বেশ নিবিড় হইয়া উঠিয়াছে। সেই অন্ধকারের মধ্যে স্পষ্ট দেখিলাম, রেবার কি দীপ্ত মহিমাময় মূর্ত্তি,—রাজেন্দ্রাণীর মত সিংহাসনে সে বসিয়া আছে—আর আমি তাহার সম্মুখ হইতে আমার বিকৃত কুণ্ঠিত মনটাকে লইয়া নতশিরে সরিয়া পড়িবার জন্য পথ খুঁজিয়া মরিতেছি।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

এ ধরণী

এ ধরণী ধুলায় মলিন,
এর পরে তোমার অঙ্গুলি নিশিদিন,
সবুজ সোণালি নীলে, রাঙায় কালোয়
সোণার জলের মত উজল আলোয়
    মরণের আঁকে আলপনা,
    কত ছবি, কত ছায়া, কতই কল্পনা

এই ধুলি রাখে বুকে করে,
যা কিছু হারায়ে যায়, যাহা থাকে পড়ে,
তাই নিয়ে বারে বারে দেয় ফিরে ফিরে,
ব্যাকুল, চারিদিক ঘিরে
    তরুণ ফুলের আস্তরণ,
    জন্ম মৃত্যু প্রণয়ের শয্যা আবরণ।

মাটীর এ আঙিনার পরে
চিরনব নক্ষত্রদল আছে ছায়া করে',
আলো দেয় রবিশশী, বসন্ত শরৎ
পুষ্প বৃষ্টি করি ঢাকে এ ধূলির পথ,
দ্যুলোকের যতেক আলোক
আসে যায়, চেয়ে দেখে কৌতূহলী চোখ।

মর্ত্ত্যবাসী আমরা সকলে
ক্ষণিকের প্রেমিক আমরা, পলে পলে
যা কিছু হারায়ে যায় তাই ভালবাসি,
ভঙ্গুর যৌবন, আর প্রণয় প্রয়াসী,
দুদিনের মধুমাস লয়ে,
ফুলদোল খেলা করি আলসে আলয়ে।

ধরণীর এই পুষ্পরাশি
নন্দন মন্দার সম নিয়ত বিকাশি
অক্ষত শোভায় আর অম্লান সৌরভে
দেখা যদি দিত কভু, তবে হায় কবে
ঘুচে যেত সব মোহ তার,
চাহিতে দেখিতে ভুল হ'ত কতবার।

এই যে খসিয়া পড়ে যায়,
চোখ ভরে না দেখিতে শুকায় মিলায়,
যে সৌরভ পলাতক পরশের আগে
ক্ষণ-প্রভা সম যেই পুষ্পশোভা জাগে,
ছিঁড়ে যায় যে ফুলের ডোর
তারি লাগি' সারা প্রাণ বাসনা-বিভোর।

এ ধরণী শিশুর মতন,
নিমেষে নিমেষে হয় কেবলি নূতন,
এতখানি ভালবাসা তাই তার 'পরে,
এ তরুণ শ্যামলতা নহে চিরতরে,
উষা, সন্ধ্যা, শুক্লা বিভাবরী
দুই দণ্ডে চলে যায় প্রাণ মন হরি।

হেথা মৃত্যু কেড়ে লয়ে যায়,
মিলন মলিন হয় বিরহ ছায়ায়
বড় বাসনার ধন, বন্ধন কঠিন,
তাও ঘুচে, আসে মুক্তি সবল স্বাধীন
আনন্দে আসেনা অবসাদ,
চিরদিন অভিনব রহে তার স্বাদ।

হায় স্বর্গে অনন্ত-জীবন,
অম্লান আলোক ভরে আনেনা স্বপন,
নয়ন নিমেষ-হীন ঝরেনাক ফুল,
বসন্তের আয়োজনে নাই কোন ভুল,
প্রেম থাকে চির-বন্দী হয়ে,
জরাহীন যৌবনের অসীম আলয়ে!

হায় স্বর্গ, গতি মুক্তি হীন,
অমর জীবন-ভারে আবদ্ধ অধীন,
পূর্ণতার পরিণামে নাই বৃদ্ধি-ক্ষয়,
নাই আশা, নাই শঙ্কা, স্তব্ধ শান্তিময়
অচেতন সে অমরাবতী—
জাগ্রত এচিত্ত নাহি চাহে এক রতি!

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

সমালোচনা

সোনার ঝরণা। শ্রীমোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত। কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত। প্রকাশক, রায় এম, সি, সরকার বাহাদুর এণ্ড সন্স, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। মূল্য বারো আনা। সব দিক দিয়াই এ বইখানির বিশেষত্ব আছে। প্রথমতঃ এখানি গল্পের বই, ছেলেদের গল্প, আবার সে গল্প লিখিয়াছেন দুটি ছোট ছেলে। মোহনলাল ও শোভনলাল দুই ভাই, দুইজনের বয়স দশ আর এগারো বৎসর। এই অল্প বয়সেই তাহাদের গল্প বলিবার কায়দা আর ভঙ্গী তাহারা এমনি আয়ত্ত করিয়াছে যে সেগুলি পড়িয়া আমরা তাহাদের প্রতিভার পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইয়াছি। গল্পগুলি যেমনি সহজ ভঙ্গীতে হাল্‌কা ধরণে তাহার লেখা তেমনি তাহাদের মধ্যে হাস্য করুণ বিচিত্র রসও ঠিকসই পরিমাণে আছে,—কোথাও রস কম পড়ে নাই, বা কোথাও রসাধিক্যও ঘটে নাই। সর্ব্বপ্রথমে এই দুই বালকলেখকের গল্প যখন "সন্দেশ" পত্রিকায় ছাপা হয়, তখন সে গল্প পড়িয়া সাহিত্য সম্পাদক মহাশয় যে বলিয়াছিলেন,—যে বয়সে তাহাদের গল্প শুনিবার কথা, সেই বয়সে তাহারা এমনভাবে গল্প শুনাইতেছে যে অনেক পাকা প্রবীণেও তেমনটি পারে না। কথাটা খুব ঠিক। ছোট গল্পের যে আর্ট, সে আর্ট 'সোনার ঝরণায়' বেশ বজায় আছে। গল্পগুলির মধ্যে কোথাও একটি অনাবশ্যক লাইন বা একটা অনাবশ্যক শব্দ নাই। প্লটের মধ্যে কোথাও গাঁ-জুরি একটা আয়োজনের ঘটা নাই, সম্পূর্ণ অনাড়ম্বর, কাজেই সহজেই গল্পগুলি বেশ জমিয়া উঠিয়াছে। দুই ভাইয়ের লেখা সাতটি গল্প বই খানিতে সংগৃহীত হইয়াছে; সেগুলি সচিত্র,—ছবি আঁকিয়াছেন, প্রসিদ্ধ শিল্পী শ্রীযুক্ত সুকুমার রায় ও শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায়। লেখার একটু নমুনা দিতে চাই—তাহা হইতে এই দুটি ভাইয়ের প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যাইবে। শোভনলাল "ইঁদুরের তিন ছেলে" গল্পে লিখিতেছেন, "এক ছিল ইঁদুর, একটুকু ছোট্ট। বড় বড় জানোয়ার দেখে সে ভয়ে কাঁপত, গর্ত্ত থেকে বার হতে পারত না। তার যখন বাচ্ছা হবার সময় হল, তখন তার ভারি ইচ্ছা হল যে আমার যদি খুব জোরালো এক বীর বাচ্ছা হয়, তাহলে আর আমি কাউকে ভয় করি না। কি আশ্চর্য্য, যা মনে করা, ঠিক তাই। বাচ্ছা হলো কালো ডোরা-কাটা বাঘের ছানা। ইঁদুর ত অবাক! ছানা দেখে তার ঠকঠক্ কোরে কাঁপুনি থামে না। তারপর যখন তাকে মা বলে ডাকলে, তখন ল্যাজ তুলে ছুটে গিয়ে তাকে আদর করতে লাগল।" খাসা লেখা। এই লেখাটুকুর মধ্যে animal psychologyর যে সহজ স্পষ্ট কথা ফুটিয়াছে তাহা অপূর্ব্ব। কোন প্রবীণ পাকা লেখকের হাতেও লেখায় ইঁদুরের মনস্তত্ত্ব এমন ফুটিত কি না সন্দেহ। আর-এক জায়গায় আছে, "ছেলেটি বল্লে,—"সে কি মহারাজ। পুঁচকে ইঁদুর কেঁদো হাতীর সঙ্গে লড়তে পারে কখনো।" (সোনার ঝরণা, ১৭ পৃষ্ঠা) এই যে বিশেষণ দুটি 'পুঁচকে' আর 'কেঁদো'—এমন লাগসই বিশেষণ প্রবীণের পাকা হাত দিয়া কখনই বাহির হইত না। অথচ এ দুইটি বিশেষণ কি সহজ, আর কি লাগসই। এমনি প্রচুর নমুনা তুলিয়া দেখানো যায়। বহিখানির কভারে ছবি আছে—পাহাড়ের গা বহিয়া ঝরণার সোনালি জল অজস্রধারে ঝরিয়া পড়িতেছে—আর পাহাড়ের নীচে দাঁড়াইয়া একটি বালক মনের আনন্দে সেই জলে স্নান করিতেছে। ছেলেটির আনন্দ চিত্রশিল্পী এ চিত্রে চমৎকার ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। 'সোনার ঝরণা' বহিখানিতেও আগাগোড়া এই সোনালি জলেরই মধু হিল্লোল ছুটিয়াছে—ছেলে-মেয়েরা তাহাতে গা ভাসাইয়া মাথা ডুবাইয়া প্রচুর আনন্দ পাইবে। লেখা, ছবি, সাজসজ্জা, ছাপা, সব দিক দিয়া "সোনার ঝরণা" সোনার মত হইয়াছে।

শেষে একটা কথা না বলিলে কথা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়, সেটি, এই বালক লেখক দুটির পরিচয় সম্বন্ধে—মোহনলাল ও শোভনলাল আমাদের বন্ধু, ভারতী সম্পাদক শ্রীযুক্ত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের দুই পুত্র। দেবী ভারতীর আশীর্ব্বাদে মোহনলাল ও শোভনলালের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ উজ্জ্বলতর হোক্, ভারতীর সেবায় তাহাদের চেষ্টা সকল নিরাপদ হোক্, শরীর নীরোগ থাকুক,—ভূমিকা লেখকের সঙ্গে ইহাই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা।

রংমশাল। শ্রীযুক্ত প্রেমাঙ্কুর আতর্থী ও শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায় সম্পাদিত। প্রকাশক এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স্ হ্যারিসন রোড কলিকাতা। কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত। দাম ন' সিকে। এখানি ছেলেমেয়েদের জন্য পূজার 'বার্ষিকী' উপহার-গ্রন্থ। সবসমেত একত্রিশ গল্প আর কবিতা ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে; ছবির সংখ্যা প্রচুর একচল্লিশখানি, তন্মধ্যে আটখানি 'পাতা-জোড়া'। গল্প আর কবিতাগুলি যাঁহারা লিখিয়াছেন,বাংলা সাহিত্যে তাঁহাদের খ্যাতি অপরিসীম। সব লেখাগুলিতেই আর্টের খেলা আছে—সেগুলি যাক্ না 'রংমশালের' প্রথম আলো জ্বালাইয়াছেন কবি সত্যেন্দ্রনাথ। কবিতাটিতে সত্যই তিনি হরেক রঙের আলো ফুটাইয়াছেন। তিনি ঠিকই লিখিয়াছেন,—"আলোর আলো! আহ্লাদে ভাই এলিয়ে গেল অন্ধকার!" বইখানির সম্বন্ধে এক কথায় বলিতে গেলে ইহাই বলিতে হয়—"আলোর আলো।" সত্যেন্দ্রনাথের 'রংমশাল,' 'পেটুকের বর্ণপরিচয়'—অবনীন্দ্রনাথের 'রাণী কুন্ত,' মণিলালের কবিতা 'রাক্ষস কুটুম' আর 'চাঁদের চর্কি,' সৌরীন্দ্রমোহনের 'বোকা জাতি,' সুরেশচন্দ্রের 'নতের পাঁচড়,' 'বেজির বাহাদুরী,' হেমেন্দ্রকুমারের 'হিমাদের পাতকা পুরাণ,' 'ডাকপেয়াদা,' 'শান্ত ছেলে' ও বাঘের মাসীর গঙ্গাযাত্রা,' কিরণধনের 'নাককাটা সেপাই,' ও 'কমলা-লেবুর দেশে,' শিশু-লেখক মোহনলাল-শোভনলালের 'বাদশাহী আংটি' ও 'চাঁদেরের বন্ধু,' সুকুমার রায়ের 'হাজিলের ডিক্সেনারী,' জলধর সেনের 'কড়াইভাজা', নরেন্দ্র দেবের 'ফুলের আয়না,' 'কালি আর ঝুল'—সমস্ত রচনাগুলিই উপভোগ্য, চমৎকার। তার উপর ছবি, গগনেন্দ্রনাথের 'পূজোর ফুল,' অবনীন্দ্রনাথের 'ছেলেখেলা,' যতীন্দ্রকুমারের 'জ্যোৎস্না-রাতে,' নন্দলালের 'হাঁস,' 'পুলিনবিহারীর গাড়ি, 'হিঁচকাঁদুনী' সুরেন্দ্রনাথের 'মাঠের পথে,' বিপিনচন্দ্রের 'কদমতলায় কে'—রঙে রঙে রংমশালের প্রতি পৃষ্ঠা রঙীন করিয়া তুলিয়াছে। এ বইখানি বাঙলা দেশে সবার-সেরা হইয়াছে—বাংলা সাহিত্যে অপূর্ব্ব সামগ্রী হইয়াছে। গল্প কবিতা ছবির এই অনিন্দ্যসুন্দর সংগ্রহটি আর্ট গ্যালারির মতই একটা দর্শনীয় বস্তু হইয়াছে—ইহার মনোরম বৈচিত্র্যে, ইহার সর্ব্বাঙ্গীন সৌন্দর্য্যে এবং ইহার আভিজাত্যে এ কথা আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি। সম্পাদক-যুগলের সাধু চেষ্টা সম্পূর্ণ সফল হইয়াছে; তাঁহারা ছেলেমেয়েদের পূজার আনন্দ এই বার্ষিকী উপহারে যে লাখ গুণ বাড়াইয়া তুলিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, এজন্য তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি। বইখানি যেরূপ তাহার তুলনায় এই দুর্মূল্যতার দিনে ইহার মূল্য বেশ সুলভই হইয়াছে।

উপনিষদাবলী। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড। শ্রীযুক্ত হরপদ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সিদ্ধান্তশাস্ত্রী কর্ত্তৃক সংশোধিত। ১২ নং ওয়ালকী বাগান শাস্ত্রপ্রকাশ কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত। হাওড়া, কল্যাণপুর পশুপতি প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য প্রতি খণ্ড এক টাকা। প্রথম খণ্ডে ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, কৈবল্য, মুণ্ড, ব্রহ্মবিন্দু, আরুণি, জাবাল ও ব্রহ্মবিদ্যা এবং দ্বিতীয় খণ্ডে গোপালপূর্ব্বতাপনীয়, গোপালোত্তর-তাপনীয়, কৌষীতকী অমৃতবিন্দু, আত্মা, কালিকা, সর্ব্বসার ও অমৃতনাদ—মূল শ্লোক ও তাহার ভাষ্য টীকা প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদসহ সংগৃহীত হইয়াছে। দুইখানি গ্রন্থেরই আকার ছোট, পকেটে রাখা যায়। বারো খণ্ডে সমগ্র ১১৪খানি উপনিষৎ প্রকাশিত হইবে।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

কলিকাতা—২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীকালাচাঁদ দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।



ভারতী

৪৪শ বর্ষ]   অগ্রহায়ণ, ১৩২৭   [৮ম সংখ্যা

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের ধর্ম্মমত

আমাদের দেশের প্রাচীন কবিদের কোনো ভক্ত বস্‌ওয়েল তাঁদের জীবনচরিত লিখিয়া রাখিতেন না, কবিরাও নিজেদের আত্ম-চরিত লিখিয়া রাখিতেন না। কেবল স্বরচিত কাব্যের মধ্যে মাঝে মাঝে ভণিতায় ও কাব্যঘটনার প্রসঙ্গে ছলিতে নিজের নিজের পরিচয় কবিরা ছড়াইয়া রাখিয়া যাইতেন। বঙ্গদেশের প্রাচীন সাহিত্যমালার মধ্যে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্য বিশেষ একটি মূল্যবান গ্রন্থ; কবিকঙ্কণ তাঁর কাব্যে আত্মপরিচয় অন্য কবিদের চেয়ে বেশ একটু ভালো রকমই রাখিয়া গিয়াছেন; কিন্তু কবিকঙ্কণ তাঁর ধর্ম্মমত সম্বন্ধে কোনো স্পষ্ট পরিচয় দ্যান নাই; আভ্যন্তর প্রমাণ হইতে অনুসন্ধান করিয়া অনুমান করা ছাড়া আর উপায় নাই।

চণ্ডীমঙ্গলের কবিকে শাক্ত বলিয়া ধরিয়া লইবারই প্রবৃত্তি হয়। কবিকঙ্কণও গ্রন্থ-উৎপত্তির বিবরণে লিখিয়াছেন—

উরিয়া মায়ের বেশে   কবির শিয়র-দেশে
চণ্ডিকা বসিলা আচম্বিতে।

*   *   *

আশ্রয় পুখড়ি-আড়া,   নৈবেদ্য শালুক পোড়া,
পূজা কৈনু কুমুদ-প্রসূনে।
ক্ষুধা ভয় পরিশ্রমে   নিদ্রা যাই সেই ধামে,
চণ্ডী দেখা দিলেন স্বপনে॥
হাতে লয়্যা পত্র মসী,   আপনি কলমে বসি
নানা ছন্দে লিখেন কবিত্ব।
যেই মন্ত্র দিল দীক্ষা   সেই মন্ত্র করি শিক্ষা
মহামন্ত্র জপি নিত্য নিত্য॥
দেবী চণ্ডী মহামায়া   দিলেন চরণছায়া,
আজ্ঞা দিলেন রচিতে সঙ্গীত।
চণ্ডীর আদেশ পাই   শিলাই বাহিয়া যাই,
আড়রায় হৈনু উপনীত॥
(বঙ্গবাসী সংস্করণ, ৬ পৃষ্ঠা)

আমাদেশে কাব্যরচনা প্রচার করা

প্রাচীন কবিদের একটা প্রথামাত্র ছিল। আদিকবি বাল্মীকি দেবাদেশে রামায়ণ রচনা করেন; আদি ইংরেজ কবি কেড্‌মন দেবাদেশে গান বাঁধেন; বাংলারও অনেক কবি দেবাদেশে কাব্য রচনা করিয়াছিলেন বলিয়াছেন, যথা—কৃষ্ণরাম দাসের রায়-মঙ্গল, বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণ, রামপ্রসাদের কালিকা-মঙ্গল, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল, রাজা জয়নারায়ণ ঘোষালের চণ্ডীমঙ্গল কাব্য, কৃত্তিবাসের রামায়ণ, মালাধর বসুর ভাগবত, সঞ্জয় রচিত মহাভারত প্রভৃতি কাব্য স্বপ্নাদেশে রচিত। এইসব দেখিয়া দীনেশবাবু লিখিয়াছেন—"যে-সে পুস্তক লিখিলেই তাহা সাধারণ কর্ত্তৃক গৃহীত হইত না।……এইজন্য প্রাচীন বঙ্গীয় লেখকগণের অনেককেই প্রত্যাদেশের ভান করিয়া কাব্য লিখিতে হইত। দেবাদেশে কাব্যরচনায় হাত দিয়াছেন, একথা ঘোষণা করা সাহিত্যের ব্যবসাদারী ছিল।"—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য।

এ রোগ শুধু আমাদের দেশের কবিদেরই ছিল তা নয়, এ রোগ বিশ্বব্যাপী—

That a god inspired his soul expresses the ordinary belief of early historical times.—Encyclopaedia Britannica.

কবিকঙ্কণ চণ্ডীর চরণে ভক্তি ও নতি মাঝে মাঝে করিয়াছেন দেখা যায়—

উমাপদে হিত-চিত রচিল নৌতুন গীত
চক্রবর্ত্তী শ্রীকবিকঙ্কণ।

* * *

অপর্ণার চরণে মজুক নিজ চিত।

*

অভয়া-চরণে প্রণাম লক্ষ লক্ষ।
অনুক্ষণ রহু মম কায়-মনো-বাক্য॥

কিন্তু চণ্ডীচরণে ভক্তি হইতে বা চণ্ডীর আদেশ পাইয়াই যে কবিকঙ্কণ তাঁর কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হন নাই, তার প্রমাণও তিনি রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি বারবার বলিয়াছেন—

রাজা কৈল মঙ্গল প্রকাশে। (৪২ পৃষ্ঠা)

*

দিলেন অনুমতি ব্রাহ্মণ ভূপতি,
শ্রীকবিকঙ্কণে গান। (১৪০ পৃষ্ঠা)

*

চণ্ডীপদ ভাবি চিত রচিল মুকুন্দ গীত,
রাজা রঘুনাথের কৌতুকে। (১৮পৃষ্ঠা)

*

ব্রাহ্মণ রাজার কুতূহলী। (২০ পৃষ্ঠা)

ব্রাহ্মণ রাজা রঘুনাথের আদেশে কবিকঙ্কণ কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হন—একটিই আসল কথা; চণ্ডীর আদেশ বা ভক্তি রঘুনাথের আদেশের অনুসঙ্গী গৌণ কারণ হইয়া উঠিয়াছিল।

কবি নিজের গ্রামবাসী ও পূর্ব্বপুরুষদের পরিচয় দিবার প্রসঙ্গে তাঁদের ধর্মবিশ্বাসের একটু পরিচয় দিয়াছেন—

দামুন্যার লোক যত শিবের চরণে রত,
সেই পুরী হরের ধরণী।

*

ধন্য ধন্য কলিকালে রত্নাহ্ নদের কূলে
অবতার করিলা শঙ্কর।
ধরি চক্রাদিত্য নাম দামুন্যা করিলা ধাম
তীর্থ কৈলা সেই সে নগর॥

*

গঙ্গা সম সুনির্মল　　তোমার চরণ জল
পান কৈনু শিশুকাল হৈতে।
সেই ত পুণ্যের ফলে　　কবি হই শিশুকালে,
রচিলাম তোমার সঙ্গীতে॥

*

সর্বেশ্বর-অনুজাত　　মহামিশ্র জগন্নাথ
এক ভাবে পূজিল শঙ্কর।

*

শিবরাম বংশধর,　　কৃপা কর মহেশ্বর,
রক্ষ পুত্রে পৌত্রে ধনমান।

ইসব পদ হইতে কবিকে বংশানুক্রমে শৈব বলিয়াই অনুমান করার সম্ভাবনা হয়। কিন্তু আবার পাই—

কৈয়ড়ি বংশজাত　　মহামিশ্র জগন্নাথ
এক ভাবে সেবিল গোপাল।
কবিত্ব মাগিয়া বর,　　মন্ত্র জপি দশাক্ষর,
মীনমাংস ছাড়ি বহুকাল॥

কবির পিতামহ একবার "একভাবে পূজিল শঙ্কর" আবার "একভাবে সেবিল গোপাল।" তিনি আগে বোধহয় মীনমাংসভোজী শৈব ছিলেন, পরে বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করিয়া 'মীনমাংস ছাড়ি বহুকাল' গোপালের দশাক্ষর মন্ত্র ও গোপীজনবল্লভায় স্বাহা জপ করিতে প্রবৃত্ত হন। পিতামহের এই গোপাল-সেবার কথা কবি নিজের কাব্যে তিন-তিনবার উল্লেখ করিয়াছেন।

ইহা হইতে অনুমান হয় কবির পিতামহ শেষ-বয়সে চৈতন্যদেবের প্রভাবে বৈষ্ণব ধর্ম অবলম্বন করিয়া থাকিবেন। এবং বৈষ্ণব বংশের ছেলে বলিয়া কবিও বৈষ্ণবই ছিলেন। এ সম্বন্ধে কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গল হইতে বহু পোষক প্রমাণ পাওয়া যায়।—

(১) চণ্ডীমঙ্গলের একেবারে প্রথম পৃষ্ঠাতেই মঙ্গলাচরণে গণেশ-বন্দনা শেষ করিয়া কবি প্রার্থনা করিয়াছেন—

গাইবে তোমার আগে　　গোবিন্দ-ভকতি মাগে
চক্রবর্তী শ্রীকবিকঙ্কণ।
(১ পৃষ্ঠা, বঙ্গবাসী সং)

এই গোবিন্দ-ভকতি তিনি আরো দুই বারের ভণিতায় প্রার্থনা করিয়াছেন —

গোবিন্দ-পদারবিন্দ-　　বিগলিত-মকরন্দ-
অলি কবিকঙ্কণ গায়ে। (৫ পৃষ্ঠা)
কি কব তোমার আগে, গোবিন্দ-ভকতি মাগে
শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভাবে। (৪১ পৃষ্ঠা)

(২) মহাদেব-বন্দনায় কবি মহাদেবকে বলিয়াছেন—"নিগূঢ় বিষয়-নারায়ণ।" এবং—

তুমি হরি যোগরাজে　　এ তিন ভুবনে পূজে,
তুমি হরি গুণের আশ্রয়।

মহাদেবকে তিনি নারায়ণ ও হরি রূপে দেখিতেছেন, এবং সেইজন্য শিবনিবাস বারাণসীকেও বিষ্ণুলোক বৈকুণ্ঠ বলিয়া অনুমান করিতেছেন—

তুমি হরি পুণ্যরাশি,　　শূল-অগ্রে বারাণসী
যাহাতে বৈকুণ্ঠ অবতার! (২ পৃষ্ঠা)

(৩) ডিহিদার মামুদ শরিফ "ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবের হৈল অরি" বলিয়া অত্যাচারপীড়িত কবি অনুযোগ ও দুঃখ করিয়াছেন। (৬ পৃষ্ঠা)

(৪) দক্ষের মুণ্ড ছেদনের পর মহাদেবের প্রসাদে শিবানুচর নন্দী "ছাগলের মুণ্ড দক্ষে করিল যোড়ন।" কিন্তু কবি দেখিলেন—"কৃষ্ণের কৃপায় দক্ষ পাইল জীবন।" (১৩ পৃষ্ঠা)

(৫) নীলাম্বর যখন অভিশপ্ত হইয়া দেবলোক হইতে মর্ত্যে অবতীর্ণ হইবার পূর্বে

দেবদেহ ত্যাগ করিতেছেন, তখন তাঁর—"চৌদিকে বান্ধব-মেলা, গলাতে তুলসীমালা।" এবং নীলাম্বরের পত্নী ছায়া স্বামীর সহ-মরণের সময় "হরি হরি সোঙরে বিধাতা।"

(৪২ পৃষ্ঠা)

(৬) চণ্ডীকে বারবার নারায়ণী ও বৈষ্ণবী বলা হইয়াছে। যেখানে যেখানে যতবার যে-কেউ চণ্ডীর স্তব করিয়াছে, তার মধ্যে চণ্ডীমাহাত্ম্যের চেয়ে কৃষ্ণকথাই প্রবল ও প্রধান হইয়া উঠিয়াছে; চণ্ডীর গৌরব যে "নানা অবতারে মাতা বিষ্ণুসহায়িনী।" বিষ্ণু বা কৃষ্ণকে সাহায্য করিতে পারাতেই যেন চণ্ডীর চরম মহিমা প্রকাশ পাইয়াছে। চণ্ডী "বলাই-পূজিতা বলদেবের ভগিনী" (২৫৫ ও ১৬৯ পৃষ্ঠা)। "নন্দগোপসূতা হয়ে রাখিলে গোকুল।"

"যশোদা-নন্দিনী জয়া যমুনা যামিনী।
যদুযোধা যুগন্ধরা যজ্ঞবিনাশিনী॥ (১০৪)

(৭) চণ্ডী বিশ্বকর্ম্মাকে কাঁচুলি নির্ম্মাণে নিযুক্ত করিলে বিশ্বকর্ম্মা কাঁচুলিতে ছবি লিখিলেন চণ্ডীর দশমহাবিদ্যা রূপের কীর্ত্তি-কাহিনী অবলম্বন করিয়া নহে; সেসব ছবি হইল বিষ্ণুর দশাবতারের কার্য্যকলাপ এবং বিশেষ করিয়া কৃষ্ণ-অবতারের কাহিনী।

(৬১ পৃষ্ঠা)

(৮) নগর পত্তনের জন্য ব্যাধ কালকেতু চণ্ডীর স্তব করিতে গিয়া বলিতেছে—

"আরাধনে হরি হর তুমি তিনজন।" (৮০ পৃষ্ঠা)

আরাধনার যোগ্য তিনটি মাত্র দেবতার মধ্যে হরি অগ্রগণ্য!

(৯) চণ্ডীর সতীন গঙ্গাকে দিয়া কবি চণ্ডীকে শুনাইয়াছেন—

হই গো বিষ্ণুর দাসী, বিষ্ণুপদ হৈতে আসি,
সেই প্রভু পতি সবাকার।

(৮০ পৃষ্ঠা)

(১০) চণ্ডীর কৃপাতেই নূতন গুজরাট নগর পত্তন হইয়াছে। কিন্তু সেখানে দেখা যায়—"সারি সারি বিষ্ণুর দেউল।" এবং—

দিয়া হীরা নীলাখণ্ড বসিতে বিষ্ণুর পিণ্ড,
অনল-বিজুলী-সমাকুল।

এবং—

দিয়া হীরা নীলাখণ্ড নিরমিল দোলপিণ্ড
কদম্ব-কানন-সন্নিধান। (৭৯ পৃষ্ঠা)

এই গুজরাটপুরী—"রূপে জিনে দ্বারাবতী" শ্রীকৃষ্ণের রাজধানী, এবং "অযোধ্যা সমান পুরী" বিষ্ণুর অপর অবতার শ্রীরামচন্দ্রের রাজধানী (৮০ পৃষ্ঠা)। গুজরাটের ক্ষত্রিয় বৈশ্য "কৃষ্ণ সেবে অনুক্ষণ।" তা ছাড়াও অনেক "বৈষ্ণব বসিল গুজরাটে" যারা "সদা লয় কৃষ্ণনাম" (৮৭)। কলিঙ্গরাজের কোটাল গুজরাট দেখিয়া আসিয়া রাজার কাছে বর্ণনা করিতেছে—

দেখিলাম গুজরাট, প্রতি বাড়ী গীতনাট,
যেন অভিনব দ্বারাবতী।
অযোধ্যা মথুরা মায়া নাহি ধরে তার ছায়া,
যেন দেখি ইন্দ্রের বসতি॥
প্রতি বাড়ী দেবস্থল, বৈষ্ণবের অস্থল,
দুই সন্ধ্যা হরিসঙ্কীর্ত্তন। (৯৪)

(১১) কলিঙ্গরাজের সঙ্গে যুদ্ধের সময় চণ্ডীর কৃপাভাজন কালকেতু চণ্ডীকে ভুলিয়া "হরি স্মরণে বীর রড়ে রণে" (৯৭) এবং চণ্ডীর কৃপায় কালকেতু কলিঙ্গরাজের কারাগার হইতে মুক্তি পাইয়া ও স্বাধীন রাজা হইয়া নিশ্চিন্ত মনে—

বিহান বিকালে যাঁর শুনেন পুরাণ।
কৃষ্ণের করেন পূজা হয়্যা সাবধান॥ (১১০)

(১২) ধনপতি সদাগরের সঙ্গে পায়রা উড়াইতে যে কজন বন্ধু গিয়াছিল তাদের প্রায় সকলকারই বৈষ্ণব নাম:—

মুকুন্দ মাধব বনমালী নারায়ণ।
রাম কৃষ্ণ জগন্নাথ ভরত লক্ষ্মণ॥
কংশারি গোপাল হরি শ্রীধর অজিত।
হরিহর জনার্দ্দন কুল-পুরোহিত॥
দামোদর গদাধর সুবল সুদাম।
হরিহর পীতাম্বর আর শিবরাম॥
নন্দরাম পরমানন্দ বিনোদ ত্রিবিক্রম।
বাসুদেব কামদেব আর সনাতন॥
মথুরেশ হৃষীকেশ শ্রীপতি শ্রীবাস।
পুরুষোত্তম আদ্যা আর জ্ঞান হরিদাস॥
অনন্ত অচ্যুত আহল আর অভিরাম।
চক্রপাণি চতুর্ভুজ আদ্যা ভৃগুরাম॥
মুরারি দৈত্যারি শ্রীগোবিন্দ ভবানন্দ।
পায়রা উড়াতে হৈল সভার আনন্দ॥(১১৫)

(১৩ শুককে বন্দী করিয়া ব্যাধ শুকের কাছে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া বলিতেছে—"বৈষ্ণব জনার সঙ্গ নিস্তারের বীজ" (১২৭)। রাজা বিক্রমকেশরী জাতিস্মর শুকের পরিচয় জানিতে চাহিলে শুক বলিতেছে—

বৃন্দাবন পৈতৃক স্থান, কালিন্দীতে স্নান দান,
জন্ম মোর কল্পতরুমূলে।
বৃন্দাবনে চান্দমুখ দেখিয়া পরম সুখ,
আছিলাম আনন্দ মঙ্গলে॥
গোপের বালক সঙ্গে ছিলাম পরম রঙ্গে
নিরবধি দেখি চান্দমুখ।
বৃন্দাবনে বাস করি নিরবধি দেখি হরি,
কথা বিধি দিয়া ছিল দুখ। (১২৮)

(১৪) রাজা রঘুনাথের পরিচয়-প্রসঙ্গে কবিকঙ্কণ বলিতেছেন—

আরতা উচিত তুমি, পুরুষে পুরুষে স্বামী,
সেবনে গোপাল কামেশ্বর। (১৪১)

(১৫) কবি আকাশ শব্দের পরিবর্ত্তে সংস্কৃত আভিধানিক শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন বিষ্ণুপদ; এবং আকাশে চণ্ডীর আবির্ভাব তিনি দেখিতেছেন—"আজি বিষ্ণুপদতলে উরিলা ভবানী।" চণ্ডীকে বিষ্ণুতলে স্থাপন করিয়া চণ্ডীমঙ্গল-রচয়িতা কবি আপনার ইষ্টদেবতার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন মনে হয়। এইটিই কবির বৈষ্ণবত্বের চরম প্রমাণ বলিয়া আমার বিশ্বাস। (১৪৯)

(১৬) ধনপতি সদাগরের পিতৃশ্রাদ্ধের সভায় হরিবংশ ও রামায়ণ পাঠ হইয়াছিল। (১৭৬-১৭৭)

(১৭ চণ্ডীর বরপুত্র শ্রীমন্তের জন্ম হইলে "দুর্ব্বলা কিঙ্করী গায় কৃষ্ণের চরিত" (২১২)। লীলাবতী সখী লহনার সপত্নীর পুত্রজন্মহেতু—

"তাপ খণ্ডিবার তরে মধুর মধুর স্বরে
ভাগবতের গান গুণগাথা।" (২১৩)

এবং—

"স্বামী আসিবেন ঘরে করিয়া কামনা।
প্রতিদিন ভাগবত শুনেন লহনা॥ (২১৩)

বালক শ্রীমন্ত—

শিশুগণ সঙ্গে করে ভাগবত খেলা।(২১২)
কৃষ্ণলীলা অনুরূপ শিশু করে খেলা।(২১৩)

(১৮) শ্রীমন্ত সদাগরকে জগন্নাথক্ষেত্র দর্শন করিতে পাঠাইয়া কবি শ্রীক্ষেত্রের বিশদ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে কবির ভক্তিবাবেগের পরিচয় পাওয়া যায়। (২৩৪)

(১৯) শ্রীমন্ত সিংহলরাজের কাছে উজানীরাজের পরিচয় দিতে গিয়া বলিতেছে—

পবিত্র নির্ম্মল যেন গঙ্গাজল,
সদাই কৃষ্ণ ধেয়ান। (২৪৫)

বিক্রমকেশরী রাজা কিন্তু ঐতিহাসিক ব্যক্তি, এবং তিনি শৈব ছিলেন, তার প্রমাণ আছে।

(২০) জরতী ব্রাহ্মণীর বেশধারিণী চণ্ডী সিংহলের কোটালকে বলিতেছেন—

কোটাল, দুঃখ পাই নিজ কর্ম্মদোষে।
জিনিয়া ইন্দ্রিয়গণ না সেবিনু নারায়ণ,
কাহারে না রাখিনু সন্তোষে॥ (২৫৯)

(২১) মশানে শ্রীমন্ত কোটালকে অনুরোধ করিতেছে—"দেহ তুলসীর মালা।" (২৬১)

(২২) সিংহলেশ্বর চণ্ডীর স্তুতির সময় বলিতেছেন—"খগেন্দ্রবাহন-সহচরী।" (২৭৪)

(২৩) শ্রীমন্ত পিতাকে সিংহলরাজের কারাগারে দেখিতে না পাইয়া বিলাপ করিয়া বলিতেছে—

কাণ্ডার ভাই, ঝাট চল তেজিয়া সিংহল।
ধর হে বৈষ্ণব-বেশ, চলহ আপন দেশ,
ভিক্ষা কর পথের সম্বল॥ (২৭৬)

(২৪) শ্রীমন্ত শ্বশুরবাড়ী ছাড়িয়া দেশে ফিরিবার সঙ্কল্প করিলে তার স্ত্রী সুশীলা তার স্বামীকে নিজের পিত্রালয়ে রাখিবার জন্য নানাবিধ প্রলোভন দেখাইতেছিল; তার মধ্যে একটি বিশেষ প্রলোভন এই—

সখী মেলি গাব গীত, সখা মেলি গাব গীত,
সানন্দ হইয়া গাব কৃষ্ণের পিরীত। (২৮৬)

(২৫) শৈব ধনপতি সদাগর চণ্ডীকে পূজনীয় দেবতা বলিয়া স্বীকার করিয়া স্তব করিতে করিতে বলিতেছেন—

যে জন তোমার নাহি করিল সেবন।
শ্রীহরি সেবায় সেই হবে কি ভাজন॥ (৩০১)

কলিঙ্গরাজও চণ্ডীর স্তব করিবার সময় এই একই কথা পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন—

যেই জন নাহি করে তোমার পূজন।
সেই নর কিবা জানে কৃষ্ণের ভজন॥

(২৬) চণ্ডী খুল্লনাকে স্বর্গে লইয়া যাইবার চেষ্টায় নানা শাস্ত্র উপদেশ দিয়া খুল্লনার পৃথিবীর প্রতি মমতা শিথিল করিতেছেন; তখন তিনি খুল্লনাকে "গজেন্দ্রমোক্ষণ উপাখ্যান" এবং অজামিলের উপাখ্যান শুনাইতে শুনাইতে বলিতেছেন—

হরিনাম হরিকথা কলুষনাশিনী।

•

অভয়া কহেন, ঝিয়ে শুন ইতিহাস।
হরিনামের মহিমা কহিল কৃত্তিবাস॥

•

সর্ব্বতীর্থস্নান সম কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন। (৩০৭)

(২৭) গ্রন্থ সমাপ্তির আগে কবিকঙ্কণ প্রার্থনা করিতেছেন—

হরি হরি বলহ সকল বন্ধুজন।
বদনে লইয়া কর বৈকুণ্ঠে গমন॥ (৩১০)

গ্রন্থ সমাপ্ত করিয়া কবিকঙ্কণ বলিতেছেন—

সর্ব্বলোক হরি বল হয়ে আনন্দিত।
সমাপ্ত হইল এই অভয়ার গীত॥ (৩১৩)

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে হরিকথার এত ছড়াছড়ি সেই কালের উপর বৈষ্ণব প্রভাব অথবা বৈষ্ণব শ্রোতাদের মনোরঞ্জনের জন্য হওয়ার সম্ভাবনার চেয়ে কবির নিজের ধর্ম্মমতের জন্যই হওয়া বেশী সম্ভব বলিয়া আমার অনুমান।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

অবতার

যে বাড়ীতে অক্টেভ বাস করিত সেই বাড়ীর নিস্তব্ধ প্রাঙ্গণে ডাক্তারের মন্ত্রপূত জল-পাত্রোত্থিত গুরুগুরু গর্জ্জন-নাদ শোনা গিয়াছিল ; শুনিবামাত্র প্রায় তখনই, অক্টেভ ডাক্তারের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। অক্টেভ হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া আছে,—এমন সময় ডাক্তার, অক্টেভকে দেখাইল—কোণ্ট ওলাফ একটা পালঙ্কের উপর হাত-পা ছড়াইয়া মৃতবৎ পড়িয়া আছেন। প্রথমে অক্টেভের মনে হইল বুঝিবা কেহ কোণ্টকে গুপ্তভাবে হত্যা করিয়াছে,—অক্টেভ কিয়ৎক্ষণের জন্য ভয়-স্তম্ভিত হইয়া রহিল। কিন্তু আর একটু মনোযোগ দিয়া দেখিবার পর, লক্ষ্য করিল, ঐ নিদ্রিত যুবকের বক্ষদেশ প্রায়-অননুভবনীয় ক্ষীণ শ্বাসপ্রশ্বাসে একবার উঠিতেছে আবার পড়িতেছে। ডাক্তার বলিলেন :—

"এই দেখ, তোমার ছদ্মবেশ প্রায় প্রস্তুত হয়েছে। এ ছদ্মবেশের যোগাড় করা বড় শক্ত। এ ছদ্মবেশ দোকানে ধার পাওয়া যায় না। কিন্তু রোমিও যখন ভেরোনার বারাণ্ডার উপরে উঠেছিল, তখন তার ঘাড় ভাংবার সম্ভাবনাটা থাকা সত্ত্বেও রোমিওর চিত্তকে উদ্বিগ্ন করতে পারে নি। সে জানত, জুলিয়েট, নৈশ অবগুণ্ঠনে আবৃত হয়ে উপরের কামরায় তার জন্য অপেক্ষা করছে। কোণ্টেস্ প্রাস্কোভির মূল্য কাপুলেট-দুহিতার চেয়ে বড় কম নয়।"

এই আশ্চর্য্য অবস্থা দেখিয়া অক্টেভের চিত্ত-এতটা বিক্ষুব্ধ হইয়াছিল যে সে কোন উত্তর করিল না। সে ক্রমাগত কোণ্টকে দেখিতে লাগিল ; দেখিল, কোণ্টের মস্তক পশ্চাতে অল্প হেলিয়া একটা বালিসের উপর ন্যস্ত। গথিক্ মঠের ভিতর সমাধিস্থানের উপরে, যে সকল বীরপুরুষের প্রতিমূর্ত্তি দেখা যায় তাহাতে ঘাড়ের নীচে খোদাই-কাজ-করা একটা মার্বেলের বালিস থাকে—এ যেন ঠিক সেই রকম। এই সুন্দর ও মহান মূর্ত্তির অভ্যন্তরস্থ আত্মাকে অক্টেভ বেদখল করিতে যাইতেছে,—এই চিন্তায় তার মনে একটু অনুতাপ উপস্থিত হইল।

অক্টেভ এইরূপ চিন্তা করিতেছিল, কিন্তু ডাক্তার মনে করিলেন, বুঝি অক্টেভ এখনো ইতস্তত করিতেছে। ডাক্তারের ঠোঁটের কোণের উপর দিয়া একটা অস্পষ্ট অবজ্ঞার হাসি চলিয়া গেল—ডাক্তার অক্টেভকে বলিলেন :—

"তুমি যদি মন স্থির না করে থাক, তাহলে আমি কোণ্টকে জাগিয়ে দিতে পারি। আমার চৌম্বক শক্তি দেখে আশ্চর্য্য হয়ে, যেমন তিনি এসেছিলেন তেমনি আবার ফিরে চলে যাবেন ; কিন্তু ভাল করে ভেবে দেখ, এ রকম সুযোগ আর কখনো পাওয়া যাবে না।

সে যাই হোক্, তোমার প্রেমের সম্বন্ধে আমার বেশ একটু কৌতূহল হয়েছে, একটা পরীক্ষা করতে আমার ইচ্ছে হয়েছে—

সে রকম পরীক্ষা য়ুরোপে আমি কখনো চেষ্টা করিনি। আমি তোমার কাছে এ কথা লুকোতে চাইনে যে এই আত্মার বিনিময় ব্যাপারে একটু বিপদ আছে। তোমার বুকে হাত দিয়ে তোমার অন্তরাত্মাকে জিজ্ঞাসা কর। তোমার যৌবন-পাশার যা সব-চেয়ে বড় দান তা পাবার জন্য কি তুমি মুক্ত হৃদয়ে তোমার জীবনকে সঙ্কটাপন্ন করতে রাজি আছ? শাস্ত্রে আছে প্রেম মৃত্যুরই মত বলবান।"

অক্টেভ শুধু এই উত্তর দিলেন :--

—"আমি প্রস্তুত আছি।"

ডাক্তার তাঁর শ্যামবর্ণ শুষ্ক ছই হাত খুব তাড়াতাড়ি ঘসাঘসি করিয়া বলিয়া উঠিলেন :—

"বেশ বাবা বেশ। কোন বাধাতেই পিছপাও হয় না—তোমার এই প্রেমের আবেগ দেখে আমি তুষ্ট হলাম। এ জগতে দুইটি মাত্র জিনিস আছে; আবেগ আর ইচ্ছাশক্তি। তুমি যদি সুখী না হও সে নিশ্চয়ই আমার দোষ নয়। গুরুদেব ব্রহ্মলোগম। অপ্সরা-সঙ্গীত-মুখরিত ইন্দ্রলোক হতে তুমি ত সব দেখছ—তোমার মৃত কঙ্কাল পরিত্যাগ করবার সময় আমার কানে যে মহামন্ত্র উচ্চারণ করেছিলে, তা কি আমি বিস্মৃত হয়েছি? না, সেই মন্ত্র, সেই-সব মুদ্রাভঙ্গী আমার বেশ মনে আছে। তবে এখন কার্য্য আরম্ভ হোক! এইবার আমাদের কটাহে এক অপূর্ব্ব রান্না চড়বে—ম্যাকবেথের সেই ডাকিনীদের মতো কেবল তাদের সেই নীচ ধরণের ডাকিনী-মন্ত্র থাকবে না। আমার সম্মুখে এই আরাম-কেদারায় তুমি বোসো। আমার শক্তিতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে আত্মসমর্পন কর। বেশ। আমার চোখের উপর চোখ রাখো, আমার হাতে হাত রাখ। এখনি মন্ত্রের কাজ আরম্ভ হয়েছে। আকাশ ও কালের ধারণা লুপ্ত হচ্চে, অহং জ্ঞান ও আত্মচৈতন্য অপনীত হচ্চে, চোখের পাতা নেমে এসেছে; মাংস-পেশী মস্তিষ্কের কথা আর শুনচে না,—শিথিল হয়ে গেছে; চিন্তা তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়েছে। যে-সকল সূক্ষ্ম বন্ধনে আত্মা শরীরের সহিত আবদ্ধ সেই সব বন্ধনের গ্রন্থি ছিন্ন হয়েছে। দশ হাজার বৎসর পূর্ব্বে ব্রহ্মা স্বর্ণ-অণ্ডের মধ্যে স্বপ্ন দেখছিলেন, সেই ব্রহ্মা এখন আর বহির্জ্জগৎ হতে পৃথক নন। বাষ্পের দ্বারা তাঁকে পরিসিক্ত করা যাক্, রশ্মির দ্বারা তাঁকে স্নান করিয়ে দেওয়া যাক্।"

ডাক্তার মধ্যে মধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে যখন এই সকল কথা বিড় বিড় করিয়া বলিয়া যাইতেছিলেন, তখনও তাঁর হাতের "ঝাড়া দেওয়া" এক মুহূর্ত্তের জন্যও রহিত হয় নাই। তিনি দুই হাত বাড়াইয়া সেই হাত হইতে প্রদীপ্ত রশ্মিচ্ছটা নিক্ষেপ করিতেছিলেন—সেই রশ্মিচ্ছটা সম্মোহিত ব্যক্তির কপালে ও বক্ষে গিয়া লাগিতেছিল। ক্রমে তাহার চারিধারে রশ্মি-মণ্ডলের ন্যায় একটা দৃশ্যমান কম্‌কমস-গঠিত বায়ু-মণ্ডল গড়িয়া উঠিল।

আপনার কাজের জন্য আপনাকে আপনি বাহবা দিয়া ডাক্তার শেরবোনো বলিয়া উঠিলেন—বেশ বেশ। খুব ভাল! তারপর একটু থামিয়া যখন দেখিলেন, ব্যক্তির জ্ঞান একেবারে লোপ পাইবার পূর্ব্বে ব্যক্তিত্ব-

জ্ঞান বজায় রাখিবার জন্ম অক্টেভের মাথার ভেতর তখনও খুব একটা চেষ্টা চলচে, তখন তিনি আবার বলিলেন, "দেখা যাক্, দেখা যাক্—কে আমার মন্ত্রের প্রতিরোধ্ করতে পারে! মস্তিষ্ক-পাকের মধ্যে তাড়িত হয়ে, না জানি কোন্ বিদ্রোহী মনোভাব আদিম পরমাণুর উপর, জীবনের কেন্দ্র-বিন্দুর উপর জমা হয়ে আমার প্রভাবকে এড়াবার চেষ্টা করচে। আমি নিশ্চয়ই তাকে পাকড়াও করতে পারব, তাকে কাবু করতে পারব।"

এই অনিচ্ছাকৃত বিদ্রোহ দমন করিবার জন্ম ডাক্তার তাঁর সৃষ্টির 'ম্যাগনেটিক্ ব্যাটারি'তে আরও বেশি শক্তি সঞ্চালিত করিলেন এবং সেই বিদ্রোহী চিন্তাটাকে উপমস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ডের মজ্জা—এই দুয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে লইয়া আসিলেন—যে স্থানটি আত্মার গুপ্ততম পবিত্র স্থান, রহস্যময় দেব-নিকেতন। তিনি সম্পূর্ণরূপে জয়লাভ করিলেন।

তখন তিনি মহা গাম্ভীর্য্য সহকারে এক অশ্রুতপূর্ব্ব পরীক্ষা-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি ঐন্দ্রজালিকের স্থায় এক শন-নির্ম্মিত পোষাক পরিধান করিলেন, একটা সুরভিত জলে হস্ত প্রক্ষালন করিলেন; বিবিধ বাক্স হইতে কতকগুলা গুঁড়া লইয়া গাল ও কপাল চিত্রিত করিলেন, ব্রাহ্মণের যজ্ঞসূত্র বাহুতে জড়াইলেন, গীতার দুই তিনটা শ্লোক আবৃত্তি করিলেন, 'এলিফ্যান্টা' গুহার সন্ন্যাসী যে-সব খুঁটিনাটি আচার-অনুষ্ঠানের উপদেশ দিয়াছিলেন, একটাও ছাড়িলেন না।

এই-সব অনুষ্ঠান শেষ হইলে, তিনি উত্তাপের বড় বড় মুখ খুলিয়া দিলেন, আর তখনি তাঁহার বৈঠকখানা-ঘর আবার প্রখর উত্তাপে উত্তপ্ত হইল। থরমমেটারে ১২০ ডিগ্রি তাপ উঠিয়াছে দেখিয়া ডাক্তার বলিলেন—"এই অগ্নির দুই স্ফুলিঙ্গ, যাহা এখন দেহ-পিঞ্জর থেকে নগ্নাবস্থায় বের হয়ে আসবে, আমাদের তুষার-শীতল হাওয়ায় ঐ স্ফুলিঙ্গ-দুটিকে ঠাণ্ডা হতে দেওয়া হবে না—বা নির্ব্বাপিত হতে দেওয়া হবে না।"

ডাক্তার সাদা বস্ত্র পরিধান করিয়া জড়-পিণ্ডবৎ এই দুই দেহের মধ্যে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। দেবীর নিকট যাহারা নর-বলি দেয় সেই ভীষণ রক্তাপপায়ু পুরোহিতের স্থায় এই সময় তাঁহাকে দেখিতে হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার যজ্ঞের প্রক্রিয়া শান্তিবলাশ্রিত।

নিশ্চেষ্ট নিশ্চল কোণ্ট ওলাফের নিকট ডাক্তার ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া, তাঁর সেই মহামন্ত্র উচ্চারণ করিলেন, তাহার পর গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন অক্টেভের নিকটে গিয়া সেই মন্ত্র আবার তাড়াতাড়ি আবৃত্তি করিলেন।

ডাক্তারের যে চেহারা সচরাচর অতি অদ্ভুত দেখিতে, তাহা এই সময় এক অপূর্ব্ব মহিমায় মণ্ডিত হইয়াছিল। এই রহস্যময় অনুষ্ঠানের সময় তাঁহার মুখের বিশৃঙ্খল রেখাগুলি চলিয়া গিয়া মুখশ্রীতে একটা শান্ত ভাব আসিয়াছিল, পুরোহিতোচিত একটা গাম্ভীর্য্য দেখা দিয়াছিল।

এই সময় কতকগুলি আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটিতে লাগিল। একটা যন্ত্রণার ভড়কার ভায় কৌণ্ট ও অক্টেভ উভয়ের দেহ একই সময়ে নড়িয়া উঠিল। উহাদের মুখ বিকৃত হইল, উহাদের মুখে 'গ্যাঁজ' উঠিতে লাগিল! পাত্র-চর্ম্ম শবের মত বিবর্ণ হইল। তথাপি দুটি ক্ষুদ্র নীলাভ আলোক-স্ফুলিঙ্গ উহাদের মাথার উপর ঝিক্‌ঝিক্ করিয়া জ্বলিতে লাগিল—কম্পিত হইতে লাগিল

যেন আকাশে একটা রেখা-পথ নির্দ্দেশ করিতেছেন এইভাবে ডাক্তার স্বকীয় বিদ্যুৎ-প্রবাহী হস্তাঙ্গুলির একটা ইঙ্গিত করিবামাত্র ফস্‌ফরস্‌-গন্ধ বিন্দুদ্বয় চলিতে আরম্ভ করিল, এবং উহাদের পশ্চাতে একটা আলোকের রেখাচিহ্ন রাখিয়া দিয়া, স্বকীয় নূতন আবাসে প্রবেশ করিল:—অক্টেভের আত্মা কৌণ্ট লাবিন্‌স্কির শরীরকে অধিকার করিল এবং কৌণ্টের আত্মা অক্টেভের শরীরকে অধিকার করিল: অবতারের কার্য্য সম্পন্ন হইল।

গালের একটু রক্তিম আভায় বুঝা গেল, যে-দুই মৃণ্ময় মানব-আবাস কয়েক সেকেণ্ড আত্মাহীন হইয়া ছিল এবং ডাক্তারের বিদ্যুৎ-শক্তির অবর্ত্তমানে যমরাজ যাহাকে আপনার কবলে আনিয়াছিলেন, এইমাত্র সেই দুই মৃত্তিকাখণ্ডের ভিতরে জীবনীশক্তি প্রবেশ করিয়াছে।

আনন্দ-উল্লাসে ডাক্তার শেরবোনোর চোখের তারায় বিদ্যুৎ ছুটিতে লাগিল। তিনি ঘরের মধ্যে লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া চলিতে চলিতে ভাবিতে লাগিলেন; "ধন্বন্তরী প্রভৃতি যে-সব চিকিৎসকের খুব নাম-ডাক, মানব-দেহের যন্ত্র বিগড়াইয়া গেলে মেরামৎ করিতে পারেন বলিয়া যাঁদের খুব অহঙ্কার,—আমি যা করিলাম এই কাজ তাঁরা করুন দিকি।

যখন আত্মা আমার একতিয়ারে আছে, তখন শব দেহের কি-তোয়াক্কা রাখি?"

এই বাক্য বিন্যাস শেষ করিয়া, ডাক্তার শেরবোনো, যে-রঙিন গুঁড়ার রেখায় নিজের মুখ চিত্রিত করিয়াছিলেন, তাহা মুছিয়া ফেলিয়া, এবং ব্রাহ্মণের পরিচ্ছদ ছাড়িয়া ফেলিয়া, অক্টেভের আত্মার দ্বারা অধিকৃত কৌণ্টের শরীরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তারপর, সম্মোহন-নিদ্রার অবস্থা হইতে উদ্ধার করিবার জন্য সম্মোহন বিদ্যার উপদেশ অনুসারে হাতের ঝাড়া দিতে লাগিলেন;—সেই এক এক ঝাড়ায় অঙ্গুলীপ্রান্ত হইতে বিদ্যুৎ ছুটিতে লাগিল।

আর কয়েক মিনিটের পর, অক্টেভ-লাবিন্‌স্কি (আমাদের বর্ণনা বিশদ করিবার জন্য এখন হইতে অক্টেভকে অক্টেভ-লাবিন্‌স্কি বলিব) স্বীয় আসনে উঠিয়া বসিলেন, চোখে হাত রগড়াইতে লাগিলেন এবং চারিদিকে বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন—এখনও তাঁহার অহং-চৈতন্য ফিরিয়া আসে নাই। যখন তাঁর বাহ্য-জ্ঞান স্পষ্ট ফিরিয়া আসিল, তখন প্রথমেই দেখিতে পাইলেন, তাঁর আপনার বাহিরে তাঁর আকৃতিটা একটা পালঙ্কের উপর স্থাপিত হইয়াছে। এ যে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। আর্শির প্রতিবিম্বরূপে না—প্রত্যক্ষভাবে দেখা যাচ্ছে। অক্টেভ লাবিন্‌স্কি চীৎকার করিয়া উঠিলেন-

এই চীৎকার-শব্দে তাঁর কণ্ঠস্বরের ধ্বনি ছিল না—এই শব্দে তাঁর মনে কেমন একটা শাঁতির সঞ্চার হইল। 'ম্যাগ্‌নেটিক'-নিদ্রায় সময় এই আত্মার বিনিময় হওয়ায়, অক্টেভ তাহার স্মৃতি ধরিয়া রাখিতে পারেন নাই,—তাই তিনি একটা অভূতপূর্ব্ব অসোয়াস্তি অনুভব করিতেছিলেন। এখন অন্য নূতন ইন্দ্রিয় আসিয়া তাঁহার চিত্তবৃত্তির সেবায় নিযুক্ত হইয়াছে। একজন শ্রমজীবীর নিকট হতে তাহার অভ্যস্ত হাতিয়ার সকল কাড়িয়া লইয়া তাহাকে অন্য হাতিয়ার দিলে যেরূপ হয় ইহা কতকটা সেইরূপ। আত্মা-বিহঙ্গ ঠাঁই-ছাড়া হইয়া একটা অপরিচিত মস্তিষ্ক-খোলের মধ্যে, পাখার ঝাপ্‌টা মারিতে মারিতে মস্তিষ্কের জটিল পাকের মধ্যে কোথায় যেন হারাইয়া গিয়াছে—এই মস্তিষ্কের মধ্যে অপরিচিত ধারণাশক্তির একটা রেখাচিহ্ন এখনো রহিয়া গিয়াছে।

অক্টেভ-লাবিন্‌স্কির বিস্ময়টা বেশ-একটু উপভোগ করিয়া ডাক্তার বলিলেন;—"আচ্ছা, এখন তোমার এই নতুন আবাসটা কেমন লাগ্‌চে? যার মত সুন্দরী এই ভূমণ্ডলে বিরল সেই সুন্দরীর পতি বীরপুরুষ কৌণ্টের দেহ-মন্দিরে তুমি বেশ গট্ হয়ে বসে নিয়েছ ত? তোমার বসৎ-বাড়ীর সেই বিষাদময় ঘরে আমি যখন তোমাকে প্রথম দেখি তখন ত তুমি মৃত্যু কামনা করছিলে। এখন কৌণ্ট লাবিন্‌স্কির প্রাসাদের সমস্ত দ্বারই তোমার সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত; রাণী প্রাস্কোভির কাছে তোমার প্রেম জানাতে গিয়ে তখন তুমি তাঁর কাছ থেকে মুখ-থাবড়া পেয়েছিলে, এখন আর তোমার সে ভয় নেই। এখন আর বোধ হয় তুমি মৃত্যু-ইচ্ছা করবে না এই যে বানর-মুখো বৃদ্ধ বালথাজার শেরবোনোকে দেখ্‌ছ—এখন তুমি বেশ বুঝ্‌তেই পার্‌চ তার অসাধ্য কিছুই নেই—আবার তোমার আত্মাকে অন্য শরীরে প্রবেশ করিয়ে দিতে পারে—তার ঝুলিতে এখনো নানা তুক্-তাকের জিনিস আছে।"

অক্টেভ-লাবিন্‌স্কি উত্তর করিলেন—

"ডাক্তার, আপনার শক্তিসামর্থ্য দেবতার মত—অন্ততঃ দানবের মত। আপনার এই শক্তি, দৈবী কিংবা দানবী শক্তি না হয়ে যায় না।"

—"না বাবা, সে ভয় কোরো না, ওর ভিতরে ভুতুড়ে বা দানবি কাণ্ড কিছুই নেই। তোমার মুক্তির পথে কোন বিঘ্ন হবে না:—তোমার সঙ্গে চুক্তি করে সেই চুক্তি-পত্রে লাল কালিতে তোমাকে সই করতে আমি বল্‌চিনে। এই-সব যা ঘটলো, তার চেয়ে সহজ জিনিস আর কিছুই হতে পারে না। যে শব্দ-ব্রহ্ম আলোকের সৃষ্টি করেছেন, তিনি কেন আত্মাকেও স্থানান্তরিত করতে পারেন। তাতে আর আশ্চর্য্য কি?"

—"আপনার এই অমূল্য উপকারের জন্য কি বলে' আপনার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব? এর প্রতিদান কি করব? কি দিয়ে এই ঋণ পরিশোধ করব?"

—"তুমি আমার নিকট একটুও ঋণী নও, তোমার উপর আমার একটা টান্ হয়েছিল। সংসারানলে দগ্ধ, রৌদ্র-দগ্ধ বুড়ার কাছে আবেগ জিনিসটা বড়ই বিরল। তুমি তোমার প্রেমের কথা আমার কাছে প্রকাশ করেছ। আমাদের মধ্যে কেউ বা

একটু রাসায়নিক, কেউ বা একটু ঐন্দ্রজালিক, কেউ বা একটু দার্শনিক—কোন-না-কোন আকারে সবাই আমরা স্বপ্নদর্শী, আমরা অল্পবিস্তর সবাই পরিপূর্ণ অসামের সন্ধান করে থাকি। সে যা হোক, তুমি এখন ওঠো, চলা-ফেরা কর, বেড়িয়ে বেড়াও, দেখ, তোমার নূতন গাত্র-চর্ম্মের দরুণ, এই বাহ্য পরিবেষ্টনের মধ্যে একটু বাধো-বাধো ঠেক্‌চে কি না?"

অক্টেভ-লাবিনস্কি, ডাক্তারের উপদেশ-মত ঘরের মধ্যে তিন-চারিবার একটু পায়চারি করিলেন। এখন আর তেমন বাধো বাধো মনে হইতেছে না, কোণ্টের শরীরের মধ্যে, অন্য আত্মা বাস করিলেও পূর্ব্ব-অভ্যাসগুলার একটা ঝোঁক, একটা বেগ কোণ্টের দেহে তখনও অক্ষুণ্ণ ছিল, নব আগন্তুক অক্টেভ লাবিনস্কিও এই সকল দৈহিক স্মৃতির উপর বিশ্বাস স্থাপন করিল, কারণ অধিকাচ্যুত পূর্ব্বদেহ-স্বামীর চাল চলন, ভাব-ভঙ্গি সমস্তই এক্ষণে নব আগন্তুককে গ্রহণ করিতে হইবে।

ডাক্তার একটু হাসিয়া বলিলেন :—

"আমি যদি তোমাদের আত্মার এই বিনিময়-প্রক্রিয়ার স্বয়ং লিপ্ত না হতাম, তা হলে আমার বিশ্বাস হত,—আজ রাত্রে যাহা কিছু ঘটেছে সবই সচরাচর ঘটনা, আর তুমিই প্রকৃত বৈধ ও প্রামাণিক লিথুনিয়ার কোণ্ট ওলাফ লাবিনস্কি। এখন ত আসল কোণ্টের আত্মা তোমার পরিত্যক্ত দেহের খোলসের মধ্যে ঐখানে নিদ্রায় মগ্ন।

কিন্তু এখনি রাত্রি দ্বিপ্রহরের ঘণ্টা বাজবে। এই বেলা রাণীর কাছে যাও—তাস-পাশা খেলে দেরী করে বাড়ী এলে বলে ওঁর কাছ থেকে ধমক খেতে না হয়। একটা ঝগড়া করে বিবাহ-জীবনের আরম্ভ করাটা ভাল নয়—সে একটা কুলক্ষণ। ততক্ষণ আমি খুব সাবধানে তোমার পুরোনো খোলোসটাকে আবার জাগিয়ে তোলবার চেষ্টা করব।"

ডাক্তারের কথাগুলা যুক্তিসিদ্ধ বিবেচনা করিয়া অক্টেভ-লাবিনস্কি তাড়াতাড়ি ঘরের বাহির হইল। সিঁড়ির ধাপের নীচে কোণ্টের জাঁকালো লাল-ঘোড়ার যুড়ী অধীর ভাবে খুর দিয়া মাটি খুঁড়িতেছিল। মুখের লাগামের লোহাটা কামড়াইতেছিল এবং তাহাদের মুখ-নিঃসৃত ফেন-পুঞ্জে সম্মুখের পাথরে বাঁধানো স্থানটা আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল। এক যুবকের পদশব্দ শুনিবামাত্র একজন জাঁকালো উর্দ্দি পরা সহিস গাড়ীর পা-দানীর কাছে দৌড়িয়া আসিয়া সশব্দে পা-দানীটা নামাইয়া দিল।

অক্টেভ প্রথমে অভ্যাস-বশে যন্ত্রবৎ তার নিজের সামান্য-ধরণের ব্রুহাম গাড়ীর অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিল,—তারপর এই উচ্চ জাঁকালো 'চেরিয়াট'-গাড়ীতে উঠিয়াই সহিসকে গন্তব্যস্থান বলিয়া দিল—সহিস কোচম্যানকে বলিল—"হোটেলে চল।" গাড়ীর দরজা বন্ধ করিতে না করিতেই, অশ্বযুগল ঘাড় বাঁকাইয়া সতেজে ছুটিল। পৌঁছিতে বিলম্ব হইল না। দ্রুতগতি অশ্বের দ্রুত গতি পথের দূরত্বকে যেন গ্রাস করিয়া ফেলিল। প্রাসাদে পৌঁছিয়া কোচম্যান খুব উচ্চৈঃস্বরে বলিল :—ফাটক!

দরোয়ান আসিয়া ফাটকের দুই প্রকাণ্ড কপাট ঠেলিয়া দিয়া গাড়ী-প্রবেশের রাস্তা করিয়া দিল। গাড়ী একটা বালুময় বৃহৎ প্রাঙ্গণে এবং সাদা ও গোলাপী রঙের ডোরা-কাটা একটা চাঁদোয়ার নীচে ঠিক আসিয়া দাঁড়াইল।

অক্টেভ-লাবিনস্কি এক-নজরে স্থানটা দেখিয়া লইল। প্রাঙ্গণটা বিশাল, সুসমান কতকগুলি ইমারতে বেষ্টিত, তাহার দীপ-দণ্ডের উপর কাচের ফানসের মধ্যস্থিত দীপ হইতে শুভ্র আলোকচ্ছটা প্রক্ষিপ্ত হইয়া চারিদিক উদ্ভাসিত করিতেছে। সে-ধরণের সেকেলে ফানস, তাহাতে এই বাড়াটা হোটেল অপেক্ষা প্রাসাদের মতন মনে হয়। 'ভরসাই'-অলিন্দের যোগ্য কতকগুলি কমলা-লেবুর টব, অ্যাসফ্যাল্টের কিনারার উপর, একটু দূরে দূরে স্থাপিত হইয়াছে। মধ্যস্থলে বালুময় ভূমি—এই অ্যাসফ্যাল্ট কিনারাটা গালিচার কিনারার মত মধ্যস্থিত বালুভূমিকে ঘিরিয়া রহিয়াছে।

এই রূপান্তরিত প্রেমিক বেচারা, দরজার চৌকাঠে পদার্পণ করিয়াই থমকিয়া দাঁড়াইল, তার বুক ধড়াস ধড়াস করিতে লাগিল। তাহার দেহ কোণ্ট-ওলাফ লাবিনস্কির দেহ হইলেও, সে বাহ্য-দেহ মাত্র; মস্তিষ্কের মধ্যে যে সব সংস্কার ও ধারণা ছিল, তাহা মালিকের আত্মার সঙ্গে সঙ্গেই পলায়ন করিয়াছিল,—এখন হইতে যে বাড়ীটা অক্টেভ-লাবিনস্কির হইবার কথা, উহা তাহার নিকট অপরিচিত;—উহার ভিতরকার বন্দোবস্ত সে কিছুই অবগত নহে। তাহার সম্মুখে একটা সিঁড়ি দেখিতে পাইল, সে কপাল ঠুকিয়া সেই সিঁড়ি ধরিয়া উঠিতে লাগিল। ঘসা-মাজা পাথরের ধাপগুলা হইতে শুভ্রচ্ছটা বাহির হইতেছে, এবং সেই ধাপগুলার উপর ঘোর রক্তবর্ণ গালিচার এক বিস্তৃত ফালি তাঁবার আঙটায় আটকানো রহিয়াছে; ধাপে-ধাপে স্থাপিত ফুলদানিতে সুন্দর সুন্দর বিদেশী পুষ্প শোভা পাইতেছে।

ঘর কাটা-কাটা একটা প্রকাণ্ড ল্যাণ্ঠান একটা মোটা বেগুনি রেশমী দড়িতে ঝুলিতেছে—ঐ দড়ি স্বর্ণ ঝালরে বিভূষিত। ঘরের দেওয়াল মার্বেলের মত পালিশ-করা সাদা চুণ-বালির কাজে মণ্ডিত; দেয়ালের গায়ে কানোভা-রচিত "আত্মার প্রেমের চুম্বন" এই ছবির একটি নকল-চিত্র ঝুলিতেছে—তাহার উপর লাণ্ঠান-নিঃসৃত সমস্ত আলোকচ্ছটা প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। সিঁড়ির মাথাটা মোজেয়িক কারুকার্য্যে অলঙ্কৃত, সিঁড়ির দেওয়ালের গায়ে চারজন বিখ্যাত চিত্রশিল্পীর চারিখানা চিত্র রেশমী দড়িতে ঝুলিতেছে—চিত্রগুলি এই জমকালো সিঁড়ির সহিত বেশ খাপ খাইয়াছে। সিঁড়ির মাথার উপরে, সোনার পেরেক-মারা একটা পশমী কাপড়ের উঁচু দরজা। অক্টেভ-ল্যাবিনস্কি সেই দরজা ঠেলিবামাত্র একটা বিশাল পার্শ্বপ্রকোষ্ঠে আসিয়া পড়িল। সেই পার্শ্বপ্রকোষ্ঠে জমকালো সাজে সজ্জিত কতকগুলি ভৃত্য নিদ্রা যাইতেছিল। অক্টেভ সেখানে আসিবামাত্র, কল-কাটি টিপিলে যেরূপ হয়—তখনি ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া, প্রাচ্যদেশের গোলামের মতো দেয়ালের ধারে উহারা সারি-দিয়া দাঁড়াইল।

অক্টেভ বরাবর চলিতে লাগিল। পার্শ্ব-প্রকোষ্ঠের পরেই সাদা ও সোনালি রঙের এক

বৈঠকখানা। এই বৈঠকখানায় কেহই ছিল না। অট্টেন্দ্র একটা ঘণ্টায় টান দিবামাত্র এক রমণী আসিয়া উপস্থিত হইল।

"স্বামিনী-ঠাকুরাণীর দর্শন কি পাওয়া যেতে পারে?"

—"রাণী এখন কাপড় ছাড়বার উদ্যোগ করচেন; একটু পরেই দেখা দেবেন।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পূর্ব্বরাগ ও অনুরাগ

পূর্ব্বরাগের আনন্দ জমিয়া উঠিয়াছে না-পাওয়ার মধ্যে, অনুরাগের আনন্দ জমিয়া উঠিয়াছে পাওয়ার মধ্যে। কোন্ আনন্দটি বেশী? কোন আনন্দ বেশী বলা দুষ্কর, কারণ, এই অনুভব নির্ভর করে আপন আপন স্বভাব ও সংস্কারের উপর। আর ব্যক্তিগত স্বভাব ও সংস্কারকে যদি এড়াইয়া উঠিতে পারি তবে নিরুপাধিকের (absolute) দিক হইতে দুইই বোধ হয় ত সমান; পার্থক্য শুধু ধরণে, মাত্রায় নহে।

ইউরোপ পূর্ব্বরাগের পূজারী, প্রাচ্য অনুরাগের সেবক। কিন্তু আশ্চর্য্য, এ যেন ভাবের অদল-বদল হইয়া গিয়াছে। যে ইউরোপের সমস্ত ঝোঁক পাওয়ার মধ্যে, জিনিষকে স্পষ্টভাবে পূর্ণভাবে হাতের মুঠার মধ্যে না ধরিতে পারিলে* যাহার সুখ নাই, তৃপ্তি নাই, সেই ইউরোপই নাকি আবার ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে না-পাওয়ার মধ্যে, না-ধরার দিকে! আর যে প্রাচ্য ছুটিয়াছে উধাও হইয়া চলিয়াছে কেবলই অনন্তের অসীমের পানে,† সেই প্রাচ্যই দেখি মধুর-আনন্দকে চাহিয়াছে সসীম সুধীর পাওয়ার ধরা-বাঁধার মধ্যে। পাশ্চাত্যের কবি দয়িতাকে বলিতেছেন—

She was a Phantom of delight—

তাঁহার রূপকে মুছিয়া যতদূর পারেন বাতাসে আকাশে মিলাইয়া মিশাইয়া দিতে চাহিয়াছেন, তাহাকে করিয়া তুলিয়াছেন

A voice, a mystery—

আর প্রাচ্যের কবি প্রণয়িনীর মূর্ত্তিকে যতখানি পারেন সুস্পষ্ট সুস্থির করিয়া ধরিতে চেষ্টা করিয়াছেন, চক্ষু দিয়া দেখিতে পারি, হাত দিয়া ধরিতে পারি এমন স্থাবর ফ্রেমে করিয়া স্থাপিত করিতেছেন—

'চিত্রার্পিতারম্ভ ইবাবতস্থে—'

ইহা প্রকৃতির ক্ষতিপূরণের দাবী কি না অথবা মানুষের অন্তরাত্মার পূর্ণতা প্রয়াসের মোল, তাহা জানিনা; কিন্তু দৃশ্যটি আশ্চর্য্য-কর ও শিক্ষাপ্রদ।

ইউরোপের প্রাণ দুলিয়া উঠিয়াছে

---

* স্মরণ করুন—A bird in hand is worth two in the bush.

† ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি।

কুমারীকে ঘিরিয়া, ভারতের চিত্ত রসাপ্লুত জায়াকে আশ্রয় করিয়া। কুমারীর চারিদিকে যে প্রহেলিকা, যে অপরিচয়ের অভিনবের অতর্কিতের খেলা, সব ইউরোপ্ তাহাতে মুগ্ধ। ভারত বোধ হয় একটু ধীর গম্ভীর স্বভাব, বালসুলভ চপলতা বলিয়াই হয়ত ইউরোপের এই মোহ-রচনাকে, এই আলো-আঁধার সন্দেহ-নিশ্চিতের লুকোচুরিকে, উপভোগ করিবার উদ্যোগে সে কিছু করে নাই। জায়ার পরিণীতার মধ্যে যে আনন্দ স্থির নিবিড় গভীর স্ফুট ও স্পষ্ট হইয়া ধরা দিয়াছে, অর্দ্ধাঙ্গিনীকে সহধর্ম্মিণীকে বেড়িয়া যে তৃপ্তি নিত্য প্রমাণিত, স্বাধিকার-প্রতিষ্ঠ, বর্ষীয়ান ভারত তাহাই চাহিয়াছে। তরুণ ইউরোপ অভিজ্ঞতার অনুভবের প্রথম সোপানে দাঁড়াইয়া—তাই কৌতূহলে বিস্ময়ে সে উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে, হাত বাড়াইয়া দিয়াছে আরও আরও'র দিকে, পাওয়া জিনিষের মধ্যে প্রাণ বাঁধিয়া দিতে গেলেই সে মনে করিয়াছে, সব শেষ হইল। ভারত বোধ হয় না-পাওয়ারও শেষ সীমায় গিয়া পৌঁছিয়াছে, তাই না-পাওয়ার ভয় তাহার নেই, ফিরিয়া বুঝি তাই পাওয়ার মধ্যেই সব পাইয়াছে। কুমারী-পূজাকে ইউরোপ তাহার ধর্ম্মের মধ্যেও লইয়া গিয়া বসাইয়াছে—খৃষ্ট ধর্ম্মের মূলে ভার্জ্জিন মেরী (Virgin Mary), ভারতে দেখি একসাথে অভিন্ন দেব ও দেবী, যুগল মূর্ত্তির পূজা।

প্রেম-জীবনে ইউরোপের 'রোমান্স' (রস বা রাসলীলা) মিলনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত; ভারতের প্রেমের লীলা আরম্ভ হয় কিন্তু মিলনের পর হইতে। এ কথা বহু পূর্ব্বে অনেকেরই চোখে পড়িয়াছে যে ভারতীয় সাহিত্য ও উপন্যাসের গোড়াপত্তন বিবাহ দিয়া, ইউরোপীয় সাহিত্যে বিবাহ হইতেছে, পঞ্চমাঙ্ক—যবনিকা। দুইটি অজানা অচেনা হৃদয় কোথা হইতে ক্রমে আসিতেছে, পরস্পরের নিকটবর্ত্তী হইতেছে, উভয়ের মধ্যে কি রকম একটি সূক্ষ্ম ঊর্ণনাভের সূত্র প্রথমে দেখা দিল, পরে তাহা স্বর্ণশৃঙ্খলে পরিণত হইল—এই ইতিহাস দিয়াছে ইউরোপের সাহিত্য। প্রেমজীবনের এই অংশ ভারতবর্ষ হয় ত একেবারে ছেক বাদ দিয়া গিয়াছে অথবা খুব সামান্যভাবে উল্লেখ করিয়াছে, পরের অংশটিকে ফুটাইয়া ধরিবার জন্য। দুইটি হৃদয় একত্র হইলে পর, একটি অন্যটির সাথে মিশিবার পর কি রকমে লেনা-দেনা করিতেছে, কি ভাবে সেই মিলনের প্রকাশ করিতেছে, তাহারই চিত্র দিতেছে ভারতবর্ষ। দুইটি অন্তরাত্মার স্পর্শ কি করিয়া হইল, তাহার রহস্য পাই পাশ্চাত্যে; এই স্পর্শের পর দুইটিতে মিলিয়া কি ভাব কি লীলা ফলাইয়া তুলিতেছে, তাহার বার্ত্তা পাই প্রাচ্যে। অথবা, সাধনার কথা যেন বলিতেছে তরুণ সাধক ইউরোপ আর সিদ্ধির কথা বলিতেছে সিদ্ধপুরুষ ভারতবর্ষ।

পূর্ব্বরাগে অনুভব করি না-পাওয়া জিনিষের পাওয়ার চেষ্টায় যে আনন্দ; অনুরাগে বা উত্তর রাগে অনুভব করি পাওয়া জিনিষের সম্ভোগে যে আনন্দ। পূর্ব্বরাগ যেন 'রোমাণ্টিক' আনন্দ—আর উত্তর-রাগ যেন রিয়ালিষ্টিক বা বস্তুতান্ত্রিক আনন্দ। মানুষ একদিকে অসীম—সে চাহিতেছে কেবলি ছাড়াইয়া ছাড়াইয়া চলিতে, পিছনের সকল বন্ধনকে ছিঁড়িয়া নিত্য-নূতনের দিকে

আহ্বান হইতে, এই অসীমের বাঁধনছাড়ার একান্ত মুক্তির রস ছিটাইয়া উঠিয়াছে পূর্ব্ব-রাগের মধ্যে। কিন্তু আর একদিকে মানুষ সসীম—নিকটের পরিচয়ের বন্ধনের মধ্যে সে চাহিতেছে শান্তির তৃপ্তির তুষ্টির আনন্দ—ইহাই উত্তর-রাগের দান। কোন্‌টিকে ছোট, কোন্‌টিকে বড় বলিব? অনিশ্চিতের আনন্দ অফুরন্ত চির-নূতন, নিশ্চিতের আনন্দ কি ফুরাইয়া যায়, পুরাতন জীর্ণ হইয়া পড়ে? অসীম আনন্দ কি কেবল অসীমের মধ্যেই, সসীমের মধ্যেও কি অসীম আনন্দ থাকিতে পারে না?

পূর্ব্বরাগ পূজা করিতেছে মানস-সুন্দরীকে। যে বস্তুকে আশ্রয় করিয়া পূর্ব্ব-রাগ জ্বলিয়া উঠিতেছে, তাহা আশ্রয় মাত্র; আমার ভিতরের আনন্দ আকাঙ্ক্ষা অভিলাষ চাহিতেছে একটা তৃপ্তি—এ তৃপ্তির খোরাক বলিয়া বাহিরের একটা আধারকে জড়াইয়া ধরিয়াছি, কারণ সেই বাহিরের আধারের মধ্যে ভিতরেরই ঈপ্সিত জিনিষের একটা কিছু ছায়া হয় ত দেখিয়াছি; কিন্তু প্রকৃত তৃপ্তি আসিতেছে সেই ভিতরের আনন্দেরই একটা রোমন্থনে; কারণ বাহিরটার সাথে নিবিড় পরিচয় এখনও হয় নাই, এখনও তাহা দূরে দূরে, তাহাকে ভিতরের কল্পনাতেই প্রতিনিয়ত গড়িয়া তুলিতেছি, তাহার উপর রং ফলাইতেছি। পূর্ব্বরাগের প্রেমাস্পদ সীমার ভিতরের প্রেমেরই সৃষ্টি—দেবী, কল্পনাময়ী। অনু-রাগের আনন্দ কিন্তু এ রকম একদিকের আনন্দ, আত্মগত তৃপ্তি—আত্মরতি নহে; অনু-রাগের আনন্দ যে বাহিরের বস্তুটির স্পর্শে স্পর্শে গড়িয়া চাঙ্গাই হইয়া উঠিতেছে—সেখানে আমি প্রেমাস্পদকে গড়িতেছি না, আমার প্রেমাস্পদও আমাকে গড়িতেছে, উভয়ে উভয়কে আপনার মত করিয়া লইতেছে। পূর্ব্ব-রাগে আমার অন্তরের তৃষ্ণা যখন যেমন চাহিতেছে, একটা নিমিত্তকে ধরিয়া তখন সেই রকম রস তৈয়ার করিয়া লইতেছে—তাই পূর্ব্বরাগ চিরনূতনকে জন্ম দিতেছে, তাই তাহা কেমন নিত্য সজীব সবুজ! কিন্তু অনুরাগেও আছে একটা 'তিলে তিলে নূতন হোয়।' প্রেমাস্পদকে যখন ধরিতে পারি, পরস্পর পরস্পরকে নিবিড় আশ্লেষে মিশাইয়া লইতে পারি, লাখ লাখ যুগ নয়নে নয়ন হিয়ায় হিয়া রাখিতে পারি, তবুও যে সে আনন্দ ফুরাইয়া যায় না, পুরাতন হইয়া পড়ে না, তাহার কারণ প্রেমের রসায়নে প্রেমের আধার উভয় বস্তুর মধ্যেই নব অবোধ্যের সব ঘটিতেছে—এ শুধু ভিতরের রঙিন দৃষ্টি দিয়া বাহিরকে দেখা নয়, এখানে আছে বাহিরের পদার্থের মধ্যেই একটা নূতন নূতন রূপের বিকাশ ও লীলা। অনু-রাগে এই উভয়ের মধ্যে চলিতেছে যে নব নব বস্তুসৃষ্টি, তাহা যখন বন্ধ হইয়া যায়, তখনই অনু-রাগের আনন্দ শুকাইয়া ঝরিয়া পড়ে; ঠিক সেই রকমেই পূর্ব্ব রাগের মানসসৃষ্টি যতক্ষণ বাহিরের বস্তুটির সাথে বুঝা-পড়া করে, যতক্ষণ অতি নিকটে বাস্তব-সংস্পর্শে আসিয়া সংঘর্ষের ফলে অলীক বলিয়া না ধরা পড়ে, ততক্ষণই তাহার অলৌকিকত্ব বজায় থাকে।

পূর্ব্বরাগে প্রেমাস্পদকে ধরিতে ছুঁইতে আপনার বলিতে পারা নাই, কাজেই সেখানে আছে হারাইবার আশঙ্কা; এই আশঙ্কাই

পূর্ব্বরাগের আনন্দে দিয়াছে একটা তীব্রতা। অনুরাগে হারাই-হারাই ভাব যে আছে, তাহারও পিছনে গোপনে আছে, কিন্তু একটা অকাট্য অচ্ছেদ্য বন্ধনের অনুভব, একটা শাশ্বত, পাওয়ার নিশ্চয়তা, অনুরাগে পূর্ব্বরাগের সে তীব্রতা, সে ঝাল নাই, সেখানে আছে প্রসাদ-গুণাত্মক গভীরতা—বোধ হয় ত তাহার নাম মিষ্টতা। নবীনের আচার ভাল না রসগোল্লা ভাল, এ কথার উত্তর কোন রুচিবিশারদ এক কথায় দিতে পারেন? সে যাহা হউক, যে জিনিষের উপর অধিকার আমার যত কম, সে জিনিষের মূল্য আমার কাছে তত অধিক, আবার যে জিনিষ আমার পূর্ণ অধিকারে, তাহারও মূল্যের সীমা নাই। জিনিষ দুই রকমে মূল্যবান—এক দুর্মূল্য, আর এক অমূল্য—হীরা জহরৎ দুর্মূল্য, জল বাতাস অমূল্য। হীরা জহরৎ সহজে পাই না বলিয়া মূল্যবান, জল-বাতাস সব সময়েই আমার বলিয়া মূল্যবান। বলিতে পারি না কি পূর্ব্বরাগের আনন্দ দুর্মূল্য, অনুরাগের আনন্দ অমূল্য?

আর এক হিসাবে কিন্তু অনুরাগের হারাইবার আশঙ্কা বেশী, পূর্ব্বরাগে হারাইবার আশঙ্কা কম; তখন অনুরাগেরও মধ্যে পাই একটা তীব্রতা, আর পূর্ব্বরাগের মধ্যেও পাই একটা স্নিগ্ধতা। পূর্ব্বরাগে দানের মাত্রাটা বেশী, প্রতিদানের প্রশ্নটা গোড়ায় ওঠে না, ক্রমে ক্রমে যখন অনুরাগের দিকে গড়াইয়া পড়ে, তখনই সেটা মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে থাকে। পূর্ব্বরাগে আমি কেবল আমাকে দিয়া দিতেছি, ভালবাসিয়াই আমার তৃপ্তি—তখন মনে হয়,

Sweeter to love than to be loved.

যেখানে প্রতিদানের অপেক্ষা নাই, সেখানে ত হারাইবারও কিছু নাই, আপনাকে নিঃশেষে ঢালিয়া দিয়া উৎসর্গ করিয়াই চিত্ত এক স্নিগ্ধ ভাবের নেশায় মশগুল। অনুরাগে কিন্তু দানের মাত্রা যতখানি, প্রতিদানের মাত্রাও সে ততখানি চায়—দিই যতখানি, আমি চাইও আবার ততখানি। দেওয়াটা আমার উপর নির্ভর করিলেও করিতে পারে কিন্তু পাওয়াটা ত আমার উপর নির্ভর করে না, অথচ পাওয়া চাই—নহিলে অনুরাগের বন্ধন শিথিল হইয়া বা টুটিয়া যায়। কাজেই আশঙ্কা উপস্থিত হয়, পাইতেছি কি না, পাইব কি না, তাই নিমেষে নিমেষে হারাই হারাই।

যে স্পর্শ দিয়া অনুরাগের পত্তন, তাহা হাজার হইলেও বাহিরের জিনিষ—সেখানে দুইটি সত্তা পূর্ব্বরাগে যেমন, তেমন দূরে দূরে না থাকিলেও তখনও সম্পূর্ণ মিলিত হয় নাই, উভয়ে উভয়কে ছুঁইয়া আছে বটে, কিন্তু বাহিরে বাহিরে তাহারা ওতঃপ্রোত মিলিয়া যায় নাই। কাজেই বলিতে হইবে অনুরাগের মধ্যেও পূর্ব্বরাগেরই একটা জের বা রেশ তখনও চলিতেছে—অনুরাগের মধ্যেও পূর্ব্বরাগেরই প্রতিচ্ছবি দেখা যাইতেছে। এই দিক দিয়া দেখিলে পূর্ব্ব-রাগ ও অনু-রাগের মধ্যে একটা কাটছাঁটা পার্থক্য কিছু পাই না। সব রাগ বা ভালবাসার ধরণ-ধারণ একই রকম দেখিতে পাই—এখানেও যাহা সেখানেও তাহা, সেখানে যাহা এখানেও তাহা—আলো-ছায়ার তারতম্য হয় ত একটু-আধটু কেবল নির্দ্দেশ করিতে পারি।

তবুও পূর্ব্বরাগে আছে একটা মোহ,

অনুরাগ যাহা দিতে পারে না। বিবেকানন্দ না কি তাঁহার জীবনের শেষাশেষি একদিন বলিয়াছিলেন, "বিবেকানন্দের চেয়ে নরেন্দ্রনাথই বড় ছিল।" স্থাণুর ঝোঁকে চলিলেও মানুষের কেমন ঝোঁক আছে অস্থাণুর উপর—শেষের সিদ্ধির দিকে চলিতে চলিতেও সে চায় আরও কিছু পথ আরও সাধনা। সীমার মধ্যে সান্তের মধ্যে অসীমকে অনন্তকে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু মানুষ যে সীমার দ্বারা সান্তের দ্বারা আজন্মমাত্র পীড়িত, তাই তাহার প্রাণ চায় অসীমের অনন্তেরই মধ্যে অসীমকে অনন্তকে ধরিতে অথবা ধরি ধরি করিয়াও না ধরিতে। মানুষ সর্ব্বাবস্থায় চায় তাই একটা মুক্ত যাযাবর ভাব।

বন্ধনের মধ্যে থাকিয়াও মুক্ত হওয়া যায় তবুও জীবন্মুক্তি অপেক্ষা কৈবল্যমুক্তিই মানুষের প্রাণকে বেশী আকৃষ্ট করে, মাতাইয়া তোলে। গৃহী হইয়াও ত্যাগী হওয়া যায়, তবুও সন্ন্যাসকেই লোকে বুঝে ভাল। পূর্ব্বরাগে আর অনুরাগে একই আনন্দ খেলিতেছে বোধ হয়; তবুও মানুষের মধ্যে একটা কি পূর্ব্বরাগের উপরই ঝুঁকিয়া পড়িতে চায়! আমাদের ভারতে পূর্ব্বরাগের রোমান্স খেলিয়া উঠিবার তেমন সুযোগ ও সুবিধা পায় নাই। কিন্তু হইলে কি হয়, মানুষের প্রকৃতি সেখানেও আপন পথ তৈয়ার করিয়া লইয়াছে—পূর্ব্বরাগের পরিবর্ত্তে তাই 'পরকীয়া'।

পরিশেষে একটা কথা বলা প্রয়োজন মনে করিতেছি। পূর্ব্বরাগ ও অনুরাগের ভাল-মন্দ আমরা বিচার করি নাই, সমাজের কল্যাণ-কল্পে অথবা ব্যক্তির শ্রেয়ের পক্ষে কোনটির মূল্য কি, তাহা আমরা মোটেই নির্দ্ধারণ করিতে চাহি নাই, আমরা বিষয়টি দেখিতে চেষ্টা করিয়াছি ব্যক্তিগত প্রেমের দিক দিয়া। আমাদের এই দেখিবার ভঙ্গী যদি কাহারও মনঃপূত না হয়, তবে আমরা নাচার।

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত।

চক্রে

দিন এমনি করিয়াই কাটিতে লাগিল। মানুষের শরীরের কোথাও যদি একটা বড় ক্ষত থাকে ত, বাহিরে হাজার চাপা দিলেও একটু নড়া চড়াতেই তাহাতে চাড় লাগে! কিন্তু দীর্ঘকালের অভ্যাস সেটাকেও কালে সহনীয় করিয়া তোলে। জ্যেষ্ঠপুত্রের নিকটে অপ্রত্যাশিতরূপে প্রতারিত হওয়া বিপিনবিহারী ও জগদ্ধাত্রী মর্ম্মে যে আঘাত পাইয়াছিলেন, প্রচণ্ড একখানা ক্ষতের মতই সে আঘাতের বেদনা তাঁহাদের চিত্তে চিরলক্ষিত হইয়াই রহিল; কিন্তু কালের প্রলেপ যে উহার দাহজ্বালা অনেকখানি প্রশমিত করিয়া দিয়াছে তাহা তাঁহাদের মুখের স্বচ্ছভাবেই ব্যক্ত হইতেছিল। বিশেষ জগতের সর্ব্বপ্রধান শোক ভিয়াপলত প্রিয়-

ভয়ের অভাবও মানুষ যখন সহনীয় করিয়া লইয়া বাঁচিয়া থাকে, তখন এঁদের তবু তাঁহাদের অপ্রত্যাশিত বধের দুঃখ নয়। ছেলে বাঁচিয়া আছে, হয় ত সে সুখেই আছে। চাই কি—এমনও আশা করা যায় যে, ভবিষ্যতে একদিন সে নিজের ব্যবহারে অনুতপ্ত হইয়া মা-বাপের কাছে ক্ষমা চাহিতে আসিবে।

কয় বৎসরে বিনয় ও ঊর্মিলার মধ্যেও কিছু কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিয়েছিল। বিপিনবাবুকে বুড়ি করিয়া যদিও এখনও তাহাদের চোর-চোর বা অকডেঙ্গা-ড্রেঙ্গি খেলা হইয়া থাকে, তবু সদরের বাগানে এখন আর সে খেলা চলে না; তাহার পরিবর্ত্তে অন্দরের সুবৃহৎ আঙ্গিনা বা ছাদ রঙ্গভূমির স্থান অধিকার করিয়াছে। কলহ বিবাদ উভয়ের মধ্যে কিছুমাত্র কমে নাই বটে, তথাপি মারামারি এখন তাহাদের নিত্য-কর্ম্ম নয়, কদাচিৎ তাহা ঘটে। এদিকে ঊর্ম্মিলার খাটো চুল লম্বা হইয়া প্রায় পিঠ ছাড়াইয়া পড়ে, সেই চুলে আজ-কাল সে চিরুনী গুঁজিয়া মাথাজোড়া খোঁপা বাঁধে। তাহার সর্ব্ব-শরীরের অপূর্ণতা এখন দেখিতে দেখিতে বর্ষায় জল-নামা পাহাড়ে-নদীর মত ভরিয়া উঠিতেছিল।

ঊর্ম্মিলার মামার বাড়ী নিকটেই,—ঘণ্টা কয়েক ঘোড়ার গাড়ী বা নৌকায় করিয়া যাওয়া যায়। মধ্যমাস। মামাতো ভাইএর বিবাহে দিন-কয়েকের জন্য সে মামার বাড়ী নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছিল; ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, বাড়ীর ভিতরের কয়েকটা ভাল ঘরের মধ্যে একটার সাজসজ্জার আগাগোড়া পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গিয়াছে। সে ঘরখানা অব্যবহার্য্য স্তূপে কতকগুলা সিন্দুক-বাক্সের ও ছেঁড়া গদি-বালিসের গুদাম হইয়া অনেক দিন হইতেই পড়িয়াছিল। হঠাৎ আজ সেখানে বেশ এক লোভনীয় শোভনতা বিরাজ করিতেছে! ঊর্ম্মিলা কৌতুহলী হইয়া ঘরটায় ঢুকিয়া পড়িল, এবং ইহার চারিদিকে চোখ ফিরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতে লাগিল।

তা ঘরখানায় দেখিবার জিনিসও নেহাৎ কম ছিল না। প্রশস্ত কক্ষের এক পাশে এক-খানা ঝকঝকে পালঙ্ক, তাহাতে একটা ধবধবে বিছানা—দেখিলেই ঝুপ করিয়া শুইয়া পড়তে ইচ্ছা করে;—মশারিটা—মা এই সেদিন বেটি সেলাই করাইয়াছেন। ঐ মতলবে বুঝি করা হইয়াছিল? ঘরের অপর দিকে খাটখানার ঠিক সামনা-সামনি ঘরের মেজেয় খুব বড় গোছের একখানা পার্সিয়ান কার্পেট পাতা। তার কোণ চারিটায় ফুটন্ত গোলাপ এবং মধ্যস্থলে একটা সতেজ সবল আরবী ঘোড়া আঁকা। ঘোড়াটা ঘাড় বাঁকাইয়া সামনের এক পা তুলিয়া দৌড়বার জন্য উদ্ধত ভঙ্গীতে অঙ্কিত হইয়াছে। এখানা সচরাচর মায়ের বিছানা-তোলা চালুনিতে তোলা থাকে। কার জন্য নামানো হইয়াছে? এ আবার কি! বাহিরের ঘরের একটা ছোট টেবিল মাথায় কালো বনাত আঁটা, এদিকে-সেদিকে সাতটা খাপ-খুবরি টানা দেরাজ, সেটাও যে আসিয়াছে। ঊর্ম্মিলা চকিত হইয়া ছুটিয়া আসিয়া অত্যন্ত নিবিষ্ট চিত্তে দেখিল, সেই টেবিলটার উপর বিনয়কুমারের সখের-সাজান এবং ঊর্ম্মিলার বহুদিনকার বিশেষ লোভনীয় অনেকগুলি পদার্থ, যথা, আগ্রার শ্বেত প্রস্তরের তৈয়ারী প্রধান কারু-খচিত

কাগজ-চাপা, দোয়াতদান, কাশী হইতে শ্বশুর কর্ত্তৃক আনীত পিতলের দোয়াত-কলম, চুনারের ফুলদানি ইত্যাদি সাজানো রহিয়াছে।

"বাঃ! বাঃ! এ হচ্চে কি? দেখো, যেন আমার জিনিষ সব লোপাট করে ফেলো না।"

"আমি যেন চোর! তোমার জিনিষ চুরি করতেই এসেছি। না?"

ভীষণভাবে ভীষণ অভিযোগের ততোধিক প্রত্যুত্তর দিয়া ঊর্ম্মিলা স্প্রিং-এর মত ছিটকাইয়া ফিরিয়া আততায়ীর সহিত ঠিক মুখোমুখী দাঁড়াইল। তাহার মুখে চোখে যে ভাব ব্যক্ত হইতেছিল, তাহাতে আঘাতের আঘাতটা যে কোনখানে, সেটুকু বেশ সুস্পষ্ট বুঝা যাইতেছিল। সকল্যাণ পূর্ব্বারোপিত চৌর্য্যাপবাদ যে ঊর্ম্মিলাকে এমন অতর্কিত অগ্নিশিখায় পরিবর্ত্তিত করিতে পারিয়াছিল, তাহার স্বামীটির মনের প্রান্তে এক লহমার জন্যও এমন অন্যায় বিশ্বাস জাগে নাই; কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়াও সে উচ্চহাস্য করিয়া বলিল, "তার পরে ঊর্ম্মিলাসুন্দরি, কখন আসা হলো? টুক টুক করে চেয়ে চেয়ে দেখ্‌চো কি? এ ঘর আমার! শুধু আমার একলার। এক টেবিলে বসে এবার থেকে আমি একলাই লেখাপড়া কর্‌বো। ঘুম পেলে ঐ খাটে শুয়ে একা ঘুমিয়ে পড়বো।"—বলিতে বলিতে বিনয় আসিয়া সাবেক টেবিলের সামনের চৌকিখানা টানিয়া তাহাতে বসিয়া পড়িল, এবং আবার তখনই উঠিয়া সগর্ব্ব পদক্ষেপে খাটের সম্মুখে আসিয়া চটিজুতা জোড়াটা খুলিয়া ধপাস করিয়া তদুপরি শুইয়া পড়িল, তারপর পরাজিত এবং একান্ত বিমর্ষ প্রতিদ্বন্দ্বীর পানে গৌরবদীপ্ত সকৌতুক চক্ষুদ্বয় ফিরাইয়া হাসিয়া বলিল, "দেখ্‌লে তো? এ সব আমার।"

ঊর্ম্মিলার মুখ ঈর্ষায় কালো হইয়া উঠিল। সে সান্দিগ্ধ ভগ্ন কণ্ঠে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, "কে তোমাকে এ সব দিলে?"

"কে আবার! আমার মা দিয়েছে।"

শুনিয়া ঊর্ম্মিলা জানিয়া উচ্চ চীৎকারের স্বরে ডাকিয়া উঠিল, "মা, মা!" এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গেই ঠিক দ্বারের বাহির হইতেই যেমন মায়ের সাড়া আসিয়া পৌঁছিল, এবং সস্নেহ হাসিমাখা সস্নেহ চোখে চাহিয়া তিনি ঘরে ঢুকিলেন অমনি দুর্দ্দম ক্রোধ ও অভিমানের বিদ্রূপ ঊর্ম্মিলার অপমানাহত ক্ষুব্ধ বক্ষে উদ্দাম হইয়া উঠিল। সে তৎক্ষণাৎ মুখ ফিরাইয়া কঠিন হইয়া দাঁড়াইল এবং এইরূপে শাশুড়ীকে জানাইয়া দিল যে সে তাঁহার উপর অত্যন্ত রাগ করিয়াছে।

জগদ্ধাত্রী এ সব মান-অভিমানে বেশ অভ্যস্ত আছেন। দুই-এক বৎসর পূর্ব্বে ইহারা স্পষ্টবাক্যে তাঁহাকে জানাইয়া দিত যে, "আমি তোমার উপর রাগ করিয়াছি।" এখন আর সেরূপ করে না, কিন্তু এক একটা ভাবে এখনও নিজেদের কাজ সম্পন্ন করে।

কাছে আসিয়া খপ্‌ করিয়া বধূর মাথা বুকে টানিয়া লইয়া হাসিতে হাসিতে তিনি বলিলেন, "রাগ হলো কেন রে?"

ঊর্ম্মিলা জবাব দিবে না মনে করিয়া ছিল, তবুও আচম্‌কা ফস্‌ করিয়া বলিয়া ফেলিল, "যাও, আমি তোমার সঙ্গে কথা কবো না।"

মা আবার হাসিয়া বলিলেন, "কেন রে পাগলী ?"

"কেন রে পাগলী, বই কি!—কিছু যেন জানেন না!" ঊর্ম্মিলা নিজের পুঁটে বেণী খোঁপাশুদ্ধ মাথাটা শাশুড়ীর কবল হইতে মোচন-চেষ্টায় একটা ঝটকা মারিল। খোঁপায় আঁটা কানকোঁদার ঘুমুরগুলা অমনি ঝম্‌ঝম্ করিয়া বাজিয়া উঠিল।

খাটে শুইয়া বিনয় এতক্ষণ হাসিয়া কুটি-কুটি হইতেছিল। সে মায়ের পদশব্দ শোনামাত্র অধিকতর আনন্দ অনুভব করিল। হো হো শব্দে হাসিয়া বলিয়া উঠিল, "[illegible] পারছো না, আঃ, আমার এই ঘর থেকে [illegible] হংসের জলে মরা!"

"হ্যাঁরে মা ?"

"যাঃ, আমি তোমার মা নই, আমি শাবার মা। তুমি নিজের ছেলেটীকে ঘর-টর সব দিয়েছ। আমায় দিয়েছ কি ?"

গৃহিণী হাসিয়া সস্নেহে বধূর কপালে চুম্বন করিয়া বলিলেন, "নে' পাগল, তোরই তো সব।"

ঊর্ম্মিলা সবেগে মুখখানা সরাইয়া লইয়া উদ্ধত কণ্ঠে বলিল, "ও সব বাজে কথা আমি শুনতে চাইনে। আমায় একটা ঘর দেবে কি না, শিগ্‌গির বলো ?"

বিনয় তাড়াতাড়ি খাট হইতে উঠিয়া মার দিকে ছুটিয়া আসিয়া কুক্ষহাত জোড় করিয়া উচ্চকণ্ঠে চেঁচাইয়া উঠিল, "দিও না মা, তোমার পায়ে পড়ি মা, ওকে দিও না।"

মা বলিলেন, "সে কিরে, ও যে আমার ঘরের লক্ষ্মী। তা এ ঘর তো তোদের দুজনকেই দিয়েছি। এইখানে আজ থেকে তুই ও ও থাকবি রে পাগল।"

বিনয় অমনি মহাশব্দে চীৎকার করিয়া উঠিল, "ও বাবা রে! সে হচ্ছে না। ওকে আমি আমার ঘরে শুতে দেবো না। ওর মাথার তেলে আমার ঘরের বালিস নোংরা হয়ে যাবে, ওর মল-পরা পা আমার ঘাড়ে এসে চড়বে—সে আমি পারবো নারে বাবা!"

সদ্য অপমানিত, রোষে আরক্ত হইয়া উঠিয়া ঊর্ম্মিলা শাশুড়ীর গায়ের সঙ্গে মিশিয়া গিয়া সতর্জ্জনে বলিল, "মা, তুমি জানো ও ঘুমতে ঘুমতে কে ঘাড়ে এসে পড়ে! সারা রাত তোমার পাশ বালিস করে আঁকড়ে ধরে ঘুম ভাঙিয়ে দেয়। তবু কি না তুমি বলছো আমায় ওর সঙ্গে শুতে? বেশ তো তুমি মা!"

মা বলিলেন, "ওরে, তোরা যে বড় হচ্ছিস, চিরদিনই কি মার আঁচলের তলায় থাকবি ?"

বিনয় বলিল, "তা থাকি আর নাই থাকি, তা বলে তো আর ওই রাক্ষুসীর আঁচল ধরতে পারিনে।"

কথার শোধ লইবার জন্ত ঊর্ম্মিলা পাল্টা গাহিল, "বাপ রে! ছেলে যা নাক ডাকান, রাতে ঘুম ভেঙ্গে গিয়ে কতদিন যে আমি ভয় পাই, তা বলতে পারিনে। আমি অমন সাপের গর্জ্জন শুতে চাইনে, আমায় একটা আলাদা ঘর তুমি দেবে কি না, বলো? দেবে? আচ্ছা, তবে এক্ষনি দেবে, এসো।"

৫

"বাবা, তোমার আজ চান করতে

আসতে বেলা হয়েছে। হবেই তো, এখন তো আর আমার বৈঠকখানায় গিয়ে তোমায় ধরে আনবার যো নেই।"

"নারে পাগলি, বেলা কেন হবে। ঠিক সময়েই এসেছি।"

"কক্ষণো নয়, অনেক বেলা হয়ে গেছে। বরং ঘড়ি দেখ। আনবো ঘড়ি?"

"না, থাক্। আচ্ছা, কাল থেকে—"

"সে তোমার খাওয়া হবে না বাবা, দেখই না একবার কত বেলা হলো।"

"তবে আন্।"

ঊর্ম্মিলা উৎসাহ-সহকারে ঘড়ি আনিয়া সম্মুখে ধরিলে বিপিনবিহারী দেখিলেন, বহুমূল্য সুদৃশ্য ঘড়িটা টুকরা-টুকরা করিয়া ভাঙ্গা! বিস্মিত হইয়া বধূর দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কি! ঘড়ি কেন ভাঙ্গা, মা? তুই ভেঙ্গে ফেলি নাকি?"

বধূ নীরবে মাথা নাড়িল, না।

বিপিন বাবু ঈষৎ ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, "তবে ভাঙ্গলো কেমন করে? একেবারে দফা রফা হয়ে গেছে যে! জানো, কে ভেঙেছে?"

বধূ মস্তক হেলাইয়া জানাইল, জানে। আর কিছু বলিল না।

তখন বিপিনবাবু বুঝিতে পারিয়া হঠাৎ ক্রুদ্ধ হইয়া উচ্চকণ্ঠে হাঁকিলেন, "বিনে? নিশ্চয় এ সেই বিনে হতভাগার কাজ! রাস্কেলটা গেল কোথায়?"

বিনয় অত্যন্ত গম্ভীর মুখে আসিয়া বলিল, ঘড়ি সে ভাঙে নাই। কে তাহাকে ভাঙিতে দেখিয়াছে? এই কথা বলিয়াই ঊর্ম্মিলার চোখের উপর চোখ পড়িতেই হঠাৎ সে থতমত খাইয়া ঢোক গিলিতে লাগিল।

ঘড়ি ভাঙ্গা এবং মিথ্যা বলা,—এ দুইটা অপরাধের জন্যই বিপিনবাবু ভৎর্সনা করিয়া ছেলেকে বিদায় দিলেন। দোষ স্বীকার এবং মিথ্যার জন্য বাপকে তাহার সেই অগ্নি দৃষ্টিরই অনুরূপ কটাক্ষ করিয়া দুম্‌দুম্ শব্দে পা ঠুকিয়া সে চলিয়া গেল। পুত্র ঘরের অন্তরালে গেলে ছোট একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বিপিনবাবু আত্মগত ভাবেই বলিলেন, "দুটোই সমান গোঁয়ার! এটারও মানুষ হবার লক্ষণ দেখ্‌চি নে।"

স্বামীর সেই কোপদৃষ্টি এবং নিজের অপরাধ স্মরণ করিয়া সারাদিন ঊর্ম্মিলা লুকাইয়া বেড়াইল; কিন্তু এখন আর যেন সে এমন করিয়া অপরাধের বোঝা বহিয়া বেড়াইতে পারিতেছিল না। এইবার স্বামীর নিকট ধরা দিয়া কৃত কার্য্যের শাস্তি বহন করিতে প্রাণ তাহার উদ্বেগে আকুল হইয়া উঠিতে লাগিল। রান্না-বাড়ীর সীমানা ছাড়াইয়া পা টিপিয়া টিপিয়া সে বাহির হইয়া আসিল; অন্তরালে থাকিয়া আততায়ীর গতিবিধি লক্ষ্য করিতে করিতে চিত্ত তাহার বিস্ময়ে ভরিয়া উঠিতে লাগিল এই জন্য যে, এই একটু পূর্ব্বেই এরূপ স্থলে যেমন ঘটিয়াছে, এবার তাহার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। বিনয় তর্কে তর্কে ঊর্ম্মিলার সন্ধানেই ব্যাপৃত থাকে এবং তাহাকে বাহির হইতে দেখিলেই বাঘের মত গর্জ্জিয়া আসিয়া পড়ে। তারপর দুইজনে হুড়াহুড়ি মারামারি—সে সব অনেক কাণ্ডই ঘটিয়া যায়। কিন্তু আজ তার কিছুই হইল না। গোপন আবরণ ছাড়িয়া অবশেষে

এমন কি সারা বাড়ীটাই ঊর্ম্মিলা ঘুরিয়া খুঁজিয়া আসিল, শত্রুপক্ষের দেখা নাই। ব্যাপার কি? কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিতেও ভরসা হয় না,—যদি ঠিক সেই সময়টিতেই সেই বাক্তি আসিয়া পড়িয়া তাহার কথা শুনিতে পায়!

সন্ধ্যার পর কি একটা দরকারে উপরে ভিতরকার বারান্দার দিকে যাইতে যাইতে ঊর্ম্মিলা দেখিল, বিনয়ের ঘরের মধ্যে আলো জ্বলিতেছে। দেখিয়াই তাহার বিষণ্ণ মুখে কর্পূর আলোর জ্বলিয়া উঠিল এবং হৃৎপিণ্ডটা ধ্বক্ করিয়া উঠিল। তিন লাফে দ্বারের সমীপবর্ত্তী হইয়াই সে মলের শব্দ করিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল, কিন্তু তথাপি পুস্তকের পৃষ্ঠায় অখণ্ড মনোযোগ-নিবদ্ধ বিনয়-কুমারের দৃষ্টি তাহার পানে ফিরিল না। বোধ করি চারগাছা মলের সে ঝন্ ঝন্ রব তাহার কর্ণগোচর না হইয়াই থাকিবে!

ঊর্ম্মিলা নিজের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণের কোন সুযোগ খুঁজিয়া না পাইয়া খোলা দরজাটাকে টানিয়া ঝনাৎ করিয়া বন্ধ করিল। তারপর তাহাতেও বিপক্ষ পক্ষকে অটল দেখিয়া অসহিষ্ণু ধৈর্য্য-হারা হইয়া ছুটিয়া আসিয়া যে চৌকিখানায় সে বসিয়াছিল, সেইখানায় হাতা ধরিয়া বিপুল বলে একটা ধাক্কা দিল; পড়িতে পড়িতে সাম্‌লাইয়া বিনয় তখন ঘুরিয়া বসিয়া তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "খবরদার! আমার ঘরে ঢুকেছ কি ঠ্যাং ভেঙ্গে দিয়েছি!"

ঊর্ম্মিলা আসিয়াছিল ক্ষমা চাহিতে, কিন্তু পূর্ব্বের সমস্ত সংকল্প নিজেই যখন মাটি করিয়া ফেলিয়াছে, তখন বাকীটুকুও বিস্মৃত হইয়া তেমনি খর দীপ্ত হইয়া উঠিয়া জবাব দিল, "ইস্—তোমারই না কি একলার ঘর! মা বলেছে, আমারও এতে ভাগ আছে। শুধু তাই নয়; তোমার সব জিনিষেই আমার ভাগ আছে।"

বিনয় নিজের নামের সম্মান সম্পূর্ণ ভুলিয়া ভীষণ দৃষ্টিতে স্ত্রীর পানে চাহিয়া বলিল, "বেরোও বল্‌ছি, এ ঘর থেকে, ভাল চাও তো এখনি বেরোও! আমি 'স্পাই'কে আমার ঘরে ঢুকতে দিইনে।"

এ কথায় ঊর্ম্মিলার অহঙ্কার-প্রদীপ্ত মুখের ছবি মুহূর্ত্তে রাহুগ্রাস-কবলিত শশাঙ্কের মতই নিষ্প্রভ হইয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅনুরূপা দেবী।

তানপুরা

আমাদের দেশে সঙ্গীতের সহিত সঙ্গতের জন্য তানপুরা যন্ত্রটি সর্ব্বতোভাবে উপযোগী। ইহার বহুল প্রচলন হইলে সঙ্গীত-চর্চা সম্যক উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে। শব্দ-বিজ্ঞানের ও য়ুরোপীয় স্বর-মিল-শাস্ত্রের সহিত তানপুরার সুরের খাঁটি সম্পর্ক আছে।

আমাদের দেশের প্রাচীন সঙ্গীত-শাস্ত্রে ও

পুরাণাদিতে কথিত আছে যে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা মহাদেবের নিকট প্রথম সঙ্গীত শিক্ষা করিয়া পরে ভরত, নারদ, রম্ভা, হূহূ ও তুম্বুরু এই পাঁচ শিষ্যকে সঙ্গীত শিক্ষা দেন।

"ভরতং নারদং রম্ভাং হূহূং তুম্বুরুমেব চ।
পঞ্চ শিষ্যাংস্ততোঽধ্যাপ্য সঙ্গীতং
ব্যাদিশদ্বিভুঃ॥"

নারদ-সংহিতা।

কাহারও মতে এই পঞ্চ শিষ্য তুম্বুরুই প্রথম সৃষ্টি করেন বলিয়া যন্ত্রটির নাম হইয়াছে 'তম্বুরা'। আবার অন্য মতে — এই যন্ত্রে পূর্ণ তান— অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে স্বরের খেলা হয় বলিয়াই ইহার নাম হইয়াছে, 'তানপুরা'। কাপ্তেন উইলার্ড সাহেব হিন্দু সঙ্গীত সম্বন্ধে যে প্রসিদ্ধ পুস্তক রচনা করিয়াছেন, তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন, "Its use is calculated, as the name indicates, to fill up all pauses and vacuities in the song, and likewise to keep the songster from straying from the tone which he originally adopted."

ইহার ভাবার্থ এই যে, গায়ক যে সুর বদ্ধ করিয়া গান ধরিয়াছেন,—তাহা ঠিক রাখিবার জন্য এবং গানের মধ্যে অন্য স্বরের সাহায্য পাওয়াই তানপুরার প্রধান উদ্দেশ্য।

আজকাল হারমোনিয়ম যন্ত্রের বহুল প্রচলন হওয়ায় ঘরে ঘরেই গায়ক পাওয়া যায়। গান গাওয়া বা স্বর সাধনা হারমোনিয়ম বা অন্য তারের যন্ত্র, যথা, সেতার, এস্রাজ, বা বেহালা ও সারেঙ্গির সাহায্যে খুব সহজ বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু এই সকল যন্ত্রের সাহায্যে গান শিক্ষা প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে বিশেষ উপযোগী হইলেও কিছুদিন পরেই দেখা যায়, যে যাঁহারা এই সকল যন্ত্রের সাহায্যে গান শিক্ষা করেন বা গাহিয়া থাকেন, তাঁহারা স্বাধীনভাবে গাহিতে প্রায়ই অক্ষম, গাহিলেও কষ্ট বোধ করেন। তাহার কারণ এই যে,— তাঁহাদের গলার স্বর যন্ত্রের স্বরকে অনুধাবন করে। যন্ত্র একবার ছাড়িয়া দিলে গলার দোষ বাহির হইয়া পড়ে ও তখন তাহা একেবারেই মিষ্ট শুনায় না। এরূপ গায়ক তানপুরায় গাহিতে অপারগ বা অনিচ্ছুক —সেটা কেবল অভ্যাসের দোষে। দিনকতক তানপুরার সাহিত স্বর সাধনা বা গান অভ্যাস করিলে নিজেই নিজের গলার স্বরের বক্রত্ব বুঝিতে পারিবেন ও আপনা হইতেই তাহার সংশোধনের চেষ্টা আসিবে।

সঙ্গীত সম্বন্ধে তিন শ্রেণীর লোক দেখা যায়—যথা, অভিজ্ঞ, অনভিজ্ঞ ও অজ্ঞ। যাঁহারা অজ্ঞ তাঁহাদের কোন বালাই নাই। সেটা যাহা ভাল লাগিল তাই বলিলেন,—তা সে হিন্দুস্থানী গানই হউক আর বাঙ্গলা গানই হউক বা কীর্ত্তনই হউক। তাঁহাদের কোন দোষ দেওয়া যায় না।

যত গোল এই অনভিজ্ঞদের লইয়া। তাঁহারা শিখিয়াছেন অনেক গান,—হারমোনিয়মের সাহায্যে বেশ ভাল গান গাহিতেও পারেন, সে গাওয়া সকলে পছন্দও করে, কিন্তু যন্ত্রটি কাড়িয়া হাতে তানপুরা দিন, অমনি একেবারে গলার স্বরূপ প্রকাশ। হারমোনিয়ম বা অন্য যন্ত্র স্বরের মিষ্টতাকেই গানের মিষ্টতা বলিয়া রাখে। যদি একটু কষ্ট করিয়া কিছুদিন তানপুরার সাহায্যে গান বা স্বর-সাধনা অভ্যাস করেন, তাহা হইলে

তাহাদের গানেরও উন্নতি হয়, আর সঙ্গীতেরও শ্রাদ্ধ না হইয়া সঙ্গীতের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা বাড়ে।

. এ বিষয়ে বালাইও কিছু নাই। কারণ তানপুরা যন্ত্রটি শেখা সহজ, এবং দামেও সস্তা।

গানের আসরে 'তানপুরা' দেখিলে অনেকেই ভয় পান যে এইবার বুঝি গানের কুস্তি সুরু হইবে। সেটা যন্ত্রের দোষ নহে,—সেটা আমাদের দেশের ওস্তাদরা সঙ্গীতের নামে বাজখাঁই গলা লইয়া রাগ-রাগিণীর সহিত ব্যায়াম করেন বলিয়াই অমন হয়। কোন একটি রাগিণী মধুর রসাশ্রিত হইলেও ব্যায়াম ও বিকট কসরতের চোটে, ভয়ানক বীররসাত্মক হইয়া পড়ে।

আধুনিক সঙ্গীতের মজলিসে আরও একটা দোষ হইয়াছে এই যে, তানপুরা থাকিলেও অনেক ওস্তাদের গানের সহিত হারমোনিয়মও বাজিতে থাকে। ইহাতে অবশ্য গান শুনিতে বেশ মিষ্ট হয় কিন্তু গায়কের গলার স্বরূপ জানিতে পাওয়া যায় না। এবং যে-সকল রাগিণীর কোমল সুর হারমোনিয়মে পাওয়া যায় না—হারমোনিয়মে তাহা বাদিত হইলে কিরূপ শোনায়, বিশিষ্ট অভিজ্ঞগণ সেটুকু বেশ বুঝিতে পারেন। মনে করুন, কানাড়ার গান্ধার কোমল বা পুরিয়ার রেখাব কোমলের সহিত হারমোনিয়মের ঐ সকল সুর বাজানো হইলে বেসুরা শুনাইবেই, এবং গায়কের গলা হইতে যখন ঐ স্বর বাহির হইবে, তখন তাহা হারমোনিয়মের স্বরের দিকেই ঝুঁকিবে। তাহা হইলে রাগিণীর বিশেষত্ব নষ্ট ও আসল সঙ্গীতের প্রলাপ হইবে।

তানপুরা যন্ত্রটির নিম্নে লাউর খোলের উঁচু অংশ—ও তাহার উপরে ফাঁপা কাঠের দণ্ড। চারিটি থাকে; মধ্যের পাকা ইস্পাতের তার ও পাশের দুইটি পিতলের। উপরে সরু সোয়ারী ও নীচে চওড়া সোয়ারী বা bridge. নীচের সোয়ারীতে তারের নীচে সুতা দিয়া জোয়ারী বা রেশ উৎপাদন করা হইয়া থাকে।

প্রথমে কানের সাহায্যে সুর বাঁধিয়া, পরে সোয়ারীর নীচে প্রত্যেক তারের ভিতর যে গুলি বা মেনকা থাকে, তাহা সরাইয়া স্বরের অল্প প্রভেদ ঠিক করিয়া দেওয়া হয়। মেনকা অল্প অল্প সরাইলে তারের টান tension বাড়িয়া বা কমিয়া সুরে মিল করিয়া দেয়। তার পর জোয়ারীর সুতা বা সিল্ক ঠিক যেখানে তার সোয়ারীর উপর ঠেকিয়া থাকে, সেইখানে এক হাতে ১ ইঞ্চি লম্বা, ২ বা ৪ ফেরু সুতা, ক্রমশঃ টানিতে হয় ও সঙ্গে সঙ্গে সেই তারটিতে অন্য হাতের এক আঙ্গুল দিয়া পিড়িং পিড়িং শব্দ করিতে হয়। এক সঙ্গেই শব্দ করিতে হইবে ও সুতা সরাইতে হইবে,—যতক্ষণ না পিড়িং পিড়িং আওয়াজ বেশ রেশ-যুক্ত শব্দে পরিণত হয়। প্রত্যেক তারেরই কেবল একমাত্র স্থান আছে যেখানে সুতা আসিলে বেশ রেশযুক্ত স্বর ধ্বনিত হয়। জোয়ারী আরও নামিয়া গেলে রেশ বন্ধ হইয়া পুনরায় পূর্ব্বের পিড়িং পিড়িং শব্দ হয়। চারিটি তারেই জোয়ারী বসিতে আরম্ভ করিলে, তার পর আসন-পিঁড়ি হইয়া বসিয়া বা এক হাঁটু আসনে লাগাইয়া ও অন্য হাঁটু উঠাইয়া বসিয়া তানপুরার তুম্বা কোলের উপর করিয়া তারগুলি দক্ষিণ দিকে লইয়া তাণ্ডী

মাথক অর্দ্ধগোল যে লম্বা কাঠ, তাহার মধ্যদেশ দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধা একদিকে, ও অনামিকা ও কনিষ্ঠা আর একদিকে দিয়া এমনভাবে ধরিবে, যেন তারগুলি কবতলে না লাগে। এই প্রকারে ধরিয়া দক্ষিণ কাণের নিকট খাড়া করিয়া রাখিয়া, দক্ষিণ মধ্যমা দ্বারা প্রথম তার ও দক্ষিণ তর্জ্জনী দ্বারা ২য়, ৩য় ও ৪র্থ তার পর-পর ধ্বনিত করিবে।

ইহাই হইল তানপুরা বাঁধিবার রীতি। মধ্যের তার দুইটি ষড়জে, প্রথম তারটি মুদারার পঞ্চমে ও চতুর্থটি মুদারার ষড়জে বাঁধাই প্রচলিত নিয়ম। যার যেরূপ গলার ওজন, সেইরূপ সুরে ষড়জ বাঁধা উচিত। সেজন্য একটি গলার ওজন হিসাবে সুরের সুর-শলাকা বা টিউনিং ফর্ক ও মুদারার পঞ্চমের ও ষড়জের সুর-শলাকা রাখা উচিত।

তাহা হইলে তানপুরার স্বর এইরূপ ধ্বনিত হইবে, যথা,—

(১) পা, সা, সা, সা—

আরও অন্য রকমে তার বাঁধা হইয়া থাকে। যে রাগিণীতে পঞ্চম বর্জ্জিত, তাহা গাহিবার সময় পঞ্চমের তারটিকে মধ্যমে বাঁধা উচিত,—যেমন মালকোষ, পূরিয়া, মারোয়া, জয়ন্ত, বসন্ত, পঞ্চম, হিন্দোল, সোহিনী, ললিত গাহিবার সময়,—এই সকল রাগিণীতে পঞ্চম স্বর বর্জ্জিত থাকায় প্রথম তারটি পঞ্চম-স্বরে না বাঁধিয়া, মধ্যমে বা মা সুরে বাঁধা হইয়া থাকে তাহা হইলে দ্বিতীয় প্রকার বাঁধার রীতি হইল—

(২) মা, সা, সা, সা।

ইহা ভিন্ন ভিন্ন-অঙ্গ রাগিণী গাহিবার সুবিধার জন্য—আরও চারি প্রকার বাঁধিবার নিয়ম আছে—

(৩) পা, নি, সা, সা।

ইহা বেহাগ, ছায়ানট, কামোদ, কল্যাণী প্রভৃতি এই সকল রাগিণী গাহিবার পক্ষে বিশেষ সাহায্য করে।

(৪) গা, সা, সা, সা।

যে সকল রাগিণীর গান্ধার সুর বাদী, সেই রাগিণী সকলের বিশেষ উপযোগী।

(৫) পা, নি, সা, সা।

যে সকল রাগিণীতে নি, সা, পর পর প্রায়ই লাগে, অথচ গান্ধার সুর বাদী বা সম্বাদী, সেই সকল রাগিণীর পক্ষে বিশেষ উপযোগী হয়, যেমন, ও তাহার সমশ্রেণীর রাগিণীগুলি।

(৬) সা, পা, পা, পা।

ইহাতে প্রথম তারটি ষড়জে, দুই মধ্যের ছইটি পঞ্চমে ও চতুর্থটি মুদারার পঞ্চমে।

যে রাগিণীতে পঞ্চম সুর বাদী তাহা গাহিবার সময় এইরূপ বাঁধিলে বিশেষ সুবিধা হয়। তবে এইরূপ সংযোগ করিতে হইলে, মধ্যের তার দুইটি সরু হইলেই ভাল হয়, তাহা না হইলে পঞ্চমে বাঁধিতে তার ছিঁড়িয়া যাওয়া সম্ভব।

তানপুরার নীচে যেমন চওড়া সোয়ারী বা bridge আছে, উপরের দিকে সেইরূপ না দিয়া সরু সোয়ারী দিবার কারণ এই যে, উপরেও চওড়া সোয়ারী ও জোয়ারী দিলে শব্দ আরও বেশী হইতে পারিত, কিন্তু উপরের লাগানো সূতা নীচের দিকে ক্রমশঃ খুলিয়া পড়া ও তারের কম্পনের সহিত নীচের দিকে ক্রমশঃ নামিয়া ও সরিয়া আসার সম্ভাবনা

…বার, তারের ঠেশ খাপাপ করিয়া দিতে …রা।

…য়ারী লাগাইবার প্রধান উদ্দেশ্য, তার …নন ঘোয়ারীতে লাগিয়া থাকে, সেখানে …ন্ত কাঠের সহিত স্পর্শ না হয়। …পর্শের জায়গায় শুধু fine touch …বে।

তানপুরা ঠিকমত সুরে বাঁধা হইলে যতটি …সুর শুনিতে পাওয়া যায়। ইহার কারণ কি, …ীত বিজ্ঞান ও স্বরমিল (harmony) …ের কি নিয়ম অনুসারে তানপুরায় …র খেলা হইয়া থাকে, তাহা দেখা …।

…শাস্ত্র বিজ্ঞানের নিয়ম অনুসারে, সা, …গা মা পা, ধা নি, এই সাতটিই প্রধান …। এবং যেরূপভাবে এই সকল স্বরের …স্পন সংখ্যার ক্রমাঙ্ক, সাধিত হয়, তাহা …পর ৯/৮, ৫/৪, ৪/৩, ৩/২, ৫/৩, ১৫/৮, …এ সকল ভগ্নাংশ দিয়া গুণ করিলেই …ওয়া যায়। সা সুরের শব্দের কম্পন- …া ১ ধরিলে, রে সুরের শব্দের কম্পন …খ্যা হইবে ৯/৮। আবার রে সুরের কম্পন …খ্যাকে ১০/৯ দিয়া গুণ করিলে গা সুরের …ম্পন-সংখ্যা বাহির হইবে। তাহা হইলে …খা যাইতেছে—

…া সুরের কম্পন-সংখ্যা ১ হইলে
…র সুরের কম্পন সংখ্যা ৯/৮, এবং
…া " " " ৫/৪
…া " " " ৪/৩
…া " " " ৩/২
…া " " " ৫/৩
…ি " " " ১৫/৮
র্সা " " " ২ হইবে
(তারা)

অর্থাৎ মোটামুটি ও সহজ হিসাবে সা সুরের কম্পন সংখ্যা ২৪ হইলে, রে গা মা, পা ধা নি র্সা ২৭, ৩০, ৩২, ৩৬, ৪০, ৪৫, ৪৮ হইবে।

তারের যন্ত্রের সম্বন্ধে নিয়ম এই যে— সমস্ত তারের দৈর্ঘ্য ১ ধরিলে, উপরের ভগ্নাংশগুলির বিপরীত যে ভগ্নাংশ হইবে, সেই অংশের তারে হাত দিলে বা ভাগ করিলে পর পর সুরগুলি বাহির হইবে। যথা,—

সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি, র্সা,
১ ৯/৮ ৫/৪, ৪/৩, ৩/২, ৫/৩, ১৫/৮, ২।

তারের

১, ৮/৯, ৪/৫, ৩/৪, ২/৩ ৩/৫, ৮/১৫, ১/২, অংশে
সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি, র্সা—

এই সকল সুর ধ্বনিত হইবে। দেখা যাইতেছে যে সম্পূর্ণ তারে সা ধ্বনিত হইলে তাহার ১/২ অংশে অর্থাৎ ঠিক মধ্যে তারার র্সা ধ্বনিত হইবে; ৩/৪ বা অপরদিক হইতে ১/৪ অংশে মা ধ্বনিত হইবে,—২/৩ বা অপরদিক হইতে ১/৩ অংশে পা ধ্বনিত হইবে; ২/৩ বা অপরদিক হইতে ১/৩ অংশে পা বাহির হইবে। "অপর দিক" হইতে বলিবার অর্থ এই যে,— তারটি দুই দিকে বাঁধা আছে, যে বিন্দুটি এক দিক হইতে সম্পূর্ণ তারের ৩/৪ অংশ তাহা অপরদিক হইতে ১/৪ অংশ, কারণ ১—৩/৪ = ১/৪

সেইরূপ ২/৩-এর অপর অংশ ১/৩
" ৩/৫ " " " ২/৫
" ৪/৫ " " " ১/৫
" ৮/৯ " " " ১/৯
৮/১৫এর " " ৭/১৫

১৫/১৬ „ „ „ ১৫/১৬

৪/৫ „ „ „ ৪/৫

হঠাৎ বলিবার উদ্দেশ্য তারের কত অংশে পর পর সুর কয়টি ধ্বনিত হয়, যখন সেই সেই অংশে তারটি ছোঁয়া হয়।

খোলা তারে ধ্বনিত হয়——সা

তারের ৮/৯ অংশ ছুঁইলে ধ্বনিত হয়—রে

„ ৪/৫ „ „ „ „ গা

„ ৩/৪ „ „ „ „ মা

„ ২/৩ „ „ „ „ পা

„ ৩/৫ „ „ „ „ ধা

„ ৮/১৫ „ „ „ „ নি

„ ১/২ „ „ „ „ র্সা।

তার যখন ছোঁয়া না হয়, কেবলমাত্র সম্পূর্ণ তারটি বাজাইয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তখন শব্দবিজ্ঞানের নিয়ম-অনুসারে প্রথমে পুরা তারটি ধ্বনিত হইলে, সা সুর বাহির হয়, তার অব্যবহিত পরেই তাহার ১/২ অংশ ধ্বনিত হয়, এবং তার পরের ১/৩ অংশ, তারপর ১/৪ অংশ ইত্যাদি এবং প্রত্যেক অংশ হইতে সেই অংশানুক্রমিক সুর বহির্গত হয়।

অতএব তানপুরার সা সুরের তারটি যখন ধ্বনিত হয়, তৎক্ষণাৎ পর পর একরূপ ধ্বনি উৎপন্ন হইয়া, অপূর্ব্ব স্বর-সংযোগ বা harmonyর সৃষ্টি করিয়া থাকে, এবং সেই জন্য তানপুরা বাজিতে আরম্ভ করিলে ঘরটি যেন সুরে ভরিয়া যায়,—

স্ ্া স্ প্ সা গা পা নি র্সা

১ ১/২ ১/৩ ১/৪ ১/৫ ১/৬ ১/৭ ১/৮

র্সা র্রে র্গা র্পা ণি নি র্সা

১/৯ ১/১০ ১/১২ ১/১৩ ১/১৪ ১/১৫ ১/১৬

একরূপ বাজিয়া গেলে দেখা যাইবে, সব কয়টি সুরই এক সা হইতে উৎপন্ন হইতেছে। আবার প্া হইতেও সেইরূপ, প্াকে সুর ধরিলে, তাহার উপরকার সুর সকল পূর্ব্বের সা সুরের মতই ঐ অনুপাতে বাহির হইবে।

প্া তারের সুর, ও সা ও স্া তারের সুর, যেগুলির হার্ম্মনি-শাস্ত্র অনুসারে মিল সম্ভব, সেই সুরগুলি পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করে। স্বর-মিল শাস্ত্র অনুসারে মিল তিন প্রকার

(১) উৎকৃষ্ট মিল, best harmony, —স্, স্া, সা, র্সা, র্সা, অর্থাৎ বড়কে ও তাহার অষ্টমে।

(২) সম্পূর্ণ মিল—perfect concord—

(ক) সা, পা—সুর পঞ্চম

(খ) সা, মা—সুর মধ্যম

(৩) অসম্পূর্ণ মিল—Imperfect concord

(ক) সা, গা—সুর গান্ধার

(খ) সা,—(ধা কোমল)

(গ) সা, ধা—

(ঘ) সা, জ্ঞা (গা কোমল)

তানপুরার চারটি তারের মধ্যে উপরি-উক্ত সুরের জোড়া দুইটি একসঙ্গে পাইলেই harmonyর সৃষ্টি হয়।

এখন বক্তব্য হইতে পারে যে, যখন তানপুরা প্া, নি্, সা, স্া—বাঁধা হয় অথবা প্া নি্, সা, স্া—বাঁধা হয়, তখন নি্ সা, দুইটি তার ধ্বনিত হইলে স্বর-মিল হইতেই পারে না, তাহার উত্তর এই যে, নি্, সা, দুটি তার ত একসঙ্গে ধ্বনিত হয় না। নি্ সুরে বাঁধা তারটি ধ্বনিত হওয়ার পরে সা

সুরের তার বাজে পড়ে। ততক্ষণ নি সুরের তার, উপরি-উক্ত নিয়ম-অনুসারে, তাহার নিজের স্বরগ্রাম সৃষ্টি আরম্ভ করিয়া দিয়াছে এবং সা সুরের তারের সৃষ্ট স্বরগ্রামের যে কয়টি সুরের সহিত উপরি-উক্ত হারমনি শাস্ত্রের নিয়ম অনুসারে জোড়া মিল হইবে, সেই কয়টি প্রবলত্ব ও মিষ্টত্ব লাভ করিয়া হারমোনির সৃষ্টি করিতে থাকে।

মোটের উপর দেখা গেল, সঙ্গীতবিজ্ঞান ও হারমনি শাস্ত্র হিসাবে তানপুরা গানের বিশেষ সহযোগী, স্বাধীনভাবে গলার রেওয়াজ করার পক্ষে উপযোগী ও ইহার সহিত অভ্যাস করিলে স্বরের উৎকর্ষ-সাধন হইয়া থাকে। হঠাৎ জোয়ারীর মধ্যে স্বরগ্রামের সব সুরই পাওয়া যায়। অধিক সংখ্যায় ও শিক্ষিত লোকে ইহার নির্মাণ ব্যবসা করিলে ইহার মূল্য খুবই শস্তা হইয়া সকলের পক্ষে সহজ-প্রাপ্য হইবে।

শ্রীআশুতোষ ঘোষ।

একটা পুরাণ গীত *

মল্লার—একতালা ও কাওয়ালী

সুধার ধারা বহিছে এত, ঘোরতর রজনী,
এ সময়ে প্রাণ-নাথরে কোথায় গুণমণি,
ঘন গরজে ঘন শুনি।
ময়ূর-ময়ূরী হরষিত হেরি চাতক-চাতকিনী ॥
কদম্ব কেতকী চম্পক যূথি সেঁউতি শেফালিকে
ঘ্রাণেতে প্রাণেতে মোহ জনমায় প্রাণনাথে গৃহে না দেখে ॥
বিদ্যুৎ খদ্যোৎজ্যোতি দিবামত চমকে দিনমণি
এ সময়ে প্রাণনাথরে কোথায় গুণমণি ॥

রচয়িতা—অজ্ঞাত।   সুর ও স্বরলিপি—শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

স্বর-লিপি

II মা মা মা | পা পা -া | ধা মা মা | পা পা -া I
সু ধা র ধা রা ০ ব হি ছে এ ই ০

I ধা -া -া | র্সা ধা পা | মা পা মজ্ঞা | -া -া -া
ঘো ০ ০ র ত র র জ নী

---

* "শান্তিনিকেতন" পত্রের শ্রাবণ সংখ্যায় পূজনীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই গীতটির বহু প্রশংসা করিয়া সমালোচনা করিয়াছেন।

মা –া রা | রা রা –া | সা সা ন্‌া | সা সা –া I
এ, ০ স ম য়ে ০ প্রা ণ না থ, রে ০

I মা মা –া | –া –া –া | মা পা পা | ধপা– মজ্ঞা –া I
কো থা ০ ০ ০ য় গু ণ, ম ণি– ০০ ০

I জ্ঞমা জ্ঞমা রা | রা সা –া | সা রা না | সা –া –া II
ঘ ন, গ র জে ০ ঘ ন, শু নি ০ ০

II মা পা পা | না –া –া | না র্সা –া | –া –া –া I
ম য়ূ র ম ০ ত্ত ম য়ূ রী ০ ০ ০ ০

I র্সা র্সা র্সা | র্সা –া –া | র্সা –না –র্সনা | র্সা –া –া I
হ র ষি ত ০ ০ হে ০ ০ ০ রি ০

I পা পা পা | পা –র্সা ণধা | পা পা –া | –া –া –া I
চা ত ক চা ০ ত০ কি নী ০ ০ ০ ০

I মা –া রা | রা রা –া | সা সা ন্‌া | সা সা –া I
এ ০ স ম য়ে ০ প্রা ণ না থ রে ০

I মা মা –া | –া –া –া | মা পা পা | ধপা– মজ্ঞা –া II
কো থা ০ ০ ০ য় গু ণ, ম ণি০ ০০ ০

I জ্ঞমা জ্ঞমা রা | রা সা –া | সা রা ন্‌া | সা –া –া II
ঘ ন, গ র জে ০ ঘ ন, শু নি ০ ০

II মা পা –া | না না না | না –া –া | –া –া –া I
ক দ ম্ব, কে ত কী ০ ০ ০ ০ ০

I র্সা –া –া | র্সা র্রা –া | না –া –া | র্সা –া –া I
চ ০ ম্প ক ০ যূ ০ ০ থি ০ ০

I না র্সা র্সা | র্সা না –র্রা | র্সা র্রা –া | –া –া –া I
মৌ উ তি শে ফা ০ লি কে ০ ০ ০ ০

I ধা পা পা | ধা পা পা | র্সা পা ধা | পা পা –া I
আ গে তে প্রা ণে তে মো হ, জ ন মা য়

I মা ধা ধা | পা পা পা | মা মা –া | মজ্ঞা –া –া I
প্রা ণ, না থে, গৃ হে না, রে ০ থে ০ ০

কাওয়ালী I রা -মা মা মা | মা- পা পা পা | পধা -মা -া -া | পা -া -া -া I
বি ০ দ্যু ত খ ০ দ্যো ত জ্যো ০ ০ ০ তি ০ ০ ০

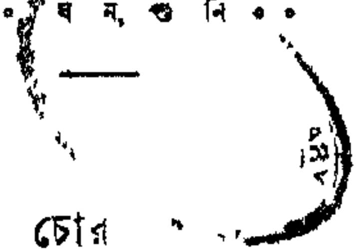
I ধা র্সা ধা পা | মা ধা পা মা | পা মা মজ্ঞা -া | -া -া -া -া I
দি বা ম ত, চ ম কে, দি ন, ম পি ০ ০ ০ ০ ০ ০

কাওয়ালী শেষ

I মমা -া রা | রা, রা -া | সা সা সা | না সা -া I
এ ০ স ম যে ০ প্রা ণ না থ বে ০

I মমা মা া | -া -া -া | মা পা পা | ধপা- মজ্ঞা -া I
কো থা ০ ০ ০ য় গু ণ, ম ণি ০ ০০ ০

I জ্ঞমা জ্ঞমা রা | রা সা -া | সা রা সা | সা -া -া II I
ঘ ন, গ র জে ০ ঘ ন, শু নি ০ ০



চোর

বাবুর বাড়ী চুরি হইয়াছে—মহা হুলস্থূল। কর্তার ঘর হইতে দশটা টাকা আর একখানা নোট পাওয়া যাইতেছে না। নইলে আর কি, চাকরদেরই কাজ। সন্দেহটা পড়িল কেষ্টার উপর। কেষ্টা কর্তার দেড়বছরের নাতিটার বাহন—বছর চোদ্দ বয়স। ফ্যাকাসে রং, ছিপ্‌ছিপে পাতলা চেহারা একমাথা ঝাঁকড়া চুল আর তার তলায় বড় বড় দুটো [illegible] চোখে চনমনে চাহনি।

ছোঁড়াটা যে কোথায় গিয়াছে তাহার কোনও পাত্তাই পাওয়া যাইতেছে না। হাজার হোক কাঁচা চোর—হজম করিতে না পারিয়া সরিয়া পড়িয়াছে আর কি। পুলিশে খবর দিলে কিনারা নিশ্চয় হয়, কিন্তু কে আর সামান্য এই দশটা টাকার জন্য আঠামো না করে! আর সে যাইবেই বা কোথায়? তাহার যা কিনা পড়িয়া আছে, কাপড় বিছানা—না হয় চটের বা সাত তালি একখানা খুঁট আর ছেঁড়া একখানা মাদুর—আছে ত।

কে রে! দরজার পাশে কে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে না?

"হাঁ হাঁ তাইত—দেখ্ দেখ্—"

"আরে!—এই যে কেষ্টা!"

"ব্যাটা গিয়েছিল কোথায় সমস্ত দিন—"

"বার কর ব্যাটা নোট—"

কেষ্টা হতভম্বের মত ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়াছিল যেন কিছু জানে না।

"ন্যাকা! দেখে পার পেয়ে যাবে মনে করেছ! দাঁড়া হারামজাদা—" চটাস্ করিয়া কেষ্টার গালে একটা চড় পড়িল।

"বল্ ব্যাটা টাকা কোথা—" কথা নাই।

বাড়ীতে ছিল নীতিকণ্ঠ, গ্রাম-সম্পর্কে কর্তার ভাইপো। কলিকাতায় সে চাকরী করিতে আসিয়াছিল। কিন্তু চাকরী করিত না —তামাক খাইত আর টেরী মেরামত করিত। সে যাই হোক এত সব চোখ ছ্যাঁচড় তাহার দুই চক্ষের বিষ। দুই হাতে উল্টা করা টেরীটা ঠিক করিতে করিতে আসিয়া সে বিরাশী শিক্কা ওজনের একটা চড় কেষ্টার গালে বসাইয়া দিল—"শালাঃ—"।

আর সঙ্গে সঙ্গেই ভিড় হইতে তিন হাত পিছাইয়া গিয়া টেরীটা দুই হাতে ঠিক করিতে লাগিল। সম্ভাবণটা হইয়াছিল অত্যন্ত আকস্মিক কেষ্টা তাহাতে ভয়ানক চমকিয়া উঠিল—যেন বিদ্যুতের একটা ঝলক তাহার শরীর বাহিয়া গিয়া মাটীতে প্রবেশ করিল। আর হতভাগাটা বোধ হয় মুখটা একটু ফাঁক করিয়াছিল নহিলে সামান্য একটা চড় দাঁত লাগিয়া ঠোঁটটা ঝাঁ কাটিয়া যাইবে কেন।

কিন্তু ইহাতেও কেষ্টা কথা কহিল না

চটাপট্—চটাপট্—গুম গাম, ধপ-ধাপ-ধপাস ঢিপ্—

অনেক চেষ্টা হইল কিন্তু সেই যে সে দরজার কোন ঘেঁসিয়া জালে-পড়া হরিণের মত চোখ দুটা লইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার ব্যতিক্রম হইল না। চোরাই মালের কিনারা করিতে আসিয়া বাড়ীর লোক ত দূরের কথা পাড়া-শুদ্ধ সকলে হাঁপাইয়া পড়িল তবু তাহার মুখ দিয়া একটা শব্দও কেহ বাহির করিতে পারিল না। আশ্চর্য্য।

কিন্তু মারের চোটে ভূত পলায় আর সামান্য একটা ছোঁড়া সিধা হইবে না? এতক্ষণ ডাল পড়িয়াছে কিছু হয় নাই, এইবার উত্তম-মধ্যম ঔষধ পড়িলেই ঠিক হইয়া যাইবে।

উত্তম-মধ্যম ঔষধ চলিতে লাগিল। চলিতে চলিতে রোগী ও রোজার দল দরজার কোণ হইতে উঠানে, উঠান হইতে দালানে, দালান হইতে বৈঠকখানায় আসিয়া উঠিল কিন্তু যথাপূর্ব্বম্ তথাপরম্।

"নাঃ ব্যাটাকে ভাল ভাবে পারা যাবে না—" নীতিকণ্ঠ বলিল—"হপ্‌লেস্।"

"দাও ব্যাটাকে পুলিসে—"

"না—না—পুলিসে দিয়ে কিছুই হবে না। দাঁড়াও না দুই ব্যাটার নখের ভিতরে ছুঁচ চালিয়ে—"

"আহা—হা—তোমরা কি সব কসাই নাকি গা—" পেন্সন-প্রাপ্ত রায়সাহেব বিষ্ণুবাবু এই কথা বলিয়া কেস্‌টা হাতে লইলেন।

চুরির ফলে ইহকালে বাহাই হউক না কেন পরকালে অনন্ত নরক। সেই নরকের কুম্ভীপাকে চড়াইয়া যমদূতেরা অনন্তকাল ধরিয়া যে ভীষণ যন্ত্রণা দিবে তাহার খবর পাইয়া উপস্থিত সকলেই শিহরিয়া উঠিল। পাড়ার বখাছেলে মেস্ত্রে কন্সার্ট পার্টির বাঁশী বাজান কেলিয়া মজা দেখিতে আসিয়াছিল। মুখফোঁড় ছোঁড়াটা চাপা গলায় বলিয়া ফেলিল—"আই উইট্‌নেস্।"

কথাটা যত আস্তেই হউক না কেন আফিম-সাধা কানে তাহা পৌঁছিল ঠিক।

—" বলিয়া বিষ্ণুবাবু তাঁহা হুঁকাটায় খুব জোরে জোরে টান দিতে লাগিলেন।

ধর্ম্মের কাহিনী শুনিয়া মহাপাতকাট

পরিত্রাণ পাইতে পাইতে মধ্য পথেই রহিয়া গেল, আর সে যে শুধু তাহারই জন্য— রমেশও এ কথাটা সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছিল। তাড়াতাড়ি ভুলটা শুধরাইয়া লইবার জন্য পোটাকয়েক অতি প্রাঞ্জল বিশেষণের সহিত তাহার ফুটবল-দুরন্ত পায়ের একটা লাথি সে কেষ্টার পাঁজরায় বসাইয়া দিল।

বিকট একটা চীৎকার করিয়া কেষ্টা পড়িয়া গেল। পড়িয়া এমন ভাব দেখাইতে লাগিল যেন দম বন্ধ হইয়া যায় আর কি! এটা ঢং না সত্যই—বুঝিবার পূর্ব্বেই দেখা গেল, সেখানে কর্ত্তার পুত্রবধূ উপস্থিত— বজ্রপাতের ফাটলের মধ্য দিয়া দেবীর আবির্ভাবের মত। সমস্ত মুখখানি তাঁর লাল, চোখ দুইটা দিয়া যেন আগুন ছুটিয়া বাহির হইতেছে! ঠোঁট দুইটা চাপা, নাকটা ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া নিশ্বাস পড়িতেছে! কেষ্টাকে হাত ধরিয়া তুলিয়া একরকম কোলে করিয়াই তিনি বাড়ীর ভিতর লইয়া গেলেন।

সারা বাঙ্‌লা দেশটা উৎসন্নে গেল এমনই করিয়া, এই সব বাঙালীর মেয়েদের জন্যই—তাহাদের মারাত্মক মায়ার লোকে না করিতে পারিল উন্নতি, না হইল পাপীর সাজা! পাড়ার লোকে হতাশ হইয়া চলিয়া গেল। কিন্তু তাই বলিয়া ত একটা চোরকে হাতে পাইয়া ছাড়া যায় না। আর মেয়েদেরও এমনভাবে চোরকে প্রশ্রয় দেওয়া কোন মতেই উচিত নয়।

তখন অন্দরের উপরে উঠিবার সিঁড়িতে বৌমা বসিয়া আর তাঁহার পায়ের কাছেই আর-একধাপ নীচে কেষ্টা বসিয়া-বসিয়া হাঁপাইতেছে আর মাঝে মাঝে শিহরিয়া উঠিতেছে। সামনে দাঁড়াইয়া বাড়ীর গিন্নী— নিস্তব্ধ গম্ভীর।

"আঃ, তোমাদের জ্বালায়—"

"বাস্—চলে যাও এখান থেকে। আমার উপরে কর্ত্তালি করতে হবে না—"

গিন্নীর এই তাড়নায় যে যার চুপ-চাপ সরিয়া পড়িল।

চুরির আর কিনারা হইল না।

২

কাঁসাই নদীর বাঁকের মুখে ছায়াচ্ছন্ন গ্রাম। তাহারই প্রান্তে তাল-তেঁতুলে ঘেরা কুঁড়েখানির উঠানে বসিয়া চাষার মেয়ে ধান ঝাড়িতেছিল। ছেলে তাহার কলিকাতায় চাকরি করিতেছে। তাহারই সংসারে লক্ষ্মীকে বাঁধিয়া রাখিবার জন্য বিধবা গতর খাটাইয়া উপায় করিত। সোনার চাঁদ ছেলে,—হ্যাঁর চৌদ্দ বৎসর বয়স হইলে কি হয়,—প্রতি মাসেই সে দুই টাকা তিন টাকা করিয়া পাঠায়। সে টাকার একটাও সে খরচ করে নাই, সবই ঘরের যে-কোণটিতে সে শোয়, সেই কোণে পিতলের ঘটীতে পুরিয়া পুঁতিয়া রাখিয়াছে। ছেলের বিবাহ দিয়া চাঁদপানা বৌ যখন সে ঘরে আনিবে, তখন সেই টাকায় আসল চাঁদী রূপার পৈঁছা, বিছা, বাউটী, খাড়ু, কসম তাবিজ গড়াইয়া গা ভরিয়া দিবে। তখন কি আর সে এমনই করিয়া পরের বাড়ীর ধান ঝাড়িয়া বেড়াইবে! তখন নাতিটিকে কোলে করিয়া দাওয়ার উপরে পা ছড়াইয়া দিন-রাত সে বসিয়া থাকিবে।

কোন্ সুদূরের স্বপন-দেশের অজানা আহ্-

হাওয়ায় গা ভাসাইয়া গরীব বিধবা এমনই করিয়া ধান ঝাড়িতে বিভোর ছিল। মাথার সূর্য্য কখন্ যে পশ্চিমের সেই বাঁধের তাল গাছটার পিছনে সরিয়া গিয়াছে, তাহা সে জানিতেও পারে নাই। খেয়াল হইল যখন মাধায়ের ছেলে রাখাল আসিয়া গড় করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"ভাল আছ ত বটে পিসি?"

রাখাল কলিকাতায় চাকরি করিত।

"ভাল আছি ও রাখাল—কখন এলি বাবা?"

"এই আলাম কৎখণ—তা বলি কি যাই একবার পিসিমার চ্যারণটা ছুঁযে আসি বটে, আর কেষ্টার খবরটাও—"

"কেষ্টার কি খবর রে, ভাল আছে ত সে?"

"আছেক ত বটে, তবে বাবুদের বাড়ী নাকি হাঙ্গামা হইছিলুক। তা হাঙ্গামা কিছু লয় বটে তবে ট্যাকা চুরি গিয়েছিল বটে। তা জান কি পিসি কলকাত্তার লোক তেনারা কসাই বটে। আহা, ছেলেটাকে যে মেলে, তা কইতে লারবে।"

"এঁ্যা—কাকে মারলে। আমার কেষ্টাকে—চুরি করেছিল সে?"

"তা লয় গো, তা লয়। চুরি করবেক ক্যানে? তার কাছেক ত পাওয়া যায় নি বটে। তা তেনারা নাকি বড় লোক বটে—"

"বল্ বাবা সব খুলে রাখাল—বাছা আমার আছে ত?"

"আহা মরবেক ক্যানে গো—তা ভাগ্যে বাবুর বৌ নাকি বার-বাড়ীকে এসে তাকে টেনে লিয়ে গিয়ে ছিলক বটে, তাই নাকি পরাণটা বেঁচে গেলক বটে। রামসদয় দা কইলেক গিন্নীমা তারে খাওয়া করায়ে শোওয়া করায়ে রাখলেক, তা ছুঁড়াটা মেতে উঠে কোথাকে যে গেছে—"

"কোথায় গেছে—তোরা কেউ একবার খোঁজ করলি না?"

"খুঁজবক নি ক্যানে। গটা মুলুকটা খুঁজা করেছি বটে তবে না আমি আইচি হ্যাথাকে। তা রামসদয় দা বড় দুখ্ করছিল বটে—আহা, ছুঁড়াটা গেলক জ্বর গায়ে—"

"এঁ্যা, এর উপর আবার জ্বর! জ্বর গায়ে গেছে? কে করি—"

"হাঁ গো জ্বর বলেক জ্বর, একেবারে ব্যাভ্রম বকাছিল বটে—"

মায়ের কেষ্টা,—মা না দেখিলে কে তাহাকে দেখিবে! গেলে আর কাহারও ত থাইবে না। হা-হুতাশ বন্ধ করিয়া বিধবা কলিকাতায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। তাহা দেখিয়া রাখাল বলিল, "ক্যানে, ক্যানে, এখন অত তাড়া ক্যানে! দুদিন পর আমিই যাব সেথাকে; আমার সাথেই যাবে বটে। কথাকে যাবে তুমি একাটি সে মুলুক?"

যার জিদে সে কথা কিন্তু তাহার রুচিল না, তখন সে একটু ক্ষুণ্ণ হইয়াই বলিল, "তবেক চল। আছে কথাকে সে। লুকিয়ে থাবেক কথাকে।"

৩

আকাশ-ভেদী বাড়ীর বেড়া-কাটাইয়া ভোরের সূর্য্য তখনও গঙ্গার জলে একটু উঁকি মারিতেও পারে নাই। পাড়াগাঁয়ের চাষার মেয়ে সেই সময় পুলে লোকের ভিড়ে হাবু-

ডুবু খাইতে খাইতে চলিয়াছিল। জাহাজঘাটে তাহায় যাওয়া চাই, কেষ্টাকে তাহায় পাওয়া চাই, এইমাত্র সে জানে। এইটুকু জানিয়াই চলিয়াছে—আগের লোকের পিছনে পিছনে।

ভোঁপ্—ভোঁপ্—ভোঁপ্, চং-চং-চং-হে-এ—এ—ষাগী—

লাওয়ার গাড়ী ঘোড়ার গাড়ী গরুর গাড়ী চারিদিক হইতে আসিয়া পড়িয়াছে। চাপা দিল বুঝি! সে তাড়াতাড়ি বাঁদিক্‌কার রাস্তাটায় ঢুকিয়া পড়িল।

ভরা জোয়ারে দুই কূল ছাপিয়া গঙ্গা বহিয়া চলিয়াছে—ঘাটে-ঘাটে মানুষের মেলা।

হে মা গঙ্গা, আমার বাছার দেখা যেন পাই মা—যেন প্রাণে-প্রাণে ফিরাইয়া পাই। রক্ষা কর মা, রক্ষা কর, আমার বাছাকে রক্ষা কর—

মায়ের প্রাণ কাঁদিয়া কাঁদিয়া সকল অন্তর দিয়া শুধু এই কথাই বলিতেছিল। আর চরণ দুইটা তার সেই সঙ্গে রেলের গাড়ীর মতই ছুটিয়াছিল—লোকের চাহনি টিট্‌কারী ধাক্কা গালাগালি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া—বিরাম নাই, শান্তি নাই, লক্ষ্য নাই। কোথায় চলিয়াছে, কে জানে!

সূর্য্য তখন বেশ প্রচণ্ড তেজে জ্বলিয়া উঠিয়াছে, দেশের লোক রামসদয়ের বাসায় একটা ছিন্ন মলিন বিছানায় কেষ্টা পড়িয়াছিল—জ্বরের ঘোরে একেবারে অচেতন। মা গিয়া কেষ্টাকে দুই হাতে টানিয়া বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিল।

"মা—" বলিয়া কেষ্টা একবার চোখ চাহিল—চোখের কোলে বড় বড় দুই ফোঁটা জল!

"বড় বেদনা—" কেষ্টা আবার চোখ মুদিল। তাহার সকল অঙ্গ কাটিয়া ছড়িয়া ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গিয়াছে। চোখ দুইটা জবাফুলের মত লাল। বাছারে—! কেষ্টার সর্ব্বাঙ্গে মা আপনার স্নেহ-হস্তের সোনার পরশ বুলাইয়া দিল!

কেষ্টা আবার চোখ মেলিয়া চাহিল—ডাকিল, "মা—বড় তেষ্টা।"

"এই যে বাবা, জল—" মা জল দিল; জল খাইয়া কেষ্টা চক্ষু মুদিল।

মায়ের কোলে মাথাটী রাখিয়া কেষ্টা নিঝুম হইয়া ঘুমাইয়া পড়িল। আর তাহারই গায়ে ধীরে ধীরে হাত বুলাইতে বুলাইতে মা তাহার ভাবিতেছিল, বারো বছর আগেকার সেই রাতটির কথা—

শ্রাবণের কাজল-পরা আঁধার কাটিয়া আকাশ ভাঙিয়া দেবতা নামিয়াছিল, তখন সে দুই বছরের ছেলেটাকে কোলে লইয়া মরণোন্মুখ স্বামীর পাশে বসিয়া। ছেলের বুকে শিথিল হাতখানি রাখিয়া আর-একখানি হাতে তাহার হাতটী ধরিয়া চাষা যখন বলিল,—ওরে যেমনই থাকিস্, ছেলেটাকে মানুষ করিস্ রে। তখন সে—

"উ-হু-হু—" চমকিয়া জড়-সড় হইয়া কেষ্টা চীৎকার করিয়া উঠিল।

"—কি—কি—কি হয়েছে বাবা?"

"চুরি করি নি—আমি চুরি করি নি—"

"না—না—কে বল্‌লে চুরি করেছ—তুমি আমার সোনার [illegible]।—"

[illegible] তোমার ছেলেকে এমনই করিয়া [illegible]কলের [illegible]তে সে তাড়িয়া দিয়াছিল [illegible] সে কি

মা? না সে ডাইনী? কেন সে টাকার লোভ সামলাইতে পারিল না? কেন সে পাঁচজনের কথা শুনিয়া—

"ওগোঃ—ওগো বাবা গোঃ—গেছি গো—আমি মা—আমি মা—"

হঠাৎ চাবুক মারিলে যেমন করিয়া মানুষ চমকিয়া উঠে, তেমনই চমকিয়া কেষ্টা মায়ের বুকে মুখটা গুঁজিয়া দিল। সমস্ত দেহ তাহার শক্ত কাঠ, থর্‌থর্‌ করিয়া কাঁপিতেছে। ছেলের মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে মা তখন একমনে ডাকিতেছিল,—ঠাকুর, হে ঠাকুর—

৪

বাড়ীর কাঠের আসবাবগুলা মেরামতের জন্য মিস্ত্রী লাগিয়াছিল। বাবুর বৌমা শ্বশুরের টেবলটা পালিস করিতে দিবার জন্য দেরাজগুলা একে একে খালি করিতেছিলেন। ওদিককার দেরাজটা টানিয়া বাহির করিতেই খস্‌ করিয়া কি একটা কাগজ মাটিতে পড়িয়া গেল। বুঝি-বা কোন চিঠিপত্র! দেরাজটাকে মাটিতে নামাইয়া রাখিয়া কাগজখানা উঠাইতেই দেখা গেল, সেটা একটা নোট।

তাইত, একখানা দশ টাকার নোটই যে! তখন সকাল বেলায় মিঠা রৌদ্র জানলার ফাঁকে আসিয়া নোটখানার ভিতরকার জলের অক্ষরগুলাকে পর্য্যন্ত উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিল। আর তার সেই উজ্জ্বলতা ছাপাইয়া নোটের সকল বর্ণ-বৈচিত্র্য ভেদ করিয়া আরও স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিয়াছিল, একখানি মুখ। ঝাঁকড়া একমাথা চুল আর তার তলায় বড় বড় দুটো জলজলে চোখ।

নোটখানা হাতে লইয়া কাজ বন্ধ করিয়া বৌমা অন্যদিকে মুখ ফিরাইলেন। কিন্তু চোখ দুইটা তাঁহার জানিবার পূর্ব্বেই সেই নোটখানার উপরই গিয়া পড়িল। তখনো তাঁর চোখের সামনে ভাসিতেছে, সেই একখানা মুখ—কালিশিরা-পড়া, ক্ষত-বিক্ষত,—আর জ্বলে-পড়া ছবিশেষ মধ্যে বড় বড় দুইটা চোখের মর্ম্মঘাতী চাহনি। বৌমার চোখে এক ফোঁটা জল আসিয়া জমিল, সেই ফোঁটা বড় হইয়া ছিটকাইয়া নোটের উপর পড়িল। বৌমা নোটের পানে চাহিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিলেন। হায়রে—দুঃখিনীর ধন! নিরপরাধ বেচারা!

শ্রীনরেশ দত্ত।

সিমলার কথা

বেলা পাঁচটার সময় Summer Hill—যেখানে Viceroy থাকেন, তথায় আসিয়া আমাদের ট্রেণ পৌঁছিল। তার পর বেলা সাড়ে পাঁচটার সময় আমরা সিমলায় পৌঁছিলাম।

ষ্টেশন হইতে একখানি রিক্সা ভাড়া করিয়া তাহাতে মালপত্র তুলিয়া দিয়ে চাপিলাম। রিকসার সামনের দিকে চারজন কুলি, পিছন দিকে দুইজন। কুলিতে রিক্সা ঠেলিয়া পাহাড়ের উপরকার রাস্তা দিয়া টানিয়া লইয়া চলিল। আমার পিছু পিছু

আরো কত রিক্‌শাতে চাপিয়া সাহেব-মেমেরা ভিন্ন ভিন্ন হোটেলে যাইবার জন্ত আসিতেছে। আমি Ambrosia অর্থাৎ হিন্দু হোটেলে আসিয়া পৌঁছিলাম। রিক্‌শার ভাড়া দিলাম, সাড়ে ছয় টাকা।

এখানকার সব বাড়ী কাঠের ও ইটের; শীতপ্রধান দেশ বলিয়া কাঠের বাড়ী। জানালাগুলি সমস্ত কাঁচের,—যেমন বিলাতের বাড়ীতে থাকে সেই রকম প্রত্যেক জানালার ভিতর দিকে পর্দা দেওয়া আছে। ঘরের মেজেগুলি কাঠের, তাহা কার্পেট দিয়া ঢাকা। ঘরে অগ্নিকুণ্ডের ব্যবস্থাও আছে। এই হিন্দু হোটেলে টেলিফোঁ আছে, প্রত্যেক ঘরে ইলেকট্রিক্ আলোও আছে। যত ইচ্ছা, গরম জল পাওয়া যায়; হোটেলটী সাহেবী ধরণের, কাঁটা-চামচের সাহায্যে খানা খাইতে হয়; হিন্দু হোটেল কেবল নামেই।

এখানকার অধিকাংশ বাড়ীরই নাম আছে। এখানে রাস্তায় প্ল্যান্ টাঙ্গানো থাকাতে পথিকেরা কোথায় কি আছে তাহা সহজেই বুঝিতে পারেন এবং হাঁটিতে হাঁটিতে শিমলার কোন্ প্রান্তে আসিয়াছেন, তাহাও জানিতে পারেন। কোন্ রাস্তায় কোন্ সময় বৈদ্যুতিক আলো জ্বালা হয়, তাহাও লেখা আছে। সন্ধ্যার পর Carleton Hotelএর নিকট হইতে দাঁড়াইয়া সহরের বাড়ীগুলির পানে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে মনে হয় যেন পাহাড়ের গায়ে দেওয়ালি হইতেছে! একই ধরণের অসংখ্য বাড়ী পাহাড়ের গায়ে রহিয়াছে, প্রত্যেক বাড়ী হইতে আলো আসিতেছে—তখন কি সুন্দর দেখাই যে হয়

বৃষ্টি এখানে প্রায়ই হয়। পাহাড়ের আশে পাশে মেঘেরা বাসা করিয়া থাকে। যখন তাহাদের ইচ্ছা হয়—চল, আমরা দল বেঁধে এক হয়ে জল ঢালি অমনি কোথাও কিছু নাই, দেখিতে দেখিতে মেঘেরা সব এক হইয়া যায়, আর বর্ষা নামে। এ বৃষ্টি বেশীক্ষণের জন্ত হয় না। একে ত খুবই শীত, তার উপর আরো ঠাণ্ডা পড়ে। আবার খানিক পরে সূর্য্যোদয় হয়।

একদিন এখানে খুব শিলা বৃষ্টি হইল, শিলাগুলি আট ঘণ্টার মধ্যেও গলিয়া গেল না, সে দিন খুব ঠাণ্ডা ছিল।

এখানে ঘোড়ার গাড়ী সব রাস্তা দিয়া যায় না, কারণ রাস্তা সব উচু-নীচু, এবং সে জন্ত ঘোড়ার গাড়ী ভাড়াও মিলে না। তবে যাহারা বড় লাটের অতিথি হইয়া থাকেন, তাঁহারাই ঘোড়ার গাড়ী চড়ার সুযোগ পান। রাস্তায় দেখি কেবল রিক্‌শা ছুটিতেছে, আর ঘোড়া ও মানুষ চলিয়াছে। কোন রিক্‌শাতে ইংরাজ মহিলা চলিয়াছেন, স্বামী তাঁহার পাশে পাশে পদব্রজে—কখন দেখি স্ত্রীর রিক্‌শা আগে চলিয়াছে, তার পাছু পাছু স্বামীর রিক্‌শাও চলিয়াছে, কারণ পাশ্চাত্য সভ্যতার—"beauty before bright।" কখন দেখি কোন ইংরেজ মহিলা নিজের শিশুকে কোলে লইয়া রিক্‌শা চাপিয়া বায়ু সেবন করিতেছেন, গলা হইতে পা অবধি র‍্যাগ্ দিয়া ঢাকা। সন্ধ্যার সময় ছোট শিমলার পথে কেবলই রিক্‌শা ছোটে, কোনটায় সাহেব, কোনটায় বা মেম—রিক্‌শা কুলিগুলি ছোটার দরুণ ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতেছে, আর আরোহীরা তাহাদের নিশ্বাস-মিশ্রিত

বায়ু সেবন করিতেছেন। ইহাতে স্বাস্থ্যের যে কি উন্নতি হয়, তাহা বুঝি না। দু'একটি বাঙালী মহিলাকেও রিক্সা চাপিয়া যাইতে দেখিয়াছি কেহ কেহ হাতে একখানা বইও লইয়াছেন। অধিকন্তু অবার বাঙালী মেয়েদের পদব্রজে হাঁটিয়া বেড়াইতেও দেখিয়াছি —শীতে জড়সড়, বৃষ্টি পড়িতেছে, water-proof over-coat-এ গাঁ ঢাকিয়াছেন—বেশ দেখাইতেছিল।

সাহেব মেমের ঘোড়ায় চড়া বৃষ্টিতেও বন্ধ হয় না। কোন মেম জিনের দুইদিকে দুই পা ঝুলাইয়া ঘোড়া ছুটাইয়া চলিয়াছেন! এখানে দেখি ঠাণ্ডার দিনেও ইংরাজ মহিলারা গলা ও প্রায় অর্দ্ধেক খোলা গাউন পরিয়া বাহির হন। কাহারো কাহারো গলায় খরগোসের বা বাঘের চামড়ার কম্ফর্টার ঝোলে, পায়ে গ্রীষ্মকালের মোজা। শুনিতে পাই যে ইঁহারা মদ্যপান করিয়া ঠাণ্ডার হাত এড়ান। মদ খাইলে শরীর নাকি গরম হয়, সেজন্য ইঁহারা এত ঠাণ্ডাতেও ঐরূপ পোষাক পরিয়া শীত সহ্য করিতে পারেন।

পার্শি মহিলাদেরও পদব্রজে বেড়াইতে দেখিয়াছি, তাঁহারা ভেলভেটের বড় বড় দেওয়া ওভার-কোট গায়ে দিয়া বাহির হন। এখানে বিস্তর পাঞ্জাবী মহিলা আছেন। তাঁহারা দিনেও রাস্তায় বেড়ান, তাও আবার ঘোমটায় মুখ ঢাকিয়া। তাঁহাদের পায়ে জুতা, মোজা, দশ-বারো গাছা কাবিয়া মল। অত্যন্ত শীত অনুভব করেন বলিয়া তিন-চারিটি পেটীকোট পরেন, পিঠের দিকে ওড়না ঝুলানো থাকে। রাত্রি ৯টা-১০টার পর বেড়াইতে বাহির হইলে দেখি, যত পাঞ্জাবী মহিলা দল বাঁধিয়া বাহির হইয়াছেন, জুতা পায়ে, গায়ে রঙিণ ওড়না—ঘোমটা টানিয়া; কেহ বা ইজের পরেন, তার উপর পেটীকোট। কেহ ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, কেহ বা ছেলে কোলে লইয়া "Mall"এ যত দোকান সাজান আছে সেই সব দেখিয়া বেড়াইতেছেন। একদিন দেখি, একটি মহিলা ঘোমটা টানিয়া ঘোড়ায় চড়িয়া আসিতেছেন, সঙ্গে পদব্রজে তাঁহার স্বামী। নিজেদের গন্তব্য স্থলে আসিয়া পৌঁছিলে স্বামী ঘোমটা দেওয়া স্ত্রীকে কোলে করিয়া ঘোড়া হইতে নামাইয়া লইলেন। পঞ্জাবী মহিলারা যেমন হৃষ্টপুষ্ট, দেখিতেও তেমনি সুশ্রী।

হিমালয়ের আর্য্য পাহাড়ী মেয়েদের নাকে মস্ত বড় একটি তেকোণা গহনা ঝোলে। সকল মেয়েরাই ইজের পরে, কাল পোষাকের ইজেরই বেশীর ভাগ পরে, কারণ শীঘ্র ময়লা হয় না। প্রায় সকল কুলিমেয়েদের পায়েই জুতা। সকল কুলিমেয়েদের এক-এক কানে ১০।১২টা করিয়া মাকড়ী। আমি এক একটি মেয়ের কানের মাকড়ী গণিয়া দেখিয়াছি। তাহারা পাহাড়ে পুরুষের কাজ করে। কেহ বা সমস্ত দিনই পাথর ভাঙ্গিতেছে। কাহারো পিঠে ঝুড়ি বাঁধা আছে, ভাঙ্গা পাথরের টুকরাগুলি ঝুড়িতে বোঝাই করিয়া অন্যস্থানে লইয়া যাইতেছে। কেহ বা আয়া-গিরি করে। ও-রকম আয়ারা বেশ ভাঙ্গা ইংরাজীতে কথা বলে। এক একটী আয়ার বেতন মাসে ৩৫ টাকা, ইহা ছাড়া তাহাদিগকে কাপড়ও দিতে হয়, খাওয়া দিতে হয় না। ঠাণ্ডায় তাহাদের ও এখানকার সব মেয়েদের গায়ের বর্ণই একেবারে লাল টকটকে হইয়া ওঠে।

এখানকার পুরুষ কুলিরা দড়ির সাহায্যে



সিমলা বাজার ও গির্জ্জা

পিঠে মোট বয়। একদিন দেখি দু'টী কুলির পিঠে একটি পাথরের 'চাপ' চাপানো হইয়াছে। তাহারা উঠিতেছে আর মধ্যে মধ্যে কাহারো বাড়ীর রোয়াকে চাপ নামাইয়া খানিকটা হাঁফ জিরাইয়া লইতেছে। একদিন দেখি একটা বড় আলমারিয়া একজন কুলি পিঠে বাঁধিয়া লইয়া চলিয়াছে। সেখানকার রাস্তা এক বাঙ্‌লা দেশের মত সোজা নহে, কাজেই উঁচু-নীচু রাস্তা দিয়া যাইতে হইলে এই রকম করিয়াই মোট লইয়া যাইতে হয়। একদিন দেখি কতকগুলি কুলি পাহাড় হইতে বরফের "চাকি" পিঠের ঝুড়িতে লইয়া যাইতেছে, তাহাদের গা দিয়া বরফ-জল ঝরিয়া পড়িতেছে। একদিন দেখি আমাদের হোটেলের সামনে একটী ডুলিতে করিয়া এক মুসলমান মেয়েকে কয়জনে কাঁধ বদলা-বদলি করিয়া লইয়া চলিয়াছে—এসব দেখিতে বেশ মজা লাগে! কোন কোন hill station এ পারাম্বুলেটার গাড়ী চলে না, সে জন্য ছোট রকমের খাটে শিশুর বিছানা করা আছে, তাহাতে শিশুকে শোয়ান হয়, ও দুইদিকে দুইজনে বাঁশ কাঁধে লইয়া শিশুর খাট তুলিয়া শিশুকে হাওয়া খাওয়ায়। যখন মুখে রোদ লাগে, ছাতাটা মাঝখানে বাঁধিয়া দেয়। কোন কোন পাহাড়ী মেয়ে পাহাড়ে উঠিবার রাস্তা দিয়া যাইবার সময় নিজের শিশুকে পিঠে কাপড় ফেলিয়া তাহার মধ্যে ঝুলাইয়া লইয়া যায়, শিশুও বেশ আরামে ঘুমাইতে ঘুমাইতে যায়।

এক-এক জায়গায় ২০০ সিঁড়ি ভাঙিয়া রাস্তায় চলা-ফেরা করিতে হয়। একদিন আমাকেও ২০০ সিঁড়ি ভাঙিয়া এক পাহাড়ে বাড়ীর নীচু হইতে আর-এক বাড়ীর উপরে উঠিতে হইয়াছিল। কেহ যেন সিঁড়িতে উঠিতেছে, আর-এক একবার কোমরে হাত দিতেছে, অমনি হাঁপাইয়া পড়িতে হয়।

জায়গাটি স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল স্থান।



যক্ষ মন্দির ও বানর

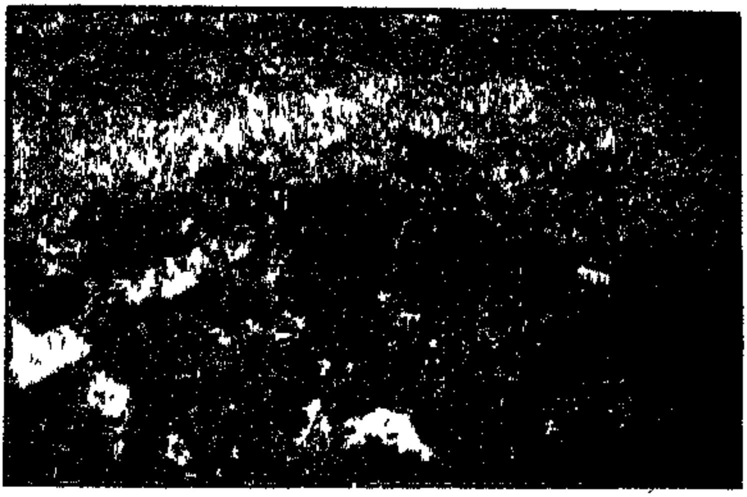
"Burnes court"—এখানে পাঞ্জাবের ছোটলাট বাস করেন।

"Jesus and Mary's Convent" দেখিলাম, অনেকটা জায়গা লইয়া স্কুল ও বোর্ডিং হাউস্ হইয়াছে। অনেক মেয়ে-বোর্ডার এখানে আছে।

"Lady's ride"—অর্থাৎ এক মাইল ঘুরিয়া বেড়াইবার রাস্তা। সেই রাস্তার মধ্যে মধ্যে বেঞ্চ আছে, এই সব বেঞ্চে প্রায়ই তরুণ-তরুণীরা ভিড় করিয়া বসিয়া গল্প করে।

"Orphanage" দেখিলাম। এখানে বড় অনাথ রহিয়াছে। ইংরাজ ছেলেমেয়েদের সুখের জন্ম যত রকমের বন্দোবস্ত সিমলাতে আছে, ভারতীয়দের জন্ম তাহার কিছুই নাই।

"Jakko height—" "মলে"র উপর যে গির্জা আছে, তাহার পাশ দিয়া ঘুরিয়া অনেক উচ্চে যক্ষ পর্ব্বত বা জ্যাকো হিল্স্। এখানে যক্ষ মন্দির আছে। ছবি হইতে বুঝিতে পারা যায় যে মন্দির খুবই ছোট। সেখানকার একজন লোক বলিল যে মন্দিরের মধ্যে মহাবীরের মূর্ত্তি আছে। যখন পৌঁছিলাম তখন তিনটী সাধুকে ধ্যানমগ্ন দেখিলাম। বাহিরে দুটী পাথরের পাদুকা, একটী বড় ও একটী ছোট বাঁধাইয়া রাখা হইয়াছে। অনেক বাঁদর এখানে আছে, তাহারা বেশ নির্ভয়ে আমাদের কাছে আসিল। (ছবি দেখুন) দেওয়ালে লোকের নাম খোদাই আছে,—তবে বেশী নহে। আমিও নিজের নাম কাঠের দেওয়ালে লিখিয়া রাখিলাম। কলেজের Herbaruim র জন্ম কিছু গাছপালা সংগ্রহ করিয়া লইলাম। এখানে পানীয় জল অনেক দূর হইতে আনিতে হয়। অনেক দূরে ও এত উপরে উঠা কষ্টকর বলিয়া বেশী লোক এ মন্দির দেখিতে আসে না। মিকুলা করিয়া



যক্ষ মন্দির যে পাহাড়ে সেইদিককার দৃশ্য

আসা যায়, তবে রিক্সা কুলিগুলিকে খুবই কষ্ট দেওয়া হয়, তাছাড়া রিকসায় ভাড়াও বেশী পড়ে।

সিমলায় "মলে"র রাস্তা ধরিয়া বেড়াইতে বাহির হইলে পাশ্চাত্য মেয়েরা কত রকমের পোষাক পরেন, কত রকমের সৌখীন জাপানী ছাতা ব্যবহার করিতেছেন, কত রকমের সিমলার মতির মালা পরিয়া নিজেদের সৌন্দর্য্যকে আরো বাড়াইতেছেন, সেই সব দৃশ্য চোখে পড়ে। য়ুরোপীয় মহিলার ব্রাহ্ম ধরণের শাড়ী পরিয়া বেড়ানোর দৃশ্যটা খুবই দেখা যায়। আর ইংরাজ সৈন্য যত আছে, তাহারা বেড়াইতে বাহির হইলে, তাহাদের হাত ধরিয়া একটি না একটী যুবতীকে ঝুলিতে দেখি। তাহাদিগকে "Sweet-heart" করিয়া রাখিবার জন্য ঐ সমস্ত সৈন্যদিগকে মধ্যে মধ্যে ইংরাজদের দোকানে লইয়া যাইয়া 'এটা' 'ওটা' কিনিয়া উপহার দিতেও হয়, ও restaurantএ খাওয়াইতেও হয়। এ সব দেখিয়া মনে হয়, সিমলা যেন ছোট রকমের বিলাত।

বড়লাটের Summer Residenceএর পাশ দিয়া গিয়া Boileguny পুলিশ ষ্টেশন ছাড়িয়া বিখ্যাত Prospect Hill। ইহাও কম উঁচু নহে। এখানে কামনা দেবীর মন্দির দেখিলাম। মন্দিরের মধ্যে দেবীমূর্ত্তি। একজন সাধু বলিল, এ মন্দির কাশীর মন্দিরেরও আগে তৈয়ারী হইয়াছে। রাস্তায় একজন লোক বলিল, যে-ব্যক্তি যা-কামনা করিয়া মন্দিরে আসে, তাহার সেই কামনাই পূর্ণ হয়, ও সেজন্য ইহার নাম "কামনা-দেবী"। তিনটা পাহাড়ী মেয়েকে মন্দিরের পাশে বিশ্রাম করিতে দেখিলাম, তাহারা সিগারেট ফুঁকিতেছিল। শুনিতে পাই, এই সব পাহাড়ী মেয়েদের চরিত্র অতি খারাপ।

"Lover's walk" নামে একটী রাস্তা



সেক্রেটারিয়াট বিল্ডিং ; প্রস্পেক্ট হিল্

দেখিলাম, সেই রাস্তা ধরিয়া বরাবর Race Courseএ পৌঁছানো যায়।

এখানে হিমালয়ের নব বিধান সমাজের ব্রহ্ম মন্দির দেখিলাম। ইং ১৮৮৬ সালে স্থাপিত।

সিমলায় বাঙ্গালীরা আসিলে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিবার স্থান পায় না। এই হিন্দু হোটেল (Ambrosia) ভিন্ন আর গতি নাই বলিলেই হয়। যে সব বাঙ্গালীরা আছেন, তাঁহাদেরও অপর কাহাকে স্থান দিবার মত অতিরিক্ত ঘর থাকে না। এখানে বাড়ী ভাড়াও সব সময় পাওয়া যায় না—পাওয়া গেলেও ভাড়া খুব বেশী। য়ুরোপীয়ান্ হোটেল আছে, তবে তথায় দিন ১০৲ টাকা দর লয় ; তাও আবার হোটেলে ভারতীয়দের থাকিতে দেয় না। এখানে সমস্ত জিনিষই আক্রা। একটি রুমাল কাচাইতে আমার ৶০ আনা খরচ হইল। বুট জুতা পালিশ করাইতে ৵০ আনা। মাছের সের ১।০ বা ১॥০ টাকা। দুধ টাকায় /২॥০ সের। একটি চাকর রাখিতে হইলে তাহাকে মাসে ১৫৲ মাহিনা ও তাহার উপর তাহাকে খাওয়া দিতেও হয়। এখানে কাঁচা আম বিক্রয় হয়, ফেরিওয়ালা হাঁকিয়া বলে—"আম কাচ্চা, চাটনি আচ্ছা।" সিমলা বাজারে সব রকম জিনিষই বিক্রয় হয়। ডিম চালান হইয়া আসে। এক একটি মুর্গির ডিমের দাম কখন /৫ আনা, আবার কখন বা ৵০ আনা।

সিমলা একটা বৃহৎ কারবারের জায়গা হইয়া উঠিয়াছে। যত ভিন্ন ভিন্ন জাতি ব্যবসায়ের জন্য আসিয়াছে, ব্যবসায়ে টাকা করিতেছে ; শুধু বাঙ্গালীরাই কেরাণী-গিরিতে নিযুক্ত। কেরাণীর কাজে বেশী মাহিনাও হয় না, কোন রকমে কষ্টে অফিসারদের মেসে থাকিয়া দিন গুজরান্ হয়। একজন পাঞ্জাবী

আমাকে বলেন, "দেখুন, বেশীর ভাগ আমার পাঞ্জাবী তাহারা এখানে ব্যবসা করছে, আর আপনার দেশের বাঙ্গালীরা এখানে খালি কলম ঠেলছে, ব্যবসা করতে চায় না।" কথাটা সত্য।

সিমলায় কয়েকটী কারবার আমরা বাঙ্গালীরা বেশ ভালরূপে চালাইতে পারি। যদি কেহ কারবার করিতে চান, আমাকে পত্র লিখিলে বিস্তারিত জানাইতে পারি।

শ্রীসত্যশরণ সিংহ।

চাঁদের আলোয়

হাওয়ায়-কাঁপা কনক-চাঁপা আন্ তুলে,
রেশমি-কালো মিশ্‌মিশে ঐ পশ্ চুলে;
সুর্মা এঁকে চোখ-দুখানি কর্ কালো,
মেঘের কোলে বিজলী যে গো আয় আলো!
চুপিয়ে নে তোর পাংলা সাড়ী লাল রংএ,
ভুলিসনে পায় আলতা দিতে ভুলক্রমে,
সোনার হাতে সাজ্‌বে সরু জল-চুড়ি,
ফুলঝুরি গো ওগো রূপের ফুলঝুরি।

হীরের বালা মোতির মালা ঝকমকে—
নেই বলে কি কাঁদবি সখি সেই শোকে?
দুধের মত উথলে-ওঠা জোছনা,
সোনার রঙে আঁকবে গায়ে আল্পনা।
পরীরা সব দেখবে তোরে চোখ চেয়ে—
উপচে-পড়া রূপখানি তোর দিক ছেয়ে;
মলয়-অনিল করবে পাখা হয়-খাড়,
অপ্সরী গো ওগো আমার অপ্সরী!

এই বেলা চল্ বেলাবেলি যাই ছাতে,
উঠবে যে চাঁদ সকাল সকাল আজ রাতে;
টিপ্ দিতে যে ভুল করেছিস্, দূর বোকা!
ছোট্ট করে টিপ কেটে নে—কাঁচ-পোকা,
এলাচ দিয়ে পান্ খেয়ে নে একাখিলি;
লাল রং আর লাল ঠোঁটে তোর নাই মিলি।
মাথা বহুং শালটি নরম একবারে
টাটকা-তোলা ফুল-পরাগের পাউডারে।

উঠবে গো চাঁদ সকাল সকাল,—চল্ ছাতে,
কইতে আছে অনেক কথা আজ রাতে;
প্রেমের কথা একটিও সই ভুল্‌বো না,
নিবিড় কালো কেশের রাশি খুল্‌বো না,
নেহাৎ যদি ভুল ক'রে সই ভুল করি,
সোহাগিটা মাপ করিস্ গো পায় ধরি;
তোর মুখেতে চাঁদের সুধা পান ক'রে
ইচ্ছেটা হয় চাঁদের আলোয় যাই মরে।

শ্রীকিরণধন চট্টোপাধ্যায়।

বারোয়ারি উপন্যাস

অরুণের মুখে শাশুড়ীর ওই দুর্দ্দান্ত অসুখের কথা শুনে কমলার দুচক্ষু ছল্ ছল্ করে এল। এবং, বিশেষ করে, সে যখন জানালে যে জামাই বাবু নিরুদ্দেশ, হয় ত বা তিনি এখন হিমালয়ের কোন গুহার মধ্যে তপস্যায় নিযুক্ত, এবং তাঁকে একটা সংবাদ দেওয়া পর্য্যন্ত সম্ভবপর নয়, তখন সেই দুটি চোখ দিয়ে বড় বড় অশ্রুর ফোঁটা ধারা বয়ে নেমে এল।

হঠাৎ কি কারণে যে সতীশ সংসার ত্যাগ করে চলে গেল, এ কথা মনে মনে সবাই বুঝলে, কিন্তু, মুখ ফুটে কেউ উচ্চারণ পর্য্যন্ত করতে পারলে না।

অরুণ বললে, শুধু কি এই? ডাক্তারের কাছে শুনে এমন দুর্নামের ভয়ে পাড়ার কেউ শুশ্রূষা পর্য্যন্ত করতে রাজি নয়। একে ত ওদের গ্রামে মানুষের চেয়ে জানোয়ারই বেশি, তার ওপর যদি এই উৎপাত হয় ত বুড়ি বে-ঘোরেই মারা যাবে।

কমলা আঁচলে চোখ মুছে অশ্রুরুদ্ধ স্বরে জিজ্ঞাসা করলে, হাঁ অরুণ, মা কি তবে একলাই পড়ে আছেন? মুখে একফোঁটা জল দেবারও কি কেউ নেই?

অরুণ বললে, অবস্থা ত তাই বটে,— আমাকে ত একরকম দোর ভেঙেই বাড়ী ঢুকতে হয়েছিল, তবে, আজ রাত্তিরের মত একটা বন্দোবস্ত করে এসেচি, ডাক্তারবাবু তাঁর হিন্দুস্থানী দাসীটাকে পাঠিয়ে দেবেন ভরসা দিয়েছেন।

যাক্, বাঁচা গেল! বলে হরেন একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললে, রাতটা ত কাটুক,— ভোর পাঁচটায় একটা ট্রেণ আছে, আমরা তাইতে বেরিয়ে পড়লে সকাল নাগাদ কমলাকে পৌঁছে দিতে পারবো।

ক্ষিতীশ এতক্ষণ পর্য্যন্ত চুপ কোরেই ছিল, মুখ তুলে বললে, কমলাকে নিয়ে যাবে? হঠাৎ ওঁকে নিয়ে গিয়ে কি সুবিধে হবে ভাবেন?

বাঃ,— সুবিধে হবে না? সতীশ যখন নেই, তখন, শাশুড়ীর সমস্ত দায়িত্ব ত এখন ওরই। ঘা'টা দেখবে কে? শুনলে ত গ্রামের মেয়েরা দুর্নামের ভয়ে বুড়ীর কাছে ঘেঁসতে পর্য্যন্ত রাজি নয়। কে সেবা করে, বল্ ত?

ক্ষিতীশ লোকটি অত্যন্ত বিচক্ষণ ব্যক্তিও নয়, আগাগোড়া ভেবে-চিন্তে হুঁসিয়ার হয়ে কাজ করাও তার স্বভাব নয়, কিন্তু ভিতরের একটা গোপন বেদনা কিছুদিন থেকে ওই দিকের দৃষ্টিকে তার অত্যন্ত প্রখর কোরে তুলেছিল, সে ক্ষণকাল চুপ কোরে থেকে বললে, কথাটা ঠিক সত্যি নয়, হরেন। আমার মনে হয় তাঁর অসুখের খবর পাড়ার মেয়েরা জানেন না। কারণ আমার নিজের বাড়ীও ত পল্লীগ্রামে, সেখানে বাপের বাড়ী থেকে বৌ হারিয়ে গেলে শাশুড়ীর জাত যেতে আমি আজও দেখিনি, এবং এই দোষে পাড়ার মেয়েরা পীড়িতের সেবা করেন না, এত-বড় কলঙ্কও তাঁদের দেওয়া চলেনা হরেন।

অভিযোগটা, হরেনের নিজের গায়েও

বঁধল। সে লজ্জিত মুখে জবাব দিলে, বেশ ত ক্ষিতীশ, সেবা না হয় তাঁরা করতে পারেন, কিন্তু তাই বলে এত-বড় একটা টাইফয়েড রোগের সেবাও তাঁরা নিয়মিত কোরে যাবেন, এত-বড় বোঝাও ত তাঁদের চাপানো যায় না, ভাই।

ক্ষিতীশ বললে, ওটা যে টাইফয়েড তাও নিশ্চয় বলা যায় না। অন্ততঃ, একটা দিনের জ্বরকে অত-বড় একটা নামের ঘটা দিয়ে না ডাকাই ভাল হরেন।

হরেন চিন্তিত মুখে প্রশ্ন করলে, তাহলে কি করা যায় বল?

এতক্ষণ পর্য্যন্ত অরুণ বড়দের কথায় কথা কয়নি, চুপ কোরেই শুনছিল, এবার বলে উঠলো, দিদির শাশুড়ী সকাল থেকে জ্বরে বেহুঁস, এই আমি শুনে এসেচি, কিন্তু জ্বরটা যে কেবল আজই হয়েছে তাও ত জানিনে। হয় ত বা ক'দিন থেকে—

ক্ষিতীশ কথাটা তার শেষ করতেও দিলে না, কানেও নিলে না, বললে, তা'ছাড়া একটা বড় কথা আছে হরেন। তাঁর সামান্য জ্বর হয় ত দু'চার দিনেই সেরে যাবে, কিন্তু মাঝখানে সহসা কমলাকে নিয়ে গেলে পল্লীগ্রামে কত-বড় একটা সামাজিক বিপ্লবের সৃষ্টি হতে পারে, ভেবে দেখ দিকি? সতীশের মা জ্বরের ঘোরে হয়ত বলেছেন যে তিনি কমলার কলঙ্ক বিশ্বাস করেন না, কিন্তু—

কিন্তুটা ওইখানেই থেমে গেল। অরুণের মত ক্ষিতীশের নিজের বক্তব্যটাও শেষ হতে পেলে না। কমলা এতদূর পর্য্যন্ত নীরবে শুনছিল, হঠাৎ তার কান্না যেন একেবারে সহস্রধারে ফেটে পড়ল। অশ্রু-বিকৃত কণ্ঠে সে বলে উঠলো,—কিন্তু কি ক্ষিতীশদা? আমাকে কি তোমরা এইখানেই বেঁধে রাখতে চাও? আমার শাশুড়ীর ব্যামো, তিনি কাছে নেই, আমি না গেলে কে যাবে, বল ত?

ক্ষিতীশ হতবুদ্ধি হয়ে বলতে গেল, তা বটে, কিন্তু ভেবে দেখলে—

কমলা তেমনি কাঁদতে কাঁদতে বললে, ভেবে কি দেখতে চাও, শুনি? কেবল ভেবে ভেবেই ত আজ আমার এই দশা করেছ। হরেনের মুখের দিকে চোখ তুলে বললে, আমি দোষ করিনি,—আমার ভালর জন্যে যদি তোমরা অত ফন্দি-ফিকির না কোরে সোজা আমাকে বাড়ী নিয়ে যেতে ত, আজ হয়ত আমার ভালই হতো, তোমাদেরও আমার জন্যে এমন ভেবে সারা হতে হতোনা। আমি আর তোমাদের সাহায্য চাইনে, কেবল অরুণকে সঙ্গে নিয়ে কাল ভোরেই চলে যাবো। আমার ভাগ্যে যা আছে তা হোক্, তোমরা আর আমার ভালর চেষ্টা কোরোনা।

ক্ষিতীশ এবং হরেন দুজনেই চমকে গেল। কমলাকে এমন কোরে কথা বলতে কেউ কখনো শোনেনি। ভাল-মন্দ সম্বন্ধে তার নিজের ব্যক্তিগত যে কোন মতামত আছে, আপনার দুর্ভাগ্যকে ধিক্কার দেওয়া ছাড়া, এবং তার সংশোধনের সমস্ত ভার অপরের উপর নির্ভর করা ভিন্ন সেও যে আবার মনে মনে কিছু চিন্তা করে, একথা তারা দুজনেই যেন একপ্রকার ভুলে গিয়েছিল।

হরেনের মুখে সহসা কোন উত্তর যোগাল না, এবং ক্ষিতীশ বিস্ময়ে দুই চক্ষু বিস্ফারিত

কোয়ে চেয়ে রইল। কিন্তু এ কথা বুঝ্‌তে আর তাদের বাকি রইলোনা, যে তাদের উভয়ের সম্মিলিত দুশ্চিন্তাকেও বহুদূরে অতিক্রম কোরে আর একজনের উদ্বেগ কোথায় এগিয়ে গেছে।

কমলা তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছে ফেলে বল্‌লে, তোমরা মনে কোরোনা ক্ষিতীশদা, তোমাদের দয়া আমি কোনদিন ভুলতে পারবো, কিন্তু আজ তোমাদের হাত জোড় করে জানাচ্চি ভাই,—বল্‌তে বল্‌তেই তার দুচোখ বেয়ে ঝর ঝর করে আবার জল গড়িয়ে পড়ল, কিন্তু এবার সে জল সে মোছবার চেষ্টাও করলেনা, হাত-দুটি জোড় করে বল্‌তে লাগ্‌ল—আমার জন্যে তোমরা যে কত দুঃখ পেলে, সে আমি জানি, আর ভগবানই জানেন, কিন্তু আর একটা দিনও না। আজ থেকে আমার দুর্ভাগ্যের সমস্ত ভারই আমি নিজের মাথায় তুলে নিলুম। ক্ষিতীশদা, একদিন যেমন আমাকে তুমি পথ থেকে এনে বাঁচিয়ে ছিলে, আজ তেম্‌নি আমাকে কেবল এই আশীর্বাদ তুমি কর, এর থেকেও একটা যেন কোথাও কূল পাই,—আর না তোমাদের দুঃখ দিতে ফিরে আসি।

ক্ষিতীশ চোখ ফিরিয়ে বোধ হয় তার চোখের জলটাই গোপন করলে, কিন্তু হরেন বল্‌লে, আমরা দুজনে সেই আশীর্বাদই তোকে করি কমলা, আমি বল্‌চি এ বিপদ একদিন তোর কেটে যাবেই,—কিন্তু কাল সকালে আমিও কেন তোর সঙ্গে যাইনে?

কমলা ঘাড় নেড়ে জানালে, না।

হরেন উত্তেজনার সঙ্গে বলে উঠলো, না কেন কমলা? আমি যদি তোর সত্যিকারের দাদা হতুম তা'হলে ত তুই না বল্‌তে পারতিস্‌নে।

তার শেষ কথাটায় এত দুঃখেও কমলার মুখখানি লজ্জায় রাঙা হয়ে গেলো, সে অধোমুখে তেম্‌নি নীরবে মাথা নেড়ে বল্‌লে, না।

তার এই লজ্জাটা হরেনের অগোচর রইল না। কিন্তু পরস্পরের নাম নিয়ে এই যে একটা লজ্জাকর অপবাদ, একে সে যে বিন্দুমাত্র স্বীকার করে না, এই কথাটাই সদর্পে জানাবার জন্যে হরেন তীব্রকণ্ঠে বলে ফেল্‌লে, তুই কি ভাবিস্‌ কমলা, আমি মিথ্যে দুর্নামকে ভয় করি? বাবার অন্যায় শাসন গ্রাহ্য করি? আমি যাবো তোর সঙ্গে, দেখি, গ্রামের কে আমার মুখের সাম্‌নে তোকে কিছু বল্‌তে পারে। তার জবাব আমি দিতে পারবো, কিন্তু ছেলেমানুষ অরুণ পারবে না।

কমলা সজল চোখ দুটি তার মুখের পানে তুলে বল্‌লে, অরুণ পারবে না সত্যি, কিন্তু তোমারও পেরে কাজ নেই হরেনদা। আমার বোঝা আমাকে বইতে দাও, আর আমার সমস্যাকে তোমরা জটিল কোরে তুলোনা।

হরেন বল্‌লে, গ্রামের লোকগুলোকে একবার ভেবে দেখ্‌ কমলা। সেখানে একাকী তোর অদৃষ্টে কি যে না ঘটতে পারে, সে তো আমি ভেবেও পাইনে।

কমলা যেন ক্লান্ত হয়ে পড়ছিল। সে আর কথা কাটাকাটি না কোরে শুধু উপরের দিকে মুখ তুলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ধীরে ধীরে বল্‌লে,—তিনিই জানেন। এই বলে সে হাতদুটি মাথায় ঠেকিয়ে উদ্দেশে কাকে

যেন প্রণাম করেই, দ্রুতপদে উঠে অন্য ঘরে চলে গেল।

কয়েক মুহূর্ত কারও মুখ দিয়েই কোন কথা বার হোলোনা, সবাই যেন নিস্পন্দ হয়ে বসে রইল। খানিক পরে অরুণ বল্লে, আমি কিন্তু একটা সুবিধে করে এসেছি হরেনদা। জামাইবাবুর মাকে বলে এসেছি, দিদি হারিয়ে যাবার পরে অসুখ থেকে সেরে উঠে পর্য্যন্ত বরাবর আমার কাছেই আছেন। ঠিক করিনি ক্ষিতীশদা? অবশ্য তোমাদের নামও করেছি বটে।

হরেন বল্লে, দূর পাগলা! তুই ছেলে-মানুষ,—কলকাতায় কমলা তোর কাছে আছে, এ কথা কি কেউ কখনো বিশ্বাস করে? কি বল হে ক্ষিতীশ?

ক্ষিতীশ হঠাৎ চমকে উঠে বল্লে, হুঁ। বলেই লজ্জিত মুখে উঠে দাঁড়িয়ে একটুখানি হেসে বল্লে, আমার ভারি ঘুম পাচ্ছে হরেন, আমি চল্লুম। বলে ঠিক যেন টল্তে টল্তে তার নিজের ঘরে চলে গেল।

নিজের বাড়ীতে তাদের কোন খেয়াল না কোরে ক্ষিতীশ শুতে গেল, এটা তার স্বভাবের এমনি বিরুদ্ধ যে হরেন ও অরুণের বিস্ময়ের সীমা রইল না কিন্তু যথার্থই আজ ক্ষিতীশের এদিকে দৃষ্টি দেবার সাধ্যই ছিলনা। বহুক্ষণ থেকেই সে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল, এত আলোচনা ও তর্কবিতর্কের অর্দ্ধেক বোধ হয় তার কানেই যায়নি। সেখানে কেবল একটা কথাই বারম্বার প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল,—সমস্ত প্রকাশ হয়ে গেছে, সমস্ত প্রকাশ হয়ে গেছে! তার মনের নিভৃত গুহায় যত-কিছু পাপ সঞ্চিত হয়ে উঠেছিল, কমলার কাছে সমস্ত ধরা পড়ে গেছে,—তার কোথাও কিছু আর লুকোনো নেই। তাই সে আজ ব্যাধ-ভয়ে ভীত হরিণীর মত ছুটে পালাতে চায়! আজ তার সকল যত্ন, সকল সেবা, সকল পরিশ্রম একেবারে ব্যর্থ, একেবারে নিরর্থক!

২২

ক্ষিতীশ দা!

কে?

আমি কমলা, একবারটি দোর খোল।

ক্ষিতীশ শশব্যস্তে দোর খুলে বাইরে এসে দেখ্লে, সুমুখে দাঁড়িয়ে কমলা। রাত্রির ঘোর তখনো কাটেনি, তখনও কালো আকাশে দু'চারটে বড় বড় তারা জল্ জল্ করে জ্বলচে। কেবল পুবের দিকটা একটু স্বচ্ছ হয়েছে মাত্র। বারান্দার এককোণে যে লণ্ঠনটা মিট্ মিট্ করে জ্বলছিল, তারই অস্পষ্ট আলোতে ক্ষিতীশ চক্ষের নিমিষে সমস্ত ব্যাপারটা দেখে নিলে।

কমলার গায়ে আগাগোড়া একটা হল্দে রঙের র‍্যাপার জড়ানো, এবং তারই দাঁড়িয়ে অরুণ। তার জোড়া-কাটা কোটের ওপর কোমরে বাঁধা একটা আধময়লা চাদর। হাতে তার পেতের সময়কার লাল রঙের ছাতাটি এবং ডান বগলে চাপা একটি ছোট্ট পুঁটুলি।

কেবল এতটুকুই ক্ষিতীশ দেখ্তে পেলে। কিন্তু কমলা যখন গড় হয়ে প্রণাম করে তার পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বল্লে, ক্ষিতীশ দা' আমি চল্লুম, তখন আলোর অভাবেই হোক্, বা চোখের দোষেই হোক্, তার মুখের কিছুই আর ক্ষিতীশের চোখে পড়ল না। তার মনে

হ'ল, অকস্মাৎ এক মুহূর্ত্তে যেন সম্মুখে, পাশে, ওপরে, নীচে সমস্তটাই একেবারে মসীকৃষ্ণ হয়ে গেছে।

—আমাদের সময় হয়েছে আমি যাচ্চি ক্ষিতীশ দা'।

—যাচ্চো ? আচ্ছা—

—আমি কোথাকার কে, তবু কত কষ্টই না এতদিন ধরে তোমাকে দিলাম—এই বলে কমলা র‍্যাপারের কোণে চোখ মুছ্‌লে।

প্রত্যুত্তরে ক্ষিতীশ শুধু কেবল জবাব দিলে, কষ্ট ? কই, নাঃ—

—কিন্তু তোমার প্রাণ বাঁচানো যেন নিষ্ফল না হয় যাবার সময় আমাকে এইটুকু আশীর্ব্বাদ কেবল তুমি কর ক্ষিতীশ দা'—এই বলে কমলা ঘন ঘন চোখ মুছ্‌তে লাগ্‌ল।

ক্ষিতীশ কোন উত্তরই খুঁজে পেলে না। কিন্তু খানিক পরে হঠাৎ বলে উঠ্‌লো, আশীর্ব্বাদ ? নিশ্চয়! নিশ্চয়! তা' করচি বই কি। হাঁ অরুণ, মোটরটা বলে দেওয়া হয়েছে ?

অরুণ মাথা নেড়ে জবাব দিলে, হাঁ, হরেন দা' ত নীচে তাতেই বসে আছেন! তিনি ইষ্টিশন পর্য্যন্ত আমাদের পৌঁছে দিয়ে আসবেন। আপনি যাবেন না ?

আমি ? না ভাই, আমার শরীরটা তেমন ভাল নেই—

কমলা দূর থেকে আর একবার নিঃশব্দে নমস্কার কোরে আস্তে আস্তে নীচে চলে গেল। অরুণ কাছে এসে বল্‌লে, আমিও চল্‌লুম ক্ষিতীশ দা'—এই বলে সে দিদির মত প্রণাম করতে যাচ্ছিল, কিন্তু ক্ষিতীশ সহসা সজোরে তার হাতদুটো ধরে হিড় হিড় কোরে টেনে তার ঘরের মধ্যে এনে ফেলে বল্‌লে, অরুণ, তোমরা সত্যি সত্যিই চল্‌লে ভাই ?

অরুণ অবাক্ হয়ে তার পানে চেয়ে রইল, প্রশ্নটা যেন সে বুঝ্‌তেই পারলে না।

ক্ষিতীশ পুনশ্চ বল্‌লে, কে জানে, আর হয়ত আমাদের দেখাই হবে না,—আমিও আজ দুপুরের গাড়ীতে পশ্চিমে চল্‌লুম ভাই।

অরুণ এ কথারও জবাব দিতে পারলে না, কিন্তু বালক হলেও সে এটুকু বুঝ্‌তে পারলে যে ক্ষিতীশদা'র কণ্ঠস্বর কান্নার জলে যেন একেবারে মাখামাখি হয়ে গেছে।

প্রত্যুত্তরের প্রতীক্ষা না করেই বল্‌লে, তুমি ছেলেমানুষ, তোমার ওপর যে কত-বড় ভার পড়্‌ল, এ হয়ত তুমি জানোওনা, কিন্তু ভগবানের কাছে আমি কায়-মনে প্রার্থনা করি, তোমাদের আজকের যাত্রাটা যেন তিনি সকল প্রকারে নির্বিঘ্ন কোরে দেন

এই বলে সে তার বালিশের তলা থেকে একখান খাম বার কোরে অরুণের হাতে গুঁজে দিতে গেল। অরুণ হাতটা সরিয়ে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, এ কি ক্ষিতীশ দা' ?

সামান্য গোটা-কয়েক টাকা আছে অরুণ।

কিন্তু ভাড়ার টাকা ত আমার কাছে আছে ক্ষিতীশ দা।

তা' থাক। তবু ছোট ভাইদের যাবার সময় কিছু হাতে দিতে হয়।

এই বোলে সে অরুণের কোঁচার খুঁটটা টেনে নিয়ে তাতে বাঁধ্‌তে বাঁধ্‌তে বল্‌লে, তোমার ত কেউ বড় ভাই নেই অরুণ,

তাই জানো না, নইলে তিনিও এমনি কোরেই বেঁধে দিতেন, দাদার মেয়ের উপহার বলে নিতে কিছু লজ্জা কোরো না, ভাই। তোমার দিদি কখনো যদি জান্তে পেরে জিজ্ঞাসা করেন, তাঁকেও এই কথাটাই বোলো। এই বোলে সে সেটা যথাস্থানে পুনরায় গুঁজে দিয়ে হাত ধোরে তাকে বাইরে এনে বল্লে, আর সময় নেই অরুণ, তুমি যাও ভাই, সাড়ে চারটে বেজে গেছে। ওঁরা বোধ করি বড্ড ব্যস্ত হচ্চেন—এই বোলে সে একরকম তাকে জোর কোরে বিদায় কোরে দিলে।

অরুণ সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে নামতে জিজ্ঞাসা করলে, আপনি কতদিন পশ্চিমে থাকবেন ক্ষিতীশ দা?

সে কথা আজ কি কোরে বোল্‌ব ভাই?

মিনিট-খানেক পরে অরুণ গিয়ে যখন গাড়ীতে উঠে বোস্‌লো, তখন তাকে একাকী দেখে কমলা কোন প্রশ্নই করলে না, কিন্তু হরেন জিজ্ঞাসা করলে, ক্ষিতীশ এলোনা অরুণ?

তার জবাবটা ক্ষিতীশ নিজেই দিলে। সে উপরের বারান্দার রেলিঙে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, বল্লে, শরীরটা আমার ভাল নেই হরেন, আর ঠাণ্ডা লাগাবোনা।

হরেন একটু উদ্বিগ্ন হয়ে বল্লে, ভাল নেই? তা'হলে হিমে আর দাঁড়িয়ো না ক্ষিতীশ, ঘরে যাও, আমি এদের পৌঁছে দিয়ে এসে তোমাকে জানাবো।

মোটর ছেড়ে দিলে। হরেনের উপদেশ তার কাণে গেল কি না কে জানে, কিন্তু গাড়ী যখন যতক্ষণ তার চোখের বাইরে অদৃশ্য হয়ে গেল, তখনও সে তেমনি সেই দিকে চেয়ে তেমনি স্তব্ধ হয়েই দাঁড়িয়ে রইল।

ষ্টেশনে পৌঁছে, টিকিট কিনে দুজনকে গাড়ীতে তুলে দিয়ে হরেন কমলার কাছে গিয়ে একটুখানি লজ্জার সঙ্গে বল্লে, আমার উপস্থিত ঠিকানা যদিচ আমি নিজেই জানিনে, তবুও আমাকে খবর দেবার যদি আবশ্যক হয়ত কেয়ার অফ্—

অরুণ পকেট থেকে তাড়াতাড়ি একটুকরো কাগজ আর পেন্‌সিল বার কোরে বল্লে, থামো থামো হরেন দা, ঠিকানাটা, তোমার লিখে নিই। তা ছাড়া শুনলুম ক্ষিতীশদা'ও আজ দুপুরের ট্রেণে পশ্চিমে চলে যাচ্চেন, এটা ছাই মনে হোলোনা যে তাঁর ঠিকানাটা জিজ্ঞেসা কোরে রাখি।

সম্বাদ শুনে কমলা মনে মনে আশ্চর্য্য হোলো, কিন্তু কিছুই প্রকাশ করলে না। কিন্তু হরেন উদ্বিগ্ন হয়ে বলে উঠ্‌লো, বলিস্ কি অরুণ! ত'হলে ত আমাকে এখুনি ফিরে গিয়ে তাকে থামাতে হয়।

কমলা মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করলে, কেন হরেন দা?

অরুণ বল্লে, কেন কি, বাঃ—

হরেন বল্লে, সেখানে কত কি ঘটতে পারে কে বল্‌তে পারে? আবশ্যক হলে আমি ত যাবই, এমন কি ক্ষিতীশকে পর্য্যন্ত ধরে নিয়ে যেতে ছাড়বো না! তুই কি আমাকে ভীরু মনে করিস্!

কমলা ঘাড় নেড়ে বল্লে, না, তা' করিনে। কিন্তু তোমাদের কারও সেখানে আমার জন্যে যাবার দরকার হবে না।

হরেন ভয়ানক আশ্চর্য্য হয়ে বল্লে,

হবেনা? যাই হোক, কিন্তু আজও কি তুই আমাদের পাড়াগাঁয়ের লোককে চিনিস্ নি কমলা?

কমলা এ প্রশ্নের ঠিক জবাব দিলে না, বল্লে, আমি কিছুতে ভেবে পাইনে 'হবেন দা', এতদিন কি কোরে আমার সমস্ত বুদ্ধি-শুদ্ধি লোপ পেয়েছিল, আর কেমন কোরেই বা এতদিন নিজের কাজের ভার তোমাদের পরের ওপর নির্ভর কোরে থাকৃতে পেয়েছিলুম। ভুল যা করেচি তার সীমা নেই, কিন্তু তোমাদের সাক্ষী দিতে ডেকে পাঠাবো এতবড় ভুল বোধ হয় আমিও আর কোরব না। এই বোলে সে ছোট ভাইয়ের হাত থেকে কাগজের টুকরোখানি নিয়ে জানালা গলিয়ে বাইরে ফেলে দিলে।

হবেন মনে মনে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ এবং লজ্জিত হয়ে বল্লে, কিন্তু কমলা, নির্দ্দোষীকেও কি সাক্ষী দিয়ে নিজের নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করতে হয় না?

কমলা একটুখানি ম্লান হেসে বল্লে, সে আদালতে হয়; কিন্তু আমার বিচারের ভার আমি যাঁর হাতে তুলে দিয়েচি হবেন দা', তাঁকে সাক্ষী যোগাতে হয় না, তিনি আপনিই সব জানেন।

এই বোলে সে উদ্গত অশ্রু গোপন করতে তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নিলে

গার্ড-সাহেব সবুজ নিশান নেড়ে দিলেন, ড্রাইভার বাঁশী বাজিয়ে গাড়ী ছেড়ে দিলে, এই সময়টুকুর মধ্যে হবেন যেন একটা ধাক্কা সাম্‌লে নিলে। সে সঙ্গে সঙ্গে দু'পা এগিয়ে এসেও কমলার মুখ আর দেখতে পেলে না কিন্তু তাকেই উদ্দেশ কোরে চেঁচিয়ে বল্লে, তাই যেন হয় বোন্, আমি কায়-মনে প্রার্থনা করি তিনিই যেন আমাদের বিচারের ভার গ্রহণ করেন।

কমলা এ কথারও কোন উত্তর দিলে 'না, দেবার' ছিলই বা কি! কিন্তু গাড়ী কতকটা পথ চলে গেলে সে কেবলমাত্র একটিবার জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখ্তে পেলে হবেন তখনও সোজা তাদের দিকেই চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

পথের মধ্যে অরুণ অনেক কথাই বকে যেতে লাগ্‌ল। তার নিজের প্রতি তাদের একটা ভরসা ছিল। সেই যে দুর্গামণি তাকে বলেছিলেন, তিনি গুজবটা বিশ্বাস করেন নি, এবং সেও তাঁকে জানিয়ে এসেছে কলকাতায় দিদি তার কাছেই আছেন, এতেই তার সাহস ছিল দুর্ঘটনাকে সে অনেকখানিই সরল করে দিয়েচে। এই ভাবের সান্ত্বনাই সে থেকে থেকে দিদিকে দিয়ে যেতে লাগ্‌লো, কিন্তু দিদি যেমন নিঃশব্দে ছিল, তেমনি নীরবেই বসে রইল। হবেশ্বর সেই কথাটা সে ভোলেনি যে অরুণের এই কথাটা সহজে কেউ বিশ্বাস করবে না। কিন্তু এজন্য মনের মধ্যে তার বিশেষ কোন চাঞ্চল্যও ছিল না। বস্তুতঃ, যা সত্য নয় সে যদি লোকে অবিশ্বাসই করে ত দোষ দেবার কাকে কি আছে! কিন্তু যথার্থ যে-চিন্তা তার মনের মধ্যে ধীরে ধীরে জাঁতার মত চেপে বস্‌ছিল সে তার শাশুড়ীর কথা। তিনি বলেছিলেন বটে তাঁর বধূর কলঙ্ক তিনি বিশ্বাস করেন না, কিন্তু এই বিশ্বাস কি তাঁর শেষ পর্য্যন্ত অটুট থাকবে? কোথাও কি কোন অবস্থায়

কোন বিঘ্ন ঘটবে না? সে জানতো, ঘটবে। পল্লীগ্রামে মানুষ হয়েই সে এতবড় হয়েছে, তাদের সে চেনে,—কিন্তু এ সঙ্কল্পও তার মনে মনে একান্ত দৃঢ় ছিল, অনেক ভুল, অনেক ভ্রান্তিই হয়ে গেছে, কিন্তু আর সে তার নিজের এবং স্বামীর মধ্যে তৃতীয় মধ্যস্থ মানবে না। এ সম্বন্ধ যদি ভেঙেও যায় ত যাক্, কিন্তু জগদীশ্বর ভিন্ন দুজনের মাঝখানে অন্য বিচারক সে কখনো স্বীকার করবে না।

বেলডাঙ্গা ষ্টেসনে যথাসময়েই ট্রেন এসে পৌঁছল, কিন্তু ঘোড়ার-গাড়ী জোগাড় করা সহজ হোলোনা। অনেক চেষ্টায় অনেক দুঃখে অরুণ যখন একটা সংগ্রহ করে নিয়ে এল, তখন বেলা হয়েছে, এবং পল্লীপথের পাকা সাত ক্রোশ উত্তীর্ণ হয়ে অশ্বযান যখন জগদীশপুরের সতীশ বাগচীর বাটীর সুমুখে উপস্থিত হল তখন বেলা বারোটা।

দুর্গামণি গোটা-তিনেক ময়লা, ওয়াড়হীন তুলো-বার-করা বালিশ জড় কোরে ঠেস্ দিয়ে বসে একবাটি গরম দুধ পান করছিলেন, এবং অদূরে মেঝের বসে পাড়ার একটি বিধবা মেয়ে কুলোয় ঢেলে ধান বাচ্‌ছিল। দুর্গামণির জ্বর তখনও একটু ছিল বটে, কিন্তু টাইফয়েডের কোন লক্ষণই নয়। তিনি অরুণকে দেখে খুসি হয়ে বল্লেন, কে অরুণ এসেছো, বাবা? এসো, বোসো,—দোর-গোড়ায় ও কে গা?

দিদি এসেছেন—

দিদি? কে, বউমা?

পরক্ষণেই কমলা ঘরে ঢুকে গলায় আঁচল দিয়ে ভূমিতলে গড় হয়ে প্রণাম করতেই দুর্গামণি শশব্যস্ত হয়ে উঠ্‌লেন। দুধের বাটিটা মুখ থেকে নামিয়ে তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, থাক্ থাক্, বউমা, আর পায়ের ধুলো নিতে হবে না। সারাদিন পরে দুধ ফোঁটাটুকু মুখে তুলেচি, এটুকু আর ছুঁয়ে দিয়ো না।

যে মেয়েটি ধান বাচ্‌ছিল সে স্পর্শ বাঁচিয়ে কুলো সমেত দুহাত সামনে এগিয়ে গেল। কমলা নির্ব্বাক স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, কিন্তু অরুণ যেন একেবারে অগ্নিকাণ্ডের ন্যায় জ্বলে উঠে বলে ফেল্‌লে,—মিথ্যেবাদী! কেন তবে কাল তুমি বল্‌লে, ও-সব গুজব তুমি বিশ্বাস করোনা! কেন বল্‌লে—

শোন কথা! কবে আবার বল্‌লুম বিশ্বেস করিনে? আর অন্যের ধমকে যদি কিছু বলেই থাকি ত সে কি আবার ধর্ত্তব্য, বাছা!

অরুণ কাঁদ-কাঁদ হয়ে বল্‌লে, তা'হলে ত আমি কখ্‌খনো দিদিকে আন্‌তুম না! দুর্গামণি দুধের বাটিটি সাবধানে একটু নিরাপদ স্থানে রেখে বল্লেন, তা' বেশ ত বাছা, অমন হাঁড়ি-মুখী হোচ্চো কেন? গাঙ্গুলি মশাই আসুন, মায় বট্‌ঠাকুরকে খবর দি,—ততক্ষণ, ঘরে সবই আছে, পটলের-মা বের কোরে দিক্,—দোরের উনুনটায় খোড়্‌লোয় কোরে ডাল-চাল দুটো ফুটিয়ে তোমাকেও দুটো দিক্, নিজেও দুটো খাক্!

অরুণ চতুর্গুণ জ্বলে উঠে বল্‌লে, কি! আমরা তোমার বাড়ী ভিক্ষে নিতে এসেচি! এত বড় কথা বল তুমি! আচ্ছা, টের পাবে! এই বোলে সে কমলার হাতখানা চেপে ধরে বল্‌লে, চল দিদি, আমরা যাই,—এখনো আমাদের গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে—আর এক মিনিট ও এর মুখ দেখ্‌তে চাইনে!

কমলা ধীরে ধীরে নিজের হাতখানি মুক্ত করে নিয়ে বল্লে, চল, যাচ্চি ভাই। তার পরে মাথার অঞ্চলটা সরিয়ে দিয়ে শাশুড়ীর মুখের পানে চেয়ে শান্ত সহজ কণ্ঠে বল্লে, মা, আমি চল্লুম, কিন্তু, আমিও এ বাড়ীর বউ তোমারি মত এও আমার শ্বশুরের ভিটে। কিন্তু এমন অপরাধ আজও করিনি যাতে এ বাড়ীতে আমাকে দোরের উনুনে রেঁধে খেতে হয়!

শাশুড়ী বল্লেন, তা' কি জানি, বাছা!

কমলার মলিন চোখের দৃষ্টি হঠাৎ শিখার মত দীপ্ত হয়ে উঠ্‌ল,—বোধ হয় কি যেন সে বল্‌তেই চাইলে, কিন্তু সে অবসর আর পেলে না। অরুণ বজ্র-মুষ্টিতে হাত ধরে জোর করে তা'কে টেনে নিয়ে বাইরে চলে গেল।

(ক্রমশঃ)*

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

সঙ্কলন

বিলাতযাত্রীর পত্র

দক্ষিণ ফ্রান্স

Cap Martin,

Alpes Maritimes.

এখানকার যে সব মনীষী বিশ্বমানবের সমস্যা বড় রকম করে চিন্তা করচেন তাঁদের অনেকের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। এঁদের সঙ্গে আলাপ হলে মন মুক্তি লাভ করে। কেননা, মানুষের মুক্তির ক্ষেত্র হচ্চে ভাবের ক্ষেত্র—সেইখানে বস্তুলোকের সমস্ত নিয়ম উল্টে যায়—সেইখানে মানুষ নিজের সুখদুঃখের, নিজের ভোগসম্ভোগের অতীত হয়ে বিচরণ করে—সেখানে বর্ত্তমানের বন্ধন তাকে ধরে রাখ্‌তে পারেনা, সেখানে আশার আলোকে সমুজ্জ্বল সীমাহীন ভবিষ্যতের মধ্যে আত্মার বিহার। মানুষের মধ্যে যারা সেই ভাবিকাল-বিহারী তারাই অমৃতলোকের অধিবাসী, কেননা মৃত্যুর ক্ষেত্র হচ্চে বর্ত্তমান। এখানেই পদে পদে ক্ষয়, এই-খানেই যত আঘাত যত দৈন্য—এই সঙ্কীর্ণ বর্ত্তমানের মধ্যেই সমস্ত চেষ্টাকে আবদ্ধ করে মানুষ পীড়িত হয়। মানুষ হচ্চে "অমৃতস্য পুত্রাঃ", মানুষ হচ্চে দিব্যধামবাসী। সেই-দিব্যধাম হচ্চে অসীমকালে, খণ্ডকালে নয়। আমাদের যথার্থ বন্ধন কালের বন্ধন। যখন আমরা কোনো ব্যথা বোধ করি তখন সেই ব্যথা আমাদের মনকে সেই ব্যথার কালের বাইরে যেতে বাধা দেয়,—সেই ব্যথা বর্ত্তমানের খুঁটির সঙ্গে আমাদের জোর করে বেঁধে রাখে, সেই রকম দারিদ্র্য বা উপস্থিতের ভাবনা দিয়ে আমাদের ঘিরে রাখে, ভবিষ্যতের দিকে যার আশার জানলা খোলা নেই। সেই হচ্চে অকিঞ্চন, কালের ক্ষেত্রে যার ঘর মাত্র আছে কিন্তু আঙিনা নেই। আধুনিক ভারত-বর্ষের লোক অতি ক্ষুদ্র বর্ত্তমানের প্রাচীরের মধ্যে আবদ্ধ। তার দীনতা এত বেশি যে বর্ত্তমানের সব দাবীও সে পুরাপুরি মেটাতে পারচে না। সম্পূর্ণ নিজের সামর্থ্যে তার দিন চল্‌চে না, পরের প্রত্যাশায় সে ধনীর দ্বারে ধর্ণা দিয়ে বসে আছে। কিন্তু যার বর্ত্তমানের সম্বল অল্প সে আপনার ভবিষ্যৎকে বাঁধা দিয়ে তবে ঋণ পায়—আমরা যতই পরের কাছে হাত পাতচি ততই নিজের ভবিষ্যৎকেই বিকিয়ে দিচ্চি। আমাদের বর্ত্তমান সঙ্কীর্ণ, আমাদের সম্মুখে ভাবী কাল বাধাগ্রস্ত, এইজন্যেই আমাদের মন বড় করে ভাবতে

* আগামী সংখ্যায় লেখক—শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায়।

পারচে না, নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করচে। তুমি তোমার কালেজের ছাত্রদের কলুষ সম্বন্ধে যা লিখেচ তার কারণ হচ্চে মন যখন মুক্তির আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয় তখন সে পাপের উত্তেজনা থেকে তৃপ্তিলাভ করতে চেষ্টা করে। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের কাছ থেকে শুনেচি যে আমাদের উচ্চশ্রেণীর ছাত্রেরা তাদের সতীর্থ ছাত্রীদের অপমানিত করবার জন্যে ক্লাসের বোর্ডে পর্যন্ত কুৎসিত কথা লিখে রাখে। এর থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, যে-সকল পরিবার থেকে এই-সব ছাত্র আসে তারা আত্মার দীনতা দ্বারা পীড়িত। মন যেখানে কেবলি ছোট ভাবনা ভাবতে বাধ্য, ছোট কর্ম করতে বাধ্য, সেইখানে এই আত্মার দীনতা ঘটে। সঙ্কীর্ণ ঘর যদি বন্ধ হয়, তাহলে বাতাস দূষিত হয়ে ওঠে। "নাল্পে সুখমস্তি" আমাদের পক্ষে সত্য নয় "বিপুলা চ পৃথ্বী" সেও আমাদের পক্ষে মিথ্যা।

মানুষ যখন তার কীর্তির জন্যে বৃহৎকালের ক্ষেত্র না পায় তখন সে নিজের মাহাত্ম্যকে প্রকাশ করবার পথ না পেয়ে, সে আপন অভাবকে হীনতাকেই ব্যক্ত করে। নিরন্তর যে দেশে কেবল এক অভাব এবং দুঃখদুর্গতিই প্রকাশ পাচ্চে সেখানে আত্মার উপরে মানুষের শ্রদ্ধা চলে যায়—পরস্পরের কুৎসাবাদে ঈর্ষাপরতায় সেই শক্তিহীনতা মানুষের আত্মাবমাননাকে উদ্ঘাটিত করতে থাকে। আমাদের দেশের লোককে বার বার জানাতে হবে যে আমরা "অমৃতস্য পুত্রাঃ"—আমরা দিব্যধামবাসী। কি করে জানাতে হবে? ত্যাগের দ্বারা। চিরন্তন কালের প্রতি যার শ্রদ্ধা আছে সেই ত আনন্দের সঙ্গে বর্ত্তমানকালকে ত্যাগ করতে পারে—এবং সেই চিরন্তন কালই আত্মার অমৃতধাম। পশ্চিম দেশ বড় হয়ে উঠেচে অর্থসংগ্রহের দ্বারা নয়, আত্মবিসর্জ্জনের দ্বারা। এত বহুলোক এখানে ভাবের জন্যে বস্তুকে ভাবীর জন্যে উপস্থিতকে ত্যাগ করচে যে তার সংখ্যা নেই। সেইরকম অনেক লোককে দেখচি। যতই দেখচি ততই মানবাত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জন্মাচ্চে। জগতে যত কিছু উন্নতি ঘটেচে মানুষের সেই আত্মোৎসর্গের দ্বারা—ভিক্ষাবৃত্তির দ্বারা নৈব নৈবচ। কোনো রিফর্ম বিল্ আমাদের দুঃখসমুদ্র পার করাতে পারবে না—আত্মার বন্ধন কখনই বাইরে থেকে ঘুচবে না—ভারতবর্ষ এই আত্মার বন্ধনের দ্বারাই জর্জ্জর—মণ্টেগু সাহেব তাকে বাঁচাবে কি করে?

উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।

ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি ॥০

২৮ আগষ্ট, ১৯২০

Villa Dunare
Cap Martin
Alpes Maritimes
28th Agust, 1920

We are in a most beautiful part of France But of what avail is the beauty of nature when you have lost your trunks which contained your dresses and underwears? I could have been with perfect sympathy with the trees surrounding me, if, like them, I were not dependent upon tailors for maintaining my self-respect However, the most important event for me in this world at present is not what is happening in Poland or Ireland or Mesopotamia, but that all the trunks belonging to our party have disappeared from the goods van in their transit from Paris to this place And therefore though the sea is singing its hymns to the rising and the setting sun and to the starlit silence of the night, and though the forest round me is standing tiptoe on the rock like an ancient druid, raising its arms to the sky, chanting its incantation of primeval life, we have to hasten back to Paris to be restored to the respectability ministered by tailors and washermen. This is what

our first parents have brought upon us. Our clothes are acting like screens dividing us from the rest of the world; and for this we have to pay—pay the bills. Do you not think that it is outrageously undignified for my humanity that standing face to face with the magnificent spirit of this naked nature I can think and speak of nothing but my wretched clothes which in three years time will be tattered into rags while these pine-trees will remain standing ever fresh and clean majestically unaffected by the soiling touch of hours? But enough of this.

I suppose I told you in my last letter that I met Sylvan Levy in Paris. He is a great scholar as you know, but his heart is larger ever than his intellect and his bearing. His Philosophy has not been able to wither his soul. His mind has the translucent simplicity of greatness and his heart is overflowing with trustful generosity which will never acknowledge disillusionment. His students come to love the subject he teaches them because they love him. I realise clearly when I meet these great teachers that only through the medium of personality truth can be communicated to men. This fundamental principle of education we must realise in Santiniketan. We must know that only he can teach who can love. The greatest teachers of men have been lovers of men. The real teaching is a gift, it is a sacrifice, it is not a manufactured article of routine work, and because it is a living thing it is the fulfilment of knowledge for the teacher himself. Let us not insult our mission by allowing us to become mere school masters, the dead feeding bottles of lessons for children who need human touch lovingly associated with their mental food.

I have just received your letter and for some time I feel myself held tight in the bosom of our Ashrama. I can not tell you how I feel about prolonged separation from it which is before me, but at the same time I know that unless my relationship with the wide world of humanity grows in truth and love my relationship with the Ashrama will not be perfect. Through my life my Ashrama will send its roots into the heart of this great world to find its sap of immortality. We who belong to Shantiniketan can not afford to be narrow in our outlook and petty in our life's mission and scope. We have seen in Tiretta Bazar thirty or more birds packed in one single cage, where they neither can sing nor soar in the sky, but make noise and peck at each other. Such a cage we build ourselves for our souls with our petty thoughts and selfish ambitions and then spend our life quarreling with each other clamouring and scrambling for small advantages. But let us bring freedom of soul into Shantiniketan.

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শান্তি নিকেতন, আশ্বিন ১৩২১।

বাঙ্গালী কি আর্য্য ?

কথাটা অনেক দিন হইল শুনিতেছি। পুরাতন দল "মোক্ষমূলর বলেছে আর্য্য" এই কথাটাই ধরিয়া পণ্ডরক্ষা হইয়া বসিয়া আছেন আর যে কেউ আমাদের অনার্য্য বলিতে যান তাঁহাদিগকে গালিগালাজ করিতেছেন। আর নূতনের দল সমান ক্ষেপিয়াছেন আমাদের অনার্য্যত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য। অধ্যাপক হেমন্তকুমার সরকার মহাশয় অনেক দিনের পর কথাটা আবার তুলিয়াছেন।

এ প্রশ্ন শুনিয়া আমার প্রথম মনে হয় এ কথা লইয়া এত মাতামাতি বাড়াবাড়ি কেন? আর্য্যই হই অনার্য্যই হই, আমরা যে বাঙ্গালী সেই বাঙ্গালীই যখন থাকিব, তখন এ কথা লইয়া এত চেঁচামেচি কেন। অনার্য্যই হইলেই ব্যাবিলনী, কি ইজিপ্টীয়, কি ক্রীতের কি হিট্টাইটদিগের মত গৌরব হয় না, আধুনিক জাপানী বা প্রাচীন চীনের সঙ্গেও এক পংক্তিতে বসা যায় না। আর আর্য্য হইলেই এমন কিছু কুলীন হওয়া যায় না। প্রাচীন কালে আর্য্য সভ্যতার যে গৌরব ছিল, এই সব অনার্য্য জাতিদের গৌরব তা'র চেয়ে কোনও অংশে হীন বলা যায় না। বর্ত্তমান কালেও অনার্য্য জাপান গৌরবে কোনও তথাকথিত আর্য্যজাতি হইতে হীন নহে। পক্ষান্তরে আর্য্যবংশীয় বর্ব্বর প্রাচীন জর্ম্মাণ বা স্কান্ডিনেভিয়ান জাতি যে খুব একটা উন্নত জাতি ছিল তাও বলা যায় না। তবে এ কথায় আমাদের বর্ত্তমান বা অতীতের গৌরবের কিছু হ্রাসবৃদ্ধি হয় না। আমরা ছোট না বড় সেটা নির্ভর হইবে আমরা বাঙ্গালী হিসাবে কতটা কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়াছি তাই দিয়া। আমাদের প্রাচীন গৌরব কি ছিল সেও প্রাচীন বাঙ্গালী জাতির কীর্ত্তিকলাপ দিয়া। বহুশতাব্দী পূর্ব্বে তাহাদের কোনও পূর্ব্বপুরুষ মধ্য-এসিয়া হইতে আসিয়াছিল, না আমেরিকা হইতে আসিয়াছিল, না এই দেশের মাটিতে জন্মিয়াছিল, তাহাতে বাঙ্গালী হিসাবে বাঙ্গালীর গৌরবের হ্রাস বৃদ্ধি হইবে না।

এই কথাটা মনে রাখিয়া কেবল জ্ঞানলিপ্সার দৃষ্টিতে নিরপেক্ষ ভাবে এ কথার ইতিহাস আলোচনা করিলেই আমরা সত্যে উপনীত হইতে পারিব।

হেমন্ত বাবু বলিয়াছেন আমরা অন্—আর্য্য। মঙ্গোলীয় ও দ্রাবিড় রক্ত আমাদের শরীরে প্রবল। এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সঙ্গে সঙ্গে আর্য্যরক্তের যে মিশ্রণ আছে তাও অস্বীকার করিবার উপায় আছে কি? আমরা একটা মিশ্র জাতি এটা খাঁটি সত্য। সেজন্য আমাদিগকে অন-আর্য্য বলিতে হয় বল। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি আর্য্যজাতি কোথায় আছে? গ্রীসের আর্য্যের যে কতটা বেশী পরিমাণে ইজিয়ন (Aegian) জাতির সঙ্গে ভেজাল ছিল, সেটা আজকাল খুব বেশী পরিমাণে ধরা পড়িয়া গিয়াছে। তা' ছাড়া রোম, জর্ম্মাণি স্কান্ডিনেভিয়া প্রভৃতি যত আদিমকালের আর্য্য-নিবাস ছিল, সে সব কোনও স্থানেই খাঁটি আর্য্যজাতি ছিল না। আজও কোথাও আর্য্যজাতি নাই। নৃতত্ত্ববিদের শাস্ত্রে 'আর্য্য' কথাটা আর মনুষ্য জাতির শ্রেণী-বিভাগে শুনা যায় না। আর্য্যবাদ এখন "Aryan heresy" বলিয়া পরিচিত।

সুতরাং আমরা আর্য্য নই এ কথা যেমন সত্য, এ জগতে কোথাও আর্য্য জাতি নাই, সে কথাটাও তেমনি সত্য। এই আর্য্যজাতির প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে কত প্রাচীন কালে এই আর্য্যজাতির রক্তের ভিতর ভেজাল আরম্ভ হইয়াছে। বেদের সময় নির্ণয় সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। তাহা ছাড়া বেদ যে কোথায় রচিত হইয়াছিল তাহাও নিঃসংশয়ে বলা যায় না। নির্দ্দিষ্ট ঐতিহাসিক যুগে সব চেয়ে প্রাচীন দু'টি আর্য্যজাতির কথা আমরা পাই, একটি মিটানী রাজ্যে আর একটি ব্যাবিলনের ক্যাসাইট বংশে। সে প্রায় চার হাজার বছরের কথা। তখন দেখিতে পাই মিটানীর রাজা দশরত্ত (দশরথ?) তাঁহার ভগিনীর বিবাহ দিয়াছিলেন ইজিপ্ট-রাজের সঙ্গে। ক্যাসাইট রাজা কাদাস্মান—এনলিল ইজিপ্টের 'রাজা তৃতীয় আমেন হোটেপকে

কন্যা দান করিবার জন্য কড়া তলব পাঠাইয়াছিলেন।* রাজায় রাজায় যখন এমনি হইত তখন ছোটখাট লোকের মধ্যে "ছুকুলাবাপ" স্ত্রীসংগ্রহ হইত না, কে বলিবে? পক্ষান্তরে শূদ্র ও অনার্য্যের ভিতর হইতে যে স্ত্রীসংগ্রহ হইত এবং তাহাদের পুত্রেরা পুত্ররূপে পরিগণিত হইত ইহার ঝুড়ি ঝুড়ি প্রমাণ ধর্ম্মশাস্ত্রে আছে। বিবাহ সম্বন্ধে জাতিভেদের কড়াকড় অপেক্ষাকৃত অর্ব্বাচীন কালে হইয়াছিল। সকল দেশেই আর্য্যজাতি এমনি করিয়া আর্য্যেতর জাতির সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিল।

যদিও নিঃসংশয়ে এ কথা এখনো বলা যায় না, তবু মনে হয় আর্য্যজাতি এক সময়ে ভূতপূর্ব্ব ব্যাবিলনীয় ও হিটাইট সাম্রাজ্যের চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। যে যে স্থানে আর্য্যগণের প্রতিষ্ঠান ছিল সেই সেই স্থানে পূর্ব্বে নানাজাতির বাস ছিল, ব্যাবিলনের সভ্যতা, দ্রাবিড় সভ্যতা ও সম্ভবতঃ মঙ্গোলীয় সভ্যতা সজীব ছিল। আর্য্য-জাতি ভারতে আগমন করিবার পূর্ব্বে হউক পরে হউক এই সমুদয় জাতির সহিত অনেকটা মিশ্রিত হইয়া গিয়াছিল, একথা সত্য হইলে প্রাচীন আর্য্য-শাস্ত্র যাঁহারা রচনা করিয়াছেন তাঁহারাও যে খাঁটি আর্য্য ছিলেন এ কথা সাহস করিয়া বলা যায় না। অথর্ব্বাঙ্গিরাসের ভিতর যে সব আচার-অনুষ্ঠান পাই, ঋগ্বেদেও যে সমুদয় আচার অনুষ্ঠানের সন্ধান পাই, তার ভিতর অনেকটা যে এই সব অন আর্য্য জাতি হইতে গৃহীত নয় তাহা কে বলিবে?

আর্য্য জাতির বিবাহ-বিধান হইতে এ সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে, অপেক্ষাকৃত অর্ব্বাচীন কালে ব্রাহ্ম, দৈব, আর্য, প্রাজাপত্য এবং আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ এই অষ্টবিধ বিবাহের পরিচয় পাওয়া যায়। স্থানান্তরে আমি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে ব্রাহ্ম বিবাহই আদিম আর্য্য বিবাহ-পদ্ধতি†।

আসুর গান্ধর্ব্ব রাক্ষস ও পৈশাচ বিধি অনার্য্য জাতি-গণের বিবাহ-বিধান হইতে ধার করা। আসুর-বিবাহে কন্যা মূল্য দিয়া ক্রয় করা হয়। আসুর জাতির (Assyrian) মধ্যে কেবল এই উপায়েই বিবাহ হইত, তাহা আমরা জানিতে পারি। রাক্ষস বিধান অদ্যাপি ভারতের বহু স্থানে অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে প্রচলিত। ইহা ভারতের আদিম অধিবাসীদিগের নিকট ধার করা এ কথা মনে করা অসঙ্গত হইবে না। এ সম্বন্ধে আমাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে দ্রাবিড় দেশের প্রাচীন সাহিত্যে রাক্ষস নামক মনুষ্যজাতির কথা উল্লেখ আছে, পাণিনীও এই জাতির উল্লেখ করিয়াছেন। গান্ধর্ব্ব বিবাহও ঐরূপ গান্ধারবাসী গন্ধর্ব্ব জাতি হইতে গৃহীত হওয়া আশ্চর্য্য নহে।

উল্লিখিত প্রবন্ধে আমি আরও দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি, যে, এই সমস্ত বিজাতীয় হীন বিবাহগুলিকে আর্য্য সংস্কার দ্বারা শোধিত করিবার চেষ্টায় দৈব, আর্ষ ও প্রাজাপত্য বিবাহের সৃষ্টি হইয়াছিল। আসুরাদি বিবাহ দ্বারা কেবলমাত্র লৌকিক উপায়ে নারীর উপর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, কিন্তু আর্য্য বিবাহের প্রধান ব্যাপার স্বামী স্ত্রীর অদৃষ্ট সম্বন্ধ। সেই অদৃষ্ট-সম্বন্ধ ঘটায় শাস্ত্রীয় সংস্কার। সুতরাং নিকৃষ্ট বিবাহগুলিকে সংস্কার শোধিত করিয়া বিশেষভাবে আর্য্য-অনুষ্ঠান করিয়া লইয়া যে বিবাহ-পদ্ধতির সৃষ্টি হয় তাহারই নাম দৈব আর্য ও প্রাজাপত্য। পরবর্ত্তী কালে, ইহাতেও যখন কুলাইল না তখন আসুরাদি বিবাহকেও সংস্কারযুক্ত করিয়া লওয়া হইল। বশিষ্ঠের মতে আসুরাদি বিবাহে সংস্কার না হইলে তাহা বিবাহ বলিয়া গণ্য হয় না। এই উপায়ে অনার্য্য অনুষ্ঠান সংস্কৃত করিয়া আর্য্য সভ্যতার সঙ্গে সমীকৃত করিয়া গ্রহণ করা হইল।

সুতরাং আর্য্যজাতি যে "অন আর্য্য" জাতির সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ ভাবে গোড়া হইতেই মিশিয়া গিয়াছিল এবং "অন আর্য্য" জাতির নিকট আচার-অনুষ্ঠান অনেক ধার করিয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

কিন্তু এ কথা স্বীকার করিলেও বাঙ্গালীর বা ভারত-

* Hall, History of the Middle East p. 257 61

† প্রতিভা ১৩২০—'প্রাচীন ভারতে বিবাহ বিধান'।

বাঙালীর অনার্যত্বের প্রমাণ হইল না। শরীর-হিসাবে মানুষ একটা উচ্চ অঙ্গের পশু, কিন্তু অন্তরের হিসাবে সে একটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জাতি। এই অন্তরটাই হইল মানুষের বেশীর ভাগ। পশু হিসাবে মানুষের বিভাগ এবং তার মনের হিসাবে বিভাগ সর্বসময় মিলে না। ইংরেজ জাতির মধ্যে অনেকের কুলজী দেখিলে দেখা যায় ঠেকাতে হইবে একটা ফরাসীর নামে।" জার্মান দার্শনিক কান্টের পূর্বপুরুষ একজন স্কটলণ্ডবাসী। তাই বলিয়া কান্টকে স্কচ এবং মার্টিনোকে ফরাসী বলিয়া গণনা করিলে যে ভুল হইবে সে বিষয়ে কি সন্দেহ আছে? মানুষের মন দেখিয়া তার Cultureএর হিসাবে যে শ্রেণিবিভাগ, সেটা পশুবিভাগ হইতে স্বতন্ত্র।

নৃতত্ত্ববিদ্ আর্যজাতি বলিয়া বর্তমান মনুষ্য জাতির কোনও বিভাগ স্বীকার করেন না; কিন্তু আর্য ভাষা আর্য Cultureএর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অস্বীকার করেন না। আমরা আর্য কি অনার্য, আমাদের পশুত্ব হিসাবে এ কথার কোনও সার্থকতা নাই। কিন্তু আমাদের Cultureএর দিক হইতে এ প্রশ্নের একটা সার্থক উত্তর পাওয়া যায়। বাঙালীর মন, তাহাদের Culture আর্য কি না এই কথাটাই অনুশীলনের যোগ্য। নাক চোখের মাপ দিয়া বাঙালীর আর্যত্ব ও অনার্যত্ব প্রতিষ্ঠা হয় না।

বাঙালীর শরীর মঙ্গোল হউক বা দ্রাবিড় হউক বা কোল হউক, তার মন জ্ঞান ও আচার আর্য কিনা, সেইটাই জিজ্ঞাস্য।

এ প্রশ্নের সমাধান করিতে গিয়া একটা কথা স্মরণ রাখা দরকার। কোনও জাতির Culture সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিতে হইলে দেখিতে হইবে প্রধানতঃ সমাজের শীর্ষস্থানীয় শ্রেণীগুলির আচার, বিজ্ঞান, ভাষা ও ধর্ম। নিম্নস্তরের মন দিয়া সমগ্র সমাজের Culture বিচার করা যায় না। নিম্নস্তরের যে জাতীয় জীবনের উপর কোনও প্রভাব নাই এ কথা বলি না, কিন্তু সে প্রভাব গৌণ। প্রধানতঃ নিম্নস্তরই উচ্চস্তরের নিকট তাহাদের Culture প্রাপ্ত হয়।

এ সম্বন্ধে আর একটা কথা আছে যে কোনও জাতির আর্যত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে গেলে আমাদের একথা প্রমাণ করিতে হইবে না যে তাদের মন তাদের আচার অনুষ্ঠান, তাদের ভাষা সমস্তই তিন চার হাজার বছরের পূর্বেকার আর্যজাতির সঙ্গে আগাগোড়া মিলিয়া যায়; কালবশে প্রভেদ হইবেই। তা ছাড়া আর্য-সভ্যতা তাহার অনার্য আবেষ্টন হইতে যে অনেক জিনিষ আপনার ভিতর টানিয়া লইবে তাহাও নিশ্চয়। এই ধরিয়া লওয়া যায় যদি আর্য সভ্যতা ও আর্য জীবনের আদর্শের সহিত সমীকৃত হইয়া থাকে, মূল কথা এই ইতিহাসের মূল প্রাণের প্রবাহটা যদি আর্যের প্রাণ হয় তবে আর্যত্ব বজায় থাকে। ডিমটি ফুটিয়া যেমন পাখীটি হয়, সমাজের ক্রমবিকাশ কখনই সে রকম হয় না। সমাজ বাড়িতে হইলে পরিণত জীব শরীরের ন্যায় বৃদ্ধি ও পুষ্টির উপাদান সংগ্রহ করে তাহার সমস্ত বাহ্যিক আবেষ্টন হইতে। সুতরাং আর্য জাতির চিন্তা ভাব ও আদর্শের স্রোত পদে পদে চতুর্দিক হইতে অনার্যের জাতির ভাব চিন্তা ও আদর্শ লইয়া পুষ্ট হইয়াছে। কিন্তু ছাগল ঘাস খাইয়া শরীর-পুষ্টি করে বলিয়া যেমন ছাগল ঘাস হইয়া যায় না, আমরা পাঁঠা খাইয়া শরীর পোষণ করিয়া পাঁঠা হইয়া যাই না, তেমনি আর্য সভ্যতা ও culture অনার্য আচার অনুষ্ঠান লইয়া নিজের পুষ্টি করিয়াছে বলিয়া সে অনার্য হইয়া যায় না। আসল প্রশ্ন এই যে প্রাণের ধারায় মূল প্রবাহটা আর্য না অনার্য।

এই কথা স্মরণ রাখিয়া বাঙালীর চিত্তজগৎ অনুসন্ধান করিলে আমরা কি দেখিতে পাই সেই কথাটা বিচার্য। চিত্তজগতের নানা প্রকাশের দিক হইতে একথা বিচার করা যাইতে পারে। একটা দিক আমাদের ভাষা। ভাষাতত্ত্ববিৎ সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছেন যে আমাদের ভাষাটা তামিল তেলেগুর সামিল। সংস্কৃতের সামিল নয়। আমি ভাষাতত্ত্ববিৎ নহি, কিন্তু কথাটা অসংশয়ে মানিয়া লইতে পারিলাম না। কিন্তু এ বিষয়ের আলোচনা করিয়া অনধিকার-চর্চা করিব না। কারণ সুনীতি বাবুও একথা অস্বীকার করেন না, যে বাঙলা ও প্রাকৃত প্রধানতঃ সংস্কৃতের বিকৃতি, সংস্কৃত ভাষা ভিন্নজাতির মুখে যাইলে যেমন বিকৃত হইতে পারে,

তেমনি বিবৃত। এইটুকুই আমার পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের পক্ষে যথেষ্ট। একথা যদি সত্য হয় তবে বাঙ্গলা ভাষা আর্য্যবংশীয়।

আমাদের চিত্ত-জগতের আর একটা প্রকাণ্ড অংশ আমাদের সামাজিক জীবনে পাই। আমাদের জাতীয় জীবনের সব চেয়ে স্থায়ী এবং দৃঢ় বন্ধন আমাদের সামাজিক আচার অনুষ্ঠান, বিধি নিষেধ, ধর্ম্ম ও ব্যবহার। এই দিকটা আমাদের স্মৃতিশাস্ত্র। বাঙ্গালী হিন্দুর উচ্চ-শ্রেণীর মধ্যে জীবনের প্রত্যেক [illegible] টি ব্যাপার যে স্মৃতির বিধান দ্বারা নিয়মিত একথা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবে না। সে স্মৃতির ইতিহাস আলোচনা করিলে বেদের আমল হইতে রঘুনন্দন বা শ্রীকৃষ্ণ পর্য্যন্ত একটা না একটা অবিচ্ছিন্ন ধারার সন্ধান পাই। [illegible] প্রাণশক্তি ও কেন্দ্র আর্য্যের প্রাণ। [illegible] যে আচার অনুষ্ঠান [illegible] আমাদের আহ্নিক [illegible] নিত্যকৃত্য [illegible] অষ্টাদশ সংস্কার পদ্ধতি সকলই সেই আচারাদি [illegible] সম্পূর্ণ [illegible] না হইলেও তাহাকে পরিণতি [illegible]। [illegible] জীবনে [illegible] জীবনের [illegible] সকল [illegible] আমরা [illegible] অনুষ্ঠান [illegible] আলোচনা করিলে আমরা [illegible] স্থানে স্থানে ইহা পারিপার্শ্বিক অবস্থা-পরিবর্ত্তনের সহিত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, [illegible] বাহির হইতে কোনও নিয়ম বা অনুষ্ঠান ইহার ভিতর আসিয়া ঢুকিয়াছে, কিন্তু বাহির হইতে যাহা আসিয়াছে তাহা সম্পূর্ণভাবে সমীকৃত হইয়া, আর্য্যসভ্যতার ভাণ্ডারে জারিত হওয়া তবে সমাজে স্থান পাইয়াছে। সুতরাং এদিক হইতে দেখিলেও দেখিতে পাই যে আমরা দ্রাবিড় হই বা মঙ্গোলীয় হই, আমাদের Culture, আমাদের সভ্যতা, আর্য্যসভ্যতা। বুদ্ধদেবকে যখন শুদ্ধোদন পুত্র বলিয়া সম্বোধন করিলেন তখন তিনি উত্তর করিয়াছিলেন যে, আমি তোমার পুত্র নহি আমি পূর্ব্ববুদ্ধদিগের বংশধর। আমাদের আধ্যাত্মিক জীবন সম্বন্ধে দ্রাবিড় ও মঙ্গোলকে আমাদের এমনি উত্তরই দিতে হইবে।

বাঙ্গালীর চিত্তজগতের, শুধু কি সমস্ত ভারতবাসীরই চিত্তজগতের এমন কতকগুলি প্রকাশ আছে যাহার মূল আমরা প্রাচীন আর্য্যসাহিত্যে খুঁজিয়া পাই না। তাই বলিয়া এগুলিও যে ভারতীয় আর্য্যসমাজ বলিতে যে প্রাচীন মিশ্র সমাজ বুঝি, তাহার ভিতর ছিল না একথা জোর করিয়া বলা অসম্ভব। আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থের মধ্যে যে সমসাময়িক সকল সামাজিক তথ্য ধৃত আছে এমন কথা মনে করা অসঙ্গত হইবে। সে সময়েও সমাজের ভিতর এমন সব তথ্য ছিল, যাহা কোন শাস্ত্র খুঁজিয়া পাইবার উপায় নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমাদের মেয়েলী শাস্ত্র ধরা যাইতে পারে। [illegible] আচার অনুষ্ঠান ও সংস্কারযুক্ত শাস্ত্র ইহার বেশী [illegible] কোনও কথা বেদে পুরাণে নাই। কিন্তু [illegible] ইহা [illegible] হইতে প্রচলিত স্ত্রী পুরুষের লৌকিক ধর্ম্ম প্রচলিত থাকা অসম্ভব নহে। আপস্তম্ব তাঁহার ধর্ম্মসূত্রের শেষে বলিয়াছেন, গ্রন্থে যাহা লেখা হইল তাহা ছাড়া অন্যান্য কথা স্ত্রীলোকদিগের নিকট [illegible]। ইহা কি মেয়েলী শাস্ত্রের দিকে [illegible] কিন্তু [illegible] স্ত্রীলোকদের [illegible] [illegible] প্রাচীন [illegible] মেয়েলীশাস্ত্রের অনেকগুলি তত্ত্ব [illegible] মেয়েলীশাস্ত্রেও যে প্রাচীন [illegible] ধারা প্রসূত এবং ইহার মধ্যে বাহিরের যে জিনিষ আসিয়াছে তা প্রাচীন ধারার সহিত সমীকৃত একথা বলা যাইতে পারে।

তারপর আমাদের দেশে অবস্থাগতিকে কতকগুলি বিশিষ্ট ধর্ম্মমত ও ধর্ম্মসম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছিল। সেই সব ধর্ম্মমত বা সম্প্রদায়ের যে আর্য্যধর্ম্মের প্রধান ধারার সহিত কোনও সংযোগ ছিল না, একথা কেহ বলিতে পারি না। তাহার কতকগুলির মূল হয় তো আমাদের লৌকিক সংস্কারের, হয়ত কি প্রচলিত মঙ্গোলীয় সংস্কারের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু সেগুলি যখন আর্য্যধর্ম্মের সহিত সমন্বিত ও সমীকৃত হইয়া গৃহীত হইয়াছিল তখন তাহার বলে বাঙ্গালীর সভ্যতা আর্য্যেতর জাতি হইতে প্রাপ্ত একথা অনুমান করা সঙ্গত হইবে না।

সুতরাং আমাদের চিত্ত-জগৎ হিসাবে আমরা আর্য্যবংশীয়। পশুহিসাবে আমরা কোন্ দলে তাহা নির্ণয় করা কঠিন। তবে আমরা খাঁটি আর্য্য নই তাহা নিশ্চয়। কেবল তাহাও নয় খাঁটি আর্য্য বলিয়া কোনও জাতি জগতে নাই এবং আর্য্যদের মূলে মানবজাতির কোনও শ্রেণী বিভাগ করা চলে না। কাজেই আমরা আর্য্য কি না, এ কথার উত্তর কেবল Culture এর দিক হইতেই দেওয়া চলে। সে হিসাবে আমরা আর্য্যবংশীয়।

শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

নারায়ণ কার্ত্তিক, ১৩২১।

সরযু জোর

নিরাসনে কাঁদছে কে গো ?—
অন্তরের কোন কন্যা এ গো !—
জলের ধারা কোন্ কাহার চোখে ?
শুকায় না ক' আঁখির পাতা,
করুণ প্রাণে এমন ব্যথা
কোন্ প্রাণে রে কে দিল গো এঁকে ?

বালির পাঁজর টুন্‌কো হিয়া
কে ভাঙিল আঘাত দিয়া ?
কে দেখা'লি হৃদয় খুলে ওরি।
বেদন-ভরা অশ্রুময়,
কা'র বিরহে কাতর আয়,
নয়ন-জলের কে তুই ভরাভরী।

বুকের নীচে পাথর ঢেকে,
তবু আশার স্বপন দেখে,
পাথর ঠেলে উঠাও চলে যেতে,
উপল-ঘায়ে রোদন ভরে
বিরহেরি টনক নড়ে,
জাগায় ব্যথা স্মৃতির অলক্ষেতে।

মনের কথা যাচ্ছে শোনা,
বুকের উপল যাচ্ছে গোনা—
পথের ছায়া আঁখির দরপণে,
এমন সরল কমলটিরে
কে ভাসালে নয়ন-নীরে ?—
হায়, প্রণয়ীর দরদ নাহি মনে।

শব্দ নাহি, নাইক সাড়া,—
একটি শুধু চোখের ধারা
দিন যামিনী এমনি করে' ঝরে,
একটি শুধু গানের লীলা—
একটি ব্যথা অন্তঃশীলা
আবেগ ভরে উছ্‌লে খালি পড়ে।

মৌনতারি নিঝুম ঘরে
একটি কথা বেড়ায় ঘুরে',—
উপত্যকায় তাকায় মিছে আশা।
দিন-দুপুরের ঝিলিক-আলো
অন্ধকারে মুখ ফিরালো,
হৃদয়ে মরে অবুঝ ভালবাসা।

টুন্‌টুনিরা ঝুটির 'পরে
রাখ্‌তে বৃথা চেষ্টা করে,
ক্ষুদ্র নখের ক্ষুদ্র স্নেহ-কণা!
ঝল্‌কে এসে কিরণ নারী,
চল্‌কে উঠে কাঁখের ঝারি,
মিলায় পায়ে মায়ার আলিপনা!

ছড়ের ছলে এলায় আসি'
রবির আলো, চাঁদের হাসি,
সজল করে শুধুই আঁখি-পাতা ;
সুখের কথা—কান্না-ভরা,
সান্ত্বনা তা'র—অশ্রু-ছড়া,
পরাণি যা'র ব্যথার রেশে গাঁথা।

একটুকুও' কল্‌কলানি,
একটুখানি থড় ফড়ানি,
শিলংয়ে-শিলায় একটু লুটোপুটি,
সুখ-পেয়ালায় শেষ-তলানি,
তোরেই আমি মিষ্টি মানি,
তোরই তরে এ'মোর ছুটোছুটি!

পড়িয়ে গেছে কোথায় জানি
এই পরাণের আধেক খানি
ওই নয়নের আগ্‌-কোঁটাতে তোর!
পিছ্‌-কোঁটাতে পিছিয়ে পড়ে'
কোথায় যেন কাঁদ্‌ছে ওরে
আধেক হিয়া—লো নয়ন্‌-চোর!

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

চয়ন

রুষ-লেখক সোলোগাব

সোলোগাব রুসিয়ার একজন সুবিখ্যাত লেখক। তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন—তাহার মধ্যে ইংরেজীতে ভাষান্তরিত হইয়াছে মাত্র কয়েকখানি। কিন্তু সোলোগাবের আসল বিশেষত্ব যে-সব রচনায় ফুটিয়া উঠিয়াছে, দুঃখের বিষয় অনুবাদকরা সেগুলির দিকে এখনো দৃষ্টিপাত করেন নাই।

সোলোগাব কবি, চিন্তাশীল ও স্বপ্নদর্শক। তাঁহার মানস-ভাব এত সূক্ষ্ম ও গভীর যে, আমাদের রবীন্দ্রনাথের মতন তাঁহারও রচনা পড়িয়া জন-সাধারণ যথার্থ রসবোধ করিতে পারে না। দার্শনিকরাও তাঁহার লেখা পছন্দ করেন না, কারণ তাঁহার শব্দচিত্রে রঙের লীলা অফুরান। সুতরাং এই দুই অতি-নিম্ন এবং অতি-উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে থাকেন যে-দলের পাঠকরা, কেবল তাঁহারাই সোলোগাবের লেখা পড়িয়া খুসি হন।

জান্‌লার ধারে বসিয়া যে-সব লেখক পথের দৃশ্য-প্রবাহ দর্শন করেন এবং তাহার বর্ণনামাত্র করিয়াই ছাড়িয়া দেন, সোলোগাব তাঁহাদের দলের নন। এইখানেই লেখকের সঙ্গে তাঁহার প্রভেদ। তিনি খালি পুতুল-খেলার মতন লোকের মেলা দেখিয়াই খুসি হন

না—সেইসঙ্গে আরো দেখিতে চান—কিসে এরা চলা-ফেরা করিতেছে, কোন্ অদৃশ্য হস্ত এদের খেলাইতেছে? তিনি প্রশ্ন করেন এবং অনুমান করেন—কিন্তু দার্শনিকের ভাষায় নয়, কারণ তাঁহার কাছে সে ভাষা একান্ত নীরস। আপনার মানস-ভাবকে ফুটাইয়া তুলিবার জন্ত তিনি রূপক, কথা ও কাহিনীর আশ্রয় গ্রহণ করেন। দৈনিক জীবন-যাত্রার মাঝখানে তাঁহার কাহিনীগুলি বিচিত্র কল্পনায় কুসুমের মতন বিকশিত হইয়া ওঠে। কিন্তু তিনি কল্পনার আনন্দ-লহরীতে গা-ভাসান দিবার জন্ত মনোগৃহের দরজা খোলেন না, ভাবকে ও চিন্তাকে চিত্রিত করিবার জন্তই স্বপ্নাকাশের উধাও কল্পনাকে সংযত করিয়া নামিয়া আনিয়া, তিনি ছোট ছোট শব্দ-চিত্রে লেখায় লেখায় জাগাইয়া তোলেন।

এইজন্তই সোলোগাব জনসাধারণের মন রাখিতে পারেন না। তিনি নিজে এ-কথা জানেন ও মানেন। কিন্তু কেউ তাঁকে ভালোবাসে কিনা, সে-সব কোন-কিছুর তোয়াক্কা তিনি রাখেন না। তাঁহাকে তাঁহার লেখার মানে বুঝাইয়া দিতে বলিলে তিনি জবাব দেন :—

"মনে ভাবের আবেগ হ'লেই মানুষ লিখ্‌তে বসে; কিন্তু সে সময়েও সে যদি আপনার ভাবকে ব্যক্ত কর্‌তে না পারে, তবে পরে যখন মন থেকে ভাবের আবেগ চলে যায়, তখন সে কি ক'রে সেই অস্পষ্টতার আসল ব্যাখ্যা দিতে পার্‌বে?"

সমস্ত কবি-প্রকৃতিরই এই একই ধারা। তাই কবির কাছে যারা তাঁর রচনার অর্থ জানিতে যায়, তারা কবির উপরে যথার্থ শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রকাশ করেনা।

সোলোগাবের মতন প্রতিভাবান লেখকরা শব্দের ঐন্দ্রজালিক হইয়া থাকেন। তাঁহারা যাহাকে আকার দিয়া প্রকাশ করেন, তাহাকে আমরা সকলেই অনুভব করি, কিন্তু প্রকাশ করিতে পারি না।

সোলোগাব তাঁহার সাহিত্য-জীবন শুরু করেন কবিরূপে। তাঁহার কবিতায় দেখা যায়, তিনি সর্ব্বত্রই মানুষের চিরন্তন জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন, কিন্তু যে উত্তরে মনের সকল সন্দেহ কাটিয়া যায়, তাহা তিনি বিশ্ব ঢুঁড়িয়া কোথাও পাইতেছেন না।

"কেন এবং কিসের জন্ত এই মানব-জীবন?"

"সমস্ত জীবনটাই খেলা এবং সে খেলায় কোন লক্ষ্য নেই।"

"সমস্ত জীবনটাই মিছা জাঁকজমকে ভরা এবং লক্ষ্যহীন স্বপ্নমাত্র। বেঁচে থাকার কোন মানে পাওয়া যায় না।"

"Oppressive Dreams" নামে কাব্য-পুস্তকে তিনি জীবনের এই ব্যর্থতাকেই নানা-ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন।

"একজন চলন্ত মানুষ তিনবার থুথু ফেল্‌লে। মানুষ কোথায় চলে গেল, কিন্তু থুথু পড়ে রইল।

প্রথম থুথু বল্‌লে, "আমরা এখানে আছি, কিন্তু সে মানুষটি আর নেই।"

দ্বিতীয় থুথু বল্‌লে, "সে চলে গেছে।"

তৃতীয় থুথু বল্‌লে, "সে খালি আমাদের এখানে ফেল্‌বার জন্তেই এসেছিল। আমরাই হচ্ছি মানুষের অস্তিত্বের লক্ষ্য। মানুষ চলে গেছে, কিন্তু আমরা আছি।"

জীবন-সম্বন্ধে হতাশ হইলেও সোলো-

গানের মধ্যে অর্থপূর্ণ হাস্যরসের অভাব নাই। "বুড়ো-বুড়ী"র কাহিনীই তাহার প্রমাণ।

"এক যে ছিল বুড়ো, তার এক ছিল বুড়ী।

বুড়োর বয়স পাঁচশো আর বুড়ীর চারশো।

বুড়ো পেতো মোটা পেন্সন। কিন্তু সে টাকাগুলো বুড়ীর হাতেই সঁপে দিত—খরচ চালাবার জন্যে।

বুড়ো সাজগোজ করত ঠিক নব-যুগের মতন, আর বুড়ী তার মাথায় চুলে কলপ মাখাত।

বুড়ো ফুঁকত সিগারেট আর কাপড়ে মাখ্‌ত আতর।

বুড়ী চুষ্‌ত লজঞ্জুস আর যেত থিয়েটার দেখ্‌তে।

বুড়ো একদিন সিগারেটে খুব কষে দম্ ভ'রে মার্‌লে এক টান—আর-এক টান—আর এক টান! শেষ-টানে সে শিঙে ফুঁকে চলে গেল যমের বাড়ী।

বুড়ী একদিন অপেরার গান শুনতে শুনতে, গলার সপ্তাশর বের ক'রে খুব চেঁচিয়ে বললে—এঙ্কোর—এঙ্কোর—এঙ্কোর। সেই চ্যাচানিতেই দম ফেটে সে থিয়েটারের ভিতরে পড়্‌ল আর মল।

কিন্তু এতে শোক করবার কিছু নেই। দুনিয়ায় আরো বুড়ো, আরো বুড়ী আস্‌বে।"

এই সুরে সাহিত্য-জীবন সুরু করিয়া, সোলোগাব শেষে জীবনের তরলতার দিক ছাড়িয়া তাহার গভীরতার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। তাঁহার "The Little Demon" নামক দীর্ঘ উপন্যাসে তিনি সমাজের মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর তুচ্ছ জাঁকজমকের একখানি ব্যঙ্গচিত্র আঁকিয়াছেন, কিন্তু সোলোগাবের পাকা হাতের সুন্দর আভাস পাওয়া যায়, তাঁহার "The Lily and the Cabbage" নামক সুন্দর কাহিনীতে। ইহার মধ্যে তিনি সমাজের চিরাচরিত বাঁধা-ধরা রীতিনীতির উপরে তিনি প্রচণ্ড বজ্রাঘাত করিয়াছেন।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

মড়া কি জ্যান্ত হয়?

বিলাতের একখানি প্রামাণিক বৈজ্ঞানিক কাগজে এ-সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, আমরা তাহার সার-মর্ম তুলিয়া দিলাম।

মাঝে মাঝে শোনা যায়, মরা মানুষ ফের জ্যান্ত হইয়া উঠিয়াছে। পুনর্জীবন লাভ করিয়া তাহাদের অনেকে বলে যে, দেহের অস্থায়ী মরণের সময়ে তাহারা "স্বর্গ" দেখিয়া আসিয়াছে। কেউ-বা কিছুই বলিতে পারে না—মৃত্যুর সময়ে তাহারা সম্পূর্ণ বিস্মৃতির অন্ধকারে বাস করিয়াছিল। যাঁহারা চিকিৎসা শাস্ত্র, মনোবিজ্ঞান ও বিজ্ঞান লইয়া আলোচনা করেন, মরণের পরে আত্মা কোথায় যায়, এই বিষয় লইয়া তাঁহারা অনেকদিন ধরিয়া তর্কাতর্কি করিয়া আসিতেছেন।

বৈজ্ঞানিকদের চোখের সামনে সংপ্রতি একটি আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছে। মিসেস

এলিজাবেথ ব্লেকের বয়স বাহাত্তর বৎসর। দশ বৎসর বয়স হইতেই তাঁহার দেহে "শায়াডভামে"র ক্ষমতা প্রকাশ পাইয়াছিল। গত মার্চমাসে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার ডাক্তারগণ তাঁহাকে মৃত সাব্যস্ত করেন। তাঁহার দেহ মড়ার মতন শক্ত হইয়া আসে এবং সে দেহে নাড়ীর গতি, হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন বা নিশ্বাসের কোন লক্ষণ ছিল না। এইভাবে তাঁহার দেহ অর্ধঘণ্টা ছিল। তারপর আবার তাঁহার দেহে জীবনের লক্ষণ ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসে। প্রথমে তাঁহার চোখের পাতা বার কয়েক কাঁপিল, তারপর দেহ নড়িয়া উঠিল, তারপর চোখ মেলিলেন, তারপর তাঁহার ঠোঁট স্পন্দিত হইল।

তিনি বলিলেন, 'আমি প্রেত জগতে গিয়েছিলুম, আঃ, সে কি চমৎকার দেশ! সেখানে আমার স্বামী আর এগারোটি সন্তানের সঙ্গে কথা কয়ে এসেছি।" আবার পার্থিব জীবন লাভ করার দরুণ তিনি অত্যন্ত দুঃখপ্রকাশ করিতে লাগিলেন।

মিসেস্ ব্লেক দিনকতক বেশ সুস্থ দেহে রহিলেন। তারপর আবার তিনি মরণাহত হইয়া পড়িলেন এবং ডাক্তাররা আবার তাঁহাকে মৃত সাব্যস্ত করিলেন। ঘণ্টাএক পরে আবার তিনি জীবিত হইয়া উঠিলেন এবং তাঁহার আত্মাকে পুনরায় জরাজীর্ণ দেহে ফিরিয়া আসিতে দিয়াছেন বলিয়া স্বামীকে উদ্দেশে বকিতে লাগিলেন। গত ১০ই এপ্রিল তারিখে তাঁহার তৃতীয়বার মৃত্যু হয় এবং এবারে আর তিনি জীবনলাভ করেন নাই।

এই ঘটনার কথা জানিয়া একজন নামজাদা ডাক্তার বলিয়াছেন, "লোকে যার যেমন খুসি ভাবিতে পারেন। যাঁর ইচ্ছা, বিশ্বাস করুন যে, মিসেস্ ব্লেকের আত্মা স্বর্গে গিয়ে আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। কিন্তু চিকিৎসা-বিজ্ঞানের মত এই যে, চারিটি কারণের দরুণ মিসেস্ ব্লেকের অমনধারা দশা হইতে পারে। হিষ্টিরিয়া, আত্মসম্মোহন, মোহপীড়া (Catalepsy) বা মূর্ছারোগ। মূর্ছারোগের সাদাসিধে নাম হইতেছে, সাধারণ দুর্বলতা; যাহাতে দেহের সমস্ত কাজ বন্ধ হইয়া যায়। প্রগাঢ় মূর্ছাকে আমরা Syncope-এর আক্রমণ বলি এবং এই অবস্থা বহুক্ষণস্থায়ী হইতে পারে।"

মোহপীড়ার আক্রমণে মানুষের হাত-পা'কে যে-ভাবে রাখিবেন, সেইভাবেই তাহা থাকিবে।

অনেক জন্তু জানোয়ারকে রক্তস্রাব করাইয়া "মারিয়া" ফেলিয়া, আবার তাহাকে জীবন্ত করা হইয়াছে। অনেক মানুষকে এথরের দ্বারা "হত্যা" করিয়া, ঘণ্টাকতক পরিশ্রমের পর আবার তাহাকে বাঁচাইয়া তোলা হইয়াছে। বিষাক্ত বাষ্পের দ্বারা অনেককে যমের দুয়ারে পাঠাইয়া, কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাসের সাহায্যে আবার তাহাকে ফিরাইয়া আনা হইয়াছে। বিদ্যুৎ সাহায্যে পশুদের "হত্যা" করিয়া আবার বিদ্যুতের দ্বারাই তাহাদের জীয়াইতে পারা গিয়াছে।

এক্ষেত্রে স্বভাবতই প্রশ্ন উঠে, "জীবন কাহাকে বলে?" এর ঠিক জবাব আজ পর্যন্ত কেউ দিতে পারে নাই। যদিও কোন কোন লোক বলিয়া থাকেন, জীবনটা বিদ্যুৎ প্রবাহ ছাড়া আর কিছুই নয়,—শুধু

এখানে মুস্কিল হইতেছে এই যে, এঁরা আপনাদের অনুমানকে সত্য বলিয়া প্রমাণিত করিতে পারেন নাই।

কিন্তু বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডাক্তার জ্যাকো লোয়েব এই প্রশ্নের সম্পূর্ণ উত্তর দিতে না পারিলেও, সমস্যার অনেকটা সমাধান করিয়াছেন। নানা পরীক্ষার পর সংপ্রতি তিনি মদ্দা ব্যাঙের কোন সাহায্য না লইয়াই, মাদী ব্যাঙের গর্ভ হইতে কৃত্রিম উপায়ে স্বাস্থ্যসবল বাচ্ছা ব্যাঙের জন্ম দিতে পারিয়াছেন।

এর উপায়ও খুব সরল। প্রথমে মাদী ব্যাঙের ডিম বা ovum লইয়া তার মাঝখানে ছোট্ট একটি ছাঁদা করা হয় (আলপিনের সামান্য খোঁচা দিলেই চলে), তারপর তাহাতে কোন নিস্তেজ অ্যাসিড প্রয়োগ করা হয়। তারপর কোন বিশেষ রাসায়নিক পরিবর্ত্তনের ভিতরে আনিয়া, শেষে সেই অণ্ডটিকে একরকম পুষ্টিকারক তরল রাসায়নিক পদার্থের মধ্যে স্থাপন করা হয়। যথাসময়ে সেখানে একটি ব্যাঙাচি জন্মগ্রহণ করে।

এর-মধ্যে সব-চেয়ে আশ্চর্য্য ব্যাপার এই যে, ঐ পিতৃহীন কৃত্রিম উপায়ে জাত ব্যাঙের লিঙ্গ-গ্রন্থির ভিতরেও অণ্ডের অভাব হয় না। সুতরাং মদ্দা জীবের অস্তিত্ব না থাকিলেও এইভাবে চিরকালই নূতন জীব-সৃষ্টি চলিতে পারিবে।

জীবনের সমস্যা এইভাবেই কতকটা সমাধান করা হইয়াছে। এখন "মরণ" কি, দেখা যাক্। মিসেস্ ব্লেকের "মরণে"র মতনই আর-একটি ঘটনার কথা বলিতেছি। এক যুবা ডাক্তার কেরো প্রেণ আফিমের সার খাইয়া মৃত্যুমুখে পড়েন। আফিমের সারের এক প্রেণই যখন মারাত্মক বলিয়া মান্য হয়, তখন তেরো প্রেণ আফিমের সার খাইলে যে মৃত্যু একেবারে সন্দেহের অতীত, সে কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। বিশেষ, কয়েকজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসকও পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছিলেন, সেই যুবকের দেহে জীবনের কোন লক্ষণই বর্ত্তমান নাই।

যাহা হউক, সেই অবস্থাতেই ডাক্তাররা সকলে মিলিয়া বিষ-প্রতিষেধক সমস্ত উপায় এবং কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাসের দ্বারা, যুবকটিকে আবার চাঙ্গা করিয়া তুলিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেলেন। প্রায় বারোঘণ্টা ধরিয়া অশ্রান্তভাবে পরিশ্রম করিবার পর যুবকের দেহে আবার জীবনের লক্ষণ ফুটিয়া উঠিল। আরো কিছুকাল পরিশ্রমের পর সেই "মৃত" যুবক আবার "জ্যান্ত" হইল।

রকফেলার ইনষ্টিটিউটের ডাক্তার সামুয়েল জে, মেল্‌ট্‌জার এই ঘটনাটির সত্যতা সম্বন্ধে সকলকেই নিঃসন্দেহ হইতে বলিয়াছেন। কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাসের আধুনিক নিয়ম উদ্ভাবন করিয়াছেন তিনিই। তাঁহারও মতে ঐ যুবক ডাক্তার সম্পূর্ণরূপেই মৃত হইয়া পরে আবার জীবনলাভ করিয়াছিলেন।

কিন্তু এখানে সকলেই যেন মনে রাখেন যে, ঐ ডাক্তার বাঁচিয়া উঠিয়া, পরলোকের কোন কথাই বলিতে পারেন নাই।

শ্রীপ্রসাদদাস রায়

কলিকাতা—২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীকালাচাঁদ দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।



ভারতী

৪৪শ বর্ষ]　　পৌষ, ১৩২৭.　　[৯ম সংখ্যা

মরণ-বাঁচনের কথা

আমাদের জাতীয়-জীবনের প্রধান সমস্যা 'মরণ-বাঁচনের' কথা। কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য যে আমরা "বিশ্বরাজনীতির" (World-Politics) বড় বড় কথা লইয়া উন্মত্ত, অথচ নিজের আত্মনিবটের কথা,—যাহা চোখের সম্মুখে ক্রমেই ভয়াবহ মূর্ত্তিতে পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে,—সে দিকে কাহারও বেশী মনোযোগ দেখিতে পাইতেছি না। বৈদ্য যাহার গঙ্গাযাত্রায় আশঙ্কা করিতেছে, সে রোগী যদি বারোয়ারী তলায় যাত্রা দেখিতে ব্যস্ত হইয়া পড়ে, তবে তাহা যুগপৎ হাস্য ও করুণ রসের কারণ হইয়া পড়ে।

Statistics বা সংখ্যা সংগ্রহের যদি কোন মূল্য থাকে, তবে ইহাই বলিতে হয় যে সমগ্র বাঙ্গলা দেশটা ক্রমেই ভয়াবহ মরণ [illegible] মধ্যে ডুবিয়া যাইতেছে। বৎসরের পর বৎসর বাঙ্গলা দেশের মৃত্যু-সংখ্যা বাড়িয়া যাইতেছে, আর [illegible] সংখ্যা হইতে মৃত্যুসংখ্যার আধিক্য দেখা যাইতেছে। অবস্থাটা এমনই শোচনীয় যে, একজন স্কুলের ছেলেও অঙ্ক কষিয়া বলিয়া দিতে পারে—কবে আমাদের জাতির সমাধি হইবে। অনেকে বিজ্ঞ ঘাড় নাড়িয়া বলেন, যুদ্ধের সময় থেকে পৃথিবীর নানাদেশের ন্যায়, আমাদের দেশেও, ইনফ্লুয়েঞ্জা, প্লেগ প্রভৃতি রোগের প্রাদুর্ভাব স্বাভাবিক কারণেই হইয়াছে, লোকও একটু বেশী মরিতেছে। কিন্তু বিজ্ঞেরা এই কথাটা তলাইয়া বুঝেন না যে, সমস্ত জাতিটা কেন এত রোগ-প্রবণ হইয়া পড়িয়াছে। রোগের বীজ ও সংক্রামক অণুপরমাণুর সঙ্গে চারিদিকেই ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। রোগ-প্রতিষেধের যে সমস্ত প্রাণশক্তি মধ্যে আছে, তাহাই তাহাকে এই সব ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাইয়া রাখিতেছে। এই প্রাণশক্তি যখন ক্ষীণ হইয়া পড়ে তখনই জাতির মধ্যে নানা রোগের প্রাদুর্ভাব হয়। সুতরাং আমাদের

জাতির জীবনীশক্তি যে অত্যন্ত হ্রাস হইয়া পড়িতেছে তাহা ত বেশ বুঝা যাইতেছে। কথাটা এমন শোচনীয়রূপে স্পষ্ট, যে স্বয়ং মণ্টেগু সাহেবও পাকে-প্রকারে ইহা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।

এই জীবনীশক্তি হ্রাসের কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলেই মনে পড়ে, দেশব্যাপী ঘোরতর দারিদ্র্য। নোয়াখালির একজন কৃষক অনাহারে মরিবার সময় বলিয়াছিল, "এক মুঠা ভাতের অভাবে আজ আমি মরিলাম।" কথাটা শুধু সেই মরিবে কৃষকের নহে,—উহা যেন সমগ্র দেশের অন্তঃস্থল ভেদ করিয়া উঠিয়াছে। বুভুক্ষা-পীড়িত দেশের এরূপ আত্মার কাতর মর্ম্ম-বেদনা, যেন ঐ কথার মধ্যে মূর্ত্তি ধরিয়া দেখা দিয়াছে। দুইবেলা পেট ভরিয়া খাইতে পারে এমন লোক এই বিপুল দেশে কয়জন আছে? দৈনিক একমুঠা আহারও কাহারও জোটে, তাও জোটে না। পরণে ছেঁড়া ন্যাক্‌ড়া, কাহারও একখণ্ড আছে, কাহারও নাই। অথচ, মজুর ও কৃষকও ত অলস নহে, সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত খাটিয়া খাটিয়া তাহাদের বুকের রক্ত জল হইয়া যায়। আর ছেঁড়া কামিজ ও ছেঁড়া চটী পরিয়া, মুখে একখণ্ড পান গুঁজিয়া, যে সব ক্ষীণকায় বাবুর দল অনাহারে বা অর্দ্ধাহারে আদালতে ছুটাছুটি করে—তাহাদের কথা মনে করিতে গেলেই আমাদের রক্ত তুষারের মত হিম হইয়া যায়। যে দুবেলা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না; অনাহারে যাহার দেহের শিরা-উপশিরা বিকল, সে কেমন করিয়া রোগ-রাক্ষসের কবল হইতে আত্মরক্ষা করিবে?

ইতিহাসে পড়ি—ম্যামথ নাকি পৃথিবী থেকে উঠিয়া গিয়াছে, কিন্তু ভারতবর্ষের অবস্থা দেখিয়া সে বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ হয়।

ঘোর-প্যাঁচ করিয়া যাহাই বল, যতই মার্শনক্‌শা ও পাণ্ডিত্য প্রকাশ কর, আসল কথা এই যে, জীবন-সংগ্রামে আমরা ক্রমেই হটিয়া যাইতেছি। যে প্রাচীন জাতি এতকাল ধরিয়া এত আঘাত সহ্য করিয়াও কোন-প্রকারে বাঁচিয়াছিল, আজ বুঝি তাহাকে ধরা-পৃষ্ঠ হইতে লুপ্ত হইতে হয়। বুঝি মায়া-জাতিদের যেরূপ অবস্থা হইয়াছিল, আমাদেরও তাহাই হয়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যখন প্রথম আমরা এই কথা বলিয়াছিলাম, তখন কেহ কেহ ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া বলিয়াছিলেন "কি, আমাদের সঙ্গে মায়াদের তুলনা? আমরা কত সভ্য,—তারা ছিল অসভ্য, ইত্যাদি।" কিন্তু বোধ হইতেছে যে ভগবান আজ আমাদের এই বৃথা গর্ব্ব ও অন্ধ সংস্কার দূর করিতে উদ্যত হইয়াছেন। ধ্বংসপ্রবণ জাতির মধ্যে যে-সব লক্ষণ প্রকাশ পায়, আমাদের মধ্যে সে সবগুলিই ক্রমে ক্রমে বিশেষভাবে প্রকাশ পাইতেছে। (আমরা কতকগুলি প্রবন্ধে ধারাবাহিকরূপে এই কথা "নারায়ণ" ও "ভারতী"তে আলোচনা করিয়াছি।) প্রবল জাতির সংস্পর্শে আসিয়া এ পর্য্যন্ত প্রায় কোন দুর্ব্বল জাতিই আত্মরক্ষা করিতে পারে নাই। হয় প্রবল জাতির সঙ্গে মিশিয়া তাহার মধ্যে আত্মসমর্পণ করিয়াছে, নয় একেবারে লুপ্ত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত ডারুইনের সুপরিচিত গ্রন্থে কয়েকটী দেখা যাইতে পারে। সেই

ভয়াবহ সঙ্কিক্ষণ আজ আমাদেরও সম্মুখে উপস্থিত ;—জীবনযুদ্ধে আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া আমরা ক্রমেই হটিয়া যাইতেছি। দেহ আমাদের দুর্বল, মন আমাদের নিস্তেজ, আমাদের ঐশ্বর্য্য সম্পদ আজ স্বপ্ন কথার প্রায়,—শিল্প-বাণিজ্য অতীতের কাহিনী। মিউজিয়মের ঘরে অতীত জীবের কঙ্কাল যেরূপ ভাবে রাখিয়া দেয়, আমাদের অবস্থা প্রায় সেইরূপ হইয়া দাঁড়াইতেছে। দেশের নেতারা হাত-মুখ নাড়িয়া টাউনহলে যখন লম্বা লম্বা বক্তৃতা দেন, বা মনের সম্মুখে ভারতের ভবিষ্যৎ গৌরবের ছবি আঁকেন, তখন আমাদের মন দুঃখে ভরিয়া যায়

ধ্বংস প্রবণ জাতির মধ্যে ধ্বংসের পাকালে জন্ম-সংখ্যার হ্রাস হইতে থাকে ; রমণীরা ক্রমশ বন্ধ্যা হইয়া আসে,—অর্থাৎ উৎপাদিকা শক্তি তাহাদের লুপ্ত হইয়া যায়। মাওরীদের মধ্যেও এইরূপ হইয়াছিল। অনেক প্রাচীন ধ্বংস প্রবণ জাত-জাতির মধ্যেও এরূপ দেখা গিয়াছিল। শুনিলে আশ্চর্য্য হইবেন যে, অনেক ধ্বংস-প্রবণ জাতির মধ্যে আবার ইহার প্রায় উল্টা আর-একটা লক্ষণ দেখা যায়,—সেটা হইতেছে জন্ম সংখ্যার অত্যাধিক্য ;—সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুসংখ্যার আধিক্য। কথাটা জীব-তত্ত্বের একটা গভীর সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। জীবের মধ্যে আত্মরক্ষার যে প্রবল ইচ্ছা, তাহা সকলেরই জানা আছে। উহারই আর [illegible] মূর্ত্তি বংশরক্ষা বা জাতিরক্ষার ইচ্ছা। ই[illegible] কথায় "Self-preservation" ও (Self) "reproduction"—উভয়ই একই "Struggle for [illegible]xistence (জীবন-সংগ্রাম)

এর দুই পার্শ্ব। মৃত্যু যতই নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে, আত্মলোপের কথা যতই বেশী মনে হইতে থাকে,—জীব ততই বংশরক্ষার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে। যক্ষ্মারোগীর মধ্যে কাম বা বংশোৎপাদন প্রবৃত্তির এইজন্য অত্যন্ত আধিক্য দেখা যায়। ধ্বংস প্রবণ জাতিরও ঠিক এই যক্ষ্মারোগীর অবস্থা হয়। আসন্নমৃত্যুর বিভীষিকা অনুভব করিয়া সে আত্মরক্ষা বা জাতিরক্ষার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়ে। তাই ধ্বংস-প্রবণ জাতির মধ্যে একদিকে যেমন মৃত্যুসংখ্যার আধিক্য, অন্যদিকে তেমনই জন্ম-সংখ্যার আধিক্য হইয়া পড়ে। কিন্তু এরূপ অবস্থা বহুকাল থাকে না। বৃদ্ধি হইতে ক্ষয়ের দিককার শক্তিই বেশী প্রবল হওয়াতে, মৃত্যু-সংখ্যা শীঘ্রই বাড়িয়া যায় ও জন্ম সংখ্যা শীঘ্রই কমের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে। শেষে জন্মসংখ্যার হ্রাস (মাওরীদের মত) হইতে থাকে। আমাদের দেশে এখন পূর্ব্বের অবস্থা,—যেমন জন্ম সংখ্যার আধিক্য —তেমনি মৃত্যু-সংখ্যার আধিক্য। কিন্তু ইতিমধ্যেই মৃত্যু-সংখ্যা জন্মসংখ্যাকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। শীঘ্রই মাওরীদের দশা আমাদের হইবে বলিয়া খুবই আশঙ্কা করিবার কারণ আছে।

কিন্তু এই ধ্বংস হইতে রক্ষার উপায় কি? অনেকেই বলিবেন বিভীষিকার দিকটাই ত দেখাইয়া দিলে, কিন্তু আশার কথা কি কিছু নাই? উত্তরে সহজেই মনে আসে, রোগ প্রতিকার কর, জাতির অন্ন সংস্থান কর, শিল্প-বাণিজ্যের বৃদ্ধি কর ইত্যাদি। কথাগুলা ঠিকই। কিন্তু এক হিসাবে বলিতে হয়—"[illegible] যবে. আগে কহ আর।"

শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি, রোগ-প্রতিকার, অন্ন-সংস্থান করিবে কে? যে করিবে সেই জাতীয় আত্মা যে দীন হইয়া পড়িয়াছে! গাছের মূলেই যদি জীবনীশক্তি না থাকিল, তবে ডাল-পল্লবের শোভা কেমন করিয়া আসিবে? তাই মনে হয়, এই আত্মার দীনতা কিসে ঘুচে, তাহাই হইতেছে, আসল কথা।

পরলোকগত আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর জীব-তত্ত্বের সমুদ্র মন্থন করিয়া যে সারসত্যের অমৃত তুলিয়াছিলেন তাহা এই—"জীবনের মূলই হইতেছে বাঁচিয়া থাকিবার ইচ্ছা।" আমি বাঁচিবই, আমাকে বাঁচিতেই হইবে—ইহাই হইতেছে জীবনের ভিত্তি। এই যে ইচ্ছাশক্তি, ইহাই সমগ্র জীবকে ধারণ করিয়া আছে। ব্যষ্টিগত ভাবে যাহা সত্য,—সমষ্টিগত ভাবেও তাহাই সত্য। জাতির জীবনীশক্তির মূলে এই বাঁচিবার প্রবল ইচ্ছা। যে জাতি মরিতে চায় না—মৃত্যুকে পদে পদে তাহার কাছে পরাস্ত হইতে হয়। ধ্বংসপ্রবণ জাতির মধ্যে এই ইচ্ছাশক্তি হ্রাস হইয়া পড়ে। জীবনযুদ্ধে শ্রান্তক্লান্ত হইয়া জরাজীর্ণ স্থবির আর বাঁচিবার ইচ্ছাকে হারাইয়া ফেলে;—ঠিক যেন আফিসের কেরাণীর মত। আমাদের আজ সেই দশা। যদি বাঁচিতে হয়, তবে এই ইচ্ছাশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতে হইবে; সুপ্তা কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করিতে হইবে। আমাদের সঙ্কল্প আমরা বাঁচিবই—এই বিরাট বিপুল বিশ্বের প্রাণের লীলাক্ষেত্রে আমাদের নিতান্তই যোগ দিবার প্রয়োজন। তপস্যা দ্বারা জাতীয় আত্মাকে শতদল-পদ্মে এইরূপে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। তখন স্বাস্থ্য-সম্পদ, শিল্প-বাণিজ্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের লক্ষ্মী আপনিই আসিয়া তাহার উপরে চরণস্থাপন করিবেন।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার।

পতিতা

রজনী প্রহর যায়—
সব কাজ করি সায়,
পা দিয়েছি পথের উপর,
শুধু ও কানের কাছে,
একেবারে প্রাণে বাজে,
এ কাহার আর্ত্ত কণ্ঠস্বর!

সারা দিন মেঘে মেঘে
শ্রাবণ ঝরিছে বেগে,
কামনা করিছে আনা-গোনা!

আর্দ্র শীত বর্ষা-বায়ু
কাঁপায়ে তুলিছে স্নায়ু,
বিজলীতে ঝলিতেছে সোনা।

পথের নাহিকো সাথী—
জনহীন স্তব্ধ রাতি
ঝিমায়ে ঢুলিছে তন্দ্রা-জাল!

সারা দিবসের চাপে
অবসন্ন হিয়া কাঁপে,
পার হ'তে উঠেছে এ কোল।

আধ ঘুমে—আধ জাগি'
চলেছি ঘরের লাগি,
কোন মতে ভাঙি অবসাদ,
সহসা কানের কাছে
একেবারে প্রাণে বাজে
এ কাহার চাপা আর্ত্তনাদ।
কে আজ এমন রাতে,
এই বর্ষা-বৃষ্টি-পাতে
খুলে দেছে মনের দুয়ার।
এই ঝরঝারি মত
কোথাও কি মেঘ নত,
ওখানেও জেগেছে জোয়ার?
থমকি তাকায়ে দেখি—
ও হ'রি! হেথায় এ কি,
পথে কে যে পড়িয়া বিহ্বল।
ফেলিতে প্রদীপালোক
অপলক দুটি চোখ
ফাঁপেয়ো কি নেমেছে বাদল?
কোলে বিড়ালের ছানা;
গৌর তনু দেহখানা
লাবণ্যের তুলিছে লহরী,
মেঘের ধারায় ভিজে
জমাট যৌবন নিজে
পথের উপরে আছে পড়ি।
অকস্মাৎ একেবারে—
ঝুঁকিয়া পথের ধারে
যেমন টানিব দেহখান,
সে কি কান্না বুক-ভাঙা,
বেদনায় রক্তে রাঙা
সে কি আর্ত্ত কাতর আহ্বান।

•   •   •

ভাবিনু মনের ভ্রান্তি—
সারা দিবসের ক্লান্তি
ঘটিয়াছে এতগুলা ভুল,
ভালো ক'রে আঁখি মুছে
আবার দেখিনু খুঁজে
পথে পড়ে ঝরা বন-ফুল।
শ্রাবণের ধারাগুলি
মুক্তাসম আছে দুলি
ঘিরে ঘিরে কালো কেশপাশ,
তখনো মাথার পরে
বাদল পড়িছে ঝরে,
হা—হা—ক'রে শ্বসিছে বাতাস।
কিছুক্ষণ সব ভুলি
দৃষ্টিহীন আঁখি তুলি
দাঁড়ায়ে রহিনু—তার পর,
মূর্চ্ছিতারে তাড়াতাড়ি
একেবারে নিনু কাড়ি
কাদা হ'তে বুকের ভিতর।

•   •   •

বাহিরে মেঘের দোলা,
সমুখে দুয়ার খোলা,
কে আছ গো? কহিলাম হাঁকি,
—হেথা এস, দেখো চেয়ে,
বুঝি তোমাদেরি মেয়ে,
মরার বিশেষ নাহি
ঘরে ঘরে দ্বার বাঁধা,
আঁধারের আর্ত্ত কাঁদা
দিকে দিকে উঠিতেছে ফিকে,
ভাঙিয়া স্তব্ধতা সব
ঘোর-কণ্ঠ কলরব
আছাড়িছে জানালায় চিকে।

ভাবিতেছি শূন্য গেহ,
    পোড়ো বাড়ী, নাই কেহ ;
        কি যে করি খোঁটাইছি মনে ,
সহসা দুয়ার ঘেঁসে
    কে যেন দাঁড়াল এসে
        আগুন ভরিয়া আঁখি-কোণে!
কহিল—পারিনে ছাই,
    এমন তো দেখি নাই,
        এ যে বাপু বড় বাড়াবাড়ি,
সেই আজ কোন্ ভোরে,
    বিড়ালটা গেছে মরে,
        মেটেনি এখনো জের তারি।
শোনো তবে কাণ্ডখানা—
    ঐতো বেড়াল-ছানা,
        মানুষ করেছে ঐ বটে,
সারাদিন তারি লাগি
    কাঁদিয়া কেটেছে জাগি,
        বসে নাই ভাতেরো নিকটে।
কেঁদে কেঁদে শ্রান্ত যবে
    ঘুমায়ে পড়েছে সবে,
        ছানাটারে চুরি ক'রে আমি,
জানলা গলায়ে পথে
    ফেলেছিনু কোনো মতে—
        এত সব তাহারি ভ্যাকামি!
প্রাণ বলে কিছু নাকি
    আমাদের আছে বাকী!
        দেহ বেচে মিটাই অভাব,
বিড়ালের ছানা ও ত—
    মানুষ মেরেছ কত
        তারি কিছু রেখেছ হিসাব?

•   •   •

শয্যায় দেহটি থুয়ে,
    বারেক সমুখে নুয়ে
        ধীরে এসে দাঁড়ানু বাহিরে,
কোনো কথা নাহি বাক
    খোলা দ্বারে এনু চলি,
        বিস্ময় বহিয়া আঁখি-নীরে।
আর্দ্র অজগরবৎ
    পড়ে আছে দীর্ঘ পথ,
        বাদলে বিকল চারিভিত,
মাঝে মাঝে থেকে থেকে
    কা—দা বায়ু ওঠে কেঁকে,
        নভতল চিরিছে তড়িৎ।
একই পথে বারে বারে
    ঘুরিয়া ঘরের দ্বারে
        অবশেষে দাঁড়ানু যখন,
তখনো বুকের তাকে
    তেমনি করিয়া বাজে
        তারি আর্ত্ত করুণ রোদন।
রূপের পসরা বয়ে
    দিন যার গেছে ক্ষয়ে,
        দেহের বেসাতি করে যারা,
এই কি তাদেরি নারী!—
    সহসা নিশ্বাস ছাড়ি
        ক্ষণেক রহিনু মুগ্ধ পারা!
তার পর শয্যা-খানি
    কখন্ নিয়েছি টানি,
        বালিসে বেঁধেছি আলিঙ্গনে,
কখন্ চোখের কাছে
    নিদ্রা নেমে আসিয়াছে
        এতটুকু নাহি তায় মনে।

•   •

সমস্ত শ্রাবণ-রাতি
করিয়াছে মাতামাতি
মেঘ আর মাতাল বাতাস,
কেবল তন্দ্রার মাঝে
কানে এসে বাজিয়াছে
তাদেরি কঠিন অট্টহাস!"

কেবল ঘুমের ঘোরে
স্তব্ধ হৃদয়ের দোরে
মাঝে মাঝে হেনেছে অশনি,
একেবারে বুক-ভাঙা
বেদনার রক্তে রাঙা
পতিতার আর্ত্ত কণ্ঠধ্বনি!

শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়।

সম্ভোগ-তত্ত্ব

যদি আমাদের কেহ সমগ্র বিশ্ব সমস্যার মীমাংসা করিয়া, এক কথায় মানুষের কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া দিতে বলে, তাহা হইলে, আমরা বলিব, "মানব! তোমার কর্ত্তব্য অতি সহজ। এই বিশ্ব তোমারই জন্য সৃষ্ট। এই বিশ্বের যাহা কিছু—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ—সকলই তোমার সুখের জন্য,—তোমার আনন্দের জন্য—তোমার আত্মবোধ জাগাইয়া দিবার জন্য অবস্থিত। যাও মানব! তোমার সুখের রাজ্যে—তোমার যাহা-কিছু আছে—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার সব দিয়া বিশ্বকে উপভোগ কর—তবেই সেই পরম-সুন্দরের উপলব্ধি করিতে পারিবে—কিছুমাত্র দ্বিধা করিও না—সঙ্কোচ, লজ্জা, ভয়, ঘৃণা কিছুই হৃদয়ে স্থান দিও না। ওগো [illegible] একনিষ্ঠ সাধক, কর্ত্তব্য তোমার সম্মুখে—[illegible] এই বিশ্ব তোমার বন্ধনের জন্য [illegible]র জন্য। যতক্ষণ তুমি সংকীর্ণ, [illegible]ই তুমি ক্ষুদ্র, ততক্ষণই তুমি বদ্ধ—কোন ক্ষুদ্র জিনিষের উপর তোমার দৃষ্টি রাখিও না,—ভূমাকে তোমার আদর্শ কর। তুমি যতই ছোট জিনিষের দিকে ছুটিবে ততই তুমি নিজের নিজের চারিদিকে অসংখ্য বন্ধনের সৃষ্টি করিয়া, আপনাকে কোষবদ্ধ গুটিপোকার মত জড় হইয়া ফেলিবে। অনন্তের দিকে তোমার দৃষ্টি প্রসারিত কর—তোমার প্রাণের ক্ষুধাকে জাগাইয়া সমগ্র বিশ্বের দিকে ছুটাইয়া দাও—দেখিবে কি আনন্দ, কি তৃপ্তি! এই নূতন যুগের নূতন সাধনায় কিছুই ত্যাগ করিতে হইবে না—সবই গ্রহণ করিতে হইবে—বিশ্বের যা' কিছু, কোনদিকে বাদ দিলে চলিবে না,—জানিও, এই বিশ্বের যেটুকু ও যতটুকু তোমার সম্ভোগের তালিকা হইতে বাদ পড়িবে, তুমি সেই পরিমাণেই অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে, তোমার আত্মা সেই পরিমাণেই সঙ্কুচিত ও সংকীর্ণ হইয়া থাকিবে।"

এ বিশ্ব আনন্দময়ের লীলা-নিকেতন—আনন্দেই ইহার জন্ম, আনন্দেই ইহার

স্থিতি এবং আনন্দেই ইহার পরিণতি। "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি।" দুঃখ, বিষাদ, কলহ, রোগ, শোক, মৃত্যু—ইহাদিগের কোনটিই বিশ্বের প্রকৃতি নহে—এ সমস্তই মনুষ্যের নিজের সৃষ্ট—আত্মকৃত অপরাধের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। মানুষ নিজেই নিজের বন্ধন সৃষ্টি করিয়া বিশ্ব-নিয়ন্তাকে গালি দেয়।

মানুষ চায় ভোগ, কিন্তু ভোগের আসল প্রকৃতিটুকু সে জানে না, তাহাতেই অল্পের মধ্যে ভূমার, ক্ষুদ্রের মধ্যে বৃহতের ও সান্তের মধ্যে অনন্তের সন্ধান করিতে গিয়া, ব্যর্থ-মনোরথ হয় এবং হা-হুতাশ করিতে থাকে। "যো বৈ ভূমা তৎ সুখম্ নাল্পে সুখম্ অস্তি।" সুতরাং তাহার ভোগ তাহার মুক্তির কারণ না হইয়া অধিকাংশ স্থলেই তাহার বন্ধন ও আসক্তিরই হেতু হইয়া থাকে। তখন কেহ কেহ ত্যাগকেই জীবনের আদর্শরূপে বরণ করিয়া ত্যাগের নামে ধ্বংসের—বৈরাগ্যের নামে দীনতা ও হীনতার আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক, অন্তর্নিহিত ব্রহ্মকে আরও সঙ্কুচিত করিয়া ফেলে। ফলতঃ ভোগই মানুষের জীবনের চরম আদর্শ।

শ্রুতি ভগবানের প্রকৃতি নির্দ্দেশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন—'রসো-বৈ-সঃ'—তিনি যদি রসস্বরূপ হইলেন—তখন, তাঁহার সাধক হইতে গেলে, আমাদিগকেও রসিক হইতে হইবে এবং রসচর্চ্চা ও রসসাধনায় আমাদিগের সম্ভোগ-শক্তিকে জাগ্রত ও উদ্বুদ্ধ করিয়া বিশ্বের এই অনন্ত রস-প্রবাহের মধ্যে [illegible] নিজেকে নিঃশেষে ও নিঃসংশয়ে [illegible] ঢালিয়া দিতে হইবে। তবে, ভোগের আসল প্রকৃতিটুকু ভুলিলে চলিবে না। আমরা অনেক সময়ে, ভোগের সেই আসল প্রকৃতি-টুকু ভুলিয়া যাই বলিয়াই কষ্ট পাই। সম্ভোগ করিতে হইবে বলিয়া, আমরা অনেক সময়, ক্ষণিক সুখের আশায় মধুলুব্ধ মক্ষিকাবৎ সংসার-ভাণ্ডে নিপতিত হইয়া বিষয়রসে বিজড়িত হইয়া পড়ি এবং পরিশেষে আমাদিগের উত্থান ও উদ্ধার-শক্তি হারাইয়া অশেষ প্রকার দুর্গতি ভোগ করিয়া থাকি।

কিন্তু, চাহিয়া দেখ ঐ মুক্তপক্ষ, প্রফুল্ল ভ্রমরটি কেমন গুন্-গুন্ করিয়া পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে গমনপূর্ব্বক চারিদিকে আনন্দের হিল্লোল তুলিয়া মধুসঞ্চয় করিতেছে। অনবরত কার্য্য করিতেছে—এদিক ওদিক ছুটিয়া বেড়াইতেছে—প্রাণে আনন্দ, হৃদয়ে উৎসাহ ও দেহে অদম্য কর্ম্ম-শক্তি লইয়া কর্ম্মের সাধনা করিতেছে আর বিশ্ব-রাজ্যে যত মধু আছে—পৃথিবীর চক্ষে যাহা অতি নীরস, কঠোর ও শুষ্ক—তাহার মধ্য হইতে মধুসঞ্চয় করিতেছে;—অথচ দেখ, সে কত মুক্ত—কত স্বাধীন, ক্ষুদ্রের মধ্যে সংকীর্ণের মধ্যে তাহার আনন্দ নাই—সে একের মধ্যে আবদ্ধ নহে—ছুটিয়াছে বহুর দিকে—অসীমের দিকে—অনন্তের দিকে।

মানুষ, তুমিও ছোটো বহুর দিকে, অনন্তের দিকে। সান্তের মধ্যে তৃপ্তি চাহিও না, ক্ষুদ্রের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখিও না—তোমার সম্ভোগের গণ্ডী বাড়াইয়া [illegible] বিশ্বের সহিত আপনাকে একাত্ম [illegible] সম্পূর্ণ [illegible] দাও, তুমি [illegible] পাইবে।

সম্ভোগ-তত্ত্ব ও বৈরাগ্য

পূর্ব্বে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে ভোগই মনুষ্য-জীবনের চরম লক্ষ্য। "জীবনটাকে উপভোগ কর", ইহাই প্রকৃতির নির্দ্দেশ এবং তজ্জন্য যাহা-কিছু ইন্দ্রিয় ও মনোবৃত্তির প্রয়োজন, ভগবান তার কোনটি থেকেই মানুষকে বঞ্চিত করেন নাই। কিন্তু এই সকল মনোবৃত্তি ও ইন্দ্রিয়াদির পরস্পরের মধ্যে সমতা রক্ষা এবং তাহাদিগের সুসঙ্গতিভূত বিকাশের উপরেই মানুষের উপভোগ করিবার শক্তি নির্ভর করিতেছে। এইখানে সম্ভোগ-তত্ত্বের সহিত বৈরাগ্যের সম্বন্ধ। বৈরাগ্য বা ত্যাগ জীবনের উদ্দেশ্য নহে—ভোগই উদ্দেশ্য, ত্যাগ তাহার উপলক্ষ্য বা উপায় মাত্র। ত্যাগ বিনা ভোগ অসম্ভব। ত্যাগের ভিতর দিয়াই ভোগকে ধরিতে হইবে। নচেৎ ত্যাগহীন ভোগ উচ্ছৃঙ্খলতার নামান্তর মাত্র। উচ্ছৃঙ্খলতায় মনুষ্যের সুখ কোথায়? যাহাকে উপভোগ করিতে হইবে তাহাকে আমাদের সকল ইন্দ্রিয় ও সমস্ত মনোবৃত্তি দিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে; যে পরিমাণে ঐ সকল ইন্দ্রিয় ও মনোবৃত্তির পরস্পরের মধ্যে সামঞ্জস্যের বিচ্যুতি ঘটিবে, সেই পরিমাণেই আমাদিগের ভোগ জিনিষটা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে, আর যে পরিমাণে আমরা আমাদিগের সমস্ত মনোবৃত্তি ও ইন্দ্রিয় সঙ্কুচিত করিয়া, বিষয়ান্তর হইতে আহরণ পূর্ব্বক ভোগ্য বিষয়ের উপর নিক্ষেপ ও কেন্দ্রীভূত করিতে পারিব—সেই পরিমাণেই আমরা ঐ বিষয়ের প্রকৃত জ্ঞানলাভ করিয়া সেই লীলাময়ের লীলারস আস্বাদনে সমর্থ হইব। ভগবান এই বিশ্বকে এবং বিশ্বের মধ্যে যাহা-কিছু আছে, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ—আত্মারূপে, প্রাণরূপে, অন্তর্যামী ও সর্ব্বসাক্ষীরূপে ওতঃপ্রোতভাবে বিশ্বের সহিত মিলিয়া তৎসমুহ সম্ভোগ করিবার জন্যই এই বিশ্বলীলার অবতারণা করিয়াছেন। তুমি আমি যদি বিশ্বকে উপভোগ করিতে চাই, তাহাতেই কি দোষ হয়?

তবে কথা আছে। আমাদের ভোগ—দানবের ভোগ, আমরা যাহা ভোগ করি, তাহা ধ্বংস করিয়া ফেলি এবং শেষে হাহাকার করি। ঐ যে সুরম্য গোলাপ ফুলটি প্রস্ফুটিত হইয়া আপনার সৌন্দর্য্যে ও মাধুর্য্যে আপনি বিভোর হইয়া চারিদিক সুগন্ধে আমোদিত করিতেছে, উহাকে ছিঁড়িয়া, দলিয়া, মথিত করিয়াই না আমাদিগের সুখ? কিন্তু ভগবান তাহা করেন না। তিনি সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করেন, ধ্বংস করেন না। দেখ দেখি, তিনি কেমন উহার সহিত আপনাকে মিশাইয়া দিয়া, নিজেই একেবারে পুষ্পময় হইয়া রহিয়াছেন এবং নিজের সকল সৌন্দর্য্য ঐ পুষ্পের মধ্যে ঢালিয়া দিয়া আপনার সত্তাটিকে সেই সৌন্দর্য্যের আবরণে আবৃত ও বিলুপ্ত করিয়া ফেলিয়াছেন। বাহিরে দেখি ফুল, কিন্তু ভিতরের খবর রাখি না, আর রাখিবারও যো নাই। এই যে সম্পূর্ণ আত্ম-বিলোপ—ইহাই ভগবানের সম্ভোগ-নীতি। বড় সহজ কথা নহে—সম্ভোগ করিতে কে পারে? যে ভোক্তা বস্তুর মধ্যে আপনার সমগ্র সত্তাটিকে ডুবাইয়া দিয়া নিজের দেহ মন ও আত্মার সকল সৌন্দর্য্য তাহার মধ্যে নিঃশেষে ঢালিয়া দিতে পারে, সেইই সম্ভোগ-

২

ভোগের প্রকৃত অধিকারী, সেই নরশ্রেষ্ঠই ভোগের প্রকৃত সাধক।

যাহাকে বৈরাগ্য বলি, তাহা একপ্রকার সাধনা মাত্র, তাহা মানুষকে প্রকৃত সম্ভোগের পথে লইয়া যায়। আমরা বাহিরের ভোগটাকেই খুব বড় করিয়া দেখি—স্থূল ইন্দ্রিয়ের কার্য্যটাকেই সব-চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানি—কিন্তু বাহিরের ইন্দ্রিয়ের ন্যায় আমাদের মনেরও যে ইন্দ্রিয় আছে—আত্মারও যে রূপ, রস, স্পর্শ, গন্ধ, শব্দ ধারণা করিবার শক্তি ও সাধনযন্ত্র আছে, তাহা ভুলিয়া যাই। যাহাকে সাধারণে ভোগের ত্যাগ বলিয়া থাকি—বৈরাগ্য বলিয়া কঠোর চক্ষে দেখি, তাহা এই মানসিক ও আধ্যাত্মিক সম্ভোগের সোপান মাত্র।

মনে কর, আমি একটি সুমিষ্ট আম্রফল পাইয়াছি, আমি নিজে তাহা ভক্ষণ করিলাম—স্থূল রসনেন্দ্রিয়ের কিঞ্চিৎ পরিতৃপ্তি হইল বটে, কিন্তু তাহা ক্ষণিক। ইহা একপ্রকার ভোগ বটে, কিন্তু এরকম ভোগকে প্রকৃত ভোগ বলা যায় না। ইহাতে দেহের পরিপুষ্টি হইল—কিন্তু, মন আত্মার পরিপুষ্টি হইল না। কিন্তু যদি ঐ ফলটি নিজে ভক্ষণ না করিয়া অনেক ব্যক্তির মুখে তুলিয়া দিতে পারিতাম এবং তাহার সত্তায় আপনার সমগ্র সত্তাটিকে মিশাইয়া দিয়া মনের মধ্যে, আত্মার মধ্যে—আত্মার যে ইন্দ্রিয় তাহাদ্বারা ঐ ফলটির মিষ্টস্বাদ গ্রহণ করিতে পারিতাম, বল দেখি তবে কি তাহা আমাদিগকে বাহিরের রসনার তৃপ্তি অপেক্ষা স্পষ্টতর ও মহত্তর তৃপ্তি আনিয়া দিত না? দেহের বিনাশ আছে—আত্মার বিনাশ নাই। সুতরাং দৈহিক সম্ভোগ অপেক্ষা আধ্যাত্মিক সম্ভোগই শ্রেষ্ঠ।

দেহের সম্ভোগ ক্ষণিক—দেহের বিনাশেই তাহা বিনষ্ট হইয়া যায়; কিন্তু আত্মার সম্ভোগ চিরন্তন—বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিনাশ প্রাপ্ত হইলেও তাহার বিনাশ নাই। যাহা ভোগ করিতে চাও তাহার প্রতি কোনরূপ মমতাবোধ রাখিও না—কেননা মমত্ববোধ সকল সৌন্দর্য্য নষ্ট করিয়া, সম্ভোগের মাত্রা কমাইয়া দেয়। অতএব তাহার সহিত শুধু দৈহিক মিলন না রাখিয়া মনোমধ্যে তাহার ধ্যান কর এবং আত্মার দ্বারা তাহার সহিত একীভূত হইয়া তাহাকে সমগ্র বিশ্বের সহিত মিলাইয়া দাও, লক্ষ লক্ষ দেহে লক্ষ লক্ষ প্রাণে, লক্ষ লক্ষ আত্মায় তাহার সৌন্দর্য্য ঝরিয়া পড়ুক—বিশ্বের সমগ্র নর-নারীর কণ্ঠে তাহার জয়গীতি বিঘোষিত হউক, দেখিবে কি আনন্দ, কি তৃপ্তি! ভগবান আমাদিগের সকলকে তাঁহার সম্ভোগ-লীলা বুঝাইয়া দিন—আমরা যেন প্রকৃত সম্ভোগের অধিকারী হইয়া ধন্য হইয়া যাই।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ রায়।

তফাৎ

দপ্তর-খানায় চাকরী করতো, বড্ড গরীব লোকটা। আপন-জন, সহায়-বন্ধু তার [illegible]—সংসারের ভিতর ছিল [illegible]। দিন-মজুরেরো বাড়া, হাড়-ভাঙা, খা[illegible] খাটুনীটা বেচারী খাটতো দিনটা [illegible]—পিঠ [illegible]—তক ভাবে—

বুকের রক্তটুকু জল হয়ে বেরিয়ে আস্তো যন্ত্রণা-ঘামের ডাগর ফোঁটায়।

মনিব-সরকার থেকে তন্‌খা যা আস্তো তাতে মাস-কাবারে পেটে খেতে হু'মুঠোই জুট্‌তো না—এর উপর আবার অল্প টাকা কুর্তা কেনা আছে—সাদা-কাপড়ের ঝোলা চাপকান, নইলে দপ্তরীর চাকরীটুকুও টেঁকে না। চার-চায়টে কচিবাচ্চা—একটুকু-টুকুন্—অষ্ট প্রহরই ভুঁয়ে পড়ে আছে, আর সকাল দুপুর, বিকাল-সন্ধ্যা বারো ঘড়ি চাইছে শুধু রুটী।

লক্ষ্মী তার বউটী। মুখে কথা নেই,—কাজল চোখে অশ্রুর কলঙ্ক নেই—অধরে হাসি আবছি শুকিয়ে গেছে—কিন্তু দীর্ঘ নিশ্বাসে কারো বিরুদ্ধে গুপ্ত অভিযোগও সে কখনো জানায় নি। গাঁটের পাশে গাঁট বাঁধা তার কাপড়খানা,—দেহ কঙ্কালসার, তরুণ মুখের কাঁচা রং পিংলে হয়ে গেছে—ভাসা চোখ, নেমে পড়া পাতা দুখানার নীচে বসে এসেছে। কোলের মেয়েটী, দুধের শিশু—কাঁচা কলার শুকনো গুঁড়ো গরম জলে গুলে তাকে খাওয়াতো—তাও কি পেট ভরে দিতে পেতো?—হায়রে কপাল। মুখের পানে তাকিয়ে মায়ের কালি-কালি, ময়লা কালো আঁচলখানা টেনে টেনে অস্পষ্ট, অকোটা তার ভাষায়—এক চুমুক খাবারের মিনতি-ভরা ভিক্ষা যখন সে জানাতো—মায়ের কাছে তখন তা অমৃতের পূর্ণ পাত্র উপুড় করে দিত না—পাঁজর [illegible]খানা তার হাজার টুক্‌রোয় ভেঙে যেতে [illegible] সে তাকে বুকের সুধার লহর ঢেলে দিতে [illegible]—নিজেকে দিয়েও যদি সন্তানকে বাঁচাতে পারে। কিন্তু দুদিন পরে একবেলা তার আধপেটা সে খাওয়া—কল্‌জের রক্ত-ফোঁটাই কি আর বক্ষের উৎসে এসে জম্‌তে পেতো!—মর্মের মাঝখানে জমাট-বাঁধা সে জমোট ব্যথাটা ছাতি-ফাটা নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে টাটিয়ে উঠে হতভাগীর দম্ বন্ধ করে আন্‌তো—কিন্তু কঠিন প্রাণটা তবু বেরুতো না তো।

মাথা গুঁজে তারা থাকতো একখানা এক-চালার নীচে—দেবতার তাও সহল না। দক্ষিণ থেকে হাওয়া সেবার ফাগুনেও আগুন হয়ে এসে শিল-হানা বৃষ্টির পিচকারি মেরে কোলি খেলে গেল বেচারীর চালাখানার বুকের উপর। মাতাল তার পায়ের ছন্দে এর যা কিছু ছিল, আবরণ-আচ্ছাদন, উড়ে গেল। রৌদ্রকে আর ধরে রাখা যায় না—হিম-হানা জর কি আর শাসন মেনে বাইরে দাঁড়িয়ে ঝিমোয়? সে এসে ছেলে-পুলে শুদ্ধ এই দম্পতীটীকে কাঁপিয়ে তুল্‌লো শিউরে উঠলো তাদের বুকের ছিদ্রে ছিদ্রে—আগুনের হল্‌কা ছড়িয়ে গেল তাদের গায়ের উপর।

এমন সময়—অকস্মাৎ—দূরান্তে কোথায় দিগন্ত-রেখায় নীলা মেঘজাই গায় জড়িয়ে নিজেরই সে কুটিল নিশ্বাসে আচ্ছন্ন একা—অলার-অলে হিম শিউরে শিউরে কেঁপে উঠ্‌ছিল—মৃত্যুর পরোয়ানা তাকে উগ্র, উত্তেজিত করে তুল্‌লে। এই দেশে সে বিকট হয়ে দেখা দিলে—হাড়ের নূপুর পায়ে দিয়ে—কেঁপে কেঁপে সেই আজন্ম-শ্যামল, হাওয়ায় হীরা-কাটা লীলায়িত রূপের উপর মরণ নিশ্বাসের ঘূর্ণী-তোলা গাঢ় পাণ্ডুর পুরু পর্দাখানা টেনে সে বিছিয়ে দিলে—

সেখানকার সে ভরপুর ভাণ্ডারের যত মণি-মাণিক্য চুর চুর করে মাটীতে মিশিয়ে দিয়ে রাক্ষসী নেশায় উন্মত্ত সে নিষ্ঠুর আপন আনন্দে নেচে উঠ্‌লো—সে কি উদ্দাম তাণ্ডব নৃত্য! ঘরে ঘরে দুর্ভিক্ষ নিয়ে এল—বিশ্ব-গ্রাসিনী ক্ষুধা, কঙ্কাল-সার দেহ—রক্ত-লোলিহান জিহ্বা—তারপর সকল-ভোলানো মৃত্যু!

লোকটা আর পারে না! চারদিন শুধু জল খেয়ে কাটিয়েছে—অবসন্ন পায়ের উপর আজ আর ভর দাঁড়িয়ে ওঠবার বল নেই। ক্ষুধায় শীর্ণ দেহ নিয়ে মানবের কাজ-ঘরের কড়া ফরমাস ক'দিনও খেটে এসেছে—কিন্তু আজ দেহ চল্‌তেই নারাজ।

ঘরে কোলের মেয়েটা জ্বরে পড়ে কোঁকাচ্ছে—গা খই-ফোটানো বালির মত তপ্ত আগুন! শীতে সে শিউরে উঠ্‌ছে—খাবার চাইছে না আজ—চাইবে যে, সে যে ঐ অদূরের আগল-হীন অবারিত দ্বারের ফাঁক দেখে মুক্তির অবাধ প্রসারের ভিতর বাঁধন-হারা ছাড়া পাবার জন্য অসীমের ঐ ঘন নীলিমার দিকে একমনে উধাও হয়ে উড়ে চলেছে!

মানবের বড়-ভালো যাঁরা চান্—তাঁরা চাকর নন্, চাকুরে। তাঁদেরই বাড়ী থেকে পেয়াদা এল ডাক্‌তে—আজ পাহারার কাজে দপ্তরীকে সারা রাত জাগ্‌তে হবে।

রোগ-ক্ষীণ স্বরে সে জিজ্ঞাসা করলে—"কেন—পাহারাদার?"

পেয়াদা উত্তর দিলে—"খেতে না পেয়ে সে মরে গেছে—আর দোসরা পাহারাদারও রাখা হবে না। দানা-রোটি, চাল-ডালের বড় দাম—"চাকুরে" আর চালাতে পারেন না। দপ্তরী যে, আজ থেকে বাড়ীপাহারার কাজও তার।"

"দপ্তর'র জান্ বাঁচে কিসে? কে বাঁচায়?—তার রুটী, এক টুক্‌রো শুক্‌নো রুটী—কে যোগাবে?"

"চাকুরের তা দেখ্‌বার অবসর নেই—হুকুম—তোমায় তামিল কর্ত্তেই হবে।"

"আর এই মেয়ে—তার শেষ নিশ্বাসটা না পড়া অবধি তাকে ছাড়ি কি করে? শীতে কাঁপ্‌ছে—ঢেকে দেবার ছেঁড়া একখানা আঁচলও নেই—বাপ, মা দুজনে আজ দুখানা বুকের মধ্যে ওর দেহখানি জড়িয়ে ধরে বসে আছি—বুকের গরমে যদি হিম কমে! কিন্তু তাই বা কই? বুকে গরম কই?—রক্ত নেই—অসাড়, বরফ!"

"নোকরের লেড়কা তো মর্‌বেই, চাকুরে বলেছেন—তাই বলে সে নিজে মরে কেন? দশ-বাজে হাজির না হলে—তন্‌খা কাটা যাবে—পাহারাওয়ালাকে পাহারায় আন্‌বেন।"

"তাঁর মেয়ের সাদি দিতে মাহিনা-ভর ছুটী নিলেন—তখন কি তাঁর তন্‌খা কাটা গেছ্‌লো?"

"না—ভারী নক্‌রী তাঁদের—তলব-শুদ্ধ ছুটী! দপ্তরীর ফিন্ ছুটী কি? আর তলবই বা সে পাবে কেন? আট রূপেয়া এক মাহিনায়—বহুৎ, ঢের!"

"হুঁ—"বল্‌তেই একটা মস্ত নিশ্বাস ক্ষুধাক্তের শীর্ণ পাঁজর কখানার উপর এক সঙ্গে হাজার শাণিত ছোরার শক্ত আ- ... হেনে বাইরে বেরিয়ে এসে পড়্‌লো, ... তার বুকের পাশে একটা কালো ... ছাপ

মেয়ে। বেচারী সেইখানেই বসে পড়লো, কিন্তু কাঁপছিল—থাকতে পারলে না—ধুলোর উপর সে লুটিয়ে পড়লো। পেয়াদা বল্লে—"ওহো—হায় হায়!" ওদিকে মনিব কুরসীতে বসে চটে টং হচ্ছিলেন—কাজের বে-বন্দোবস্ত—এখনো এলোনা বেটা পাহারায়!

একদল লোক যাচ্ছিল—ক্ষুধায় তারা রাক্ষস—পেট চিমসে লেগে পিঠের সঙ্গে এক হয়ে গেছে। নড়ি নড়ি হাত পা—ভাগ্য মাথাটা তখনো তারা তুলতে পারে—। ছুটে চলেছে তারা, কাতর স্বরে, সরু গলায় ডাকতে ডাকতে—"ওরে! তোরা কে আছিস—ক্ষুধাতুর, অর্থহীন, অন্নহীন,—গৃহ-হারা হতভাগা, ছুটে আয়—যা আছে, লাঠী সোটা, তাই নিয়ে ছুটে আয়—মরণ তো এসেইছে—ঐখানে গে মারগে, ওদেরই দোষে—মনিবের ভাণ্ডারের হিসাব রাখছে যারা, চাকুরেরা—তাদেরই বুকের উপর। খেতে যদি দেয়, তলব যদি বাড়ায়—ভালো। নইলে—"

দপ্তরীর প্রাণের ভিতর গিয়ে সেই সব কথাগুলো আঘাত করলো—দুর্বল দেহের ভিতর দিয়ে একটা বিদ্যুৎ বুঝি চলকে উঠে তাতে বল সঞ্চার করে দিয়ে গেল। সেও এসে যোগ দিলে, এই আত্মহারা উন্মাদদের কলরবে। মেয়েটা ভুঁয়ে পড়ে তখনো ধুঁকছিল,—মা তাকে বুকে চেকে কোলে জড়িয়ে অন্য শিশুগুলিকে পিঠের উপর আশ্রয় দিয়ে পড়ে রইল, মুখ বুজে—[illegible]মা স্বামীকে ফেরাবার জন্যে মায়ীর নিজের জোর দাবী, মায়ের মিনতি নিয়ে সে গিয়ে [illegible] সামনে দাঁড়ালো না।

আকাশে[illegible] পরিসর কাঁপিয়ে দিগন্তে প্রতিধ্বনি তুলে হতভাগীদের "দাও-দাও" ভিক্ষা স্পষ্ট হয়ে, পরিস্ফুট হয়ে সঘন হয়ে উঠ্লো। চাকুরে বিপদ গণ্লেন—পাহারাদার কেউ এগোলো না—এদের রোখে কে?

রাজার কাণে এ ধ্বনি বজ্র-নির্ঘোষের মত গিয়ে বাজলো—এ কি রাষ্ট্র-বিপ্লব—বিদ্রোহীদের বিজয় দামামা?—প্রাণ তাঁর চঞ্চল হয়ে উঠ্লো—বুকের ভিতরটা বেজে উঠ্লো। তিনি খবর জিজ্ঞাসা করেন—"কি হয়েছে—কিসের এ গোলমাল?"

সংবাদবাহী বল্লে—"ক্ষুধায় উন্মাদ লোকগুলো এসেছে রাজকোষ লুটতে—হয় তাদের অন্ন দিতে হবে—তলব বাড়াতে হবে—নয়তো ওরা ভাণ্ডার লুটবে। অক্ষম যদি হয় ওইখানেই পড়ে মরবে না কি আর।"

মহারাজ বল্লেন—"আহা! বেচারীরা! দাও, ভাণ্ডার খুলে দাও—রাজকোষ মুক্ত কর—তলব ওদের বাড়িয়ে দাও।"

খবর শুনে উচ্ছৃঙ্খল জন-তরঙ্গ শান্ত হল—আশ্বাস পেয়ে তারা কেঁদে উঠ্লো।

চাকুরে এসে বল্লেন—"মহারাজ, করেন কি? অজন্মার দিনে ভাণ্ডার খালি করলে—উপায়?"

মহারাজ বল্লেন—"উপায় ভগবান! অবশেষে না হয় মৃত্যু—ভাণ্ডার উজাড় করে ওদের অন্ন দাও।"

"মহারাজ,—আমারও ঘোড়ার দানা-পানি জোটে না, সন্ধ্যা-দীপ জালবার তেল কেন্বার কড়ি নেই—মেয়ের বিয়ে দিয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছি—আমার—আমাদের সম্বন্ধে বিবেচনা?"

"হাঁ,—সকলের সম্বন্ধেই বিবেচনা অবশ্য করতে হবে। ভাগ বেঁটে দাও—বিলি কর। অন্নের অভাবে যেন প্রজার জীবন-নাশ না হয়। ভাণ্ডার উজাড় হলেও আমার উষ্ণীষের মণি আছে, মহিষীর অঙ্গের আভরণ আছে—প্রাসাদ-চূড়ার স্বর্ণ আছে—তারপরে—তারপরে দেবতা আছেন—ঘন-কৃষ্ণ মেঘের ধারে অমৃতের বৃষ্টি নামবেই নিশ্চয়।"

চাকুরে এলেন। তনখা বাড়ার সুসমাচার জানিয়ে লোকগুলোকে বিদায় করে দিলেন—আশা নিয়ে আনন্দিত তারা অভাগার দল ঘরে ফিরে এল।—দপ্তরী এসে দেখে, মায়ের অসাড় আড়ষ্ট বুকখানার পাশে, কোলের মেয়েটীর শক্ত কাঠ মৃত দেহটা পড়ে আছে—ছেলে-মেয়ে তিনটীই চলে গেছে, সব ক্ষুধা-তৃষ্ণা এড়িয়ে—সব-পাওয়া, সব-চাওয়া মেটানো—সকল-হরণ, সকল-মোহন সেই অমৃতের দেশে।

নির্বাক দুই চোখ তুলে লোকটা একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল, এই মরণেও অবিচ্ছিন্ন মায়ের মমতা-গ্রন্থিটীর পানে—মায়ের আশে-পাশে সম্বিৎ-হারা, প্রাণ-হারা তার বুকের ধন-ক'টীর রক্ত-লেশহীন পাণ্ডুর মুখ ক'খানার দিকে। "যেটী আছে, তাকে বাঁচাবো। না খেয়ে বাছারা গেছে—কিন্তু এবার তো রাজা শস্ত কেনবার স্বর্ণ দিতে চেয়েছেন—বুকে করে জড়িয়ে রেখে বাঁট-গরম টাটকা দুধে একে বাঁচাবো।"

ভাবতে ভাবতে লোকটা ছেলেটীকে বুকের উপর জড়িয়ে নিয়ে বেরিয়ে এল—শুষ্ক তার চোখ, আর্তনাদ-হীন সে কণ্ঠ, কেবল বুকের ভিতরে রক্তের স্রোত চলেছে,—উদ্দাম দ্রুত।

চৈত্র-সন্ধ্যার স্নিগ্ধ হাওয়া পিতা-পুত্রের মুখের উপর দিয়ে আরাম বুলিয়ে বয়ে গেল—এইবার। হতভাগা চেঁচিয়ে উঠে আছাড় খেয়ে মাটীতে প'ড়লো, বুকের উপর ছেলেটি।

সংবাদ-বাহী এসে খবর দিলে—"তনখা বেড়েছে।"

"অঁ্যা"—বলে সে উঠে বসল।

খবর নিয়ে এসেছিল যে, সে বললে—"হ্যাঁ তলব বেড়েছে। তোমারও বেড়েছে, আমারও বেড়েছে,—হুজুরেরও বেড়েছে।"

"বেড়েছে?—এনেছ টাকা? না দাও, টাকা দিয়ে দুধ কিনে এনেছ? দাও, দাও, ঢেলে দাও এর মুখে—আহা, বাছার গলাটি শুকনো কাঠ হয়ে গেছে।"

"টাকা ত আনি নি—দুধও আনি নি।—হায়রে হতভাগা। বাড়া তলব মিলবে আসচে-মাস থেকে—এক টাকা।"

"আর হুজুরের?"

"একশ টাকা! তিনমাস আগের তারিখ থেকে হিসেব হবে, তাঁদের।"

"কে বিলি করলে?"

"হুজুর।"

"হুঁ—"বলে বেচারী ছেলেটীর মুখের দিকে তাকালে।

সংবাদ-বাহী বললে—"রাজা আর চাকুরে—চাকুরের আর চাকরে—এই তফাৎ।"

শ্রীবিমলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

কবিতার কথা

কবিতার জন্ম কবির কল্পনায়। কবিতা-সুন্দরী কবির মানস-কন্যা। মাতৃ-অঙ্কে শিশু যেমন ক্রমোন্নতি লাভ করে, কবির মনে কবিতাও ঠিক তেমনি প্রসার লাভ করে। কবিতা স্বচ্ছ স্নিগ্ধ ও সুগভীর অন্তরের প্রতিবিম্ব—পবিত্র জীবনে শুভ ও মঙ্গল মুহূর্ত্তের আগমনের পরিচয় মাত্র। যে শক্তি থাকিলে মানুষ কবি হয়, সেই শক্তি কল্পনা নামে পরিচিত। সেই কল্পনা কত সুন্দর-সুন্দর চিত্রের সংগ্রহ ও সমাবেশ করিয়া, কত নব নব মূর্ত্তি সৃষ্টি করিয়া কবিতাকে সাজাইয়া দেয়, যাহা অতি মলিন ও নিন্দনীয়, তাহাকেও উজ্জ্বল এবং সুন্দর করিয়া তুলে; যাহা সুন্দর, তাহাকে আরও সুন্দর ও মহিমোজ্জ্বল করে। এক কথায়,—"গরলে অমৃত করে কল্পনার ইন্দ্রজাল।" কল্পনা সুদূর অতীতের দৃশ্য বর্ত্তমানের সম্মুখে আনিয়া জীবন্তবৎ তাহা প্রত্যক্ষ করাইতে পারে এবং বর্ত্তমানের মধ্যে ভবিষ্যতের সন্ধান করিয়া দিতে পারে। কল্পনার চক্ষে দেশ ও কালের গণ্ডী চূর্ণ হইয়া যায়। তাই কবি বলিয়াছেন,—

"কি স্বরগে, কি মরতে, অতল পাতালে।
নাহি স্থল, যথা দেবি, নাহি তব গতি।"

ধর্ম্ম, নীতি ও সমাজের মূলে আত্মোৎসর্গ বা প্রেম এবং প্রেমের মূলে কল্পনা। এই কল্পনার সাহায্যে আমরা অন্যের সুখ-দুঃখ [illegible], উৎসব-ব্যসনকে আপনার করিয়া লইতে [illegible]—নিজেকে অন্যের বলিয়া ভাবিতে পারি। এইরূপ ভাবিতে [illegible] অন্যের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করিতে পারি। এই আত্মোৎসর্গ প্রেমের প্রধান উপাদান কিম্বা প্রেমের অপর নাম। প্রেম আমাদের অন্তরের আসল মানুষটাকে আবিষ্কার করে; ইহার তড়িত-পরশে মন্ত্র-দৃষ্টিতে আমাদের 'আমি' নিম্নে নামিয়া আসে, এবং বিশ্বের সকল বস্তুকেই সুন্দর ও পবিত্র বলিয়া উপলব্ধি করে। কল্পনা-শক্তি না থাকিলে অন্যকে আপনার বলিয়া ভাবা যায় না এবং কোন বস্তুকে সুন্দরের ও পবিত্র বলিয়া অনুভব করা যায় না, অর্থাৎ কল্পনা না থাকিলে, প্রেম জন্মিতে পারে না। কল্পনার অভাবে প্রেম নষ্ট হয়। যে হৃদয় যতই কল্পনা-প্রবণ, সে হৃদয় ততই প্রেমিক, উদার ও মহৎ। প্রেমের জন্ম যেমন কল্পনা-ভরা হৃদয়ে, তাহার লীলা-ক্ষেত্রও তেমনি হৃদয়ে। ইহা একের হৃদয় অন্যের হৃদয়ের সহিত গাঁথিয়া দিতে পারে—এক হৃদয়ের ভাব অন্য হৃদয়ে সংক্রামিত করিতে পারে। যখন দুইটি মানব-হৃদয় সম ভাবে বিভাবিত, সুদৃঢ় প্রেম-সূত্রে গ্রথিত, তখনই মানব-সমাজের উদ্ভব, এবং সমাজ-জীবনের মূলে অতি শুভ মুহূর্ত্ত, অতএব সমাজ-গঠনের মূলে মিলন; এবং মিলন সহধর্ম্মিতা আত্মোৎসর্গ বা প্রেমের উপর নির্ভর করে। শুধু সমাজ কেন, ধর্ম্ম ও নীতির মূলেও প্রেম। ধর্ম্ম ও নীতি আত্ম-ত্যাগের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে প্রেমের মূল উপাদান কল্পনা। কবির হৃদয় কল্পনা-প্রবণ সুতরাং [illegible] আর কবিতা অমূর্ত্ত বা ব্যক্ত [illegible],

কবি তাই অতি সহজেই "পরকে আপন করে, আপনাকে পর," অন্যের কাছে আপনাকে ধরা দেয়, এবং ধরা দিয়া শেষে অন্যকে আপনার করিয়া লয়। কবি স্বপ্ন-ভরা সান্ধ্য-সমীরণে আন্দোলিত বিহঙ্গের ন্যায় নিভৃত একাকী কল্পনার আবেশে গান করেন, আর সব অন্ধকার নীরবতা মুখরিত প্রফুল্ল হইয়া উঠে, সেই সঙ্গীতের ঝঙ্কার যে হৃদয়ে বাজে, সে হৃদয়, গায়কের সন্ধান জানুক আর না জানুক, আনন্দে আনন্দিত ও বিকশিত হইয়া উঠে, কবির হৃদয় বিশ্ব হৃদয়; কবি সকলের মধ্যে বিশ্ব-মানবকে দর্শন করে, কবি কল্পনায় পূর্ণপ্রাণ, তাই সে এত প্রেমিক ও ত্যাগী। যে প্রকৃত কবি, সে ত্যাগী ও তপস্বী এবং প্রেম-যজ্ঞে আত্মবলিদান করিতে সক্ষম, সুতরাং প্রকৃত কবিই আদর্শ ধর্ম্মের দীক্ষাগুরু, আদর্শ নীতির বার্ত্তাবহ ও আদর্শ-সমাজের প্রতিষ্ঠাতা।

কল্পনার প্রতিদ্বন্দ্বী বুদ্ধি। বুদ্ধি যাহা দেখে, তাহা খণ্ডবিখণ্ড করিয়া দেখে। বাহ্য দৃশ্যপুঞ্জ বা বস্তুনিচয়ের মধ্যে যেখানে অনৈক্য, বিরোধ বা ব্যবধান, সেইখানেই ইহার দৃষ্টি। কিন্তু অনৈক্যের মধ্যে যে ঐক্য, বিরোধের মধ্যে যে মিলন, ব্যবধানের মধ্যে যে নৈকট্য, তাহা কল্পনার দৃষ্টি এড়াইতে পারে না; বুদ্ধি বস্তুকে বাহির হইতে দেখে, তার বহির্ভাগেই আবদ্ধ থাকে। কল্পনা তার অন্তরে প্রবেশ করে, তার অন্তস্তল বা মর্ম্ম স্পর্শ করে এবং তার সহিত একাত্ম বা তন্ময় হইয়া যায়, অতএব কল্পনা অন্তর্মুখী, আর বুদ্ধি বহির্মুখী; বুদ্ধি ক্ষুদ্রকে তুচ্ছজ্ঞান করিতে পারে কারণ তার দৃষ্টি খণ্ড ও সঙ্কীর্ণ, কিন্তু কল্পনা তার অন্তর্দেশে পৌঁছিতে পারে, বলিয়া তার আসল মূল্যের পরিচয় পায়। কল্পনার সমগ্র দৃষ্টিতে—

………ক্ষুদ্র যাহা
ক্ষুদ্র তাহা নয়;
সত্য যেথা কিছু আছে
বিশ্ব সেথা রয়—"

কেহ বলিতে পারেন যে, কল্পনার সাহায্যে আমরা নানাভাবে সুখের উপভোক্তা হইতে পারি বটে, কিন্তু বুদ্ধির সাহায্যে আমরা নানাবিধ মঙ্গলের অধিকারী হইয়াছি, অর্থাৎ সংক্ষেপে বলিতে গেলে, কল্পনা সুখদাত্রী, আর বুদ্ধি শুভদাত্রী—বুদ্ধি আর কল্পনার দ্বন্দ্ব শ্রেয় ও প্রেয়'র দ্বন্দ্ব, কিন্তু ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, প্রকৃত সুখ বা আনন্দ ও প্রকৃত কল্যাণের মধ্যে কোনো বিরোধ বা পার্থক্য নাই। সুখ দ্বিবিধ; এক চিরস্থায়ী ও সর্ব্বজনীন অর্থাৎ সমষ্টির ভোগ্য, অন্য অস্থায়ী ও ব্যক্তিবিশেষের ভোগ্য। এই উভয়বিধ সুখ হিতকার্য্য হইতে স্থায়ী সুখের উদ্ভব। তাহাই প্রকৃত হিতকার্য্য, যে কার্য্যের দ্বারা আমাদের চিত্তবৃত্তিসমূহ সজীব ও বিশুদ্ধ হয়, কল্পনা প্রসার লাভ করে, হৃদয়ে প্রেমের উৎস খুলিয়া যায়, এবং মনের ক্ষুদ্রতা ও সঙ্কীর্ণতা দূর হয়; তাহাই প্রকৃত হিতকার্য্য এবং তাহাই স্থায়ী পবিত্র সুখের জনক, কিন্তু যে-কার্য্যের দ্বারা ব্যক্তিবিশেষের লাভালাভ কিম্বা ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধি সম্ভবপর হয় এবং কল্পনা নির্জীব ও সঙ্কীর্ণ হইয়া যায়, তাহা নিম্নশ্রেণীর হিতকার্য্য, ইহার অন্য নাম স্বার্থপরতা। প্রকৃত হিতকার্য্যে যে সুখ তাহা পরার্থপরতার সুখ, মনের [illegible] ও জীবনের সুখ, আমাদের অন্ত[illegible]র 'আসল

মানুষের, সঙ্গতিলাভের সুখ,কবির কল্পনা-রচিত প্রেম-রাজ্যের সুখ, তাই কবি গাহিয়াছেন,—

"পরের কারণে মরণেও সুখ,"

* * *

"পরের কারণে স্বার্থে দিয়া বলি
এ জীবন-মন সকলি দাও—
তার মত সুখ কোথাও কি আছে ?
আপনার কথা ভুলিয়া যাও।"

কল্পনাকে আশ্রয় করিয়া যখন আমরা আপনাকে ছাড়াইয়া উঠিতে পারি, তখনই আমাদের অন্যের প্রতি সহানুভূতি দেখানো সম্ভবপর হয়, কিন্তু বুদ্ধির দ্বারা আমরা আপনাদিগকে বাঁচাইয়া চলি। পরহিতৈষণার মূলে কল্পনা, আত্মসুখেচ্ছার মূলে বুদ্ধি। এ জগতে যে যত আপনাকে অন্যের সহিত স্বার্থের সংগ্রামে জয়ী করিতে পারে, সে তত বুদ্ধিমান্। এ সংসারে যদি শুধুই স্বার্থসেবী বুদ্ধিমান্ লোক থাকিত, তাহা হইলে মানব-সমাজের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থা যে কিরূপ হইত তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে; আমাদের সমাজ স্বার্থ-সংগ্রামের রঙ্গভূমিতে পরিণত হইত, আমাদের ঘরে ঘরে চার্বাক ও এপিকিউরাসের আধিপত্য দেখা যাইত, কিন্তু যদি ডান্টে, পেট্রার্ক, বোকাসিও, চসার, সেক্সপীয়র, মিল্টন, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ প্রভৃতি কল্পনাপ্রবণ কবিগণ জন্মগ্রহণ না করিতেন, তাহা হইলে পাশ্চাত্য জগতের নৈতিক অবস্থা ভীষণ হইতে ভীষণতর হইয়া উঠিত। শুধু কবিগুরু বাল্মীকি ও হোমারের অভাবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিরোধ ও বৈষম্য বিকট মূর্ত্তিতে তাণ্ডব নৃত্য করিত। মহাকবিগণ পরিবারগত সমাজগত, দেশগত, কালগত, ধর্ম্মগত সর্ব্বপ্রকার বৈষম্যের অন্তরালে যে ঐক্য নিহিত আছে, তাহারি অনুভূতিতে বিভোর হইয়া উঠেন, ধর্ম্ম, প্রেম, 'বিশ্ব-ভূলোকের অসীম পুলকের' আস্বাদন, দুঃখ-দীর্ণ হৃদয়ের আশা-ভরসা, অনুতাপক্লিষ্ট হৃদয়ের বেদন-নিবেদন প্রভৃতি কবির জীবন-সর্ব্বস্ব হইয়া দাঁড়ায়, এখানে কল্পনা তাঁর একমাত্র সহায়। প্রকৃত কবি ও আত্ম-সেবী, কবিতা ও আত্ম-সর্ব্বস্বতা পরস্পর-বিরোধী। কবি গাহিয়াছেন,—

"বাহির হইতে দেখো না এমন করে,
আমায় দেখো না বাহিরে!
আমায় পাবে না আমার দুখে ও সুখে,
আমার বেদনা খুঁজো না আমার বুকে,
আমায় দেখিতে পাবে না আমার মুখে,
কবিরে খুঁজিছ যেথায় সেথায় নাহিরে,

* *

"আমি সেই এই মানবের লোকালয়ে
বাজিয়া উঠেছি সুখে দুখে লাজে ভয়ে,

* * *

তোমাদের চোখে আঁখিজল ঝরে যবে
আমি তাহাদের গেঁথে দিই গীতরবে,
লাজুক হৃদয় যে কথাটি নাহি কবে
সুরের ভিতর লুকাইয়া কহি তাহারে।"

কবি যেমন প্রকৃত সুখের সন্ধান দেন, তেমনি প্রকৃত দুঃখেরও সন্ধান দেন। প্রকৃত দুঃখ যে কি তাহা কবির কল্পনাই উপলব্ধি করিতে পারে। কবি অতিসহজেই বুঝিতে পারে যে দুঃখের সহিত সুখের এক ঘনিষ্ঠ অপরিহার্য্য সম্বন্ধ রহিয়াছে, দুঃখ যতই কঠোর, ততই পরম-মঙ্গলের সহিত সম্বন্ধ, শোক, ভয়, ঔৎসুক্য, নৈরাশ্য প্রভৃতি কেবল

পরম-মঙ্গলের নিদর্শন মাত্র, তাই কবির শোক-কাব্য ; দুঃখের মধ্যে যে সুখ আছে তারই গান গায়, সেই জন্যই শোক-কাব্য আমাদের এত প্রিয় ও প্রাণ-স্পর্শী, দুঃখে যে সুখ, সুখে সে সুখ নাই, এ এক অতি মধুর সুখ ; অন্য সুখ তাহার তুলনায় অতি উৎকট, সুখের সন্ধানে সুখের প্রমোদ কাননে বিলাস-ভবনে যাওয়া অপেক্ষা দুঃখের প্রশান্ত ক্ষুদ্র কুটিরে যাওয়াই ভাল, দুঃখ সুখেরই উজ্জ্বল চিত্র মাত্র, শোক-কাব্য সুখ-কাব্য ভিন্ন আর কিছুই নহে, তাই কবি দীনের জীবন-কাহিনী, ক্ষুদ্র-হৃদয়ের ভাবোচ্ছ্বাস, দৈনন্দিন জীবনের দুঃখ-শোক প্রভৃতি উপাদান-সমূহ স্তরে স্তরে সাজাইয়া সুখের এক সুন্দর আলেখ্য অঙ্কিত করিতে পারেন, তাই কবি বলিয়াছেন,—

"স্বর্গে তব রহুক অমৃত,
মর্ত্ত্যে থাক সুখে দুঃখে অনন্ত মিশ্রিত
প্রেমধারা—অশ্রুজলে চিরশ্যাম করি'
ভূতলের স্বর্গ-খণ্ডগুলি।"

শেষ কথা,—যাহাকে আসল কবিত্ব বলা যাইতে পারে, তাহা চঞ্চল মনের ক্ষণিক ভাব বা খেয়াল নহে ; তাহা শিশুর ক্রীড়নক-রচনার ন্যায় অতি সহজ ও তুচ্ছ নহে। তাহা ধীর ও গম্ভীর হৃদয়ের নীরব ভাষা—ভাবুকের ভাব—তরঙ্গের স্পন্দন,—তপস্বীর পূত মন্ত্র, সুতরাং কবি ভাবুক ও তপস্বী। তাহার কল্পনা মনের খেয়াল নহে ; পরন্তু অনন্ত সত্য ও সৌন্দর্য্যের অনুভূতি মাত্র, মানুষ যখনই তাহার অন্তরে এই অনন্ত সত্য ও সৌন্দর্য্য বা মহান্ আদর্শের স্পর্শ-সুখ অনুভব করে, যখনই সেই পরম দৈবতের আবির্ভাব উপলব্ধি করিতে পারে, তখনই সে মহাকবি, তখনই সে নব জাগরণে জাগরিত হয়, নব ভাবে বিভাবিত হয়, তখন সে শুধু মানুষ নয়, দেবতার লীলাভূমি। তখনই সে ভীতির সহিত প্রীতির, দুঃখের সহিত সুখের, অনিত্যের সহিত নিত্যের, চঞ্চলের সহিত চির-স্থির-শান্তের সম্বন্ধ বুঝিতে পারে। তখনই তাহার চক্ষে যাহা ঘৃণ্য তাহাও প্রিয় ও সুন্দর বলিয়া বোধ হয় এবং জগৎ অনন্ত সৌন্দর্য্যের আধার হইয়া দাঁড়ায়। কবি হয়ত প্রথম অবস্থায় নিজের উদ্দাম-লালসা, বিফল-বাসনা অতৃপ্ত-আশা বা প্রমোদ-বিভ্রমের কাহিনী গান করে ; কিন্তু যতই তার কল্পনা প্রসার লাভ করে, হৃদয় উদার হয় এবং যতই সে সত্য ও সৌন্দর্য্যের সম্মুখীন হয়, ততই সে আত্মকাহিনী ছাড়িয়া অন্যের সুখ-দুঃখের কথা গাহিতে থাকে, তারপর ধীরে ধীরে বিশ্ব-জগৎ তার কাব্যে স্থান পায়, শেষে যাহা চির-সত্য ও নিত্য সুন্দর, তাহারই সমীপে কবি আত্ম-বিসর্জ্জন করে। কবির জীবনে প্রথম স্তর—আত্ম-সর্ব্বস্বতা ; দ্বিতীয়—পরার্থতা এবং শেষ আত্ম-বিসর্জ্জন। এই শেষ অবস্থায় পৌঁছিয়া কবি বিশ্ব-কবির সম্মুখে দাঁড়াইয়া গাহিয়াছেন,—

"তুমি কি মহান্, বিভু, আমি কি মলিন ক্ষুদ্র
আমি পঙ্কিল সলিল বিন্দু, তুমি যে সুধাসমুদ্র,
তবু তুমি ডাকিলে হৃদয়ে এস,
তাই এত অযোগ্যের লাজ।"

* * *

"আমি নয়নে বসন বাঁধিয়া,
বসে, আঁধারে মরিগো কাঁদিয়া
আমি দেখি নাই কিছু, বুঝি নাই [illegible]
দাও হে দেখায়ে বুঝায়ে।"

শ্রীজীবনকৃষ্ণ [illegible] বিদ্যারত্ন

পুরূরবা

দিনশেষে রাত্রি এল, শীর্ণ শর্ব্বরী
কেটে গেল বহুক্ষণ ভুবন-ভবনে ;
গৌরী গোধূলির ভালে রৌপ্য-দীপাধার
কখন্ উঠেছে জ্বলি', সন্ধ্যা জ্যোৎস্নামুখী
রচিল কনকবেণী কানন-কুন্তলে।
অতিমুক্ত, কর্ণিকার, পুন্নাগ, পাটল
বিথারিল দেবতার নিভৃত শয়ন
পুষ্পোচ্ছ্বাসে, ফুলবনবীথিকার তলে।
ক্রমে ঊর্দ্ধে, আরো ঊর্দ্ধে, স্ফটিক বিমানে
আরোহি' আকাশবক্ষে প্রবেশিল শশী
উন্মাদনী যামিনীর নিশীথ বাসরে।
তখনো ভ্রমিছে একা অরণ্যগহনে,
নদীতীরে, পর্ব্বতের সঙ্কট-শিখরে,
প্রিয়াহারা পুরূরবা ; স্রস্ত-উত্তরীয়,
ছিন্নবাস, নগ্নশির, উন্মাদের মত ;
অতিদূর গিরীশের নীহার-বলয়ে
বিস্ফুরিত চন্দ্রহাস ধাঁধিছে নয়ন—
সে কাহার অট্টহাসি দিগন্ত-প্রসারী
বিদ্রূপিছে বিরহীর বৃথা অন্বেষণ।
অরণ্যগভীরে বনশাখা-অন্তরাল
নিত্য-অন্ধকারে জনমিছে দৃষ্টি-ভ্রম,—
তিমিরপটলে যেন তরল সরসী!
দুলিছে তাহারি তলে দীপাবলিসম
অদ্ভুত আলোকবিম্ব—নহে খদ্যোতিকা!
অপূর্ব্ব সে মরীচিকা কানন-আঁধারে।
[illegible]লতিকায়, কুসুমিত তৃণস্তরে,
[illegible] বসনপ্রান্ত গিয়াছে লুটিয়া
প্রিয়ার, অঞ্চলপথ সুরভিত করি'।

সচকিত কুরঙ্গীর কস্তুরীসুবাস
তাহারি নিশ্বাস যেন, জ্যোৎস্না রেখা-রেখা
লেগে আছে তরুশাখে, ব্রততীবিতানে—
শুভ্র-চীনাংশুক-শোভা। ঝিল্লীর ঝঙ্কার
কাহার মঞ্জীরগুঞ্জ? কার দীর্ঘশ্বাস
নীড়সুপ্ত বিহঙ্গের পক্ষ-বিধূননে!
গুঞ্জরিছে মুখে তার ভাব-গদগদ
অসম্বদ্ধ বাণী, হৃদিসিন্ধুমন্থনের
সুধায় বুদ্বুদ যেন অধরের ফাঁকে!
চলিতে চরণ বাজে কভু শিলাতটে,
কঠিন কণ্টকে কভু, ছুটে বল্মীকাসে—
স্বপনে-উন্মীলনেত্র চলে পুরূরবা
দুরবোধা উর্ব্বশীর অলীক সন্ধানে।

সহসা কাননতলে অসম্ভব বিভা!
হিমদীপ্ত সৌদামিনী, প্রখর-ভাস্বর,
দীর্ঘায়ত, অতর্কিতে খসি' স্বর্গ হ'তে
ভরিল পাদপতলী,—সহস্রশাখার
অনন্ত সে রন্ধ্রময় আবরণ দিয়া
ঢালিল কৌমুদী-ধারা মেঘমুক্ত শশী,
আরোহিয়া গগনের সমুচ্চশিখরে ;
নিদ্রাতুরা ধরণীর দু'নেত্র উপরি
ফুটিয়া উঠিল যেন স্বর্ণ-শতদল
উচ্চবৃন্তে, তাহারি সে নাভিপদ্মনালে
মুহূর্ত্তে সে বরবপু হ'ল রূপান্তর
অটল-নিটোল শুভ্র মর্ম্মর-পুত্তলে।
কুটিল সে কেশদাম অংসেবিলম্বিত
মুহূর্ত্তে শোভিল যেন কিরণ-কিরীটি

নিদ্রার নয়ন যেন হারাইল দিশা,
বক্ষ সুবিশাল ধরিল তুহিন-কান্তি,—
চাহি' ঊর্দ্ধমুখে দাঁড়াইল পুরূরবা,
জ্যোৎস্নাধারা শিরে ধরি' নব গঙ্গাধর!'
অপলক নেত্রে তার আলোক সুধারা
গণ্ডূষে সাগর-সম করিল নিঃশেষ,
তীব্র বাসনারণনে মর্ম্মমূল যেন
বীণার তন্ত্রীর মত হারা'ল কম্পন।
প্রিয়ার পীরিতি যেন দিকে দিকে দিকে
উথলিল লাবণ্যের মত। সে মিলন
অহরহ, কোথা নাই বিরহ-কল্পনা।
নাহি মৃত্যু, নাহি জরা,—মহাকাল যেন
সহসা নিশ্চল। আলোক-আঁধারে দ্বন্দ্ব
ঘুচে' গেল মানবেরি পিপাসার সাথে।
অবগাহি' অফুরন্ত জ্যোতির প্রপাতে
দেহ হ'ল ছায়া-তনু, মৃত্যুঞ্জয়ী প্রেম
ধরিল সর্ব্বাঙ্গ-শুভ্র মূর্ত্তি আপনার,
কোনোখানে নাই তার বিষের কালিমা।

পরক্ষণে তেমনি চকিতে মুদে' গেল
জ্যোতিঃশতদল; স্বপ্ন-ভঙ্গে পুরূরবা
অলস-অবশ-দেহ বসিল ভূতলে;
আবরিল আঁখি তার আঁধার-অঞ্চলে
বনস্থলী, লেপি' দিল পুনঃ স্নেহভরে
সর্ব্ব অঙ্গে ম্লানচ্ছায়া চন্দ্রিকা চন্দন।
আলোক-বন্যার সেই গভীর প্লাবনে
স্থির ছিল জলজ কুসুম, ঊর্দ্ধমুখে,
বৃন্ত দৃঢ় করি'; যবে বন্যা গেল সরি',
নমিয়া পড়িল শির—লুটাইবে বুঝি
আপনারি পাদমূলে পঙ্কিল শয়নে।
অনন্ত আলোকে তাই নয়নের কোণে
[illegible]
অবরুদ্ধ বাসনায় অরুদ্ধ আবেগে।
কি-এক সঙ্গীত, যেন বিয়োগ-রাগিণী,
আত্মার সে আর্ত্তরব—সারাচিত্ত ভরি'
ধ্বনিয়া উঠিল তার সকল শিরায়;
মর্ম্মকোষে স্নেহপদ্মমধু'র তাড়না
একসাথে ফুটাইল পঞ্চেন্দ্রিয়-দল,
রূপের কিরণরশ্মি পান করিবারে!
অমনি সে বাণবিদ্ধ কেশরীর মত,
ঊর্দ্ধশ্বাসে, আন্দোলিয়া কেশরকলাপ,
ছুটে গেল বনান্তরে, উত্তান আননে,
রক্তসিক্ত পদে। তার রোদন-আরাব
সমস্ত কান্তার ব্যাপি' পঁহুছিল শেষে
পর্ব্বতকন্দরে, অতিদূর দূরান্তরে
হ'ল প্রতিধ্বনি, শিহরিল তারাস্তোম
অনন্ত সে ব্যোমপথে, প্রোষিতা নিশীথিনী
ফিরিয়া বাঁধিল তার বিশীর্ণ কবরী।

পাণ্ডুর বদনে বিধু হেরিল তাহারে।
সে যে তাঁরি বংশধর প্রতিষ্ঠানপতি
ঐল পুরূরবা! সেই পূর্ব্ব-ইতিহাস,
যৌবনের মধুময় মোহের কাহিনী
স্মরিল বিষাদে সোম, সে কলঙ্ক-লেখা
এখনো বাজিছে বুকে—তবু কি মধুর!
তখনো সিক্তিছে ওষ্ঠে অমৃত নবীন,
তরুণী সে পৌর্ণমাসী স্মৃতি,—ব্রহ্মচারী
পারিল না ফিরাবারে নিষিদ্ধ চুম্বন।
গুরুপত্নী তারা ধরিল সন্তান তাঁর
আপন জঠরে—সেই পুত্র বুধ হ'তে
জনমিল পুরূরবা, ইলার তনয়।
কভু নর, কভু নারী—ইলার কাহিনী
সুবিচিত্রতর! তাই সে অপূর্ব্বজন্মা
[illegible]
বীর পুরূরবা—

ধরাতলে প্রথম সে পূর্ণ মানবতা।
একদা নেহারি' তায় চৈত্ররথবনে,
প্রগলভে প্রসাদ তার যাচিল উর্ব্বশী,
উন্মনা অপ্সরা সে অমরা-আলোক।
স্বর্গের লাবণ্য হরি' আনিল ধরায়
চন্দ্রবংশ-অবতংস বীর পুরূরবা।
নন্দনে যে ফুল ঝরি' ফুটিল না আর—
ফুটিল সে পুঞ্জে পুঞ্জে ধরণীর বনে,
উর্ব্বশীর রাগারুণ নয়ন-আলোকে,
ফুটিল অমরাবাঞ্ছা মানবের প্রেমে।
সেই প্রেম, সেই বধূ ফিরে গেছে আজ
আপন আলয়ে, তারি শোকে পুরূরবা
উন্মাদ ভ্রমিছে ঘুরি' কান্তারে গহনে।

যবে রাত্রি আয়ুঃশেষ, তিমির-অলকে
ফুটিছে ধূসরচ্ছায়া অটবীসীমায়,
ক্লান্তিহর শীতস্পর্শ নিশান্ত-সমীরে,
কে যেন বুলায় ধীরে অতি সুকোমল
করাঙ্গুলি, অয়তপ্ত ললাটে চিবুকে,
স্বেদসিক্ত শিরোরুহমূলে। আচম্বিতে
জ্যোৎস্না নিবে' গেল, প্রভাত-গোধূলি
ঢালিল কলসী-জল তরল তিমিরে;
শুধু ঊর্দ্ধে চিহ্নসম চন্দ্রের বদনে
তখনো জাগিছে জ্যোৎস্না নিশীথ-লাঞ্ছন।
এতক্ষণে পার-হয়ে শীর্ণা শুক্তিমতী
উত্তরিল পুরূরবা অশোকের তীরে।
একটি পুন্নাগতরু সরল সুঠাম,
তারি দেহে দেহ রাখি', বাহু বাঁধি' বুকে,
ডুবা'য়ে চরণযুগ সুজাতৃণবনে,
দাঁড়া'ল সম্বিৎ-হারা শ্রীহীন উদাস
ত্রয়োদশদ্বীপাধিপ প্রতিষ্ঠান-পতি।
পশ্চিমে সরসীজলে সরোজ-শয়নে
[illegible]

দুলিছে নলিন-দোলা জলের দোলনে।
ধূপধূম্রসমোচ্ছ্বাস বাষ্প-যবনিকা
গোপন নেপথ্য রচি' আবরিছে দিক্
প্রাচীমুখে; যেন কারা অন্তরীক্ষ-পথে
স্বপ্নপ্রাগয়ের মাঝে করে আনাগোনা,
যেন কারা—স্নানার্থিনী, তেয়াগি' বসন,
নামিয়াছে পদ্মবনে অম্ভোজ-সরসে,
পূর্ব্ব-সোপান-শিখরে রাখি' দীপটিরে
শুকতারকার, সাজাইয়া সযতনে
রতনভূষণরাজি আকাশ-কুটিরে।
কাঞ্চন-কঞ্চুক 'পরে মুকুতার সিঁথী
আবরিয়া অভ্রস্বচ্ছ জরীর প্রাসাদে,
ঢালিয়াছে পার্শ্বে তার সদ্যঃ-চয়নিত
নব সিন্দুবার। গাঁথিবে বিনোদ কাঞ্চী
মাধবী-মুকুলে বুঝি? কেশর-কলাপে
গড়িবে গুণ্ঠন? কি যেন আশ্বাস-সুখে
মুদিল মদিরদৃষ্টি, মেলিল যখন—
সুবঙ্কিম দীর্ঘায়ত আঁখির তোরণে
ফুটিয়াছে অমৃত-ভাতি দিব্য চেতনায়।
তখন সুদূর দিক্-চক্রবাল-রেখা
হ'য়ে গেছে রূপান্তর জ্যোতির বলয়ে,
ধূম্র-গিরিশ্রেণী গাঢ় নীলাঞ্জনে লেখা—
ক্ষৌমবস্ত্রপটে যেন চিত্রঘনাবলী!
পলে পলে নব শোভা উঘারি' উঘারি'
কে করিছে নেত্রসেবা? মুগ্ধ পুরূরবা
বিভ্রান্ত-বিস্মিত,—ভুলিয়াছে এত ত্বরা
কামরূপা অপ্সরার অপার মোহিনী,
অসীম ছলনা!

সহসা সরসী-বুকে
দুলিল সলিল, ভিন্ন কুহেলির কাঁকে
[illegible]

শীলায়িত বাহুভঙ্গি,—কি মধুর হাসি
মুহূর্ত্তেকে মিলাইল পাটল অধরে।
তখনি চিনিল তারে, বর্ষ সহস্রেও
যার সাথে ছিল নিত্য নবপরিচয়।
তাই সে প্রসারি' বাহু, উন্নমিত মুখে,
উচ্চারিল নব বাক্ সত্য-সমুজ্জ্বল—
প্রেমের প্রণবমন্ত্র তাহারি উদ্দেশে।

'কোথায় চলেছ অয়ি জীবনরূপিণি,
আত্মা মোর, শূন্য করি' এ দেহ-দেউল?
হের ওই পূর্ব্বাশার উদয়-দুয়ারে
এখনি দাঁড়া'বে আসি' কৈমবতী উষা
সদ্যঃ-প্রাণহন্ত্রী-বেশে। কোন্ অপরাধে
কি ছলে ত্যজিলে মোরে,কহ তা' উর্ব্বশি!
নিত্যজ্যোৎস্না নিত্যপুষ্প নন্দনের লাগি'
বিরহী হৃদয় তব? তাই উদাসীন
মর্ত্ত্যসুখে—সদ্যঃপাতি ধরার কুসুমে?
তা' ত' নহে। রচিয়াছি হৃদয় প্রসারি'
তোমার মন্দির ঘেরি' নন্দন-অধিক
রূপময় উপবন, আনন্দ-হিন্দোলা।
স্বপ্নাঞ্জন পরা'য়েছি নেত্র-ইন্দীবরে,
মোর মুখে চেয়ে তব অকুণ্ঠিত আঁখি
শিথিল নিমেষপাত, পক্ষ্ম-অগ্রভাগে
দুলিল অশ্রুর বিন্দু, শিশির যেমতি
শিরীষ-কেশরে; সুনিবিড় আলিঙ্গনে
উপজিল হৃদিতলে মধুর বেদনা,
নীল-ভৃঙ্গ বিলসিল উরস-কমলে—
সফল হইল তব যৌবন-প্রসূন!
বহিশত শতাব্দের অযুত রজনী
এই হৃদিপাত্র ভরি' যে-সুধা ঢালিয়া
পিয়াইনু এতকাল—তারি মোহাবেশে
শিহরিত চন্দ্রোদয়ে রহিতে জাগিয়া

নিদাঘ-যামিনী কত অলিন্দের 'পরে,
হেরিবারে জ্যোৎস্না মোর সুখসুপ্ত মুখে—
অধর অধীর হ'ত চুম্বন-লালসে।
ছিলে নাকি সুখী? তোমার অম্লান রূপ—
দেবতাকাঙ্ক্ষিত, ধন্য, অনির্ব্বচনীয়;—
রাজ্যসুখ তুচ্ছ করি' চেয়েছিনু আমি
ধরণীর পতি,তুমি তাই পণ দিয়ে
জিনিয়া লইলে মোর কৌমার অতুল—
অ-স্বর্গীয়, দেবতা-দুর্ল্লভ। স্বর্গ হ'তে
রূপ আসে নামি', ধরার অনর্ঘ দান
মানবের প্রেম; এ দোঁহার বড় কে যে
বুঝিবারে নারি। তবু কহ সত্য করি',
আর কেহ ওই স্ফুরু রক্তাধর পানে
নিমেষে-সর্ব্বস্বহারা চেয়েছে এমন?
ও-কটাক্ষে সুধাপাত্র হাত হ'তে খসি'
পড়েছে কভু কি কারো ত্রিদশ-মণ্ডলে?
ছিঃ! ছিঃ! এত ঘৃণা ফিরা'য়ো না মুখ!
অয়ি মানস-নিষ্ঠুরে! কর অন্তরাল
আমার নয়ন হ'তে উষার অঞ্চল!
ওই না হেরিনু সেই মরণমোহিনী—
অনির্ব্বাণ কামনায় অশেষ ইন্ধন,
উর্ব্বশীর বিহ্বলনা শোভা! কি বলিলে?
দৈবাধীনা তুমি? ফিরিতেছ দেবাদেশে
দুখস্বর্গে, দেবতার সুখচর্য্যা লাগি'?
তোমারো নয়নে অশ্রু! থাক্ থাক্ তবে,
আমার সকল ব্যথা নিয়েছ হরিয়া
অশ্রুমুখি। কিন্তু ওই মর্ত্ত্য-মনোহর
অনুপম নেত্রভূষা কোথায় লুকা'বে
অমর-সভায়? যেয়ো না,যেয়ো না প্রিয়ে!
যাচি' লও স্বর্গ হ'তে চির-নির্ব্বাসন,
চেয়ো না অমৃত, এসো যদি দু'জনে।
অজর অমর হ'য়ে নিত্যোন্মুখ-মন্দনে

থেকো না অরূপ রূপে, অনিত্য-সদনে
অন্তহীন মৃত্যুস্রোতে এস গো নামিয়া ।
নব-নব জন্ম-বিবর্ত্তনে আঁখিযুগ
চিনি' ল'বে আঁখিযুগে; চির পিপাসায়,
বার বার হারা'য়ে হারা'য়ে, ফিরে' পা'ব
দ্বিগুণ-সুন্দর ; আবার বিচ্ছেদ-ক্ষণে
ফুটিবে চুম্বন যেই মর্ম্মান্ত আবেগে
ওষ্ঠপুটে, তারি গন্ধ মকরন্দ-লোভে
লুকা'য়ে নামিবে মর্ত্ত্যে সকল দেবতা ।
নিত্যেরে কে বাসে ভালো ? চিরস্থির ধ্রুব
অনন্ত রজনী কিম্বা অনন্ত দিবস ?
নহি তা'র অনুরাগী ; আমি চাই আলো
ছায়ারি পশ্চাতে, চাই ছন্দ, চাই গতি,
রূপ চাই ক্ষুদ্র-সিন্ধু-তরঙ্গ-শিয়রে—
ধরিতে না ধরা যায় পলকে লুটায় !'

নীরবিল পুরূরবা,—কোথায় উর্ব্বশী !
রেখে গেছে হাসিখানি প্রভাতের মুখে
অরুণ-কোমল ; তাই যেন মনে লয়
'আবার কোথায় কবে হইবে মিলন !
সেই কথা লিখি' দিয়া সোণার অক্ষরে,
মিলাইল মধুপর্ণ বিবাহ-দুকূল
মেঘস্তরে, শূন্যমনা মুগ্ধ পুরূরবা
হেরিল গন্ধর্ব্বলীল মৌনী গিরিমালা
বালারুণ-রক্তরাগে অনুতাপমান্ !

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার ।

অবতার

৭

অদ্বৈতের শরীরে এখন ওলাফ-লাবিনস্কির আত্মা বাস করিতেছে। সঙ্গে আছেন একাকী ডাক্তার বালথাজার-শেরবোনো। এখন এই জড়পিণ্ড দেহটাকে ডাক্তার আবার সচেতন করিতে উদ্যত হইলেন। নিশ্চেষ্ট ও আড়ষ্টভাবে অদ্বৈত-দেহধারী ওলাফ পালঙ্কের এককোণে আবদ্ধ ছিলেন, কতকগুলা ঝাড়া দিবার পর ওলাফ-অদ্বৈত (পরস্পরের শরীরে পরস্পরের আত্মার বিনিময় হইয়াছে বলিয়া এক্ষণে এইরূপ নামকরণ করিতে হইল) নরকস্থ প্রেত-ছায়ার ন্যায় তাঁহার গভীর তন্দ্রা হইতে, অথবা মৃগীরোগের মূর্চ্ছা-মোহ হইতে যন্ত্রের মত উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু এখনো ইচ্ছা-শক্তির দ্বারা তাঁর গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত হইতেছিল না ; এখনো 'মাথা-ঘোরা'টা সম্পূর্ণরূপে কাটিয়া যায় নাই ; এখনো পা টলিতেছিল। তাঁর চারিদিকে পদার্থ সকলের মধ্যে একটা যেন চাঞ্চল্য উপলব্ধি করিতেছিলেন, বরাবর দেয়ালের ধারে ধারে বিষ্ণু-অবতারদিগের যেন তাণ্ডব-নৃত্য চলিতেছিল। ডাক্তার শেরবোনো সেই এলিফ্যান্টা সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিয়াছেন, দুই হাতে পাখীর ডানা-ঝাড়ার মত হাত-ঝাড়া দিতেছেন। চশমার চক্র-রেখায় তাঁর শ্যামল বলি-রেখা-বিশিষ্ট নেত্র-মণ্ডলের মধ্যস্থিত নীলবর্ণ দুই তারা ঘুরিতেছে—ডাক্তারের সম্মোহন-প্রক্রিয়ায় সম্পূর্ণ চৈতন্য-লোপের

পূর্ব্বে ওলাফ এই যে-সব অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়াছিলেন, ঐ-সব দৃশ্য আবার তাঁহার বুদ্ধি-বৃত্তির উপর কাজ করিতে লাগিল; ক্রমে আস্তে আস্তে বাস্তব পদার্থ সকল তাঁহার উপলব্ধি হইল। বুক-চাপা দুঃস্বপ্ন হইতে স্বপ্নদর্শী হঠাৎ জাগিয়া উঠিলে যেরূপ হয়, আসবাব-পত্রের উপর ছড়ানো কাপড়-চোপড়কে প্রেতের উপচ্ছায়া এবং দীপালোকে উদ্ভাসিত পর্দার উপর আংটা কড়াগুলাকে দৈত্যের জ্বলন্ত চোখ বলিয়া তাঁহার ভ্রম হইতেছিল।

ক্রমশঃ এই ছায়াবাজির দৃশ্য অন্তর্হিত হইল। আবার সমস্তই স্বাভাবিক আকার ধারণ করিল। ডাক্তার শেরবোনো এখন আর ভারতবর্ষের তাপস সন্ন্যাসী নহেন, এখন তিনি চিকিৎসক ডাক্তার মাত্র; তিনি সাদাসাটা ভদ্রভাব হাসি মুখে আনিয়া ওলাফকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন:—"কোণ্ট মহাশয়, আমি আপনার সম্মুখে যে-পরীক্ষাগুলি দেখিয়ে ধন্য হয়েছি সেই পরীক্ষাগুলি দেখে আপনি কি পরিতুষ্ট হয়েছেন?"—এই অতি-নম্র কথার মধ্যে যে একটু বিদ্রূপের ভাব ছিল না এ কথা বলা যায় না। তারপর আবার বলিতে লাগিলেন:—"ভরসা করি আমার সান্ধ্য-বৈঠকে উপস্থিত হয়েছিলেন ব'লে আপনি পরিতাপ করবেন না; আর বোধ হয় এখন আপনার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, বস্তুর-যোতাবেক বিজ্ঞান যাকে গাল-গল্প ও বাজি-করের খেলা বলে' উড়িয়ে দেয়, সেই সম্মোহন-প্রক্রিয়ার কথা সমস্তই গাল-গল্প ও বাজিকরের হাতের চালাকি নয়।" ডাক্তারের কথায় সায় দিবার ভাবে, অক্টেভ-দেহধারী কোণ্ট ওলাফ মাথা নাড়িয়া ইসারায় উত্তর করিলেন, এবং ডাক্তার শেরবোনোর সঙ্গে সঙ্গে ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন; ডাক্তার প্রত্যেক দরজার কাছে আসিয়া খুব মাথা হেঁট করিয়া কোণ্টকে নমস্কার করিতে লাগিলেন।

ক্রুহাম গাড়ী অগ্রসর হইয়া একেবারে সোপান ধাপ ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল। কোণ্টেস্-লাবিন্স্কার পতি, অক্টেভ দেহধারী কোণ্ট ওলাফ, সহিস-কোচম্যানের উর্দ্দি-পোষাক বা গাড়ীর গঠনের প্রতি বড়-একটা লক্ষ্য না করিয়াই গাড়ীতে উঠিয়া পড়িলেন।

কোচ্ম্যান জিজ্ঞাসা করিল—"কোথায় যাইবেন?" সবুজ-পোষাক-পরা তাঁর কোচম্যান সচরাচর যে স্বরে তাঁকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিত, সেই স্বর শুনিতে না পাইয়া" তাঁর গোলমাল ঠেকিল,—তিনি বিস্মিত হইয়া উত্তর করিলেন:—

"আমার বাড়ী—আবার কোথায়?"

এখন এই ক্রুহাম গাড়িতে উঠিয়া দেখিলেন গাড়ীটা ঘোর নীল রঙের ফুল-কাটা পশমি কাপড়ে মণ্ডিত; সাটিন-মোড়া বোতামে বিভূষিত। এক-সব প্রভেদ সত্ত্বেও তিনি উহা নিজের গাড়ী ব'লয়া মানিয়া লইলেন। যেরূপ স্বপ্নে, সচরাচর দৃষ্ট পদার্থ অন্য আকারে দেখা দিলেও সেই পদার্থ বলিয়াই মনে হয়, ইহাও কতকটা সেইরূপ। ইহাও তাঁহার মনে হইল, তিনি আসলে যাহা, তাহা অপেক্ষা যেন খাটো; তা ছাড়া তাঁর মনে হইল, তিনি ডাক্তারের বাড়ী কোট পরিয়া গিয়াছিলেন এবং সেই পরিচ্ছদ তিনি যে পরিবর্ত্তন করিয়া-

ছিলেন, তাহা ত তাঁর স্মরণ হয় না—এখন দেখিলেন, একটা পাতলা কাপড়ের আলখাল্লা পরিয়া আছেন; এ পরিচ্ছদ তাঁর কাপড়ের আলমারি হইতে ত কখনই বাহির হয় নাই। তিনি অননুভূতপূর্ব্ব একটা সঙ্কোচ অনুভব করিতে লাগিলেন, প্রাতঃকালে তাঁর চিন্তা-প্রবাহ এমন স্বচ্ছ ছিল, এখন যেন সমস্তই কুয়াশাচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। সেই সান্ধ্য বৈঠকের অপূর্ব্ব অদ্ভুত বৃত্তান্তগুলার উপর তিনি এই অবস্থাটা আরোপ করিয়া ঐ বিষয়ের চিন্তায় মন দিলেন না; গাড়ীর কোণে মাথা রাখিয়া একটা এলোমেলো চিন্তাপ্রবাহে না-নিদ্রা না-জাগরণ এইরূপ একটা তন্দ্রাবস্থার মধ্যে আপনাকে ছাড়িয়া দিলেন।

ঘোড়া এক জায়গায় আসিয়া থামিয়া পড়ায় এবং কোচম্যান উচ্চৈস্বরে "ফাটক" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠায়, তিনি আপনাতে ফিরিয়া আসিলেন; শার্সি নামাইয়া দিয়া, গাড়ীর জানলা হইতে মাথা বাহির করিলেন, এবং রাস্তায় গ্যাসের আলোয় দেখিতে পাইলেন, এ একটা অপরিচিত রাস্তা, বাড়ীটাও তাঁর বাড়ী নয়। তিনি বলিয়া উঠিলেন:—

"আমাকে কোথায় নিয়ে এলি? এই কি তবে ক্যাবিনস্কির হোটেল?"

—"হুজুর, মাপ করবেন, আমি তাহলে বুঝতে পারি নি" কোচম্যান এই কথা অনুস্বরে বলিয়া, কথিত স্থানের অভিমুখে অশ্বযুগলকে আবার চালাইয়া দিল।

যাত্রা-পথে রূপান্তরিত কৌন্ট, মনে মনে অনেক প্রশ্ন করিলেন, কিন্তু তাহার উত্তর দিতে পারিলেন না; "আমাকে না লইয়া [illegible] আমার গাড়ী কেন চলিয়া গেল, আমি ত আমার জন্য অপেক্ষা করিতে হুকুম দিয়াছিলাম?" "আর একজনের গাড়ীতে আমি কেন উঠিলাম?" তিনি অনুমান করিলেন, হয় ত একটু অবসাদ হওয়ায়, তাঁর জ্ঞান অস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল; হয় ত সেই "মনের" ডাক্তার, তাঁর বিশ্বাস-প্রবণতা আরও বাড়াইবার জন্য, তাঁর নিদ্রিত অবস্থায় "হাশিশ্" কিংবা উহারই মত কোন প্রকার বিভ্রম-উৎপাদক মাদক দ্রব্য খাওয়াইয়া দিয়াছিলেন। এক রাত্রি বিশ্রাম করিলেই এই-সব বিভ্রম নিশ্চয় চলিয়া যাইবে।

ক্যাবিনস্কির হোটেলে গাড়ী আসিয়া পৌঁছিল।

দরোয়ানকে ফাটক খুলিতে বলায় দরোয়ান ফাটক খুলিতে অস্বীকৃত হইয়া বলিল, "আজ রাত্রে লোক অভ্যর্থনা হবে না, কেননা হুজুর দুই-এক ঘণ্টার উপর হ'ল বাড়ী এসেছেন—আর রাণী বিশ্রামের জন্যে নিজের মহলে চলে গেছেন।"

ভ্রমণকারী অশ্বারোহী পুরুষদিগকে রাত্-করা রাজ-প্রাসাদে প্রবেশ নিষেধ করিবার জন্য, আরবদেশের কাহিনীতে প্রকাণ্ড তাম্র-মূর্ত্তিসকল যেরূপ দ্বার আগলাইয়া থাকে, সেইরূপ প্রকাণ্ড জীবকায় যে দরোয়ান খুব জাঁকজমক ভাবে অর্দ্ধ-উন্মুক্ত ফাটকের সম্মুখে খাড়া হইয়াছিল, তাহাকে অক্টেভ-দেহ ওলাফ এক ঠেলা দিয়া বলিলেন:—

"আরে বেটা, তুই মাতাল না পাগল?"

এই কথা শুনিয়া দরোয়ানের লাল মুখ রাগে নীল হইয়া উঠিল—সে উত্তর

"মশাই, আপনিই মাতাল কিংবা পাগল!"

অক্টেভ-দেহ-ওলাফের মুখ লাল হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন "হতভাগা, যদি আমার আত্মমর্যাদা না থাকত......"

বাকোয়াবীর সং ভীমের প্রকাণ্ড এক হাত বাহির করিয়া সেই প্রকাণ্ডকায় দরোয়ান উত্তর করিল:

"চুপ কর! নৈলে আমার এই হাঁটুর তলায় তোর মাথাটা গুঁড়োগুঁড়ো ক'রে, রাস্তার উপর ছুড়ে ফেলব! বাছাধন, আমার সঙ্গে চালাকি না,—দুই-এক বোতল শ্যাম্পেন বেশী মাত্রায় খেয়েছ ব'লে এ-সব চালাকি আমার কাছে চলবে না!"

এই কথা অক্টেভ-দেহ-ওলাফ আর বরদাস্ত করিতে না পারিয়া তাহাকে এমন এক ঠেলা দিলেন যে, সেই ঠেলায় সে গাড়ী বারাণ্ডার তলায় গিয়া পড়িল। যে-সব ভৃত্য তখনও শুইতে যায় নাই, তাহারা একটা গোলমাল শুনিয়া দৌড়িয়া আসিল।

"হতভাগা, পাজি, নচ্ছার! তোকে আমি জবাব দিলাম। আজ এই রাত্তিরটাও তুই এই বাড়ীতে থাকিস্ আমার ইচ্ছা নয়; দূর হ এখান থেকে—নৈলে ক্ষেপে কুকুরের মত তোকে এখনি হত্যা করব। একজন নীচ ভৃত্যের রক্তে আমার হাতকে কলঙ্কিত করতে আমাকে বাধ্য করিসনে বলচি!"

তাহার পর স্বদেহ হইতে বেদখল কৌন্ট ঐ অতিকায় দরোয়ানের দিকে ছুটিয়া আসিলেন—তাঁহার চোখ দুইটা ক্রোধে বিস্ফারিত, ঠোঁটের উপর ফেনপুঞ্জ, হাতের আবির্ভাবে কৌন্ট-মহোদয়কে অপমান সূচক মুঠা মুচকিত। দরোয়ান কৌন্টের দুই হাত তাহার এক হাতের ভিতর লইয়া মধ্যযুগের যন্ত্রণা দিবার পাক-খাঁচাওয়ালা যন্ত্রের মতো তাহার কেঁড়ো গাঁঠওয়ালা খাটো মোটামোটা আঙুলের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া পিষিয়া ফেলিবার যোগাড় করিয়াছিল। এই অতিকায় পুরুষটা আসলে লোক ভাল —উহার কোন বিদ্বেষবুদ্ধি ছিল না। আগন্তুককে শুধু একটু শিক্ষা দিবার জন্য দুই-চারটি মর্মান্তিক টিপুনি দিয়াছিল। তারপর আগন্তুককে সম্বোধন করিয়া বলিল:—

"দেখ, একটু ঠাণ্ডা হও। ভদ্রলোকের মত কাপড় চোপড়—তোমার এইরকম ব্যবহার করা, রাত্রে একজন ভদ্রলোকের বাড়ীতে এসে এইরকম গোলমাল করা কি সুবুদ্ধির কাজ? বেশ দেখছি এ কাজ নেশার ঝোঁকে করেছ—কে জানানি তোমাকে মদ খাইয়ে মাতাল করে ছেড়েছে! এইজন্যই তোমার উপর আমি মারপীট করব না, তোমাকে শুধু আস্তে আস্তে রাস্তার উপর রেখে দিয়ে আসব, সেখানেও যদি গোলমাল কর,—রোঁদ্ ফেরবার সময় পাহারাওয়ালা তোমাকে তুলে নিয়ে যাবে; এস, একটু তোমাকে বেহালা শোনাই—বেহালার একটা গৎ শুনলে তোমার মাথা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।"

অক্টেভ-দেহ-ওলাফ সমবেত ভৃত্যদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন:—

—"নির্লজ্জ বেটারা,—এই একটা নীচ অলীক কথা বলে তোদের মনিবকে—

করচে—আর তোরা স্বচক্ষে দেখেও কিছু বল্‌চিস নে!"

এই নাম উচ্চারণ করিবামাত্র ভৃত্যবর্গের মধ্যে খুব-একটা হৈচৈ পড়িয়া গেল। একটা অট্টহাস্তে, উহাদের জরির কিতার বিভূষিত বুকগুলা ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল: "দেখ ভাই, এই লোকটা আপনাকে কৌণ্ট লাবিন্‌স্কি বলে মনে করচে। হা! হা! ছি! ছি! বেশ যা হোক!"

অক্টেভ-দেহ-ওলাফের ললাট কষ্ঠ শীতল ঘর্ম-বিন্দুতে আর্দ্র হইল। ছোরার ফলার মত তীক্ষ্ণ একটা কথা যেন তাঁর মস্তিষ্কের ভিতর দিয়া চলিয়া গেল। "সমারা" দরোয়ানটা সত্যই কি আমার বুকের উপর হাঁটু গেড়ে বসেছিল? তখনকার সে জীবনটা কি আমার বাস্তব জীবন? আমার বুদ্ধিটা কি চুম্বক-আকর্ষণের প্রক্রিয়ায় একেবারে ঘুলিয়ে গিয়েছিল? অথবা কেউ একটা ভীষণ ষড়যন্ত্র ক'রে আমাকে এই রকম নাকাল করেছে? এই-সব ভৃত্য, যারা আমার কাছে থর্ থর্ ক'রে কাঁপত, আমার পদানত হয়ে থাকৃত, তারা কিনা আমাকে চিন্‌তেই পারলে না! আমার যেমন কাপড় বদ্‌লে দিয়েছে, গাড়ী বদ্‌লে দিয়েছে সেইরকম কি আমার শরীরও বদ্‌লে দিয়েছে? ঐ ভৃত্যবর্গের মধ্যে যে সব-চেয়ে দুর্বিনীত সে বলিল:—

"দেখ, তুমি যে কৌণ্ট লাবিনস্কি নও, এইবার ঠিক জানতে পারবে। তুমি যে রকম অপমানের কথা বল্‌ছিলে তাই শুনে স্বয়ং কৌণ্ট ঐ দেখ সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছেন।"

দরোয়ানের বন্দী, প্রাঙ্গণের শেষ-প্রান্তের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, মাটিতে-পোঁতা তাঁবুর মত একটা বৃহৎ ছত্রের চাঁদোয়ার তলে একটি যুবক দণ্ডায়মান। শোভন ছিপ ছিপে গঠন, মুখমণ্ডল ডিম্বাকৃতি, কালো কালো চোখ, শুকসদৃশ নাসা, সরু গোঁফ,—এ ত তিনিই, তিনি ভিন্ন আর কেহ নয়। অথবা সাদৃশ্যে বিভ্রম উৎপাদন করিবার উদ্দেশে শয়তান নিজে বোধ হয় তাঁর প্রেতচ্ছায়ামূর্ত্তি গড়িয়াছেন।

দরোয়ান, কয়েদীকে দৃঢ় মুষ্টিতে ধরিয়া রাখিয়াছিল, সেই মুষ্টি শিথিল করিল। দৃষ্টি অবনত, হস্ত পার্শ্বে লম্বিত, নিস্পন্দ নিশ্চল ভৃত্যবর্গ, বাদশার আগমনে গোলাম-দিগের ন্যায় দেয়ালের গায়ে ভক্তিভাবে সারি দিয়া দাঁড়াইল। যে সম্মান তাহারা আসল কৌণ্টকে প্রদর্শন করে নাই, সেই সম্মান তাহারা তাঁহার উপচ্ছায়াকে প্রদর্শন করিল।

স্বামী প্রাগুক্তির পতি, খুব সাহসী হইলেও স্বকীয় দ্বিতীয় মূর্ত্তির আগমনে, তাঁহার মনে কেমন একটা ভীতির সঞ্চার হইল।

তাঁহাদের বংশগত একটা প্রাচীন কাহিনী তাঁহার মনে পড়িয়া গেল, তাহাতে এই ভয় আরো বর্দ্ধিত হইল। প্রতিবার লাবিন্‌স্কি-বংশের কোন ব্যক্তির যখন মৃত্যু হয়, ঠিক্ তাঁহার মত দেখিতে এক উপচ্ছায়া আসিয়া ঐ সংবাদ তাঁহাকে পূর্ব্বেই জানাইয়া দেয়। য়ুরোপের উত্তর খণ্ডের লোকের মধ্যে, স্বপ্নেও নিজের দ্বিতীয় মূর্ত্তি দেখাটা মৃত্যুর পূর্ব্ব-

সূচনা বলিয়া চিরদিন গৃহীত হইয়া আসিতেছে। সুতরাং ককেদসের এই নির্ভীক যোদ্ধ্পুরুষ, আপনার বাহিরে আপনার ছায়ামূর্ত্তি দর্শন করিয়া, একটা অন্ধ-সংস্কারমূলক দুরতিক্রম্য আতঙ্কে আক্রান্ত হইলেন; কামান হইতে গোলা বাহির হইতে যখন উদ্যত এমন সময়ে যিনি নির্ভয়ে কামানের মুখে হাত ঢুকাইয়া দিয়াছিলেন, সেই তিনি এখন কিনা নিজেরই সম্মুখ হইতে ভয়ে পিছু হটিলেন।

কৌণ্ট শাবিন্স্কি-গুলাক-দেহধারী অক্টেভ, স্বকীয় পুরাতন শরীরের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। ঐ শরীরের মধ্যে, কৌণ্টের আত্মা কখন যুঝাযুঝি করিতেছিল, কখন ক্রোধে প্রজ্বলিত হইতেছিল, কখন বা ভয়ে কাঁপিতে-ছিল। শাবিন্স্কি-দেহ অক্টেভ, অক্টেভ-দেহ শাবিন্স্কিকে উদ্ধত ও প্রাণহীন ভদ্রতার স্বরে বলিলেন:—

"মহাশয়, এই ভৃত্যদের সঙ্গে বিবাদ ক'রে অনর্থক আপনার মান হানি করবেন না। যদি আপনি কৌণ্ট শাবিন্স্কির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান, তাহলে জানবেন, তিনি দুপুর দুটোর পূর্ব্বে আগন্তুকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন না। আর কৌণ্টেস্ মহোদয়ার সঙ্গে যাঁদের সাক্ষাৎ-কারের অধিকার আছে, কৌণ্টেস্-মহোদয়া বৃহস্পতিবারে তাঁদের অভ্যর্থনা করেন।"

এই কথাগুলি ধীরে ধীরে উচ্চারণ করিয়া এবং প্রত্যেক শব্দের গুরুত্ব দেখাইবার জন্য, প্রত্যেক শব্দের উপর সজোরে ঝোঁক্ দিয়া এই অলীক কৌণ্ট ধীর-পদক্ষেপে প্রস্থান করিলেন, আর তাঁর পশ্চাতে দ্বারও [illegible]

অক্টেভ-দেহ গুলাক-শাবিন্স্কি মূর্চ্ছিত হওয়ায় তাঁহাকে তুলিয়া লইয়া তাঁহার গাড়ীতে পৌঁছাইয়া দেওয়া হইল। যখন তাঁহার চৈতন্য হইল, তখন তিনি দেখিলেন, এমন একটা শয্যায় তিনি শুইয়া আছেন, যেখানে তিনি পূর্ব্বে কখন শয়ন করেন নাই, এমন একটা ঘরে রহিয়াছেন, যে ঘরে তিনি কখন প্রবেশ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার স্মরণ হয় না। তাঁহার নিকটে একজন অপরিচিত চাকর দাঁড়াইয়া ছিল। সে, তাঁহার মাথাটা উঠাইয়া, নাকের কাছে ঔষধের শিশি ধরিল। চাকর অক্টেভ-দেহ কৌণ্টকে আপনার মনিব মনে করিয়া জিজ্ঞাসা করিল:

"এখন আপনার একটু ভালো বোধ হচ্চে?" কৌণ্ট উত্তর করিলেন:—

—"হাঁ; ও একটা ক্ষণিক দুর্ব্বলতা মাত্র।"

—"আমি কি এখন যেতে পারি?—না আপনার কাছে আপনাকে দেখবার-শোন্বার জন্য আমাকে এখানে থাকতে হবে?"

—"না, আমাকে একলা থাকতে দেও; কিন্তু চলে যাবার আগে,—বড় আয়নার কাছে যে-সব লোহার মশাল-বাতি আছে সেগুলা জ্বালিয়ে দিয়ে যেও।"

—"কিন্তু এত-বেশী আলোতে আপনার ঘুমের ব্যাঘাত হবে ব'লে আপনার মনে হচ্চে না কি?"

—"কিছুমাত্র না; তা ছাড়া এখনো আমার ঘুম পায় নি।"

—আমি শুতে যাব না, যদি আপনার কিছু দরকার হয়, ঘণ্টা বাজালেই আমি ছুটে [illegible]"

চাকর, কোৰ্টের পাণ্ডুবর্ণ, ও বিশ্রিষ্ট মুখশ্রী দেখিয়া মনে মনে ভীত হইয়াছিল।

চাকর বাতিগুলি জ্বালাইয়া প্রস্থান করিলে কোণ্ট আয়নার কাছে ছুটিয়া আসিলেন এবং আলোক-উদ্ভাসিত এই শুভ্র ও বিশুদ্ধ আসির ভিতর দিয়া দেখিলেন :—একটি তরুণ মুখ, মৃদু ও বিষণ্ণ, মাথায় প্রচুর কালো চুল, নীলবর্ণ চোখের তারা রেশমের মত মোলায়েম শ্যামল শ্মশ্রু—তখন বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন,—"একি! এ মুখটা ত আমার নয়।" তিনি প্রথমে বিশ্বাস করিতে চেষ্টা করিলেন, হয়তো কোন দুষ্ট তামাসা-বাজ লোক তাম্র ও দিল্লুক খচিত আয়নার চৌকাঠ কিনারার পিছনে তাঁর একটা মুখস্ রাখিয়া দিয়াছে। তিনি পিছনে হাত দিয়া দেখিলেন, হাতে কিছুই ঠেকিল না। সেখানে কেহই ছিল না।

আপনার হাত টিপিয়া টিপিয়া দেখিলেন,—তাহার হাত অপেক্ষা সরু, লম্বা, ও শিরা-সমন্বিত; অনামিকা অঙ্গুলিতে একটা বড় সোনার আংটি, আংটির মাথার উপর কুল-চিহ্ন খোদিত। কোণ্ট এই আংটির অধিকারী কখনই ছিলেন না। তাঁহার পকেট হাতড়াইয়া একটা ছোট পত্র-পেটিকা পাইলেন,—তাহার ভিতর কতকগুলি সাক্ষাৎ করিবার তাস-পত্র (card) ছিল—তাস-পত্রের উপর এই নামটি লেখা ছিল;—"অক্টেভ"।

লাবিন্স্কি-প্রাসাদে ভৃত্যদের অট্টহাস, তাঁহার দ্বিতীয়-মূর্তির আবির্ভাব, আয়নার ভিতরে নিজের মূর্তির বদলে ভিন্ন লোকের মূর্তির ছায়া দর্শন—এ-সব বিকৃত মস্তিষ্কের বিভ্রম হইলেও হইতে পারে। কিন্তু এই-সব অন্যের পরিচ্ছদ, এই আংটি যাহা তিনি আঙুল হইতে খুলিয়া ফেলিয়াছেন—এই সব সাদা-কালো প্রত্যক্ষ প্রমাণের প্রতিবাদ করা, এই-সব সাক্ষ্যের বিরুদ্ধে কিছু বলা অসম্ভব। তাঁহার অজ্ঞাতসারে তাঁহার সম্পূর্ণ রূপান্তর সাধিত হইয়াছে; নিশ্চয়ই কোন যাদুকর, সম্ভবত কোন দানব তাঁহার আকৃতি, তাঁহার আভিজাত্য, তাঁহার নাম, তাঁহার সমস্ত ব্যক্তিত্ব তাঁহার নিকট হইতে হরণ করিয়াছে, কেবল তাঁহার আত্মাকে তাঁহার নিকট রাখিয়া দিয়াছে অথচ সেই আত্মাকে বাহিরে আপনাকে অভিব্যক্ত করিবার কোন উপায় রাখিয়া দেয় নাই।

তাঁহার অবস্থা অন্য প্রকারেও শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। এক্ষণে তিনি যে শরীরের মধ্যে বন্দী হইয়া আছেন, সে শরীর ধারণ করিয়া তিনি লাবিন্স্কি কোণ্টের পদবী কখনই আর দাবী করিতে পারিবেন না। সকলেই তাঁহাকে প্রবঞ্চক,—নিদান পক্ষে,—পাগল বলিয়া ঠাওরাইবে। একটা মিথ্যা আকারে আবৃত তিনি—এমন তাঁর স্ত্রীও তাঁহাকে চিনিতে পারিবে না—তাঁকে কে সনাক্ত করিবে? কি করিয়া তিনি তাঁহার তাদাত্ম্য প্রমাণ করিবেন? অবশ্য অনেক ঘনিষ্ঠ রকমের ঘটনা আছে, অনেকে রহস্যময় খুঁটিনাটি কথা আছে যা অন্যের অপরিজ্ঞাত হইলেও, কোন্‌টেস প্রাস্কোভীর মনে পড়িতে পারে এবং সেই সব কথা মনে করিয়া তাঁহার ছদ্মবেশী স্বামীর আত্মাকে তিনি খুব সম্ভব চিনিতে পারিবেন কিন্তু একা তাঁহার বিশ্বাসে কি হইবে? সমস্ত

লোকের মতের বিরুদ্ধে কি তাঁহার বিশ্বাস স্থির রাখিতে পারিবেন? সত্যই তাঁহার "আমি" সম্পূর্ণরূপে তাঁর বেদখল হইয়া গিয়াছে। তাঁর এই রূপান্তরীকরণ শুধু কি ব্যক্তির আকার ও মুখশ্রীর পরিবর্ত্তন মাত্র অথবা বাস্তবিকই তিনি অন্য কাহারো শরীরে বাস করিতেছেন। তা যদি হয়, তবে তাঁর নিজের শরীরটা কোথায় গেল? কোনও চুলার মধ্যে পড়িয়া কি ছাই হইয়া গিয়াছে, অথবা কোন সাহসী চোরের অধিকারে আসিয়াছে? লাবিনুস্কি প্রাসাদে তাঁহারা অনুরূপ যে দ্বিতীয় মূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন তাহা প্রেত-মূর্ত্তি হইতে পারে, কোন অলৌকিক দর্শন হইতে পারে; কিংবা কোন শরীরী জীবন্ত জীবও হইতে পারে, সেই ব্যক্তির আকৃতি ডাক্তার হয়ত আমার গাত্রচর্ম্ম খুলিয়া লইয়া তাহার মধ্যে দারুণ নিপুণতার সহিত ঐ লোকটাকে স্থাপন করিয়াছে।

বিষাক্ত সর্পের ন্যায় এই চিন্তাটা তাঁর হৃদয়কে দংশন করিতে লাগিল।—কিন্তু এই অলীক কৌন্ট লাবিনুস্কি, কোন দানব যাহাকে আমার আকারে পরিণত করিয়াছে, সেই রক্তপিপাসু হিংস্র পশু, যে এখন আমার বাড়ীতে বাস করিতেছে, ভৃত্যেরা এখন যাহার আজ্ঞাবহ হইয়াছে, হয়ত সে এই সময়ে আমার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়াছে, সেই কক্ষ যেখানে প্রথম রাত্রির ন্যায় যখনই আমি প্রবেশ করিতাম আমার হৃদয় একটা অনির্ব্বচনীয় আবেগে ভরিয়া উঠিত। হয়ত এখন কৌন্টেশ প্রাস্কোভি সেই হতভাগার স্থগিত স্কন্ধের উপর আপনার স্বর্গীয় রক্তিম রাগে রঞ্জিত সুন্দর মুখখানি আনত করিয়া রাখিয়াছেন এবং এই বিশ্বাসকে, প্রবঞ্চককে, নারকীকে আমি বলিয়া বিশ্বাস করিতেছেন। এখন যদি ছুটিয়া আমার প্রাসাদে যাই আর উচ্চকণ্ঠে কৌন্টেশকে বলি: "তোমাকে ও প্রতারণা করছে, ও তোমার হৃদয়েশ্বর ওলাফ নয়। তুমি না জেনে নির্দোষ ভাবে এমন একটা জঘন্য কর্ম্ম করতে উদ্যত হয়েছ যা আমার হতাশ আত্মা চিরকাল—অনন্তকাল স্মরণ করবে!"

কৌন্টের মস্তিষ্ক অগ্নিময় আবেগ তরঙ্গে আলোড়িত হইতে লাগিল। কখন বা অস্পষ্ট রাগের কথা মুখ দিয়া বাহির হইল, কখন বা মুষ্টি-কণ্ডূয়ন অঙ্গুলি দংশন করিতে লাগিলেন, ঘরের মধ্যে হিংস্র পশুর মতো অস্থির ভাবে পায়চারি করিতে লাগিলেন। তাঁহার অস্পষ্ট অহংজ্ঞান, যেন উন্মাদে আচ্ছন্ন হইবার মতো হইল। তিনি ছুটিয়া অক্টেভের প্রসাধনকক্ষে গেলেন, জলের বাসনে জল ভরিয়া, তাহার মধ্যে মাথা ডুবাইলেন। যখন মাথা উঠাইলেন, তখন সেই কন্কনে তুষার শীতল জলে সিক্ত মাথা হইতে বাষ্প-ধূম উত্থিত হইতেছিল। তাঁহার রক্ত আবার ঠাণ্ডা হইয়া আসিল। তিনি মনে মনে ভাবিলেন, বাজিগিরি ও ডাইনীমন্ত্রতন্ত্রের দিন ত চলিয়া গিয়াছে। মৃত্যুই কেবল আত্মাকে শরীর হইতে বিযুক্ত করিতে পারে। একজন পোলাণ্ডের কৌন্ট, যে প্যারিসে বাস করে, রথচাইল্ডের কাছে যাহার লক্ষ লক্ষ টাকা জমা আছে, যে বড় বড় বংশের সহিত যে সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ, একজন সৌখীন রূপসী যাকে পতিত্বে বরণ

করেছে, প্রথম শ্রেণীর রাজ-সম্মানে যে বিভূষিত তাকে কি কোন বালিকা এই রকম করে চোখে ধুলো দিতে পারে? এ নিশ্চয়ই সেই বালখাতার পোরবোনের কাজ—আমাকে লইয়া সে একটু মজা করিয়াছে, কিন্তু ইহাতে তার কুরুচিরই পরিচয় পাওয়া যায়। এখন এই সমস্তের ব্যাখ্যা একমাত্র সেই করিতে পারে।

তিনি শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া তাড়াতাড়ি অক্টেভের শয্যায় গিয়া শুইয়া পড়িলেন। শুইবামাত্র গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন হইলেন। ঘুম ভাঙ্গিয়াছে মনে করিয়া তাঁহার চাকর এক সময়ে আসিয়া, তাঁহার চিঠিপত্র ও খবরের কাগজাদি টেবিলের উপর রাখিয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রস ও নিরস

বহুকাল হ'ল মানুষ আপনার ইতিহাস লেখা সুরু করে দিয়েছে। প্রথম ইতিহাস আরম্ভ হয়েছে—লেখার অক্ষরেও নয়, ছাপার অক্ষরেও নয়, কিন্তু বাটালির চোপ দিয়ে, নয়তো তুলির আঁচড় দিয়ে মানুষ প্রথম লিখলে সিংহের ঘাড়ে পা রেখে মানুষ দাঁড়িয়েছে—খাড়া হয়ে। এইভাবে এক ঢিলে দুই পাখী মারার নিয়ম এখনো ঐতিহাসিকদের মধ্যে চলে এসেছে। ভারত-বিজয়ের ইতিহাসেও এই প্রথা, সিংহ-বিজয়ের ইতিহাসেও তাই, আবার ভারত-শিল্পের ইতিহাস লেখবার সময়েতেও ঐ একই নিয়ম চলে আসছে এ-পর্য্যন্ত। মানুষের দিক দিয়ে সিংহ-বিজয়টা অক্ষয় পাথরে অক্ষর কালিতে ছাপা হয়ে রয়ে গেল, আর পশুদের দিক দিয়ে তাদের আপনার ইতিহাস যা লেখা হ'ল বা হচ্ছে, তা রক্তের অক্ষরে পশু-ভাষায় লেখা—কাজেই পণ্ডিতেরা তার অর্থ বুঝলেন না, উল্টো টীকাই ক'রে চল্লেন। কাজেই সিংহ দুঃখ করে বলেছিল—আমি যদি মানুষের ভাষায় ইতিহাসটা লিখতেম—তাহলে সিংহ রইতো উপরে, মানুষ রইতো নীচে। এই তো গেল ঝগড়ার ইতিহাস; —সে ইতিহাসের মূল্য ইতিহাস-হিসাবে নয়, মকদ্দমার নথি-হিসাবে সেটা কাজের হতে পারে। তাই দেখা যাচ্ছে আমাদের শিল্পের ইতিহাস আমরা লিখলে হবে এক-রকম, ওরা লিখলে হবে অন্য। ওরা যতটা পারে বিশুখৃষ্টের জন্মের পরে আমাদের শিল্পটাকে ঠেলে এনে আলেকজাণ্ডারের পায়ের তলায় ফেলবে, আর আমরা ঠেলে তুলবো আমাদের শিল্পটাকে খৃষ্টপূর্ব্ব এবং খৃষ্টেরও পূর্ব্ব তস্য-পূর্ব্ব ভূতপূর্ব্বের দিকে সোজা—এইভাবে ঝগড়া চলতে থাকলে হবে কি? ঝগড়াই ইতিহাস বাড়বে, আমাদের দেশের artএর ইতিহাস একচুলও এগোবে না। এই সেদিন—ফরাসী মুলুক থেকে একজন এলেন, তিনি প্রমাণ করে গেলেন,

সব বুদ্ধমূর্ত্তিতে গ্রীক শিল্পের ছাপ রয়েছে, অতএব ওটা পশ্চিম এসে পূবকে বখ্‌শিস্ করে গেছে। কিন্তু আমি বলতে চাই— দেখ দেখি একটা দাঁড়ানো সমভঙ্গ বিষ্ণুমূর্ত্তি এবং ইজীপ্তের এক দেবতার চেহারা, ছটোই দেখবে এক ছাঁচে ঢালা,—ইজিপ্তের সঙ্গে ভারতের একটা কুটুম্বিতেও ঘটেছিল এক সময়ে, কাজেই প্রমাণ হচ্ছে—ভারত যেটা দিলে ইজীপ্তকে গ্রীসেরও পূর্ব্বজন্মের—এমন কি ফরাসী জাতেরও সৃষ্টি হবার স্বপ্নেরও স্বপ্নের আগে, সেইটে থেকেই সবাই শিখলে মূর্ত্তি গড়তে। এর উত্তর সবাই দেবে—যে আস্পর্দ্ধা বিদেশীকে মানায় সেটা দেশীতে মানাবে কেন? অথচ তোমরা জানো কেবল ব্রাহ্মণ যেমন জন্মেই ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী, তেমনি ফ্রেঞ্চম্যান কি ইংরেজ বলেই এরা artist, কিম্বা সত্যিই এরা archæologist ও Historian যারা ভারত-শিল্প সম্বন্ধে চর্চ্চা ক'রে ইতিহাস লিখতে চলেছে —তারা art জিনিষটার তথ্য artএর দিক দিয়ে আবিষ্কার করতে চলছেনা, সন-তারিখের প্রমাণ আর বাহ্যরূপ দেখেই তারা চলেছে আমাদের artএর তথ্য লিখতে! Indian Artএ বড় বড় history, archæology কুটকচাল ধরে! কাজেই artএর হিসেব যা হচ্ছে আমাদের তা archæological বা খুবই logical,—artistic একেবারেই নয়।

Artএর সম্পর্ক রসের সঙ্গে রসিকের সঙ্গে, কাজেই তার ইতিহাস হ'ল রসের ইতিহাস, রসিকেই সেটা লিখবে, ইংলণ্ডের ইতিহাসের সঙ্গেও মিলবে না গ্রীসের সঙ্গেও নয়, এমন কি তোমাদের আপনার ইতিহাসের রাজা-বলীর তারিখের সঙ্গেও নয়। বাজারে পাঁজিতেও হয়তো লেখা আছে অমুক রাজা অমুক সনে পুরীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করলেন, শিলালিপিতেও পাওয়া গেল তাই, কিন্তু শিল্পজগতের রসের ভাণ্ডারে কবে কেমন করে পুরী-মন্দিরের ছাঁচ প্রস্তুত হয়েছিল —বাংলা পাঁজির বহুপূর্ব্বে, ঐতিহাসিকের সাধ্য নেই যে দেখে,—সেটা রসিকের চোখে ধরা যায়। ফুল-ফলের মধ্যে রূপ রস গন্ধ সবই ফুল-ফল দেখা দেবার অনেক আগে এসে জোটে, কোনটা সময় পেয়ে চট্ ক'রে যোটে, কোনটা সময় অপেক্ষা ক'রে দেরী করে, আর কোনটা বা ফুটতেই পায়না সময়-অভাবে। রসালের জন্ম যেদিন গ্রীষ্মের তাপে সে পাকলো সেদিন, না বসন্তের হাওয়ায় সে গুটি বাঁধলে, সেদিন, না কুয়াশার মধ্যে সে যেদিন বউল ফোটালে বা যেদিন আমগাছটাই ফল নিয়ে বীজ ছেড়ে বেরোলো, সেদিন? কালের মাপকাটি দিয়ে রসের ইতিহাস মাপা চলবেনা। রসের সমতা আর তার অসমতা রসের উৎকর্ষ রসের অপকর্ষ এই নিয়েই একদেশের এক কালের artএ জোড়াতোড় করা যেতে পারে, তা ছাড়া তারিখ-সন্ মিলিয়ে যা হয় তা আর্টের কুষ্ঠি বা ঠিকুজি কথা। আর্টের এ-পর্য্যন্ত যা ইতিহাস হয়েছে তা ঐ কুষ্ঠি ছাড়া আর কিছু নয়। কোন বিশেষ দেশের বিশেষ শিল্পের বয়েস দেবার বেলায় কুষ্ঠির সন-তারিখগুলো তার দাঁতের হিসেবের কাজ করতে পারে, কিন্তু তাকে-ক'রে এ প্রমাণ হয় না যে আজকের বলেই কলা গুটি থেকে রসাল পেয়েছে তার রস, কিম্বা বয়েসে গুটি বড়, অতএব সব-পাকা

আমের চেয়ে পুরোণো বলেই সেটা ভালো ও বড়। বয়েসের আগে-পিছে হিসাবে artএর ছোট-বড় ভাল-মন্দ হিসেব হয় না, হ'তে পারে না। রসের তারতম্য নিয়েই কথা,—এবং তারি ইতিহাস হয় artএর ইতিহাস। যুগের ইতিহাস জাতির ইতিহাস কোন-একটা বিশেষ সভ্যতার ইতিহাস অনেকটা ক'রে সময় নিয়ে অনেকগুলো কাজ-কর্ম্ম বলা কওয়া কাণ্ড-কারখানা নিয়ে জড়িয়ে চলে, কাজেই অনেক টুকরো টুকরো জিনিষকে একত্র ক'রে নিয়ে তবে সেটাকে সম্পূর্ণভাবে দেখা ও দেখানো ছাড়া উপায় নেই। তেমনি রসের সৃষ্টি ঠিক যে ভাবে প্রকাশ হয় তাতে শুধু তার প্রকাশের তারিখ তার ইতিহাস জানার পক্ষে যথেষ্ট নয়,—কোথা থেকে সে রস এল, কেমন ক'রে নানা পরিবর্ত্তনের মধ্যে দিয়ে সে আস্তে আস্তে আপনার মাধুর্য্য প্রকাশ করলে এটা না ধরতে পারলে কখনই artএর ইতিহাস লেখা সম্ভব হয় না, জিনিষটিকেও সম্পূর্ণ জানা চলে না। এটা একেবারে ঠিক যে, জাতি-বিশেষের ইতিহাস যে রাস্তাটি ধরে উঠে পড়ে চলেছে সে রাস্তাটি ধরে জগতের শিল্পের ইতিহাস চলেনি। দেখছি মানুষ তখন সভ্যতার ধার দিয়েও যাচ্ছে না, গুহার মধ্যে বাস করছে—কাঁচা মাংস খাচ্ছে অথচ artএর দিক দিয়ে খুব আধুনিক যুরোপীয় শিল্পীর মতো ড্রয়িং করছে। ইউরোপের গুহাবাসীরা যে তখনকার মহিষ বরাহ হরিণের পালের নক্সা লিখেছে, এখনকার ফরাসী চিত্রকরের সঙ্গে তার খুব তফাৎ এই যে সেটা অনেক ভালো। আবার কোথায় দেখি জগতে আদিমতম artএর মূর্ত্তি ইজিপ্তের দেবতা আর খৃষ্টজন্মের ঢের পরেরকার ভারতের একযুগের বিষ্ণু-মূর্ত্তি দুই এক ছাঁদে গড়া, একভঙ্গী একভাব। কাজেই বলতে হয় artএর বিশ্ব-জোড়া একটা স্বতন্ত্র বিচিত্র গতি রয়েছে, এই বিরাট গতির উত্থান-পতনের ইতিহাস হচ্ছে artএর ইতিহাস। একই জলের ঢেউ যেমন নানা জায়গায় মাথা তুলতে তুলতে চলে—বেগের তারতম্যে কোথাও বড় কোথাও ছোট, বিচিত্র ভঙ্গীতে বিচিত্র; তেমনি artও আপনাকে প্রকাশ করছে—স্থানে স্থানে ক্ষণে ক্ষণে এক ও বিচিত্রভাবে গোড়ায় রয়েছে রসের কল্পনা বা ইংরিজীতে যাকে বলি artistic feeling; কোথাও সেটা ফুটেছে খুব শীঘ্র একরকম, কোথাও সেটা এসেছে খুব পরে আর এক রকম। ইউরোপ angelকে ডানা দিয়েছে যে রসের তাড়নায়, সেই রসেরই তাড়নায় আমাদের দেব-দেবীর মূর্ত্তি দশ হাত, হাজার হাত ছড়িয়ে বাতাস কেটে চলেছে দেখছি। এতে ক'রে কেন যে একটাকে বলি angel আর একটাকে বলি monster তাতো আমি বুঝিনে। কোন authority নিয়ে গায়ের জোরে রাক্ষস বলে বসলো ওরা' আর আমরা সেটা মেনে নিলুম কবাবে নির্বিচারে, সেটা আর যাতেই সম্ভব হোক artএর ইতিহাস গড়বার বেলায় সেটা চলবে না। সেখানে এককথা art, কি art নয়।

গ্রীকদের কাছে গ্রীক শিল্প ছাড়া সবই Barbarian art, Birdwood সাহেবের মতে বুদ্ধ-মূর্ত্তি Salt Pudding ছাড়া কিছুই নয়, Anderson বলেন, এ সবই monster, আর Vincent Smith যিনি সেদিন Indian

Artএর history লিখে গেছেন তিনি বলেন, এদের দেশে Fine art সম্বন্ধে কোন বই লেখা এ পর্য্যন্ত হয়নি। কাজেই Fine art ব'লে পদার্থ এদেশে নেই ও ছিল না,—চীনের দেশে artএর ষড়ঙ্গমালা আছে তাদের artও আছে, গ্রীসের পুঁথিগুলো দুর্ভাগ্য ক্রমে লোপ পেয়েছে এবং রোমান আমলের কপি ছাড়া আসল গ্রীক মূর্ত্তি খুবই কম পাওয়া যায়, কিন্তু তবু তাদেরও art আছে, কেবল নেই এদের! আর খুব আধুনিক ফুচে সাহেবের মত হ'ল, তোদের যা কিছু ভালো সবই প্রায় গ্রীসের দেওয়া। এ ছাড়া ছোট-খাটো অনেক authority আছে যারা এদেশের Fine artকে সপ্তরথীর মতো ঘিরে বধ করতে চাচ্ছে। একা অভিমন্যু তার সেকালের ধনুর্ব্বাণ এমন কি ভাঙ্গা রথের চাকা ঘুরিয়ে যে কিছু করতে পারে এ ক্ষেত্রে তা বোধ হয় না। অস্ত্রে অস্ত্রে কাটাকাটি খানিক চলবে কিন্তু তারপরে যখন বাক্‌যুদ্ধ বাধবে তখন আমাদের পরাজয় স্বীকার করতেই হবে যদি না তেমন যোদ্ধা পাই। আমি তো বলি লড়ায়ে কাজ নেই, সে সময়টা artistএর চোখ দিয়ে দেখে Art History যদি কেউ আমরা লিখে যেতে পারি সেই চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য। এটাকে তোমরা বলবে ভীরুতা। কিন্তু আমি বলি সুবিবেচনা। Archæologyর শরশয্যায় artকে না শুইয়ে তাকে নিজের দরদের সিংহাসনে বসিয়ে যদি দেখ, তো দেখবে ঢের গোলযোগ আপনি মিটে যাবে, এবং artistএর দিব্যচক্ষু নিয়ে তোমরা দেখতে পাবে যদিই বা লড়তে চাও তো ওই-সব authorityকে উড়িয়ে দেবার অস্ত্রাস্ত্র হচ্ছে artএর প্রথম ফরমান, Archæologyর ধূমধাম নয়। Artএর ইতিহাস দরদের ইতিহাস, আর artএর গতিবিধির ইতিহাসটা সুবিস্তৃত সব বড় জিনিষের যেমন তেমনি। সেটার ইতিহাস লেখার সময় দরদ দিয়েই লিখতে হবে, চাক্ষুস প্রমাণ দিয়ে কোন বিশেষ artএর সঙ্গে অন্য artএর তারতম্য এবং তার মোটামুটি আন্দাজ শ্রেণী ও জাতি-বিভাগ করা চলে, কিন্তু artএর মনের কথা, যেখানে গ্রীক হিন্দু মুসলমান পারসী চিনে জাপানী আধুনিক ও পুরাতন একাকার হয়ে artএর বিরাট ধারাটি উঠে পড়ে চলেছে, কোথাও অন্তঃশীলা বইছে আপনার স্বরূপ প্রচ্ছন্ন রেখে, কোথাও মিলছে ত্রিবেণী-সঙ্গমে, কোথাও একটানা স্রোতে কোথাও জোয়ার-ভাঁটা খেলিয়ে চলেও গেছে এবং চলেও যাবে অবাধ আনন্দময়ী ছন্দরূপা, তার ইতিহাস দরদীরই জানের বিষয়। চাক্ষুস প্রমাণের চেয়েও সত্যকার এই দরদ দিয়ে লেখা যে artএর ইতিহাস সেই হচ্ছে নানা শিলা-লিপিতে যা পাই, মাটি খুঁড়ে যা পাই, সাহেবের লেখা ইতিহাস পড়ে যা পাই—সবার চেয়ে artএর সঠিক ইতিহাস, কেননা দরদের প্রকাশ হোলো না art। দরদ জিনিষটি দেখাও যায় না, শোনাও যায় না, কিন্তু দরদ অনেকখানি দেখাতে পারে শোনাতেও পারে। দপ্তরী টানলে লাইন রুল দিয়ে পরিষ্কার একেবারে সোজা, ছেলেও দেখে সোজা বুড়োও দেখে সোজা, কিন্তু artist দেখলে ওটা লাইন ছাড়া আর কিছু নয়। Artist টানলে লাইন দরদ দিয়ে, সেটা হল এমন জিনিষ যে দরদী ছাড়া সহজে কারো বোঝবার জো নেই। এইখানে দপ্তর-খাঁটা ঐতিহাসিকের ইতিহাসের সঙ্গে

artistএর লেখা artএর ইতিহাসের তফাৎ। বে-দরদী সে factএর উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর ক'রে লিখতে চলে, factএর বাইরে যা তার ইতিহাস, কাজেই তাতে ভুল থেকে যায়, আর দরদী লিখে চলে দরদের টানে হু হু ক'রে, তাতে fact হয়ে যায় ওলোট-পালোট। Fact বাদ দিয়ে ইতিহাস যেমন অসত্য, তেমনি দরদ বাদ দিয়ে শুধু fact নিয়ে artএর কথা বল্লে তার চেয়ে কম অসত্য হয় না। রূপালের সব ইতিহাস লেখা হলো কেবল রসের কথাটাই বাদ পড়লো এটা ভালো, না তার ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব অনেকটা বাদ গেল কিন্তু রসতত্ত্বটা সম্পূর্ণ ফুটে উঠলো সেটা ভালো, এ নিয়ে মামলা artist ও archæologist দুই দলেই চলেছে কিন্তু জিতবে দরদী! ইতিহাসের তথ্য আজ বদলাবে কাল বদলাবে কিন্তু দরদীর অভ্রান্ত দৃষ্টিতে artএর সত্য কথাটাই পড়বে অভ্রান্তভাবে এটা ঠিক। এ পর্যন্ত যা fact আবিষ্কার হয়েছে তারি উপরে নির্ভর ক'রে archæologist দেখলেন গান্ধার শিল্প অতি চমৎকার আর তারি প্রভাব ভারতের এমন কি জাভা চীন জাপান যেখানে যত বুদ্ধ-মূর্ত্তি আছে তার উপরে, কিন্তু দরদীর বা artistএর দিক দিয়ে গান্ধার-শিল্পের ঐ মায়াদেবী * কিম্বা বোধিসত্ত্বটির * দিকে চেয়ে বেশ দেখবে হয় মেয়ের ধড়ে পুরুষের মুণ্ড নয় এর বিপরীতটা! Fact বাদীরা একেই বলেন গান্ধার শিল্প বা Greco-Bactrian art আর এরি ফল ভারতের শিল্প, কিন্তু দরদী দেখে গান্ধারের বীজ যা তা থেকে ভারত কেন, কোন শিল্পই জন্মাতে পারে না, কেননা, সেটা গ্রীক শিল্পের কতকটা আবর্জ্জনা, গ্রীক অভিযানের স্রোতে এদিকে এসে পড়েছিল, জোয়ার চলে গেলে ভাঁটার মুখে এইখানেই পড়ে রইলো, এই আবর্জ্জনা কুড়িয়ে ভারত শিল্পী বুদ্ধদেবের মূর্ত্তিও গড়ে নি, মায়াদেবীকেও সাজায় নি, একটি খাঁটি বুদ্ধ মূর্ত্তি আর মায়াদেবীর চেহারা * দেখলেই সেটা বোঝা যাবে। গ্রীসের বরুণ দেবতার * পাটখানি যেমন বোঝাচ্ছে গান্ধার শিল্পের মূলে রয়েছে গ্রীক শিল্প, তেমনি আমাদের 'সুন্দর' মূর্ত্তি প্রমাণ করছে—নানা গ্রীক-দেবতার বীজে ভারত-শিল্পের জন্ম নয়, কিছুতেই নয়। তেঁতুলের বীজে আর আমের বীজে যতখানি তফাৎ তার সঙ্গে সমান তফাৎ গান্ধার-শিল্পে আর ভারত-শিল্পে, এই হ'ল দরদীর প্রমাণ। দরদীর চোখে গ্রীক দেবতা আর 'সুন্দর' মূর্ত্তি এক শ্রেণীর জিনিষ, দুয়ের মধ্যেই গড়ন আর ভাবের এমন-কি কারিগরিরও পার্থক্য বড়-একটা নেই এ-টা fact, কিন্তু Archæologistরা কিছুতেই মানবে না, দেখিয়ে দিলেও দেখতে পাবে না—কেননা তারা যে দরদী নয়। বরং fact-বাদীরা এই কথাই বলবে যে গ্রীকের নরদেব আর সিংহলের এই অতি-আশ্চর্য্য ভক্ত মূর্ত্তির সঙ্গে যখন অনেকটা মিল দেখা যাচ্ছে তখন

* Fig. 67. 68. P. 116. Vincent smith.

* Fig. 62. P. 112 Vincent smith.

* P. xxxvi. Vincent smith.

* Fig. 77. P. 124 Vincent smith.



সুন্দর মূর্ত্তি

সুন্দর মূর্ত্তির জনক নিশ্চয়ই গ্রীক-দেবতাটি, কিন্তু দরদীর উত্তর হচ্ছে তা নয় দেখতে এক হলেও এক রসে গড়া একটি, অন্য রসে গড়া অন্যটি, art দুটিরই জনক, এরা দুই ভাই, কিন্তু রস দিচ্ছে দুজনে পৃথক পৃথক যেন হিন্দু-মুসলমান, মানুষ হিসেবে দুই ভাই কিন্তু রসের প্রকৃতি দুয়ের সম্পূর্ণ আলাদা। পিতা পুত্র হ'লে এরূপটি হতো না, কম-বেশী একই রস দুজনে দিত। এই রসের তারতম্য ধরে artর ইতিহাস লেখার কথা কিন্তু নীরস Fact দিয়েই রসের ইতিহাস গড়তে চলেছে প্রায় সবাই, কেন যে, তার কারণ যারা রস সৃষ্টি করতে চায় তাদের ইতিহাস সৃষ্টি করবার চেষ্টাই আসেনা সময়ও হয় না। আমাদের দেশে শিল্পীর মন থেকে অষ্টাদশভুজা দানব-দলনী মূর্ত্তি যখন বায়ুস্তরে একটা স্তর তুলে বেরিয়ে এল, সেটা দেখে দরদীর মন আলোড়িত হল, সে নির্ব্বাক হয়ে রস উপভোগ করলে, আর যে দরদী নয় সে চেঁচিয়ে উঠলো monster বলে, এবং কেতাবে লিখলে এরা রাক্ষসী-প্রতিমা ছাড়া আর কিছুই গড়ে নি গড়তে পারে না। They are a peculiar people and necessarily produce peculiar art—বাস্ এই পর্য্যন্ত।

কিন্তু দরদীর দিক দিয়ে এ-কথা যদি বলা যায়, Sir, you are not at all artistic so you do not understand what *Rasa* is and therefore you are unaffected by *Rasa*—এ হ'লেই ঝগড়া। যারি পেতে আছে সে যেমন এদেশে আপনাকে ভাবে ব্রহ্মবিদ্যার উত্তরাধিকারী তেমনি সাদা চামড়া মাত্রই আপনাকে ঠাওরায় artist, রাস্কিন নিজেকে তাই ঠাউরে গ্রীস ছাড়া সবার শিল্পকে বর্ব্বর বলে নিন্দা করেছিলেন এবং সেই গর্ব্বে Whisler artকেও সমালোচনা করতে গিয়েছিলেন, বিশ্ব-শিল্পের দেবতা তাঁকে আদালতে নিয়ে এক শিলিং জরিমানা ক'রে ছেড়ে দিলেন। Birdwood সাহেবেরও ঐ দশা। জীবনের বেশি ভাগ এদেশে কাটিয়ে দেশের কারু শিল্পের উপরে ভালো বই লিখে শেষ বয়সে তিনি বুদ্ধের-মূর্ত্তিকে গালাগালি দিলেন

Salt pudding ব'লে অমনি তাঁবই দেশের ত্রয়োদশ দরদী মিলে তাকে বধ করলে, প্রাণে নয়, মানে। Vincent Smith যেদিন লিখলেন, তাঁর Art History-তে, "The enormous mass of Indian literature whether in Sanskrit or in any other language does not contain, I believe a single treatise on the æsthetics of plastic or pictorial art, and thus present a marked contrast to the literature of China." যেদিন সাহেব বল্লেন, চীনেদের মধ্যে এদের ষড়ঙ্গমালা নেই, সেই দিনই বাৎসায়ণের ষড়ঙ্গ ছটা সাপের ফণা তুলে গর্জে উঠলো।

রূপভেদ প্রমাণানি ভাবলাবণ্যযোজনম
সাদৃশ্যম্ বর্ণিকভঙ্গম ইতি চিত্রম্ ষড়ঙ্গকম্।

এই ভারত ষড়ঙ্গমালা চীনের চেয়ে পুরা-ও বটে বিচিত্রও বটে, সেটা Fact-বাদীদের চোখে পড়বে কেন, চোখে পড়লো আগেই তাদের, যারা দরদী—artর ক্রীতদাস। মানুষ একদিন না একদিন মরবে, যে দরদী সেও মরবে, যে নয় সেও মরবে, কাজেই artর history অসমাপ্ত রেখে যদি কেউ চলে যায় আগেই, তার জন্যে দুঃখ নেই, কিন্তু দুঃখ থাকবে যদি আমাদের দেশে যে চমৎকার প্রকাণ্ড একটা art treatise ইংরেজী ভাষার জন্মের বহুপূর্ব্বে ভারতবর্ষীয় দরদী লিখে গেছেন সেটার কথা কিছু তোমাদের জানিয়ে না যাই। আমার বড ইচ্ছে ছিল Vincent Smithকে এই পুঁথির কথাটা একবার শুনিয়ে দিই কিন্তু তা এখন আর হয় না, কাজেই তোমাদের সময় থাকতে শুনিয়ে রাখছি, বিশ্বাস হয়ো না যে, ভারতবর্ষের এত-বড় art থাকতে Æsthetics সম্বন্ধে কেউ ভাবেনি বা লেখেনি। লিখেছে, এমন ক'রে লিখেছে, এমন সম্পূর্ণ ও নিখুঁত ক'রে লিখেছে, যে আমার মনে হয় যে art সম্বন্ধে তার উপর আর কিছু বলা চলে কি না। আমি অবাক হয়ে যাই যে art আর æsthetics সম্বন্ধে এত বড় সাহিত্য এ দেশে থাকতে art সম্বন্ধে জানতে চাই আমরা সাহেবদের লেখা পড়ে, এর এক কারণ বই-খানা সংস্কৃতে লেখা, আর এক কারণ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্ররা সংস্কৃত জানলেও artর জ্ঞান তাঁদের একেবারেই নেই, কাজেই অলঙ্কার শাস্ত্রটা কাব্যেরই অন্তর্গত করে তাঁরা ধরেছেন, অলঙ্কারের সূত্রগুলো যে ছন্দে ছন্দে artর ব্যাখ্যা ক'রে চলেছে সেটা কোন পণ্ডিতকে তো এ পর্য্যন্ত বলতে শুনলেম না! ছেলেবেলায় যা একটু দেবভাষা পড়েছি আর এ পর্য্যন্ত যেটুকু শিল্প চর্চা করেছি, তাতে ক'রে আমি স্পষ্ট দেখছি অলঙ্কার শাস্ত্রটা মূলতঃ সব শিল্পেরই ব্যাখ্যা। কাব্য, সঙ্গীত, চিত্র, নাট্য সবারই মূল কথা এখানে ধরা রয়েছে। সেকালে Photograph ছিল না যে অলঙ্কার শাস্ত্রকার নানা মূর্ত্তি নানা চিত্র দিয়ে সূত্রগুলি বিশদ্ ক'রে বোঝাবেন, কবিতার পুঁথিগুলো হাতের কাছে পাওয়া সহজ ছিল সেইজন্যে তারই নমুনা তুলে আপনার Laws of Æsthetics বুঝিয়ে গেছেন, এখন সময় এসেছে ঐ সব সূত্র মূর্ত্তি-শিল্প চিত্রশিল্প এমনি সবার নমুনা দিয়ে বোঝানো। এটা দেখা যায় যে, একই অলঙ্কার-শাস্ত্র নানা মুনি নানা শিল্পের ব্যাখ্যায় লাগিয়েছেন

সময়ে সময়ে। ভরত অলঙ্কার-শাস্ত্র জুড়ে দিলেন নাট্যকলায়, সাহিত্যিক জুড়লে সেটা সাহিত্য-দর্পণে, কবি নিয়ে সেটাকে গড়লেন কাব্যপ্রকাশ, কেন এখন বাংলায় একটা শিল্পপ্রকাশ না ক'রে অলঙ্কারে সাজানো? Art æsthetics সম্বন্ধে একটা স্বাধীন চিন্তার স্রোত অনেক কাল ধরে এদেশে চলেছে দেখি। এক কালের art critic কোন-এক সূত্র লিখলে সেই সূত্রের নানা ব্যাখ্যা কালে কালে পণ্ডিতেরা ক'রে চল্লেন, এইভাবে বিচার চলতে চলতে কোন সূত্র দেখছি গ্রাহ্য হচ্ছে, কোনটা বা খণ্ডিত হচ্ছে বর্জ্জিত হচ্ছে—এম্‌নি ক'রে কালে কালে নানা সভ্যতা নানা সময় নানা মনের ছাপ নিয়ে অলঙ্কার শাস্ত্রগুলি গড়ে উঠেছে দেখি। আমাদের দেশে যত দীর্ঘকাল ধরে æsthetics সম্বন্ধে বিচার-বিতর্ক চলেছে এমনটি আর কোনো দেশে হয়েছে কিনা সন্দেহ। শিল্পীর দিক দিয়েও অলঙ্কার-শাস্ত্র নিয়ে নাড়া-চাড়া যে চলেছে তারও আভাস কতক কতক প্রাচীন ছবিতে দেখেছি। এই সেদিনের কথা-কতকগুলো পুরোণো ছবি উল্‌টে-পাল্‌টে দেখছি, বসন্ত-ঋতুর একটা ছবির উপরে একটা হিন্দিতে লেখা শ্লোক চোখে পড়লো, আমি শ্লোকটা পড়ে চল্লেম, অলঙ্কারের পণ্ডিত ছিলেন সাম্‌নে, হঠাৎ ব'লে উঠলেন, এ যে কাব্যপ্রকাশের একটা জানা কবিতা! কবে কার মাথায় কাব্যপ্রকাশটা ছবি দিয়ে প্রকাশ করবার ইচ্ছে হয়েছিল, কে জানে, তাঁরি প্রমাণটুকু রয়ে গেছে বাকি, কিন্তু এ থেকে ধরা যায় যে নবরস যা কাব্য-প্রকাশের মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে সেটা কেবলি কবিদের একার সম্পত্তি নয়, শিল্পীরও সেটা নিয়ে অলঙ্কার-শাস্ত্র লেখার নজীর রয়েছে। অলঙ্কার-শাস্ত্রকে ইংরিজিনবিশেরা তর্জ্জমা করেন Treatise on Rhetoric ব'লে, সেটা একেবারে ভুল; সঙ্গীত, কাব্য, সাহিত্য, নাট্য, এবং চিত্র ও অন্য শিল্প সবার সাধারণ সম্পত্তি হচ্ছে অলঙ্কার-শাস্ত্র—এর তর্জ্জমা হওয়া উচিত Our Laws of Æsthetics কিম্বা Indian Æsthetics. যাই বল ওটা কেবলি কিন্তু Treatise on Rhetoric নয়। সমস্ত অলঙ্কার-শাস্ত্রের সূত্রগুলো ছবি মূর্ত্তির দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝাতে পারলে শুধু যে মনোরম হবে তা নয়, জিনিষটাকে বোঝাও আমাদের সহজ হবে। সমস্ত শাস্ত্রটাই বোঝানো চলবে কি না ছবি মূর্ত্তির দিক দিয়ে, সেটা ভাববার বিষয়, তবে এটা বলা যায় যে, চেষ্টাটা একবার ক'রে দেখলে হয় সেটা বাজে কাজ বলে উড়িয়ে না দিয়ে। অলঙ্কার-শাস্ত্র যে শিল্পী এবং শিল্পকে যারা জানতে চায় তাদের পক্ষে কতটা কাজের হ'তে পারে তা বলি।

আমাদের সাধারণ ধারণা, কাব্য হচ্ছে নানা ছন্দে-বাঁধা কবিতার লেখাগুলো,—কিন্তু আলঙ্কারিক বলছেন 'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যং।' বাক্য মানে এখানে মুখের কথা নয় ইংরেজিতে যাকে বলে Utterance তাই, কিন্তু যেমন সব জিনিষই art নয় তেমনি Utterance মাত্রই কাব্য নয়, সেটা রসাত্মক হ'লে তবে হলো কাব্য। কথা দিয়ে, শরীরের গতিবিধি ও সুরের ওঠা-পড়া দিয়ে যেমন মনের চিন্তা ও ভাব uttered হচ্ছে কবিতায় নাটকে ও গানে তেমনি arts জিনিষ দিয়ে artists ও মনোগত-যা-তা uttered হচ্ছে—কিন্তু যা-ই uttered

তাতো কাব্য কিম্বা art ক'তে পারে না, বীণা-দণ্ডটার আঙুল দিয়ে ঘা দিলেম, কাঠ বল্লে টক্ টক্ কিম্বা তার বল্লে টিং টিং সেটা কাঠ আর তারের utterance হলো মাত্র,বর্ণাত্মকও হ'লনা কাব্যও হলনা। Artist বীণা তুলে নিলে, তার মনের রস গিয়ে বীণার তারে, তার কাঠের অণু-পরমাণুতে, তার খোলটার মধ্যে ভরা বাতাসে কম্পন তুল্লে, সঙ্গীত-বাণী রাগ-রাগিণীর মূর্ত্তি uttered হলো। তখন হলো সেটা art। এমনি অলঙ্কার-শাস্ত্রে art বিষয়ে কত গভীর চিন্তা যে লুকোনো রয়েছে তার ঠিকানা নেই। মহাকাব্য বলতে আমরা এ-পর্য্যন্ত বুঝে আসছি রামায়ণ মহাভারত আর নয়তো পৃথ্বীরাজ বধ। কিন্তু অজন্তার আর বরভুধরের পাথরে কেটে শিল্পী যে মহাকাব্য লিখেছে সেটার খবর আজ আমার কাছে, শুনছো। সত্য কিনা, মহাকাব্যের লক্ষণের সঙ্গে মিলিয়ে দেখ—'কোন দেবতার কিম্বা সদ্বংশজাত ক্ষত্রিয়ের অথবা এক-বংশসম্ভূত নৃপতি-পরম্পরার বৃত্তান্ত লইয়া যে রচনা তাহার নাম মহাকাব্য। মহাকাব্য নানাসর্গে বিভক্ত, কিন্তু আট সর্গের ন্যূন হইলে মহাকাব্য হয় না।" শুধু কটা গুহায় কতলায় বরভুধরের আর অজন্তায় ছবি ভাগ করা হবে সেইটে জানতে বাকি রইলো। খণ্ডকাব্য —মহাকাব্যের কোন কোন লক্ষণাক্রান্ত ও এক এক বিষয় লইয়া লিখিত হয় খণ্ডকাব্য। এর দৃষ্টান্তও শিল্পে ভূরি ভূরি রয়েছে। তারপর আছে অলঙ্কারে বৃত্তি বা style সম্বন্ধে বিচার তারপর লক্ষণের অধ্যায়ে চিত্রের কাব্যের স্বরূপ বিভাগ, আকার-চিত্র বন্ধচিত্র, গতিচিত্র স্থানচিত্র। এগুলো কি কাব্যেই খাটে, শিল্পে খাটে না।

আকার-চিত্র কাকে বলা হচ্ছে, না—Those which have only one creator, the Lord, are called আকার-চিত্র।" এখানে যে আকৃতি সৃষ্টিকর্তার রচনা তারি প্রতিকৃতি মাত্রটিকে বলা হ'ল আকার-চিত্র, এককথায় Photographic representtion, not artistic expression হল আকার-চিত্র। এমনি কি পরিষ্কার ক'রেই আমাদের আলঙ্কারিক বুঝিয়েছেন শিল্পের খুব ভিতরের ও খুব বাহিরের খুব সহজ বা খুব শক্ত কথাগুলো ভাবলে অবাক হই।

বন্ধচিত্রের বেলায় বলা হচ্ছে, which are created by the Lord and by man and have thus two creators, constitutes বন্ধচিত্র। গাছকে ডালপালার আকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করলেন বিধাতা গাছ কেটে পুতুল কিম্বা চৌকি কিম্বা নৌকো গড়লে শিল্পী, দুই সৃষ্টিকর্তার ভাব হয়ে গেল, বিধাতা বুঝলেন তিনি পারেন না নৌকো গড়তে, শিল্পী বুঝলে সে পারেনা গাছ গজাতে, কাজেই দুজনে সন্ধি-বন্ধন হয়ে হ'ল বন্ধচিত্র, ইংরিজী ভাষাটা সৃষ্টি হবার পূর্বে যে-সব ভাবনা আমাদের পণ্ডিতেরা ভেবে বিচার বিতর্ক ক'রে চুকেছেন ইউরোপ তারি কতক কথা নতুন ক'রে বলছে, কতক কথা এখনো বলতেও আরম্ভ করেনি দেখি, কিন্তু এই গর্ব্বে সবই আছে বলে যদি আমরা ঘুমোতে বসি, তবে চোখ আমাদের বোজাই থাকবে আর কোন দিন দেখবো আমাদের ধন পরহস্তগত হয়েছে, তখন আপসোস সার হবে। অলঙ্কারের ধুয়া দিয়ে এবারে আমাদের মধ্যে কেউ কেউ তোমরা লড়ায়ে এগোবে,

কিন্তু ব'লে রাখছি সবই বৃথা যদি আমাদের হাতে পড়ে এই শাস্ত্রটা লোককে ঠকাবার ও হাসাবার জিনিষ হয়ে ওঠে। জিনিষটাকে যদি সত্যি কাজে লাগাতে হয় তবে স্থির হয়ে বসে রসের জিনিষগুলি সংগ্রহ এবং সব-চেয়ে প্রধান কাজ রসিকদের একটা দল বাঁধা, শুধু দেশী রসিকের কর্ম্ম নয়, বিদেশী রসিকদেরও চাই এখানে জাত্যাভিমান চলবে না। কেননা জার্ম্মাণ পণ্ডিত জাকোবী, অল্ডেনবার্গ এঁরা অলঙ্কার আর ইতিহাস আমাদের যেমন বিশদ ক'রে ব্যাখ্যা ক'রে গেছেন Havell যেমন চোখে আমাদের কলা বিদ্যাকে দেখেছেন—তার সমকক্ষ লোক এদেশে পাওয়া যায় ভালো। এই সব দেশ ও বিদেশের রসিক মিলে যদি কারিকা ধ'রে অলঙ্কার-শাস্ত্র ব্যাখ্যা করেন, শিল্পের দিক দিয়ে তবেই হবে একটা জিনিষের মতো জিনিষ।

যে দেশ থেকে রসিকের সভা উঠে যায়, রসের চর্চ্চা যেখানে বন্ধ হয়ে যে দেশে কেবল পলিটিক্স আর হরতাল্ শুষ্ক-হাতে হরিত-কীটের মতো অবশিষ্ট থাকে, সে দেশের ভাণ্ডার শূন্যই বলতে হয়—সেখানে বীণার ঝঙ্কারের চেয়ে দুর্ভিক্ষের চীৎকার প্রবল হয়, কেননা সেখানে থেকে শিল্প তার সঙ্গে দেশের শ্রীও বিদায় হয়। এইজন্য অলঙ্কার-শাস্ত্রের গোড়াতেই বলা হয়েছে।

কাব্যং যশসে অর্থকৃতে ব্যবহারবিদে শিবেতর ক্ষতয়ে—

সদ্যঃপরনির্বৃতয়ে কান্তাসম্মিততয়োপদেশ যুজে।

Art is for fame, wealth, knowledge of rights, usages, removal of evils, it is the Smile of a lover brightening our home exhorting us to do good, and it is ever-lasting joy.

এরি, প্রতিধ্বনি এখনকার ইউরোপ দিচ্ছে—a thing of beauty is a joy for ever.

এই কথারই পরিষ্কার প্রতিধ্বনি পাচ্ছি ফ্রান্সের বিখ্যাত মূর্ত্তি-শিল্পী রোঁদার কথায়, It is the human soul's smile on the house and its belongings…it impregnates everything of use to man with the charm of thought and sentiment.

বিশ্বে এলো মানুষ—এর অর্থ এই যে মানুষ বিশ্বকর্ম্মার রচনার মধ্যে নেমে এল রসের অভিনয় দেখতে এবং দেখাতে—যেমন ক'রে শিল্পী ছবি দেখেও বটে দেখায়ও বটে; সে কথা মানুষ ভুলে গেল, চল্লো অন্ধ পথে—উল্টোমুখে ঘরের শ্রী বাহিরের শ্রী কোনোদিকে তার চোখ রইলো না—রইলো গোলদিঘীর পশ্চিমে মোটা থাম-কড়ার দিকে, নয় ম্যাদাপত্তের চূড়োর দিকে, নয় আফিসের বড় সাহেবের ঘড়টার দিকে! এ হ'লে শ্রীই শুধু চলে গেল সারা-জীবন থেকে; আর শ্রী যদি চলে যায়, রস যদি শুকিয়ে মনটা ঝামা হয়ে যায় শক্ত কর্কশ সে মানুষের হয় কি? রসের উৎস বন্ধ হয়ে যায়, রস-সাগরে গিয়ে জীবনের মেলবার পথে চড়া পড়ে আর মরুভূমি ধূ-ধূ করতে থাকে—সামনে পিছনে আশেপাশে। যে দেশে ঋতুতে ঋতুতে বিচিত্র রস ফুটে পড়ছে, সে দেশে fine art ছিল না, হ'তেও পারে না, এটা

যেমন fact নয়, তেমনি এটাও যে ভয়ঙ্কর fact আমাদের মধ্যে এখন art নেই, artএর ভাবনা নেই, আর্টের আনন্দ আর্টের জন্তে চিন্তামাত্র নেই ঘরে, ঘরে! ইতিহাসের fact নিয়ে লড়াই ক'রে হবে কি, আসল লড়াই হচ্ছে এই অতি-সত্য অতি-ভীষণ factটার সঙ্গে—art ছিল। যা ছিল সে তো ছিল, কিন্তু সেটা যে এখনো আছে এবং ভবিষ্যতে থাকবে তার প্রমাণ আমরা কোথাও পাচ্ছি কি না দেখ। স্থাপত্য-শিল্প নেই, সঙ্গীত রয়েছে প্রায় না থাকারই মধ্যে, অতীতের তার বেশী, বর্ত্তমান খুব কম। চিত্রবিদ্যা একটু গা-ঝাড়া দিচ্ছে কিন্তু এখনো রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাহিরে, কাব্য-সাহিত্য অনেকটা সজাগ ও সবল দেখছি স্বাধীনও বোধ হচ্ছে এই ছুটো। কিন্তু এই হ'লে যদি আমরা খুসি থাকি তবে artএর পরিপূর্ণতা তো পাওয়া আমাদের সম্ভব নয়। কবি লিখলেন নাটক কিন্তু দেশে সেটা প্রচার করলে না অভিনেতারা। ছবি লিখলে অজ্ঞে, নিয়ে গেল সেগুলো পাঁচজনে এসে বিদেশ থেকে, গান গাইলেন তানসেন তার পর থেকে কেউ আর রাগ পর্য্যন্ত করলে না, সেই একই গান শুনতে শুনতে এ পর্য্যন্ত, বারাখাতে ভাঙলো মন্দিরের চুড়ো তার জায়গায় উঠলো খোলার চাল। artএর এ দীনতা তো ঘুচবে না, সমস্ত জীবনের গতি আমাদের যদি artএর মুখে না গিয়ে যায় কেবল আফিস-আদালতের মুখেই অনবরত। সাহেব-গুলো খেতে বসেছে আর শুনছে পাশেই বেহালা সুর ধরেছে, আর আমরা খেতে বসেছি শুনছি খাড়িতে ঘণ্টার ঘড়ি টিং টিং বলছে—আর না, ওঠো, সময় ফুরিয়ে এলো। এই যে নিরানন্দ জীবন, এ থেকে একটু ছাড়া পেলে যদি কেউ অসম্ভব রকম আমোদের নেশায় সারা রাত থিয়েটারের কিন্নরীকে অপ্সরী ভেবে কাটিয়ে দেয়, আর বসন্তের আগমনে বছরের একটা দিন নিজেরা ফাগ মেখে রাস্তায় ঘাটে হারমোনিয়াম বাজিয়ে চীৎকার ক'রে কান ঝালা-পালা ক'রে দেয়, তবে তার দায়ী কাকে করা যাবে? যারা আমোদে মেতেছে তারা নয়, যারা নাচ গান সবই দেশের লোপ ক'রে দিয়ে সুসভ্য হয়ে উঠতে চলেছে তাদেরই দায় এটা। আমাদের থিয়েটার বাইনাচ যাত্রাযাত্রী এমনি সব নানা জিনিষ, যে গুলোর মধ্যে অনেকখানি art থাকা দরকার ছিল, সেগুলো এখন বিকৃত রুচির আড্ডা হয়ে পড়েছে, কেন না তার মধ্যে art নেই, কাজেই ছেলেগুলিকে সেখানে পাঠাতে সকলেই আমরা ভয় পাই। কিন্তু art বর্জ্জিত অতএব সম্পূর্ণ বিকৃত সমস্ত যৌবনকালব্যাপী একটা ভয়ঙ্করনীরস শিক্ষা-প্রণালীর ভিতর দিয়ে আমাদের ছেলেগুলোকে আমরা মানুষ করতে চলেছি একবার ভাবিনে পরকালে কি হবে, শুধু সেই নয় এই শিক্ষার স্কুল-পোড়ার শিলমোহরের ছাপ নিয়ে আসবার জন্তে ছেলে না চাইলেও জোর ক'রে তাকে দাগী হ'তে পাঠাই, এমন-কি উৎসাহ দিতেও কসুর করিনে; এখন এই আর্টশূন্য শিক্ষায় শিক্ষিত ছেলেরা বুড়ো হবার আগেই যদি থিয়েটারে গিয়ে বাকি যৌবনটা কাটিয়ে দিতে চেষ্টা করে, তবে যাদের রুচি রস এ-সবের কোন ব্যবস্থাই এ পর্য্যন্ত করা হয়নি—তাদের অনর্থক আমরা দোষ দিই

কেমন ক'রে ? কেবল পেন্সিলের দাগ আর পানের পিক্ এরি মধ্যে বসিয়ে পড়ালেম ছেলেকে, সে কলম পিষ্‌লে সমস্ত দিন, রাতের অর্দ্ধেক কাটাতে লাগলো বিকৃত মূর্ত্তি আর পানের পিকের মধ্যে—এতো হতে বাধ্য! এম্‌নি বিপরীত শিক্ষার মধ্যে দিয়ে আমরা চলবো—আর art চলবে না, চুপটি ক'রে বসে থাকবে আমাদের ঘরের লক্ষ্মী হয়ে, এ হতে পারে না। ঘরের মধ্যে কেরোসীন safety lampএ ভরে রাখলেও আমাদের আর্ট পুড়ে মরবে—তাতেই সংসারের জিনিষগুলোয় আমাদের আগুন ধরিয়ে। আমাদের শাস্ত্রে artকে বল্‌চে হয় অনন্য-পরতন্ত্রা, সুতরাং আমাদের আর্ট আর কারু হ'তে পারে না, কিন্তু তবু সে যে "হ্লাদৈকময়ী" যেখানে art এর আনন্দ লোকের মধ্যে নেই নিশ্চয় জানবে সেখানে আর্ট থাকে না। Artর মানে অভিধানে পাবে—'নৈপুণ্য' শিল্প মানে পাবে 'অর্থকরী বিদ্যা' কিন্তু ভেবোনা যে এ দুটো artর ঠিক মানে। কাজের চালাকি বুদ্ধির দৌড় এ-সব দিয়ে অর্থকরীবিদ্যাকে বাগে আন্‌তে পারো, কিন্তু তাই ব'লে artকে পাবে এটা মনেও করা ভুল! Art যে সহজ বস্তু নয়, তা art কি, তা জান্‌তে চেষ্টা কর্‌লেই বোঝা যায়, আমি তো না সংস্কৃত না ইংরিজী না ফরাসী অভিধানে artর মানে পেয়েছি। What is Art ব'লে বইটা পড়লুম তাতে কেবল নিজের মাথাই ঘুরানো—artর মাথামুণ্ডু কিছু পেলুম না, কাজেই তোমাদের বলছি History of Art, What is Art এমনি সব বড় বড় বই পড়ে ও তর্ক-বিতর্ক শুনে artকে একটুও বোঝা যায় না, বোঝা যায় একটিবার দরদীর একটি কথা শুনলে। দুঃখের বিষয়, দরদী সকল দেশেই চিরকালই দুর্লভ, তাই এ পর্য্যন্ত art সম্বন্ধে পরিষ্কার বুঝিয়ে একটি মাত্র শ্লোক ছাড়া না দেশে না বিদেশে কোথাও আর কিছু পেয়েছি। আজ হ'ল বিংশ শতাব্দী, আর আমার শ্লোকটি দশ বা দ্বাদশ শতাব্দী কি তারও পূর্ব্বের ঠিক বলা যায় না। এই শ্লোকে art সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে এই শত শত বৎসরে মানুষের চিন্তা যে তার চেয়ে বেশি এগিয়েছে তা বল্‌তে পারিনে। শ্লোকটি হ'ল artর বন্দনা ক'রে লেখা; কাব্যপ্রকাশের প্রথম সূত্রপাত হ'ল এই শ্লোক দিয়ে

> নিয়তিকৃত নিয়মরহিতাম্
> হ্লাদৈকময়ীম্ অনন্যপরতন্ত্রাম্
> নবরসরুচিরাং নির্মিতি আদধতি
> ভারতী কবের্জয়তি।

এই শ্লোকটি পুরোপুরি ব্যাখ্যা করতে হ'লে art সম্বন্ধে একটা বই লিখতে হয়; কাজেই এর একটু চুম্বক ইংরিজীতে শোনাই—

Art is ungoverned by nature's law, it is another creation having its own laws. It is pleasurable in its entirety spirit of joyousness নিয়তিকৃতনিয়মরহিতা হ্লাদৈকময়ী। Possessing great individuality and the independent expression of artistic sentiment. অনন্যপরতন্ত্রা; A tasteful creation of the manifold poetic sentiment (রস) or the embodiment of taste, beauty, রূপ and রুচিরতা। নবরসরুচিরাং নির্মিতি আদধতি।

এই শ্লোকের প্রথম অংশটা থেকে জাপান

শিল্পের একটা আইন সৃষ্টি হয়েছে যাকে বলা হয় Esoragoto বা artistic unreality নিয়তিকৃতনিয়মরহিতা। জাপানের শিল্পী এর ব্যাখ্যা দিচ্ছেন this is Espragoto, the privileged departure, the false made to seem true!

ইউরোপও এই কথাই বলছে চিত্রের বেলায়, nothing in a picture is real, art has been pursuing the chimera, attempting to reconcile two opposites, the most slavish fidelity to nature and the most absolute independence, so absolute that the work of art may claim to be a creation অনন্যপরতন্ত্রাম্ নিয়তিকৃত নিয়মরহিতা নির্মিতি।

আধুনিক ফ্রান্সে, এমন-কি জগতের সব-চেয়ে বড় ভাস্কর রোঁদা, তিনিও বলেন— ......its laws are more powerful than those of the compass, art is again taste. এ-সব কথা নতুন নয়, পুরোনোও হবে না কোনো দিন। যারা যে, সে তখনও যা বলে নমস্কার দিয়েছে artকে আজও যারা সেই ব'লে নমস্কার দিচ্ছে, পরেও দেবে artএর জয় ঐ একই শ্লোক ব'লে—

নিয়তিকৃত নিয়মরহিতাম্
হ্লাদৈকময়ীম্ অনন্যপরতন্ত্রাম্
নবরসরুচিরাং নির্মিতি আদধতি
ভারতী কবের্জয়তি।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

দস্যি

অস্থির চঞ্চল,
একটুতে চোখে জল,
মাধুরীর শতদল
বুক-জুড়ানো।
চুম্বন-উৎসুক
ঠোঁট লাল টুক্‌টুক্,
দুষ্টু ঘি-মাখা মুখ
হাসি-ছড়ানো।

কান্ত ও কমনীয়,
চিরদিন স্মরণীয়,
সে অনির্বচনীয়,
মায়াময়ী!

আগুনের ফিন্‌কুটি
ছিটকায় চোখদুটি,
ছোট্ট সে বাহুমুঠি
বিশ্ব-জয়ী!

দিব্য কী শীতলতা—
বেষ্টিত তনু-লতা,
লাবণ্য কোমলতা
ঝরে অঙ্গে!
অদ্ভুত প'ড়ে যায়
মজবুত ঝগড়ায়,
বিদ্যুৎ চমকায়
ভুরু-ভঙ্গে!

রেগে রাঙা গন্ গন্,
ঘর-দোর ঝন্ ঝন্,
চুড়ি বাজে খন্ খন্,
কাঁপায়ে ভিটে!
পলকেই রাগ ছোটে,
সে মানুষ নয় মোটে,
একগাল্ হাসি ফোটে
এক মিনিটে।

এই ভাব এই আড়ি,
চুমু নিয়ে কাড়াকাড়ি,
তাড়াতাড়ি বাড়াবাড়ি,
সব জিনিষে।
রাতদিন অবিরল
কৌতুক-লীলাছল,
অভিমানে রসাতল
প্রতি নিমিষে।

বেমালুম বুক ঠুকে
মিছে কথা কয় রুখে,
জবাবটি মুখে মুখে
গাঁথা তৈরী।
অবুঝ সে নিঠুর,
নেই বোধ কিছুর,
সুখের সে দস্তুর-
মত বৈরী।

এ রকম দস্যিকে
সামলাবো কোন্ দিকে?
লুটে নিলে মনটিকে
জোর্‌সে এসে!
তবু সেই মন্-চোরে
ভালবাসি অন্তরে,
জানিনে কি মন্তরে
ভোলালো যে সে!

নন্দন-বন থেকে
চুরি করে আনলে কে?
পারিজাত ফুল একে—
রাখবো কোথা?
এ হাওয়ায় বাঁচবে কি?
আলো-জলে নাচবে কি?
বুকে রেখে চেয়ে দেখি—
লেগেছে ব্যথা।

শ্রীকিরণধন চট্টোপাধ্যায়

বারোয়ারি উপন্যাস

২৩

বৈরাগ্য-জিনিষটা কল্পনায় যতখানি সুন্দর ব'লে মনে হয়, আসলে তার সৌন্দর্য্য যে ঠিক ততখানি ভোগ করা যায় না, কিছুকাল বৃন্দাবনে থেকে সতীশ তা বিলক্ষণ-রূপেই টের পেয়ে গেল।

সমুদ্রের ঝড়ের দোলায় নৌকা যেমন স্থির থাকতে পারে না, বিক্ষুব্ধ মনের ভিতরেও তেমনি শান্ত ভাবের ঠাঁই হওয়া অসম্ভব। সতীশও তাই বৃন্দাবনে এসে বেশী-দিন নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে পারলে না—সংসার আর অতীতের স্মৃতি তাকে যেন চারি-

দিক থেকে আমায় বাঁধনে বেঁধে টান দিতে লাগ্‌ল।

সতীশ মনে মনে ভাব্‌লে, শুকদেব বলেন জগৎ মায়াময়—মিথ্যা। আমার কিন্তু গুরু-বাক্যে বড়ই সন্দেহ হচ্ছে, কারণ যে সত্যকে সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে নিশিদিন সত্য ব'লে বুঝ্‌তে পার্‌চি, এত সহজে কি-ক'রে তাকে মিথ্যে ব'লে উড়িয়ে দেব!

শুকদেবের হুকুম মেনে সে যে পাগলের মতন হিমালয়ে ছুটে গিয়ে সত্যসত্যিই ক্ষেপে যায় নি, এই ভেবে সতীশ এখন মনে মনে অনেকটা আরাম বোধ কর্‌লে।

সতীশ ভাবতে লাগ্‌ল, এবারে সে কি কর্‌বে? সে কি আবার সংসারে ফিরে যাবে? কিন্তু আত্মানন্দ-বাবাজার বৈরাগ্যের লেক্‌চার, মুক্তির টীকা-টিপ্পনী, আর লোটা-কম্বল-ত্রিশূলের আস্ফালন স্মরণ হবা-মাত্রই সংসারের কথা তার মন থেকে একেবারে নিঃশেষে মুছে গেল।

তারপরে মনে হোলো, বেলতলার কথা। সেখানে তার মা আছেন বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে আছে তাঁর ফিরে-ফিরতি বিয়ে-করার প্রস্তাবটাও। সুতরাং সে ঠাঁইও যথেষ্ট নিরাপদ নয়।

আচ্ছা, কাশীগাঁয়ে গেলে কেমন হয়? কিন্তু তখনি তার মনে হোলো, কমলার অন্তর্ধানের কথা। ব্যাপারটা যে-ভাবে তার কানে উঠেছিল, সতীশ তা বিশ্বাস কর্‌ছিলও বটে—কর্‌ছিল না-ও বটে। তাই আসল কথাটা জান্‌বার জন্যে মন তার ব্যথা-ভরা আগ্রহে উস্‌খুস্ ক'রে উঠ্‌ছিল। কিন্তু কমলা-শূন্য কাশী-গাঁ এখন যে কেবল সকল দুঃস্বপ্নের মতন, তা নয়,—সেইসঙ্গে গ্রাম্য ঘোঁটে, চাপা হাসি-ব্যঙ্গ-টিট্‌কিরিতে তা যে বতখানি বিষিয়ে উঠেছে, সেটুকু একবার মাত্র কল্পনা ক'রেই সতীশের মনটা যার-পর-নাই দমে পড়্‌ল।

সতীশ ভাব্‌লে, এ কি মুস্কিলেই ঠেকা গেল! সন্ন্যাসী হ'তে বা ঘরে ফিরতে বা নিষ্কর্মার মত এখানে ব'সে থাকতে—আমি এ তিনটের কোনটাই পার্‌চি না। তবে আমি করব কি?

ভেবে-ভেবে সতীশ আর ভাব্‌তে পার্‌লে না—মাথাটা তার ঘুলিয়ে এল। শেষটা সে আপন মনে ব'লে উঠ্‌ল—"দূর হোক্‌-গে ছাই,—চুলোয় যাক্ এ-সব ভাবনা-চিন্তা। পরের কথা পরে ভাবা যাবে-অখন, আপাততঃ যখন স্থির করেচি যে সন্ন্যাস নিয়ে আর পাগ্‌লামি করা হবে না, তখন যে ক'টা দিন ছুটি আছে, পশ্চিমের দেশগুলো ঘুরে-ঘুরে দেখে-নি।"

সতীশ ঠিক কর্‌লে, কাল সকালের গাড়ীতেই সে আগ্রায় তাজমহল দেখ্‌তে যাবে।

.. ..

কবি সাজাহানের অমর মর্ম্মর-কাব্য নানান লোকে নানান ভাবে দেখেছে। কিন্তু তাজ-মহল দেখে সতীশের মনে হোলো, এ যেন তারই প্রিয়তমার মূর্ত্তি।

প্রিয়তমা! কে সে?… …কমলা?—না, সে এ-কমলা নয়—যে-কমলা তার স্নেহ-প্রেম, যত্ন আদর ভুলে, লোক-সমাজে তাকে হাস্যাস্পদ ক'রে, তার বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎকে অন্ধকারে ডুবিয়ে এ-জন্মের মত তাকে ছেড়ে

চ'লে গেছে, তার কথা সে আর ভাব্‌তে পারে না—ভাব্‌তে চায়ও না। কিন্তু স্বদেশে-বিদেশে যে প্রেমময়ী নারী-মূর্ত্তিকে নিয়ে সতীশের বহু বিনিদ্র-রজনী গরীব স্বপ্নের মতন অজানতে কেটে গেছে, যার চোখের মাধুরী, ঠোঁটের হাসি, তনুর লীলা, হাতের স্পর্শ - সবার উপরে যার বুক-ভরা অগাধ ভালোবাসার স্মৃতি ফুলের মতন তার জীবন-বৃন্তকে পুষ্পিত ক'রে রেখেছে—সতীশ এত সহজে এখনো তাকে ভুল্‌তে পারে নি—এই পরিপূর্ণ হৃদয় নিয়ে তাই তো তার বৈরাগ্যের শূন্যতার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়বার চেষ্টাটা একেবারে মিথ্যা হয়ে গিয়েছিল। সতীশের মনে হোতো, যেন কাল্‌কের কমলা আর আজকের কমলা—এ দুজনে এক লোক নয়। যদিও এ-রকম মনে-হওয়াটাও ছেলেমানুষী এবং এর কোন-একটা সঙ্গত কারণও নেই, তবু এমনি-একটা ভাবই তার মনের আশ-পাশ দিয়ে যখন-তখন উঁকিঝুঁকি মারত। যুক্তি-তর্ক এখানে খাটত না—তার মন জোর ক'রে ব'লে উঠত—সে-কমলা এ-কমলা এক লোক নয়, দুজনে স্বর্গ-নরক তফাৎ। সে ছিল আমার,—একান্তই আমার, আর এ হচ্ছে... ... ...

—এইখানে ভাব্‌নার সূত্র ছিঁড়ে যেত। আজ্‌কের এই কমলাকে তার মন নিজের ব'লে দাবি করতেও পারত না, পরের ব'লে মানতেও রাজি হোতো না—এইখানে মস্ত-বড় একটা অন্ধকার—অজানা অন্ধকার ছিল, সে অন্ধকার যেন লুকানো অশ্রুজলে জমাট!

একদিন, দুদিন, তিনদিন—আরো ক'টা দিন একে একে কেটে গেল, সতীশ কিন্তু তাজমহলকে ছেড়ে চ'লে যেতে পারলে না। কি এক অজানা মোহের টানে রোজ সে তাজমহলের দিকে ছুটে আসত, মর্ম্মরের শুভ্র-স্বপ্নের সেই স্নিগ্ধ শীতল স্পর্শের মধ্যে আপনার ব্যথিত দেহকে এলিয়ে দিয়ে চুপ ক'রে সে প'ড়ে থাকত, আর তার সামনে দিয়ে যমুনার কালো জল কত বেদনায় উচ্ছ্বসিত হয়ে কুল কুল ক'রে বয়ে যেত,—কূলে কূলে মাথা কুটে, সাধ-শিল্পীর নয়ন-নীরকণের আকুল হয়ে।

শাজাহানের প্রেমের স্মৃতি তাজমহল আজ তারও বুকের ভাঙা ঘরে প্রেমের দীপশিখাটি আবার যেন উস্কে দিলে,—এ মর্ম্মর যেন জীবন্ত, এ পাষাণের মৌন ভাষা যেন কাণ পেতে শোনা যায়, এর এই নিষ্কলঙ্ক শুভ্রতা যেন বুকের আঁধারকে আলো ক'রে দেয়!

সতীশ স্থির কর্‌লে, কি হবে ছন্নছাড়ার মতন দেশে দেশে ঘুরে ম'রে,—ছুটির ক'টা দিন এইখানে বসে বসেই কাটিয়ে দেওয়া যাক্‌, দেখি, এতে তবু মনটা কিছু শান্ত হয় কিনা!

... ...

পূর্ণিমার চাঁদের আল্‌পনা সেদিন তাজের মর্ম্মর-শিলায় এসে ঘুমিয়ে পড়েছিল। চাতালের উপরে গায়ের জামাটা খুলে বালিসে পরিণত ক'রে, সতীশও শুয়ে শুয়ে দেখ্‌ছিল—জোছ্‌না আর তাজ যেন আজ মিলে-মিশে ধীরে ধীরে একাকার হয়ে যাচ্ছে—একটু পরেই যেন কে জোছ্‌না, কে তাজ তা আর মোটেই চেনা যাবে না।

হঠাৎ কাছেই কার বাঁশী বেজে উঠ্‌ল—নিশীথিনীর নীরবতায় সুরের লহরী তুলে! এক তানেই বোঝা গেল, এ যার-তার বাঁশী নয়, ওস্তাদের বাঁশী!

বাঁশী বাজ্তে লাগ্ল—কিন্তু কি উদাস ওর সুর! এ যেন মুখের ফুঁয়ে বাজ্চে না—বুকের দীর্ঘশ্বাসে বাজ্চে। বাঁশী যেন কবে কাকে হারিয়েচে, আকাশে-বাতাসে যমুনার জলোচ্ছ্বাসে, চাঁদের আলোয়, তাজের ছায়ায় সে যেন কাকে দিশেহারা হয়ে ডেকে-ডেকে কেঁদে ফির্চে—সে কান্না শুনে সাজাহানের আত্মাও যেন কত-যুগের নিশ্চিন্ত সমাধি-শয়ন থেকে জেগে, এখনি উঠে বসে ব্যস্ত হ'য়ে চেয়ে দেখ্বে, এতকালের পর পাশ থেকে রূপের পুতলি মমতাজ আবার তাকে ফাঁকি দিয়ে হারিয়ে গেছে কিনা।

বাঁশীর কান্না থেমে গেল। তার করুণ সুরে সতীশের চোখের পাতাও ভিজে এসেছিল। একটা নিশ্বাস ফেলে আস্তে আস্তে সে উঠে বস্ল—তার আড়ালের কোনো বাঁশীর এই ওস্তাদটিকে একবার দেখবার জন্যে।

দেখ্লে, কাছেই, যমুনার দিকে মুখ ফিরিয়ে একটি লোক চুপ ক'রে বসে আছে। পোষাক দেখে বোঝা গেল, বাঙালী।

সতীশ স'রে তার কাছে গিয়ে বসে বল্লে, "দয়া ক'রে আর একবার বাজাবেন কি?"

লোকটি সতীশের দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকে দেখ্লে। তারপর একটু হেসে, কোন কথা না ক'য়ে বাঁশীতে আবার ফুঁ দিলে।

সেবারেও বাঁশীতে নিরাশার আর্ত এক রাগিণী বেজে উঠল। এ বাঁশী যেন কান্না বৈ আর কিছু জানে না।

কেঁদে কেঁদে বাঁশী আবার থাম্ল। সতীশ আর সেই লোকটি, দুজনেই আনমনে নীরবে অনেকক্ষণ পাশাপাশি বসে রইল।

তারপর সতীশ ধীরে ধীরে বল্লে, "আপনার বাঁশীর ভেতরে আরো কত কান্না পোরা আছে?"

লোকটি তেম্নি মৃদু মৃদু হেসে বল্লে, "আপনার মন যদি চায় তবে আমার বাঁশী হাসতেও পারে। শুনবেন?" সে ফের বাঁশীটিকে মুখের কাছে তুল্লে।

সতীশ বাধা দিয়ে বল্লে, "না, তাজের কোলে হাসি তো জম্বে না। এ তাজ যে বিরহীর চোখের অশ্রু দিয়ে গড়া।"

লোকটি বল্লে, "তাইতো আমারও বাঁশীর মুখে হাসি আসে নি। এই দুঃখের দুনিয়ার সঙ্গে কান্নার সুর ছাড়া আর-কিছু তো খাপও খায় না।"

তার কথাবার্তা শুনে, লোকটিকে সতীশের বড় ভালো লাগল। সে বল্লে, "যদি কিছু মনে না করেন, তবে আপনার পরিচয়টি জান্তে পারি কি?"

—"ক্ষিতীশচন্দ্র চৌধুরী। বপিলডাঙ্গায় থাকি। মশায়ের পরিচয়?"

—"সতীশচন্দ্র বাগচী। নিবাস চব্বিশ পরগণা, বেলতলীতে।"

ক্ষিতীশের হাত থেকে বাঁশীটি খসে, সশব্দে পড়ে গেল। অত্যন্ত বিস্ময়ে সে সতীশের মুখের দিকে অবাক্ হয়ে তাকিয়ে রইল।

—"আ-হা-হা, দেখুন, বাঁশীটা ভেঙে গেল না তো?" এই ব'লে সতীশ বাঁশীটা তুলে নিয়ে ক্ষিতীশের অসাড় হাতে ফের গুঁজে দিলে।

ক্ষিতীশ তৎক্ষণে আপনাকে সাম্লে নিয়ে বল্লে, "বেলতলীতে সতীশচন্দ্র বাগচী ব'লে আর কেউ থাকেন নাকি?"

—"না। তবে আমি যেখানে চাকরী করি, সেই লক্ষ্ণৌয়ে আমার নামে আর একজন আছেন।"

ক্ষিতীশের মনে আর কোন সন্দেহ রইল না। তবু একেবারে নিশ্চিন্ত হবার জন্যে সে বল্লে, "কাঞ্চীগাঁয়ে কি আপনার শ্বশুরবাড়ী?"

ভুরু কুঁচ্‌কে সন্দিগ্ধ স্বরে সতীশ বল্লে, "হ্যাঁ। কিন্তু এ-কথা আপনি জান্‌লেন কি ক'রে?"

ক্ষিতীশ অত্যন্ত খুসি হ'য়ে বলে উঠ্‌ল, "সতীশবাবু, আপনার কথার জবাব পরে দেব। আপাতত ভগবানের দয়ায় এমন আশ্চর্য্য ভাবে যখন আপনার দেখা পেয়েছি, তখন আর আপনাকে ছেড়ে দিচ্ছি না। খুব কাছেই আমার বাসা। আপনাকে এখনি সেখানে যেতে হবে।"

ক্ষিতীশের দিকে হতভম্বের মতন খানিক-ক্ষণ চেয়ে থেকে সতীশ বল্‌লে, "আমাকে যেতে হবে আপনার বাসায়? কেন মশাই?"

—"আপনার 'কেন'র জবাব আমার বাসায় গেলেই পাবেন।"

—"আপনি কে?"

—"মণিকাঞ্চন বণিক।"

—"আপনার কথার অর্থ?"

—"ক্রমশ-প্রকাশ্য। এখন উঠুন—উঠুন, আর দেরি করবেন না।"

—এই ব'লে ক্ষিতীশ অবাক সতীশকে দু'হাত ধ'রে একরকম জোর ক'রেই টেনে-হিঁচ্‌ড়ে তুলে নিয়ে গেল। তার অন্ত সাধের সাধী বাঁশীটা যে তাদের আলো-মাখা সাদা চাতালে কালো একটা রেখার টানের মতন পড়ে রইল, আনন্দের আবেগে সেদিকে তার একটুও খেয়াল রইল না।

২৪

গেল-দুদিন, হরনাথ মৈত্রকে ভিন্-গাঁয়ের এক যজমানের বাড়ীতে, কি-একটা শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানে লিপ্ত থাকতে হয়েছিল। যজমান-বাড়ীর কাজ-কর্ম্ম সেরে, আজ দুপুরে তিনি আবার নিজের গ্রামে ফিরে এলেন। তাঁর পিছনে পিছনে আসছিল দুটো লোক। তাদের মাথায় বড় বড় দুটো বস্তা এবং একটা বস্তার ফাঁক দিয়ে একটি নতুন চক্‌চকে পিতলের ঘড়া উঁকি মারচে। দেখলেই বুঝে নিতে দেরি হয় না যে, যজমানের বাড়ী থেকে এবারে ঠাকুরের যা লাভ হয়েছে, তা যৎসামান্য নয়।

রোদ্দুরের ঝাঁজ থেকে রেহাই পাবার জন্যে হরনাথ মাথার উপরে ভিজে গামছাখানি পাট ক'রে রেখে, একটি সাদা কাপড়ে মোড়া ছাতার ছায়ায় ছায়ায় তাড়াতাড়ি বাড়ীর দিকে ফিরছিলেন। তাঁর বাঁ-হাতে যজমানের দেওয়া খানকয়েক নতুন কাপড়।

এই ক'দিনেই হরনাথের চেহারা কেমন মুষড়ে পড়েচে,—দেহটিও রোগা, কোলকুঁজো হয়ে গেছে। তাঁর চোখদুটি বসা-বসা, তার তলায় গভীর কালির রেখা। তাঁর মুখ দেখলেই বোঝা যায়, বুকের ভিতরে তিনি অহরহ কি অসহ চিন্তার তাপ সহ্য করচেন!

যজমানী করতে তাঁর মনে আর একটুও ইচ্ছা নেই—কাজকর্ম্ম এখন যা করেন তা কতকটা শিষ্যদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে দায়ে ঠেকেও বটে, আর কতকটা আপনার ব্যথিত প্রাণকে অন্যমনস্ক রাখ্‌বার জন্যেও বটে।

চারিদিকে কাঠফাটা রোদ খাঁ-খাঁ করচে—পায়ের তলায় পথের ধুলোগুলো পুড়ে পুড়ে যেন আগুনের কণা হয়ে উঠেচে। হরনাথ কোনদিকেই না-তাকিয়ে হন্ হন্ ক'রে এগিয়ে চল্‌ছিলেন—হঠাৎ ডানদিক থেকে শব্দ উঠল—'কিস্তি মাৎ।' হরনাথ বুঝ্‌লেন, শশী মুখুয্যের ঘরের দাওয়ায় তাস-দাবার দৈনিক আসরটা রীতিমত জমে উঠেচে। তিনি পাশ কাটিয়ে চলে যাবার জন্যে ছাতাটাকে ডানধারে হেলিয়ে আত্মগোপনের চেষ্টা কর্‌লেন। কমলার অন্তর্ধানের পরে এই শশী মুখুয্যেকে তিনি ভালো ক'রেই চিনে নিয়ে ছিলেন। তাই তার প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গভরা মুখে বিনয়প্রকাশের মস্ত-আড়ম্বর দেখ্‌লেই, হরনাথের বুকের ভিতরে কাটা ঘায়ে যেন নুনের ছিটে লাগ্‌ত।

কিন্তু 'কাণা শশী'র একটিমাত্র যে চোখ, তা সাপের মতন তীক্ষ্ণ। সে চিলের মতন চিঁচি-করা গলা তুলে সাড়া দিলে—"হরনাথ-দা', বলি ও হরনাথ-দা'! অধীনদের দিকে একটিবার নেক্-নজরে চেয়ে যান, এমন ক'রে পায়ে ঠেলে গেলে তো চল্‌বে না!"

হরনাথ বেগতিক বুঝে দাঁড়িয়ে পড়্‌লেন ছাতার আড়াল থেকে আত্মপ্রকাশ ক'রে অপ্রতিভ স্বরে বল্‌লেন, "না ভাই, রৌদ্দুরের ঝাঁঝে অনেকখানি পথ হেঁটে তেষ্টায় প্রাণটা টা-টা করচে—এখন কি আর কোনদিকে চাইবার যো আছে? তাড়াতাড়ি বাড়ী যেতে পার্‌লেই বাঁচি!"

কাণা শশী বকের মতন এক-পা এক-পা ক'রে এগিয়ে এসে ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে বল্‌লে, "সে কি দাদা, তেষ্টা পেয়েচে? আসুন—আসুন, আমার বাড়ীতে আসুন।"

হরনাথ বল্‌লেন, "আর ভায়া, বাড়ীর কাছেই এসে তো পড়েচি, একেবারে স্না-আহ্নিক ক'রে ঠাণ্ডা হয়ে জল-টল্ যা-হয় খাওয়া যাবে।' এই ব'লে তিনি আবার এগিয়ে পড়বার চেষ্টা কর্‌লেন।

শশী আকুপাকু ক'রে বল্‌লে, "দাদা, যাবে না! জল না খান, একটা সুখবর অন্তত শুনে-যান।',

হরনাথ নিরাশ ভাবে করুণ স্বরে বল্‌লেন "সুখবরের কথা আর তুলো না ভায়া এ-জীবনে সু আর কু, ও দুইই এখন আমার কাছে এক কথা।"

শশী 'ঠা'য়ের অন্ধকারে অনেকগুলো হলদে দাঁতের ঝিলিক মেরে একগাল হেসে বল্‌লে, "হরনাথ-দা', অতটা হাল ছেড়ে দিয়ে বস্‌বেন না! সত্যিই যদি সুখবর দি, আমাকে কি খাওয়াবেন বলুন দেখি?"

শশীর রকম-সকম দেখে হরনাথের মনে সাঁ-ক'রে একটা সন্দেহের বিদ্যুৎ চম্‌কে গেল· শশী তো অকারণে কিছু করবার পাত্র নয়—অকস্মাৎ তার এতটা আত্মীয়তার কারণ কি? উদ্বিগ্নভাবে তিনি বল্‌লেন, "শশী, তুমি কি বলচ? তোমরা কি কমলার কোন খবর পেয়েচ? এতদিন যা কামনা কর্‌ছিলুম, তাই কি হয়েচে? সত্যিই কি কমলী মরেচে? বল, বল—এর চেয়ে সুখবর এখন আমার কাছে আর কিছুই নেই!"

শশী নকল দরদে মুখখানা যথাসম্ভব কাঁচু-মাচু ক'রে বল্‌লে, "ওকি কথা হরনাথ-দা'?

বাপ হয়ে মেয়ের মৃত্যু-কামনা করবেন না, ছি !"

হরনাথের সন্দেহ বেড়ে উঠ্‌ল। তিনি উৎকণ্ঠায় উদ্‌গ্রীব হয়ে বললেন, "শশী, তুমি যা বলতে চাও, শীগ্‌গির বলে ফেল !"

শশী তার হাসিকে আরেকটু মিষ্টি ক'রে বললে, "অরুণ যে কমলীকে নিয়ে কলকাতা থেকে ফিরে এসেচে !"

হরনাথের বুকের ভিতরে হৃৎপিণ্ডটা যেন দমাস্ ক'রে ফেটে যাবার মতন হ'ল, দু-হাতে বুকখানা জোরে চেপে ধ'রে বজ্রাহতের মতন স্তম্ভিত হয়ে তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন—তাঁর চোখের সামনে মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের সমুজ্জ্বল শিখাও যেন এক-মুহূর্ত্তে অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে গেল।

আধ-মরা ইঁদুরের ভাবভঙ্গি বিড়াল যেমন নিষ্ঠুর চোখে তাকিয়ে দেখে, হরনাথের দিকে শশী ঠিক তেমনি ভাবেই বারবার চেয়ে চেয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌ল।

বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কাটা কেটে গেল পর, বিষম রাগে আর অপমানে হরনাথের সমস্ত মুখখানা রাঙা টকটকে হয়ে, রগের উপরকার শিরগুলো ঠেলে ঠেলে ফুলে উঠ্‌ল। ঠক্‌ঠক্ ক'রে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে আগুন-ভরা চোখে শশীর দিকে তাকিয়ে তিনি প্রাণপণে চেঁচিয়ে বললেন, "ওরে মহাপাপী, এই কি তোর সুখবর ? তোর মাথায় বজ্রাঘাত হোক, বজ্রাঘাত হোক্ !" বলতে বলতে একরকম ছুটেই তিনি সেখান থেকে চলে গেলেন। খানিকদূর গিয়ে শুনলেন, শশীর আড্ডা থেকে অনেকগুলো গলা একসঙ্গে হো-হা ক'রে হেসে উঠ্‌ল।

বাস্তবিক, এতক্ষণ শশীর দলের লোকগুলি চরম আগ্রহের সঙ্গে যেন অত্যন্ত উত্তেজক একখানা নাটকের বিচিত্র অভিনয় দর্শন করছিল। হরনাথ চলে গেলে পর খুব একচোট হেসে নিয়ে বোসজা বললেন, "টাকার গরমে মৈত্রের পা যেন এতদিন মাটির ওপরে পড়্‌ত না। কিন্তু মাথার ওপরে যে দর্পহারী মধুসূদন হাসচেন, সে খোঁজ তো শম্মা রাখ্‌তেন না ! আচ্ছা শশী, মৈত্র এখন কি করবে বল দেখি ? কমলী ছুঁড়ীকে বাড়ীতে রাখ্‌বে, না খেঁটিয়ে বিদেয় ক'রে দেবে ?"

হরনাথের সেই অগ্নিশর্ম্মা মূর্ত্তি দেখে আর অভিশাপ শুনে, শশীর পাপী মনটা দস্তুর-মতন চম্‌কে ভ্যাবাচাকা খেয়ে গিয়েছিল। কোনরকমে এখন সে ভাবটা সাম্‌লে নিয়ে সে বললে, "বোধ হয় তাড়িয়েই দেবে। কিন্তু বলাও যায় না, মৈত্র যেমন চট্ ক'রে রেগে ওঠে, তেমনি শীগ্‌গির তার রাগ জল হয়েও যায়। আর হাজার হোক্ বাপের মন, মেয়ের মুখ দেখে ভুলে যেতেও কতক্ষণ ? —যা হোক আপাতত তোমরা এখানে বোসো তো, এর-মধ্যে আমি জমিদার-বাবুকে খবরটা দিয়ে আসি !"

একজন জিজ্ঞাসা করলে, "গিয়ে কি বলবে ?"

—"বলব যে হরনাথ মৈত্র ফিরে এসেচে। কমলীর আসার খবর জমিদার-বাবুর কাছে আগেই উঠেচে। কেবল মৈত্র এখানে ছিল না ব'লেই এ দুদিন তিনি রাগ সাম্‌লে চুপ ক'রে আছেন !"

সকলকার মুখেই ভারি-একটা আরাম ও

সন্তোষের লক্ষণ ফুটে উঠ্‌ল। গাঁয়ে দিন-কে-দিন হরনাথের সংসারের শ্রীবৃদ্ধি দেখে যে-লোকগুলি মনের ভিতরে বরাবর নিস্ফল হিংসা আর আক্রোশ পুষে আস্‌ছিলেন, আজ তাঁদের অন্তর্দাহ নিবারণের মাহেন্দ্রক্ষণ এসে উপস্থিত!

২৫

হরনাথ যখন প্রচণ্ড একটা উল্কার শিখার মতন বাড়ীর ভিতরে এসে হুড়মুড় ক'রে ঢুক্‌লেন, মৈত্র-গিন্নি তখন অরুণ আর কমলার সামনে ভাতের থালাখানি পাঁচরকম অন্নব্যঞ্জনে সাজিয়ে এনে ধর্‌ছিলেন।

হরনাথকে প্রথমেই দেখ্‌তে পেলে—কমলা! সে তখনি পিঁড়ি থেকে উঠে পড়ে, "বাবা গো" ব'লে কেঁদে ছুটে এসে, দু-হাতে হরনাথের পা-দুখানা একসঙ্গে প্রাণপণে জড়িয়ে ধর্‌লে।

মৈত্রগিন্নীও দুঃখের আনন্দে কেঁদে ফেলে বল্‌লেন, "ওগো তোমার কম্‌লীকে ঠাকুর আবার ফিরিয়ে দিয়েচেন গো!"

হরনাথ একবার কমলা, আর একবার গৃহিণীর দিকে চেয়ে দেখ্‌লেন। তাঁর সে দৃষ্টি পাগলের মতন উদভ্রান্ত। তারপর অরুণের দিকে চেয়ে তিনি গর্জ্জন ক'রে ডাক্‌লেন—"অরুণ!"

তাঁর সেই কড়া ডাকে ভয় পেয়ে অরুণ খুব আস্তে সাড়া দিলে, "বাবা!"

মৈত্রগিন্নী স্বামীর ভাব দেখে মনে মনে প্রমাদ গুণে দেব-দেবীকে স্মরণ করতে লাগলেন। হরনাথ মৈত্রের রাগ এ গ্রামে ঘরে ঘরে বিখ্যাত। রাগের মাথায় তিনি অনেক সময়ে এমন-সব কাজ ক'রে ফেলেচেন, যে-জন্যে পরে তাঁকে অনুতাপ করতে হয়েচে।

হরনাথ কর্কশ স্বরে বল্‌লেন, "অরুণ, কম্‌লীকে তুই কোথায় পেলি?"

অরুণ মৃদুস্বরে বল্‌লে, "ক্ষিতীশবাবুর বাসায়।"

হরনাথ চোখ পাকিয়ে বল্‌লেন, "ক্ষিতীশ! কে ক্ষিতীশ?"

বাপের সঙ্গে কথা কইতে অরুণের ভরসায় আর কুলোলো না। অত্যন্ত দীনভাবে করুণ চোখে সে মায়ের দিকে তাকালো।

মৈত্র-গিন্নী স্বামীর দিকে এগিয়ে এসে বল্‌লেন, "ওগো, সে অনেক কথা। কম্‌লী আর অরুণের মুখে সমস্তই আমি শুনেচি। শোনো—"

হরনাথ ধম্‌কে বল্‌লেন, "গিন্নী, তুমি থামো! ওদের যে-কথা তুমি বিশ্বাস করেচ, গাঁয়ের আর-পাঁচজনেও তোমার মতন অত সহজে তা বিশ্বাস করবে না!"

—"বিশ্বাস করবে না! কেন?"

—"কেন, তাও আবার খুলে বল্‌তে হবে? কারণ, তোমার মেয়েকে তারা কুলটা বলে!"

এতক্ষণ কমলা ভূলুণ্ঠিত দেবী-প্রতিমার মতন হরনাথের পায়ের তলায় পড়ে চোখের জলে ধরিত্রীর ধূলাকে সিক্ত ক'রে তুলছিল। এখন সে আহত বিষধরের মতন আচম্বিতে উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌লে, "বাবা, বাবা! তুমিও কি আমাকে তাই ব'লে বিশ্বাস কর?"

হরনাথ গম্ভীর স্বরে কেবলমাত্র বল্‌লেন, "হুঁ!"

কমলার দুইচোখে যেন বিদ্যুতের ঝল্‌কো

ঝল্‌কে উঠ্‌ল। সগর্ব্বে মাথা তুলে তীব্র স্বরে সে বল্‌লে, "তুমিও? তুমি,—আমার বাবা,—তুমিও বিশ্বাস কর?"

হরনাথ কমলার সেই অভাবিত, তেজস্বিনী মূর্ত্তি দেখে বিস্মিত হলেন বটে, কিন্তু সে বিস্ময় তাঁকে একটুও টলাতে পারলে না। সেদিনের সেই নিদারুণ কথা আজও তাঁর বুকের পরতে পরতে গাঁথা আছে—যেদিন কল্‌কাতায় হরেনের মেসে গিয়ে ক্ষুদিরামের মুখে তিনি জান্‌তে পেরেছিলেন যে, হরেনের সঙ্গে কমলা একলাটি বোম্বাই মেলে বিদেশে চ'লে গিয়েচে। তারপর,—এই ক্ষিতীশ। কোথাকার কে সে? তার বাসায় কমলা কেন ছিল? এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কি হ'তে পারে? তিনি চেঁচিয়ে ব'লে উঠ্‌লেন, "হ্যাঁ, আমিও বিশ্বাস করি, যা নিজে গিয়ে জেনে এসেচি, তা বিশ্বাস না-করাই আশ্চর্য্য। এতদিন পরে কেন তুই আবার এখানে ফিরে এলি, কেন তুই মর্‌তে পারলি না, কেন তুই—"

দুইহাতে দুইকাণ ঢেকে, চক্ষু মুদে, গভীর বেদনায় অবরুদ্ধ স্বরে কমলা ব'লে উঠ্‌ল—"আর শুনতে পারিনি গো—বাবা, থামো, থামো,—যথেষ্ট হয়েচে।... ...ভগবান, তোমার জগতে নারী এত অসহায়! উঃ।" কমলা ট'লে পড়ে যাচ্ছিল—মৈত্র-গিন্নী তাড়াতাড়ি তাকে ধ'রে ফেল্‌লেন।

হরনাথ কমলার সে অবস্থা দেখেও দেখ্‌লেন না। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে, অবিচল স্বরে তিনি বল্‌লেন, "আমার ঘরে কলঙ্কিনীর ঠাঁই নেই। এখানে আর এক-দণ্ড না! চ'লে যা—চ'লে যা—এখনি চ'লে যা—নইলে—"

মৈত্র-গিন্নী কান্নাভরা গলায় ব'লে উঠ্‌লেন, "ওগো, তুমি কি পাষাণ গো! অমন কথা মুখেও এনো না!"

হরনাথ তেমনি অটল ভাবেই তিক্ত স্বরে বল্‌লেন, "গিন্নী, যে দোষে যোগেন মিত্তির তাঁর ছেলের মায়াও ছেড়েচেন, সেই একই দোষে দোষী এই পাপিষ্ঠাকে কোন্ মুখে আমি ঘরে তুলে নেব?"

—"হ্যাঁ গা, যোগেন মিত্তির ছেড়েচেন ব'লে সমাজও তো হরেনকে ঠেলে রাখ্‌বে না। সে ব্যাটাছেলে আর কমলা যে মেয়ে। এ বিপদে তুমি না দেখ্‌লে তাকে যে আর কেউ দেখ্‌বে না!"

হরনাথ অত্যন্ত শুক্‌নো একটা হাসি হেসে বল্‌লেন, "একজন দেখ্‌বে—তার নাম যম। আমার রক্তের একবিন্দুও যদি কমলার দেহে থাকে, তবে ও যেন এখনি গিয়ে তারই আশ্রয় নেয়!" বল্‌তে বল্‌তে হরনাথের চোখ থেকে দু'ফোঁটা তপ্ত অশ্রু গড়িয়ে প'ড়ে, তাঁর ওষ্ঠপ্রান্তের সেই একান্ত অস্বাভাবিক হাসিকে ভিজিয়ে দিলে।

কমলা হঠাৎ মায়ের আলিঙ্গন থেকে আপনাকে জোর ক'রে ছাড়িয়ে নিলে। বাপের মুখের দিকে শান্ত চোখ তুলে স্থির ভাবে বল্‌লে, "বেশ বাবা, তাই হবে। তোমরা সকলে মিলে যা-থেকে আমাকে বিনা-দোষে বঞ্চিত করলে, দেখি যমের কাছে গিয়ে সত্যিই সে আশ্রয় পাই কিনা!" তার পর ফিরে পূর্ণ-দৃষ্টিতে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে, গাঢ় স্বরে ধীরে ধীরে বল্‌লে, "মা, তোমার জামাইয়ের খোঁজ যদি পাও, তবে তাঁকে আমার শেষ সেবা-নিবেদন জানিও

যে, কলঙ্কিনী নাম নিয়ে মরলেও আমার স্বামী ভক্তি কোনদিন সাবিত্রীর চেয়ে একটুও কম ছিল না!" বলতে বলতে তার গলার আওয়াজ ধরা-ধরা হয়ে উঠ্‌ল, চোখের পাতা আবার কান্নার জলে ভেরে এল— কিন্তু প্রাণপণে প্রাণের সমস্ত উচ্ছ্বাস দমন ক'রে, মায়ের সমস্ত বাধা এড়িয়ে সে দ্রুতপদে সদর-দরজার দিকে এগিয়ে গেল—তার পরেই, আবার কি-যেন দেখে চম্‌কে উঠে থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়্‌ল।

সঙ্গে সঙ্গে সকলকে আশ্চর্য্য ক'রে হরেন এসে বাড়ীর ভিতরে ঢুকে, কমলার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে বল্‌লে, "বোন, এমন যে হবে, আমি তা আগেই জানতুম। তাই তোমাকে বিদায় দিয়ে কলকাতায় আমি নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পারি নি। তোমার খোঁজে আমি বেলতলী গিয়েছিলুম, সেখান থেকে সব শুনে একেবারে এখানে ছুটে এসেচি!"

হরনাথ প্রথমে নিজের চোখকেই বিশ্বাস কর্‌তে পার্‌লেন না। হরেন যে ভরসা ক'রে তাঁর বাড়ীতে মাথা গলাতে পারে এটা তাঁর কল্পনাতীত ছিল। দুপুর রোদে কেতে-পুড়ে, পথ হেঁটে, ক্ষুধা-তৃষ্ণায় তাঁর ভগ্ন দেহ এমে তো অবশ হয়ে ছিল, তার উপরে এই-সব বিষম উত্তেজনা ও নানা ভাবাবেগের ঘাত-প্রতিঘাত। এখন এই শেষ-ধাক্কায় একেবারে ভেঙে প'ড়ে, হাঁপাতে হাঁপাতে তিনি বল্লেন, "না, আর পারি না! মধুসূদন, এ অগ্নি-পরীক্ষা থেকে আমাকে রেহাই দাও প্রভু!" এই ব'লে তিনি ক'রে মাটির উপরে ব'সে পড়ে, হাঁটুর মাঝখানে নিজের মুখ ঢেকে ফেল্‌লেন।

ঠিক সেইসময় বাড়ীর বাহির থেকে গম্ভীর গলায় কে ডাক্‌লে, "মৈত্র-মশাই বাড়ীতে আছেন কি?"

হরনাথ পাথরের নিশ্চল মূর্ত্তির মতন ব'সে রইলেন—সাড়া-শব্দ কিছুই দিলেন না।

হরেন কমলার দিকে চেয়ে বললে, "আমার বাবা ডাকচেন!" (ক্রমশঃ)

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

সোনার গৌরাঙ্গ

নদীয়ায় আজ বড় ঘটিল জঞ্জাল,
সোনার গৌরাঙ্গে বুঝি ছুঁয়েছে চণ্ডাল!
কেহ বলে, ঢালো শিরে সুরধুনী-নীর,
পঞ্চগব্যে নিমজ্জন কেহ করে স্থির।
চাহিয়া গৌরাঙ্গ-পানে জুড়ি দুটি কর
চণ্ডাল কহিল ধীরে,—গদ-গদ-স্বর—
হে ঠাকুর, কত লোহা করিলে-কাঞ্চন,
কাঞ্চন হইলা তব এ কি এ লাঞ্ছন?
চণ্ডালেরে কোল দিলে তুমি জগন্নাথ,
আজি তার আলিঙ্গনে হারাইবে জাত?
কৃপাতে তারিলে কত পাতকী-উদ্ধার,
পাতকী-পরশে আজি পতন তোমার!
গৌরাঙ্গে আলিঙ্গি যদি করেছি সরগ,
আমি ত কনক কই, করিনি পরশ!

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

চয়ন

ছায়ার কায়ালাভ

বিখ্যাত ইংরেজ লেখক কনান ডয়েল সাহেব আজ কয়েক বৎসর ধরিয়া ধারাবাহিক ভাবে প্রেত-তত্ত্বের আলোচনা করিতেছেন। তিনি এবং আরো জন-কতক বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক এই ব্যাপারটিকে সম্পূর্ণ একটি বিজ্ঞানে পরিণত করিবার জন্য চেষ্টিত আছেন। প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহারা অত্যন্ত সতর্কভাবে আলোচনা করিতেছেন, এবং বহুকাল ধরিয়া পরলোকের রহস্য লইয়া যে সব কুসংস্কার ও মিথ্যা প্রমাণ জড়ো হইয়া উঠিয়াছে, সে সমস্তকে তাঁহারা যথাযথ বর্জ্জন করিয়া চলিয়াছেন।



ছায়ার কায়ালাভ—ectoplasmএর সাহায্যে।

তাঁহাদের মতে, মৃত্যু অনন্ত নিদ্রা নয়—ইহলোকের পরে পরলোকের অস্তিত্ব আছে। প্রেতেরা মানুষের সামনে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে—ছায়ামূর্ত্তিতে নয়, কায়ারূপেও।

প্রেতদের ছায়া-দেহ কিরূপে কায়ায় পরিণত হয়, সে সম্বন্ধে এক নূতন রহস্য প্রকাশ পাইয়াছে। এ রহস্যের কথা এর-আগেও অস্পষ্টভাবে আরো কেউ কেউ বলিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বৈজ্ঞানিকরা সে-সমস্ত কাহিনীকে গাঁজাখুরি বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন।

এখন অতীতের ও বর্ত্তমানের বিচ্ছিন্ন প্রমাণগুলি একত্র করিয়া ডাক্তার শ্রেক-নটজিং, ডাঃ গিলে, প্রফেসর ক্রুক্স্, ডাক্তার ক্রফোর্ড ও কনান ডয়েল প্রভৃতি বিশ্বাসযোগ্য প্রসিদ্ধ পণ্ডিতরা স্পষ্টভাবেই দেখাইয়াছেন, ঐ কাহিনীগুলি বাস্তবিকই মিথ্যা নয়। কোথাও কোথাও অতিরঞ্জিত হইলেও সত্যের সঙ্গে তাহাদের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ।

প্রেততত্ত্বে যাঁহারা একেবারেই বিশ্বাস করেন না, এমন অনেক নামজাদা বৈজ্ঞানিক লোকের সামনে, মিডিয়ামের সাহায্যেও এই ব্যাপারটার সত্যতা (ছায়ার কায়ালাভ) নানাভাবে পরীক্ষিত হইয়াছে—অবিশ্বাসীরা চারিদিকে কড়া পাহারা বসাইয়াও তাহার ভিতরে জাল-জুয়াচুরির লেশমাত্রও দেখিতে পান নাই।

বিজ্ঞান-জগতে প্রফেসর ক্রুকসের ডাকনাম বড় অল্প নয়। ক্রুক্‌স্ প্রেততত্ত্ব-সম্বন্ধে যে সমস্ত বিচিত্র তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন, সে সব ঘটনার বাস্তবিকতা সম্বন্ধে অবিশ্বাসীদের যথেষ্ট সন্দেহ থাকিলেও ক্রুক্‌সের কথা যে মিথ্যা, এ কথা তাঁহারা মুখ ফুটিয়া বলিতেও পারিতেছেন না। বাস্তবিক ক্রুক্‌সের সুদীর্ঘ কর্মজীবনে চাহিলে অদ্যাবধি কেহ মিথ্যার কলঙ্ক আবিষ্কার করিতে পারে নাই। সকলেই স্বীকার করেন, তিনি আর যাহাই হউন, মিথ্যাবাদী নন।

মিসেস কুক নামে এক মিডিয়ামের সাহায্যে প্রফেসর ক্রুকস্, কেটি কিং নামে এক প্রেতের সাক্ষাৎলাভ করেন। কেটি কিং সুদূর অতীতে,—দ্বিতীয় চার্লসের রাজত্বকালে এই পৃথিবীতে বর্তমান ছিল।



ক্রুক্‌স্ ও কেটিকিংয়ের প্রেতাত্মা

কেটি কিং কেবল যে ক্রুকসাহেবের দৃষ্টি ধরিয়া আবির্ভূত হইয়াছিল, তাহা নয়; পরন্তু সে ক্রুকসের শিশু-সন্তানদের সঙ্গে খেলা করিয়াছিল, তাহাদিগকে সেকালের অনেক গল্প বলিয়াছিল—এমন-কি ক্রুকসের সঙ্গে ফটো তুলাইতেও আপত্তি প্রকাশ করে নাই। বিদায় লইবার সময়ে সে বলিয়া গিয়াছিল, "মৃত্যুর পরেও যে আত্মার অস্তিত্ব থাকে, পৃথিবীতে এই মহা সত্য প্রকাশ করিবার জন্যই, মানুষের সামনে আমি দেহ ধরিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছি।"

এখন, প্রেতদের ছায়া-দেহ কি-করিয়া কায়ায় পরিণত হয়? বিজ্ঞান তাহা নানা কালের নানা প্রমাণ পরীক্ষা করিয়া দেখাইয়া-

ছেন যে, মিডিয়াম যখন অভিভূত অবস্থায় থাকেন, তখন তাঁহার নাক, চোখ, কাণ, মুখ ও দেহের ত্বকের ভিতর হইতে একরকম অদ্ভুত চটচটে, স্থিতিস্থাপক পদার্থ বাহির হইয়া আসিতে থাকে। বস্তু দিয়া স্পর্শ করিলে বা আচম্কা তীব্র আলোক পড়িলে সেই বিচিত্র পদার্থটা চকিতে আবার মিডিয়ামের দেহের ভিতরে ঢুকিয়া যায়! যদি তাহা সজোরে টিপিয়া ধরা হয়, তবে মিডিয়াম অত্যন্ত যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিতে থাকে। এই পদার্থই ক্রমে ক্রমে একটা নির্দ্দিষ্ট আকার লাভ করিতে থাকে এবং এই ভাবেই প্রেতের ছায়া-দেহ বায়ায় পরিণত হয়।

এই পদার্থটি যে কি, বৈজ্ঞানিকরা পরীক্ষা করিয়াও তাহা ঠিকমত বুঝিতে পারেন নাই। ইহা মিডিয়ামের দেহ ও কাপড় ফুঁড়িয়া বাহির হয় বটে, কিন্তু আবার মিলাইয়া গেলে পর দেহে বা কাপড়ে ইহার কিছুমাত্র অস্তিত্ব থাকে না। ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে ectoplasm।

ডাঃ শ্রেঙ্ক নটজিং মিডিয়ামের দেহ হইতে নির্গত ঐ অদ্ভুত পদার্থের একটুকুরা কাটিয়া লইয়াছিলেন। তাহাকে তিনি পুড়াইয়া ছাই করিয়া ফেলিয়াছিলেন। পুড়াইবার সময়ে অনেকটা শিং পোড়া গন্ধের মতন একটা গন্ধ পাওয়া গিয়াছিল। রাসায়নিক পরীক্ষায় প্রতিপন্ন হয়, তাহার ভিতরে অন্যান্য উপাদানের সহিত chloride of soda (সাধারণ নুন) এবং phosphate of calicum এর অস্তিত্ব বিদ্যমান আছে।



প্রেতাত্মার মুখে সংলগ্ন ectoplasm

জার্ম্মাণী, ফ্রান্স ও ইংলণ্ড প্রভৃতি স্থানে শত শত লোকের চোখের এবং ক্যামেরার সুমুখে বারংবার এই আশ্চর্য্য ব্যাপারের অনুষ্ঠান হইয়াছে। জড়বাদী বৈজ্ঞানিকরা স্বচক্ষে এই অদ্ভুত পদার্থ দেখিয়া এবং ছুঁইয়াও ইহাকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না। কারণ পৃথিবীতে শবব্যবচ্ছেদ করিয়াও যখন মানুষের দেহে এমন-কোন উপাদান পাওয়া যায় না,—তখন ইহাকে সত্য বলিয়া কিরূপে তাঁহারা মানিয়া লইবেন? আসল কথা, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের মাঝখানে তাঁহারা মহা ফাঁপরে পড়িয়া গিয়াছেন।

এদিকে যতরকম প্রমাণ দেওয়া সম্ভব, প্রেততত্ত্ববিদরা তাহা দিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু অবিশ্বাসীরা তবু ইহাকে জোর করিয়া মানিতে চাহিতেছেন না দেখিয়া তাঁহারা স্পষ্ট বলিতেছেন,—"তোমাদের বিজ্ঞানই অসম্পূর্ণ—অথবা যাহা চাক্ষুষ সত্য, তাহাকে সে মিথ্যা বলিতেছে, তাহাকে সে অস্বীকার করিতেছে। তোমাদের জড়-বিজ্ঞানই মিথ্যা, কারণ সত্যকে সে প্রমাণিত করিতে পারিতেছে না, অথচ আপনার অক্ষমতা স্বীকার করিতেও রাজি নয়!"

দিনে-দিনে প্রেততত্ত্ব নানাদিকে যেরূপ সম্পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে আশা হয় যে, অদূর-ভবিষ্যতে ইহলোক ও পরলোকের মধ্যে এক অপূর্ব্ব সেতুবন্ধনও সম্ভব হইতে পারে। মরণের মহা-ভয় মানুষের মনকে আর কাতর করিতে পারিবে না—জানি না, পৃথিবীতে সে শুভদিন আসিতে আর কতদিন দেরি আছে।

নূতন 'গন্ধীরবেদন'

সংপ্রতি বিলাতে একটি যুবকের উপরে সাংঘাতিক অস্ত্রচিকিৎসার আবশ্যক হইয়াছিল। তাহার পেটের ভিতরে টিউবারকিউলসিস হওয়াতে, ডাক্তার তাহার পেটের খানিকটা অংশ একেবারে বাদ দিতে চাহিয়াছিলেন। এই অস্ত্র-চিকিৎসায় সময় লাগিয়াছিল একঘণ্টা দশমিনিট। কিন্তু অস্ত্রাঘাতের সময়ে রোগীকে অজ্ঞান করা হয় নাই,—তাহার জ্ঞান বরাবর সমান টনটনে ছিল,—ছিল না কেবল তাহার ব্যথাবোধের শক্তিটা। তাহার নাড়ীও খারাপ হইয়া পড়ে নাই; অস্ত্রাঘাতের সময়ে সে "নার্স"দের সঙ্গে দিব্য খুসিমনে ঠাট্টা-তামাসা করিয়াছিল,—এমনকি কিছু-কিছু আহার করিতেও তাহার কোন বাধা হয় নাই!

এহেন অসম্ভব সম্ভব হইল কিসে? পাশ্চাত্যদেশের চিকিৎসকরা সংপ্রতি এক নূতন "গন্ধীরবেদন" বা anæsthetic আবিষ্কার করিয়াছেন। এই যুবকটির দেহে সেই জিনিষটি—অর্থাৎ "ইথর" প্রদান করা হইয়াছিল। কিন্তু এই "ইথর" সাধারণ "ইথর" নয়। ইহার দ্বারা কিছুক্ষণের জন্য মানুষের অনুভব-শক্তি চলিয়া যায়, অথচ সে অজ্ঞান হইয়া পড়ে না। মানুষের মস্তিষ্কের একঅংশেই যাহা কাজ করে, অন্য অংশের স্বভাব কিন্তু সমানরূপেই বজায় থাকে।

কানাডার ডাক্তার জেমস্ হটন এই নূতন "ইথর" আবিষ্কার করিয়াছেন। এতদিন ডাক্তাররা ছোটখাট অস্ত্র-চিকিৎসায় সময়ে রোগীর যন্ত্রণা দূর করিতে পারিতেন না। নিশ্চয় ভবিষ্যতে ছোট-বড় সমস্ত অস্ত্র-চিকিৎসাই এই নূতন "ইথরে"র সাহায্যে যন্ত্রণাশূন্য হইবে,—অস্ত্রের নামে রোগীকে আর ভয়ে আঁৎকাইয়া উঠিতে হইবে না।

দাঁতের ব্যামো

ডাক্তার আলবার্ট ওয়েষ্টলেক, দন্ত-চিকিৎসার সম্বন্ধে কতকগুলি নূতন কথা বলিয়াছেন। তিনি বলেন, যে-সকল যুবকের বয়স উনিশ হইতে পঁচিশ বৎসরের মধ্যে এবং যে-সকল যুবতীর বয়স ষোল হইতে একুশ বৎসরের মধ্যে, তাহাদের দাঁতের মাড়ির প্রান্ত-রেখা যদি লালরঙে রঞ্জিত হইয়া ওঠে, তবে তাহারা দেহের স্বাস্থ্যের দিকে চোখ না রাখিলে পনেরো বৎসরের ভিতরে নিশ্চয়ই pyorrhœa রোগের দ্বারা আক্রান্ত হইবে। যাহাদের অন্ত্রের মধ্যে কোন গোলমাল নাই, তাহারা কখনো এই রোগে ভোগে না।

ডাক্তার ওয়েষ্টলেকের মতে, মুখ-ধোওয়ার পক্ষে পাতিলেবু বা কমলালেবুর রস সব-চেয়ে উপকারী। লেবুর রস ব্যবহারের পর এক গেলাস জলের দ্বারা মুখ ধুইলেই মুখের ভিতরটা চমৎকার পরিষ্কার হইয়া যায়। পাঁচভাগ জলে দুইভাগ লেবুর রসই যথেষ্ট।

দাঁতের ডাক্তাররা পচা দাঁত ও মাড়ির অসুখ আবার ভালো করিতে পারেন বটে, কিন্তু এই আরামের সুখ বেশীদিন টেঁকে না। কারণ যাহারা দেহের স্বাস্থ্যের দিকে মন দেয় না, দাঁতের অসুখ আবার তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া থাকে।

সকালের ও রাতের আহারের পর দন্ত-রোগীদের উচিত, গোটাকয়েক কমলা ও একটি পাতি লেবুর রস পান করা। কিছু কিছু লেবুর খোসা, শাঁসের সঙ্গে থেঁতো করিয়াও খাওয়া দরকার। কারণ উহার ভিতর vitamine নামে পরম-উপকারী উপাদান বর্ত্তমান থাকে।

অভিজ্ঞ দন্ত-চিকিৎসক মাত্রই জানেন, মানুষের গ্রন্থি-সম্বন্ধীয় বিকৃতির জন্যই দাঁতের নানারকম অসুখ হয়। সব সময়েই যে সুপরিষ্কৃত দন্ত নীরোগ হয়, এ ধারণা ভারি ভুল। এমন অনেক মানুষকে দেখা যায়, যাহারা জীবনে কখনো দাঁত মাজে নাই, তবু কিন্তু তাহাদের দাঁত নীরোগ ও নিখুঁত।

মনের বসতি কোথায়?

বিজ্ঞানের কথা দিনে দিনে পরিবর্ত্তিত হইতেছে—আজ যাহা সত্য, কাল তাহা মিথ্যা। সংপ্রতি পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকরা এমন-এক নূতন কথা বলিতেছেন, যাহা সত্য হইলে দেহ-তত্ত্বের প্রধান একটা স্থির সিদ্ধান্তও একেবারে বাতিল হইয়া যাইবে। বৈজ্ঞানিকরা নানা পরীক্ষার পর শেষটা ঠিক করিয়াছেন যে, মানুষের মনের বাসা তাহার মস্তিষ্কের মধ্যে নয় এবং মস্তিষ্কের ভিতরেও কোনরূপ মানসিক কার্য্যনির্ব্বাহ হয় না। ডাক্তার রবার্টসন বেল অনেকদিন আগেই বলিয়াছিলেন যে, নর-দেহের solar plexus-এর মধ্যেই মনের বসতি। তখন কিন্তু কথাটা সকলেই হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন। এখন পাশ্চাত্য চিকিৎসকরা বলিতেছেন, গত যুদ্ধে তাঁহারা রণক্ষেত্রে অস্ত্রচিকিৎসায়

সময়ে কোন কোন লোকের মস্তিষ্কের সমস্ত অংশও বাদ দিয়া দেখিয়াছেন যে, তাহাতে মানুষের মানসিক শক্তি একটুও নষ্ট হয় না। আর-একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক (Prof. Troude) বলিতেছেন, কুকুর ও বানরের উপরে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, তাহাদের মস্তিষ্ক সম্পূর্ণরূপে কাটিয়া উড়াইয়া দিলেও তাহাদের মানসিক অবস্থার কিছুমাত্র উত্তর-বিশেষ হয় না! আধুনিক অনেক চিকিৎসকের মতে, মানুষের মনের জন্মক্ষেত্র নিশ্চয়ই দেহের অন্য কোন স্থানে। তবে সে স্থানটা যে কোথায়, সেটা এখনো ঠিকমত ধরিতে পারা যায় নাই।

বেতার টেলিগ্রাফে ফোটো-তোলা

প্রবন্ধের শিরোনামা দেখিয়া চমকিত হইবেন না, কারণ এখানে বেতার টেলিগ্রাফে ও টেলিফোনের সাহায্যেও ফোটো-তোলা সত্যসত্যই সম্ভব হইয়াছে।

এর-মধ্যেই এই ব্যাপারের অনেকগুলি পদ্ধতি উদ্ভাবিত হইয়াছে—যদিও এক-বিষয়ে সমস্ত পদ্ধতিতেই মিল দেখা যায়। টেলিগ্রাফ বা টেলিফোনের সাহায্যে কোন আলোক-চিত্র অখণ্ডভাবে নয়—কিন্তু খণ্ড খণ্ড ভাবেই স্থানান্তরে চালান করা হয়। তারপর সেই খণ্ডাংশগুলি একত্র করিলেই একখানি সম্পূর্ণ আলোকচিত্র গড়িয়া উঠে।

এ বিষয় লইয়া বৎসর-কয়েক পূর্ব্ব হইতেই চেষ্টা চলিতেছিল এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সে চেষ্টা আংশিকভাবে সফলও হইয়াছিল বটে, কিন্তু এবার এই ব্যাপারটি একেবারে নিখুঁত হইয়া উঠিয়াছে বলিলেও চলে। সংপ্রতি ডেনমার্ক হইতে বিলাতের "ডেলি এক্সপ্রেস" নামক সংবাদ-পত্রের কার্য্যালয়ে, প্রধান মন্ত্রী লয়েড জর্জ্জের একখানি ছবি বেতার টেলিগ্রাফের সাহায্যে প্রেরিত হইয়াছে। টেলিগ্রাম পাঠাইতে যে খরচ হয়, এই উপায়ে ছবি পাঠাইতেও তার চেয়ে বেশী-কিছু খরচ পড়ে না।

মানুষ-খেকো গাছ

আফ্রিকার নিকটস্থ মাডাগাস্কার দ্বীপে একজন বিখ্যাত জার্ম্মান বৈজ্ঞানিক একটি অদ্ভুত গাছ দেখিয়া আসিয়াছেন। "ভেনাস ফ্লাইট্র্যাপ" প্রভৃতি কয়েকটি ছোট ছোট গাছের কথা ইতিপূর্ব্বেই শোনা গিয়াছিল—যাহারা পোকা-মাকড়-মাছি প্রভৃতিকে ফাঁদ পাতিয়া ধরিয়া আহার করে। কিন্তু এই নূতন-আবিষ্কৃত গাছটির নজর আরো উঁচু এবং সেইজন্যই স্থানীয় অসভ্য বাসিন্দারা ইহাকে বৃক্ষ-দেবতা বলিয়া পূজা করে। এই বৃক্ষ-দেবতা নরমাংসের অত্যন্ত ভক্ত। অসভ্যরা তাহাদের বৃক্ষদেবতার নিকটে মানুষকে বলিরূপে নিবেদন করে। কিন্তু সাধারণ পাষাণ-দেবতার মতন এই বৃক্ষদেবতা নিশ্চল ভাবে দাঁড়াইয়া মানুষ-বলি দর্শন করেন না। ইনি স্বয়ং তাহাকে বধ করেন এবং শিষ্যগণের জন্য সামান্য প্রসাদ পর্য্যন্ত না-রাখিয়া সমস্তটাই নিজে নিঃশেষে খাইয়া ফেলেন। বলিরূপে



মানুষ-খেকো গাছ

তিনি নর-কেও পান না—পান যুবতী নারীকে।

এই ভয়ানক গাছের নাম দেওয়া হইয়াছে, "ক্রিনোইডা ড্যাজিলা।" এই গাছের গুঁড়ি সাধারণত দশফুট উঁচু হয় এবং তাহাদিগকে দেখিতে অনেকটা শুঁড়-জাতের আনারস গাছের মতন। গাছের মাথার বেড় আট-নয় ফুট এবং তাহার উপর-দিকটা প্রকাণ্ড এক-খানা থালার মতন আকার ধারণ করিয়াছে। গাছের গুঁড়ির উপর হইতে আটখানা করিয়া পাতা ঝুলিতে থাকে,—সেগুলো লম্বায় দশ-বারো ফুট এবং চওড়ায় গোড়ার দিকে এক ফুট, মাঝখানে দুই ফুট, তারপর ডগার দিকে ছুঁচের মতন তীক্ষ্ণ হইয়া আসে। তাহাদের সর্বাঙ্গে বড় বড় কাঁটা খাড়া হইয়া থাকে। এই পাতাগুলো মাঝখানে পনেরো ইঞ্চির কম পুরু নয়। ইহাদের উপরে আড়া-আড়ি ভাবে অনেকগুলো শাখা থাকে; মাথার উপরে থালার তলাতেই গুটিছয়েক নলের মতন কেশর—অবিরাম সর্বদাই থরথর করিয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠে। গাছের থালায় এক-রকম পুরু ও মিঠা রস পাওয়া যায়, তাহার একটুখানিতেই এত নেশা হয় যে, মানুষ অজ্ঞান হইয়া পড়ে। দলের লোকে যে গাছে ওঠে, এই গাছ আপনার কেশর দিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরে। তারপর কাঁটাওয়ালা পাতায় চাপিয়া ধরিয়া তাহার প্রাণবধ করে।

শ্রীপ্রসাদদাস রায়

অভিনেতার সংগ্রহ

Matheson Lang একজন বিখ্যাত অভিনেতা। ইঁহার অভিনয়চাতুর্য্য বিশ্ব-বিখ্যাত। সম্প্রতি তিনি Pearson's Magazine-এ একটি প্রবন্ধ লিখেছেন—তা থেকে কিছু চয়ন করে দিলাম।

তিনি আফ্রিকা, ভারতবর্ষ, সিংহল, চীন, অষ্ট্রেলিয়া ইত্যাদি অনেক দেশ ভ্রমণ করেছেন এবং সেই-সব দেশ-ভ্রমণের ফলে এমন অনেক ফটোগ্রাফ ও আসল অলঙ্কারাদি সংগ্রহ করেছেন, যাতে তাঁর অভিনয় স্বাভাবিক হ'তে অনেকখানি সাহায্য করেছে। তাঁর সংগ্রহ ভবিষ্যতে আরও অনেক নাটকে তাঁকে সাহায্য করবে। তাঁর সংগ্রহসম্বন্ধে তিনি অনেক কথা বলেছেন। একবার Zanzibar-এ তিনি এক বৃদ্ধ আরব দেখতে দেখতে পান, তার পোষাক দেখেই তাঁর মনে হল যে এই রকম পোষাক ওথেলোকে পরিয়ে তাকে স্বাভাবিক করে তুলবেন। তখনই তাদের গাইড গিয়ে আরবটিকে ডেকে নিয়ে এল; আর তাকে ফটো-তোলাতে সম্মত করিয়ে। ফটো নেওয়া হয়ে গেলে বৃদ্ধ আরবটির পোষাক Mrs. Lang কিনে নিতে চাইলেন। সে তার একটি পোষাক বিক্রী করে গেল, সেই পোষাক পরে Mr Lang ওথেলোর ভূমিকা অভিনয় করে থাকেন।

Zanzibar-এর তিনি একটি সুন্দর বাড়ীর ফটো নিয়েছিলেন, সেই ছবি থেকে পরে Merchant of Venice-এ সাইলকের বাড়ীর দৃশ্য-রচনা করা হয়েছিল। তাঁর সংগ্রহের মধ্যে তিনটি জিনিষ তাঁর কাছে অমূল্য। একটি হার, একজোড়া জুতো আর একখানা ছোরা। হারটি মরক্কো থেকে আনা। তাঁর স্ত্রী সেটি একটি চামড়ার বেল্টের বদলে লাভ করেছিলেন। এ হার তিনি সাইলক আর ওথেলো সেজে ব্যবহার করেন। জুতো-জোড়া ভারতবর্ষ থেকে কেনা। ছোরাখানা অর্দ্ধচন্দ্রকার, এখানা Zanzibar-এর এক দোকান থেকে কেনা, ওথেলো সেজে এখানা তিনি ব্যবহার করেন।

তাঁর এই রকম অসংখ্য সংগ্রহ আছে। তার কতক তিনি ব্যবহার করেছেন, কতক ভবিষ্যতে ব্যবহার করবার জন্য প্রস্তুত আছে।

শ্রীসোমনাথ সাহা।

সঙ্কলন

বিলাত-যাত্রীর পত্র

৮

হঠাৎ মৃত্যুসংবাদ পেয়ে আমরা সবাই চমকে উঠেচি। কাছে থেকে তোমাদের যে সান্ত্বনা করতে পারতুম এত দূর থেকে তা আর সম্ভব হয়না। তোমাদের চিঠি আসতে এবং আমার উত্তর পৌঁছিতে যে দীর্ঘ সময় যাবে সেই সময়েই ধীরে ধীরে প্রতিদিন প্রতিরাত্রি তোমাদের শুশ্রূষা করবে। জীবন মৃত্যুর রহস্য সম্বন্ধে আমরা যা ভাবি আর যা বলি তার মধ্যে অনেকখানি থেকে যায় কেননা আমরা ওদের এক করে মিলিয়ে দেখতে পারিনে, আলাদা ভাগ করে দেখি। অথচ মনে আমরা জানি, কেননা অনাদিকাল অথচ আমরাই

আমাদের বিশেষ প্রয়োজন; কিন্তু সেই আলো জ্বালার দ্বারা আমাদের আলোকিত ছোটঘর আর অনালোকিত বিপুল বিশ্ব আমাদের কাছে দুই স্বতন্ত্র সত্য বলে প্রতিভাত হয়। আমরা যাকে বলি জীবন সেও সেই আলোকিত ছোট ঘরের মত, সেইটুকুর মধ্যে আমাদের চেতনা বিশেষভাবে সংহত, সেইটুকুর মধ্যে আমাদের লীলা স্থল। তার বাইরে যে অসীম সত্য আছে তাকে আমরা জীবনক্ষেত্রের বিরুদ্ধ বলে ভুল করি। কিন্তু আমাদের ঘরের সঙ্গে বাইরের যেমন নিরবচ্ছিন্ন যোগ, যেমন এই ঘর ও বাহির একই সত্যে বিধৃত, তেমনি, জীবন ও মৃত্যুর মাঝখানে কোনো সত্যকার ব্যবধান নেই উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব নেই—আমরা আমাদের বোধশক্তির ক্ষণিক বিশেষত্ব বশতঃ অংশমাত্রকে একান্ত করে জানচি বলেই সমগ্রের মধ্যে ভেদ দেখ্‌তে পাচ্চি। আজ যেখানে আলো জ্বলচে কাল সেখান থেকে আলো সরে যেতে পারে কিন্তু আমাদের বিশ্ব সরে যাবে না, আমাদের আশ্রয়স্থল সমান ধ্রুব হয়েই থাকবে। অতএব সত্যকে জীবন ও মৃত্যু কখনই বিচ্ছিন্ন করতে পারে না। জীবনে আমরা যে সত্যকে পেয়ে আনন্দিত আছি মৃত্যুতেও আমরা সেই সত্যকেই পাব। রাত্রে জেগে উঠে শিশু কেঁদে ওঠে, সে মনে করে সে বুঝি তার মাকে হারিয়েছে —এই সত্যটুকু শিখতে তার দেরি হয় যে আলোতেও তার মা, আছে অন্ধকারেও তার মা আছে। জীবন মৃত্যু সম্বন্ধেও আমরা সেই শিশুর মত—আমরা বৃথা ভয়ে কাঁদি জীবনেই আমরা সত্যকে পাই, মৃত্যুতে সত্যকে হারাই। কিন্তু বিশ্বে প্রাণের মূর্ত্তিকে দেখ, সে মূর্ত্তি আনন্দ মূর্ত্তি। চারিদিকে তরুলতা পশুপক্ষী রূপে শব্দে গতিতে কতই আনন্দ বিস্তার করচে; বিশ্বে প্রাণের এই আনন্দ রূপ কি কখনই টিঁকে থাকতে পারত যদি মৃত্যুতে কোনো সত্য না থাকত? রাত্রে আমরা ছোট প্রদীপে কতটুকু তেল দিয়ে কতটুকু সলতেই বা জ্বালাই। কিন্তু সেইটুকু শিখার মধ্যে ভয় নেই কেন? কেননা একথা নিশ্চয় জানা আছে যে, সে নিভলেও সূর্য্য কখনো নিভবে না। বিশ্বের মধ্যে মহা-প্রাণই হচ্চে অনির্ব্বাণ সত্য, সেই জন্যেই ক্ষুদ্রপ্রাণ নিবলেও ভাবনা নেই। যা ওঁ যা হাঁ তাকে প্রাণের মূর্ত্তিতে দেখছি, সেই হাঁ-কেই বিশ্বাস কর, না কে নয়। প্রভাতকেই বিশ্বাস কর কুয়াশাকে না। আমাদের চারিদিকে জগৎ জুড়ে প্রাণ এই অভয় বাণী ঘোষণা করচে, মৃত্যু কোনোমতেই সেই প্রাণকে নিরস্ত করতে পারচে না দেখ বারংবার এসে হুয়াকে যেন মুছে ফেলতে চাচ্চে কিন্তু কিছুতেই মুছতে পারচে না। মৃত্যু তেমনিই প্রাণের উপর দিয়ে চলে যাচ্চে কিন্তু প্রাণকে কখনই আচ্ছন্ন করে বিলুপ্ত করতে পারবেনা। অতএব মনকে শান্ত করে প্রাণকেই তোমরা শ্রদ্ধা কর মৃত্যুকে না। যাকে ভাল বেসেচ, যাকে সত্য বলে জেনেচ সে মৃত্যুতেও সত্যই আছে এই বিশ্বাস দৃঢ় রেখে শোক থেকে মনকে মুক্ত কর।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শান্তিনিকেতন, কার্ত্তিক ১৩২১।

কবিবর দেবেন্দ্রনাথ

কবি দেবেন্দ্রনাথ সেনের মৃত্যু হইয়াছে। প্রায় ষাট বৎসর বা ততোধিক কাল বয়সে তিনি ইহলীলা সংবরণ করিলেন। জীবদ্দশায় তাঁহার কাব্য-সাধনা ও অন্যান্য কীর্ত্তি সাধারণ্যে প্রচার না হইলেও পণ্ডিত এবং রসিক সমাজে তাঁহার অসাধারণ কবি-প্রতিভা সকলকেই আকর্ষণ করিয়াছে। বাংলা সাহিত্যে তিনি কি দিয়া গিয়াছেন, আজিকার হট্টগোলে সে সংবাদ বিশেষভাবে প্রচারিত হইতে বিলম্ব ঘটিলেও যাঁহারা গুণগ্রাহী ও ভাবের ব্যাপারী তাঁহারা ভালরূপই জানেন, দেবেন্দ্রনাথের স্থান কোথায়,—বঙ্গীয় কাব্য-



কবিবর দেবেন্দ্রনাথ

কাশের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্করূপে তিনি চিরদিন আগত ও অনাগত রসপিপাসুদের আনন্দ বর্দ্ধন করিবেন।

রবীন্দ্রিয় যুগে যুগনায়ক রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত অপর যে দুইজন কবি তাঁহার যথার্থ সমসাময়িকরূপে বাংলা কবিতায় বিশিষ্ট কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন, সেই অক্ষয়কুমার ও দেবেন্দ্রনাথ আজ উভয়েই পরলোকে—the greatest and the last of the Victorians রূপে একমাত্র রবীন্দ্রনাথ এখনো নিত্য-নূতন রশ্মি-প্রভায় বাংলা সাহিত্যের তামসী নিশাকে তাহার স্বাধিকার হইতে দূরে রাখিয়াছেন, বঙ্গভারতীর মহাদুর্ভাগ্যের মধ্যেও এই অতিরিক্ত সৌভাগ্য-যোগ হইয়াছে, এখনো তিনি আছেন বলিয়া রুদ্ধ অশ্রু স্তম্ভিত হইয়া আছে, সিঁথির মণি উজ্জ্বল আছে, অধরের স্মিত-হাস্ত ম্লান হয় নাই!

দেবেন্দ্রনাথের মৃত্যু সংবাদে একটি বিশেষ

দুঃখের কথা এই যে তাঁহার প্রতিভার পরিচয় আজিকালিকার সাহিত্য-সমাজে কেবল তাঁহার নামেই পর্য্যবসিত হইয়াছে। অনেকেই তাঁহার উৎকৃষ্ট রচনাবলীর সহিত পরিচিত নহেন। পুরাতন 'ভারতী' ও 'সাহিত্য' পত্রিকায় তিনি যে নূতন রসধারা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রতিভার সেই মাধ্যন্দিন গৌরবের কথা অনেকেই জানেন না—তাঁহার মৌলিক কল্পনা, আশ্চর্য্য সর্ব্বপ্রাণ, ও চমৎকার ছন্দঃস্রোত ও শব্দকুশলতার পরিচয় পাইতে হইলে গত ১৫ বা ২০ বৎসরের পূর্ব্বেকার রচনা পাঠ করিতে হয়। অধুনাতন রচনাগুলিতে, তিনি যে কত বড় কলাবিদ্ ছিলেন তার প্রমাণ তেমন পাওয়া যাইত না। কাজেই আমি লক্ষ্য করিয়াছি, বর্ত্তমানবংশীয় অতি অল্প সাহিত্যামোদী যুবকই তাঁহার কাব্য আলোচনায় উৎসাহ প্রকাশ করেন। তাঁহার পরিচয় সর্ব্বত্র যেন নূতন করিয়া দিতে হয়। 'অশোক গুচ্ছ' ও অনেক দিন পূর্ব্বে প্রচারিত হইয়াছিল—পুরাতন সংস্করণ বহুকাল নিঃশেষিত হইয়াছে, কিছুদিন পূর্ব্বে প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থগুলির প্রচার আদৌ হয় নাই। তাই তাঁহার সম্যক পরিচয় অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ ক্ষেত্রেই আবদ্ধ।

দেবেন্দ্রনাথ সেনের আদি বংশীয়েরা মজুমদার নামে পরিচিত। হুগলীজেলার পাণ্ডুয়া মহকুমার বলাগড় গ্রামে ইঁহাদের আদি নিবাস। প্রায় দুই পুরুষ যাবৎ ইঁহারা ও ঐ বংশের অন্য দুই-এক শাখা পশ্চিম প্রবাসী। এই প্রবাসকালেই ইঁহারা মজুমদার উপাধির পরিবর্ত্তে মূল কুল-সংজ্ঞা সেন (গুপ্ত) উপাধি গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ৺লক্ষ্মীনারায়ণ সেন ব্যবসায়-উপলক্ষ্যে বহু ভাগ্যবিপর্য্যয়ের মধ্যেও স্বভাব-গত উদারতা ও দানশীলতা, আশ্রিত-পালন প্রভৃতি নানা সদ্গুণের আধার ছিলেন। কিন্তু তিনি ও তাঁহার ভাই-ভগিনীরা তাঁহাদের অসাধারণ গুণবতী জননীর স্নেহ-শাসন ও শিক্ষা প্রভাবেই বাল্যে ও যৌবনে যত-কিছু সদ্গুণের অধিকারী হইয়াছিলেন। তাঁহাদের জীবনে এই মহীয়সী মাতার প্রভাব যে কতখানি ছিল—হৃদয় ও মন, উভয়ের বিস্তার লাভে তাঁহার কৃতিত্ব যে কতখানি, তাহার বিবরণ শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। সুখে দুঃখে, নিরতিশয় অভাব ও অর্থ-কৃচ্ছ্রতার মধ্যেও এই জননী কখনো মহান্ আদর্শ হইতে তাঁহাদিগকে বিচ্যুত হইতে দেন নাই। সরলতা, উদারতা, মহাপ্রাণতা, নিঃস্বার্থপরতা ও পরকে আপন করিয়া লওয়া প্রভৃতি সদ্গুণ এই জননীদেবীর শিক্ষায় ও অক্লান্ত চেষ্টায় এই সংসারে কিরূপ স্ফুরিত হইয়াছে তাহা পরিচিতদিগের মধ্যে অবিদিত নাই। সর্ব্ববিধ কার্পণ্য ও ক্ষুদ্রতা হইতে তিনি সন্তানদিগকে বাঁচাইতে চেষ্টা করিতেন; পরচর্চ্চা, পরনিন্দা তাঁহার সংসারে হইতে পারিত না। সৎসাহিত্যের আলোচনায় তাঁহার এত অনুরাগ ছিল যে শেষ-বয়সে তিনি এই নিয়ম করিয়াছিলেন, যে প্রত্যহ কোনও নির্দিষ্ট সময়ে বধূরা পালাক্রমে কোনও সদ্গ্রন্থ পাঠ করিয়া তাঁহাকে এবং অপর সকলকে শুনাইবেন। সংসারটিকে তিনি স্নেহ-প্রীতির লীলানিকেতন করিয়া রাখিয়াছিলেন।

এই শিক্ষা ও বোধ করি, তাঁহার পিতার মুক্তপ্রাণের অধিকারী হওয়ায় দেবেন্দ্রনাথের কবি-শক্তি স্ফুরিত হইয়াছিল।

তিনি অতি অল্প বয়সে কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। উদ্বেল ভাবরাশি অকৃত্রিম গিরিনির্ঝরের মত উৎসারিত হইত। ক্রমে সেই প্রাণ ও ভাষা গভীরতর হইয়া—যৌবন-প্রবুদ্ধ হৃদয়ের স্বভাব-সৌন্দর্য্য ও আশ্চর্য্য নৈপুণ্যে ভূষিত হইয়া বঙ্গভারতীর চরণতল ও দীর্ঘ-লুণ্ঠিত অঞ্চল-প্রান্ত প্রাণের রঙ্গে লালে-লাল করিয়া দিয়াছে। তিনি প্রথম যৌবনে মানস-শক্তির প্রথম প্রকাশ-মুখে পশ্চিম হইতে বাংলার রাজধানীতে বিদ্যা-শিক্ষা করিতে আসেন; সবজজ মথুরানাথ গুপ্ত মহাশয়ের কন্যা, ও প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ গুপ্ত মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা ভগিনীকে বিবাহ করেন ও প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে অধিক বয়সে এলাহাবাদ হইতে ইংরাজী সাহিত্যে এম, এ উপাধি গ্রহণ করেন।

প্রথম কলিকাতা-বাসকালে তিনি যে সঙ্গ ও সাহচর্য্য লাভ করিয়াছিলেন তাহার তুলনায় বর্ত্তমান সাহিত্য-সমাজ প্রাণহীন। তখন বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রযুগের সূচনা মাত্র হইতেছে। অমৃত-পিপাসু তরুণ দেবতাদের অপূর্ব্ব সম্মেলনে বাণীর প্রসাদ-পাত্রে যে নবীন সুধা কাণায় কাণায় ভরিয়া উঠিবার উপক্রম করিয়াছে, সেই রসরঞ্জিত ওষ্ঠাধরের কলগুঞ্জন দেবেন্দ্রনাথের অন্তর-বীণায় প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। সে আনন্দে পরিপুষ্ট হইয়া, সে সৌহার্দ্দ্য ও সমপ্রাণতার আত্মশক্তিতে আত্মবান হইয়া তিনি অল্প লাভবান হন নাই। বঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাসে এই যুগসন্ধির গৌরব ভবিষ্যৎ বংশীয়েরা কীর্ত্তন করিবেন। কত আশা, কত উৎসাহ! কতদিকে কত নব নব প্রতিভার উন্মেষ, তার পরে কত ফোটা, কত ঝরা! দেবেন্দ্র নাথের প্রতিভা এইরূপে সেই নব-জাগ্রত সৃষ্টিশক্তির কেন্দ্রস্থলে আপনাকে স্থাপন করিয়া সাধনা ও সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইয়াছিল।

তারপর পত্নী-বিয়োগ—দারান্তর-গ্রহণ—ওকালতী ব্যবসায়ে সফলতা। তারপর একমাত্র পুত্রের বিয়োগ-দুঃখে শোকোন্মাদ—ওকালতী-পরিত্যাগ—কত উত্থান-পতন। কিন্তু প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত প্রাণের মধ্যে সেই যে আজন্ম-লব্ধ কবি-প্রেরণা, তাহা হইতে কখনো তিনি বিচ্যুত হন নাই।

প্রায় কুড়িবৎসর পূর্ব্বে যখন কলিকাতায় ফিরিলেন, তখন দেবেন্দ্রনাথের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তাঁহার কবিতা ও জীবন এক ছিল, তাঁহার বাস্তব জীবনের যাহা কিছু সত্যকার মর্ম্মকথা, যাহা তাঁর বিশ্বাস ছিল, ধর্ম্ম ছিল, তাহাই আবেগ ও কল্পনার একটু আবেশ পাইলেই ছন্দঃ-স্রোতে উথলিয়া উঠিত। আপনাকে বিলাইয়া আত্ম-পর ভুলিয়া, এমন কি সাংসারিক কর্ত্তব্য জ্ঞানকেও বিস্মৃত হইয়া, নিতান্ত শিশুর ন্যায় সরল মনে জীবনটাকে চিন্তালেশ-শূন্য দায়িত্ববিহীন আবেগের পথে ছুটাইয়া যখন প্রচণ্ড প্রতিঘাত পাইলেন, তখন হঠাৎ তাঁহার মানস-নদে একটা ঘূর্ণী জাগিল—আর গতি নাই, আর প্রসার নাই, বিকাশ নাই; তাঁহার সৌন্দর্য্য-প্রীতি ও প্রেম-কল্পনার একটা বাঁধন পড়িল—প্রেম-সৌন্দর্য্যের সঙ্গে বিশ্বমঙ্গল-কল্পনা, ভাগবত মূর্ত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইল। কর্ত্তব্য-শাসনে আপনাকে

না বাঁধিয়া, যতটা সম্ভব নিজেরই মানস-সম্ভূত অথচ পৃথক্-কল্পিত এই শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহের সম্মুখে ভক্তির শাসনে আপনার অন্ধ হৃদয়কে লুটাইয়া ধরিয়া তিনি কর্ম-সন্ন্যাসের সাধনা আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে এই ঘূর্ণার প্রচণ্ড-বেগে তিনি ঘর-সংসার ছাড়িয়া কৃষ্ণপ্রেম-প্রচারে প্রায় সমগ্র দক্ষিণ ভারত পর্য্যটন করিয়াছিলেন—প্রায় কৌপীনবস্ত্র ও তরুমূল-বাসী হইয়া এ সময়ে তিনি কি দুর্দ্দম উন্মাদনার বলেই একাগ্র-চিত্তে সকল বাধা, সকল বিঘ্ন অগ্রাহ্য করিয়া Srikrishna Mission, Srikrishna Review ও শ্রীকৃষ্ণ পাঠশালা প্রতিষ্ঠা করেন। কলিকাতার শ্রীকৃষ্ণ পাঠশালার ইতিহাস অনেকেই জানেন, ইহার আশ্চর্য্য অভ্যুদয় ও পরিশেষে আকস্মিক পতন, কোনোটাই আশ্চর্য্যজনক নয়। প্রকাণ্ড কল্পনার সঙ্গে যদি তীক্ষ্ণ কর্ম্মবুদ্ধি না থাকে, আত্মশক্তিতে অত্যধিক আস্থা, মনে মনে "কল্পধেনুর অমৃত দুগ্ধ দোহন" করা কোনো কর্ম্মে সফলতা আনয়ন করে না। কবি দেবেন্দ্রনাথ চির-দিনই কবি, একেবারে আত্মবিস্মৃত, মোহাভি-ভূত,—সুন্দর ও মঙ্গল-এর অন্ধ উপাসক, যাহা মনে করেন তাহাই সত্য, এবং যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই শুভ—এই রূপ বুদ্ধিবৃত্তির সঙ্কোচ তাঁহার জীবনকে ব্যবহারিক দিকে নিষ্ফল করিয়াছে। তিনি শেষ জীবনে আবার সংসারী হইয়াছিলেন। কিন্তু সংসার ও কল্পনা, এ দুইয়ের দ্বন্দ্ব কখনো তাঁহার জীবনে মেটে নাই। ইদানীং তিনি অকাল-বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়াছিলেন, মস্তিষ্কের ও চক্ষুর স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়াছিল। একমাত্র অবলম্বন তাঁহার 'পাঠশালা' যখন আচম্বিতে বজ্রপাতে চূর্ণ হইয়া গেল, তখন হতোদ্যম ও হতোৎসাহ হইয়া ভগ্নহৃদয় দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার অধুনা-প্রবাস-ভূমি দেরাদুনে ফিরিয়া গেলেন, এবং সেইখানেই বোধ হয় সারাজীবনের কল্পনা-স্বপ্নের অবসানে সংসারের দাবদাহের মধ্যে শেষ নিঃশ্বাস গ্রহণ করিলেন।

দেবেন্দ্রনাথের জীবন বাহিরের দিক দিয়া দেখিবার নয়—সে দেখায় সম্পূর্ণ উল্টা দেখাইবে। সর্ব্ববিধ নিয়মের বাহিরে যে, তাহাকে লইয়া সমাজে বিশেষতঃ সংসারে, সাংসারিক নীতির আলোচনা করিলে, সত্যকে পাওয়া যাইবে না, মিথ্যারই উদ্ভব হইবে। বাঙলাদেশে যদি কোন কবি জন্মিয়া থাকেন, যাঁহার জীবন বা চরিত্র-ব্যাখ্যান করিতে হইলে সংসারকে, বাস্তব ভাল-মন্দকে একেবারে ভুলিতে হইবে, তিনি দেবেন্দ্রনাথ; তাঁহা না হইলে দেবেন্দ্রনাথকে কিছুতেই সত্য করিয়া জানা যাইবে না। কবির কথা "যেজন সেবিবে ও পদযুগল, সেই সে দরিদ্র হবে"—'দরিদ্র' অর্থে জীবনে-পরাজিত—ইহার কারণ বা অর্থ কবি দেন নাই; কিন্তু দেবেন্দ্র-নাথ আপনার জীবনে তাহার অর্থ সুস্পষ্টরূপে করিয়া দিয়াছেন।

দেবেন্দ্রনাথের কাব্যেও যাহা, তাঁহার জীবনেও তাহাই প্রবল ছিল, রূপলেশহীন আত্মপ্রসাদ সুন্দরের ধ্যানে নয়, সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা তাহার অনুভূতিতে যে উল্লাস, তাহাতেই সর্ব্ব ভুবন তাঁহার চক্ষে রাগরঞ্জিত হইয়াছিল। সহজ কথায় প্রাণ ও মন বলিতে আমরা যে ভেদ নির্দ্দেশ করি—সেই দুই-এর মধ্যে

প্রাণের অফুরন্ত বিলাসই তাঁহার কল্পনার শক্তি সঞ্চার করিয়াছে; 'মন' জিনিষটা তেমন ফুটিতে পায় নাই। ইহার যদি বিপরীত হইত, তবে বাংলা কাব্যে আমরা একটি খাঁটি Keats পাইতাম। সুন্দর-পিপাসার সঙ্গে সুখ-বোধ তাঁহার ছিল না। তাঁহার প্রাণের আবেগ বিশালতর ছিল, artএর মধ্যে তিনি আনন্দ অন্বেষণ করেন নাই—এই জীবন ও জগৎটাকেই আপনার প্রাণের বক্ষে জোপাইয়া তিনি বৃন্দাবন-স্বপ্নে ভোর হইতে চাহিয়া ছিলেন। কীটস্-এর মত তাঁহার sensuousness ত' intellectual, objective নয়; জগৎ ও নিজের মধ্যে দ্বন্দ্ব তিনি মানিতেন না; আর্টিষ্টের মত আপনাকে পৃথক করিয়া রাখিয়া, জগৎকে একটু দূরে ধরিয়া, চিন্তা ও ধ্যানের সাহায্যে রসাস্বাদন করা তাঁর ধর্ম নয়, সংশয় সন্দেহ নয়, সরল বিস্ময়ের প্রাণময়তা তাঁহাকে এই নূতন ভোগপন্থা ও আনন্দবাদের কবি করিয়াছিল। Sense ও Dutyর যে conflict তাহা তিনি বুঝিতেন না, আপনার আনন্দ-বিশ্বাস তাঁহাকে আর সর্ব্ব-বিষয়ে অন্ধ করিয়াছিল। সেই জন্য তাঁহার কাব্য, অতি অপূর্ব্ব-মধুর হইলেও, জীবনের সারা বৎসরের সঙ্গী নয়, কেবল উৎসব-রাতে, জীবনসংগ্রামের ক্ষণিক অবসরে অনাবিল প্রীতিহাস্যে আমাদিগকে মুগ্ধ করে। কিন্তু মুগ্ধ সে করিবেই—সে 'ভাবে'র infection কাহারও রোধ করিবার শক্তি নাই—সে এমনই সহজ, সবল ও সুন্দর। তাঁহার কাব্যের পরিসর সঙ্কীর্ণ হইলেও মৌলিকতা ও প্রকৃত কবিশক্তিতে এ যুগে—অবশ্য রবীন্দ্রনাথের [illegible] বাদ দিয়া—তাঁহার সমকক্ষ আর কেহই নাই। কেবল মাত্র প্রাণের অতি তীব্র স্পন্দনে ভাষা, ছন্দ, ও সুর কেমন করিয়া আপনা-আপনি আশ্চর্য্য নৈপুণ্য ও কারু কলার নিদর্শন হয়—unconscious art এর কথা যে সত্য, তাহা দেবেন্দ্রনাথের প্রতিভায় মধ্যাহ্নকালের রচনা পাঠ করিলে বেশ বুঝা যাইবে। ইংরাজী ও সংস্কৃত কাব্যে তাঁহার গভীর প্রবেশ ছিল। বাংলা কাব্যে মাইকেল ও হেমচন্দ্রের প্রভাব তাঁহার উপর কিছু কিছু পড়িয়াছিল—বোধ হয় হিন্দি কবিতাও কিছু কিছু চর্চ্চা করিয়াছিলেন। তাঁহার ছন্দে যে একটি অপরূপ ঝঙ্কার আছে, তাঁহার আবৃত্তিতেও সেই রূপ এক অতি মধুর স্বর-ভঙ্গী ফুটিয়া উঠিত; তাহার মধ্যে যেন তাঁহার প্রাণের সুন্দর-সম্ভোগের সমস্ত রস ঢালিয়া দিতেন। তাঁহার সহিত যাঁহারা সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন, অনুরোধ করিলেই অনর্গল আবৃত্তি করিয়া যাইতেন। এমন সাদর অভ্যর্থনা, প্রাণ খুলিয়া বুকে করিয়া লওয়া, আর কোথাও দেখি নাই।

দেবেন্দ্রনাথেরা পাঁচ সহোদর—তিনি সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। মধ্যম সহোদর শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ সেন ওকালতি করেন, তিনি দুই বিষয়ে এম, এ। তৃতীয় সহোদর ৺উপেন্দ্রনাথ সেন অদ্বিতীয় লোক ছিলেন—যেমন সাহিত্যানুরাগ, তেমনি স্বভাব-ধার্ম্মিকতা, সাত্ত্বিকতা, বিনয় ও প্রীতি তাঁহাকে আদর্শ গৃহী করিয়াছিল। তিনি এম,এ, বি,এল,—সবজজ ছিলেন। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে সংসারে হাসির আলো অনেকখানি নিবিয়া গিয়াছে। চতুর্থ সহোদর যতীন্দ্রনাথ সেন কোনও উপাধিধারী না

হইলেও প্রগাঢ় পণ্ডিত, সুলেখক, সর্ব্বাপেক্ষা তীক্ষ্ণধী-সম্পন্ন—তিনি রাজনীতি-ক্ষেত্রে যশোলাভ করিয়াছেন—এক সময়ে এলাহাবাদের চরম-পন্থী ইংরাজী পত্র 'Citizen' এর সম্পাদক ছিলেন। সর্ব্বকনিষ্ঠ ডাঃ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ-সেন এম, এ, এল, এল, ডি মহাশয় অধুনা এলাহাবাদ-হাইকোর্টের লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল। ভ্রাতৃগণের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথের প্রভাব বিশেষ করিয়া এই কনিষ্ঠ সহোদরের মধ্যেই লক্ষ্য করা যায়। তাঁহার 'কিশোরা' ও 'সুধার' নামে দুইখানি কাব্য ইতিমধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি যেমন পণ্ডিত, তেমনি বিনয়ী ও মুক্তপ্রাণ।

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার।

পৌষের অবেলায়

পৌষের হাওয়া দেয়, গা করে শির্ শির্!
কোন্ তূণ খালি করে' কোন্ জন ছোড়ে তীর।
দেখা যায় ফাঁকে ওই নারিকেল পত্রের—
রূপসীর লাজ-ভরা চাউনিটি নেত্রের।
নীলিমার নীল চোখে গাঢ় হয় নীল রঙ্,
অন্তরে বুলে যায় আকাশের রঙ্-চঙ্;
পৌষের হাওয়া দেয়, পড়ে' যায় রদ্দুর,—
বাঁধা হলো চুল তোর—কদ্দুর? কদ্দুর?

নলি বেয়ে খেজুরের রস পড়ে টুপ্ টুপ্—
অধরের সীধু টুক্ ঝরে' যায়—চুপ্ চুপ্!
কাঁঠালের কচি মুচি কাঁচা সোনা চুক্ চুক্—
আধ রোদ আধ-ছায় দেখা যায় মুখ-সুখ!
চরা শাম চড়ায়ের, ঘর-কোণে উড়ে' যায়,
চোখ-চোখ চায়, আর প্রেম- শ্লোক আওড়ায়,
পৌষের হাওয়া দেয়, পড়ে' যায় রদ্দুর,—
বাঁধা হলো চুল তোর—কদ্দুর? কদ্দুর?

থিলি খেয়ে হাসে যেন খিল্ খিল্ বকফুল—
তরুণীর রক্তিম কর্ণের ওই দুল।
বোঝা ভার—কাঁচলো কি পাক্‌লো ও কৎবেল
লাজশীলা বধূটির যেন রীত-আক্কেল!
সজনের ফুল থোক—বুক-ভরা মৌ ও'র,
শেষ করে মৌমাছি মন-পাওয়া মন্তর!
পৌষের হাওয়া দেয়, পড়ে' যায় রদ্দুর,—
বাঁধা হলো চুল তোর—কদ্দুর? কদ্দুর?

নট্ কনা চট্ কনা ভেঙে দেয় দু'চোখের—
পিয়ে যায় প্রেয়সীর রূপ-রস ওষ্ঠের।
শাত শুভি রুচি তোর, খুটি মুটি কয় সায়,
বেঁধেছিস্ মন মোর বিউনির ফাঁস্ টায়!
উড়ে' যায় পাখী ওই একসার—দুইসার,
থাক্-ভাঙা বক যায়,—সাধ নেই শুধবার!
পৌষের হাওয়া দেয়, পড়ে' যায় রদ্দুর,—
বাঁধা হলো চুল তোর—কদ্দুর? কদ্দুর?

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

নাস্তিকের গল্প

একটা কথা আমরা বেশ জানি, 'যার খাই যাই, তাকে বলি চোর।' ভগবানের হাতের তৈরী জীব হয়ে, তাঁর খেয়ে দেয়ে, তাঁকেই আবার আমরা কিনা অস্বীকার করে ফেলি। এটা একটা উল্টো চাপ্। জগতের ইতিহাসে এ-সম্বন্ধে রকম নিমকহারামি ত কথা নয়। আমাদের অনেকের জানা আছে তর্ক-শাস্ত্রের অদ্ভুত পণ্ডিত মিলের কথা (John Stuart Mill); তিনি তর্কের কর্ণধার করে শেষ্টায় এই বলেন যে তর্ক ছাড়া কোন জিনিস বড় একটা বিশ্বাসের ধার কাছেও আস্তে দিতেন না—কিন্তু কতকগুলি জিনিস আছে, যেগুলি চোখে দেখা যায় না, সহজে মনের খাপে নামে না, তবু সত্য! এই যেমন বাতাস, এটাকে দেখ্বার যো নেই—কিন্তু স্পর্শ করেই বুঝতে হ'বে যে এ বড় বেজায় জিনিস। মিলের তর্কে এটার ঠাঁই হইতে পারে, কিন্তু এমন জিনিস ঢের আছে, যে-গুলি পাঁচটা ইন্দ্রিয়ের কোনটার দ্বারাই অনুভব করা অত সহজ নয়, তবে ধ্যানের দ্বারা সে শক্তি লাভ করতে হয়। ইংরেজীতে এইগুলিকে Transcendental—ইন্দ্রিয়ের অতীত বলে; এই যেমন ভগবান্কে পেতে হলে, এই অতীন্দ্রিয়ের দরকার—সাদামাঠা চোখ দিয়ে দেখা যায় না। তাই কথায় বলে 'বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর!' এই বিশ্বাস—Faith তর্কের বিষয়ীভূত নয়, তাই মিলের ভগবানে আস্থা ছিল না। তিনি ভগবান্ মানতেন্ না। কিন্তু এই পাণ্ডিত্যের দিকে চেয়ে মহাকবি শেক্সপীয়র খুব জোর গলায় অতি-পণ্ডিতদের হেঁকে বলে ছিলেন, 'There are more things in heaven and' earth than are dreamt of in your philosophy. স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে এমন অনেক কিছু আছে যা মত্ত পাণ্ডিত্যে ধরা দেয় না। এই সব বুঝতে হলে, মনের বিশ্বাসকে আমল দিতে হয় এবং তাই নিয়ে ধ্যানশক্তি বাড়াতে হয়, তবে না—দেখার জিনিস দেখা যায়। মিল তর্কের ঝড় ছুটিয়ে শেষ জীবনে মৃত্যু শয্যায় যখন দেখেন যে আর জীবন যেতে বাকী নাই, তখন তাঁর বন্ধুদের দিকে চেয়ে বল্লেন, 'ভগবান নামক কোন জিনিষ তোমরা বিশ্বাস কর?'

সকলেই বলে উঠলেন, 'খুব—মিল, জীবন থাক্তে তুমিও বলে যাও, ভগবান্ আছেন, ক্ষমা পাবে।' তখন তর্ক রাজ শেষ নিঃশ্বাস টানতে টানতে বল্লেন, 'If there be any God, let Him forgive me.' ভগবান বলে কোন জীব থাকলে, আমায় ক্ষমা করুন। মৃত্যুর গলা টিপানি খেয়ে তাঁর মুখে এই নাম বাহির হল। কিছুদিন আগে বিলাতে একটা মজার কাণ্ড হয়ে গেল, সে হচ্ছে এক নাস্তিকের সভা,—An assembly of atheists. তাঁরা সব দলে দলে ভিড়ে সভাপতি ঠিক করে এক বিরাট সভার আয়োজন করে ফেল্লেন, 'সভা-মঞ্চের দুয়ে, প্ল্যাকার্ডে বড় বড় অক্ষরে

লেখা হইল, 'God is no where' অর্থাৎ ভগবান্ কোথাও নাই—এ একটা মস্ত ভুল! তারপর ভোট লওয়া আরম্ভ হল, সকলেই ভোট দিলেন ঈশ্বর নাই—যিনি সভাপতি তিনি বজ্রাজ গলায় সে বিল পাশ করলেন। আর অমনি ঘোষণা হল ঈশ্বর থাকলেও পেন্সন পেলেন। ঠিক এমন সময় এক নাস্তিকের ছোট একটি ছেলে সেই poster এর (লেখার দিকে) দিকে চেয়ে আপনমনে জোর গলায় পড়ে গেল, 'God is now here' শোনবামাত্র সকল নাস্তিকের পিলা চম্‌কাইয়া উঠিল, তারা সব চেয়ে আশ্চর্য্য দেখলে nowhere কথাটা কেমন ভাবে যেন কার যাদু-মন্ত্রে 'now here' হয়ে উঠেছে! ক্ষুদ্র শিশুর কণ্ঠে ভগবান্ জানিয়ে দিলেন 'ওরে তোরা বলছিস্ আমি নেই—এই দেখ্ কথার ফাঁকেই আমি আছি!' তখন আর যায় কোথা! গোলমাল পড়ে গেল, মুখপোড়া বানরের মত সেই নাস্তিকের দল ছত্রভঙ্গ হয়ে কে কোথায় সরে পড়ল। কেহ খোঁজ পাইল না। Trench পাঞ্চে এক চিত্র বাহির হইয়াছে, এটি অবশ্য ব্যঙ্গ চিত্র। একটা বিলাতী গোরাকে এক মিশনারী বললেন, 'খ্রীষ্টকে কি ভুলিয়াছ?' সেপাই হাকিল—'Christ! what is his number!—বটে খ্রীষ্ট কই চিনিনা—সে অবশ্যই আমার মত সৈন্য হবে, তার নম্বর কত?' নাস্তিকতা কিরূপে চারিদিক আপন পাখায় ঢাকছে, এ তারই একটা ইঙ্গিতমাত্র।

শ্রীভূপেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

সমালোচনা

A Short History and Ethnology of the Cultivating Pods, by Mahendranath Karan. Published by Rai Charan Sardar B. L. Diamond Harbour. Dt. 24 Parganas. Kuntaline Press. Calcutta. Price Superior edition Re 1/-; Popular edition annas ten only. এই গ্রন্থখানিতে পোদ জাতির উৎপত্তি, তাহাদের জীবন-যাত্রার প্রণালী ও তাহাদের সামাজিক আচার-ব্যবহার প্রভৃতির বিষয় বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। শাস্ত্র ও ইতিহাস-গ্রন্থাদি হইতে গ্রন্থকার নিপুণ ও নিঃসংশয়ভাবে প্রমাণ করিয়াছেন, পোদ জাতি পৌণ্ড্রক জাতিরই নামান্তর,—প্রাচ্য বা অনার্য্য জাতি হইতে তাহার উৎপত্তি নহে। মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত, হরিবংশ, মনু-সংহিতা, মৎস্যপুরাণ, কুলতন্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থে পোদ বা পৌণ্ড্রক জাতির উল্লেখ আছে। অনার্য্য পোদ জাতির সহিত cultivating পোদ জাতির কোন সম্পর্ক নাই; বাঙ্গলা দেশের ধীবর জাতি এই অনার্য্য পোদ জাতির অন্তর্ভুক্ত। পোদ জাতির সামাজিক আচার-ব্যবহারের সহিত প্রাচীন ক্ষত্রিয় জাতির বিস্তর সৌসাদৃশ্য আছে। গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া লেখকের সত্যানুসন্ধিৎসা এবং তথ্য-সংগ্রহে বিপুল উদ্যম ও অধ্যবসায় দেখিয়া আমরা পুলকিত হইয়াছি। বাঙ্গলার জাতীয় ইতিহাসে এ গ্রন্থ বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিবে। বাঙ্গলা ভাষায় এ গ্রন্থের প্রচার বাঞ্ছনীয়। গ্রন্থের ভাষাও বেশ সহজ ও চিত্তগ্রাহী হইয়াছে।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

কলিকাতা—২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীকালাচাঁদ দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ভারতী

৪৪শ বর্ষ] মাঘ, ১৩২৭ [১০ম সংখ্যা

অবতার

৮

কৌণ্ট চক্ষু উন্মীলিত করিয়া তাঁহার চারিদিকে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন; দেখিলেন, শয়ন-কক্ষটি বেশ আরামের কিন্তু খুব সাদাসিধা; চিতা-চর্ম্মের অনুকরণে তৈয়ারি একটা গালিচায় ঘরের মেজে আচ্ছাদিত; বুটিদার পরদায় জানলা-দরজা ঢাকা, কাপড়ের মত দেখিতে সমান-চোস্ত সবুজ কাগজে ঘরের দেয়াল মণ্ডিত। কালো মার্ব্বেলে গঠিত একটা ঘড়ি—তাহার উপরে একটা রূপার পুত্তলিকা—তাহার সহিত দুইটা রূপার প্রাচীন পেয়ালা—এই সমস্ত জিনিসে সাদা মার্ব্বেল-গঠিত চিমনী-স্থান বিভূষিত ছিল। একটা পুরাতন ভিনিশিয়ান আর্শি যাহা কৌণ্ট গতমাসে আবিষ্কার করিয়াছিলেন, এক বৃদ্ধার চিত্র—সম্ভবতঃ অক্টেভের জননী—ইহাই এই ঘরের একমাত্র অলঙ্কার; ঘরটি বিষণ্ণ ও কঠোর-দর্শন; আসবাবের মধ্যে একটা পালঙ্ক, চিমনীর নিকটে স্থাপিত একটা আরাম-কেদারা, পুস্তক ও কাগজ-পত্রে আচ্ছাদিত একটা দেরাজ-ওয়ালা টেবিল। এই সকল আস্বাব আরামপ্রদ হইলেও লাবিন্স্কি-প্রাসাদের জম্কালো আস্বাবের কাছ দিয়াও যায় না।

চাকর মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল:—

"মহাশয়, উঠেছেন কি?" এই কথা বলিয়া, তাহার মনিবের প্রাতঃকালের পরিচ্ছদ,—একটা রঙিন কামিজ, একটা ফ্লানেলের প্যান্টালুন, একটা আলখাল্লা—কৌণ্টকে দিল। পরের কাপড় পরিতে তাঁর নিতান্ত অনিচ্ছা হইলেও,—অগত্যা ঐ কাপড় তাঁকে পরিতে হইল; কেননা, না পরিলে উলঙ্গ হইয়া থাকিতে হয়। শয্যা হইতে নামিবার সময় একটা কালো ভাল্লুকের চাম্ড়ার পা-পোষের উপর পা রাখিলেন।

তাঁহার সাজসজ্জা শীঘ্রই হইয়া গেল। কৌণ্ট অক্টেভ নহে—এই বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ না করিয়া চাকর কৌণ্টের যত্ন

পরিধানে সাহায্য করিল। তাহার পর জিজ্ঞাসা করিল,—"কোন্ সময় মহাশয় প্রাতর্ভোজন করতে ইচ্ছা করেন?" কৌণ্ট উত্তর করিলেন!—

"নিত্য-নিয়মিত সময়ে"। তাঁহার ব্যক্তিত্ব ফিরিয়া পাইবার চেষ্টায় পাছে কোন বাধা ঘটে, এই মনে করিয়া তাঁহার এই দৈহিক পরিবর্ত্তনটা আপাতত মানিয়া লইবেন বলিয়া সঙ্কল্প করিলেন।

চাকর প্রস্থান করিলে, অক্টেভ-দে-গুলাস্ক, সংবাদ-পত্রাদির সহিত যে দুইখানা চিঠি তাঁর জন্ম আনা হইয়াছিল, সেই দুইখানা চিঠি খুলিলেন; আশা করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে, তাঁহার রূপান্তর সম্বন্ধে কোন খোঁজ-খবর পাইবেন। প্রথম চিঠিতে কতকগুলি প্রণয়-ভর্ৎসনা আছে—লেখিকা আক্ষেপ করিয়াছেন, কেন বিনা কারণে তাঁর বন্ধুত্ব প্রত্যাখ্যান করা হইল। দ্বিতীয় পত্রে, অক্টেভের উকিল অক্টেভকে পীড়াপীড়ি করিয়া লিখিয়াছেন, ভাড়ার হিসাবে তিনি যে টাকা পাইবেন, তাহার চতুর্থাংশ যেন কোন লভ্যজনক কাজে খাটান হয়। কৌণ্ট মনে মনে ভাবিলেন:—

"তাই নাকি, তবে ত দেখছি যার শরীরে আমি বাস করছি—সেই অক্টেভ নামে একজন লোক বাস্তবিকই আছে; সে তা হলে একটা কাল্পনিক জীব নয়। তার ঘর-বাড়ী আছে, তার বন্ধুবান্ধব আছে, তার উকীল আছে, টাকা খাটাবার মূলধন আছে—একজন ভদ্রলোক গৃহস্থের যা থাকা উচিত সবই আছে, কিন্তু আমার ত বেশ মনে হচ্চে—আমিই কৌণ্ট লাবিন্‌স্কি!"

কিন্তু আর্শিতে একবার কটাক্ষপাত করিবামাত্র তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস হইল, তাঁহার এই মতের সঙ্গে কাহারও মিল হইবে না—কেহই ইহাতে সায় দিবে না। কি উজ্জ্বল দিবা-লোকে, কি অস্পষ্ট দীপালোকে, ঐ আর্শিতে তো একই মূর্ত্তি প্রতিবিম্বিত হইতেছে!

বাড়ীর কোথায় কি আছে কৌণ্ট দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তারপর টেবিলের দেরাজ খুলিলেন। একটা দেরাজের মধ্যে দেখিতে পাইলেন,—ভূসম্পত্তির কতকগুলা দলিল, দশ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ; আর এক দেরাজের মধ্যে রুষীয় চামড়ার পত্র-পেটিকা—একটা সাঙ্কেতিক তালা দিয়া তাহা বন্ধ রহিয়াছে।

চাকর ঘরে প্রবেশ করিয়া জানাইয়া দিল আলফ্রেড সাহেব আসিয়াছেন। চাকরের উত্তর আনিবার অপেক্ষা না করিয়াই অক্টেভের পুরাতন বন্ধু, ঘনিষ্ঠতার ভাবে ঘরের ভিতর হুড়মুড় করিয়া প্রবেশ করিল। আগন্তুক যুবাপুরুষ, মুখে একটা সরল দিল্-খোলা ভাব। যুবক কৌণ্টকে বলিল:—

"এই যে অক্টেভ, আজকাল কি করচ বলদিকি? তোমার হ'ল কি? তুমি বেঁচে আছ না মরেছ? কোথাও তোমাকে ত আর দেখা যায় না; তোমাকে লিখ্‌লেও ত উত্তর পাওয়া যায় না। দেখ আমার অভিমান করাই উচিত। তবে কিনা, বন্ধুত্বে আমি মান-অভিমানের বড়-একটা ধার ধারিনে, তাই তোমাকে দেখতে এলাম। বল কি হে! এক কালেজের সহপাঠী তুমি, তোমাকে কিনা এই অন্ধকেরে ঘরে বিষণ্ণ হয়ে মরতে দেব। তুমি পীড়িত—তোমার কিছুই ভাল লাগে না—এ সমস্তই

তোমার ভাই কল্পনা। তোমার মন ভাল করবার জন্যে, তোমাকে একটু আমোদ দেবার জন্যে তোমাকে জোর ক'রে একটা ভোজের নেমন্তন্নে নিয়ে যাব। সেখানে আজ খুব আমোদ-প্রমোদ হবে। আমাদের বন্ধু "য়্যাঘো"ও আসবে।"

অর্দ্ধ দুঃখ প্রকাশ ও অর্দ্ধ পরিহাসের স্বরে অক্টেভের বন্ধু অক্টেভ-দেহ কৌণ্টের নিকট এইরূপ বাক্য-বিন্যাস করিয়া ইংরেজের ধরণে কৌণ্টের হাত ধরিয়া সজোরে এক ঝাঁকানি দিল। কৌণ্ট তাঁহার জীবন-নাট্যে এখন যে ভূমিকাটি তাঁর অভিনয় করিতে হইবে, তাহার মর্ম্ম-ভাবটী ঠিক ধরিয়া লইয়া উত্তর করিলেন :—

"না ভাই, অন্য দিনের চেয়েও আমার যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়েছে। সেখানে যাবার মত আমার মনের অবস্থা নয়। আমি গিয়ে তোমাদেরও বিষণ্ণ করে তুলব,—তোমাদের আমোদের ব্যাঘাত হবে।"

অ্যাল্‌ফ্রেড দরজার দিকে অগ্রসর হইয়া বলিল,—"বাস্তবিক তোমাকে খুব ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে, মুখে ভয়ানক একটা ক্লান্তির ভাব প্রকাশ পাচ্ছে। আচ্ছা, তা হ'লে একটু ভাল হও—আর এক সময়ে দেখা যাবে। আমি তবে পালাই। বড় দেরী হয়ে গেছে। এতক্ষণে হয়ত তিন ডজন কাঁচা "অয়ষ্টার" ও এক বোতল খোক্কেন্‌ সুরা পার হয়ে গেছে। "য়্যাঘো" তোমাকে না দেখতে পেয়ে খুবই দুঃখিত হবে।"

এই আগন্তুকের আগমনে কৌণ্টের বিব্রতা আরও বৃদ্ধি পাইল ;—চাকরটা তাঁকেই মনিব ঠাওরাইয়াছে। অ্যাল্‌ফ্রেড তাঁকেই বন্ধু ভাবিয়াছে। এখন কেবল একটা প্রমাণ বাকী। এই চূড়ান্ত প্রমাণ। দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল। একটি মহিলা—মাথায়-বাঁধা ফিতায় জরির সূতা মিশ্রিত এবং দেয়ালে যে-ছবিখানি ঝুলিতেছে সেই ছবির সঙ্গে আশ্চর্য্য সাদৃশ্য—ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন এবং পালঙ্কে উপবিষ্ট হইয়া কৌণ্টকে বলিলেন :—

"কেমন আছিস্‌রে অক্টেভ ! চাকর বলছিল, কাল তুই খুব দেরীতে বাড়ী এসেছিস্ ; আর ভয়ানক দুর্ব্বল অবস্থায়। বাছা, তোর শরীরের একটু যত্ন করিস। কেন তুই এত বিষণ্ণ হয়ে থাকিস্, আমার কাছে ত কিছুই খুলে বলিস্‌নে, তোকে দেখলে আমার বুক ফেটে যায়।"

অক্টেভ-দেহ ওলাফ্ উত্তর করিলেন :

"ভয় নেই মা, ও কিছুই গুরুতর নয় ; আজ আমি অনেকটা ভাল আছি।"

এই কথায় অক্টেভ-জননী আশ্বস্ত হইলেন। তিনি জানিতেন তাঁর পুত্র একাকী থাকিতে ভাল বাসে। বেশীক্ষণ কেহ তাহার নিকট থাকিয়া তার নির্জ্জনতা ভঙ্গ করিলে তাহার ভাল লাগে না। তাই তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া প্রস্থান করিলেন।

বৃদ্ধা প্রস্থান করিলে,কৌণ্ট বলিয়া উঠিলেন, "আমি তবে নিশ্চয়ই অক্টেভ ; অক্টেভের মা আমাকে চিনতে পারলেন। তাঁর পুত্রের শরীরে এক অপরিচিত আত্মা বাস করছে—এটা ত তিনি মনে করলেন না। সম্ভবত চিরদিনের মতো আমাকে এই আবরণের মধ্যে বদ্ধ থাকতে হবে, অন্যের শরীরে আত্মা আবদ্ধ—আত্মার এ [illegible] অদ্ভুত কারাগার।

তথাপি কৌণ্ট ওলাফ লাবিন্‌স্কির অস্তিত্বকে, তাঁর কুলচিহ্নকে, তাঁর স্ত্রীকে, তাঁর ঐশ্বর্য্যকে জলাঞ্জলি দেওয়া, আর সামান্য এক গৃহস্থের অবস্থায় পরিণত হওয়া—এ বড়ই কঠিন। যে চামড়াটা এখন আমার গায়ে লগ্ন হয়ে আছে, সে চামড়াটা ছিঁড়ে একটি একটি করে, ওর প্রথম-অধিকারীকে আমি প্রত্যর্পণ করব। যদি আমি প্রাসাদে ফিরে যাই? না!—তাহলে অনর্থক একটা কেলেঙ্কারি হবে, দরোয়ান আমাকে দরজায় ধাক্কা মেরে ফেলে দেবে। আমি ত এখন রুগ্ন লোকের বস্ত্র পরে আছি। আমার দেহে এখন আর সে বল নাই। দেখা যাক্‌, অনুসন্ধান করা যাক, এই অক্টেভ কি-রকম করে জীবনযাত্রা নির্বাহ করত, আমার একটু জানা দরকার।" এইরূপ ভাবিয়া তিনি সেই পোর্টফোলিওটা খুলিতে চেষ্টা করিলেন। ছুঁইবামাত্র হঠাৎ স্প্রিংটা খুলিয়া গেল; কৌণ্ট উহার চামড়ার পকেট হইতে প্রথমে কতকগুলা কাগজ টানিয়া বাহির করিলেন, উহা ঘন-নিবদ্ধ ও সূক্ষ্ম লেখায় কালো হইয়া গিয়াছে—তাহার পর একটা চৌকো চর্ম্ম-কাগজের উপর ওস্ত নিপুণ হাতের না হইলেও, কৌন্‌টেস্ প্রাস্কোভি-লাবিন্‌স্কার একটা পেন্‌সিলে আঁকা ছবি আঁকা রহিয়াছে—ছবিটা অবিকল তাঁর মত—দেখিলেই চেনা যায়।

এই আবিষ্কারে কৌণ্ট একেবারে হত-বুদ্ধি হইয়া পড়িলেন। বিস্ময়ের পরেই একটা ভীষণ ঈর্ষার আবেগে তাঁহার সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল। কৌন্‌টেসের ছবি কেমন করিয়া এই অপরিচিত যুবকের গুপ্ত পত্র-পেটিকায় ঢুকিল? কোথা হইতে আসিল? কে চিত্র করিল? কে ইহাকে দিল? প্রাস্কোভি—যাঁকে তিনি দেবীর মত পূজা করেন, তিনি কিনা তাঁর স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিয়া এই জঘন্য গুপ্ত-প্রেমে লিপ্ত হবেন? যে রমণীকে এতদিন তিনি নিষ্কলঙ্ক ভাবিয়া আসিয়াছেন সেই রমণীর প্রণয়ীর শরীরের মধ্যে তার স্বামী কি না এখন কয়েদী? না-জানি এ কার নিষ্ঠুর পরিহাস! পতি হইয়া শেষে কি আবার তাঁকে প্রণয়ী হইতে হইবে। এ কি ভীষণ দশা-বিপর্য্যয়! এ কি হাস্যজনক ওলট-পালট! পতি ও প্রণয়ী একাধারে!

এই সকল কথা তাঁর মাথার ভিতর গুন্‌ গুন্‌ করিতে লাগিল; তাঁহার মনে হইল, যেন তাঁর বুদ্ধি লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছে, তিনি খুব জোর করিয়া আপনাকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিলেন। চাকর খবর দিল, আহার প্রস্তুত; তিনি সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া, থর থর কাঁপিতে কাঁপিতে ঐ গুপ্ত পত্র-পেটিকাটা তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে লাগিলেন।

পত্রগুলা একপ্রকার মনস্তত্বঘটিত দৈনিক-লিপি বলিলেও হয়—বিভিন্ন কালের লেখা। কখন বা লেখা হইয়াছে—কখন বা লেখা বন্ধ করা হইয়াছে। ইহার কতকগুলি টুক্‌রা নিম্নে দেওয়া যাইতেছে—কৌণ্ট উদ্বেগপূর্ণ কৌতূহলের সহিত এইগুলা যেন গিলিতে লাগিলেন:—

"সে কখনই আমাকে ভালবাসবে না—কখনই না, কখনই না!

তার চোখের দৃষ্টি এমন কোমল, কিন্তু ঐ কোমল দৃষ্টির মধ্যে সেই নিষ্ঠুর কথাটি

আমি পাঠ করেছি—যার চেয়ে কঠোর কথা আর নাই—যে কথাটি কবি দান্তে তাঁর বিষাদপুরের তোরণ-দ্বারের উপর লিখে রেখেছেন,—"সব আশা ত্যাগ কর।" আমি কি করেছি যে ভগবান জীবন্ত অবস্থাতেই আমাকে নরক ভোগ করালেন? কাল, পরশু, চিরদিন এই একই ভাবে চল্‌বে! তারকামণ্ডলের মধ্যে পরস্পর পথ কাটাকাটি হতে পারে, নক্ষত্রে নক্ষত্রে যোগ করে পুটলি পাকিয়ে যেতে পারে, তবু আমার অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন হবে না।

সেই রমণী আমার স্বপ্ন শূন্যে বিলীন করে দিয়েছে; এক চকিতে আমার কল্পনার ডানা ভেঙ্গে দিয়েছে। যত মিথ্যা অসম্ভব সব একত্র হয়েও আমাকে একটা সুযোগ করে দিচ্ছে না; ভাগ্যপাশায় কত লোকের কত ভাল ভাল দান পড়ছে—হায়! আমার অদৃষ্টে একটিও পড়ল না!"

"আমি হতভাগ্য, আমি বেশ জানি স্বর্গের দ্বারদেশে আমি মূঢ়ের মত বসে আছি, আমি নীরবে অশ্রুপাত করচি—উৎসের সহজ ধারার মত অবিরত চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরচে। আমার সে সাহস নেই যে এখান থেকে উঠে গিয়ে কোন গভীর অরণ্যে প্রবেশ করি!"

"কখন কখন রাত্রে যখন নিদ্রা হয় না আমি প্রাস্কোভিকে ধ্যান করি; যদি নিদ্রা আসে,—প্রাস্কোভিকেই স্বপ্নে দেখি; আহা ফ্লরেন্‌স্ নগরে সেই বাগান-বাড়ীতে তাকে কি সুন্দরই দেখাচ্ছিল! সেই শুভ্র পরিচ্ছদ, সেই সব কালো ফিতা—একাধারে চিত্ত-বিমোহন ও মরণ-শোক-সূচক। শুভ্রতা তাঁর খাঁটী, শোকের বর্ণটা আমার জন্য! কখন কখন ফিতাগুলা বাতাসে নড়ে গিয়ে ও একত্র মিলিত হয়ে সেই সাদা জমির উপর 'ক্রস' আকারে গড়ে উঠছিল; কোন অদৃশ্য আত্মা আমার হৃদয়ের মৃত্যু উপলক্ষে যেন খুব আস্তে আস্তে আমার অন্ত্যেষ্টি মন্ত্র পাঠ করছিলেন।"

"কি অদৃষ্টের ফের! আমি ইস্কিয়ায় যাব মনে করেছিলাম, যদি যেতাম তাহলে তাঁর সঙ্গে দেখা হত না। আমি ফ্লরেন্সে থেকে গেলাম,—তাঁকে দেখলাম,—আর সেই দেখাই আমার কাল হল।"

"আমার মরণ হলেই ভাল। কিন্তু জীবিত থাক্‌তে থাক্‌তেই তার নিঃশ্বাসের সঙ্গে আমার নিঃশ্বাস যদি একটিবার মেশাতে পারি—ওঃ! সে কি অনির্ব্বচনীয় আনন্দ! না, না, তাহলে আমি যে নরকস্থ হব। পরলোকে গিয়ে তাঁর ভালবাসা পাব—সে সম্ভাবনাও তাহলে আর থাক্‌বে না। তাহলে সেখানে আমাদের পৃথক হয়ে থাকতে হবে। তিনি থাক্‌বেন স্বর্গে—আমি থাক্‌ব নরকে। একথা মনে হলে, একেবারে অভিভূত হয়ে পড়তে হয়!"

"যে রমণী আমাকে ভালবাসে না, সেই রমণীকেই আমায় ভালবাসতে হবে, এ কেমন কথা? কত কত রূপসী এর আগে তাদের মধুর মুখের মধুরতম হাসি ঢেলে আমার হৃদয় হরণ করবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু তবুও আমার হৃদয় হারাই নি। আর এখন? আহা সে কি ভাগ্যবান, যে তার পূর্ব্ব-জন্মের সুকৃতি ফলে এই নিরুপমা ললনার প্রেম লাভ করে ধন্য হয়েছে।"

আর বেশী পাঠ করা অনাবশ্যক।

প্রাস্কোভির পেন্‌সিলে আঁকা ছবিখানি প্রথম দেখিয়া কৌণ্টের মনে যে সন্দেহের উদ্রেক হইয়াছিল, এই গোপনীয় লেখাগুলার প্রথম দুই ছত্র পড়িবামাত্র সে সন্দেহ দূর হইল। তিনি বুঝিতে পারিলেন, প্রেমাসক্ত যুবক তাঁর ছবি আঁকিয়া নিরাশ প্রেমের অক্লান্ত ধৈর্য্য সহকারে, আসলের অভাবে এই নকলকেই তার প্রেমাঞ্জলি অর্পণ করিতেছে। এই ক্ষুদ্র গুহ্য দেবালয়টিতে "ম্যাডোনা"কে স্থাপনা করিয়া, নতজানু হইয়া, নিরাশ হৃদয়ে তাঁহারই পূজা-অর্চ্চনায় নিযুক্ত রহিয়াছে।

"কিন্তু যদি এই অক্টেভ, আমার শরীর অপহরণ করিবার জন্য, এবং আমার শরীর ধারণ করিয়া প্রাস্কোভির প্রেম আকর্ষণ করিবার জন্য সয়তানের সঙ্গে চুক্তি করিয়া থাকে?"

কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীতে এইরূপ অনুমান অসম্ভব মনে করিয়া এই অনুমানটিকে কৌণ্ট শীঘ্রই মন হইতে দূর করিয়া দিলেন।

এমন অসম্ভব কথা তিনি বিশ্বাস করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন মনে করিয়া তিনি একটু হাসিলেন। তাঁর চাকর যে খাবার রাখিয়া গিয়াছিল, ঠাণ্ডা হইয়া গেলেও তাহাই আহার করিলেন। আহারান্তে পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া গাড়ী আনিতে বলিলেন। গাড়ীতে উঠিয়া ডাক্তার বালথাজার-শেরবোনোর গৃহে উপনীত হইলেন। গৃহে প্রবেশ করিয়া সেই সব কক্ষের মধ্য দিয়া চলিতে লাগিলেন যেখানে গত রাত্রে কৌণ্ট ওলাফ লাবিন্‌স্কির নামেই প্রবেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু সেখান হইতে যখন বাহির হইয়া আসেন তখন সকলেই তাঁকে অক্টেভের নামে অভিবাদন করিয়াছিল। ডাক্তার তাঁর দস্তুরমত, পিছন দিকের শেষ-কামরায় পালঙ্কে উপবিষ্ট ছিলেন। হাতের মধ্যে পা-টা রাখিয়া গভীর চিন্তায় যেন নিমগ্ন।

কৌণ্টের পদশব্দ শুনিয়া ডাক্তার মাথা উঠাইলেন।

"আঃ! অক্টেভ, তুমি? আমি তোমার ওখানেই যাচ্ছিলাম; কিন্তু রোগী আপনা হতেই ডাক্তারকে দেখতে এল—এটা শুভ লক্ষণ বলতে হবে।"

কৌণ্ট বলিলেন—

—"অক্টেভ, অক্টেভ, অক্টেভ—ক্রমাগতই অক্টেভ! আমার এমন রাগ ধরচে—আমি দেখছি পাগল হয়ে যাব!" তাহার পর বাহুর উপর বাহু রাখিয়া ডাক্তারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। এবং ভীষণভাবে এক দৃষ্টিতে তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন।

"বালথাজার-শেরবোনো, আপনি ত বেশ জানেন আমি অক্টেভ নই, আমি কৌণ্ট ওলাফ-লাবিন্‌স্কি। আপনিই গত রাত্রে এইখানেই বাহুমন্ত্রে আমার শরীর অপহরণ করেছিলেন।"

এই কথা শুনিয়া ডাক্তার উচ্চৈঃস্বরে হাঃ! হাঃ! করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, হাসিতে হাসিতে বালিশের উপর উল্টিয়া পড়িলেন এবং হাস্যাবেগ থামাইতে পারিতেছেন না এইভাবে দুইহাতে পার্শ্বদেশ ধরিয়া রহিলেন।

"ডাক্তার তোমার এই আনন্দের উচ্ছ্বাসটা একটু কমিয়ে আনো, নৈলে পরে না ত অনুতাপ করতে হবে। আমি সত্য বলচি, পরিহাস করিনে।"

—"তাহলে ত আরো খারাপ, আরো খারাপ! তবে তারা প্রমাণ করছে, আমি যে তোমার চেতনশক্তি-হীনতা ও অকারণ বিষণ্ণতার চিকিৎসা করছিলাম, সেটা ঠিক নয়। আর কিছু না, এখন কেবল চিকিৎসাটা বদ্‌লাতে হবে, এইমাত্র!"

কৌণ্ট, শেষবেলায় দিকে অগ্রসর হইয়া বলিয়া উঠিলেন—"তোমার গলা টিপে কেন যে তোমাকে এখনো মারি নি, আশ্চর্য্য।

কৌণ্টের এই ভয়-প্রদর্শনে ডাক্তার ঈষৎ হাস্য করিলেন; তারপর, একটা ছোট ইস্পাতের ছড়ির প্রান্তভাগ কৌণ্টের গাতে ছোঁয়াইলেন;—কৌণ্টের শরীরে একটা ভয়ানক ঝাঁকানি লাগিল, মনে হইলে যেন তাঁর হাতটা ভাঙিয়া গেছে। ডাক্তার মাথায় ঠাণ্ডা জল ঢালিবার মত একটা ঠাণ্ডা রকমের স্থির দৃষ্টি কৌণ্টের উপর নিক্ষেপ করিলেন,—সে দৃষ্টিতে পাগলরা বশীভূত হয়, সে দৃষ্টিতে সিংহ একেবারেই ধরাশায়ী হইয়া পড়ে। এইরূপ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া ডাক্তার তাঁকে বলিলেন:—

"দেখ, রোগী অবাধ্য হয়ে বেঁকে দাঁড়ালে, তাকে সিধা করবার উপায়ও আমাদের হাতে আছে। বাড়ী ফিরে যাও, বাড়ী গিয়ে স্নান কর,—অতি-উত্তেজনায় মাথা গরম হয়েছে,—ঠাণ্ডা হবে।"

কৌণ্ট বৈদ্যুতিক আঘাতে বিহ্বল হইয়া ডাক্তারের গৃহ হইতে বাহির হইলেন। তাঁর সংশয় ও ভাবনা আরো বাড়িল।

এই বিষয়ে পরামর্শ করিবার জন্য, ডাক্তার B……এর বাড়ী গিয়া উপনীত হইলেন। এবং ঐ প্রসিদ্ধ ডাক্তারকে বলিলেন:—

"আমি এক অদ্ভুত বিভ্রম-বিকারে আক্রান্ত হয়েছি, আমি যখন আয়নায় মুখ দেখি, তখন আমার মুখের স্বাভাবিক অবয়ব-গুলো তাতে দেখতে পাই না। আমি যে সব পদার্থে বেষ্টিত থাকতাম সে সব পদার্থ বদ্‌লে গেছে। এখন আমার ঘরের দেয়াল-গুলোও আমি চিন্‌তে পারি না, আস্‌বাব-গুলোও চিন্‌তে পারি না। আমার মনে হয় আমি যেন সে আমি নই—আমি যেন অন্য লোক!"

ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন:—

"তুমি আপনাকে কি-রকম দেখ বল দেখি? ভ্রমটা চোখ থেকেও উৎপন্ন হতে পারে, মস্তিষ্ক থেকেও উৎপন্ন হতে পারে।"

—"আমি দেখতে পাই, আমার চুল কালো, চোখ নীল, মুখ ফ্যাকাশে,—আর দাড়িতে ঘেরা।"

—"ছাড়-পত্রে যে রকম কোন লোকের মুখের বর্ণনা থাকে, তোমার বর্ণনাটা তার চেয়ে সঠিক দেখ্‌চি।

তোমার বুদ্ধি-বিভ্রমও হয় নি, দৃষ্টি-বিভ্রমও হয় নি। তুমি আসলে যা,—ঠিক্ তাই আছ।"

"কিন্তু না,—তা নয়! আমার আসলে কটা চুল, চোখ কালো, রং রৌদ্র-দগ্ধ আর আমার গোঁফ হঙ্গারী দেশের লোকের মত সরু করে' ছাঁটা।"

ডাক্তার উত্তর করিলেন:—"এইখানেই বুদ্ধি-বৃত্তির একটু বদল দেখছি।"

—"যাই হোক ডাক্তার, আমি পাগল নই, বেশ জেনো। একটুও না।"

ডাক্তার উত্তর করিলেন :—"নিশ্চয়ই। যাদের বুদ্ধি-বিবেচনা আছে তারাই কেবল আমার এখানে আসে। একটু দৈহিক শ্রান্তি, একটু অতিরিক্ত পড়াশুনা, কিংবা অতিরিক্ত আমোদ-প্রমোদ থেকে এই অসুখটা ঘটেছে। তুমি ভুল করচ আসলে,—তুমি যা চোখে দেখচ তাই বাস্তব আর যা মনে ভাবচ—সেইটেই কাল্পনিক। ফর্সা রঙের দেশে তুমি আপনাকে শামলা দেখচ; কিন্তু তুমি আসলে শামলা, কল্পনা করচ তুমি ফর্সা।"

"—সে যাই হোক্, আমি যে লাবিনস্কির কৌণ্ট ওলাফ, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই—কিন্তু কাল-থেকে সবাই আমাকে সাবিলের অক্টেভ বল্‌চে।"

ডাক্তার উত্তর করিলেন :—

"—আমি ত ঠিক তাই বলেছিলাম। তুমি আসলে সাবিলের অক্টেভ, কিন্তু মনে করচ তুমি লাবিনস্কির কৌণ্ট। আমার স্মরণ হচ্চে, আমি কৌণ্টকে দেখেছি;—তাঁর রং ত ফর্সা। আয়নায় যে তুমি অন্য মুখ দেখ্‌তে পাও, তার কারণ ত বেশ বোঝা যাচ্চে। তোমার এই আসল মুখের সঙ্গে, তোমার মনোগত কাল্পনিক মুখের মিল হচ্চে না বলেই তুমি বিস্মিত হয়েছ।—এই কথাটা বিবেচনা করে' দেখ না, সবাই তোমাকে অক্টেভ বল্‌চে; সুতরাং তোমার নিজের বিশ্বাসের কথায় ভুলো না। দিন পনেরো আমার এইখানে থাক :—স্নান বিশ্রাম, বড় বড় গাছের তলায় পায়চারি করলেই তোমার এই মনের বিকারটা কেটে যাবে।"

কৌণ্ট মস্তক অবনত করিয়া, অঙ্গীকার করিলেন, আবার তিনি আসিবেন।

ডাক্তারের কথায় অগত্যা বিশ্বাস করিলেন।

কৌণ্ট তাঁর আবাস-গৃহে ফিরিয়া গিয়া হঠাৎ দেখিলেন, টেবিলের উপর, কৌণ্টেস্ লেবিনস্কার নিমন্ত্রণ-পত্র রহিয়াছে—ঐ পত্রখানাও পূর্বে অক্টেভ ডাক্তার শেরবোনোকে দেখাইয়াছেন। কৌণ্ট বলিয়া উঠিলেন :—

"এই যাদু-কবচটা সঙ্গে নিলেই, তাঁর সঙ্গে দেখা হতে পারবে।" (ক্রমশঃ)

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অতীত

তবলা বোল্‌হীন, সেতার হারা তার,
ভাঙিয়া পড়ে আছে কয়নি সারা আর।
বাদক বুড়া আহা, শকতি অবসান,
বাহিরে বসে আছে সুমুখে উপাধান।
ঘুরেছে পানাহেতে আলাপে ছায়ানট,
মানসে খুলে তার মোহিনী মায়াপট।
ভাঙিয়া গেছে বাজা গিয়াছে আঁত ঘুম,
নিকটে আসে আজি সে যা চেনা ঘুম।

ভুলে সে যায় যবা ভুলে সে যায় কাল,
আপন উপাধানে থাবে সে দেয় তাল।
রাগিণী উঠে নাক, বুকেতে পায় লয়,
প্রাণের খেলাভূমে ভাবের ঢেউ বয়।
কেহবা হাসে দেখে, কেহবা চলে যায়,
যেহ সে সুর স্মরি 'আহা' 'হা' বলে যায়।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

জানিবিঘা শিলালিপি

পূর্ব্ব ইতিহাস—১৯১৪ সালের নবেম্বর মাসে, পাটনা কলেজের "প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধান সমিতির" এক বিশেষ অধিবেশনে শ্রীমান্ মহেন্দ্রপ্রসাদ সিংহ নামক জনৈক ছাত্র গয়া-জিলার জানিবিঘা গ্রামে প্রাপ্ত একখানি শিলালিপির উল্লেখ করেন। "সরস্বতী" নামক হিন্দী মাসিক পত্রের ১৯১৬ সালের অক্টোবর মাসে শ্রীযুক্ত হরিরামচন্দ্র দিবেকর নামক লেখক শিলালিপির প্রতিলিপি সহ এক প্রবন্ধে উহার পরিচয় প্রদান করেন। শিলালিপির এই প্রতিলিপি দেখিয়া ও বিবরণ পাঠ করিয়া যাহাতে উহা পাটনা যাদুঘরে আনীত হয় তজ্জন্য যাদুঘরের অধ্যক্ষের নিকট আমি আবেদন করি। তিনি গয়ার কালেক্টরের নিকট এ জন্য পত্র দিলে শিলালিপির স্বত্বাধিকারী, জানিবিঘার মোহন্ত মহাশয় উহা দিতে অস্বীকার করেন। কিছু দিন পরে আমি যাদুঘরের কিউরেটর বা অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হইলে আমাদের পূর্ব্বোক্ত ছাত্র শ্রীমান্ মহেন্দ্রপ্রসাদ ও তাঁহার পিতৃদেব উক্ত মোহন্ত মহাশয়ের প্রিয় শিষ্য শ্রীযুক্ত বাবু মুকুটধারী সিংহ উহা প্রদানের জন্য মোহন্ত মহাশয়কে অনুরোধ করেন। মুকুটধারী বাবুর অনুরোধে মোহন্ত মহাশয় উহা দিতে প্রস্তুত হন। কিন্তু কিউরেটর স্বয়ং উপস্থিত না হইলে উহা দিবেন না বলায়, আমি জানিবিঘায় যাইয়া উহা গয়ায় আনয়ন করিয়া গয়ার কালেক্টরের হস্তে উহা পাটনায় প্রেরণের জন্য রাখিয়া আসি। দুঃখের বিষয় রেলযোগে প্রেরণকালে কালেক্টরের নাজীরের অসাবধানতায় উহা দ্বিখণ্ড হইয়া যায়। তবে সুখের বিষয় এই যে, উহা দ্বিধা বিভক্ত হইলেও লিপিপাঠের কোন অসুবিধা হয় নাই।

স্থান-পরিচয়—জানিবিঘা গ্রাম গয়া জিলায় অবস্থিত এবং উহা বোধ-গয়ার ছয়-মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত। এই গ্রাম জানিবিঘার মোহন্তগণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং পরিপুষ্ট। প্রায় শত বর্ষ পূর্ব্বে বংশী ভারতী নামক মূলতান-বাসী এক ব্যক্তি অযোধ্যায় আসিয়া নাগেশ্বর মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। বুধরাম ভারতী নামে তাঁহার এক শিষ্য ছিলেন—এই বুধরাম ভারতীই জানিবিঘা গ্রামের প্রতিষ্ঠাতা।

বুধরাম তীর্থ-পর্য্যটনকালে বোধগয়ায় আগমন করেন। তথা হইতে তিনি বোধগয়ার পাঁচমাইল পূর্ব্বে অবস্থিত গাকা নামক গ্রামে গমন করেন। গাকা তখন গভীর জঙ্গলাবৃত ছিল। বুধরাম তপশ্চারণ-মানসে এই জঙ্গলে কাষ্ঠ-নির্ম্মিত একটী উচ্চগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া গৃহের ঊর্দ্ধ-তলে বাস করিতেন—তাঁহার শিষ্যবৃন্দ গৃহ-তলে থাকিতেন। প্রচলিত কিংবদন্তী এই যে, বুধরাম ভারতীর তপশ্চারণ-কালে জাহুরিয়া নামে এক জিন (মুসলমান ভূত) তাঁহার শিষ্যদিগকে নির্য্যাতন করিতেন। বুধরাম এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া নিজেই একদিন গৃহের তলদেশে জিনের জন্য অপেক্ষা করিতে

লাগিলেন এবং জিনের আবির্ভাব হইলে মন্ত্রবলে তাঁহাকে পরাজিত করিলেন। ফলে জিন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া তত্রস্থ জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া বুধরামের জন্য মঠ নির্ম্মাণ করিল; বুধরামও আবুমিয়ার নামানুসারে গ্রামের নাম রাখিলেন জানিবিঘা।

বুধরাম ভারতী বোধগয়ার তৎকালীন মোহন্ত রাঘনীল মোহান্তের মন্ত্রগুরু ছিলেন। টিকারীর তৎকালীন মহারাজ মিত্রজিৎ সিংহও ভক্তি-প্রণোদিত হইয়া বুধরামকে কয়েকখানি গ্রাম প্রদান করেন। মিত্রজিৎ সিংহ প্রায় ৮০ বৎসর পূর্ব্বে টিকারী-অধিপতি ছিলেন—জানিবিঘা গ্রাম এ হিসাবে আধুনিক।

শিলালিপি-আবিষ্কার—আলোচ্য শিলালিপিখানির এক প্রান্ত মৃত্তিকার বাহিরে অনেকদিন হইতেই দেখা যাইত; কিন্তু, গ্রামবাসিগণের কুসংস্কার-হেতু উহা আর খনন করা হয় নাই। প্রায় চারি বৎসর পূর্ব্বে মোহন্ত মহাশয় স্বয়ং উহা খুঁড়িয়া বাহির করেন। সর্ব্বপ্রথমে পূর্ব্বোল্লিখিত "সরস্বতী" পত্রিকায় উহার বিবরণ প্রকাশিত হয়; তৎপরে শ্রীযুক্ত কাশীপ্রসাদ জয়-সোয়াল ও ৺ হরনন্দন পাণ্ডে শিলালিপি সম্বন্ধে বিহার ও উড়িষ্যার প্রত্নতত্ত্বানু-সন্ধান সমিতির ১৯১৮ সালের পত্রিকায় এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেন। কিন্তু, দুঃখের বিষয় তাঁহারা শিলালিপি প্রাপ্তি সম্বন্ধে বিশেষ কোন কথাই উল্লেখ করেন নাই। শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার এম-এ, মহাশয় "ইণ্ডিয়ান য়্যাণ্টিকোয়ারী"তে ১৯১৯ সালের এপ্রিলমাসে শিলালিপির পুনরালোচনা করেন।

দুঃখের বিষয়, বঙ্গবিজয় সম্বন্ধীয় ভ্রম-অপনোদন সম্বন্ধে এই শিলালিপিখানি অত্যাবশ্যক হইলেও, বঙ্গভাষায় কেহ ইহার আলোচনা করেন নাই। আমরা অব্যবসায়ী,—এ সম্বন্ধে বঙ্গীয় প্রত্নতত্ত্ব-বিশারদগণের দৃষ্টি আকর্ষণার্থ সে সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ লিখিতে প্রয়াসী হইয়াছি। তবে অষ্টাদশ অশ্বারোহী যে বঙ্গবিজয় করেন নাই, এ দুরপনেয় কলঙ্ক-অপনোদনে যে এই শিলালিপি যথেষ্ট সহায়তা করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

শিলালিপির মূল্য—'সরস্বতীর' লেখক মহাশয় বলিয়াছেন যে, ঐতিহাসিক হিসাবে ইহার কোন মূল্য নাই। কিন্তু তাঁহার এই মন্তব্য পরবর্ত্তী লেখকগণ স্বীকার করেন নাই। মিনহাজ লিখিত সপ্তদশ অশ্বারোহী কর্ত্তৃক বঙ্গবিজয়ের কাহিনীর সহিত এই শিলালিপির যথেষ্ট সম্পর্ক রহিয়াছে। এই শিলালিপি হইতে প্রমাণ হয় যে, বিহারের অনেকাংশেও সেন-রাজগণের আধিপত্য ছিল এবং বক্তিয়ার-পুত্র মুহম্মদের তথা-কথিত বঙ্গ-বিজয়ের পরেও সেনবংশীয় বুদ্ধসেন-পুত্র জয়সেন গয়ার পার্শ্ববর্ত্তী ভূভাগে রাজত্ব করিতেন।

শিলালিপি—যে প্রস্তরখানিতে শিলা-লিপি উৎকীর্ণ রহিয়াছে, উহা ৩ফিট ১½ ইঞ্চি উচ্চ, ১½ ইঞ্চি প্রস্থ এবং ৬ইঞ্চি পুরু। শিলালিপি ১৯ ইঞ্চি দীর্ঘ এবং ইহার প্রস্থ ৭½। লিপির ঊর্দ্ধে বোধিবৃক্ষের তলদেশে বজ্রাসনাসীন ভূমিস্পর্শ মুদ্রা বুদ্ধ-মূর্ত্তি। লিপির তলদেশে, ঐ বংশীয় কেহ শিলালিপির শাসনস্থ আদেশ অমান্য করিলে গর্দ্দভের ঔরসে ও শূকরীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবে, এইরূপ অভিশাপের কথা চিত্রিত রহিয়াছে। সাক্ষীস্বরূপ বুদ্ধমূর্ত্তির উভয় পার্শ্বে সূর্য্য ও চন্দ্র অঙ্কিত রহিয়াছেন।

. বজ্রাসন ও তৎসংলগ্ন মঠের ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্য সপ্তঘাটার অন্তর্গত কোট্টখল গ্রাম সিংহল-দেশীয় ভিক্ষু মঙ্গলস্বামীকে বুদ্ধসেন পুত্র, পিথিপতি রাজা জয়সেন কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইল শিলালিপির ইহাই উক্তি।

প্রথম পংক্তি। ওং স্বস্তি॥ শ্রীমন্মহা-বোধিপুরং পুরাণং পরম্পং

দ্বিতীয় পংক্তি। রীণং নিয়তং জিনানাং। হাদ্ধবন্দিতানাং স্থিতি—

তৃতীয় পংক্তি। স্বস্তি বজ্র সংবোধয়ে বোধিতরোস্তলং চ॥

চতুর্থ পংক্তি। শ্রীমদ্বজ্রাসনায় স্থলজল সহিতঃ কোট্টখ।

পঞ্চম পংক্তি। লা গ্রাম এষ আচন্দ্রার্কং প্রদত্তস্তদধিবসত—

ষষ্ঠ পংক্তি। যে মঙ্গল স্বামিভিক্ষোঃ। হস্তে শ্রীসিংহলস্য .

সপ্তম পংক্তি। ত্রিপিটক-কৃতিনঃ শাসনী-কৃত্য রাজ্ঞা নির্ব্বা—

অষ্টম পংক্তি। জঃ সপ্তঘট্টে হলকর-কলিতো বুদ্ধসেনাত্মজেন—

নবম পংক্তি। (ন)। সত্তো দানমিমং গ্রামং জয়সেন স ভূপতিঃ।

দশম পংক্তি। (শ্রী) শ্রী পতিরত্রাচোর্য্য চ র্যাঃ সত্যাবাধচঃ। বংশে

একাদশ পংক্তি। মদীয়ে যদি কোপিভূপঃ শিষ্টোঽথবা দুষ্টত—

দ্বাদশ পংক্তি। রো বিনষ্টঃ। ব্যতিক্রমং চাত্র করোতি তস্য স্তা—

ত্রয়োদশ পংক্তি। চঃ খরঃ শূকরিকা চ মাতা॥ লক্ষ্মণ—

চতুর্দ্দশ পংক্তি। সেনস্যাতীতরাজ্য সং ৮৩ কার্ত্তিক শুদি।*

শিলালিপির অর্থ—ওং স্বস্তি। আমি

---

* শিলালিপি-পাঠে মত-ভেদ।

প্রথম পংক্তি। মহাবোধিপুরং—হরনন্দন পাণ্ডে মহাবোধিপ্রবরং পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। পুরং পাঠই প্রশস্ত। শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার ও দিবেকর মহাশয়দ্বয় পুরংই গ্রহণ করিয়াছেন। প্রবরং করিলে অর্থের বিভিন্নতা হয়। পরম্পং—পরম্প হইবে।

দ্বিতীয় পংক্তি। দিবেকর মহাশয় হাদ্ধবন্দিতানাম্—স্থলে তুষ্টিস্থিতানাং করিয়াছেন। তুষ্টি পাঠ আদৌ গ্রহণীয় নহে। দিবেকর মহাশয় লিখিয়াছেন যে, তিনি এই শব্দের পাঠোদ্ধার করিতে পারেন নাই।

পঞ্চম পংক্তি—'লা' কে দিবেকর মহাশয় পা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

অষ্টম পংক্তি—জো স্থলে উক্ত লেখক ত্যাগ করিয়াছেন।

নবম পংক্তি—সত্তো মূল শিলালিপিতে সত্তো থাকিলেও ইহা দত্তো হওয়া উচিত ছিল। দিবেকর মহাশয় দত্তো পাঠ করিয়াছেন।

দশম পংক্তি—দিবেকর মহাশয় আচার্য্যং করিয়াছেন।

একাদশ পংক্তি—পাণ্ডে মহাশয় ভূপঃ লিখিয়াছেন—ইহা মুদ্রাকর-প্রমাদ বলিয়া মনে হয়।

ত্রয়োদশ পংক্তি—শিলালিপিতে শূকরিকা রহিয়াছে।

চতুর্দ্দশ পংক্তি—পাণ্ডে মহাশয় রাজ্য করিয়াছেন। শিলালিপিতে রাজ্যে রহিয়াছে। শিলালিপিতে শুদি রহিয়াছে, শুদি হইবে।

সম্মানীয়, প্রাচীন, পূজনীয়, যে মহাবোধিপুরে, সম্বোধিকামী জিনগণ সর্ব্বদা বোধিবৃক্ষমূলে বাস করেন, তাঁহাদিগকে অভিবাদন করি। সপ্তঘাটার অন্তর্গত স্থলজল ও চলকর সহিত এই কোটিখলা গ্রাম, বিনা সঙ্কোচে যতদিন চন্দ্রসূর্য্য থাকিবেন, ততদিন সম্মানীয় বজ্রাসনে, ত্রিপিটকাভিজ্ঞ সিংহল দেশীয় ভিক্ষু মঙ্গলস্বামীর বাসের জন্য, বুদ্ধসেন পুত্র, রাজা কর্ত্তৃক শাসনদ্বারা প্রদত্ত হইল। সত্যবাদী ও শিখিপতি, আচার্য্য রাজা জয়সেন এই গ্রাম প্রদান করিয়া বলিলেন যে, "আমার বংশের শিষ্ট, দুষ্ট অথবা দুশ্চরিত্র কোন রাজা ইহার ব্যতিক্রম করিলে তাহার পিতা অশ্বতর ও [illegible]তা শূকরী হইবে।"

লক্ষ্মণ সেনাব্দের ৮৩ বৎসরের কার্ত্তিক মাসের শুক্লপক্ষের পঞ্চদশ দিবসে (ইহা প্রদত্ত হইল)।

শিলালিপি-পাঠে মত-ভেদ—আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, ইতি-পূর্ব্বে তিনজনে এই লিপি উদ্ধার করিয়াছেন। তিনজনেরই মধ্যে কিছু কিছু ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। আমরা পাদটীকায় তাহা উল্লেখ করিয়াছি।

শিলালিপি-উল্লিখিত কয়েকটী শব্দ—

সপ্তঘট্ট—জামিবিঘার মোহন্ত মহাশয়কে আমি এই সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছিলেন যে, বৈদ্যনাথ প্রভৃতি স্থানে যে সকল ঘাটোয়াল আছেন, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ তীর্থযাত্রিগণের নিরুপদ্রবতার জন্য দায়ী থাকিতেন এবং তজ্জন্য তাঁহারা নিষ্কর ভূমি ভোগ করিতেন। "ঘাটী আগলাইবার" কথা [illegible] বার। মোহান্ত মহাশ[illegible] তন্নিকটবর্ত্তী তীর্থস্থানে [illegible] সাতটী [illegible] ছিল এবং তাহা হইতেই [illegible] এই [illegible] অভিহিত হইয়াছে।

ওয়ারেন্ নামক আমে[illegible]বাসী লেখক লিখিয়াছেন যে, সুজাতার পায়সান্ন গ্রহণের সময়ে, বুদ্ধ নিরঞ্জনে অবগাহন করেন। এই স্থান 'সপ্ততীর্থ' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ("Buddhism in Translation") এই সপ্ত-তীর্থের সহিত সপ্তঘটের কোন সম্পর্ক থাকিতে পারে কি?

পীঠী-পতি—পীঠী যে কোন্ জনপদ ছিল সে সম্বন্ধে যথেষ্ট মত-ভেদ দৃষ্ট হয়। ডাক্তার ষ্টেনকোনো মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত পিঠপুরকে পীঠী বলিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ইহাকে বর্ত্তমান ত্রিহুত বলিয়াছেন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন, "A place named Pithaghatta is mentioned in an ancient geographical work called *Desavali*...The addition of the word ghatta probably means that this place was situated on the Ganges." (*The Palas of Bengal*: Page 87) অর্থাৎ দেশাবলী নামক একখানি প্রাচীন ভৌগোলিক গ্রন্থে পিঠঘাট্টা নামক একটী স্থানের উল্লেখ আছে। ঘাট্টা শব্দ-সংযোগে প্রতীয়মান হয় যে, এই স্থান গঙ্গাকূলে অবস্থিত ছিল। এ সম্বন্ধে আমার যৎকিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। বিক্রম-শিলা বিশ্ববিদ্যালয়, ভাগলপুরের অন্তর্গত

'কজঙ্গলী নামক স্থানে অবস্থিত বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। সেই স্থানটী "পাথরঘাটা" বলিয়া পরিচিত। এই "পাথরঘাটার" সহিত দেশাবলী-উল্লিখিত "পিথঘাট্টা"র কোন সম্পর্ক আছে কি না? পাথরঘাটা গঙ্গাতীরেই অবস্থিত। পিথঘাটার অপভ্রংশ কি পাথরঘাটা হইতে পারে না? বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত পালরাজগণের যথেষ্ট সংস্রব ছিল। ৺কৃষ্ণনন্দন পাণ্ডে মহাশয় পিথিকে মগধ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। আমাদেরও তাহাই মনে হয়।

বুদ্ধসেন পুত্র রাজা জয়সেন—বুদ্ধসেনের পূর্ব্বে রাজা শব্দ প্রযুক্ত হয় নাই বলিয়া শ্রীযুক্ত জয়শোয়াল মনে করিয়াছিলেন যে বুদ্ধসেন রাজত্ব করেন নাই। কিন্তু শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার মহাশয় প্রমাণ করিয়াছেন যে, বুদ্ধসেনও সেনবংশীয় নরপতি ছিলেন।

উপসংহার—আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, শিলালিপির পাঠোদ্ধারে আমরা অব্যবসায়ী, কিন্তু বঙ্গ ইতিহাস-সম্বন্ধীয় এই শিলালিপিখানি অত্যাবশ্যক এবং ঠিক তিন বৎসর পূর্ব্বে ইংরাজী-অভিজ্ঞ পাঠকগণের গোচরীভূত হইলেও, গভীর দুঃখের বিষয় যে বঙ্গভাষায় এ-সম্বন্ধে কোন আলোচনা হয় নাই। আমাদের ভরসা আছে যে শিলালিপি-পাঠে কৃতী রাখাল দাস বাবু ইহার বিস্তৃত ও সঠিক পাঠোদ্ধার করিয়া আমাদের কৌতূহল নিবৃত্তি করিবেন।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার।

ছোট মা

সুব্রত বৌদির পা ছুঁইয়া বলিল,—না বৌদি, আমি ও কথা শুনবনা। আমার সনৎকে মেরেছে, আর আমি চুপ করে থাকব! এই জন্তেই বৌদি, আমি বলেছিলাম—আমার ও-সব ছাইয়ে আর কাজ নেই। দুধ দিয়ে সাপ পুষে সে সাপের কামড় নিজেকেই খেতে হবে, এ আমি আগেই জানতাম—। বৌদি তাহার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন,—ছি ঠাকুরপো, ও কথা বলো না। ছোট বউ শুনলে কি মনে করবে। সে যে কি ভাল,—তুমি তাহলে এখনো তাকে চিনতে পারোনি!

সুব্রত রূঢ় কণ্ঠে বলিল, চের হয়েছে বৌদি। নিজে থেকে ঘরে সাপ ঢুকিয়েছ কি না, তাই তার বিরুদ্ধে কোন কথা তুমি শুনতে চাও না—তা হলে তুমিই যে তার দায়ী হবে!

বৌদি সুব্রতর হাত দু'খানি চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন,—না ঠাকুরপো, ও কথা তুমি কিছুতেই বলতে পাবে না। এমন লক্ষ্মীর প্রতিমাকে—কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে সনৎকুমার আসিয়া বলিল,—বাবা, এই দেখ, ছোট মা আজকে আমাকে [illegible] মেরে ফেলেছে—আমার দু' গাল [illegible]

সুব্রত হুকার দিয়া [illegible] আমার সুমুখ থেকে। [illegible] দুষ্টুমি করবি—কে তোকে [illegible]!

কি পাজী। খেলো হুমুখে দাঁড়িয়ে রইলি! যাবিনে? দাঁড়া—বলিয়া সুব্রত এমন সজোরে সনৎকুমারের গাল টিপিয়া ধরিল যে বালকের করুণ ক্রন্দনে ঘর যেন ফাটিয়া গেল!

বৌদি সুব্রতকে কোলে জাপটাইয়া ধরিয়া বলিলেন,—তুমি ক্ষেপেছ ঠাকুরপো!

সুব্রত তীব্র কণ্ঠে বলিল,—দুধ দিয়ে কাল সাপ পুষেছি, তাই তার প্রতিফল পাচ্ছি!

ছোট বৌ নিকটেই আসিয়াছিল; ঘোমটাটা ঈষৎ টানিয়া মৃদু হাসিয়া সে বলিল,—বাস্তু সাপকে শুধু পুষতে হয় না'ত—একে পূজো দিতেও হয় যে!

সুব্রত আরো রাগিয়া একেবারে নিজের ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িল। একটা প্রচণ্ড নিশ্বাস ফেলিয়া,—হ্যাঁ, ঠিকই ত, ঠিকই ত করেছি! গাল থেঁতো করে দিয়েছে বলে আমার মারলে ও কাঁদতে এল কেন! বেশ করেছি, তার গাল আরও থেঁতো করে দিয়েছি! সে জানে না, তার মা যেমন তার বিমাতা, তার বাপও তার তেমনি শত্রু।

ছোট বৌ আসিয়া অতি সহজ স্বাভাবিক স্বরে বলিল,—এখন আবার শুলে কেন? জল খাবার খাও'সে, ওঠ।

সুব্রত গম্ভীরভাবে উঠিয়া বসিল। ছোট বৌ জল খাবারের রেকাবিখানা টেবিলে রাখিয়া বলিল,—যাই আমি। নীচে আমার মেলা কাজ আছে। ছোট বৌ চলিয়া গেল।

সুব্রত বলিয়া উঠিল,—বাবে বৈ কি, ছোট বৌ! এখন কি সনতের মা আছে যে বসে বসে খাওয়াবে! ততক্ষণ তোমায় সংসারের দাস-দাসীর উপর খানিক প্রভুত্ব করা চল্‌বে! তারপর চেঁচাইয়া বলিয়া উঠিল,—ছোট লোকের মেয়ে! আমার সনৎ থাক্‌তে তুমি কর্‌বে তাদের উপর প্রভুত্ব!

ছোট বৌ আসিয়া দিদির পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল,—ঐ কথাটা, দিদি, আর একবার বল, একবারটি—তোমার পায়ে পড়ি! বলিয়া হাসিয়া সে বড়বৌয়ের গায়ে ঢলিয়া পড়িল। বড় বৌ তার গালটা টিপিয়া ধরিয়া বলিলেন,—আমি তোর হয়ে অত লাগি কেন, জানিস্, ছোট বৌ? পান্তা ভাত আর চচ্চড়ি দিয়ে একটা সাপ পুষে তোর ভাগের সমস্ত দুধটা আমরা নিজেই আত্মসাৎ করছি।

এমন সময় দুখে আসিয়া বলিল,—ছোট মা, আমি সনৎকে এবার তোমার ছেলে বলে কিছু বল্‌লাম না কিন্তু। সে আমার লাঠিটা নিয়ে রাঙী কুকুরটাকে মারতে গিয়ে কেন এসটা ভেঙে দিলে! ছোট বৌ ক্রুদ্ধ স্বরে বলিয়া উঠিল,—কে বলেছে রে দুখে, সনৎ আমার ছেলে? আমি ত এই সেদিন তোদের বাড়ী এলাম, তোদের চোখের সামনেই সনতের আপন মা মরে গেল! তুই তাকে যত পারিস্, মারিস্—কথাটা বলিয়াই ছোট বৌ দেখিল, সনৎ চোরের মত খিড়কীর দিকে পলাইতেছে—দেখিয়া ছোট বৌ একরকম লাফাইয়াই তার হাত দু'খানি ধরিয়া গিয়া নাকে বলিল,—দুষ্টু ছেলে, যাবি—যাবি, দুখের সঙ্গে ঝিয়ের ছেলের সঙ্গে আর খেলা কর্‌তে? এত করে বলেও তোর হায়া হল না! এই দেখি এত করে মারলুম! আবার আজ সেই কাজ! এই বলিয়াই সনতের পিঠে জোর করিয়া এমন একটা কিল মারিল যে সনৎ—মা গো বলিয়া বসিয়া পড়িল। ছো

বৌ গর্জ্জন করিয়া বলিল—মা থাক্‌লে কি তোর এত খোসার হয় রে ছুঁচো! যাকে তোর ডাক্‌বার হয়েছে কি! তাকে বরং আমিই ডাক্‌ব—কি তার এত শত্রুতা করে-ছিলুম যে চলে গিয়ে আমার এই মাথার উপর এক মহা কর্ত্তব্যের বোঝা চাপায় সে। এত কি তার বাদ সেধেছিলুম যে—তুই যাবি মরে, যা—আমি তা' নিয়ে খুন-খুটি করে মরতে যাই কেন। বড় বৌ আগাইয়া আসিয়া ছল ছল চোখে ছোট বৌয়ের চিবুকখানি ধরিয়া বলিয়া উঠিলেন,—ছোট বৌ, তোর হাতে সনৎ পড়বে, সনতের মা—সতী সাবিত্রী বুঝি তা জান্‌তে পেরেছিল—তাই সে নিশ্চিন্তে অত শীঘ্র মায়ার সংসার থেকে সরে যেতে পেরেছে!

হঠাৎ এমন সময় সুব্রত সেখানে আসিয়া তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলিল—সুখে, তোর ছোট মা ত ঠিক কথাই বলেছে। কেন, এত দিনও কি জান্‌তিস্ নে তুই লক্ষ্মীছাড়া, যে তোর ছোটমা সনতের নিজের মা নয়। তাই তার কাছে তুই ছেলের আবদারের দাবী করতে গেছিস্? যা—আমি তোকে একটা আরাম লাঠি দেব এখন।

সুখে বাবুর একটা ভাল লাঠি পাইবে শুনিয়া হাসিমুখে চলিয়া গেল। সুব্রত তখন রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল,—এই ত চাই! পাপ যখন করেছি—তার প্রায়শ্চিত্তও করতে হবে বৈকি! বিধাতার তা হলে আমার দিকে মোটেই দৃষ্টি নেই বলব যে! ভাল কাজ করে তার সুফল লাভ করে যখন শান্তি পাই, তখন বুঝি, ঈশ্বর আছেন। আর মন্দ কাজ করে যদি তার সুফল প্রত্যাশা করি, তাহলে মনে সন্দেহ হবে, হয়ত বিধাতার আমি ত্যাজ্য পুত্র—তাই মন্দর দিকে বয়ে গেলেও ভগবান তা' ভ্রূক্ষেপ করেন না। বড় বৌ আসিয়া বলিলেন,—ভাই, সেই জন্যেই ত ছোট বৌ আমাদের বড় আদরের বউ! ছোট বৌ চায় সনৎকে একটি হীরের টুকরো করতে। সুখের সঙ্গে খেলা করা নিয়ে ত এই দু'দিন হল, সে সনৎকে মেরে ভুলো-খোলা করে দিলে। আবার ভাই! চোখের সামনে সনৎকে মন্দর দিকে একচুল এগুতে দেখলেই ছোট বৌ খড়্গ-হস্ত হয়। এটা কি সে মন্দ করে সনতের!

সুব্রত বলিল,—হয়েছে বৌদি! তুমি ছোট বৌকে নিয়ে এসেছ, তুমিই তাকে নিয়ে থাক! আর যে, আয়—সনৎ তখন সেই দিকেই আসিতেছিল—সুব্রত সনৎকে কোলের কাছে টানিয়া বলিল—কেন, বড়বৌ, তুমি ত সে সময় উপস্থিতই ছিলে। আর আজ তার এত বড় আস্পর্দ্ধা হল!—কেন, ওটা মনে মনে পুরে রেখেও কি তার মনস্কামনা সিদ্ধ হচ্ছে না,—তাই সে স্পষ্ট করে আজ সনৎকে শুনিয়ে দিলে যে সে সনতের আপন-মা নয়! তাই ভাল, বড়বৌ—সনৎকে নিয়ে আমি তার আপন মার কাছে চলে যাই।

ছোট বৌ চীৎকার করিয়া বলিল,—কেন, তাকে আমি বকেছি, মেরেছি, তাই তাকে নিয়ে চলে যাওয়া হল। দিদি, তুমি অমন কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে রইলে যে! কেন—আমার কি তাকে বক্‌বার-মারবার কোন অধিকার নেই! সুখের গায়ে ত আমি এক-দিনও হাত তুলিনি। তুমিই বল, দিদি, যদি কোনদিন তোমার উপর কোন অপরাধ করে

থাকি, ক্ষমা কর। জোর করে যদি কোনদিন কোন কথা বলে থাকি, মার্জ্জনা কর।

বড় বৌ বলিলেন,—ছোট বউ, ও বাবে কোথায়? সনৎকে তোমার এখনি আবার নিয়ে এল বলে। সনৎ তোমার ছাড়া আর কাকেও জানে না যে বোন্!

ছোট বৌ কয়দিনে নরম হইয়া গেল। আস্তে আস্তে বলিল,—দিদি, তুমি তাকে এনে দাও, একবারটি এনে দাও, আমি তাকে আর কিছু বল্‌ব না। সত্যি বলচি। বড় বৌ মৃদু হাসিলেন। ছোট বৌ হঠাৎ পরক্ষণেই চেঁচাইয়া বলিল,—না, কেন। যে চলে গিয়েছে, তাকে জন্মের মত যেতে দাও। চোখের সাম্‌নে সে বয়ে যাবে, আর আমি শত্রুর মত দাঁড়িয়ে তাই দেখ্‌ব। কেন, আমি কি তার পর।—তাকে কিছু বল্‌তে দেবে না! এবার আসুক দেখি সে—এমন করে পা ভেঙ্গে দেব যে সে কেমন 'তু' করে ডাকলেই ওঁর সঙ্গে—ছোট বৌ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিল,—সনৎ আমার ছেলে,—সাধ্য কার তাকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়। দিদি, তুমি তাকে বলে এসো—শীগ্‌গির আস্‌বে ত আসুক, নইলে মেরে তার হাড় ভেঙ্গে দেব!

বড় বৌ আঁচল দিয়া চক্ষুপ্রান্ত মুছিলেন, মনে মনে বলিলেন,—সনৎ, আজ তুই চেয়ে দেখ্—তুই কেমন মা পেয়েছিস্। তারপর ছোট বৌয়ের হাত দু'খানি ধরিয়া তিনি বলিলেন,—ছোট বৌ, এই তিন দিন না যেতে যেতেই এমন অধীর হয়ে পড়েছ!

ছোট বৌ সগর্জ্জনে বলিল,—বয়ে গেছে! শত্রুর গিয়েছে, ভালই হয়েছে—আমি ত তাই-ই চেয়েছিলুম। তিন দিন! তিন যুগের মত থাক্ সে—আমি ত তাই চাচ্ছি।

বড় বৌ অধীর হইয়া উঠিলেন, দেখিলেন,—ছোট বৌয়ের সেই মুখ, সেই হাসি,—যা' এই কয় বৎসর হইতেই তিনি দেখিয়া আসিতেছেন—সে মুখ, সে হাসি যেন কেমন হইয়া আসিতেছে। বড়বৌ বলিলেন,—কেন, কি হয়েছে ছোট বৌ, সনৎকে সে নিয়ে যেতে পার্‌লে—আর তুমি তা সহ্য করতে পার্‌বে না। বিমাতা হয়ে এত দরদ কেন। কিসের জন্যে।

বাঘ যেমন তার শিকারের উপর লাফাইয়া পড়ে, ছোট বৌও তেমনি বড় বৌয়ের পায়ের উপর পড়িয়া বলিল,—দিদি, এ কথা তোমরা যদি এতদিন মনে মনে বলিয়ে রেখেছ ত আমাকে ঘুণাক্ষরে একদিনও তা জান্‌তে দাওনি কেন! ও:, এতক্ষণে বুঝেচি! তাই ত, আমি বিমাতা বই নই! কি জানি, যদি আমি সনৎকে মেরে ফেলি,—তাই তাকে সরিয়ে নিয়ে গেল!

বড় বৌ অপ্রতিভ হইলেন। ছোট বৌ বলিল,—হ্যাঁ, আমি যা' শুন্‌তে চেয়েছিলুম—তাই—এতদিনে তাহ তুমি শুনিয়ে দিলে!—বলিয়া সবেগে পাশের ঘরে গিয়া খাটের উপরে বালিশে মুখ গুঁজিয়া পড়িল।

* * *

সুব্রত ভগ্নকণ্ঠে বলিল,—ছোট বৌ, অমন অভি-মানী হয়ো না। এই দেখ, সনৎ—তাকে তুমি মেরেছিলে—তাকে তুমি বকেছিলে—তবু সে তোমারই কাছে ছুটে এসেছে। ওঠো, তাকে তুমি একবারটি কোলে নাও। সনৎ বলিল, —নাও, ছোট মা,

আমাকে দাও। বাবা আমাকে মাসীর বাড়ী নিয়ে গিয়েছিল, সেখানে আমাকে বিকেলে খেতে দিত না। দাও ছোট মা, আমার লেবেনচুস বার করে দাও। ছোট বৌয়ের তখন বিকার। চীৎকার করিয়া সে বলিয়া উঠিল,—আমি বিমাতা বই, নই। ভালই করেছে তাকে নিয়ে গিয়েছে। দেখি, কে তার আপন-মার কাছে আগে যায়।

সুব্রত দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—ছোট-বৌ, দেখ, সনৎ ক্ষিদে পেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সনৎ বলিল,—মা ওঠো, বাক্স থেকে খাবার দাও। মাথার শিওরে বাক্স ছিল, ডালা খুলিয়া সনৎ বলিল,—বাবা দেখ, ছোট মা আমার জন্যে কেমন সাজিয়ে রেখেছে। মাসিমা কিছু রাখে না। সুব্রত একটু ঝুঁকিয়া বাক্সর মধ্যে দেখিল, থরে থরে খাবার কত সাজান, ভাঁজে ভাঁজে সনতের পোষাক-পরিচ্ছদ, থাকে থাকে সনতের ছবির বই। সে এ বাক্স কোন দিন খুলিয়া দেখে নাই। চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল,—ছোট বৌ, একদিনও কোন কথা শোন নি—কলকাতার মাসীর বাড়ীতে প্রতি রবিবারে তোমার যাওয়া কেউ রোধ করতে পারে নি। তুমি সেখানে যেতে যেতে, এখন বুঝচি। কলিকাতা হইতে আনীত সেই লেবেনচুস্ সেই বাদাম, বিস্কুট—সেই ছবির বই—রাজেশ্বর বাবু প্রতি সপ্তাহে যাহা বাড়ী আসিয়া সনতের জন্য সনতের ছোটমার বরাতী ছোট বৌয়ের হাতে তুলিয়া দিয়া গিয়াছেন, সেগুলির দিকে তাকাইয়া টস্ টস্ করিয়া সুব্রতর চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। সনৎ বলিল,—ছোট মা, বাবা আমার খাবারে চোখ দিচ্ছে। বাবা, তুমি অমন করে চোখ দিও না। ছোট মা আমার রোজ ঘরের মধ্যে আমাকে কত কি খাইয়ে মুখ মুছিয়ে মাথায় ফুঁ দিয়ে তবে বাইরে যেতে দিত; কাউকে বলতে বারণ করত; খাবারের দিকে চাইলে লোকে চোখ দেবে, বলত। বাবা, কেন মার অসুখ হয়েছে বলে তুমি চোখ দিচ্ছ। দাঁড়াও, মা আগে ভাল হোক্, মাকে আমি বলে দেব।

শেষ রাত্রে পাগলের মত চীৎকার করিয়া সুব্রত বলিল,—ডাক্তার বাবু, কেন তবে এতদিন পড়েছিলে, যদি একটি প্রাণই না ফিরিয়ে দিতে পার।—আমার সব শেষ ডাক্তার বাবু—বড়বৌকে সুব্রতর উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে বলিয়া ডাক্তার চলিয়া গেল।

শ্মশান হইতে কেঁধোরা যখন "বল হরি—হরিবোল" বলিয়া বাড়ী ফিরিল, সনৎ তখন ছুটিয়া আসিয়া বড়বৌয়ের কোলে মাথা রাখিয়া কাঁদিতে লাগিল। সুব্রত সেখানে আসিয়া বলিল,—বড়বৌ, মাথা নীচু করে কেঁদে কেঁদে ও কি প্রার্থনা করছে, বড় বৌ? চোখ মুছিয়া গদগদ কণ্ঠে বড় বৌ বলিলেন,—"কি করছে! বোধ হয়, ও প্রাণ-পণে হরিকে ডেকে বলছে,—হরি, জন্ম-জন্মান্তরে যেন ছোট মার মতই মা পাই।"

শ্রীরবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

লেখার ইতিহাস

আমাদের দেশে লেখার প্রচার কবে হইল, ইহা এক মহা সমস্যারূপে ইতিহাস-মহলকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া রাখিয়াছিল, আজও সে সমস্যা পূরণ হয় নাই। না হইবার কারণও বিস্তর রহিয়াছে। পৃথিবীর মানদণ্ড-স্বরূপ এই ভারতীয় সভ্যতা কখন্ প্রথম অভ্যুদিত হইয়া উঠিতেছিল, তাহার খবর এ যুগে পৌঁছবে কি করিয়া? কবি কালিদাস হিমালয়কে বলিয়াছেন, 'পৃথিব্যা ইব মানদণ্ডঃ।' এই মান-দণ্ডের সৃষ্টি, রচনা, ক্রম-বর্দ্ধন ও ক্রমোন্নতি একমাত্র বিশ্ব-বিধাতার নেত্রে উদ্ভাসিত, এক আদিম সৃষ্টিরঙ্গ মানুষের চক্ষে অনবগুণ্ঠিত হইয়া ধরা দিতে আসিবে, ইহা কাহারও ইচ্ছা হইতে পারে কি? হিমাদ্রি-অঙ্গের রূপ কখন কাঞ্চন-জঙ্ঘার স্বর্ণ-উত্তরীয়ে আবৃত হইল, কখন নভোমণ্ডল-স্পর্শী শির এভারেষ্টে পরিণত হইল, এই সব জল্পনা বড় সুন্দর কিন্তু ইহা প্রত্যক্ষীভূত হইবার অপেক্ষা রাখে না। আমার ইচ্ছা হয়, সমস্ত ভারতীয় সভ্যতাকে একটী পূর্ণ অবয়ব দিই—ইচ্ছা হয় ভারতের সাধনাকে একটী যুগযুগান্তের স্থায়ী মূর্ত্তিতে গড়িয়া তুলি। তাহা হইলে দেখিতে পাইব যেমন আকাশের মেঘ-রাজ্য গলিয়া বিশ্ব-বর্ষণে ঢলিয়া পড়ে, সেইরূপ আমাদের ভারতীয় সভ্যতা গলিয়া গলিয়া হিমাদ্রির হিমধারায় ক্ষীর হইয়া, কাল-পুরুষ হিমালয়ের জটাজুটের মধ্যে অলকানন্দা-রূপে ঠাঁই পাইয়াছে—এ অলকানন্দার ধারা জাহ্নবী-মুখে আজও আর্য্যাবর্ত্তের বুক ভাসাইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে।' পৃথিবীর বয়স মাথায় করিয়া হিমালয়ের জটায় পাক ধরিয়াছে। আমাদের শিয়রে দাঁড়াইয়া পৃথিবীর আদিম পুরুষ আজ মৌন নির্ব্বাক। ভারতীয় সভ্যতা মন্থনদণ্ডে মথিত করিয়া হিমালয়, আপনার মাঝে সব সংযোগ করিয়াছেন, তার পর সমাধিস্থ হইয়াছেন। সমাধি-মগ্ন ভোলানাথ সংসার ভুলিয়াছেন, তাই আমরা ভূতের অন্ধ-গুহায় অলি-গলি ঘুরিয়া বৃথাই পথ খুঁজিয়া মরিতেছি।

বাস্তবিক ভারতীয় সভ্যতার জন্মকাহিনী পৃথিবীর প্রথম বয়সের সঙ্গে বিজড়িত, সেই সভ্যতার স্তর পর্ব্বতের স্তরের মত এই বিংশ শতাব্দীর বুক পর্য্যন্ত নামিয়া আসিয়াছে। ইতিহাস-রাজ্যে সে স্তর-পরম্পরার খোঁজ যে শৃঙ্খলাবদ্ধরূপে মিলে নাই, তাহা না বলিলেও চলে; যতটুকু মিলিয়াছে, ততটুকুও বিচ্ছিন্ন। ছিন্ন মালিকাদাম হইতে কয়েকটী ফুলের সন্ধান মিলিয়াছে, বাকীগুলি কোথায় পড়িয়াছে তাহার কিনারা হয় নাই; যেগুলি পাওয়া গিয়াছে, তাহারও শ্রেণী সংখ্যা জানা যায় নাই। কোন্ ফুলের পর কোন্ ফুল আসিবে, বেলীর সঙ্গে চম্পক বসিবে, না চম্পকের সঙ্গে অপরাজিতা বর্ণবৈচিত্র্যের বাহার ফুটাইবে, এত খুঁটিনাটি পারিপাটিরূপে জানিবার সুযোগ কোথায়? কালের মহা-তরঙ্গ হইতে যে ফুলদল পাওয়া গিয়াছে, তাহাই যথেষ্ট, এই সভ্যতার ফুলসাজ লইয়া ঐতিহাসিক সমাজে বিধি-ব্যবস্থা অনেকদিন

চলিয়াছে। ভারতীয় সাধনার যদিও পুঁথি মিলিয়াছে, কলম মিলে নাই, কালির ত আভাসও পাওয়া যায় না, কাগজের কথা ত একেবারেই অজ্ঞাত! চাঁদ বসিয়াছিলাম, অনেক স্তর আঁখির অগোচরে রহিয়া গিয়াছে, অনেক ফুল সূতা ছিঁড়িয়া লুটিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু ঐতিহাসিক সুদূর অতীতের স্বপ্ন লোককে এই সব ভাসিতে দিতে একান্ত নারাজ, কারণ ঐতিহাসিকের লক্ষ্য হইয়াছে প্রাচীনকে নবীনের ঘরে আনিয়া দেওয়া। ইতিহাস লেখক চাহেন, অতীতের জীবনকে বর্ত্তমানের জীবনের সঙ্গে মিশাইয়া দিতে, আদি যুগকে বর্ত্তমানের বুকে বসাইতে। ভগীরথ শিবের জটা হইতে গঙ্গা আনিয়া দেশ-দেশান্তরে নগরে কান্তারে সে সুরধুনী-স্রোত চিরতরে বহাইয়া লইয়া গিয়াছেন, ইতিহাস লেখক চাহেন অতীতের জীবন-ধারাকে তেমনি ভাবে মানব-হৃদয়ে ভাগীরথীর মত চির-স্রোতস্বিনী, চির-কল্লোলিনী করিতে। ঐতিহাসিকের এ স্বপ্ন বড় মধুর, বড় বিস্ময়! বেদের সভ্যতার খোঁজ পাওয়া গেল, বৈদিক যুগ-রচনার সাড়া পড়িয়া গেল, বেদের সমাজ অল্পে অল্পে ফুটিতে লাগিল। ভারতীয় সভ্যতার চিত্র-অঙ্কণে জর্ম্মণ গুরু পথ দেখাইলেন, ফরাসী ও ইংরাজের দেশেও এক আলোচনার ধূম পড়িয়া গেল। আজ পর্য্যন্ত সে সভ্যতার এক অঙ্ক বই দুই অঙ্ক উদ্ঘাটিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না, বাকি অঙ্কগুলি যবনিকার নিটোল বেষ্টনে অবলুপ্ত রহিয়াছে। কিন্তু সভ্যতার বিকাশ রচনায় আত্ম-ঘর হইতে আরম্ভ হইয়াছে, রচনার ভিত্তি লেখার পদ্ধতি। মসী ও লেখনী এই লেখাপদ্ধতির যুগল সারথি আর রচনা-পত্র হইয়াছে রথ। সারথি পরিচালিত রথ বেদের যুগে কেমন করিয়া চলিয়াছিল, তারপর কেমন করিয়া সেই লেখার রথ ব্রাহ্মণ ও দর্শনের যুগ বহিয়া বৌদ্ধ ভারতে আসিয়া উপনীত হয়, তাহার ইতিহাস কি উপন্যাসের চেয়ে চিত্তাকর্ষক নয়? বৌদ্ধ যুগ হইতে লেখনী সারথি হইয়া রথকে কোন্ পথে চালাইয়াছিল, ভারতের অঙ্গনে অঙ্গনে কোথায় সে রথ থামিয়াছিল, মৌর্য্য, শক, গুপ্ত সাম্রাজ্যের উপর সে রথ কোন্ ছন্দে নৃত্য করিয়াছিল, তাহা জানিবার ঔৎসুক্য কি আমাদের হয় না? সেই লেখার ইতিহাস আলোচনার অবকাশ করিয়া লইব। লেখার সঙ্গে জ্ঞানবিকাশের পূর্ণ সম্বন্ধ, তাহা কি অস্বীকার করিবার উপায় আছে?

লেখার ইতিহাস-আলোচনায় ঐতিহাসিকেরা সভ্যতার স্তর-পরম্পরা ধরিয়া বিচার-তর্ক করিবার সুযোগ পান নাই—কারণ বহু স্তর অদৃশ্য হইয়াছে, ভারতের ইতিহাস বৌদ্ধ যুগ হইতেই ফুটিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহার পূর্ব্বের ইতিহাস নাই, কেবল beacon light এর মত সভ্যতার মুকুটমণি পুস্তকরাজি পাওয়া গিয়াছে। কাজেই বৌদ্ধযুগের পূর্ব্বে ইতিহাস সম্বন্ধে কোন কথা বলা কঠিন এবং যতটুকু পারা যায় সেটুকুও অনুমান-সাধ্য। বেদের রচনা-কাল খৃঃ পূঃ ২০০০-১৫০০; এই সময়ে বেদ রচিত হয়। কিন্তু রচনা প্রণালী সম্বন্ধে এক মহা সমস্যা য়ুরোপীয় পণ্ডিতবর্গকে পাইয়া বসিয়াছে। তাহার কারণ এই যে বেদের রচনা Revelation হইতে, বাল্মীকির রামায়ণ রচনা-চক্রের মত যে বৈদিক ঋষিরা আসনস্থ হইয়া দোয়াত কলম

ও কাদি এই ত্রয়ী সাহায্যে বেদ-ত্রয়ী রচনা করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহারা মানিতে বাধ্য নহেন। শ্রুতি স্মৃতি, যাহা শ্রুতি যাহা শুনা গিয়াছে তাহাই স্মৃতিতে রাখিতে হইবে। ইহাই বেদমন্ত্রের মূল ও মন্ত্রের ব্যবহার ধারণা। এইরূপ ব্যবস্থা দৃষ্ট হয় না যে আধুনিক শিক্ষার মূল মন্ত্র 'লেখা পড়ার' মত অর্থাৎ লেখা ও পাঠ উভয়-সংযোগে বিদ্যা অর্জন করিতে হইবে, তখনও বিদ্যার্থীর জন্য কাগজে খড়ি দিয়া কলমের সাহায্যে লিখিতে হইবে। পরন্তু গুরুর নিকট শিক্ষা শুধু আবৃত্তি করিতে শিখিত। য়ুরোপীয় ধারণায় ইহাই বেদের যুগের 'লেখা পড়া', অর্থাৎ পড়া লেখা নহে। বেদ রচনা অবধি স্মৃতি-গত থাকিয়া এক যুগ হইতে অপর যুগে চলিয়া যাইত, সে সময় লেখার পথ ছিল না, শুধু স্মৃতির বাহনে বেদের জ্ঞান-সমুদ্র মানব-শিশুর হৃদয়কন্দরে জাগিতে থাকিত। বৌদ্ধ ইতিহাসের নায়ক Rhys Davids এই লেখার অভ্যুদয়-কাল বৌদ্ধযুগে স্বভাবতঃই আনিয়া ফেলিতে চাহেন। তাঁহার Buddhist Indiaতে তিনি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, ভারতবর্ষের যাহা কিছু গৌরবের, যাহা কিছু প্রশংসনীয় সকলই প্রায় বৌদ্ধ উত্থান-কাহিনীর সঙ্গে বিজড়িত। এই লেখার মূল বৌদ্ধ-যুগের সঙ্গে বদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু একটা pan-Buddhism সভ্যতার অপর স্তর-গুলিকে যে স্তিমিত সে স্তিমিতেই রাখিয়া দেয় তাই আজিকালিকার দিনে বোধ হয় pan-Brahmanism-এর প্রয়োজন। কারণ বৌদ্ধ ঐতিহাসিকদের কৃপায় বৌদ্ধ ইতিহাস মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে Pan-Buddhism-এর ফলে আমরা অপূর্ব্ব সামগ্রী পাইয়াছি, এ মহাসত্যের তুলনা হয় না। বৌদ্ধ ধর্ম্মের আলোর রথ যে দিন হইতে যে পর্যন্ত যে যে দেশের উপর ছুটিয়া চলিয়াছিল, সেই সময়ের ইতিহাস আলোক-দীপ্ত হইয়া আজ আমাদের নয়নের মণি হইয়াছে। যত ঐতিহাসিকের বৌদ্ধ দক্ষ। তাই বলিতেছিলাম, এবার pan-Brahmanism এর প্রয়োজন, তবেই আমরা হারানিধি খুঁজিয়া পাইব। হারানিধির অন্বেষণ জীবনের ব্রত করিয়া লইলে তবে ব্রতীর সাফল্য লাভের সম্ভাবনা, এবং সেই সফলতার দীপ্তিতে ভারত ইতিহাসের যে যে কোণে আলোক-পাত হইবে, সেই সেই অন্ধ জ্যোতি-কল্লোলিত হইয়া পৃথিবীর বুকে একটা মহা আলোর বন্যা বহাইয়া তুলিবে।

বেদের যুগে কিরূপ লেখা পড়া ছিল তাহা অনুমান করা সহজ সাধ্য নয়। আজি কালিকার দিনে ইহা একরূপ ঠিক হইয়াছে যে বৈদিক যুগে Brahmi-script প্রচলিত ছিল, ব্রাহ্মী অক্ষরের সংখ্যা ও নমুনা বহু বিবেচনাধীন। প্রফেসার Buhler বলিয়াছেন, এই ব্রাহ্মীলিপিই ভারতীয় সভ্যতার মূল-বাহন, এই ব্রাহ্মী বর্ণই সারথি-পরিচালিত হইয়া বেদের যুগ হইতে বরাবর বৌদ্ধযুগ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়াছিল, তৎকালে সে রথ কতক সময় গতিহীন হইয়া আবার পূর্ণ বেগে ভারতের নগরে প্রান্তরে ছুটিয়া চলিতে পারিয়াছিল। খৃঃ পূঃ ৫০০ অব্দে এই ব্রাহ্মী লিপি রীতির এক মহা পরিবর্ত্তন আসিল, তাহার কথা বলিবার পূর্ব্বে লেখা সম্বন্ধে দু'এক কথা বলা প্রয়োজন। Buhler এর মতে Brahmi script-এ 500 B. C. পর্য্যন্ত ২২টী অক্ষর

ছিল, সে অক্ষরের নমুনা এবং লিখন প্রণালী কিরূপ তাহার বিশদ বর্ণনা পাওয়া যায় না। তবে এইটুকু স্থির যে পাঙ্ক্তি রচনা বাম দিক হইতে ডাহিনে (left to right) চলিত, এই লিপি পদ্ধতি পূর্ব্বকার শেষ ধাপায় পরিলক্ষিত হয়। এখন কথা হইতেছে যে ২০০০ B.C হইতে ৩০০ B.C পর্য্যন্ত এই Brahmi script কোন প্রয়োজনে ব্যবহৃত হইত? যদি এই script এর ব্যবহার হইত তবে লেখার ধারাবাহিক ইতিহাস ছিল, বলিতে পারে। কিন্তু ঐ যে যুগ উঠিয়াছে স্মৃতি ভিন্ন শাস্ত্র ছিল না, বেদ বা পরে যে শ্রুতির শব্দগুলি লিপিবদ্ধ হইতে পারে নাই, কারণ যাহা Revelation, যাহার Remembrance ছাড়া গত্যন্তর আছে কি? শ্রুতির বাহন যদি স্মৃতিই হইল, তবে আর লেখ-পদ্ধতির কি প্রয়োজন? ব্যক্তিক অক্ষরের রূপ না জানিয়া ভাষার ব্যাকরণের বিচার না জানিয়া বেদের মত গ্রন্থ স্মৃতিশীল হইল কাহার উপর, বেদের গুরুগম্ভীর উদাত্ত অনুদাত্ত স্বরিত ছন্দ কণ্ঠে বিরাজ করিয়া কাহার উপর বাজিয়াছিল? কণ্ঠগানের কি পাশ ফোটে? একটা কথা মনে পড়িতেছে, সহস্র সহস্র উর্ম্মির ন্যায় সহস্র সহস্র শব্দ লইয়া ভাষা-সমুদ্র উত্তাল নৃত্য করিবার অবকাশ পায়, সহস্র শব্দ যোজনা-দ্বারা ভাষার শিল্পাকার সন্ধান করিয়া থাকে, কিন্তু অক্ষর বিহীন সে ভাষা হইলে মধুর ছন্দ কোথায় পাইব, সমুদ্রের বাণ কোথা হইতে আসিবে? নিরক্ষর লোকে কি চিন্তা করিতে পারে না? পারে। কিন্তু সে কত crude form এ, নিরক্ষরের মুখে কি কথা নাই? আছে। কিন্তু সে কত দায় সারা গোছের। বিশ্ব-রাগিণী লহরের পর লহর তুলিয়া অক্ষর-অংকিতের কণ্ঠ খোলবার অবকাশ পায় কি? আমাদের দেশের নিরক্ষর সমাজ যে শব্দ সমূহের কারবার করিয়া থাকে তাহার যে লেনা দেনা চালাইয়া থাকে, তাহার মূলধন কি তাহার আপনা হইতেই গড়িয়াছে? বিশ্বাস হয় না। যাহারা অক্ষর সমাজের গণ্ডি ঘিরিয়া গণ্ডীর সম্বন্ধে বাস থাকায় যে পরিমাণ শব্দ সংগ্রহ করে, তাহা তাহাদের পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে বহু রূপে বাড়িয়া যায়। Cultured circle এর ভাষার আমদানি করিয়া নিরক্ষর গরিবের অক্ষরের অভাব বোধ করে না। ৩২ অক্ষর অনভিজ্ঞ সমাজেও সুন্দর শব্দসমষ্টি পাওয়া যায়। যে দেশে নিরক্ষরের রাজত্ব, অক্ষরের লেশ মাত্রও নাই, এমন কাক-লাগা রাজ্যে চিন্তা স্রোত নাই, আছে কেবল বস্তু পরিচয়-জ্ঞান, তাহাও কত crude। এই বস্তু-জ্ঞান মাত্রক অক্ষরবিহীন শব্দ দ্বারা বেদ-রচনা সম্ভবপর অথচ আশ্চর্য্য নয় কি? আর একটা কথা মনে আসিতেছে যে, ভাষা-পন্থা, অক্ষর-পন্থা আমরা শৈশবে তাহার অক্ষর পরিচয় না পাইয়া চিন্তা করিবার অধিকার কি পাই নাই? অবশ্যই পাইয়াছিলাম। কিন্তু যাহা চিন্তা করিয়াছিলাম, তাহা বস্তু-পরিচয় ছাড়া আর বড় বেশী কিছু বলিয়া ত মনে হয় না। বস্তু-তত্ত্ব ছাড়াইয়া সত্য-ভাবতত্ত্বের কথা মনে করিতে পারিতাম না, ইহা সত্য, কিন্তু এখন অক্ষর পরিচয় হইয়া অবধি অজ্ঞাতসারে কখন হইতে আমরা সেই বস্তুচিন্তা পর্য্যন্ত

অক্ষর সংযোগে করিতেছি, তাহা আমরা বলিতে পারিব না। ঠিক আমাদের শৈশব-নিরক্ষর চিন্তা যাহা বস্তুতে উপগত হয়, তাবের রাজ্যের সীমানা মাড়াইতে একান্ত নারাজ সেই অক্ষর-বিহীন চিন্তা চিরজীবন নিরক্ষরের উপর ভর করিয়া থাকে, মহাভারতের তিন আখ্যানও তাহার নিজ হইতে করিবার অধিকার থাকে কি না সন্দেহ। কিন্তু বেদ কি? বেদ ত বস্তুতন্ত্রের পুঁথি নয়, ইহা মহাভারতের শব্দকল্পদ্রুম। এরূপ বেদ কি লেখা ব্যতীত প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে? এই বেদের যুগ কি সাগরের ঢেউএর মত হঠাৎ বাণ ডাকিয়া আসিয়া পঞ্চনদের তীরে উদয় হইয়াছিল, না, এই যুগ গড়িয়া উঠিতে বহু দিনের সাধনা ও তপস্যার প্রয়োজন হইয়াছিল? প্রফেসার Buhler প্রমুখ সুধীবর্গ এরূপ ধারণা করিতে যান নাই, কারণ তাঁহারা প্রমাণ লইয়া তবে কথা কহিবেন, প্রমাণ তাঁহাদের গুরু। Buhler ব্রাহ্মী লিপিকে national writing of India বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, এই script ২২টী অক্ষর লইয়া 500 B. C. পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে; কিন্তু এই সময়ে ব্রাহ্মী লিপির অক্ষর সর্ব্বশুদ্ধ ৪৬টীতে পরিণত হয়। বাদবাকী অক্ষরগুলি কোথা হইতে আসিল ইহার তথ্য Prof. Buhler সর্ব্বপ্রথম বাহির করিয়া ভারতীয় লিপির ইতিহাসে এক অভিনব অধ্যায় সংযোজনা করেন।

Northern Semitic বা Phœnician type-এ বিরচিত Mesa inscription হইতে এই অত্যাশ্চর্য্য লিপির প্রাথমিক ইতিহাস-সূত্র পাওয়া গিয়াছে। এই inscription Assyrian weight এর উপর লিখিত হয়। ইহার রচনার তারিখ 890 B. C.। Prof. Buhler দেখাইয়াছেন যে সেই সুদূর অতীতেও ভারতবর্ষীয় বণিক সম্প্রদায় বেবিলন ও এসিরিয়াতে বাণিজ্য অভিলাষে যাতায়াত করিত, এবং সেই বাণিজ্য ব্যাপার অবকাশে তাহারা মেসোপটেমিয়ার পথে ফিরিত। এই প্রত্যাবর্ত্তন পথে তাহারা যে লিপি-প্রথা Assyrian weight এ দেখিয়া আসিয়াছিল, তাহার নমুনা এবং অনুমান ২২টী অক্ষর লইয়া আসিয়া থাকিবে। ভারতীয় বণিক-সম্প্রদায় ৮০০ B. C. তে এই লিপি প্রথার সংকেত ভারতবর্ষে প্রচার করিয়া থাকিবে, এবং উহা হইতেই ভারতীয় ইতিহাসের লিপির অধ্যায় প্রথম সংযোজিত হইয়াছে। Prof. Buhler দেখাইতে গিয়াছেন যে Brahmi script এর সর্ব্বশুদ্ধ ৪৬টী অক্ষরের মধ্যে ২২টী অক্ষর Mesa inscription এর অক্ষরের মত, এবং ইহা হইতেই প্রমাণ হয় যে এই কয়টী Assyria হইতে ধার করিয়া লওয়া হইয়াছে। ভারতবর্ষ এইরূপে ২২টী অক্ষর আত্মসাৎ করিয়া লইল। খৃঃ পূঃ ৮০০ অব্দে বণিককুল-দ্বারা লিপি-প্রথা আনীত হইলেও, ইহা প্রায় 500 B. C. পর্য্যন্ত Brahmi Script এর অঙ্গে মিশিয়া যাইতে পারে নাই; কিন্তু এই মিল ঘটিয়াছে, প্রায় 500 B. C. তে। Buhler আরও দেখাইতে গিয়াছেন যে-দুইটী script ভারতবর্ষে এ পর্য্যন্তও চলিয়া আসিয়াছে, ইহার মধ্যে একটী Brahmi অপরটী Kharosthi, প্রথমটীর কথা এযাবৎ আলো-

চিত হইল, ইহার পরিধি ছিল উত্তর ভারতের সর্ব্বত্র, অবশ্য পঞ্চনদই মূল কেন্দ্র। খরোষ্ঠী গান্ধার রাজ্যে বসতি স্থাপন করিয়াছিল। Buhler বলিতে কসুর করেন নাই যে প্রথমোক্ত লিপি এদেশে সেনাপতিগণ এর বহু পূর্ব্ব হইতেই চলিত ছিল, তবে তাহার চলনে বড় বেশী জীবনী-শক্তির সঞ্চার তিনি দেখিতে পান নাই, কিন্তু শেষোক্ত লিপির সম্বন্ধে স্পষ্ট বলিয়াছেন, ইহা বরাবর Assyria হইতে ধার করা। এ দুইটী script এর লিখন-পদ্ধতি বিভিন্ন— Brahmi বাম দিক হইতে ডানে, আর Kharoshthi ডান হইতে বামে। প্রথমটী অবিকল সংস্কৃত পদ্ধতি। দ্বিতীয়টি আরবী পদ্ধতি। Buhler বলিয়াছেন যে খরোষ্ঠী লিপি শুধু গান্ধারেই প্রচলিত ছিল, কিন্তু ব্রাহ্মী লিপি ভারতের নিজস্ব হইয়াছিল। তাঁহার মতে ইহা national script, কারণ এই ব্রাহ্মী হইতেই ভারতের ভাষা সমূহের গঠন ও সংগঠন হইয়াছিল। Kharoshthi লিপির চিহ্ন ভারতে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। পরন্তু গুজরাটী, মারাঠী, হিন্দী, সিন্ধী, বাঙ্গলা, তামিল এই সব ভাষার কোষ্ঠীতে এক ব্রাহ্মীর অস্তিত্ব-রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে। Prof Buhler এর পরে অনেক বড় বড় ঐতিহাসিক আসরে জুটিয়াছেন, তাহারা Buhler এর মত লইয়া টানাটানি করিতে ছাড়েন নাই,— Isaac Taylor বলিতে চাহেন, ভারতীয় লিপিপ্রথা পুরাপুরি আরব দেশের southern Semites হইতে ধার করা। Buhler এর Northern Semites তাঁহার মনঃপূত হইল না। রয়েল এসিয়াটিক জর্ণালে (১৮৯৮) Mr. Kennedy এ-সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন তাহার মূল মর্ম্ম এই যে, সৌরাষ্ট্রের এক বণিক সম্প্রদায় অতি প্রাচীনকালে বেবিলনের সহিত অবাধ বাণিজ্য চালাইত, টাইগ্রিস্ হইতে পশ্চিম-ভারতের সমুদ্র-উপকূল পর্য্যন্ত বাণিজ্য-পথ সুগঠিত ছিল, এই পথেই ভারতের সহিত কেলডিয়া প্রদেশের লেনাপাওনার কারবার চলিত। এই ব্যবসায়ের আমদানী রপ্তানি সংযোগে বেবিলন রাজ্যের অক্ষরলিপি পণ্যশালার মধ্যে গণ্য হইয়া গিয়াছিল। যখন এ মাল আসিয়া ভারতের দ্বারে পৌঁছিল, তখনই লিপি প্রথার সূচনা হইল। সম্ভবতঃ এই সব বণিক দ্রাবিড় জাতীয় হইবে, কারণ তাহারা যে যে জিনিসের কারবার করিত, তাহাদের নাম সংস্কৃত বা পালি নহে, কিন্তু তামিল অভিধান খোঁজ করিলে ইহাদের সন্ধান মিলিতে পারে। কেনেডীর মত আবার Rhys Davids বদলাইতে বাধ্য হইয়াছেন। ভারতীয় লিপির মৌলিকত্ব বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ সন্দিহান, পূর্ব্ব পূর্ব্ব মতের ন্যায় তিনিও দেখাইতে চাহেন যে ভারতবর্ষে এ প্রথার উদ্ভব হয় নাই, ভারতবর্ষ একটা মৌলিক হইবে ইহা তাঁহার ধারণার বাহিরে। Buhler হইতে Rhys Davids পর্য্যন্ত সকলেই বলেন তিন চারি হাজার বৎসর পূর্ব্বে গ্রীস এবং ভারতে Semitic অক্ষর চলিত। প্রথা গ্রহণ করিয়াছিল, এবং সেই লিপি প্রথার সাহায্যে গ্রীক ও লাটিন ভাষা গড়িয়া উঠিয়া অবশেষে মধ্যযুগে য়ুরোপীয় আধুনিক ভাষা সমূহের জন্মদান করে; Semitic অক্ষর-জাত হইতে এতটা হইল, ভারতবর্ষ কি অমান লিপি

সৃষ্টি করিয়া বসিল? Rhys Davids কিন্তু Southern Semites বা Northern Semites, ইহাদের কাহাকেও ভারতীয় লিপির সহিত গ্রথিত করিতে চাহেন না, তাঁহার মতে ভারতীয় লিপির সূত্রপাত হইয়াছে বেবিলনের আদিম অধিবাসী Akkadian জাতি হইতে। তাঁহার মতে এই Akkadian হইতেই বেবিলন লিপি-প্রথার আভাস পাইয়াছিল। কাজেই দেখা যাইতেছে যে অন্ততঃ বড় বেবিলন জাতিরও উৎপত্তি সম্পর্ক নহে। তিনি বলেন যে ভারতীয় বণিক কুল এই লিপির আমদানি করিয়া ব্রাহ্মী script এর উদ্ভব ঘটাইতে যথেষ্ট সাহায্য করিয়া থাকিবে। Rhys Davids এই Brahmi scriptকে sublime writing নামে অভিহিত করিয়াছেন। অপর কতিপয় য়ুরোপীয় পণ্ডিতের ন্যায় ঐতিহাসিক Rhys Davidsও ছক দাঁড় বাহিতে ছাড়েন নাই—হাল একমুখ করিয়া চলার ইচ্ছা হইলেও ঘটনার স্বভাবগত শৃঙ্খলায় ভিন্ন মুখেও যে না হেলিয়া পড়িয়াছেন, এমন নহে। হিন্দুদের লেখা ছিল না জোর করিয়া প্রমাণ করিতে নামিয়াছেন, 'নেতি নেতি' রব তুলিয়া উহাকে খণ্ডিত করিলেন, কিন্তু হিন্দু সাহিত্যের গঠন ও রূপ চিন্তা করিয়া আস্তিক্য-বাদের দিকেও যে অজ্ঞাতসারে না ঝোঁক দিয়াছেন, তাহাও নহে। নমুনা স্বরূপ এক কয় ছত্রই যথেষ্ট:—'It is of course, not impossible a priori that the priests in India had developed an alphabet of their own out of picture writing, and that it was on to such an alphabet that the borrowed letters are grafted. অপরেরাও এক মতবাদ লইয়া অনেক কালি খরচ করিয়াছেন, একবার এদিকেও যে না চাহিয়াছেন এমন নয়—For their study as well as for the different methods of preserving them, whether by writing or by memory, for either is possible." এই যুক্তি-তর্কের দোদুল দোলা অনেক মতাবলম্বীকে নাচাইতে ছাড়ে নাই। কারণ প্রচণ্ড 'না-না'র মধ্যে—God is no-where বলিতে atheistবর্গ যেমন প্রত্যক্ষ God is now—here দেখিয়াছিল, সেইরূপ তা'হা খানেরও অস্ফুট আভাস জাগিয়া উঠিয়াছে যে কি! এই প্রতিকূল দিকের General Cunningham অনুকূল মত লইয়া একধারে হইতে বসিয়াছেন। তিনি অভ্র মাপা যামাতো 'না'র ইতিহাস রচনায় নিতান্ত নারাজ। তিনি বলিতে চাহেন, ভারতের বেদ বেদান্তের সঙ্গে সঙ্গেই লিপি-রচনার স্বচ্ছন্দ সুন্দর নব যুগল সারথি-বাহিত হইয়া চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। Ryhs Davids এই মত যুক্তি-তর্ক-বিহীন জ্ঞান করিতে চাহেন। তাঁহার মতে ভারতীয় ভাষার অঙ্গে যেমন বহু শব্দের সমন্বয় দেখা যায় তেমনি ভারতীয় লিপির চেহারায় অপর লিপি-প্রথার সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। ইহাতেই স্পষ্ট প্রতীত হয় যে বাহির হইতে এ লিপির অবয়ব ধার করা। যখন ইহা সত্য তখন দ্রাবিড় বণিককুল হইতে তাহার সংগঠন না হইয়া যায় কোথায়? তাঁহার মতে ব্রাহ্মণেরা আত্মস্বার্থ লইয়া ব্যস্ত, তাহাদের ভাষার ব্যবস্থা লেখার উপর দাঁড় করান অসম্ভব। এইরূপে বহির্জগৎ

হইতে ভারতের লিপি সাহিত্য গড়িয়া উঠিতে পারিয়াছে ইহাই প্রমাণ হয় এবং ইহারই জন্য পশ্চিমের চিন্তাশীলেরা আধুনিক যুগের আবিষ্কারের সাহায্যে ভারত-ইতিহাসের পৃষ্ঠা নব গঠিত করিতে প্রতিভা-প্রকাশে তিলমাত্র ত্রুটি করেন নাই।

কিন্তু একটা কথা উঠিতে পারে কি? এই যে Mesa inscription হইতে ভারতীয় লিপি প্রথার উদ্বোধন হইল, তাহা ত সকলেই মানিয়া লইয়াছেন, ভারতের বণিক যাইয়া এক কুড়ি অক্ষর কাণা কড়ির মত ধার করিয়া লইয়া আসিল, তারপর ভারতবর্ষের টাঁকশালায় ঐ ধার-করা বিত্তের প্রথম ক্রয়-বিক্রয় চলিল, ইহা ত সকলেই বাইবেলের মত মানিয়া লইতেছেন; কিন্তু মানার প্রমাণ? যেহেতু Mesa inscription বহু ব্যয়সাধ্য excavation হইতে বাহির হইয়াছে, যেহেতু ইহা লেখার অতি প্রাচীন নিদর্শন এবং যেহেতু ভারতবর্ষে তৎকালীন বা তৎপর-বর্ত্তী কালের কোন লিখিত দলিল পাওয়া যায় নাই, সেই হেতু কি বলিতে হইবে যে ঐ inscription হইতে লিপি-প্রথা আনীত হইয়া ভারতের সাহিত্য-রচনায় নিয়োজিত হইয়াছে। আশ্চর্য্য কথা! আরও আশ্চর্য্য এই যে ভারতের এক বণিক সম্প্রদায় সে অক্ষর লইয়া আসিল, আবার তাহারা দ্রাবিড়-দেশীয়। তাহারা ঐ লেখার মর্ম্ম এত বুঝিল যে অক্ষরগুলি সাড়ে পনের আনা বেশ মুখস্থ করিয়া, বা য়ুরোপীয় ফ্যাসানে হাত পাকাইয়া এ দেশের হাটে মাঠে ছড়াইয়া দিল। মজার কথা বটে। মধ্যযুগের ইতিহাসে পড়িয়াছিলাম, চীন দেশ হইতে Silk industry এক অভিনব উপায়ে য়ুরোপে চলিয়া যায়—দু'জন 'পথ-ভোলা পথিক এসেছি-ভাবে' সে দেশে বেড়াইতে যায়, এবং silk-worm আনিতে গিয়া ব্যর্থকাম হইলে বাঁশের বাঁশীতে কয়েকটা পোকা রাখিয়া তাহারা গ্রীসে চলিয়া আসে, তখন Heraclius এর রাজত্ব। Eastern Capital এ দেখিতে দেখিতে রেশমের চাষ ছাইয়া গেল।' এইরূপে মধ্য-যুগের বাণিজ্যে য়ুরোপ এক নূতন জিনিসের পত্তন করিতে পারিল। আমাদের আলোচ্য বিষয়টীও প্রায় সেইরূপ। এখানেও সেই এক দৃশ্য। কিন্তু গলদ হইতেছে ঠিক সেইখানে যে অক্ষরের চাষ ও রেশমের চাষ মোটেই একরূপ নয়, ইতিহাসের চোখে এ দুইটী জিনিস জোট দাঁড়াইতে পারে না। পশ্চিমের ইতিহাস-নায়কেরা কিন্তু ভারতীয় লিপির ইতিহাসে সেই রেশমের চাষ আনিয়া ফেলিয়াছেন। এখন কথা হইতেছে, Mesa inscription ত আর রেশম পোকার আধার নয়, যে বণিকেরা সাতডিঙ্গায় সে মণি লইয়া আঁধার ভারতের অঙ্গনে বাতি জ্বালিতে থাকিবে? ভাবিয়া স্তম্ভিত হইতে হয় যে-ভারতীয় ব্রাহ্মণ বেদ বেদান্ত উপনিষদ রচনা করিয়া ও 'সোঽহম্' চিন্তা লইয়া মগ্ন হইয়া রহিল, তাহারা অক্ষর আবিষ্কারের এক বিন্দু উপায় খুঁজিয়া পাইল না, আর কোথাকার দ্রাবিড় বণিককুল পণ্য সরবরাহের সঙ্গে সঙ্গে সে জিনিস বাহির করিয়া ফেলিল। যাহারা ব্যবসায়ী তাহারা লিপির মর্য্যাদা বুঝিল বেশী, আর যাহারা মনস্তত্ত্ববিদ্ ও শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া বেদের অকূল জ্ঞান-সমুদ্র মন্থন করিয়া আসিলেন, তাঁহারা লিপিকুশল

হইতে জানিতেন না, বা পারিতেন না। বেবিলনে দ্রাবিড় বণিকেরা Mesa inscription দেখিবামাত্র বুঝিয়া ফেলিল, ইহাও লেখা, তারপর জানিল, ইহাতে অক্ষর আছে এবং তৎক্ষণাৎ এগুলি পোকার মত দেশে আনিয়া হাজির হইল। ভাল, এ অক্ষরগুলি আনিল কিরূপে? পুঁটলি বাঁধিয়া? তাহা অবশ্যই নয়। তাহারা নিশ্চয় লিখিয়া অভ্যাস করিয়া থাকিবে, সে দেশে ত আর বর্ণপরিচয় ছিল না যে গুরুদাসের দোকান হইতে এক কাপি লইয়া আসিবে, বা ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস ছিল না যাহার কাছে সেই Mesa inscription এর প্রতিলিপি পাঠাইয়া দিয়া, তাহার প্রকাশ ও ভারত-ব্যাপী প্রচারে লাগিতে পারিত। তবেই দেখা গেল যে তাহারা নিশ্চয় সেখানে হাত পাকাইতে শিখিয়া থাকিবে। তাহাদের ত আর কাজ ছিল না যে অক্ষর গলাধঃকরণ করিতে লাগিয়া যাইবে। তাহারা Modern school of Archaeology র student ছিল না যে Buhler এর মত, Kennedy র মত, Rhys Davids এর মত Paleography র বিদ্যা লইয়া ব্যবসা করিতে যাইবে। তারপর বণিক সম্প্রদায় ব্রাহ্মণের হাতে এই অক্ষরের অক্ষমালা সম্প্রদান করিতে গেল কখন? তাহারা দাক্ষিণ-ভারতের লোক, উত্তর ভারতের উত্তরাংশ বেদাধ্যুষিত। ইতিহাসে আজকাল দেখা যায় দক্ষিণ-ভারতে আর্য্য উপনিবেশ বহু সময়-সাপেক্ষ হইয়াছিল, যদি এইরূপ হয় তবে দ্রাবিড় জাতির সহিত বৈদিক হিন্দুর দেখা-সাক্ষাতে কত বিলম্ব ঘটিয়াছিল? আরণ্যক উপনিষদ, অনুক্রমণী, ঘটনায় যে ব্রাহ্মণ সাহিত্যিকের হাত পাকিয়া উঠিয়াছিল, তাহারা কিনা লিপি-প্রথায় হাতে খড়ি লইবে অর্দ্ধ আর্য্য বাস্ত্রী হইতে! যাহারা ভারতবর্ষে ভাষায় উপনয়ন দিয়া মহা-সাহিত্য-সৌধ হেলায় আকাশের বুকে জাগাইয়া তুলিল তাহারা পুনরায় আতুরঘরে যাইয়া বণিকের মুখে লিপির কল-কৌশল জানিতে ব্যস্ত হইবে—তাহারা মাতৃ-গর্ভে জন্ম হইয়া অভিমন্যুর মত সপ্তরথীর গূঢ় রহস্য অবগত হইবে। এ কল্পনা ইতিহাসের অঙ্গে প্রলয়ঙ্করী। পাশ্চাত্য সিদ্ধান্তবাদীদের মনে কি ইহা উদয় হয় না, যে, সত্যের সাক্ষ্য ভিন্ন রূপ ধারণ করিতে পারে, বেবিলন বণিককুল ভারতে আসিয়া লেখার আদর্শ, তাহাদের যুক্তিতর্ক অনুসারে Brahmi script হইতে লইয়া যাইতে পারে? Mesa inscription এর অন্ততঃ হাজার বৎসর পূর্ব্বে বেদ রচিত হয়, কিন্তু বেবিলনের কোন্ অমূল্য পুস্তক পাওয়া গিয়াছে যাহাতে ভারতীয় সাহিত্যের মত ভাষার ও ভাবের সমাবেশ দৃষ্ট হয়? তবে কেন ভারত হইতেই বেবিলন অক্ষর ধার করিতে আসিবে না? The table is thus upset. না, তা হইবার নয়, তাহা হইলে সেমিটিক জাতি, ভারতের হাতে লেখা-পড়া শিখিয়া ফেলে, এবং সেই জাতি হইতে বর্ণমালার অভিযান গ্রীস ও রোমে যায়! তবেই ত মুস্কিল! য়ুরোপ মৌলিকতার সুর আর ভৈরো রাগিণীতে ভাঁজিতে পারে না! Rhys Davids বলিয়াছেন, Akkadian হইতে ভারতবর্ষ অক্ষর লাভ করিয়াছে। এই Akkadian বংশের নাম উল্লেখ করায় নূতন করিয়া একটা কথা

মনে জাগিল। এ কাহিনী আগুনের ইতিহাস সম্পর্কে।* বেদে দেখা যায় অগ্নিদেব প্রথম ভৃগুবংশের দ্বারা আনীত হন। আগুনের উদ্ভাবন ভৃগু ঋষির কার্য্য, তাঁহার পুত্র শুক্রাচার্য্য ভার্গব নামে খ্যাতি লাভ করেন; এবং শুক্রাচার্য্য দৈত্যকুলের গুরু-পদে বৃত ছিলেন। দৈত্যকুল আর কিছুই নহে, Oxus valley হইতে Euphrates valley পর্য্যন্ত যে অনার্য্য আর্য্য সভ্যতার বাহিরে ছিল, তাহাই পৌরাণিক দৈত্যধাম। শুক্র বেদের সভ্যতা-বিস্তারে ইহাদের মধ্যে আবির্ভূত হন, এবং প্রবল চেষ্টায় বৈদিক রীতি-নীতির অনুবর্ত্তন করিতে সমর্থ হন। প্রসিদ্ধ পুরাতত্ত্ববিদ্ Hewitt তাঁহার 'Ruling Races of pre historic times' পুস্তকে লিখিয়াছেন—The-e western Asiatics formed the Akkadian race of remot past and it is a thing of sup eme importance that the chief deity of this race was Sukas, a corruption of the name 'Sukras. যদি ঘটনার স্রোত এ পন্থা অবলম্বন করে, তবে সুর ফিরাইতে আর কতকাল লাগে? Rhys Davids এর Akkadian race শুক্রাচার্য্য হইতে যে অগ্নির সন্ধান লাভ করিল, ঐ অগ্নি প্রজ্বলনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় সভ্যতার বহু অগ্নিশিখা যে সেই বেবিলন ও এসিয়ার অংশে ধ্বক্ ধ্বক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, তাহাতে কি সন্দেহ আছে? ইতিহাসের পৃষ্ঠায় Hewitt শুক্রাচার্য্যকে Sukrao রূপে Akkadian দিগের কুল গুরু-পদে বৃত হইতে দেখিয়াছেন, কিন্তু মানব শাস্ত্র বা আধুনিক Semitic নামধারী Assyrian বা বেবিলনে, ভারত ঋষিকে গুরু নির্ব্বাচন করিতে হইয়াছে এরূপ আলেখ্য ইতিহাসের চিত্রশালায় মেলে কি? তারপর যে ভাষার ও লিপির বাহন বর্ণমালা দ্রাবিড় বণিক ভারতের হাটে Assyria হইতে আনিয়া দিয়াছিল, সেই ভাষার অগ্নি-শলাকা আগুনের প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে যুরোপের ভিন্ন ভিন্ন দেশাঞ্চলে যে ধূপ ও দীপ জ্বালিয়া দিয়াছিল, তাহারই শলাকা-সংযোগে ভারত যে একদিন সমগ্র যুরোপের তরফে শ্রীগুরবে নমঃ করিয়াছিল তাহার খবর কয়জন রাখিতে জানেন, বা রাখিতে চাহেন? Ragozin তাঁহার Vedic India তে এই কয়টি বহুমূল্য কথা আমাদের চক্ষে ধরিয়াছেন—Phrigu com s from a root Bhrip—To burn...it survives in Greek Phlego, Latin flagrare fulgue with all their derivatives chief of which is the Latin ful ar lightning bolt not to speak of their numerous posterity in our modern t ngues —p 360 তিনিও তাঁহার পুস্তকে দেখাইয়াছেন, যে শুক্রাচার্য্য সেই Akkadianদের গুরু হইয়াও পিতার নাম ত্যাগ করেন নাই, তাই তাঁহার পিতার নামানুসারে ফ্রিজিয়া প্রদেশের নামকরণ হয়,—they called themselves Briges, Bhrigu or Phreygoi in Phrygia...Also we

* পুরাকালে ভূগর্ভস্থিত দান—শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। জাহ্নবী

find the northern 'r' altered into 'l' in the Akkadian Bil-gi, we find a similar change in the name Phlegyas, the Greek form of Phreguas, and we see the German pfugg and our plough are names taken from that of the Phrygian fire-father God, by a race, which besides changing the r into an 'l' changed 'ph' into a 'ph' "—Vol 1. p 30.

স্বভাবের নিয়মচক্রে সূর্য্য পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে যাইয়া থাকে, পশ্চিম হইতে পূর্ব্বে আসে না, 'কত নদী ধাইলা উছলিয়া পুলকে' 'পলে পড়ে ঝরণা রজ-গিরি প্রস্রবণা'; এই স্রোতস্বতী নৃত্য-চপলা পাহাড় হইতে নামিয়া দেশ-বিদেশ ভাসাইয়া চলে, কিন্তু সেই পিতৃলোক হিমাচলে 'বাপের ঘর' ফিরিতে আর ফিরে কি? এই ভারতীয় সভ্যতার দীপ্তি, অল-অল ময়ূখমালী সূর্য্যবৎ এই সভ্যতার গতি নৃত্য-বিহ্বলা নদীর মত ভারত মহাসাগর হইতে উত্থিত হইয়া, পশ্চিম আসিয়ার দেশ-বিদেশ ভাসাইয়া, বসফরাস্ পাড়ি দিয়া য়ুরোপের তৃষ্ণাতুর মুখে ঝাপাইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু সে স্থল হইতে আর ভারতের দিকে 'ফিরা যাত্রা' করিয়াছিল কি? 'এ ফিরা রথের' ব্যবস্থা ইতিহাসের পাঁজিতে খুঁজিয়া পাওয়া ভার। হইতে পারে যে Kharosthi script গান্ধারে প্রচলিত ছিল, উহা সেই Semitic type এর বা Rhys Davids এর Akkadian type এর, কিন্তু দেখিতে হইবে সেই script ভারতবর্ষে কতটুকু ক্ষমতা বাড়াইতে পারিয়াছিল। Buhler বলিয়াছেন উহা সে প্রদেশ-বিশেষে নিবদ্ধ ছিল এবং উহার প্রচারের কিছুমাত্র আয়োজন বা প্রয়োজন ছিল না, কারণ ব্রাহ্মী script ', national হইয়া জাতীয়তার আকার-সম্পাদনে ভারতীয় ভাষার সৃষ্টি করিতে বসে। ব্রাহ্মী নাম কি ব্রহ্ম-বোধক নহে? হিন্দুর সর্ব্ব-কার্য্যারম্ভকালে সর্ব্ব সাধনার মূলে ধর্ম্মের বীজমন্ত্র দেখিতে জানিলে, ভারতীয় সভ্যতার বিকাশ ধরিবার প্রকৃত চক্ষু ফোটে বলিতে হইবে। Kharosthi নাম কোন বেদে কোন ব্রাহ্মণে পাওয়া যায়? ইহা যে 'পর-দেশী' তাহা নাম-পাঠেই মর্ম্মে মর্ম্মে বোধ জন্মে। Khorasan নাম পারস্য দেশের এক প্রান্তের উপর স্থাপিত ছিল, এই Khorasan নাম হইতে Kharoshthi লিপির উদ্ভাবনা সম্ভব। যখন গান্ধারে এ লিপির প্রচলন ঐতিহাসিকেরা দেখিয়াছেন, তখন উহা সেই যে 'পর-দেশী' সামগ্রী, তাহাতে ভুল নাই! এ লিপি আরবী প্রভৃতির মত ডান হইতে বামে লিখিত হইয়া থাকে। Buhler বলিতেছেন 4th century B. C. হইতে এই Kharosthi script গান্ধারে প্রচলিত হইয়া 200 A. D. পর্য্যন্ত অস্তিত্ব বজায় রাখিতে পারিয়াছিল। ইতিহাস পাঠে জানা যায় খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীতে পারস্যের অধীনে এই স্থানসমূহ কিছুদিনের জন্য অধীনতা-পাশে কাটাইয়াছিল, ঠিক সেই সময়ে Kharosthi এ প্রদেশে প্রচলিত হইয়াছিল, এবং পারস্যাধিকার-বিমুক্ত হইলেও এ script যাই-যাই করিয়াও কিছুকাল টিঁকিয়া গেল। আজকাল Eastern Turkisthan excavation-এর ফলে যে

লিপির আদর্শ বাহির হইয়াছে, তাহার বিবরণ পরে চলিবে, কিন্তু এইখানে Khotan হইতে তের মাইল দূরে Gosinga Vihar-এ যে লিপি-রচনার কয়েক ছত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার কথা একটু বলা প্রয়োজন। এই লেখা ভূর্জ্জ পত্রে মসী-অঙ্কিত, কলমের আঁচড়ে কালির ছাপে আধুনিক প্রথায় রচিত। এ লিপি Paris ও Petrograd-এ তথ্যাবিষ্কারের জন্য চলিয়া গিয়াছে। ইহা Kharosthi script-এর দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, ইহার রচনা-কাল প্রথম শতাব্দী খৃষ্টাব্দে এইরূপ ধার্য্য হইয়াছে। যদিও এই Kharosthi script লইয়া Sylvian Levi ও Pischel এর মধ্যে বহু তর্কযুদ্ধ হইয়াছে, তবু ইহার সঠিক নির্ণয় সম্ভবপর হয় নাই। Buhler কিন্তু বলিয়া গিয়াছেন যে ইহা সেই inscription-এর Semitic type, কারণ উহাও ডান হইতে বামে লিখিত হয়, এবং Kharosthi ও ঠিক তদ্রূপ। কিন্তু Brahmi লিপি ইহাদের উল্টা; সেইজন্যই national script বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। Buhler প্রায় বলিতে চাহিয়াছেন যে ভারতের ষড়ৈশ্বর্য্যের মধ্যে এই লেখার আবিষ্কার অন্যতম, ইহাতে যতটা দেশের স্বাতন্ত্র্য ফুটিয়া উঠিয়াছে, যতটা দেশের হাতে এ লেখার সাজ বানানো হইয়াছে, ততটা কেন, তাহার যুক্তি প্রমাণ, বাহিরের ছাপ আসিয়া লাগিয়াছে কিনা সন্দেহ; তবু প্রত্নতত্ত্বের যাদু-ঘরে ঢুকিলে প্রাচীন যুগের Mesa Inscription প্রভৃতির দর্শন মাত্রেই মনটাকে এমন যাদু করিয়া তোলে, যে ইহার দ্বারা দূর-দূরান্তের অবগুণ্ঠিত ইতিহাসকে অনবগুণ্ঠন করিবার ইচ্ছা জন্মাইয়া থাকে। এই যাদু-ঘরের যাদু যে ইতিহাস-মহলকে পাইয়া বসিয়াছে, তাহারই একটা প্রমাণ-স্বরূপ এই লেখার ইতিহাস ইতিহাস-সাহিত্যের আদালতে হলফ করিয়া সাক্ষ্য দিতে আসিয়াছে।

শ্রীভূপেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী।

সরযূ

বিস্মরণের ভস্ম মাঝে কি গান তুমি গাইছ উদাস-মনে,
রঘুকুলের হে রাজলক্ষ্মী! হে সরযূ! স্বর্ণ-স্রোতস্বতী!
দুঃখ-দিনেও ললাট তোমার অঙ্কিত যে ইন্দ্রাণী-লক্ষণে,
হে সুন্দরী! অনিন্দিতা! অঙ্গে তোমার চন্দ্র-মালার জ্যোতি!
সন্ন্যাসিনীর বেশে রাণী! কি কথা হায় জপ্‌ছ নিরজনে,
কোন্ অতীতের সঙ্গীতে মন তরঙ্গিয়া চল্‌ছ মন্দগতি!

তটে তোমার পুষ্ট হ'ল দিগ্বিজয়ী রঘুর বিপুল সেনা,
সুহ্ম-মগধ-পাণ্ড্য-কেরল-হূণ-পারসীক-যবন-দর্পহারী;

ধাত্রী তুমি সম্রাটদের ; সরিৎ-স্রোতে সাগর-ঢেউএর ফেনা
উথ্‌লাতে বল ধরে যারা, তেমন ছেলে পুষ্‌লে এযাবধারই
পীযূষ দানে। কবির গানে অমর যারা, যারা সবার চেনা,
মানুষ হ'ল তোমার স্নেহে তারা সবাই ক্ষত্র-ধনুর্ধারী।'

যাত্রাভারও ধাত্রী তুমি! গঙ্গারে যে আন্‌লে স্বর্গ হ'তে
সে পুরুষে বল দিয়েছ মুক্তি দিতে ষাট হাজারে, মা'র।
ইক্ষ্বাকুরও তুই প্রসূতি, কিন্তু যে জন নিত্য চক্ররথে ;
যে যোদ্ধাদের পরাক্রমে নাম এ পুরীর অযোধ্যা নগরী,
—অ-যোধ্য যা' শত্রু যোধের—তারা সবাই অমি শুচিরতে।
তোর মমতায় স্নান ক'রেছে, পান ক'রেছে স্নেহের সুধা তোরি।

তোমার স্নেহের রাখী হাতে রাক্ষসেদের বশ ক'রেছে নরে,
সগর-খাত সাগর-জলে বাঁধ্‌লে সেতু তোমার সন্তানেরা।
ডঙ্কা দিয়ে হিমালয়কে, ঝাণ্ডা নিয়ে দেশে দেশান্তরে
গ'ড়্‌লে কতই উপভারত, উপনিবেশ বাঁধ্‌লে কতই ডেরা ;
তাদের কীর্ত্তি নব-পুরী সে, মগের দেশে আজো বিরাজ করে,
আর দ্বিতীয় অযোধ্যাপুর মেকং-তীরে স্মৃতির ডোরে ঘেরা।

বিভীষণের ভীষণ মুখে ভক্তি-রেখা ফুটিয়েছে যে রাজা,
যার অভিধান জনম জয়ী, গেড়েছে যে জয়ের ধ্বজা মনে,—
বাল্মীক আর কালিদাসের কাব্যে যাহার কীর্ত্তি চির তাজা,—
পায় যে পূজা কৃত্তিবাসের তুলসীদাসের ছন্দ-সুচন্দনে,—
হরের ধনুক ভাঙ্‌লে যে জন,—দর্পীজনে দিলে উচিত সাজা,
তোমার বুকের সেই শতদল ঘুমায় আজি তোমার আলিঙ্গনে।

যাত্রী এসে দেশ-বিদেশের তোর তীরে তার চরণ-চিহ্ন খোঁজে,
চোখের জলে ঝাপ্‌সা দু'চোখ,—খোঁজে সীতার রাঙা পায়ের রেখা,
নিমেষ-মাঝে নিমেষ-হারা, তিনটা যুগের স্বপ্ন জাগে ওরে,—
সৈকতে তোর সোণার রেণু,—জলে নব-দূর্ব্বাদলের লেখা।—
পাণ্ডা হেঁকে চমক ভাঙায়, একাল সেকাল সমঝাতে মন বোঝে,
কোথায় সীতা? কোথায় বা রাম? লোকের ভিড়ে একা নেহাৎ একা!

রাবণ-জয়ীর জনম-ঠাঁইএ দাঁড়িয়ে আজি ধ্বজা বাবরশাহী,
যে বাবরের বর্ষী-গন্ধ ডুবে গেছে রাঙা মদের হ্রদে ;

"মুণ্ড পাহাড়" ভিন্ন যাদের ভূমণ্ডলে অন্য কীর্তি নাহি,
সেই গ'ড়েছে ওজন শালা, ভিতের পাথর চিহ্নিয়ে দেমাক-ঘরে ;
যাদু ঘরের মদের মাতাল কোথায় গেছে সুধা-সাহেব যাহ'?
মৌলবীরা হয় তো জানেন,—পরলোকের পরম কোন্ পারে।

রক্ত-কাদায় তক্ত-তাউস্! ..নব কীর্তি প্রাচীন কীর্তি নাশে।
কোন্ "বাবরে রুধ্‌ছে সাকেত"...সে কথা আজ কেউ রাখে না মনে?
বিরূঢ়কের স্তূপটা কোন বাবরশাহী মসজিদের পাশে,
নিষ্ঠুরতার কাহিনী, হায়, যায় ঘুমিয়ে অগাধ নিস্তানে।
ভয় জাগিয়ে যে সব পশু বানায় পশু মানুষকে ভয় জাগে
দুঃস্বপনের মতোই তারা, দিন ফুরিলে ডোবেন বিস্মরণে।

যুগের পরে যুগ চ'লে যায় নাগর-দোলায় চলছে ঘোরাঘুরি,
ওঠা-নামার চল্‌ছে তুফান, আগমনী ডাক্‌ছে বিসর্জনে,
ছায়াবাজীর পুতুল চলে সারি সারি উঁচিয়ে ছায়া জুরী,
নেবে জ্বলে হিন্দু-বৌদ্ধ, প্রসেনজিতের প্রাচীন এ পত্তনে।
রয় না লোক, রয় না ক'টাক, অটুট কারো না রয় জারিজুরি
থাকে কেবল পুণ্যশ্লোক পুণ্যাত্মা ও প্রাণের রামায়ণে।

আজ সরযূ! তোর ছেলেরা কুলির বেশে যাচ্ছে ফিজিদ্বীপে,
যা'চ্ছে সুদূর মরীচ সহর, পেটের দায়ে বিকিয়ে দিয়ে মাথা,
কূলে কূলে কান্না ওঠে, চিরবিদায় বার্তা যায় নিবে
কত ঘরে সন্ধ্যা প্রদীপ, কেঁদে মরে কন্যা জায়া মাতা।
অধীনতার অন্ধকারে হায় সবল আশায় মারছে গলা টিপে,
ধোঁয়ায় ভ'রে যাচ্ছে দু'চোখ, ধোঁয়ায় ভ'রে উঠছে মনের খাতা।

ঘুরছে ধাঁধায় হিন্দু-তুরুক লাঞ্ছনা আর সইছে গ্লানির বাণী,
আত্মা-শাক্তের নাই যেন বল আঁধির আঁধার হয়েছে দিক ভরি,
রঘুকুলের আত্মজেরা একা-গাড়ীর করছে গাড়োয়ানী,
রাবণ-পাকের খানসামারা আজকে স্তান বেলুনে মস্তরী!
বিজিত আর জেতার ধূলায় চোখের জলে আজকে সাঁতার-পানি,
আজ সরযূ অশ্রুনদী, সরিৎ-রূপা এ রাজ-রাজেশ্বরী!

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

মাতৃহীনা

ছোট বেলা থেকে আমার মা নেই। লোকে আমায় বল্‌ত "মা-খেকো।",—মানুষের এত বড় দুর্ভাগ্যের উপর এতখানি নির্দ্দয় উপহাস মানুষে যে কেমন করে' করে, আমি ত তা ভেবে পাই না। এই মায়ের অভাবে যে কি বোধ হয় আমার মত ত আর কেউ তা কখনো অনুভব করত না, অথচ আমিই ছিলেম আমার ভাগ্যের জন্যে দায়ী। বাবা আমার মা-বাপ দুইএর অভাবই পূর্ণ করেছিলেন। আমার আদর-আব্দারের অন্ত ছিলনা। লোকে বিরক্ত হত,—'মাওড়া' মেয়ের অত কেন? বাবা হাস্‌তেন, বল্‌তেন, "আহা, করুক! সে থাক্‌লে ত সইত—না হয় আমিও সইলেম।" তবু যত বড় হচ্ছিলেম, আমার মনের অভাব ততই বেড়ে উঠছিল। কিছুতে যেন সুখ পেতেম না। খেলার সাথীরা যখন "মা" বলে ডাকত, আমার মন তখন তৃষিত হয়ে উঠত, ঐ ডাকটির জন্যে। মা! মা! মা! কি মিষ্টি এই নামটি! আমার কেবল কান্না পেত। রাগ হত; কেন আমার মা নেই। মা-ডাকের কিছু অভাব পূর্ণ করবার জন্যে আমার জেঠিমা কি খুড়িমা কেউ ছিলেন না। আমার শুক্‌নো বুকের ভিতরটা যেন তাই থেকে-থেকে হাঁপিয়ে উঠত। যশোদা আমায় মানুষ করে ছিল—তাকে আমি মা বলে ডাক্‌তে সুরু করায় সে বাধা দিলে, "ছি, দিদিমণি, যাকে তাকে কি মা বল্‌তে আছে। বিয়ে হোক, রাজা-শাশুড়ী হোক, তাকে মা বলে ডাক্‌বে।" সেই দিনটি থেকে বিয়ের জন্যে মনে-মনে বড়ই সাধ জন্মাল। বিয়ে জিনিষটা যে কি, তা তখন ভাল করে জানতুম না। তার সুখ-দুঃখ লাভ-লোকসানের হিসাব খতিয়ে দেখার সে বয়সও নয়। বিয়ের প্রধান যা স্বামী—তাঁর কথা তখন জানতেমও না, ভাবতেমও না—কেবল জানতেম, বিয়ের সঙ্গে মস্ত-বড় একটা যৌতুক আমার পাওনা আছে—সে মা।

ক্রমে বয়স বাড়তে লাগল। সংসারের সঙ্গে ছোট-খাট পরিচয়ও আরম্ভ হ'ল—তবু আমার মানসের মানসী প্রতিমাকে, আমার ভবিষ্যৎ শাশুড়ীকে আমি এতটুকু মলিন হতে দিলেম না। খুব উজ্জল রঙে-রাঙ তাঁর মুখে মাকে আমার দুর্গাপূজার প্রতিমার মতই আমার বুকের ভিতর আমি পূজা কর্তেম। শাশুড়ী সম্বন্ধে কেউ আমার ঠাট্টা ক'রে কোন অন্যায় কথা বল্লে আমি তা সইতে পারতেম না। মুখরার মত তখন ঝগড়া বাধিয়ে দিতেম। লোকে বলত, "দেখ, দেখ। রাণুর এখন থেকেই শাশুড়ীর উপর কত দরদ—ওরে, অত ভক্তি করিস নে রে—শেষে রাখ্‌তে পার্‌বি নে।"

বারো উত্তীর্ণ হয়ে তেরয় পা দিতেই আমার জন্য পাত্র খোঁজা সুরু হ'ল। আমি বাবার বড় আদরের ছোট মেয়ে, তাই আমার জন্যে একটু বিশেষ ক'রেই বাচাই-বাছাই চল্‌ছিল। বাবার মনের মত আর হয় না। শেষে তাঁর পছন্দ-মত একটি পাত্র মিলে গেল। কলকাতায় বাড়ী, বেশ সচ্চারিত্র। একশো টাকা মাহিনায় চাকরি করেন। ঘরে তাঁর

কাপড়ের অভাব নাই, অবস্থা ভালো। চাকরিতে ভবিষ্যৎ উন্নতিরও আশা আছে। বিধবার একমাত্র সন্তান। এইখানটায় বাবার মন একটু খুঁত-খুঁত করছিল। আমরাও যে না করেছিল এমন নয়,—আমার এতদিনের এত সাধের দুর্গাপ্রতিমার বিসর্জন হয়ে গেল। তাছাড়া মনের ভিতরকার যে মনোময়ী মা—তাঁর শাসনের বদলে কিছু এসে যায় না। তবে অনেক দিনের ঘসা মাজা নাড়া-চাড়ায় যে উজ্জ্বল মূর্ত্তি আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল তাঁকে নিজের হাতে বিসর্জন করতে মনে একটা ব্যথাও লাগল। মনকে প্রবোধ দিলেম, নশ্বর মা ত নিবে না, কাঞ্চনের মাও ত নাই। কি আর হবে ভেবে, তবু মা ত! বাবা একদিন কাছে ডেকে আদর করে বুকে জড়িয়ে ধরে বল্লেন, "খুকু, এবার বাবা ছেড়ে মার কাছে যাচ্ছিস। মা পেয়ে বাবাকে ভুলে যাবি নে ত রে?" আমি বাবার কোলে মাথা রেখে বল্লেম, "না বাবা, তোমায় আমি কিছুতেই ছেড়ে থাকতে পারব না—কিছুতেই না।" বাবার আমার মনের ভাব তখন অজানা থাকার ছিল বটে, তবু তার মধ্যে ঐ যে বাবা মিষ্টি করে বল্লেন, "মা পাচ্ছিস"—এই কথাটা আমার কানে এমন মধুর সুরে বেজে উঠল যে তেমন মধুর কোন শব্দ বুঝি আমার কান দুটো কখনো শোনেনি। ওগো, সত্যই তবে এবার আমি মা পাবো। মা ডাকের সাধ আমার এ-জন্মে পূর্ণ হবে তাহলে!

বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের কথায় বর্ণনার কিছু নাই। অধিকাংশ বাঙালী গৃহস্থঘরে মেয়ের বিয়ে যেমনভাবে হয়, আমার বেলাতেও কোনদিকে তার কোন ব্যতিক্রম হয়নি। সেই আত্মীয়-কুটুম্বের সমাগম, গহনা কাপড় আলো বাজনা, ফুলের মালা, ছাপানো কবিতা—আপ্যায়নের সহিত একখানি অপরিচিত সুন্দর মুখ—শুভদৃষ্টির মধুর মিলন,—সবই তাই। তাতে নূতনত্ব বা বিশেষত্ব কিছুই ছিল না। হাঁ, কিছু একটা ছিল। সেই সুন্দর মুখের যিনি অধিকারী, তিনি যেচে পড়ে আমায় নিজের মুখে গ্রহণ করে তাঁর মাকে "মা" বলবার পূর্ণ অধিকার আমায় দিয়ে ছিলেন। আর তাঁর সেই মহৎ দানের বিনিময়ে আমি আমার তের বছর বয়সের কৃতজ্ঞতার পুষ্পাঞ্জলি অকুণ্ঠভাবে তাঁর পায়ে ঢেলে দিলেম। মাতৃহীনাকে যিনি মা দিলেন, তাঁকে অদেয় কিছু থাকে কি? ভাল করে এসব মনস্তত্ত্বের ব্যাখ্যা তখন মনে মনেও করতে পারিনি, তবে মনের গভীরে যেন এমনি ভাবেরই একটা আলোড়ন উঠেছিল। বিয়ের পরে শ্বশুর-বাড়ী এলেম; বাবাকে ছেড়ে ভাইবোন ছেড়ে এই আমার প্রথম বাইরের সংসারে পা ফেলা। তাই ভয়ে-ভাবনায় চোখে জল ঝরছিল। তবু একটা নূতন আশায় মনের ভিতরটা থেকে থেকে, যেন আনন্দে দুলে-দুলেও উঠছিল, মাকে দেখতে পাব।

আমাদের গাড়ী এসে দোরে দাঁড়াতেই, শাঁখ বেজে উঠল। একজন গহনা-পরা ঘোমটা-দেওয়া আধাবয়সী স্ত্রীলোক আমায় নামিয়ে নিতে এলেন। বয়স আমার তের হলে কি হয়, দেখলে লোকে ষোলর কম বলত না। যিনি নামিয়ে নিতে এসেছিলেন, তিনি খুড়শাশুড়ী। হাত ধরে নামাতে হোল। আমি ভয়ার্ত্ত চোখে চেয়ে রইলেম, লোকে আমায়

বেহায়া বল্‌বে কিনা, সে উপদেশ মনেও ছিল না। শুনে ছিলেম শাশুড়ী বিধবা, তাই তাঁকে চিনে নিতে দেরী হলনা। স্বামীর মুখের সঙ্গে তাঁর মুখের অনেকখানি মিল। ছোট-খাট গৌরবর্ণ আধা-বয়সী। চেহারাখানি দেখ্‌লেই ভক্তি হয়, মা বলে ডাক্‌তে মনে কুণ্ঠা আসে না। খুড়-শাশুড়ী বল্লেন, "দিদি, বৌমার মুখে মধু সন্দেশ দাও। সোনার জলে মা-লক্ষ্মীর মুখ দেখো ভাই! সোনার চাঁদের বৌকে যেন সোনার চোখে দেখ্‌তে পার।" শাশুড়ী গম্ভীর মুখে বললেন, "তোমরা দেখ, ছোট বৌ,—মিথ্যের মুখোস্ পরা আমার কর্ম্ম নয়।" চারদিকের লোকজনদের বিস্মিত লজ্জিত মুখের পানে চেয়ে না দেখেই তিনি তখনকার কোন দরকারী কাজে চলে গেলেন। স্বামী আস্তে আস্তে মুখ নীচু করে গাড়ী থেকে নেমে এলেন। আমি ছেলেমানুষ, তাঁর হেঁয়ালি কথার অর্থ না বুঝে খুসী হয়ে দুধে-আল্‌তায় এসে দাঁড়ালেম। এম্‌নি করে আমার নব জীবনের অভ্যর্থনা হয়ে গেল।

বিয়ের পর যে কয়দিন সেখানে রইলেম গোলমালেই দিন কেটে গেল। মা বলে ডাক্‌বার মত একটুকু অবসরও শাশুড়ী আমায় পেতে দিলেন না। দিন-রাতই তাঁর কাজ,আর কাজ! খাওয়ানো দেখা-শোনা ঘর-গুছোন পরিচ্ছন্নতা-সাধন এই সবেতেই এমন ব্যস্ত হয়ে থাক্‌তেন তিনি, যে আমার কাছে আস্‌বার কি বস্‌বার তাঁর সময় হতো না। শুনতে পেলেম একদিন মাস্‌-শাশুড়ী শাশুড়ীকে বলছেন, "পদ্ম, তোর বৌ-ভাগ্যি ভালোই হবে, মেয়ে বড় সুবোধ! মা কি কচ্চেন, মার খাওয়া হয়েছে কিনা, পিসিদের কাছে খবর নেয়। আহা, ছোট-বেলায় মা মরা। ও তোকে মা বলে নিতে পারবে।" শাশুড়ী দালানে বসে লুচির ময়দা মাখছিলেন, আমি যে ঘরের এক কোণে বসেছিলেম, তা বোধ হয় ওঁরা জান্‌তেন না।

শাশুড়ী বললেন, "তা যদি হতো দিদি, তা হলে মানুষের পেটে ভগবান সন্তান দিতেন না, গাছপালাতেই ফলাতেন। তুমিও যেমন পাগল!" বাকী কথা শোনা গেল না। যেটুকু গেল তার অর্থও যে ভাল করে বুঝলুম না, তা নয়। শুধু তাঁর বিরক্ত বিরস কণ্ঠস্বর আমার বালিকা-চিত্তেও একটা আঘাতের দোলা দিয়ে গেল। মনে হলো, আমি ওঁকে খুসী করতে পারিনি! কি উনি আমার কাছে চেয়েছিলেন? কি কর্‌লে ওঁকে আমি খুসী করতে পারি? আমায় যদি বুঝিয়ে দেন, বলে দেন, প্রাণপণেই যে আমি তা করতে রাজী আছি!

বছর-খানেক পরে শ্বশুর-বাড়ী ঘর করতে এলেম। বাবা সঙ্গে অনেক জিনিষপত্র দিয়ে-ছিলেন। শাশুড়ী সবাইকে ডেকে দেখালেন। কুটুম্বের সুখ্যাতি কল্লেন—আমার সম্বন্ধে তাঁর একই ভাব। আমায় তিনি মা বলে ডাক্‌তে দিলেন না। প্রথম প্রথম আমি তাঁর মানা না মেনে মা বলেই ডাকতেম। তিনি যেন শুন্‌তে বা বুঝতে পারেননি, এম্‌নিভাবেই থাক্‌তেন, উত্তর দিতেন না। কিন্তু এভাবে বেশী দিন চলে না, একদিন স্পষ্ট করেই তা বুঝিয়ে দিলেন। অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বল্লেন, "গুরুজনের কথা মানো না, বাপেও ভাল শিক্ষা দেয়নি। আমায় বাছা, স্পষ্ট কথা,

মিথ্যে আমি বলতেও পারিনা, সইতেও পারিনা—। মুখে যতই মা-মা কয়, মনে-মনে তুমিও জানো আমিও জানি, সত্যি ত তা নয়! সেজন্যে কেউ তোমায় দুষ্‌বেওনা। তখন-কার লোকে ঠাকুর-ঠাকুরুণ্ বল্‌ত—মিথ্যের উপর যেন্না ছিল কি না।—এখন যত ফাঁকি তত ঢং। মা-মা আমার করো না।" তর্ক করিবার মত জ্ঞান-বুদ্ধি আমার ছিল না। সাহস বা শক্তির অভাব আরও বেশী। অগত্যা চুপ করে আদেশ পালন করাই সহজ পথ। তা ছাড়া সত্য কথাই আমি বলব। এর পর মা-ডাকের লোভও আমার কমে গিয়েছিল। তৃষ্ণা শুধু শীতল জলেই মেটে এমন নয়, অভাবেও মিটে থাকে।

শাশুড়ী লোক মন্দ ছিলেন না। পাড়া-প্রতিবাসী তাঁর সুখ্যাতি করত। এমন পরোপকারী মানুষ হয় না। দাসী-চাকরেরাও খুসী ছিল তাঁর মিষ্ট কথা আর খাওয়ানোর যত্নে। ছেলেদের প্রতি ভালবাসার তাঁর অন্ত ছিল না। তাঁর স্নানের জল গরম থেকে জামা-কাপড়ের পর্য্যন্ত তিনি তদারক কর্‌তেন, কেবল যত অপরাধ কি এই অধম আমার! মিথ্যা বল্‌ব না, তিনি আমার খাওয়া-পরার কোন দুঃখ রাখ্‌তেন না। তাঁতিনী এলে "করোনেশান" "ইয়ারোপ্লেন" প্রভৃতি নাম-জাদা পাড়ের শাড়ী কিনে দিতেন। সেমিজ ব্লাউজ-ওলা এসেও এমনি ফিরে যেত না। কিন্তু মানুষ কি শুধু খাওয়া-পরারই কাঙাল! পাখীকে খাঁচায় পুরে ক্রমাগত যদি ছোলা ছাতু আর ভাল ভাল ফল খেতে দেওয়া যায়, তাতে তার মনের অভাব কি মেটে? আমার কতদিনের কত যত্নে নিজের হাতে গড়া সাধের অট্টালিকা যে ভেঙে-চুরে গুঁড়ো হয়ে গেল, সে খবর ত কেউ নিলেন না। ছেলে বেলায় আশা-ভরা প্রাণ নিয়ে মা বলে যাঁর কাছে এলেম, তিনি আমায় মাতৃস্নেহে কাছে ত টেনে নিলেনই না বরং অপরাধিনী করে পাশে ঠেলে সরিয়ে রেখে দিলেন। মা আমায় আদর করে একদিনও কাছে ডাকেননি। "বৌমা" বলেও ডাকতেন না। আমার উপর ভালবাসার এতটুকু বুদ্‌বুদও সে স্থির জলে কখনো জাগতে দেখিনি। যা তিনি দিতেন না তা আমার কাছেও চাইতেন না; বরং সেধে দিতে গেলে বিরক্তই হতেন, রাগ করতেন। বাড়ীর পাঁচজনের মত আমিও একজন থাকি। খাই পরি, ইচ্ছা হলে চুল বাঁধি, কাজ করি, ইচ্ছা না হয় করি-ও না। এ সবে নিষেধও নাই; অনুরোধও নাই। ছিল কেবল এক জায়গায়। সে তাঁর ছেলের বিষয়ে। ছেলের খাবার করা,ছেলেকে খেতে দেওয়া—এসব তিনি নিজের হাতে কর্‌তেন। কাকেও তাতে ভাগ নিতে দিতেন না। মা আমায় যে চোখেই দেখুন, আমি যে তাঁকে সেই প্রথম যে-দিন সবুজ বেনারসী সাড়ীর আঁচলে গ্রন্থিবাঁধা তাঁর ছেলের সঙ্গে একসঙ্গে তাঁর পায়ের কাছে প্রণাম করে মনে মনে বলে-ছিলেম, "তুমি আমার মা, আমার চিরদিনের মা, আমার ক্ষুধিত তাপিত চিত্তের বেদনা-হরা অমৃত-ভরা সুখের উৎস মা,—" সে কথা ত আর ফিরিয়ে নিতে পারি না। তাঁর হাতে পাওয়া অবিচারের আঘাত খেয়ে-খেয়ে মন আমার এখন আর তেমন ক'রে সাড়া দেয় না, তবু কর্ত্তব্যের কাছে তিনি এখন যে আমার মা, আর চিরদিনই সেই মা-ই থাকবেন।

৯

স্বামী আমায় ভাল বাস্‌তেন আদর-যত্ন করতেন। তবু তিনিও ত মায়ের ছেলে, বাইরের উচ্ছ্বাসটা তাঁর একেবারেই ছিল না। কতখানি গভীর জলে তরঙ্গ ওঠে, আর কোন্‌খানে ওঠে না, এ-সব বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের খবর ত রাখ্‌তেন না, তাই নিজেকে বড় একা বড় অসহায় ব'লে মনে হতো। মাকে তিনি ভাল বাস্‌তেন ভগবানের প্রতিরূপে, পাছে মার মনে পাছে ব্যথা লাগে সর্ব্বদাই ছিল তাঁর এই ভয়। আমার সম্বন্ধেও তাই এত সঙ্কোচ সাবধানতা! বুঝ্‌তুম সব, আবার এও বুঝ্‌তুম না মা যে শুধু তাঁর একলারই মা—আমার যে তিনি সব হয়েও কেউ নন

এম্‌নি করেই তিন-চার বছর কেটে গেল। অসিত আমার কোলে এলো। শাশুড়ী এবার ডাকার দায়ে অব্যাহতি পেলেন। "অসির মা" বলেই আমার পরিচয় হলো। আমিও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেম। এত-বড় সংসারে একান্ত অসহায় আমার সহায় হোল, সঙ্গী হোল, আনন্দ আশা সবই হোল—আমার এতটুকু ছেলে অসিত। তোমরা শুনে হাসচ, ভাবচ, এ-সব কবিত্বের কথা। আসলে সত্যই তাই,—তবু মানুষ যে মানুষ! শুধু সংসারে সংগ্রাম করেই সে বেঁচে থাকতে পারেনা, মাঝে মাঝে শান্তিরও তার দরকার হয়। বাইরের অভাব যাই থাক্‌ মনের অভাব মন দিয়েই মেটাতে সাধ যায়—হয়ত কারও মেটে, কারও মেটে না।

এম্‌নি ক'রে বছরের পর বছর কেটে এখন আমার মনের নদীতে ভাঁটা পড়ে এসেচে। আমি যে মাতৃহীন, এ অভাব আর আমার মনের কোণেও উঁকি মারে না। মনে হয়, জন্ম-জন্মান্তর ধ'রে এম্‌নি ক'রে ঝরা ফুলের মত প্রকৃতির কোলেই আমি পড়েছিলেম। সংসারের লেন-দেন নিয়েই আমার কারবার। তিন ছেলের পর দুই মেয়ে হওয়ায় মা তাদের নাম রেখেছিলেন—সাধনা আর আরাধনা। নাতি-নাতনীরা ছিল তাঁর গলার হার। তারা এক মুহূর্ত চোখের আড় হোলে তিনি সংসার অন্ধকার দেখ্‌তেন। তাদের নাওয়ান তেল-মাখান চুল আঁচড়ান সব তিনি নিজের হাতে ক'রে দিতেন। পাড়ার ছেলে-মেয়েদের দেখে নূতন ক'রে ভেসলীন পাউডার স্নো ক্রিমের ব্যবহার শিখ্‌লেন। লোকে তাঁর নাতি-নাতনীদের লোকে যদি তারিফ না করে! তারা যা কিছু করে মার চোখে তাই ভাল, তাই অদ্ভুত। তাদের বাহাদুরি আর গুণপনার ফিরিস্তি শুনে শুনে পাড়ার লোকের ত কান ঝালাপালা হ'য়ে উঠ্‌ত। মার কিন্তু তবে আশ মিটত না—সন্ধ্যার পর জপের মালা হাতে মাদুর পেতে মা তাঁর নাতি-নাতনীদের নিয়ে গল্প শোনাতে বস্‌তেন। সে এক রূপ কথার রাজ্য। কোথায় কোন্‌ সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারের ঘোড়ায়-চড়া রাজপুত্র—নদীর ভিতর সাত মহলা বাড়ীর ঘুমন্ত পুরীর রাজকন্যা, সাত ভাই চম্পার আদরিণী বোন পারুলবালা, আরও যে কত দেশ বিদেশের বিচিত্র কাহিনী—মা শুনিয়ে যেতেন, সে সব শুনতে শুনতে এই এত বয়সেও পাশের ঘরে অন্ধকার বিছানার মধ্যে ছোট খুকীকে বুকে চেপে ধরে আমার ব্যাকুল মন কে জানে কি অতৃপ্ত বেদনায় তারে লুটিয়ে পড়্‌তে থাক্‌ত! মনে হোত সুধা-সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে জন্ম-ভ'রে কেবল তৃষ্ণা সয়েই কাটিয়ে দিলেম!

একদিন পাড়ার এক বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খেয়ে ফিরে এসে মাকে বল্লেম, "অসির বিয়ে খুব ছোট বেলায় দিতে হবে। ওদের মত অম্নি একটি টুক্টুকে ছোট্ট বৌ আমায় এনে দিয়ো কিন্তু।" মা বল্লেন, "দুর্গা! না বাছা, আমি বেঁচে থাকতে তোমরা অসির বিয়ে দিয়োনা। যে দুঃখ আমি পেলুম তা আমি তোমায় দেব না।" শুনলে একবার কথার শ্রী! মুখে একটা তীব্র উত্তর এসে ছিল, কষ্টে জিহ্বাকে সংযত করে নিলেম, তবু ব্যথার উপর অস্ত্রচ্ছেদের মত—বেদনার মধ্যে আনন্দের আভাসও বুঝি একটুখানি পেয়েছিলেম। যে দুঃখ উনি পেলেন আমার তা দিতে চান্না! তবু এতটুকু অন্তরের টান আমার উপরও ওঁর আছে! এক এক সময় মনে হয়—আমার কাজ ফুরিয়ে গেছে, এখন ছুটি পেলেই হয়—উনি খুসি হন্। ঠিক বুঝ্তে পারি না। একদিনের কথা বলি। পুরোনো ঠাকুর বাড়ী গেছে,—মা ঠাকুর-ঘরে, স্বামী খেতে বসেচেন। আমি সাম্নের দালানে বসে পান সাজ্চি। অসিত স্কুলে যাবে, ভাতের জন্যে ঠাকুরকে তাড়া দিচ্চে। স্বামী খেতে খেতে নুন্ চাইলেন। ঠাকুর খোকার ভাত বাড়্ছিল, আমায় বল্লে "বহুমা, বাবুকো জারা নুন দেনেত।" এ নূতন লোক, এ-বাড়ীর অলি-গলির সব সন্ধান ত জান্ত না। উঁকি দিয়ে চেয়ে দেখলেম, নুনের জন্যে উনি হাত গুটিয়ে বসে রয়েছেন,—দেখে অমন চেপে নিশ্চিন্ত হ'তে পাল্লেম না, পান ফেলে উঠে এসে একটু নুন এনে পাতে দিলেম। লিখ্তে যতখানি সময় গেল, কাজে হয় ত এতটা সময় যায়নি। আমরা যে সেবিকার জাত। সেবা করাই যে আমাদের পরম ধর্ম্ম বলে চিরদিন শিখে এসেচি! ওঁর খাওয়া হচ্চে না, সেইটেই আগে মনে হোল, পাতে নুন দিয়ে সরে এলেম। স্বামী মুখ নীচু ক'রে খাচ্ছিলেন। মুখ তুলে আমার দিকে চেয়ে দেখ্লেন। তাঁর ঠোঁটের কোণে একটুখানি হাসির আমেজ ফুটেচে কি না ফুটেচে হঠাৎ শাশুড়ীর কণ্ঠস্বর কানে এলো, "এই যে খাবার কাছে সবাই আছে! আমার যেমন পাপের মন, নুন চাইলি শুনে তাড়াতাড়ি জপ ছেড়ে উঠে এলেম।" স্বামী বল্লেন, "কেন তুমি উঠে এলে মা—ওরা ত সব রয়েচে, যে হয় দিত।" মা বললেন, "আর আস্ব না বাছা, এবার থেকে ওরাই খাওয়াবে। বুঝতে পারিনি, অন্যায় করেচি।" শাশুড়ী সেখানে আর একটুও দাঁড়ালেন না, অপেক্ষাকৃত জোরে জোরে পা ফেলে আবার পূজার ঘরে ফিরে গেলেন। তিনি তাঁর অসমাপ্ত জপের সূত্র ফের খুঁজে পেয়েছিলেন কি না জানি না, কিন্তু তাঁর ছেলের পাতের নুন যে নিজের স্বাদ হারিয়ে তিক্ত হয়ে গেছল, সে আমি তাঁর মুখ দেখেই বুঝ্তে পেরে ছিলেম। তার পর থেকে শাশুড়ী আর একদিনও তাঁকে হাতে তুলে কিছু খেতে দেননি। প্রথম কিছুদিন খাবার সময় কাছেও আস্তেন না, ছেলের অনুনয়-বিনয় কান্নাকাটি রাগারাগিতে শেষ মা এসে বসতেন, কিন্তু নিজের হাতে পাতে কিছু তুলে দিতেন না। স্বামীর শিক্ষামত আমি সে সময় সেদিকেই থাকতেম না। ঠাকুরকে সব জিনিষ ছুঁতে দেওয়া হোত না, তবু হাজার অসুবিধা সত্ত্বেও শাশুড়ী তাঁর জেদ বজায় রেখেছিলেন। তিনি জপের মালা

হাতে নিয়ে এসে বসতেন; কাজেই নিজে কিছু পারতেন না, নন্দ আমার মেজ ছেলে, একদিন পাতে দই দিতে গিয়ে সবটুকু দই মেঝেতে উল্টে ফেলে দিলে। স্বামী রাগ ক'রে বললেন, "দই আমি আর খাব না। আমার জন্য দই আর পেতোনা মা,—দই আমি আর খাব না।" মা শান্ত মুখে জবাব দিলেন—"না খাস্ ত পাতবো কেন।" এই দই খাওয়াটি যে মা ও ছেলের চিরদিনের অভ্যাস। ছেলের যদিই চলে মায় যে চলে না, তা স্বামীও জানতেন। অনেকগুলি ভাত তিনি এক দই দিয়েই খেয়ে থাকেন। স্বামী দই ছেড়ে দেওয়ায় শাশুড়ীও আর দই স্পর্শ করতেন না। আমার মুখে মায় খাওয়া হচ্চে না খবর পেয়ে উনি সেধেই বল্লেন, "দই দেওয়া ছেড়ে দিলে মা—জানো, শেষ-পাতে দই না হলে আমার খাওয়াই হয় না।" মা যে তা ভালই জান্তেন, সে তাঁর ক'দিনের ব্যথা-কাতর মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছিল। সেদিনের রাগ তাঁর অনেক আগেই পড়ে গেছ্‌ল। ছেলের খাবার কষ্ট তিনি সইতে পার্‌ছিলেন না, এখন কেবল জেদের মামলা চলছিল। ছেলের উপর ভালবাসার ত তাঁর অভাব ছিল না। কেবল সে ভালবাসার উপর শনিগ্রহ-রূপিণী এই আমার আবির্ভাবই তাঁর স্নেহ-রাজ্যে বিপ্লব বাধিয়ে ছিল বই ত নয়!

সেদিন মেয়ে আবদার ধল্লে—সন্ধ্যেবেলা পা ধোবে। অনেক করে "মা আমার,—মা-মণি আমার, লক্ষ্মী আমার" বলে ভুলিয়ে আম-সত্ত্বর লোভ দেখিয়ে তবে ছাড়ান পেলেম। মেয়ে চলে গেলে মা দালান থেকে বল্লেন, "দুধের সাধ কি ঘোলে মেটে।—সোনা যে পেলে না, তার পিতল পরা কেন? মা ত' দেখনি, অমিয় মা, তাই যাকে-তাকে মা ডাকতে তোমার লজ্জা হবে না।" মনে হোল বলি, ভগবান দেন্‌নি, মানুষেও দিলেনা—কাজেই ঘোলে স্বাদ মেটাচ্চি, তবু চিত্রগুপ্তের দরবারে গিয়ে বলব যে পয়ঃরসের স্বাদ পেয়েচি কখনো,—থাক্—বাজে কি আর তর্ক ক'রে।

এইবার আমার সকল অপরাধের চরম শাস্তি হয়ে গেছে। মা আজ কাশী-বাসিনী—এটা তাঁর ধর্ম্মানুরক্তির জন্যে, তাঁর স্বেচ্ছার ফল নয়। এ আমার অপরাধের দণ্ড। কি আমি করেছিলেম—সেই কথাই বলব।

সেদিন, যেদিনকার ঘটনা আমার জীবন ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাক্‌বে, সেদিন সকালবেলা মেজ পিসশাশুড়ীর ছেলে অপূর্ব্ব আমাদের নিমন্ত্রণ করতে এলো।—জবরদস্ত "সাধ", এখনি যেতে হবে। সে আমাদের নিয়ে যাবে। ছেলেরা ত সব নাচ্‌তে সুরু ক'রে দিলে। শিবপুরে বোটানিক্যাল গার্ডেন দেখাতে হবে। স্বামী বল্লেন, "বেশ ত, কাল থেকে সেখানে বাগান দেখে সন্ধ্যার সময় সব ফিরলেই হবে।" মা তাঁর নাতি-নাতনীদের সাজিয়ে গুছিয়ে তৈরী হলেন। আমাকেও যাবার কথা বলেছিলেন। কিন্তু ছোট খুকীর রাত থেকে জ্বর হয়েচে বলে আমি যেতে চাইলেম না। মাও বল্লেন, "থাক্—কর্ম্মবাড়ীতে অনিয়ম হবে, কাজ নেই। বরং বিপিন বাবুকে ডেকে একবার ভাল ক'রে দেখাও, সর্দ্দি রয়েচে, ভাল নয়।" মা চলে গেলেন। আমার

মনটা ভার হয়ে রইল। গেলাম না খুকীর অসুখের দোহাই দিয়ে—মাও তাই বুঝে গেলেন,—কিন্তু ওগো আমার অন্তরবাসী অন্তর্যামী, তুমি ত জান অন্যের মুখের কথা—যে পাপের লালসা আমার মনের ভিতর জন্মেছিল, সে যে পাপ করেই শেষে আবার দংশাবে—তা কি আমি জানতে পেরে ছিলেম। সত্য প্রকাশকে আমি মিথ্যা দিয়ে ঢাকব না। খুকীর জন্য সত্যই আমার মনে ভাবনা হয়নি—হয়েছিল দুর্জয় অভিমান। নইলে বাঙালী গৃহের অন্তঃপুরবদ্ধা কুল-নারী আমি, উৎসব গৃহের স্বচ্ছন্দ মিলন আনন্দ-উৎসবের লোভ কি আমার মনেও জাগে নি? জেগেছিল বই কি। তবু যে গেলেম না—সে কেবল ভয় করতে। শ্বাঁর আত্মার নাত নাতিন দেখে জন্যেও আমার অভাব লাগে কি না, দেখুন। তাছাড়া সেখানে সবাই জিজ্ঞাসা করবে, কিগো শাশুড়ী এখন বৌ বলে ডাকে? মা বলতে দেয় ত? কাজ নেই আমার এত কৈফিয়ৎ কাটাব। স্বামী ভাত খেতে বসে বল্লেন, "আজ কোরিন্থিয়ানে "মধুর মুরলী" প্লে হচ্ছে,—যাবে? সকালবেলা পান্নু এসে একখানা রিজার্ভবক্সের টিকিট দিয়ে গেল। ছেলেদের হাঙ্গাম নেই—চল না—ঘুরে আসা যাক্।" মনে মনে লোভ খুবই হচ্ছিল। তবু বল্লেম, "খুকীর অসুখ, তাছাড়া মা যদি শোনেন?" স্বামী হেসে বল্লেন, "নাই বা বল্লে মাকে। বিপিন বাবু ত বলে গেলেন, খুকীর এমন কিছু নয়। যশোদা রাখবে এখন ওকে, কতক্ষণেরই বা মামলা।" কথা ঠিক; কতক্ষণই বা; ও ত যশোদারই কাছে বেশী সময় থাকে। নেহাৎ কাঁদে, দুধ খাইয়ে দেবে'খন। তবু মন বলছিল কাজ নেই, মা যদি জানতে পারেন—মেয়ে-ছেলে থিয়েটার দেখতে যাওয়া। লোভ বলছিল, এ আর এমনই কি অপরাধ। চিরদিনই কি ভয়ে চোর হয়ে থাকতে হবে। তুই ত এখন পাঁচ ছেলের মা—কোলের বেটি ত দোস। লোভ আর সংযম শক্তি যে কার বেশী সে খবর অনেকেই জানেন, আমিও জানতেম, তবু স্রোতে ভেসে যাবার মত মনের কাছে না জানাই ভান করেছিলেম। কিন্তু হে আমার পাষাণ ঠাকুর, তুমি যে এই পথে বসে জেগেছিলে, তাই না এ দারুণ পরীক্ষায় ফেললে। নইলে এ মুগ্ধা কুলাঙ্গনীকে স্বামীর কণ্ঠ দিয়ে এমন আশ্বাসের মোহন বাঁশী শোনাবে কেন। তোমার যে মোহনবাঁশীর মধুর সুরে অবলা ব্রজের বালা লজ্জা-ভয় কুল-মান সব ভুলে সর্বস্ব বিসর্জন দিয়ে অকূলে ভেসেছিল—সে বাঁশীর সুরে না ভুলবে কে। স্বামী বল্লেন, "চল!" তার উপর সব ভাবনার ভার সঁপে দিয়ে আমিও উঠলাম। কিন্তু এ যে অকূলের ডাক সে খবর কি তখন জানতেম।

থিয়েটারে অভিনব উপাখ্যানের সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য উপভোগ করে যাব, ঘরের কথাই ভাবছিলেম বেশী। খুকীটা কেমন আছে? কি করছে? কাঁদছে কি না, কে জানে? মন তাই থেকে থেকে চমকে উঠছিল। "মধুর মুরলীর" নায়িকা সেজেছিল বিখ্যাত অভিনেত্রী মিস্ গওহর। তার হাব-ভাব লীলা-চাতুর্য্য অভিনয় কুশলতা লোককে মুগ্ধ করে রেখেছিল।—আমার কিন্তু বেশী ভাল লাগছিল, ঐ সঙ্গে জড়ানো অন্য উপাখ্যানের নায়ক এক মাতৃভক্তকে

বল্‌বার এ সময় নয়—তাল মনেও নেই; শুধু সব-কিছুর মধ্যেও তার ভীষণ পরীক্ষা আমার মনের উপর আজও ছাপ্‌ মেরে রেখেচে। বাধ কষ্ট হওয়ায় যখন তার দুর্গতির চরম অবস্থা, এমনি সময় মার কুঁড়ে ঘরে গেল আগুন ধ'রে,—একমাত্র ছেলেটি গেল জলে ডুবে, সে কি ভীষণ পরীক্ষা। কাকে রাখবে কাকে ছাড়বে! মাতৃ-ভক্তিরই জয় হো'ল—জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়ে আশি বছরের বুড়ীকে সে কোন-রকমে বার ক'রে আন্‌লে। আর তার তরুণ-কান্তি বারো বছরের ছেলে অতল জলে তলিয়ে গেল। কিন্তু না, তা গেল না—যাঁর পরীক্ষা, তিনিই যে বিচারক! তাই ছেলে কোলে নিজে জলের ভিতর থেকে সেই শ্যামকান্তি নবজলধর ভুবনমোহন মূর্ত্তি তাঁর ভক্তকে নিয়ে উঠলেন। আনন্দে দুচোখ দিয়ে ঝর-ঝর ক'রে জল্‌ ঝর্‌ছিল। স্বামীকে বল্লেম, "থাক্‌, আর দেখ্‌ব না, বাড়ী চল।" স্বামী বল্লেন—"জগন্নাথ-দর্শনের বদলে পুঁইশাক দেখা! বৃথা তোমায় টেনে আন্‌লেম, চল।"

কড়া নাড়্‌তেই ঠাকুর এসে দরজা খুলে দিলে। তাড়াতাড়ি গিয়ে ঘুমন্ত মেয়ের গায়ে হাত দিলেম। গা যে পুড়ে যাচ্ছে! ওরে বাপ্‌রে, কত জ্বর! তার উপর যশোদা যা খবর দিলে, শুনে ত আমি বসে পড়্‌লেম। যশোদা বল্‌লে—আম্‌রা চলে যাবার খানিক পরেই মা ফিরে এসে ছিলেন, খুকীর জ্বর দেখে গেছলেন, তাই থাক্‌তে পারেননি। আমরা থিয়েটারে গেছি শুনে ছেলেকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে আধ ঘণ্টা পরেই চলে গেছেন। অপূর্ব্বই তাঁকে নিয়ে গেছে। রেল-গাড়ী না কি—তাইতে না কি কাশী গেছেন! ঠাকুরও সে কথায় সাক্ষ্য দিল। মা তবে আমাদের ছেড়ে গেছেন! এত-বড় অন্যায় কেমন ক'রে বা সইবেন! কাশীতে মার পিসিমা ছিলেন—নিশ্চয় মা সেইখানেই গেছেন। খুকী একটু সাম্‌লালে আমরা সবাই তাঁকে ফিরিয়ে আন্‌তে গেছলেম। মা এলেন না,—বলেছেন, সাধনার বিয়ের সময় আস্‌বেন। স্বামী আস্‌বার সময় চোখের জলে ভেসে বল্লেন—"একটা অপরাধ ক্ষমা কর্‌তে পার্‌লে না, মা?" মা বল্লেন, "একটা নয় বাপু, তোর একশোটা অন্যায় আমি ক্ষমা করেচি, করবও, কিন্তু তোদের সংসারের ভেতর আমায় আর টানিস্‌ নে—আমি আর পাচ্ছিনুম না। বিশ্বনাথ আমায় জুড়ুতে দিন একটু।"

মা তাঁর ছেলেকে ক্ষমা কর্‌তে পেরেচেন—তিনি যে ওঁর ছেলে! কিন্তু আমায়—? লোকে আমায় কত নিন্দা করে। শাশুড়ী আমার জন্যে তাঁর সাজানো সংসার, সাধের সন্তান সব ছেড়ে আজ কাশী-বাসিনী। ছেলেরা রাগ করে, আমার জন্যে ওদের ঠাকুমা চলে গিয়েচেন। স্বামী মুখে স্পষ্ট না বলুন কিন্তু মনটা তাঁর ভার হয়েই থাকে—কেন আমি এত কালেও তাঁর মন নিতে পারলেম না—তাঁর মা ত যেমন-তেমন মা নন! সব সত্যি! কিন্তু ওগো, তোমরা সবাই আমায় ব'লে দিতে পার, আমি রাগ করব কার উপর? আমার মার সঙ্গে দেখা হবার শুভদৃষ্টির শুভ মুহূর্ত্তটিকে—? না, চির-মাতৃহারা ক'রে যিনি আমায় এ সংসারে পাঠিয়েছিলেন, তাঁর উপর?

শ্রীইন্দিরা দেবী।

যদি সে

যদি সে ফিরে এসে, আবার ভালবেসে,
আমার মুখ পানে চায়!
পুরানো ছুটো কথা, গোপন মন-ব্যথা,
আমার কানে কয়ে যায়!
যদি সে জেগে উঠে সহসা আসে ছুটে
চমকি দেয় দুনয়ন।
দু-খানি বাহুডোরে বাঁধিয়া রাখে মোরে,
আদরে ভরে ত্রিভুবন।
যদি সে অনুপম মু'খানি মনোরম,
মুরতি মনোরম তার,
মাধুরী উছলিয়া জীবন উজলিয়া,
জীবনে আসে একবার।
দাড়িম-ফেটে-পড়া, গোলাপী-হাসি-ভরা,
অমিয় ছিয়ে-পড়া মুখ।
ডাগর কালো আঁখি চপল দুটি পাখী,
শীতল স্নেহ-ভরা বুক।—
যদি সে অনুরাগে, রঙীন ফুলে ফাগে,
নবীন করে ফিরে প্রাণ।
সুরভি-কুসুমিত, জোছনা-পুলকিত,—
গাহে সে পরিচিত গান।
দারুণ অভিমানে সজল দুনয়ানে
যদি সে আসে পুনরায়!
বচন বাধো বাধো মু'খানি কাঁদো কাঁদো
যাতনাহত বেদনায়।
যদি সে লীলাভরে মুখে না হাসি ধরে
আলোকে ভরে' চারিদিক!
তেমনি পাশে এসে তেমনি কাছে ঘেঁসে
দাঁড়ায় তেমনিটি ঠিক।
পরান-অঞ্চলে মুছায় আঁখিজলে,
ভুলায় কত ছলে আর!
চ'পাছি চুড়ি বাজে রহিয়া মাঝে মাঝে
নরম দুটি হাতে তার।
"কেমন! আজ ভাল? হয়ে যে গেছ কালো,
না দেখে এই ক'টা মাস;
এই যে আমি এই! তোমারি প্রিয় সেই!
বঁধু গো নহে পরিহাস।
স্বাধ না স্বাধ চেয়ে।" বলে সে চুমা খেয়ে
—অমৃত মিঠে নহে তত—
যদি সে বাহু-ডোরে বাঁধিয়া ফেলে মোরে
আদর করে শত শত।
যদি সে এলোচুলে কাঁকন বাহুমূলে
ছেলেকে কোলে তুলে কয়—
"চাহিয়া স্থাখো দিক, বাছারা হয়েছে কি!
স্নেহের এত পরিচয়?"
মুখরা সে আমার যদি সে একবার
আমার কাছে ফিরে আসে!
কঠিন বলে কথা জুড়াতে মন ব্যথা
আবার ফিরে ভালবাসে।

বৃথা এ মনো আশা সে জন ফিরে আসা
পিপাসা পড়ে রবে খালি!
মলিন চিন্তা-ধূমে কঠিন মরুভূমে
কেবলি বালি আর বালি!
পাখী না গাহে গান চাঁদের আলো ম্লান
কুসুমে পরিমল নাই।
দখিনে বাতাসেতে আর না উঠি মেতে
উড়িতে ছাই আর ছাই।

শ্রী কমলধন চট্টোপাধ্যায়।

২৬

ক্ষিতীশের বাসা থেকে সতীশ বেরিয়ে এসে যখন পথের মধ্যে দাঁড়াল, তখন রাত অনেক হয়েছে। জন মানবহীন নিস্তব্ধতার মধ্যে তার জোট খাওয়া চিন্তা-সূত্রের সেই খোঁজবার অবসরটুকু যেন তাকে নিমেষে সঞ্জীবিত করে তুললে।

তাজের গম্বুজের উপর চাঁদের আলোর শুভ্র হাসিটি যেন একশ' বার করে তাকে বলতে লাগল, পৃথিবীর কোন জিনিষই অবহেলার নয়। মানুষ নিজের হীনতার ছাপ দিয়ে তাকে কালো করে দেখে—অযথা স'রে দাঁড়াতে চায়।

কমলার কথা মনে করে তার মনের একদিক যেমন আনন্দে স্বস্তিতে ফুলে উঠতে লাগল—অপর দিকটা তেমনি কুণ্ঠায় গ্লানিতে ক্ষুব্ধ আহত হয়ে পড়ল। তার মার অনুজ্ঞা মনে পড়ল,—ঠিক কথাই শাস্ত্র বলে—হাজার অশিক্ষিত নিরক্ষর হন, তবুও মা মা-ই!—তিনি ত আগা-গোড়াই বলে এসেছেন, বেনামি উড়ো চিঠি বিশ্বাস করা তার কত বড় আহাম্মকি হয়েছে!

বাসায় যেতে মন চাইলে না। সে আস্তে-আস্তে ফিরে ক্ষিতীশের সঙ্গে যেখানে সাক্ষাৎ হয়েছিল সেইখানটীতে গিয়ে আবার বসল।

কি চমৎকার রাত, কি সুন্দর জায়গা!—দূরে যমুনার কালো জল—সাদা বালির উপর মৌন জ্যোৎস্না—যেন তারই মত জেগে বসে আছে। মাথার উপর দিয়ে একটা পেঁচা চীৎকার করে উড়ে গেল। তার শব্দের রেশটা আকাশে মিলিয়ে গেল—কিন্তু বুকের ভিতরটা অনেকক্ষণ যেন গুমরতে লাগল।

সতীশ ভাবলে,—তাইত, এই পেঁচাটার ত কিছুই ভাল লাগে না। এত আলো, এত শোভা থেকে কেন সে এমন ভাবে বঞ্চিত। আচ্ছা, সে নিজে বঞ্চিত, না আর কারুর ইচ্ছায় বঞ্চিত? কি জানি,—হয়ত, কেউই জানে না,—যে যা বলে, সব নিজের মন-গড়া কথাই বলে, বোধ হয়।

আবার সে ফিরে-ফিরতি নিজের কথাই ভাবতে বসল।

অসুখ শুনে কমলা অধীর হয়ে সব ভয়-ভাবনা নিন্দা-গঞ্জনাকে তুচ্ছ করে ছুটে গেছে তার মার সেবা করতে। আর সে? কাপুরুষ, কুপুত্র।

সতীশের চোখের সামনে কমলার ছবিখানি পরিস্ফুট সৌন্দর্য্যে ফুটে উঠল। রোগিণীর শয্যা-পার্শ্বে পতিগত-প্রাণা তার সতী সাধ্বী স্ত্রী কমলা; অনাহারে, অনিদ্রায় ক্ষীণ তনু—এই ত' সংসার, এই ত' স্বর্গ! তাই মানুষের মন কিছুতেই তাকে ছেড়ে যেতে চায় না; যেতে পারেও না।

গভীর প্রেম-প্রীতি-কৃতজ্ঞতায় তার হৃদয় উদ্বেলিত হয়ে উঠে' চোখ দুটিও অশ্রু-ভারাক্রান্ত হলো। তার মনে হলো—তার এখন একান্ত কর্ত্তব্য হচ্ছে অচিরে গিয়ে কমলাকে সাহায্য করা। নিমেষে আবার মনে মনে

কমলার কাছে নিজেকে সে নিয়ে গেল। কমলার কোমল দুখানি হাত নিজের কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে যেন বলচে—কমলা, তোমাকে কি আমি সন্দেহ করতে পারি!

এমন সময় পিছন থেকে পাহারাওয়ালা উচ্চ স্বরে হাঁকলে—কোন্ হ্যায়?

সতীশ তাকে তার অক্ষম দুর্ব্বল হিন্দিতে বুঝিয়ে দিলে যে সে একজন—মুসাফির।

প্রহরী বল্লে,—বাবুজি, বাঁশি কি বাজাতে হেঁ? সতীশ চেয়ে দেখলে, ক্ষিতীশের বাঁশিটি পড়ে রয়েচে। সেটাকে হাতে তুলে নিতেই—চৌকিদার একটু বক্র হাসি হেসে অন্যদিকে চলে গেল। তার হাসির অর্থ আর কিছুই নয়—দুনিয়াতে কত পাগলই আছে!

বাঁশিটা আগা-গোড়া নিরীক্ষণ করে সতীশ মনে মনে ভাবলে—এই একই জিনিষ, কিন্তু আমার ফুঁতে এটা কি কুৎসিত শব্দই না করবে! বাস্তবিক কি শুভক্ষণেই বাবুটির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল! আমার কমলাকে উনি বাঁচিয়েছেন—আমাকে আমার জিনিষ পৌঁছে দেবার জন্যে লক্ষ্ণৌ পর্য্যন্ত ছুটে ছিলেন! কপাল আমার!

কমলার জন্য হঠাৎ তার মনটা কেমন অশান্ত হয়ে উঠ্ল। মনে হলো কাজ নেই আর দেরী করে—কি জানি, কি হতে কি হয়—আজকের শেষ-রাত্রের গাড়ীতেই রওনা হয়ে যাই। কিন্তু এই বাঁশীটা কি করে ফিরিয়ে দেব? আচ্ছা, থাক্ না দিন-কতক আমার কাছে। আমিও একদিন তাঁর জিনিষ তাঁকে ফেরাতে যাব, সে বেশ হবে এখন।

পথে বেরিয়ে পড়ে সতীশ হন্-হন্ করে বাসার দিকে ছুটল। পথের কুকুরগুলো ঘেউ-ঘেউ করতে লাগ্ল। যেটা বড় কাছা-কাছি এসে পড়লো—তাকে বাঁশিটা উঁচোতেই সে পালিয়ে গেল। সে মনে মনে হেসে বল্লে, মন্দ কাজে লাগ্চেনা এটা। হয়ত আরো কাজে আস্বে একদিন!

বাসার দোর বন্ধ হয়ে গিয়েছিল—ডাকা-ডাকি করতেই খুলে দিয়ে চাকরটা বল্লে; বাবুজি, ভারি রাত হুয়া। তার হাতে একটা কেরাসিনের ডিপে—চোখদুটো সদ্য ঘুম ভাঙ্গাতে এখনো ছোট্ট হয়ে রয়েছে।

সতীশ বল্লে—রঘুয়া, আভি গাড়ি পাওয়া যায়েগা? অগার আনে শকেগা ত বকশিশ দেঙ্গা।

যো হুকুম—বলে রঘুবীর গাড়ীর উদ্দেশে বার হয়ে গেল।

জিনিষ-পত্র বড় কিছু ছিল না—তবে নেহাৎ লোটা-কম্বলও নয়। কারণ সতীশ কোনোদিনই হিমালয়ের গহ্বরে বসে যে ধ্যান-মগ্ন হতে পারবে—এমন আশাও করেনি এবং ততখানি মনের জোরও তার কোন কালে ছিল না।

বাসার ম্যানেজার-বাবুকে আর ডেকে তুলতে হলো না; তিনি একটু সতর্ক ধরণের লোক। পাছে কে কোনদিন চার্জ্জ না দিয়ে সরে পড়ে, এ ভাবনা তাঁর সর্ব্বদাই লেগে থাকত। আর সতীশকে তাঁর কেমন-কেমন বোধ হ'ত—যেন খামখেয়ালি—মতলবের ঠিক-ঠিকানা নেই। রাত্রে শুতে যাবার আগে তিনি খবর নিতেন, কে এল-গেল। বাসন-চুরির ভয়ে সন্ধ্যা না হতেই বাসার দরজায় খিল এঁটে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতেন।

দোর খুলতেই সতীশ তার সুমুখে পড়্‌ল। তিনি বলে উঠলেন,—কি মশাই, এত রাত হল যে! তার পরেই সতীশের হাতে বাঁশি দেখে বলে উঠলেন—আখড়ায় গিয়েছিলেন বুঝি?

সতীশ পৈতে-শুদ্ধ চাবিটা তালার মধ্যে পুরে দিতে দিতে বল্লে—না। এই একটু—আমার একজন বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গেছলুম।

ম্যানেজার বাবু অবাক্ হয়ে সতীশের দিকে চেয়ে রইলেন।—সতীশ ঘরের মধ্যে ঢুকে বাতিটা জেলে ফেলেই তার সংক্ষিপ্ত বিছানা-পত্র টেনে মাটিতে নামিয়ে ফেলে সব বেঁধে ফেল্‌বার উদ্যোগ করতে লাগল।

এদিকে রঘুবীর ফিরে এসে ভারি গলায় বল্লে—বাবুজি, গাড়ি নেহি পায়া—একঠো টম্‌টম্ লায়া!

সতীশ অন্যমনস্কভাবে বল্লে—আচ্ছা হো বাপা—উস্‌কো ঠাঁয়রণে বোলো।

ম্যানেজার বাবুর চক্ষু ক্রমেই বিস্ফারিত হয়ে উঠতে লাগল। ব্যাপার কি? লোকটা পালাচ্ছে না কি? গতিক ত' ভাল নয়, দেখ্‌চি!

রঘুবীর ঘরের মধ্যে ঢুকে বাবুজির বিক-কুল চিজ বিছানার মধ্যে পুরে দিয়ে একটা মস্ত মোট বেঁধে মাথায় করে গাড়ীতে তুলে দিতে গেল।

সতীশ বার হয়ে এসে বল্লে,—তবে এখন আমি ম্যানেজার বাবু, এই গাড়ীতেই মনে করচি—আমি বাড়ী যাব।

ম্যানেজার বাবুর আর সহ্য হল না—তিনি তখন অতি স্পষ্ট করেই বল্লেন—আপনার চাজ্জ?

সতীশ একেবারে অপ্রস্তুত হয়ে বল্লে—ইস্ তাইতো—একেবারে ভুলে গিয়েছিলুম মশাই—একটা তার—এই অবধি বলেই একটু ইতস্ততঃ করলে, তারপর একটা ঢোক গিলে বল্লে,—বাড়ী থেকে মন্দ খপর পেয়েচি কিনা, তাই বাড়ী যাচ্চি—তা আপনি কিছু মনে করবেন না।

ম্যানেজার বাবু অসন্তুষ্ট হয়ে বলে উঠলেন—তা হবে না মশাই—টাকা-কড়ি দিয়ে তবে যেতে পাবেন, নইলে-

সতীশের কেমন ধা করে রাগ হয়ে গেল, সে বল্লে—নইলে কি?—আপনি ত' বেজায় ছোটলোক দেখ্‌চি, মশাই!

ম্যানেজার বাবুর একটা মুদ্রা-দোষ ছিল—তিনি রাগলেই এক-একটা কথার এক-একটা অক্ষর অনেকবার উচ্চারণ করে ফেল্‌তেন। তিনি বল্লেন,—ছো-ছো-ছো-ছো-ছো ছো লোক তু-তু-তুমি না আ-া-া-া-মি? টাকা না দিয়ে চ-চ-চ-চ-লে যাচ্চ?

সতীশ বল্লে—কে—চলে কে যাচ্ছে, মশাই? টাকা দিতে ভুল হয়ে গেছে—তাই বলচি।

ম্যানেজার তখনি শান্ত হয়ে বল্লেন তাই বলুন।

—কত দিতে হবে?

—পাঁচ টাকা সাড়ে বারো আনা।

সতীশ তার হাতে ছটা টাকা দিয়ে বল্লে-খুচরো বাকিটা রঘুবীরকে দিয়ে দেবেন।

ম্যানেজার বাবু মহা খুসী হয়ে টাকাটা হাতে নিলেন। মনে মনে সতীশের প্রশংসা

বল্লেন—লোকটা দেখ্‌চি খাসা,—বিনা হিসাবে টাকা দেয়!

সতীশ সটান গিয়ে টমটমে চড়ে বল্লে,—হাঁক্‌কে যাও। টম্‌-টম্‌ গাড়ীর, মৃতকল্প ঘোড়ার পিঠে কোচমান চাবুক কশিয়ে দিয়ে জিভটা গালের মধ্যে পুরে একটা অদ্ভুত রকম শব্দ করলে—যাতে নাকি অশ্বজাতি পরম বিস্ময়ে একান্ত উত্তেজিত হয়ে ওঠে—টমটমের ঘোড়াও অমনি সে শব্দে প্রাণপণ বেগে ছুটতে সুরু করে দিলে।

২৭

হরেনের গলার আওয়াজ পেয়ে যোগেন মিত্র আর বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে পারলেন না। তাঁর বিস্ময়ের অবধি রইল না—এবং রাগটা এমন অপরিসীম হলো যে পায়ের হাঁটু দুটো পর্য্যন্ত ঠক্‌-ঠক্‌ করে কাঁপতে লাগল।

তিনি যখন বাড়ীর উঠানের মধ্যে এসে দাঁড়ালেন, তখন তাঁকে ঠিক মনে হলো যেন স্বয়ং মূর্ত্তিমান প্রলয়। চোখদুটো রাগে বড় এবং লাল হয়ে উঠেছে – কপালের উপর একটা শিরা ফুলে ধক্‌ ধক্‌ করছে,—কাঁচা-পাকা গোঁফ-জোড়াও ফুলে খাড়া হয়েছে।

যোগেন মিত্র চীৎকার করে বল্লেন,—পাজি, ছুঁচো, শূয়ার, হতভাগা, নচ্ছার—তুই এখানে কি করছিস?

তার বাপের রাগ যে কি জিনিষ, হরেন তা জানত, আর এও সে মনে মনে ঠিক করেছিল যে একদিন তার ভীষণ ধাক্কা তাকে পোয়াতেই হবে। তাই সে কোন কথার উত্তর না দিয়ে একটু আড়ভাবে দাঁড়িয়ে হেঁট হয়ে মাটির দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল। সে যে কতখানি নিজেকে সামলাচ্চে—তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল তার পকেটের মধ্যে পুরে দেওয়া হাত দুখানার ধরণ দেখে—মনে হচ্ছিল, বগলের নীচে থেকে তার কোট-টা বুঝি বা ফেটেই আসে।

পুত্রকে নির্ব্বাক দেখে মিত্রজা কিছুমাত্র শান্ত হলেন না—বরং রাগের মাত্রা তাঁর আরো চড়ে গেল। তিনি কমলাদের দিকে ফিরে বল্লেন,—এই রাস্কেলকে তোমার অন্দর মহলের মধ্যে ঢুকতে দিয়েছ কেন?—ওকে জুতো মেরে রাস্তায় বার করে দাও—এক তিলও দেরী করো না,—দাও।

হরেন বাপের দিকে মুখ ফিরিয়ে অকম্পিত স্বরে বল্লে—পরের বাড়ীতে ঢোকা যদি দোষ হয় ত' আমি একা দোষী নই।

ঠিক এমনভাবে কথার উত্তর শোনা জমিদার বাবুর মোটেই অভ্যাস ছিল না, তাই তিনি পুত্রের ঔদ্ধত্যে একেবারে অবাক হয়ে গেলেন। আর একটা কথা তাঁর মনে এলো যে পরের কাছে এমনভাবে অপমানিত না হবার উপায় তাঁর হাতেই ছিল।

এমন সময় কমলা ডাকলে,—জেঠামশায়। যোগেন একবার তার মুখের উপর দৃষ্টি ফেলে তাড়াতাড়ি এমন করে মুখ সরিয়ে নিলেন যাতে প্রকাশ হলো যে এই কুলত্যাগিনীর সঙ্গে কথা কওয়াও উচিত নয়—এইটেই তাঁর দৃঢ় এবং স্থির মত।

কিন্তু কমলা উত্তরের প্রতীক্ষা করে নি, সে খুব সহজভাবে কয়েকটি কথা অনর্গল বলে গেল:—

আপনাদের মস্ত ভুল হচ্ছে—আপনারা সবটা না জেনেই হরেন-দাকে অপরাধী মনে

করে নিচ্ছেন। অপরাধ আমরা এক বিন্দুও করিনি—তাই ভয়ও আমরা কারুকে করিনে। যদি ধর্ম্মের জন্যে সত্যের জন্যে আপনারা খোঁজ নেন ত' দেখবেন, কি জন্যে মানুষ মিছে-মিছি করে। মানুষ মানুষের বিচার করতে পারে না—তাই বিচারের প্রার্থনা করে এ সব কথা বলছিনে। বলছি এই কথাই মনে করে যে, আমাদের প্রতি অবিচার করে বিশেষ করে এক নির্দ্দোষ হরেনদাদার উপর অবিচার করে আপনি নিজেই না অপরাধী হয়ে পড়েন। এমন একদিন আসবে যেদিন এই মিথ্যের কেল্লা ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে যাবে—সেদিন কিন্তু এ জগতে আপনাদের মুখ রাখবার আর স্থান থাকবে না।

রঘুনাথের আর সহ্য হলো না। তিনি উঠে পড়ে বাঘের মত আক্রোশে কমলাকে আক্রমণ করে তার টুঁটি টিপে ধরে হিড় হিড় করে টেনে খিড়কির দোর দিয়ে বার করে দিয়ে বল্লেন—হার মজাদি, এই ক'দিনের মধ্যে থিয়েটার করতে শিখে এসেছিস্! চুলোয় যা—আমার বাড়ীতে তোর স্থান হবে না।

তারপর খিড়কির দরজা সশব্দে বন্ধ করে তাতে তিনি চাবি লাগিয়ে দিলেন।

রঘুনাথের কাণ্ড দেখতে সবাই ব্যস্ত ছিল, হরেন যে এর মধ্যে কখন কেমন করে বার হয়ে গেছে, তা' কেউ দেখতে পায়নি।

যোগেন্দ্র যেমন স্তব্ধ গম্ভীরভাবে এসেছিলেন, তেমনি ভাবেই বাড়ী ফিরে গেলেন। অল্পক্ষণের অভিজ্ঞতাটুকু যে জীবনের দুর্ভেদ্য বন্ধ হয়ে একদিন দাঁড়াবে—তা' তখন তিনি বুঝতেও পারলেন না।

* * * *

কিছুক্ষণের জন্য কমলা নিজেকে একান্ত অসহায় মনে করে অবিশ্রাম কেঁদে বুক ভাসিয়ে দিলে। কিন্তু কেঁদে মানুষের দিন যায় না। আকস্মিক নির্ম্মম আঘাতে মুড়িয়ে-পড়া মনটিকে আবার সে খাড়া করে তুলতে লাগল।

তার সব-চেয়ে বড় ভয়ের জিনিষ হলো—মানুষের সান্ত্বনা কি সহানুভূতির কথা। তাই সে ধীরে ধীরে উঠে বাগানের এক কোণে যে নিবিড় বাঁশের জঙ্গল ছিল, তার মধ্যে ঢুকে গেল। সেখানে যারা পাপের আলো রাখে, তারা যে কিছুতেই আসবে না—তা সে ভাল করেই জানত।

সেখানে বসে সে বেশ ভাল করে বুঝে নিতে চাইলে যে কি করবে। তারপর হাত দু খানি জোড় করে একান্ত মনে সে ডাকলে—হে ভগবান, শুনেছি নিরাশ্রয়ের আশ্রয় তুমি। এখন দেখিয়ে দাও, কোন্ পথ আমার পথ। আমি যে কিছু জানিনে।

ঠিক এই সময়ে তার রঘুনাথের কথা গুলো মনে পড়ল। সত্যি—যমই কি এখন তার শেষ আশ্রয়?

একটা ভীষণ আতঙ্কে তার সমস্ত দেহ-মনে যেন কাঁটা দিয়ে উঠল। আত্মহত্যা? না, তা কিছুতেই হতে পারে না। শুনেছি, তাতে আত্মার অনন্ত নরক!—কেন আত্মহত্যা করব? কি হয়েছে আমার? কি করেছি আমি? কিন্তু এই বাঁশ-বনের মধ্যেও ত' জীবন যাপন করা সম্ভব নয়। কিছু একটা উপায় করতেই হবে—একটা ত আশ্রয় চাই—চাই।

কমলা গালে হাত দিয়ে আবার ভাবতে লাগল। হায়! আজ যদি সতীশ কাছে থাকত! সে নিশ্চয়ই এমন করে অবিচার করত না।

করত না? ঠিক কি তাই? আচ্ছা, এমন করে সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে হিমালয়ে চলে গেলেন কেন তিনি? শোকে? না দুঃখে? কমলা আস্তে আস্তে মাথাটি নেড়ে বল্লে—কি শক্ত মানুষকে বোঝা! সবই ত অনুমান—অনুমান যে সত্য হবেই হবে—তা কে বলতে পারে!

সে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বল্লে,—বাবা, আর যে ভাবতে পারিনে—কতক্ষণে সন্ধ্যে হবে—কতক্ষণে গ্রামের লোক ঘুমিয়ে পড়বে।—তখন আমি যে দিকে দু-চোখ যায়, সেইদিকে চলে যাব।

মাথাটা হাঁটুদুটোর মাঝখানে রেখে কমলা কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল—মন আর ভাবতে চায় না—যা হবার হবে। মানুষ নিজের কথা ভাবতে ভাবতে যখন ক্লান্ত হয়ে ওঠে—তখন অপরের কথা আপনিই এসে জোটে।

তাই কমলা হরেনের কথা ভাবতে বসল। জেঠামশাই ত' তাকে ত্যাগ করেছেন; কিন্তু সে পুরুষ মানুষ,—কি ভাবনা তার! সবাই কিছু বাপের বিষয় পায় না। কত স্বাধীন এই জাতটি—আর কি বাঁধনেই বাঁধা আছি আমরা! হায় রে!

কমলা যখন এমনি করে পুরুষের সুখ-সুবিধাগুলো তাদের জীবনের দুঃখ কষ্টের সঙ্গে তৌল করচে—তখন দেখলে, পুকুরের পাড়ের উপর শশী এসে দাঁড়িয়েছে—তার কানা চোখটা তার দিকে, আর ভাল চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে পুকুরের একদিক থেকে আর-একদিক পর্যন্ত সে কি যেন খুঁজে বেড়াচ্চে। সে যে কিসের খোঁজে এসেচে, তা বুঝতে কমলার একটুও দেরি হলো না—এই সয়তানের দোসর দেখতে এসেচে যে কতক্ষণে তার শবটা জলের উপর ভেসে ওঠে!

কমলা, ভয়ে নিশ্বাস বন্ধ করে চুপটী করে বসে রইল। শশী কিছুক্ষণ এদিক ওদিক করে বল্লে,—এত সাগ্যিগির ভাসবে না,—কাল সকালে ফুলে ঢোল হয়ে ভেসে উঠবেই হবে, বাবা!

তার মুখে একটা কুৎসিত হাসি ফুটে উঠলো যা দেখে যমও আঁৎকে ওঠে। কমলা ভয়ে শিউরে উঠে চোখদুটো তাড়াতাড়ি বুজে ফেললে।

দেখতে দেখতে সন্ধ্যা হয়ে আসতে লাগলো। বাঁশবনের মধ্যে ঝিঁঝিঁ পোকারা সন্ধ্যার আগমনী কিছু আগে আগেই সুরু করে দিলে।

কমলা স্তব্ধ হয়ে সুযোগের প্রতীক্ষায় বসে রইল। শশী বাড়ী চলে গেল। মাঠ থেকে ফিরে আসবার পথে গরুর গলার ঘণ্টাগুলো ক্রমেই বেশী শোনা যেতে লাগল।

চারিদিকের শব্দ—আলোকের সঙ্গে যেন এক শান্ত মধুর মায়া রচনা করে কমলার চোখের উপর তন্দ্রার একটা পাৎলা পর্দা টেনে দিলে।

কমলা হঠাৎ চমকে জেগে উঠে চারিদিকে চেয়ে বল্লে,—কৈ, তিনি ত আসেন নি! ওমা—আমি কি স্বপন দেখলুম না কি!

এ ত সেই বাঁশ-বন—তেমনি করেই ত বসে আছি!

দুর্নিবার আবেগ তার সমস্ত হৃদয়-মনকে নির্দ্দয় পীড়নে মথিত করে যেন তার দম করে দেয় আর কি! তার দুই চোখ ফেটে অজস্র অশ্রুর ধারা বয়ে গেল।

২৮

সতীশ যে ট্রেণে উঠেছিল সেটা একটা গাধা প্যাসেঞ্জার। অর্থাৎ তার গতির চেয়ে স্থিতি বেশী, আর চলার মুখে সে কাউকে, বখে মেলের মত, অনাদর অবহেলা দেখিয়ে চলে যায় না। এই মন্থর-গতি গাড়ীখানার মধ্যে তার বেগবান মনটা খাঁচার-পোরা পাখীর মতই সমস্ত দিন ছট্‌-ফট্ করতে লাগল।

দুপুরের কড়া রোদে গাড়ীখানা থাম্‌লে তার ভিতরে আর থাকা যায় না। প্ল্যাট-ফরমেও ভীষণ রোদ—এম্‌নি করতে করতে শেষে শেষ-বেলায় মোগলসরাইএ এসে গাড়ীখানা একেবারেই দাঁড়িয়ে গেল। সতীশ সেখানে জলযোগ করে নিয়ে প্ল্যাটফর্ম্মে পায়চারি করে বেড়াতে লাগ্‌ল।

ওদিককার প্ল্যাটফর্ম্মে গাড়ীখানা এসে লাগল—তা থেকে কত লোক পিল্‌পিল্ করে নেমে পড়ে এই গাড়ীখানার দিকে ছুটচে! মেয়েরা এই গরমেও লাল নীল সবুজ রঙের র‍্যাপার গায়ে দিয়ে তাঁদের লজ্জা রক্ষা করচেন—কিন্তু গরমে প্রাণ তাঁদের গলদঘর্ম্ম হয়ে উঠেচে, যেন ওষ্ঠাগত প্রায়!

একজন বিধবা ছুটে এসে সতীশকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন—বাবা, এই গাড়ীখানা কি বর্দ্ধমান যাবে?

সতীশ হাঁ বলাতে তিনি ছুটে গিয়ে একখানা সেকেণ্ডক্লাশ গাড়ীতে চড়ে বসলেন শেষাশেষি একজন কালো উর্দ্দি-পরা টিকিট কালেক্‌টার এসে সেই গাড়ী থেকে বেচারাকে নেমে যেতে বল্লে। বিধবা ভয়ে অস্থির—বাবা, এক কোণে জড়সড় হয়ে বসে চলে যাব—থাকতে দাও—নাম্‌লেই গাড়ী ছেড়ে দেবে।

কেউ কারুর কথা বোঝে না; টিকিট কালেক্‌টরটি হিন্দুস্থানী।

সতীশ গিয়ে বল্লে—মা, আপনি অন্য গাড়ীতে যান—এটা দুনো ভাড়ার গাড়ী।

বিধবাটি নেমে পড়ে বল্লেন,—বাবা, তোমার গাড়ীতে আমাকে বসিয়ে নেও। না জানি পথ-ঘাট, বড় বিপদে পড়েই একলা বেরিয়েছি!

—আচ্ছা তবে আসুন—বলে সতীশ তাড়াতাড়ি চল্‌তে লাগল—আর দেরী নেই; গাড়ী ছেড়ে দিলে বুঝি!

গাড়ীটা নড়ে উঠ্‌তেই সাম্‌নের একখানা গাড়ীর দোর খুলে বিধবাটিকে তুলে দিয়ে সতীশ সেই গাড়ীতেই উঠে পড়ল।

এই বিধবাটির বয়স প্রায় চল্লিশ। রংটা এক সময়ে উজ্জ্বল ছিল; কিন্তু দুঃখে-কষ্টে আর সে জেল্লা নেই। চুল একটিও পাকেনি কিন্তু ছোট করে ছাঁটা। কপালে আর নাকের উপর নীল উল্কির দাগ।

ছুটোছুটির উত্তেজনার দরুণ উদ্বেগটা কমে গেলেই তিনি বল্লেন,—তুমি কোথায় যাবে, বাবা?

সতীশ বল্লে,—আমিও বর্দ্ধমানেই নামব, তারপর আমাকে জগদীশপুর যেতে হবে—সে বেশী দূর নয়।

বিধবা বল্লেন,—জগদীশপুর? আহা! মনে করতেও দুঃখু হয়। আমার দূর-সম্পর্কের এক মাসী থাকেন সেখেনে। উপযুক্ত পুত্তুর—কি ক্ষেপিই হয়ে গেল বাবা—হাবাগী বৌ মাগীর জন্মে। বৌ মাগী, শুনচি, তার বাপের বাড়ীর দেশের জমিদারের ছেলের সঙ্গে বেরিয়ে গেছে—এই কথা শুনে মাসির ছেলে একেবারে লোটা-কম্বল নিয়ে কোথায় যে নি-উদ্দেশ—হায়, হায়, মাসীর কপাল ধরেচে। এমন বেটা—শুনি না কি পশ্চিমে কোথায় পাঁচশ' টাকার চাক্‌রি করত,—সব জলাঞ্জলি দিয়ে চলে গেছে। ধন্যি মন পুরুষের। কি ভালই যে বাস্‌তে ছোঁড়া ঐ বৌ ছুঁড়িকে। তাও বলি বাবা, রাগ্‌লে কি সে তোর ভালবাসার মান? তাই বলে ভেবে ভেবে তুই কেন বয়ে গেলি? বৌ ছুঁড়ির নাকি অসামান্যি রূপ; হোক্ না কেন রূপ—বাংলা দেশে অমন ঢের-ঢের মেয়ে গড়াগড়ি যাচ্ছে—কে পোঁছে। সোজা কথা বাবা, পাঁচশ' টাকা মাইনে?

পরচুল-পরা নিজের ছবি যেমন আর্শিতে দেখে কিছুতেই হাসি সামলানো যায় না, সতীশের অবস্থা ঠিক তেমনি হলো—তার নিজের এই অতিরঞ্জিত কাহিনী শুনে। এই দূর-সম্পর্কের আত্মীয়ার সব-চেয়ে ব্যথা বেশী ঐ পাঁচশ' টাকার চাক্‌রিটির জন্যে। সতীশ মনে মনে হেসে বল্লে,—গাঁধিজীর নন্‌-কো-অপারেশন্ বাংলায় চলা শক্ত। কি চাক্‌রি-প্রিয়তা আবাল বৃদ্ধ-বনিতার!

সতীশ বল্লে,—আপনি থাকেন কাশীতে,—এত খপর আপনাদের কাছে পৌঁছল কি করে?

বিধবা একটু হেসে বল্লেন,—বাবা, বিদেশে থেকে আপনার জনের জন্যে কত যে মন হাঁক-পাঁক করে—তা তোমরা বোঝ না পুরুষ-মানুষরা। তা ছাড়া—আরো একটু কারণও আছে। আমার মাসীটি ঐ বৌ-ছুঁড়িকে বরাবরই দু'চক্ষে দেখ্‌তে পারতেন না। তাঁর ছেলের আর একটি যে দেবার ইচ্ছেও তাঁর ছিল—আমার পিস্‌তুতো ননদের এক মেয়ের সঙ্গে কথাবার্ত্তা অনেকটা এগিয়েছিল; কিন্তু যাক্ সে সব কথা—সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই। সে মেয়েটির বে হয়ত' আসচে মাঘ মাসে হয়ে যাবে।—সতীশ এই কথাগুলো বেশ সয়ে নিতে পারছিল, তার মানে সে মনে মনে স্থির জান্‌ত যে, কমলা এখন তাদের বাড়ীতে তার মাকেই শুশ্রূষা করচে।

বিধবা আর বেশীক্ষণ জেগে থাকতে পারলেন না—একটি কোণে কুকুর-কুণ্ডলি হয়ে শুয়ে পড়লেন। রাতটা ক্রমেই ঠাণ্ডা হওয়াতে সমস্ত দিনের হায়রানির পর ঘুমটা ভালই হলো—তার উপর আবার আগের রাতটা একেবারেই অনিদ্রায় কেটেছে।

সকালে মধুপুরে এসে গাড়ী দাঁড়াতেই সে নেমে পড়ে উপার-উপার দু-কাপ চা খেয়ে শরীরটাকে খাতে নিয়ে এলো। বিধবা বৈদ্যনাথের পাণ্ডার কাছে কিছু নির্ম্মাল্য আর প্রসাদি পেঁড়া সংগ্রহ করে নিলেন। গাড়ীতে প্রসাদ-ভক্ষণটা বৈধব্যধর্ম্মে বাধে না—এ কথা পাণ্ডা অনেকবার করে শুনিয়ে দিলে।

গাড়ীটার বর্দ্ধমানে এসে ঠিক বেলা চারটের সময় পৌঁছবার কথা; কিন্তু কি একটা কারণে আসানসোলে ঘণ্টা-দুই দেরী [illegible]

হয়ে গেল—তাই একেবারে অপরাহ্নে এসে গাড়ী বর্দ্ধমানে পৌঁছল।

সতীশ সুব্বারাত্রির কোন খোঁজ-খবর না নিয়ে সটান একটা কুলির সঙ্গে বাড়ী রওনা হয়ে পড়ল।

পথ অতিক্রম করে যতই বাড়ীর দিকে আসে, ততই যেন তার মনটা উদ্বেগে পূর্ণ হয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। মার অসুখ—তিনি কেমন আছেন? যাক্‌গে, সে নিশ্চয় ম্যালেরিয়া—দু-চার দিন নেটিয়ে ভাল হয়ে উঠ্‌বেন। তার পর তার কমলার কথা মনে হলো।

বৌকে যদি মা বাড়ীতে জায়গা না দিয়ে দূর করে দেন! না—তা' কি হয়? আমাকে না জানিয়ে—তাইত, আমি ছিলুম কোথায়! ইস্, তাই ত কি ভুলই করেচি! হে হরি—হে মা দুর্গা—এমন যেন না হয়।

গ্রামের মধ্যে যখন সে ঢুকল, তখন বেশ রাত হয়েছে। কারুর সঙ্গে দেখা হবার মত সময় আর নেই। সতীশ দুর্গা-নাম জপ করতে করতে এসে ভূপেন-ডাক্তারের ডিস্‌পেন্‌সারির কাছে দাঁড়িয়ে দেখ্‌লে—ডাক্তার নেই, কম্পাউণ্ডার একটা ভাঙা বেঞে বসে একখানা বাংলা কাগজ খুলে পড়চে।

সতীশ চেঁচিয়ে বল্লে,—ওহে নিতাই, ডাক্তার কোথায়?

—আজ্ঞে তিনি এইমাত্র একটা কলে বেরিয়ে গেলেন।...আপনি কবে এলেন? দরকার আছে নাকি? ফিরে এলে পাঠিয়ে দেব।

ভূপেন ডাক্তার কলে যান্‌নি—তিনি বাড়ী গিয়েছিলেন—কিন্তু সেটা বলা নিষেধ ছিল—সব সময়েই তিনি কলে যান এই রকম বলার কড়া হুকুম এই বেচারার উপর ছিল।

সতীশ বল্লে,—না, মা আছেন কেমন, জানো কিছু?

—আজ্ঞে তাঁর ত কুইনাইন চলচে।

সতীশ একটু দাঁড়িয়ে ইতস্ততঃ করে এগিয়ে গেল।

বাড়ীর সামনে এসে তার বুকের মধ্যটা ধড়াস্ ধড়াস্ করতে লাগ্‌ল।

কুলিটা হাঁকাহাঁকি করতে স্বয়ং দুর্গামণি এসে দোর খুলে দিয়ে মানুষ ভূত দেখলে যেমন করে চেয়ে থাকে, তেম্‌নি করেই চেয়ে রইলেন—তারপর চাউমাউ করে কেঁদে উঠ্‌লেন।

সতীশ তাঁকে নিরস্ত করে বাড়ীর মধ্যে নিয়ে গিয়ে কুলি বিদায় করার পর তাঁর বিনিয়ে বিনিয়ে কান্না শুনে উপলব্ধি করলে—যে কালনাগিনী এসেছিল আর ঠেকার করে বাপের বাড়ী চলে গেছে; তিনি তাকে বিধিমতে ঠাকুরসেবা করেছিলেন—কিন্তু—

সতীশ কোন কথা না কয়ে বাড়ী থেকে ধীরে ধীরে বার হয়ে কালিগাঁর পথ ধরে চল্‌তে লাগ্‌ল।

সমস্ত দিন স্নান নেই, আহার নেই—তার পায়ের তলায় সমস্ত পৃথিবীটা যেন টল্‌তে লাগ্‌ল—তবুও সে চল্‌চে—চল্‌চে—চল্‌চে।

শুষ্ক মাঠের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে তার আর পা চলে না। একটা উঁচু আলের উপর বসে পড়ে সে কালিগাঁর দীর্ঘ পথের দিকে চেয়ে রইল—এই পথ তাকে অতিক্রম করতেই হবে—যেমন করে হ'ক!

খানিক বিশ্রাম করার পর আবার সে

চলতো—কিন্তু আর ত চলা যায় না ভগবান্‌! পা যে ভারী পাথর হয়ে উঠেচে!

একটা ছোট নিমগাছের তলায় সে বসে পড়ল। চারিদিকে চাঁদের আলো ফুট্‌-ফুট্‌ করচে—আর সামনে ধূ ধূ অফুরাণ পথ। সতীশ চোখ বুজে একটু বিশ্রাম করে আবার উঠ্‌তে গিয়ে দেখে—কে ঐ পথের উপর দিয়ে দ্রুত পদে ছুটে চলেচে? মেয়েমানুষ, না?

তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াতেই কতকগুলো শুকনো পাতা খড়মড় খড়মড় করে উঠতেই মেয়েটি পথের ধারে নিসিন্দের ঝাড়ের পিছনে লুকিয়ে পড়ল।

সতীশ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। খানিক পরে মেয়েটি আবার বেরিয়ে তাড়াতাড়ি চলতে লাগল।

হঠাৎ তার মুখ থেকে বার হয়ে পড়ল—কে যায় ও? কমলা!

সে স্বর শুনে সেই পথের ধূলার উপর চক্ষের পলকে কমলা মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে গেল।

তার নিস্পন্দ দেহখানি নিজের কোলের উপর টেনে নিতে নিতে সতীশের দুই চোখে অশ্রুর সাগর উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠ্‌ল।

(ক্রমশঃ)*

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

ঘুম্‌তী নদী

ঘুরে ঘুরে ঘুম্‌তী চলে, ঝুম্‌ঝু তালে ঢেউ তোলে!
বেল্‌-চামেলির চুম্‌কি চুলে, খুশেল হাওয়ায় চোখ্‌ ঢোলে!
কুহু-কু-পাখীর উদুর রবে ঘুম ভাঙে তার, দিন কাটে,
ক্যাম্বাব-দোয়েল্‌-শালিক-শামা-বুলবুলিদের কন্‌সার্টে!
শনের ফুলে ছিটিয়ে সোনা শরৎ তারে সাজিয়ে যায়,
ভাঁড়-ফুলের কনক-জবা তার নিকষে যাচিয়ে যায়।
হেমন্ত ভেট দ্যায় তাহারে আনন্দে দুই হাত ভরি,
মুক্তো-কাটা গাজর ফুলের চিকণ চারু ফুল্‌করী!
শিশির আসে নীল আকাশে বকাঞ্চ ফুলের বক-ধ্বজা,—
উড়িয়ে ঘোষে মুল্‌-মুলুকের নিত্যদিনের নওরোজা!
সমারোহ সর্ষে-ক্ষেতে, জর্দ্দা-ফুলের একজাইএ—
খেলাঘরের খাস্‌-গেলাসের জলুস বাঁধা-রোশ্‌নাইএ!
ঘুরে ঘুরে ঘুম্‌তী চলে ঝিমঝিমিয়ে মন্থরে,
দিনের আলোর ফুল্‌কিগুলি বুক জুড়ে তার সন্তরে!

* * * *

---

* আগামী সংখ্যায় লেখক—শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত।

ঘুম্‌পাড়ানি ঘুম্‌তো নদী ঘুমিয়ে কি তুই পথ চলিস্‌,
ঘুমের ঘোরে ঘুরিস্‌ শুধুই স্বপন-পুরীর বোল্‌ বলিস্‌!
দুই কিনারায় ফুলের ফসল, পর্‌লে শাড়ী ফুল-পেড়ে,
আমের ছায়া নিমের ছায়া এড়িয়ে আগে যাস্‌ বেড়ে;
বসন্তে তোর ডাইনে বাঁয়ে ফুলের ধুলোট, ফুলের বান,
মগজ ভরে মন ভরে তোর সাত-আতরের ঐকতান!
জুলুম সুরু কর্‌লে নিদাঘ আগুন ঝুরো ছুটিয়ে লু
শিরীষ চাঁপার অঞ্জলিতে দিস্‌ ঢেকে তুই তার চিলু।
কাজ্‌রী যখন গায় মেয়েরা, বাদল-মেঘে দিয় কাজল,
আচেল্‌ কেয়ার পরাগ মেখে ভুঁই ক'রে যাস কেওড়া জল।
খোসবায়ে তোর খুসীর হাওয়া সোঁতের পিছল সঞ্চরে,
ফুলগুলো যায় ফড়িং ক'রে উড়ণ্‌-ফুলের রূপ ধ'রে।
ঘুরে ঘুরে ঘুম্‌তী চলিস্‌ ঝুম্‌কো ফুলের বন দিয়ে,
ঢেউ ঝিলিকে মাণিক জ্বেলে চাঁদের নয়ন নন্দিয়ে।

* * * *

সঙ্গীতে তোর তৈরী শরীর বঙ্গ-বীণার রঙ্গিণী!
জল-গজলির গজল-গানের তুই যে চির-সঙ্গিনী।
কৃষাণকে তুই করিস্‌ কবি, খয়রতে মন চমৎকার,
নূপুর পায়ে চলিস্‌ মৃদু দুলিয়ে কনক-চন্দ্রহার।
সুল্‌তানেদের সুলতানা তুই, নবাব-বেগম, রাজ-রাণী,
অপ্সরা তুই উর্ব্বশী তুই চার যুগই তোর প্রেমবাণী!
দুই হাতে তোর ডালিম-আনার, ভুট্টা-জনার ছড়িয়ে যাস্‌,
অড়হর-চানার মাঝখানে তোর যোজন-জোড়া ফুলের চাষ।
মস্‌জিদে তোর টিয়ের মেলা, মন্দিরে তোর চন্দনা,
পিক্‌ আফেরী-ময়না মিলে গায় তোমারি বন্দনা।
আনন্দে নীলকণ্ঠ পাখী বেড়ায় উড়ে তোর তীরে,
মাছরাঙাকে চম্‌কে দিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে তিত্তিরে।
ফুল-ক্ষেতে আর ফুল-খামারে পঞ্ছিদের আস্তানা
মুখ-চোখে ঠিক ফুল-বিলাসী সুলতানেরি ভাবখানা।
ঘুরে ঘুরে আস্‌ছে তারা, ভাস্‌ছে ফুলের মুখ চেয়ে,
ঘুরে ঘুরে ঘুম্‌তী চলে ঘুম-নিঝুমের গান গেয়ে॥

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

সঙ্কলন

বিলাতের পত্র

ব্লুম্‌স্‌বেরিতে আমাদের ছাত্রাবাস। এই পাড়াটি আজকাল লণ্ডনের ছাত্রদের কেন্দ্রস্থল হয়ে দাঁড়িয়েছে। শহরের মাঝখানে এই পাড়া; এর এক বাজুতে ইউনিভার্সিটি কলেজ, আর এক বাজুতে কিংস্ কলেজ, এ ছাড়া আরো অনেক শিক্ষার আয়তন এই অঞ্চলে আছে। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিস্তর ছাত্র এই পাড়ায় বাসা করে থাকে। প্যারিসে যেমন শিক্ষার্থীদের পাড়া হচ্ছে লাটিন কোয়ার্টার্‌স্, অনেকে মনে করেন লণ্ডনে ব্লুম্‌স্‌বেরি তেমনি হয়ে উঠবে — কলকাতার পটলডাঙ্গা কালেজীয় অঞ্চল যেমনি। ব্রিটিশ মিউজিয়ম আমার ঘর থেকে দেখা যায়। ব্রিটিশ মিউজিয়মের পিছনে অনেকটা খালি জমি পড়ে আছে, অনেক জায়গায় অস্থায়ী ঘর রয়েছে। সম্প্রতি সে জমি ক্রয় করা হয়েছে। দূর সাউথ কেন্‌সিংটন থেকে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় উঠিয়ে এনে ব্রিটিশ মিউজিয়মের পিছনে বাড়ী ক'রে বসাবার কথাও নাকি হচ্ছে, তা হ'লে এ পাড়াটি পুরোপুরি ইউনিভার্সিটির ছেলেদের বস্তি হয়ে যায়। কিন্তু সে বোধ হয় দূরের কথা।

আমাদের ছাত্রাবাসে আমরা আছি প্রায় পঁয়তাল্লিশ জন ছেলে। আমি একা ভারতবাসী। বাকী যে নানা দেশের। ইংরেজ অবশ্য বেশী। এক জন মিসরী — কপ্ট্ খ্রীষ্টান, — একজন গ্রীক, জন সাতেক [illegible], জন তিন সার্বিয়ান, তা ছাড়া আছে ফরাসী, ইটালিয়ান, সুইস, ডচ্। প্রায় সবাই ছাত্র।

লণ্ডনের বোর্ডিং হাউস-এ তিনমাস কাটালুম। দেখলুম যে বোর্ডিং হাউস এর চেয়ে এখানে দেখবার শোনবার সুযোগ বেশী। এক ওয়াই, এম, সী, এ, রিক্রিয়েশন্ ক্লাব কাছে আছে সেখানে মেয়েরা আসে। কলেজের ছাত্রী বেশীর ভাগ, হপ্তায় দু'দিন করে নাচ হয়—আমাদের হোস্টেলের ছাত্রেরা অনেকেই যায়। এরা আমায় একদিন নিয়ে যায়, তার পর এদের সঙ্গে থেকে মাঝে মাঝে যাই। এই ক্লাবে আর নাচের মজলিসে ইংরেজ সমাজের একটা অঙ্গ বিশেষের সঙ্গে পরিচয়ের সুবিধা পেয়েছি।

বোর্ডিং হাউস এর জীবনের পুনরাবৃত্তি করবার ইচ্ছে আপাততঃ নেই — যদি খুব অবসর পাই তো আর কথা। লণ্ডনে পৌঁছুলুম রেলে, মার্সেল্‌সের পথে গত সেপ্টেম্বর মাসের শেষে। আমি যা লণ্ডনে আগমনটা হয়েছিল একটু নূতন রকম করে। মার্সেল্‌সে আমাদের জাহাজ থামে, বিস্তর যাত্রী সেখানে নেমে গেল। আমরা ক'জন জাহাজেই রইলুম, কিন্তু জিব্রাল্টার দেখবার লোভ ছিল। আর কিছু প্রলোভনীয় ছিল না যাতে তাড়াতাড়ি আর এক দফা বন্দোবস্ত করা যেত। যাক শেষকালে আমরা র'য়ে গেলুম। জিব্রাল্টারে নামতে দিলে না, বারো ঘণ্টা থেমে, তারপরে পড়লুম বে অব বিস্কে, দিব্যি শান্তই রইল। পরের দিন লণ্ডনে পৌঁছুল আমাদের জাহাজ, টেম্‌সের মোহানার ভিতর দিয়ে দু'ধারের বন্দরের কোলাহল ছাড়িয়ে দিয়ে উজানে উঠলুম, জাহাজ গ্রেভ্‌সেণ্ডে এসে থেমে গেল। একটা খবর এসে আশঙ্কার কারণ ঘটিয়ে দিলে— ভীষণ ব্যাপার! ডক-স্ট্রাইক, অতএব গোলমাল বাধবে। সরকারী লোক এসে আমাদের পাসপোর্ট দেখে গেল মনে হ'ল এবার সুরাহা হবে। সাত হাজার মাইল এসে লণ্ডনের দোরগোড়ায় এরকম ভাবে আটকে গিয়ে ভারী বিরক্ত হ'য়ে গেল। অনেকের আত্মীয় স্বজন নৌকা আর লঞ্চ নিয়ে এল, মাল মাথায় কুলিকে চলে গেল। এতে আমরা যারা পড়ে রইলুম তাদের মেজাজটা আরও গরম হ'তে লাগল। আমরা কতকগুলি ভারতবাসী ছাত্র, আর কতকগুলি ইংরেজ। বাঙালি যে ক'জন ছিলুম, কি করা যায় পরামর্শ আঁটতে লাগলুম। ডাঙায় নামলে লণ্ডন অবধি যেতে পারবো কি না সন্দেহ ছিল; রেল চ'লছে না, ট্রাম আর বাসও নাকি বন্ধ হ'য়েছে বা হ'ল ব'লে শোনা যেতে লাগল। তার উপর দাঙ্গা ফেসাদের ভয়। দু'দিনে ব্যাপার

মিটবে তা জানা যাচ্ছে না; দু'রাত্তির জাহাজে থেকে আজকে খাবাদাবার পর আর থাকবো না ঠিক করলুম। জাহাজের এক ইংরেজ মেট্‌কে জিজ্ঞাসা করলুম—"কিহে, ব্যাপার কি রকম? যদি চুরি ডাকাতি মারামারি হবে না তো?" মেট বল্লে, "মারামারি তো সামান্য কথা, রেভলিউশন হবে।" বড় আশাপ্রদ কথা মনে হ'ল না। বন্ধু ব—হেসে আকুল। মেট্‌কে একটু কাতর ভাবে বল্লেন—"কিন্তু বোধ হয় ইংরেজ-কুলী লুটপাট খুন ক'রলেও নিরীহ বিদেশীর গায়ে হাত তুল্‌বে না"—ইংরেজ কুলীর নৈতিক উৎকর্ষে বন্ধুর অসীম বিশ্বাস। মেট্‌টি হ'চ্ছে একটা আনকোরা সোশ্যালিষ্ট; সে একটু উৎসাহিত হ'য়ে ব'ললে, 'লুট পাট, চুরি-ডাকাতি—এ তো আকছার ভদ্রলোকে বেমালুম ক'রছে। আমার আর আমার মত গরীব লোককে খাটিয়ে মারছে, আর আমাদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজকার করা কড়ি—আমাদের হক-মুখ থেকে কেড়ে নিয়ে বাবুয়ানী করছে। ইংলণ্ডের জন-গণ আমরা, আমরা দেখিয়ে দেবো যে আমরা ম'রে নেই।" তা তো হ'ল; আমরা এখন ক'রি কি? ব—বল্লেন—"ভায়া হে, সমুদ্র পেরিয়ে কি শেষটা কূলে এসে প্রাণ দেবে? রয়ে যাও, দু'চার দিন বইত না—বোঝার উপর শাকের আঁটি।" কিন্তু জি—ঠিক করলেন তিনি আর থাকবেন না—তিনি বেরিয়ে পড়বেন, প্রাণ থাক্ বা যাক্। কারণ দেরী হ'লে তাঁর কলেজে ভর্ত্তি হওয়া হবে না, দিন উৎরে যাবে। তাঁর এই ভীষণ পণ শুনে ব—আর আমি মহা উৎসাহে করতে লাগলুম। জি—for ever! কূলে অবতরণ করে, গ্রেভসেণ্ড থেকে যদি ট্রাম কি বাস্ মেলে তো তাতে ক'রে, নয় মোটর ভাড়া ক'রে লণ্ডনে যাবো ঠিক হ'ল। ট্রিড্‌লে কোম্পানীর লোক ছিল জাহাজে—সব ভারী মাল ট্রাঙ্ক প্রভৃতি তার কাছে স'পে দিলুম—আর সপ্তাহখানেকের মত কাপড়চোপড় আর দরকারী জিনিস একটা মস্ত কিট্-ব্যাগ ছিল তাতে পুরে নিলুম। তার পর আমাদের তিন মূর্ত্তিকে ডাঙায় নামিয়ে দেবে, 'এমন দেশে আছে কোন্ নায়' দেখতে লাগলুম। এক নৌকাওলাও জুটে গেল; জন পিছু সাত শিলিং হ' পেনি নিয়ে আমাদের গ্রেভ্‌সেণ্ডের জেটিতে তুলে দিলে। নৌকায় ওঠবার সময় আমাদের এই 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' দেখতে ডেকের রেলিঙে সব বড় সহযাত্রী সার করে দাঁড়াল। বন্ধু ব—চেঁচিয়ে বল্লেন 'ভায়া, লণ্ডনে পৌঁছে আমাদের উদ্ধারের ব্যবস্থা করো।' গ্রেভ্‌সেণ্ডে উঠে দেখলুম, ট্রাম আর বাস চলছে। আমার কিট-ব্যাগটা ছিল বিষম ভারী, জেটী থেকে বাসের কাছ অবধি সেটা ব'য়ে নিয়ে যাওয়া এক বিপদ হ'ল; এমন সময়ে এক জোয়ান ছোকরা এসে ব'ললে, 'Sir, gentleman, shall I carry it for you?' জিজ্ঞাসা ক'রলুম, বাস অবধি পৌঁছে দেবে কত নেবে। ব'ললে—one bob অর্থাৎ—এক শিলিং। তার হাতে ব্যাগটা দিয়ে আমাদের নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচলুম। এক-জন বৃদ্ধ লোকের কাছে জিজ্ঞাসা ক'রে জেনে নিলুম, বাস ক'রে যেতে হবে ডার্টফোর্ড অবধি, তারপর ডার্টফোর্ডে ট্রাম ধ'রে উলিচ, উলিচ থেকে গ্রীনিচ, তারপর ডেপ্টফোর্ড, তারপর লণ্ডনের সাদার্ক মহল্লা। আমরা তিনজন বাসের ছাদে চড়লুম। মারামারি দাঙ্গা হেঙ্গামের কোনও লক্ষণ দেখা গেল না। কিন্তু সকলের মুখেই একটা সন্ত্রস্ত ভাব—সবাই আশঙ্কার সঙ্গে কি দাঁড়ায় তারই অপেক্ষা করছে। বাসে চড়ে যেন একটু ভরসা হ'ল। বাঙলায় কথা ক'চ্ছি, সামনে এক ইংরেজ ব'সেছিল, সে দেখি কান খাড়া ক'রে শোনবার চেষ্টা ক'রছে। লোকটা একটা যেন আস্ত জন-বুল্; খুব মোটা চেহারা টকটকে রাঙা, গালে মুখে লাল শিরা দেখা যাচ্ছে, গা থেকে যেন রক্ত ফেটে পড়বার মত—গায়ের রঙ কসাইয়ের দোকানে টাঙিয়ে রাখা মাংসের মত। খানিক প'রে ঘাড় ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা ক'রলে—'কি ভাষায় কথা ক'চ্ছ? আমি ইণ্ডিয়া গিয়েছিলুম, কিন্তু এতো হিন্দুস্থানি নয়।' আমি ব'ললুম 'এ হ'চ্ছে বাঙলা, তুমি হিন্দুস্থানী জানো?' লোকটা ব'ললে—'থৌড়া ম্যালোম'—অর্থাৎ "থোড়া মালুম।" হাইদরাবাদে নাকি সে পাঁচ বছর ছিল এক ইঞ্জিনিয়ারের অধীনে কুলীর সর্দারী কাজে। লোকটা বেশ ভাল মানুষ বোধ হ'ল—লণ্ডনে যাবার পথ আমাদের সব বুঝিয়ে দিতে লাগল। বাস্ ছেড়ে দিলে,

প্রথম বিলেতের মাটীর উপর দিয়ে আমাদের এই প্রয়াণ। ব—একটু ভাবুক গোছের; বিলেত—শেষটা সত্যিই আমরা বিলেতে পৌঁছেচি। বিলেতের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি। যেন এই চিন্তা তাকে একটু অভিভূত করে ফেল্লে। জি—ভাবুকতার ধার ধারে না, যাকে stolid common sense-ওয়ালা লোক বলে, ও তাই; বাস চলছে—পনেরো কুড়ি বা ত্রিশ শিলিঙ খরচ করে লণ্ডন অবধি, মোটর ট্যাক্সি ভাড়া করতে হ'ল না—শিলিঙ খানেকের মধ্যেই সব হ'য়ে যাবে—এই চিন্তায় সে একটু বেশ প্রীতি অনুভব ক'রছে মনে হ'ল। রাস্তার দুধারে ঘর-বাড়ী, বাগান, পথ-চলতি লোক, গাড়ী, মোটর;—মনে হ'য়েছিল এ সব আমার কাছে কতই না জানি আশ্চর্য্য লাগবে—কিন্তু ও হরি! এ যে দেখি সবাই আমার চেনা। বিলেতে আসবার আগে ইংরেজি প'ড়ে, নভেল প'ড়ে, ছবি দেখে এখানকার লোকজন ঘর-বাড়ী রীতি-নীতির সঙ্গে আমাদের আগেই একটা পরিচয় হ'য়ে যায়—আমরা অনেক জিনিস যেন দেখবার জন্যে তৈরী হ'য়েই আসি—সুতরাং নতুনত্ব তেমন থাকে না। আমার মনে হয়, যখন প্রথম কলকাতার বাইরে পুরী কি কাশী যাই, বা হরিদ্বারে আর মুসৌরীতে হিমালয় দেখি তখন যেন নবীন-দর্শনের পুলক আরও বেশী হয়েছিল। পুরীর সমুদ্রের ধার, মন্দির, নানা জাতের লোকের সমাগম, স্থানীয় লোকদের সব সেকেলে বাড়ী; কাশীর পাথরের সব ঘাট, সরু সরু গলি, ওড়না গায়ে দেওয়া নথ নাকে পশ্চিমে মেয়ে; হরিদ্বারে গঙ্গার অপূর্ব্ব শোভা—দূরে হিমালয়ের বরফ, লছমন্-ঝোলার পাহাড়, গাছ-পালা আর গঙ্গা মিলে যে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করেছে—এ সবে যেন একটা অজ্ঞাত জীবন আমার চোখের সামনে খুলে দিয়েছিল—তাতে মনপ্রাণ এক অনির্ব্বচনীয় রসে ভরে উঠ্‌ত। কিন্তু লণ্ডনের শহরতলীর সব যেন অতি common-place—ধূলি-ধূসরিত, এমন কি কদর্য্য মনে হতে লাগ্‌ল। শহরতলী দিয়ে লণ্ডনে ঢুক্‌লুম—রেলের ষ্টেশন থেকে বেরিয়েই বড় সড়কের চটকে অভিভূত হ'য়ে পড়া ঘটাতে ঘট্‌ল না। মনে হ'ল, এ তো কলকাতার ভাব দেখ্‌ছি—আর সব ছবিতেও তো ঠিক এমনিটিই দেখিছি। বাস ছুটছে কানের পাশ দিয়ে হাওয়া সোঁ-সোঁ করে যাচ্ছে, সেইটীই যা একটু নতুন লাগ্‌ল।

ভারটফোর্ডে বাস বদলে ট্রামে যেতে হ'ল। সঙ্গী ইংরেজটীও ট্রামে ঢুকলো। আমরা তিন কালো আদমী যাচ্ছি; ব—এর কৌতুকবিস্ফারিত নেত্র, আমাদের ব্যাগে জাহাজের লেবেল আঁটা, আর খুব সম্ভব আমাদের পোষাক (আমি পরে ছিলুম এক ফ্ল্যানেলের পেন্টুলেন, আর এক অল্‌প কোট, জি—র সাদা পোষাক, আর ব—এর গলা-আঁটা কোট—এখানে দেখছি কেউই সাদা পোষাক পরে না)—দেখে, ট্রামে এক পাল মেয়ে-পুরুষ উঠল, তারা আড়চোখে চাইতে লাগ্‌ল—দুটী ছোট মেয়ে তো হাঁ ক'রে তাকিয়েই রইল। ইংরেজপুঙ্গব একটু অনাবশ্যক পাণ্ডাগিরি ক'রে নিজের প্রতিপত্তি আর সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে কৃতার্থ হ'ল; একটা জায়গা খালি হ'তে খামকা চেঁচিয়ে বলে উঠ্‌ল—'বহান্ ব্যায়ঠো,' কিনা, 'বহাঁ বৈঠো'। কাজেই গাড়ীর মধ্যে আর সবাই বুঝ্‌লে যে এই ইংরেজটী মস্ত প্রাচ্যতত্ত্ববিৎ—দু একজন একটু সম্ভ্রমের সঙ্গে তার প্রতি তাকালে। তাতে সে উৎসাহিত হ'য়ে দু-চার মিনিট অন্তর (বোধ হয় মনে মনে কথাগুলো আউড়ে নিয়ে) একটা একটা করে হিন্দুস্থানী বচন আমাদের উপর ছাড়তে লাগল—'ডেইখো (দেখো) আর 'লাণ্ডন শ্যার বৌট বর‍্যা শ্যার' (লণ্ডন শহর বহুৎ বড়া শহর) 'বৌট দুকান্, বৌট আডমি,—এই রকম অমূল্য তথ্য আমাদের দিতে লাগল। আমার ভারী মজা লাগ্‌ছিল; আমি একটু শক্ত হিন্দুস্থানীতে তাকে লম্বা একটা কি কথা ব'ললুম; দেখলুম বুঝ্‌তে পারলে না, একটু ঠোকর খাওয়া ভাবে তাকিয়ে হাস্‌তে লাগল মাত্র। তাকে খুসী করবার জন্য আমি শেষটা দু একটি হিন্দুস্থানী শব্দ ওজন ক'রে ক'রে বলতে লাগলুম; সেগুলো বুঝতে পেরে সে বিশেষ তৃপ্তিলাভ করলে। যখন নেমে গেল, তখন খুব ঘাড় নেড়ে 'সালাম' 'সালাম' ক'রে গেল।

ডার্টফোর্ড, উলিজ, গ্রীনিজ, ডেপ্টফোর্ড—বাসে আর ট্রামে চ'ড়ে বায়স্কোপের ছবিতে শহর দেখার মত

চোখের সামনে দিয়ে চ'লে গেল। সব গরীব লোকেদের জল-মজুরদের জন্য লম্বা লম্বা বস্তী খুব দেখলুম—সেগুলি বেশ ভাল লাগ্‌ল। স্ট্রাইকের লক্ষণ কিছু দেখা গেল না। ডেপ্‌টফোর্ডে ট্রাম ছেড়ে বাস ধরতে হবে। এক পাহারাওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করলুম—সাউথ কেন্‌সিংটান্‌ যেতে চাই, কোন্‌ বাসে চড়বো? এখন এখানে সব ট্রাম আর বাসের লাইন এত বেশী যে সংক্ষেপে নম্বরে উল্লিখিত হয়; কলকাতারও হয়ত এই রকম দাঁড়াবে, ট্রাম আর একটুখানি প্রসার লাভ ক'রলে; যেমন, শ্যামবাজারের লাইনকে একের লাইন, শিয়ালদার লাইনকে দুইয়ের লাইন, কালীঘাটের লাইনকে বারোর লাইন বলা—এই রকম। পাহারাওয়ালা ব'লে দিলে—অমুক নম্বরে চ'ড়ে ওয়াটার্লু ষ্টেশন অবধি যাও; সেখানে বাস্‌ বদলে অমুক নম্বরে চড়ে হাইড্‌পার্ক কর্ণার; তারপর সেখানে আবার বাস বদলে সাউথ কেন্‌সিংটন। ডেপ্টফোর্ডে বাসে ঠাঁই মিল্‌ল—কিন্তু বড্ড ভিড়, আবার মস্ত কিট্‌ব্যাগ নিয়ে জায়গা করা মুস্কিল হ'ল। ডেপ্ট্‌ফোর্ড থেকেই আসল লণ্ডন; ওঃ, কি ভয়ানক রাক্ষুসে শহর! একেবারে নতুন আমদানী আমরা; পথ-ঘাট কিছুই জানি না; গ্রেভ্‌সেণ্ড ছেড়েছি সকাল এগারোটা, এখন বাজে প্রায় তিনটে; কিছু খাওয়া-দাওয়া হয় নি। ক্রমাগত রাস্তার পর রাস্তা দিয়ে বাস্‌ চ'লেছে। ওয়াটার্লু ষ্টেশনে যখন পৌঁছুলুম, তখন দেখি, বাস বদলে অন্য বাসে চড়া মুস্কিল। ভয়ানক ভিড়; টিউব্‌-রেল চল্‌ছে না, বড় রেল চল্‌ছে না, একমাত্র বাস হ'চ্ছে সাধারণ লোকের আশ্রয়, কাজেই এক এক বাস্‌ এসে দাঁড়াতেই ৫০।৬০।৮০ জন লোক তাতে উঠবার জন্য ধাক্কা-ধাক্কি করতে লাগ্‌ল। আমরা অতি বিপদে পড়লুম; ভারী ব্যাগ নিয়ে ধাক্কা সামলানো দায় হল। বাসের প্রত্যাশা ছেড়ে ট্যাক্সীর চেষ্টা দেখতে লাগলুম, মিল্‌ল না; শেষে তিনজনে কোনও রকমে একটা বাসে ঢুকে পড়লুম। হাইড্‌পার্ক কর্ণারে গিয়ে যা দেখলুম তাতে বিভীষিকা লাগ্‌তে লাগ্‌ল! কি ভিড়, আর কি বাস আর মোটরের দৌড়। বিবেচনা ক'রে দেখলুম। আবার বাসে চড়বার চেষ্টা করা সম্ভব নয়। একটী ইংরেজ মহিলা আমাদের রাস্তা-হারিয়ে-যাবার মত ভাব দেখে বুঝতে পারলেন যে আমরা নতুন আমদানী—কোথায় যাবো জান্‌তে চাইলেন। তাঁর নির্দেশমত একটু ঘুরে এক ঘোড়ার গাড়ীর আড্ডা থেকে ব—গিয়ে এক ক্যাব নিয়ে এল। আমরা তিন জন তাতে উঠলুম—আর মহিলাটি বাসের জন্য অপেক্ষা করছিলেন, তিনিও ক্রমওয়েল রোডের দিকে যাচ্ছেন শুনে তাঁকে গাড়ীতে তুলে নিলুম। এইভাবে বেলা প্রায় পাঁচটায় ২১ নম্বর ক্রমওয়েল রোডে আমাদের আগমন। সেখানে ন্যাশনাল ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী শ্রীমতী বেক্‌ আমাদের অভ্যর্থনা করলেন, সেখানেই থাকবার ব্যবস্থা হ'ল।

এই রকমে লণ্ডন পৌঁছুলুম। গ্রেভ্‌সেণ্ড থেকে ক্রমওয়েল রোড, এই তিরিশ মাইল আন্দাজ পথ আমরা যে কষ্টে এসেছি তার একটা অস্পষ্ট ছবি মনের মধ্যে রয়েছে,—এখন লণ্ডনের অনেক জায়গা ঘুরেছি, এ শহরটার সঙ্গে পরিচয় হচ্ছে, এর উপর একটা কেমন টানও হ'য়ে যাচ্ছে—কিন্তু এই পরিচয়-সত্ত্বেও প্রথম দিনের লণ্ডনের ছাপ যা আমাদের মগজে প'ড়েছে সেটা কিন্তু যায় নি—লোক-জন, বাড়ী ঘর, ট্রাম-মোটরের উদ্দাম গতি, গাছপালায় আর মেয়েদের পোষাকে রঙের খেলা, একটা রাক্ষুসে আর অতি ভয়াবহ, সর্ব্বগ্রাসী, জীবনস্রোত, ধাক্কাধাক্কি, মোটরের ভেঁপুর রব, ঘোড়ার ছড়বড়ি এ সব মিলে মিশে একাকার হ'য়ে কিউবিস্ট বা ফিউচারিষ্ট চিত্রকরদের আজগুবি সৃষ্টির মত আবছা আবছা ভাবে চোখের সামনে ভাস্‌ছে।

আমাদের লণ্ডনে আসা এই রকম একটু নতুন ভাবে হ'ল। প্রথম থেকেই লণ্ডনের হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন অনুভব করতে পেরেছি। একটা ভারী অস্বস্তি বোধ হ'ত লণ্ডনের রাস্তায় বার হ'লেই; মনে হ'ত যেন কি একটা ভয়ানক ঘূর্ণিপাকের টান মানুষকে টেনে নিয়ে ফেলতে চায়, যেন লণ্ডনের যাঁতা-কল সবাইকে পিষে ফেলতে চায়। ক্রমাগত রাস্তা, মাইলের পর মাইল, অফুরন্ত রাস্তা, বড় বড় বাড়ী—পা ব্যথা করত হেঁটে, চোখ ব্যথা ক'রত দেখে। রাস্তায় চ'লতে চ'লতে

খালি যে পা খাটত তা নয়, চোখেরও বিরাম ছিল না, কানকেও সজাগ থাকতে হ'ত, মনও অমণের কাজে নিবিষ্ট হ'তে পারত না—নানা বিষয়ে তাকে টানাটানি ক'রে ব্যতিব্যস্ত ক'রে ফেল্‌ত। পাড়াগাঁ থেকে কোন ছেলেকে এনে চিৎপুর আর বড়বাজারে ছেড়ে দিলে বোধ হয় তার এমনি অবস্থাই হয়। ক্রমে কিন্তু সব বরদাস্ত হ'য়ে গেছে, শহরের ধাত বুঝতে পাচ্ছি, এখন একে ভালই লাগছে।

ক্রমওয়েল রোডে আমরা পৌঁছুতে আমাদের বাহাদুরিকে দু এক জন তারিফ ক'রলেন। জাহাজের বন্ধুদের নাগালে আনবার জন্য এঁরা কত চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু কিছুই করতে পারেন নি। ষ্ট্রাইকের জন্য লণ্ডনে খাবার আমদানি বন্ধ হ'ল, আমাদের তো ক'দিন সেপাইদের রসদের মত ওজন করে জিনিস দেবার ভাব ক'রলে। আমাদের adventure-এর দু'দিন পরে জাহাজ থেকে বন্ধুরা মুক্তিলাভ করে এসে পড়লেন। কিন্তু ষ্ট্রাইক তখনও থামে নি।

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

সবুজপত্র, কার্ত্তিক ১৩২১।

কোনো নেতার প্রতি

দেশে যা' বর্জ্জন করে, লোকে বলে, সেই আবর্জ্জনা;
তাই শিরোধার্য্য হ'ল? তাই হ'ল তব উপার্জ্জন?
বিদেশীর দরজায় পেয়ে উচ্ছিষ্টের কণা
থেমে গেল অকস্মাৎ ক্ষুণ্ণ-পুষ্ট সিংহের গর্জ্জন।

স্বদেশ একদা যারে দিয়েছিল ফুলের মুকুট
এ কি চায় সেই তুমি? মর্য্যাদায় রাজার অধিক—
ছিল যেই? এ কি ভিক্ষাবৃত্তি আজ? এ কি ঝুটমুট—
ঝুটা সম্মানের লাগি' সম্মানীর লাঞ্ছনা, ধিক্!

জীয়ন্তে জালিয়াঁ-বাগে পুঁতে ফেলে ভারত মাতার,
শ্রাদ্ধে দেবে স্বর্ণ-ধেনু; অগ্রাহ্য সে অমাঙ্গল্য দান;
ভাটেরা আসুক ছুটে, দলে দলে, ক্ষতি নাহি তায়,
তুমি যে ভিড়েছ সঙ্গে, এই ব্যথা, এই অপমান।

না লুকাতে রক্তচিহ্ন, না শুকাতে নয়নের পানি,
প্রবীণ স্বদেশ-ভক্ত! যেচে গিয়ে হ'লে অগ্রদানী।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

৮

চয়ন

পরীর ফোটো

পরীর ফোটোগ্রাফ!—অতি বড় বিশ্বাস-খোরেও এ-কথা শুনলে হেসে গড়িয়ে পড়বে। কিন্তু বিলাত থেকে স্যার আর্থার কনান ডয়েল পৃথিবীকে জানিয়েছেন যে, কেবল শৈশবের সোনার স্বপনেই এবং কুসংস্কারের অন্ধকারেই পরীর দল বাস করে না, এখনকার এই বিজ্ঞান প্রধান সভ্যযুগেও, বাস্তব-জগতেও সত্যসত্যই পরীর অস্তিত্ব আছে। খালি পরী নয়—বিলাতী ভাষায় বালখিল্য মুনিদের মতন যে ছোট্ট বেঁটে gnome বা "নোমে"দের কথা শোনা যায়—উপকথার পাতায় যাদের রাজ্য, তারা পর্যন্ত মানুষের কাছে আসে, নাচে-গায়, বাজনা বাজায়—এমন কি ফোটো তোলাতেও আপত্তি জানায় না।

বাস্তবিক, এ-সব কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। স্যার কনান ডয়েলও জোর ক'রে কারুকে বিশ্বাস করতে বলছেন না। কিন্তু তিনি এবং অন্যান্য আরো অনেকে বিশেষরূপে পরীক্ষা ক'রেও এ ব্যাপারটার মধ্যে কোন-রকম ফাঁকি জুয়াচুরি আবিষ্কার করতে পারেন নি। স্যার কনান ডয়েল যে-সব প্রমাণ বিস্তৃতভাবে পাঠকদের সামনে ধরেছেন, এখানে সে সমস্ত [illegible] অসম্ভব।



আইরিস ও বেঁটে যক্ষ

যাদের কৌতূহল হবে, তাঁরা গেল-ডিসেম্বরের ষ্ট্র্যাণ্ড ম্যাগ্যাজিন প'ড়ে দেখতে পারেন।

আসল ঘটনা সংক্ষেপে এই।—

আইরিস ও অ্যালিস দুটি "মেয়ে"-সম্পর্কে তারা বোন। আইরিসের বাপ বিলাতের একজন বিশিষ্ট ধার্ম্মিক লোক।

আইরিস প্রায়ই তার বাপকে এসে বল্‌ত যে, অ্যালিসের সঙ্গে বনের ভিতরে গেলে সে পরীদের দেখা পায়—পরীদের সঙ্গে তাদের বন্ধুত্ব হয়েচে। বলা বহুল্য আইরিসের বয়স ষোলো বৎসর হ'লেও তার বাপ এ-সব কথা তাহা কল্পনা ব'লেই উড়িয়ে দিতেন।

কিন্তু আইরিসের মুখে ক্রমাগত এক কথা শুনে ও তার আব্দারের দায়ে প'ড়ে বাপ শেষটা মেয়ের হাতে একদিন একটি ক্যামেরা দিলেন। আইরিস তার বোন অ্যালিসকে একটি পুকুর-পাড়ে বসিয়ে, একখানা ছবি তুলে বাড়ীতে ফিরে এল। সেই ছবিখানা দেখে বাপ একেবারে বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে গেলেন। কারণ ছবির ভিতরে অ্যালিসের চারপাশে একদল ছোট ছোট ডানাওয়ালা পরী দেখা গেল—নাচের আমোদে তারা মেতে আছে।

মাস-দুয়েক পরে আর-একখানা ফোটোতে আইরিসের সঙ্গে একটি "নোমে"র মূর্ত্তি উঠ্‌ল, সে শুধু নাচ্‌ছে না—সেইসঙ্গে বাঁশীও বাজাচ্ছে।

ফোটোগ্রাফের ভিতরে অনেক সময়ে "ডবল এক্সপোসারে"র দ্বারা জাল-জুয়াচুরি চলে। কিন্তু "নেগেটিভ" দেখলেই সে-রকম জালিয়াতি ধরা পড়ে যায়। এই দুখানি বিচিত্র ফোটোর "নেগেটিভ" স্যার কন্যান ডইল স্বয়ং পরীক্ষা ক'রে দেখেছেন। তার উপরে মিঃ স্নেলিং নামে ফোটোগ্রাফের



একজন প্রসিদ্ধ বিশেষজ্ঞকেও "নেগেটিভ" দুখানা পরীক্ষার জন্যে দেওয়া হয়েছিল। বিলাতের বিখ্যাত "অটোটাইপ কোম্পানী" এবং ইলিংওয়ার্থের ফোটোগ্রাফের প্রকাণ্ড কারখানার সঙ্গে আজ ত্রিশ বৎসরের উপর তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। যত-বড় পাকা জুয়াচোরই হোক্ না কেন, তাঁর চোখে ধুলা দেওয়া অসম্ভব,—কেননা ফোটোগ্রাফের সমস্ত গুপ্তকথাই তাঁর নখদর্পণে! মিঃ স্নেলিং তন্ন তন্ন ক'রে পরীক্ষার পর বলেচেন—"এই 'নেগেটিভ' দুখানা একেবারে আসল,এর-মধ্যে নকলের বা জাল-জুয়াচুরির নামগন্ধও নেই।"

আইরিস বলেছে, পরীদের উপরে তার কোন শক্তি নেই। তবে সে যখন বনের মাঝে গিয়ে শান্তভাবে ব'সে একমনে পরীদের কথা চিন্তা করে এবং তারপর দূর থেকে যখন একটা অস্পষ্ট শব্দ বা গতির ধ্বনি শুন্‌তে পায়, তখন পরীরা আস্‌চে বুঝে তাদের সাদর অভ্যর্থনা ক'রে কাছে ডেকে আনে!

এখানে অনেকে ভাবতে পারেন, এত লোক থাক্‌তে এই দুটি মেয়েই কেবল পরী ও 'নোম' দেখতে পেলে কেন?

এর সোজা উত্তর, এই মেয়েদুটির ভিতরে এমন কোন অলৌকিক শক্তি আছে, যা অধিকাংশ মানুষের মধ্যেই নেই। হয়তো আরো কত অজানা লোক এমন-সব বিচিত্র দৃশ্য দেখেচে, কিন্তু তারা হাস্যাস্পদ হবার ভয়ে গুপ্তকথা কথা ব্যক্ত করে নি, কিংবা কারুর কাছে প্রকাশ ক'রে থাক্‌লেও সে তা গাঁজাখুরি ব'লে উড়িয়ে দিয়েচে—ফলে সর্ব্বসাধারণের কানে আজ-পর্য্যন্ত পৌঁছবার সুযোগ পায় নি।

সব-চেয়ে পুরোণো পট

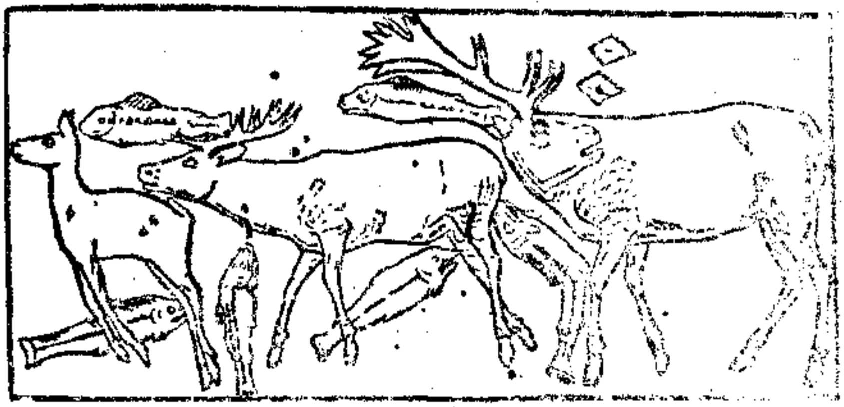
যতদূর জানা গেছে তাতে বলা যায় যে, সব-চেয়ে পুরোণো ছবি যে পটুয়া এঁকেছে, আজ থেকে বিশ হাজার বৎসর আগে সে অন্তিম নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে!

প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত স্যার রে, ল্যাঙ্কেষ্টার অনেক আলোচনার পর এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়েচেন।

সে সময়ে মানুষরা পাহাড়ের গুহায় বাস করত। গুহার বাইরে তখন সেকালকার সব ভীষণদর্শন অতি-কায় জীবজন্তু মানুষের ঘাড় মট্‌কাবার জন্যে সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাক্‌ত। সে-সব জীব আর পৃথিবীতে টিকে নেই। বাঁচা গেছে!

সেই আদি শিল্পী একটি মৃগ-শৃঙ্গের উপরে বসে বসে এই প্রথম ছবিখানি খুদে' খুদে' এঁকেছিল। পণ্ডিতদের মতে, ছবি-আঁকাই ছিল তার প্রধান কাজ।

দাক্ষিণ-ফ্রান্সের একটি প্রকাণ্ড গুহার ভিতর থেকে, সেকালের ব্যবহার্য্য আরো অনেক জিনিষের সঙ্গে এই ছবিখানি আবিষ্কৃত হয়েছে। এই ছবিখানি ছাপ মারবার জন্যে তৈরি করা হয়েছিল। চর্ব্বির সঙ্গে ভুষো মিশিয়ে ছবিতে মাখিয়ে, গাছের ছালের পোষাক বা পশু-চর্ম্মের উপরে এই চিত্রের ছাপ মারা হোতো ব'লেই পণ্ডিতরা অনুমান করেন। এতদিন পরে একালেও



সব-চেয়ে পুরোনো পট

এই নক্সার 'ব্লক' খানি ছাপিয়ে চমৎকার ছবি তোলা গেছে।

ছবিখানি জায়গায় জায়গায় খারাপ হয়ে গেলেও, এখনো এর নিপুণ অঙ্কন-পদ্ধতি দেখ্‌লে তারিফ করতে হয়। অত কাল আগেও শিল্পীরা যে কতটা স্বাভাবিক মূর্ত্তি আঁকতে পার্‌ত, না-দেখ্‌লে তা বিশ্বাস করা সহজ নয়। রেখাগুলিও যথেষ্ট হাতের কায়দার পরিচয় দিচ্ছে।

ছবিতে তিনটি হরিণ আর কতকগুলি মাছের রেখাচিত্র আছে। বড় হরিণের উপরেই যে দুটি সমচতুর্ভুজ রেখা রয়েছে, পণ্ডিতদের মতে সে দুটি শিল্পীর হাতের সই ছাড়া আর কিছুই নয়।

স্পিট্‌সলার

গত ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের নোবেলের সাহিত্য-পুরস্কার এ বৎসরে কবি কার্ল স্পিট্‌সলারকে দেওয়া হয়েছে।

তিনি জাতে সুইস হ'লেও লিখতেন জার্মান ভাষায়। স্পিট্‌সলার সুইজারল্যাণ্ডের প্রবীণ কবি। তিনি "Prometheus", "Epimetheus" ও "Olympischer" নামে গ্রন্থগুলি রচনা করেছেন। তাঁর বয়স এখন পঁচাত্তর বৎসর।

তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ-কিছু জানা যায় না। কারণ ক্ষুদ্র এক ভক্ত-মণ্ডলীর বাইরে, তাঁর নাম জানে এমন লোক খুব কম আছে। সেইজন্যে স্পিট্‌সলার নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন ব'লে পৃথিবীর অধিকাংশ লোকই রীতিমত বিস্মিত হয়েছেন।

সৃষ্টিকর্ত্তায় স্পিট্‌সলার যে খুব একজন প্রতিভাবান লেখক, তাও নয়; তবে উঁচুদরের কবি ব'লে স্বদেশে, ফ্রান্সে ও জার্মেনীতে কাব্যরসিকরা তাঁর প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন ক'রে থাকেন। ফ্রান্সে তিনি "সুইস ক্যাবেয়ার" (ফ্রান্সের একজন নামজাদা লেখক এবং মোপাসাঁ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ লেখকদের গুরুস্থানীয়) নামে বিখ্যাত। জার্মেনীতেও তাঁর ভক্তের অভাব ছিল না।

কিন্তু গেল যুদ্ধের সময়ে তিনি জার্মানদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে আপত্তি প্রকাশ করেছিলেন ব'লে, জার্মান ভক্তরা নাকি তাঁর প্রতি বিরূপ হয়ে উঠেছেন। তাই তাঁর স্বদেশী ভক্তরা জার্মানদের দ্বারা নিন্দিত এই কবির সত্তর জন্মদিনে, গত ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে বিপুল এক উৎসবের আয়োজন ক'রে-ছিলেন।

হাম্‌সুন্‌

১৯২০ খৃষ্টাব্দের নোবেলের সাহিত্য পুরস্কার পেয়েছেন ক্নুট্‌ হাম্‌সুন। হাম্‌সুন নরওয়ের বিখ্যাত ঔপন্যাসিক এবং জন-সাধারণের কাছে তিনি প্রায় কবি রূপেও পরিচিত। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা আগষ্ট মাসে তাঁর জন্ম। তাঁর বাপ-মা ছিলেন বড়ই



ক্নুট হামসুন

গরিব। ছেলে-বেলায় মুচীর কাজ করতে করতে তিনি কবি লিখতেন। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে তাঁর প্রথম উপন্যাস ও কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

কিন্তু মুচীগিরির কাজ তাঁর ভালো লাগল না। সুদূরের টানে তিনি দেশ ছেড়ে আমেরিকায় যাত্রা করলেন। সেখানে গিয়ে তিনি চাষবের কাজ থেকে সুরু ক'রে কেরাণীগিরি পর্যন্ত নানান রকম কাজে জীবিকার্জন করেন। এ সময়টায় তিনি সাহিত্য-সাধনা করেছিলেন খুবই অল্প। মার্ক টোয়েন প্রমুখ সাহিত্যিক ও বিপ্লববাদীর দলে তিনি যোগ দিয়েছিলেন। সাহিত্য-রচনা সম্বন্ধে বক্তৃতাও দিতেন, তার অনেকগুলো বই হয়েছে। এর পর তিনি ধর্মযাজকের কাজ ও ধর্ম-সাধনায় নিযুক্ত হ'য়ে পড়েন।

কিন্তু এই খাপছাড়া জীবনের বৈচিত্র তার মধ্য থেকে তাঁর স্বদেশের মাটির টান কেঁদে উঠত। তাই তিনি আবার দেশে ফিরে আসেন (১৮৮৪) কিন্তু কোপেনহেগেনে এসে বন্ধুর অর্থের অভাবে তাঁর জীবন এমন ভয়ানক হয়ে ওঠে যে, তিনি আত্মহত্যার চেষ্টা পর্য্যন্ত করেছিলেন।

তারপর তিনি সাহিত্যকে উপজীবিকা রূপে গ্রহণ করলেন। প্রথম প্রথম সাহিত্যও তাঁর পেটের ক্ষুধা মেটাতে পারে-নি। কিন্তু তিন বৎসর কাল একখানি জেলে-নৌকায় বাস ক'রে তিনি Hunger নামে যে আত্মজীবনীমূলক চিত্র বা উপন্যাসখানি লিখলেন, তাইতেই তাঁর যশ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। Hunger প্রথমে একখানি ডিনেমার সংবাদপত্রে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। এখানি পড়েই সকলে তাঁকে প্রথমশ্রেণীর ঔপন্যাসিক ব'লে মাথায় তুলে নেয়। এর পর তিনি ক্রমাগত বই লিখতে সুরু করেন। তার সব-চেয়ে আধুনিক উপন্যাসের নাম "Pan",—এটি একটি প্রেমের কাহিনী। এ ছাড়া হামসুনের "Mysteries," "Editor Lynge" ও "The Faith" প্রভৃতি উপন্যাসগুলিও সুবিখ্যাত।

তাঁর উপন্যাসে তিনি কঠিন বাস্তবের সঙ্গে ভাবের আবেগ এবং স্বপ্নময় অজানা রহস্যে মিলন দেখা যায়। একদিকে তিনি যেমন কল্পনার রঙ্গীন ঘুড়ি দিয়ে আমাদিগকে সুমধুর স্বপ্নের রাজ্যে উধাও ক'রে নিয়ে যান, অন্যদিকে তেমনি মানব-আত্মা নিয়ে নিরপেক্ষভাবে সমালোচনা করেন এবং মানুষের দুর্বলতা ও ত্রুটি দেখিয়ে, আবার তাদের বিচার-শক্তির পরিচয় দেন।

নাটক রচনাতেও তিনি অসাধারণ নাম করেছেন। নাটককার হিসাবে তাঁর একটা স্বাভাবিক বিশেষত্ব আছে, তাঁর চমৎকার কাব্য-রচনাকে তা ক্ষুণ্ণ করতে পারেনি। তাঁর নাটক "At the Door of the Wealthy", "Queen Tamara" (এটি সেরা নাটক) ও "Munken Vendt" প্রভৃতি নামের নাটকগুলি দেশ বিদেশে যথেষ্ট সুখ্যাতি অর্জন করেছে।

কিন্তু সাহিত্য-ক্ষেত্রে এমন প্রতিষ্ঠালাভ ক'রেও, হামসুন তাঁর নির্জন সাধনা-কুঞ্জ ছেড়ে, বাইরের কোলাহলের মধ্যে আর ঝাঁপ দিতে চান না। খ্যাতি বা সম্মানের তিনি কোনই তোয়াক্কা রাখেন না। তাঁর

পঞ্চাশ জন্মোৎসবের সময়ে দেশবাসীরা যখন "জীবন্ত কবিদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ" ব'লে তাঁকে অভিনন্দন দান করেছিল, তখনও তিনি বিজন বন-ভূমির মাঝখানে একখানি কুঁড়ে ঘরের ভিতরে গিয়ে আপনাকে লুকিয়ে ফেলেছিলেন। কিন্তু সেখানেও তাঁর ভক্তদের উপদ্রব শুরু হওয়াতে, তিনি আরো দূরে পালিয়ে গিয়ে, আপনার শৈশবের এক ক্রীড়াক্ষেত্রের মধ্যে আত্মগোপন করতে বাধ্য হয়েছেন।

এখন তাঁর বয়স একষট্টি বৎসর। কিন্তু তিনি যে নিজেকে বুড়ো ব'লে ভাবেন না, তাঁর "A Wanderer Plays With the Sardine" নামে উপন্যাসেই তার প্রমাণ আছে। লোকে বুড়োকেই সম্মানের ও শ্রেষ্ঠত্বের আসন দেয়, তিনি কিন্তু "Honor to the Young" নামে রচনায় যৌবনের কণ্ঠেই শ্রদ্ধার মাল্য অর্পণ করেছেন। পাঠক দেখবেন, আমাদের রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অনেক বিষয়ে হামসুনের মিল আছে।

পরলোকে টেলিফোন

আগুনের শিখায় যখন নশ্বর দেহ পুড়ে ছাই হয়ে যায়, মানুষের আত্মা কি তখনো পরলোকে জীবন্ত হয়ে থাকে?

আর পরলোকে আত্মার অস্তিত্ব যদি মেনেও নেওয়া যায়, তাহলে তারা কি বৈতরণীর এপারের বাসিন্দাদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করতে পারে? বিজ্ঞানের কল্যাণে আমরা এখন নানান রকম সূক্ষ্ম যন্ত্রের সাহায্যে পৃথিবীর বহু দূর-দূরান্তর থেকে সংবাদ আদান-প্রদান করতে পারি। তেমনি কোন সূক্ষ্মতর যন্ত্রের সাহায্যে নরলোক থেকে পরলোকের খবর পাওয়া সম্ভব কি না?

এ-যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উদ্ভাবক মিঃ টমাস, এ, এডিসন বলেন, "এমন ব্যাপার অসম্ভব নয়।" তাঁর মতে বিজ্ঞানের দ্বারা এ সমস্যা সমাধান করা যায়। তিনি একটি নতুন-রকমের যন্ত্র নির্ম্মাণের চেষ্টা করেছেন। পরলোকে সত্যি-সাত্যিই যদি আত্মার অস্তিত্ব থাকে, তাহলে এই যন্ত্রের মধ্যস্থতায় ইহলোকে সে বার্ত্তা প্রেরণ করতে পারবে।

তবে এখানে একটি মস্ত "কিন্তু" আছে। যে-সে প্রেতাত্মা এই যন্ত্রের সাহায্যে মানুষের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কইতে পারবে না। পৃথিবীতে যারা টেলিগ্রাফ বা বেতার টেলিফোন প্রভৃতি যন্ত্র ব্যবহার করতে জানত, এই নতুন যন্ত্রে কেবল তাদেরই মনের কথা ধরা সম্ভব হবে।

এডিসন বলেন, এখন "মিডিয়ামে"র সাহায্যে যে-ভাবে প্রেতাত্মাকে আহ্বান করা হয়, সে ব্যাপারটা যেমন আজগুবি, তেমনি বিজ্ঞান-বিরোধী। তথাকথিত অনেক "মিডিয়াম"ই জুয়াচোর;—অবশ্য সাধু "মিডিয়াম"ও আছেন—কিন্তু তাঁরা যা দেখেন ও যা শোনেন,সমস্তই আত্ম-সম্মোহনে অভিভূত হয়ে। এমনধারা ছেলেখেলা ক'রে কখনোই প্রেতলোকের বার্ত্তা পাওয়া যাবে না।

কিন্তু সত্যিই যদি প্রেতাত্মার অস্তিত্ব থাকে এবং মরণের অন্ধকার ভেদ ক'রে জীবনের চাঞ্চল্যের মধ্যে মনের ভাব জানাবার জন্যে যদি তারা বাস্তবিকই ব্যাকুল হয়ে ওঠে, তবে তারা জগতের ইথর-তরঙ্গ বা অন্ত-

কোন শক্তির দ্বারা এডিসনের উদ্ভাবিত এই যন্ত্রের সাহায্যে বার্ত্তা প্রেরণ করতে পারবে।

অনেকে ভাবতে পারেন, এডিসনের এই চেষ্টাও ব্যর্থ চেষ্টায় পরিণত হবে। কিন্তু ইতিমধ্যেই বিজ্ঞান এই ধরণের আরো অনেক অসম্ভবকে সম্ভব করেছে। যন্ত্রের সাহায্যে এখন অনেক মাইল দূর থেকে বাতির আলোর তাপের পরিমাণ স্থির করা যায়।—আকাশের সব-চেয়ে দূরবর্ত্তী তারার তাপও পৃথিবীর যন্ত্রে ধরা পড়ছে। এমন-কি কোন্ তারার বয়স অল্প আর কোন্ তারার বেশী, সেটা জানাও অসম্ভব নয়। পৃথিবীর এক-প্রান্তের মাটি একটুমাত্র কাঁপলে অন্য প্রান্তের যন্ত্রে তা টের পাওয়া যায়, এ খবর তো সকলেই রাখেন। রণক্ষেত্রের পরিখার জন্যে আর-একরকম যন্ত্র উদ্ভাবিত হয়েছে। ঘোর অমবস্যা রাত্রে ঘুটঘুটে অন্ধকারেও, শত্রুপক্ষের অধিকৃত শত শত ফুট দূরের পরিখার ভিতর থেকে কোন লোক যদি এক-পলকের জন্যেও মাথা তোলে, তবে তার মুখের তাপ পেয়ে যন্ত্রটি তৎক্ষণাৎ সকলকে ইসারা ক'রে সাবধান হ'তে বলবে!

অবশ্য যারা এ-সব যন্ত্রের ব্যবহার জানে না, এদের কাছ থেকে তারা কোন কাজও পাবে না। কোন ডাক্তার বা উকিল একটি টেলিগ্রাফ-আপিসে গিয়ে নিজে নিজেই তারের খবর পাঠাতে পারেন না। তাই এডিসনের মতে, একজন অজ্ঞ লোক যে ম'রে গেলেই একেবারে সবজান্তা হয়ে উঠে যে-কোন বৈজ্ঞানিক যন্ত্র ব্যবহারে অভিজ্ঞতা দেখাতে পারবে, এও বড় অসম্ভব কথা। এইজন্যেই এডিসন মতপ্রকাশ করেচেন যে, কেবলমাত্র বিশেষজ্ঞ লোকের প্রেতাত্মারাই তাঁর যন্ত্রে সাড়া দিতে পারবে।

যন্ত্রটির সমস্ত গুপ্তকথা এডিসন এখনো প্রকাশ করেননি। তবে তিনি যেটুকু বলেচেন, তাতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, তাঁর এই নতুন উদ্ভাবনাটি ভৌতিক বেতার-যন্ত্রের কাজ করবে—জীবন্তের কাণে সে মৃতের কণ্ঠস্বর এনে শোনাবে!

যে হাত বায়স্কোপ আর গ্রামোফোনের সৃষ্টি করেচে, বর্ত্তমান ক্ষেত্রেও হয়ত সে হাত ব্যর্থ হবে না। অদূর-ভবিষ্যতে হয়তো পৃথিবীতে মরণের রহস্য আর অজ্ঞাত থাকবে না—কারণ, আমাদের যখনি দরকার হবে, তখনি টেলি-ফোনের হাতল টিপে পরলোকগত আত্মীয়-বান্ধবের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কইতে পারব!

শ্রীপ্রসাদদাস রায়।

স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র সমাজপতি

সাহিত্য-সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি বহুমূত্র রোগে গত ১৭ই পৌষ তারিখে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স একান্ন বৎসর মাত্র হইয়াছিল। তিনি নিঃসন্তান।

সুরেশচন্দ্র যৌবন-বয়স হইতেই বঙ্গ-বাণীর সেবা করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার মত একনিষ্ঠ সাধক যে বাংলা ভাষায় বেশী আছেন, আমাদের এমন বিশ্বাস নাই। সম্ভবত সাহিত্যের প্রতি এই গভীর নিষ্ঠা

তিনি তাঁহার মাতামহ স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট হইতে স্বাভাবিক ভাবেই অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

এমন অনেক লেখক দেখা যায়, যাঁহাদের শক্তি যথেষ্ট, কিন্তু লিখিয়াছেন অল্প। এঁদের কাছ হইতে লোকে আশা করে ঢের, কিন্তু আশা-পূরণের উপাদান পায় বড় কম। দুর্ভাগ্যক্রমে সুরেশচন্দ্র এই শ্রেণীর লেখক ছিলেন। সাহিত্যের সঙ্গে এতদিন সাক্ষাৎ-সম্পর্ক রাখিয়াও, নিজে এমন শক্তিধর হইয়াও, সাহিত্য-ক্ষেত্রে তিনি যাহা দান করিয়া গিয়াছেন, তা মুঠা-ভরাও নয় এবং তাহাতে তাঁহার ক্ষমতার পূর্ণ পরিচয়ও পাওয়া যায় না।

অথচ তাঁহার হাতের ভিতর দিয়া অনেক অযোগ্য 'মানুষ' হইয়া গিয়াছে। বরাবর তিনি লেখক তৈয়ার চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন এবং নিজের ভাষার ইন্দ্রজালে অনেক কদর্য্য লেখাকেও অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে সাজাইয়া সাধারণের চোখের সাম্নে তুলিয়া ধরিয়াছেন। ফলে অনেক সময়েই যে 'বাহবা' তাঁহার প্রাপ্য, তাঁহারই দৌলতে সেটা লাভ করিয়াছে অন্যে। এ কথা যে সত্য, সুরেশচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা তাহার সাক্ষ্য দিতে পারেন।

লেখায় তাঁহার হাত যে কত মিঠা ছিল, সুরেশচন্দ্রের ছোটগল্পগুলিই তাহার প্রধান প্রমাণ। বঙ্গ-সাহিত্যের নবযুগে অল্প যে কয়েকজন লেখক প্রথম ছোটগল্প রচনায় ব্রতী হইয়াছিলেন, সুরেশচন্দ্র তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। তাঁহার রচিত "বাঘের নখ" ও "প্রাইভেট টিউটার" "কমলা" প্রভৃতি গল্প কতকাল আগে পড়িয়াছি, কিন্তু এখনো সেগুলির কথা ভুলিয়া যাই নাই। মনে হইতেছে, "সাধনা"য় রবীন্দ্রনাথও ছোটগল্প লেখায় সুরেশচন্দ্রের নিজস্ব নিপুণতার প্রশংসা করিয়াছিলেন।

সমালোচক রূপেও সাহিত্য-সমাজে সুরেশচন্দ্রের প্রতিষ্ঠা আছে। "মাসিক-সাহিত্য সমালোচনা" তাঁহার সম্পূর্ণ নিজের জিনিষ। মাসিক পত্রে তাঁহার আগে এ ব্যাপারটির অনুষ্ঠান আর কেহ করেন নাই। সকলেই দেখিয়াছি "সাহিত্যে"র পাতা উল্টাইয়া সর্ব্বাগ্রে এই সংক্ষিপ্ত সমালোচনা পাঠ করিতে বসিয়াছেন। এই সংক্ষিপ্ত সমালোচনা এতটা উপভোগ্য হইবার কারণ, ইহার লেখকের লিখনভঙ্গী, সমুজ্জ্বল হাস্যরস, অম্লমধুর রঙ্গ-ব্যঙ্গ। এমন-কি যাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া ব্যঙ্গবাণ নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, তিনি পর্য্যন্ত তাহার রস-উপভোগে বিমুখ হইতে পারিতেন না—পেটুকের পাতে রুইমাছের ঝাল ও তরকারি পড়িলেও সে যেমন না খাইয়া থাকিতে পারে না, এও তেম্নি। দীর্ঘকালের আলোচনায় ভুলচুক থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু দোষে গুণে জড়াইয়া এই "মাসিক-সাহিত্য-সমালোচনা" যে একটি অপূর্ব্ব ও বিচিত্র অনুষ্ঠান এবং ইহার সার্থকতাও যে অল্প নয়, তাহা কোনরকমেই অস্বীকার করা চলে না। তা ছাড়া এ জিনিষটি বাংলার সম-সাময়িক মাসিক-সাহিত্যের একটী সূচীপত্রের মতনও হইয়া রহিল। সুদীর্ঘকালের মধ্যে বাংলা মাসিক-সাহিত্যের ধারা কখন্ কোন্ পথে ছুটিয়াছে, কবে কোন্ লেখক আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন,

কে কি জিনিষ লইয়া সাহিত্যের হাটে আসিয়া নামিয়াছেন, এ-সব তথ্য ঐ মাসিক-সাহিত্য-সমালোচনার উপরে একবার-মাত্র চোখ বুলাইয়া গেলেই জানিতে পারা যাইবে। সুরেশচন্দ্রের সমালোচনার সঙ্গে সকলের মতের মিল না থাকিতে পারে, কিন্তু ঐসব লাভও বড় যে সে লাভ নয়।

সম্পাদক রূপে সুরেশচন্দ্রের শক্তি অত-বড় শত্রুও স্বীকার করিতে বাধ্য। বাংলা দেশের একজন ক্ষমতাবান ও সুযোগ্য সম্পাদক বলিয়া সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁহার নাম লেখা থাকিবে। দৈনিক "বাঙ্গালী" এবং সাপ্তাহিক "বসুমতী" তাঁহার সম্পাদকতায় কতটা উন্নতি লাভ করিয়াছিল, সে কথা এখনকার পাঠকমাত্রেই বলিতে পারিবেন। তাছাড়া তিনি কিছুকাল দৈনিক "নায়কে"রও সহযোগী সম্পাদক ছিলেন।

কিন্তু সুরেশচন্দ্রের সমগ্র জীবনের প্রধান কীর্ত্তি হইতেছে, মাসিকপত্র "সাহিত্য"। তরুণ বয়সে, দ্বিতীয় বৎসর হইতে তিনি সেই যে "সাহিত্যের" সেবার সম্পূর্ণ ভার নিজের হাতে তুলিয়া লইয়াছিলেন, তারপর মৃত্যুশয্যায় শুইবার পূর্ব্বমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আপনার কর্ত্তব্যপালনে ত্রুটি করেন নাই। তিনি ধনী ছিলেন না—বরং নিজের দারিদ্র্যের গর্ব্ব করিতেন। সুতরাং কত বাধা-বিঘ্ন, অভাব ও দুশ্চিন্তার মধ্যে, কত ঝড়-ঝাপটা সহিয়াও "সাহিত্যে"র জীবন-প্রদীপটি তিনি দুই হাতের আড়ালে এতদিন সস্নেহে জ্বালাইয়া রাখিয়াছিলেন, সে কথা ভাবিলেও অবাক হইতে হয়। যে দেশে ধনীর অজস্র অর্থব্যয়ও অধিকাংশ সাময়িক পত্রের জীবনকে দীর্ঘ করিতে পারে না, সে দেশে এই অভাবিত সাফল্য সুরেশচন্দ্রের অপূর্ব্ব সাহিত্য প্রীতি এবং দুর্লভ শক্তির পরিচয় দিতেছে।

"সাহিত্য" বরাবর বাংলা দেশের একখানি প্রধান ও প্রথম শ্রেণীর মাসিকপত্র বলিয়া আদর ও সম্মান পাইয়া আসিয়াছে এবং রবীন্দ্রনাথ হইতে আরম্ভ করিয়া বাংলার প্রায় সমস্ত শ্রেষ্ঠ লেখকেরই হাতের ছাপ তাহার গায়ে অঙ্কিত আছে। "নব্যভারত" ছাড়া বাংলার আর কোন মাসিক-পত্রই এতকাল ধরিয়া কেবলমাত্র একজনের প্রাণপণ চেষ্টায় ও সেবায় বাঁচিয়া থাকিতে পারে নাই। আজ সুরেশচন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গে "সাহিত্যে"র জীবন-শিখাও নিবিয়া গেল। বাংলা সাহিত্যের পক্ষে এটা একটা মস্ত দুঃখের বিষয়; কারণ এদেশে ভালো মাসিক কাগজ দুই-তিনখানির বেশী নাই।

অকালমৃত সুরেশচন্দ্রের পরলোকগত আত্মার মঙ্গল-প্রার্থনা এবং তাঁহার শোকতপ্ত পরিবার-বর্গের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া আমরা বিদায় হইলাম।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

আলোচনা

গত মাসের ভারতীতে "নাস্তিকের গল্প" প্রবন্ধে লেখক শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন, "মিল তর্কের ঝড় ছুটিয়ে শেষ জীবনে মৃত্যু শয্যায় যখন দেখেন যে আর জীবন যেতে বাকী নাই, তখন তাঁর বন্ধুদের দিকে চেয়ে বল্লেন "ভগবান নামক কোন জিনিষ তোমরা বিশ্বাস কর?" সকলেই বলে উঠলেন, "খুব—মিল, জীবন থাকতে তুমিও বলে যাও, ভগবান আছেন, ক্ষমা পাবে।" তখন তর্করাজ শেষ নিশ্বাস টানতে টান্‌তে বল্লেন, "If there be any God, let Him forgive me" মৃত্যুর গলা টিপনী থেয়ে তাঁর মুখে এই নাম বাহির হল।" আমিও পাঠ্যাবস্থায় এক পাদরী সাহেবের বক্তৃতায় শুনিয়াছিলাম যে মিল বলিয়াছিলেন "If there be any God and if there be any soul, let God save my soul." কিন্তু এ পর্য্যন্ত জন ষ্টুয়ার্ট মিল সংক্রান্ত পুস্তকাদি পাঠ করিয়া এবং এ বিষয়ের অনুসন্ধান করিয়াও এই উক্তির সত্যতা নির্দ্ধারণ করিতে পারিলাম না। কয়েকজন দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপককেও এ বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম কিন্তু তাঁহারাও এ বিষয়ে কিছুই অবগত নহেন। আমার ধারণা এইরূপ অমূলক উক্তি নাস্তিক-বিদ্বেষী পাদরী দ্বারা রচিত ও প্রচারিত হইয়াছে। লেখক যদি কোন খ্যাতনামা লেখকের গ্রন্থ হ'তে এই উক্তির সত্যতা প্রমাণ করিতে পারেন, তবে তাঁহার নিকট বিশেষ উপকৃত এবং বাধিত হইব।

শ্রীযোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

তারকা ও ফুল

সে ডাকি' কহিল, পথের ধূলায় লুটি,'
—সেফালির মত সকরুণ আঁখি দুটি,
'লহ ওগো মোরে লহ,
নিষ্ঠুর তুমি নহ।'—
সুন্দর ফুল, কেন উঠেছিলে ফুটি'?
কেমনে কুড়া'ব?—জোড়া যে এ হাত দুটি।

সে ডাকি' কহিল সাঁঝের গগনে ফুটি',
—তারকার মত সুগভীর আঁখি দুটি,
'বন্ধু, তোমারে চাই
এই আকাশের ঠাঁই!'—
সুদূর স্বপন, কে দিবে আমারে ছুটি?
মাটির ঢেলায় চাপা যে চরণ দুটি।

সে যবে কহিল নখেতে কাঁকন খুঁটি',
—রমণী আমার, আনত নয়নদুটি,
'ব্যথার নিশীথে প্রিয়,
আমারে জাগায়ে দিও!'
তারা আর ফুল এক সাথে ওঠে ফুটি'—
বিরহে স্বপন, হৃদয়ে সে ভরে মুঠি!

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার।

সমালোচন

আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর *

আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দরের পরলোক গমনের পর তাঁহার সম্বন্ধে যে সন্দর্ভগুলি নানা সংবাদ ও সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়, সেইগুলি এবং আরও কয়েকজন মনীষীর দ্বারা আরো কয়েকটি প্রবন্ধ লেখাইয়া লইয়া 'আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর' নামে এই সংগ্রহ পুস্তকখানি প্রকাশিত হইয়াছে। এ চেষ্টা বাঙ্গলায় বোধ হয় এই প্রথম, এবং এ চেষ্টা যে সার্থক হইয়াছে, সে শুধু সম্পাদক মহাশয়ের অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের গুণে।

আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দরের জীবনে পঞ্চাশ বৎসর যেদিন পূর্ণ হয়, সেদিন কবিবর রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে অভিনন্দন প্রদান করেন। সেই অভিনন্দন-পত্রে আচার্য্যের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন, "পূর্ব্ব দিগন্তে তোমার প্রতিভার রশ্মিচ্ছটা স্বদেশের নবপ্রভাতে উদ্বোধন সঞ্চার করিয়াছে। জ্ঞান প্রেম ও কর্ম্মের শতদলে চিরদিন তুমি দেশমাতার পূজা করিয়াছ।...

সাহিত্য পরিষদের সারথি তুমি এই রথটিকে নিরন্তর বিজয়পথে চালনা করিয়াছ। এই দুঃসাধ্য কার্য্যে তুমি অক্রোধের দ্বারা ক্রোধকে জয় করিয়াছ, ক্ষমার দ্বারা বিরোধকে বশ করিয়াছ, বীর্য্যের দ্বারা অবসাদকে দূর করিয়াছ এবং প্রীতির দ্বারা কল্যাণকে আমন্ত্রণ করিয়াছ।...

প্রিয়গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রিয় তুমি...নিধিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নিধি তুমি...ইত্যাদি ইত্যাদি।

কবিবরের এই কথাগুলি যে একটুও অতিরঞ্জিত কবিকল্পনা নয়,—নিছক সত্য, তাহা এই গ্রন্থান্তর্গত সন্দর্ভগুলি পাঠ করিলে সঠিক বুঝা যায়—এই গ্রন্থখানিতে রামেন্দ্রসুন্দরের সর্ব্বাঙ্গীন পরিচয় পাওয়া যায়—পরিপূর্ণ মানুষটিকে সম্পাদক দেশের লোককে বেশ বুঝাইয়া দিয়াছেন। বাঙ্গালী হইয়া বাঙ্গালার মনস্বী আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দরকে যিনি না জানিবেন তাঁহার বাঙ্গালী জন্মই বৃথা হইবে।

জ্ঞান বিজ্ঞান সাহিত্য ও ভাষার সেবায় রামেন্দ্র-সুন্দর সেকালের আদর্শ পুরুষ। একালের যুবকগণ পিছনে দাঁড়াইয়া দেখিবে রামেন্দ্রসুন্দর স্বদেশের সেবা করিয়াছেন, তাহার কাছে দীপক-রাগের রক্ত হা-স্যটিকে দক্ষ বাগ্মীর বাক্যবাণ বিস্তার নিতান্ত তুচ্ছ ও অসার।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় রামেন্দ্রপ্রসঙ্গে কয়টি সুন্দর কথা বলিয়াছেন—"রামেন্দ্রবাবু বড় উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন।... পরনিন্দা, পরচর্চ্চা, হিংসা দ্বেষ—এগুলি তাঁহার ছিল না।

'রামেন্দ্রবাবু বড় কোমলপ্রকৃতি ছিলেন। শাস্ত্রের উপর রামেন্দ্রের প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। তিনি সকলই পড়িতেন, নিপুণ হইয়া পড়িতেন, হজম করিবার জন্য পড়িতেন, হজম না করিয়া ছাড়িতেন না। তাই অতি কঠিন বিষয়ও সহজেই বুঝাইয়া দিতে পারিতেন।...

"রামেন্দ্র দেশহিতের জন্য তিনটি অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন—একটি সাহিত্য-পরিষৎ, একটি সাহিত্য-সম্মিলন, আর একটি সাহিত্য পরিষদের মন্দির।...

"তিনি যদি কলিকাতায় আসিয়া বিদ্যার উপাসনা না করিয়া মা লক্ষ্মীর উপাসনা করিতেন, বোধ হয় লক্ষ লক্ষ টাকা রাখিয়া যাইতেন,—তাঁহার সময়ের অনেক লোক ত এমন রাখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তিনি মহাবীরের মত সে প্রলোভন হইতে আত্মরক্ষা করিয়াছেন।...

'লোকে বলে রামেন্দ্রবাবু Nationalist ছিলেন। এ দেশ-হিতৈষিতা তিনি নেতাদের নিকট পান নাই।

* আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত সম্পাদিত। বেঙ্গল বুক কোম্পানি, ৩০নং কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা, ১৩২৭। মূল্য দুই টাকা।

কারণ, জেতাদের সহিত তিনি বড় একটা মিশিতেন না। কলেজ, ঘর, আর সাহিত্য-পরিষদ, এই তাঁহার স্থান ছিল।"

শাস্ত্রী মহাশয়ের এই কয় ছত্র লেখায় রামেন্দ্রসুন্দরের যে পরিচয়টুকু ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা হইতেই রামেন্দ্রসুন্দরকে পরিপূর্ণভাবে বুঝিবার সুযোগ পাওয়া যায়।

রামেন্দ্রসুন্দর শুধু বিজ্ঞানের আলোচনা লইয়া ক্ষান্ত ছিলেন না; তাঁহার ন্যায় দার্শনিক একালে বিরল। তিনি তাঁহার বিবিধগ্রন্থে বিজ্ঞান ও দর্শনের বহু জটিল তথ্যের এমন সুন্দর আলোচনা করিয়া তাহার সহজ সমাধান করিয়াছেন, যে অবিশেষজ্ঞ পাঠকও তাহার রস সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারেন।

অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ যথার্থই বলিয়াছেন,—দেশ-বিশ্রুতকীর্ত্তি রামেন্দ্রসুন্দর আমাদের চিন্তা-জগতের প্রায় সর্ব্ববিভাগেই তাঁহার মুদ্রাঙ্ক রাখিয়া গিয়াছেন; সাহিত্যে তাঁহার স্থান কত উচ্চে, তাহা বলিবার সময় আসে নাই।

শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় রামেন্দ্রসুন্দরের জীবনের 'মিশন' বা 'সাধনা' তিনভাগে বিভক্ত করিয়াছেন :—

"১। প্রথম ভাগ,—ইউরোপের বিজ্ঞান-প্রচারের ভাগ।...আধুনিক সায়েন্সে কি সব পদার্থ-তত্ত্বের কি সব নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহারই সমাচার তিনি বাঙ্গালী পাঠককে দিতে প্রথম যৌবনে উৎসুক হইয়া ছিলেন।...তিনিই প্রথম বাঙ্গালীকে দেখাইয়া যান যে ইউরোপের সায়েন্সের কথা কেমন বাঙ্গালা গদ্যে লিখিলে তাহা বহুজন-বোধ্য হইবে।...

২। রামেন্দ্রের মনীষার দ্বিতীয় পর্য্যায়ে তিনি ইউরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞানের কষ্টিপাথরে ভারতবর্ষের দর্শনশাস্ত্র ও রসায়নাদি কষিয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই সময় তিনি ইউরোপ ও ভারতবর্ষকে সমালোচনায় তুলিত করিয়া উভয়ের যাচাই করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এ যাচাই চেষ্টাও রামেন্দ্রের পক্ষে অপূর্ব্ব।

৩। তৃতীয় পর্য্যায়ে রামেন্দ্রের ব্রাহ্মণ্য প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ ঘটে। এই সময়ে তিনি যে কয়খানি পুস্তক লিখিয়াছেন তাহার সাহায্যে বাঙ্গালার হিন্দু-সমাজকে তিনি বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, ইউরোপের বিদ্যার মাপকাঠিতে ভারতের বিদ্যা মাপিলে ছোট ত হইবেই না, উপরন্তু ভারতে এমন অনেক জিনিস আছে, অনেক ভাব আছে, যাহা ইউরোপের মাপ কাঠির বাহিরে; ইউরোপ এখনও ভাব-জগতে প্রবেশ করিতে পারে নাই।...এই সঙ্গে 'শব্দকথা' 'কর্ম্মকথা' প্রভৃতি পুস্তিকাগুলিরও উল্লেখ করা যাইতে পারে।"

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে কয়েকবার বক্তৃতা দিবার জন্য অনুরোধ করেন; কিন্তু তিনি প্রতিবারই বঙ্গভাষা ভিন্ন অন্য কোন ভাষায় বক্তৃতা দিতে পারিবেন না বলিয়া সে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। পরে বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে বাঙলা ভাষাতেই বক্তৃতা দিতে বলেন—তাহারই ফলে রামেন্দ্রসুন্দর 'যজ্ঞ' সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। জ্ঞানে-ভাবে-ভাষায় বঙ্গভাষায় তাহা অমূল্য।

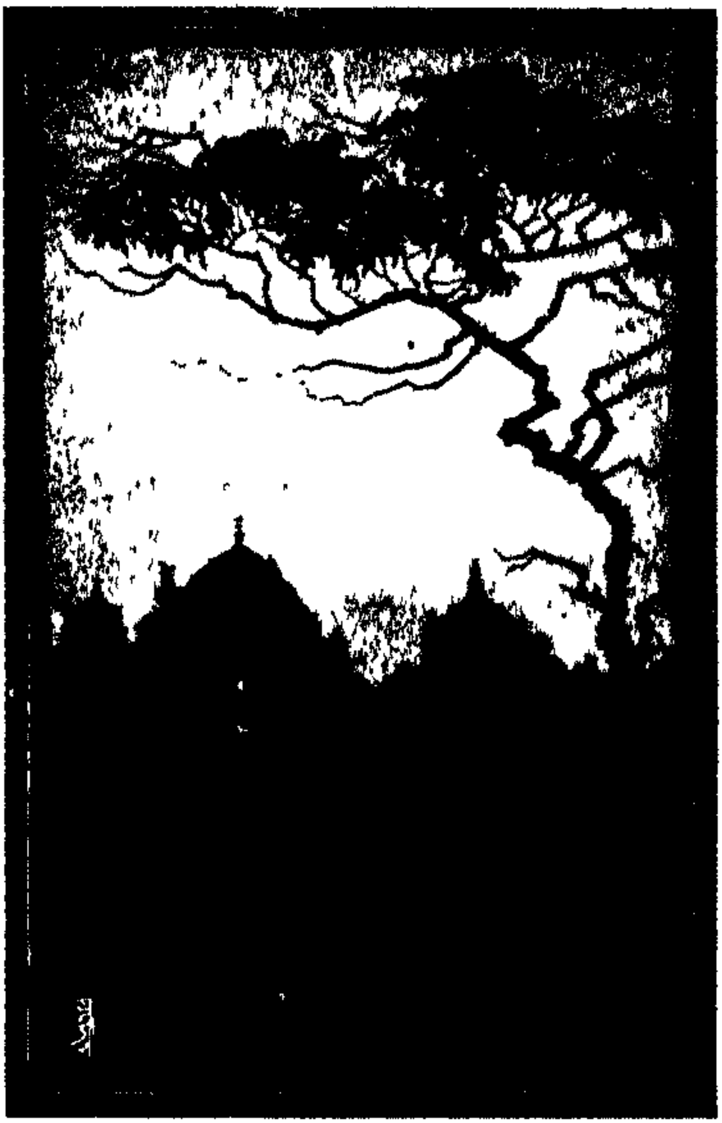
এ সব গেল তাঁহার জ্ঞানানুরাগ ও স্বদেশ-প্রেমের কথা; কিন্তু তবুও তাঁহার পরিচয়ের যেটুকু বাকী থাকে, সুধীন্দ্রনাথ তাহা বলিয়া দিয়াছেন—ত্রিবেদী মহাশয় খাঁটি বাঙ্গালীর বেশভূষা করিতেন; তিনি বাঙ্গালীর কলেজে পড়াইতেন, তিনি বাঙ্গালীর মত সরল ভাবে সরল প্রাণে সকলের সহিত আলাপ করিতেন, তিনি খাঁটি বাঙ্গালীর জীবন যাপন করিতেন—তিনি বাঙ্গলা দেশকে ধন্য করিয়াছেন। আজ এই নন্-কো-অপারেশনের-কোলাহলের দিনে ত্রিবেদী মহাশয় একজন অনুকরণীয় স্মরণীয় পুরুষ।

বাস্তবিক এইখানেই রামেন্দ্র-চরিত্রের প্রধান গৌরব আর বিশেষত্ব—রামেন্দ্র 'কায়মনোবাক্যে' বাঙ্গালী ছিলেন। আর এই জন্যই বিশেষ করিয়া এই আদর্শ মনস্বীর এই জীবন-কথা এই চরিত্রালোচনা বাঙ্গালী মাত্রেরই পাঠ্য। এ গ্রন্থ পাঠে স্বদেশ-প্রেমের আসল মন্ত্র শিক্ষা হইবে, মনুষ্যত্ব শিক্ষা হইবে। এ গ্রন্থ বাঙ্গালী মাত্রেরই গৃহ-পঞ্জিকার মত গৃহে রাখা কর্ত্তব্য।

এ গ্রন্থ প্রকাশের জন্য সম্পাদক মহাশয়কে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

কলিকাতা—২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীকালাচাঁদ দালাল কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।



ভারতী

৪৪শ বর্ষ] ফাল্গুন, ১৩২৭ [১১শ সংখ্যা

প্রব্রজন ও উপনিবেশ স্থাপন

ইতিহাসে পাঠ করা যায় যে সময়ে-সময়ে সমগ্র জাতি তাহাদের দেশ পরিত্যাগ করিয়া অন্য এক দেশে গিয়া বসবাস করে। তাহার ফলে নানাজাতির সংমিশ্রণ সাধিত হইয়া নূতন নূতন সঙ্কর জাতির উদ্ভব হয়। জগতের ইতিহাসে যখন প্রথম উহার সূত্রপাত হইয়াছে, তখন দেখিতে পাওয়া যায় যে, জাতিসমূহ যাযাবর প্রকৃতির, দেশ দেশান্তরে নিরন্তর ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে। সে এক বিরাট ব্যাপার, সহজে কল্পনায় আসে না। আজকালকার মত একটা ব্যাগ, একটা ট্রাঙ্ক ও একটী বিছানা লইয়া, বড় জোর পাঁচ ছয়টা ট্রাঙ্ক, পাঁচ ছয়টা বিছানা ও কতকগুলা মোট পুঁটুলি লইয়া ট্রেণে উঠিয়া হাওয়া বদলাইবার আড্ডায় কলিকাতা হইতে দেওঘর মধুপুর গিরিডি আর না হয় ডিহরী কি এটাওয়ায় স্থানান্তরণ নয়। এ একেবারে গৃহস্থালী কে গৃহস্থালী, সারা সংসার গরু বাছুর ভেড়া ছাগল উট ও নানা লট-বহর লইয়া এক দেশ হইতে অন্যদেশে পাড়ি দেওয়া। আর রাস্তা-ঘাটেও দুঃখের সীমা ছিল না। এই যে নিরন্তর ভ্রমণের অভ্যাস, ইহা কি একটা জাতির খেয়ালমাফিক চঞ্চল প্রকৃতি, খেয়াল—না, ইহার একটা নিয়ম, একটা শৃঙ্খলা ছিল? হ্যাডন তাঁহার Wanderings of Peoples এ বলেন যে, না, এত বড় একটা নিয়ম শুধু খেয়ালের বশে হয় না। আকর্ষণ ও বিকর্ষণ এই শক্তির খেলায় এই প্রব্রজন সাধিত হয়। ইহাতে আকর্ষণ শক্তি অপেক্ষা বিকর্ষণ শক্তিরই অধিক জোর। আহার্য ফুরাইয়া গিয়াছে, এখন এখানে টিকানো যায় কি করিয়া? অতএব এ দেশ হইতে অপসারণ অবশ্যম্ভাবী। যে দেশ খাইতে দেয় না, সেখানে কে থাকিবে বল? অতএব সে ছাড়ি সেই দল কোথাও স্থান পাইবার [illegible]

খাদ্য-জলের অভাব হইবে না। কোথায় আছে সে সোনার দেশ? খুঁজিয়া বাহির কর। শেষে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সেই বাঞ্ছিত দেশের সন্ধান মেলে; অমনি সকলে গিয়া সেইখানে উপস্থিত হয়।

ধরুন, এক সীমানির্দ্দিষ্ট প্রদেশে একটী জাতি বাস করিতেছে বহুযুগ ব্যাপিয়া। যদি তাহারা সুস্থ সবল থাকে, তবে প্রাকৃতিক নিয়মে তাহাদের বংশবৃদ্ধি হইতেই থাকিবে। আর তাহারা যদি চাষ করিয়া খায়, তবে একদিন ধরিত্রী সাফ জবাব দিয়া বসিবেন,—বাছারা, তোমাদের জন্য আর আমি শস্য প্রসব করিয়া তোমাদের নিয়ত-বর্দ্ধনশীল গ্রাসের ব্যবস্থা করিতে পারিতেছি না। বাস্তবিক ভূমির উৎপাদনী শক্তিরও তো সীমা আছে। অর্থ-নীতিবিদ্‌রা নাকি বলেন যে যখন সমগুণ শ্রেঢ়ীতে (geometrical progression) মানুষের বংশবৃদ্ধি হয়, ঠিক তখনই সমান্তর শ্রেঢ়ীতে (arithmetical progression) ভূমি হইতে আহার্য্য বস্তুর আমদানি হয়। তবেই স্পষ্ট বোঝা যাইতেছে, ভূমির উৎপাদনী শক্তি উত্তরোত্তর হ্রাস পাওয়াতে আহার্য্যের অসদ্ভাব হয়। তখন পলাইয়া জীবন রক্ষা ব্যতীত আর উপায়ান্তর কি থাকিতে পারে? তবে মানুষ সহজে কোন দেশ ছাড়িয়া যাইতে চাহে না। অনেকদিন এক জায়গায় থাকলে দেশ বলিয়া একটা অনুভূতি কেমন আসিয়া পড়ে। শেষ না দেখিয়া আর কেহ যাইতে চাহে না—তাই আবার ভূমির কাছে সাধ্য-সাধনা চলিতে থাকে। ভূমির উৎপাদন-শক্তি বৃদ্ধি করিবার যা-কিছু কৌশল জানা আছে তাহার প্রয়োগ নিঃশেষ হইলে সেখান হইতে বিদায় লইতে হয়। আজকালকার উৎকট সভ্যতার যুগে "পুত্রকন্যারূপ প্রবল বন্যার" গতি-নিরোধকারী কৃত্রিম উপায় সে যুগের লোক লইতে শিখে নাই। শিখিলেও যে নির্ব্বাসন হইতে রক্ষা পাইত তাহা বলা যায় না। যাহারা শিকার করিয়া খাইত, তাহাদের অবস্থাও তাদৃশ। খাইয়া খাইয়া মানুষ জানোয়ার-বংশের একরকম উচ্ছেদ করিয়াই বসিয়াছিল; তাহার উপর তাহাদের পীড়া-ব্যাধি তো ছিলই। সুতরাং তাহাদেরও সংখ্যা হ্রাস হইতে লাগিল। অগত্যা মানুষকে সেই সেই প্রদেশ হইতে সরিয়া পড়িতে হইল। ইহাই বিকর্ষণ শক্তির খেলা।

কোন জাতি যদি অনুর্ব্বর প্রদেশে বাস করে, তাহা হইলে তাহার সান্নিধ্যে যদি উর্ব্বর কৃষিক্ষেত্র অথবা শস্যশ্যামল উপত্যকা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে প্রথমোক্ত প্রদেশের জাতি শেষোক্ত জাতির দেশ আক্রমণ করিয়া তথায় বাস করিতে প্রলুব্ধ হয়, ইহাই আকর্ষণ-শক্তি।

ভূতত্ত্ব-বিবরণ-পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, হিমানীযুগের অন্ত্য অংশে য়ুরোপের মধ্যভাগে বল্গা হরিণ (rein deer) বড় বড় দল বাঁধিয়া বেড়াইয়া বেড়াইত আর ফ্রান্সের দক্ষিণ ভাগে আদি প্রস্তর-যুগের মানুষ তাহাদিগকে শিকার করিত। কিন্তু pleistocene (আধুনিক) যুগে আবহাওয়ার নিরন্তর পরিবর্ত্তন হইতে থাকে, এবং এই পরিবর্ত্তনের অনুযায়ী গাছপালা ও জন্তু-জানোয়ারের ইতস্তত প্রব্রজন ঘটে। বৃক্ষ-লতা-গুল্ম ও পশু-পক্ষীর সহিত মানুষের

খাদ্য-খাদক সম্বন্ধীয় একটা সম্পর্ক দাঁড়াইয়াছিল। তাহাদের অপসারণে মানুষেরও অপসারণ অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিল। হ্রদ-যুগে এসিয়ার ভূভাগ ছোট-বড় অসংখ্য হ্রদে আবৃত ছিল। শেষ হিমানীযুগে প্রাকৃতিক নিয়মবশতঃ তাহাদের অধিকাংশই অন্তর্হিত হইয়াছিল। এই বিশোষণ-প্রক্রিয়ার ফল ঐতিহাসিক যুগেও অনুভূত হইয়াছে। মধ্য এসিয়ার বিশোষণ প্রণালী স্মরণ থাকিলে বোধ হয় উরাল-অলতাই জাতি, মোঙ্গল ও তুর্কদিগের ইতস্ততঃ প্রব্রজনের একটা কারণ পাওয়া যায়। আর ঠিক সেই অবস্থা-পরম্পরার জন্যই য়ুরোপের যে অংশে সভ্যতা সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল, তথায় পরবর্ত্তীকালের জনমানবের চিহ্ন অবধি লুপ্ত হইয়াছিল।

এখন মূলতঃ দুইটী কারণ প্রব্রজন ঘটায়:—প্রথম, মানুষের অতিরিক্ত বংশবৃদ্ধি ও তন্নিবন্ধন আহার্য্যের হ্রাস ও দ্বিতীয় আবহাওয়ার ক্রমিক অথবা আকস্মিক পরিবর্ত্তন। ইহা ছাড়াও দুই-চারিটী ছোট ছোট কারণ লক্ষিত হয়। সন্নিহিত জাতি আঢ্য ও দুর্ব্বল হইলে অসভ্য জাতির তাহাকে আক্রমণ করিবার একটা লালসা জাগিয়া উঠে। সমতল ক্ষেত্রে বাস করিয়া কৃষি অবলম্বন পূর্ব্বক যে জাতি জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহাদের শান্তিতে ও উন্নতিতে দিন-গুজরান হয়, সভ্যতার ক্রমবিকাশ হইতে থাকে; কিন্তু সেই পরিমাণে কালে সেই জাতি দুর্ব্বল ও হীনবীর্য্য হইয়া পড়ে। তখনই তাহাদের ধন ও দৌর্ব্বল্য সন্নিহিত অসভ্য জাতি-সমূহকে প্রলুব্ধ করিয়া তোলে। ইতালীর কথা ধরা যাক্—যে ইতালীর শৌর্য্যে তদানীন্তন জগৎ চমৎকৃত হইয়া গিয়াছিল, সেই ইতালী উত্তরকালে নির্ব্বীর্য্য হইয়া পড়ায় গথ, হূন, ভাণ্ডাল প্রভৃতি অসভ্য জাতিরা তাহার সৌন্দর্য্য ঐশ্বর্য্য ও প্রাচুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া আমমাংসলোভী শ্যেনের মত আসিয়া ইতালীর হৃদয়-রক্ত শোষণ করিয়াছিল। কবি বাইরণ আক্ষেপ করিয়াছেন—"কি হতভাগিনী, তুমি ইতালী!" কখন কখন এমন ঘটে যে, বিজেতা জাতি বিজিত জাতির সভ্যতা রীতি-নীতি আপনার করিয়া লইয়া একসঙ্গে মিশিয়া যায়। তাহাতে দুইটী ফল হয়,—এক, অসভ্যেরা সভ্য হয়, আর দুই, বিজিতের ধমনীতে নূতন রক্ত-নিষিক্ত হইয়া তাহাকে সবল করিয়া তোলে।

ভূমির জন্য একটা অশান্ত ক্ষুধা যখন কোন কোন জাতিকে পাইয়া বসে, তখন সে খাই-খাই করিয়া ভূমি-লাভের জন্য নিরন্তর ঘুরিয়া বেড়ায় ও সকলকে আক্রমণ করিতে থাকে।

জাতিতে জাতিতে সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে দুইয়ের মধ্যে এক জাতি পরাভূত হয় ও পরাভূত জাতি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। মধ্য এসিয়ার উচ্চ তৃণ-সঙ্কুল অনুর্ব্বর প্রদেশ হইতে নানা জাতির বিচ্যুতি ও বিকীরণের কথা অবিদিত নাই। খৃষ্ট-পূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর তৃতীয় পাদে হিয়ঙ-নু নামক এক যাযাবর জাতি সেই একই মূল গোষ্ঠীর য়ুএচি নামক আর একটী প্রতিদ্বন্দ্বী-সম্প্রদায়ের সহিত ভীষণ যুদ্ধ করে। তাহার ফলে য়ুএচিরা পরাভূত হইয়া হিয়ঙ-নু-গণ কর্ত্তৃক চীনদেশের উত্তর-পশ্চিমাংশ হইতে বিতাড়িত হয় ও বরাবর পশ্চিমে তাহারা অনুসৃত হইতে থাকে। এই ধাক্কা সাম্‌লাইতে

না পারিয়া আবালবৃদ্ধবনিতা পাঁচ লক্ষ হইতে দশলক্ষ য়ু-এচির স্রোত টাকলা-মাকান (অর্থাৎ গোবি) মরুর উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়াছিল। এই স্রোতোবেগ প্রথমে যু-স্থন ও পরে শক জাতির উপর আসিয়া পড়িল। অগত্যা শকগণ নিজ চারণভূমি য়ু-এচিদিগকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইল। আরও দক্ষিণে আসিয়া শকগণ ভারতের দ্বারবর্ত্মে পঙ্গপালের ন্যায় জড় হইল। পাঠক জানেন যে, এই জাতি-বিক্ষেপের ফলে ভারতের রাজনৈতিক ভাগ্যাকাশে কিরূপ মেঘের উদয় হইয়াছিল। শক ও য়ু-এচি নৃপতিগণ ভারতের সিংহাসনে ত হইয়াছিলেন ও হিন্দু শিথীয় (Indo-Scythian) রাজবংশ ভারতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। তাহাদের ভিতর হইতেই ক্রমে রাজপুতগণের আবির্ভাব হয়।

এই যু-স্থন এবং তাহাদের জ্ঞাতি শক, পশ্চিম শিথীয় ও উত্তর য়ুরোপের নর্ডিকদের সম্বন্ধে হ্যাডন বলিয়াছেন যে, ইহারা যাযাবর জাতির লোক ও কৃষি-জীবিকা অপেক্ষা ইহারা পশুচারণ করিয়া জীবনধারণই অধিকতর পছন্দ করিত। ইহারা সন্নিহিত জাতিদের একটা বিরাট অশান্তির কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

মেসোপটেমিয়ার একসময় যে আশ্চর্য্য সভ্যতা বিদ্যমান ছিল তাহা লেয়ার্ড, বটা (Layaerd, Botta) প্রভৃতি মনীষিগণের কল্যাণে কাহারও অবিদিত নাই। আসিরীয়গণ কানানাইটগণ কর্ত্তৃক বিজিত ও সেমিটীক জাতিতে পরিণত হইয়াছিল, বাবিলোনিয়াগণ হিটাইটগণ কর্ত্তৃক পরাভূত হয়; ইহারা আবার ক্যাসাইটগণ কর্ত্তৃক বিজিত হয়। এই ক্যাসাইটগণ মিডিয়া এলাম ও ব্যাবিলোনিয়ার উপর প্রভুত্ব বিস্তার করে। পরে আর্য্য মিতানীগণ আসিয়া তাহাদিগকে পরাভূত করেন। ঋগ্বেদে আর্য্যসভ্যতার যে নিদর্শন পাওয়া যায়, মিতানীগণ তদ্রূপ সভ্যতায় অলঙ্কৃত ছিলেন।

য়ুরোপে ভূমধ্য-সাগরের উপকূলে বহু জাতির উদ্ভব হয়। তাহাদের নানা শাখা-প্রশাখা প্রথমে দক্ষিণ য়ুরোপ, পরে পশ্চিম য়ুরোপ ও ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে আসে, তখন তাহাদিগকে নব প্রস্তরযুগের লোক বলিয়া ধরা হইয়াছিল। রাইকা হোল্‌ম্ (Rica Holme) বলেন যে, খৃষ্ট-পূর্ব্ব ১৮০০ অব্দে আলপাইন জাতির লোকেরা ব্রিটেনে ব্রোঞ্জ ধাতুর আমদানি করে এবং খৃষ্ট-পূর্ব্ব ৮০০ অব্দে কেল্‌টিক জাতিগণ ঐ দ্বীপপুঞ্জ আক্রমণ করে। বহুকাল ধরিয়া কেল্‌টিক জাতি রাইন নদের নিকট দলবদ্ধ হইয়া পরে উহা পার হইয়া ফ্রান্সে আসিয়া উপস্থিত হয় ও খৃষ্ট-পূর্ব্ব সপ্তম শতাব্দীতে বেশ জাঁকিয়া বসে। খৃষ্ট-পূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে তাহারা বোধ হয় স্পেন অধিকার করে এবং ইতালীতেও সেই সময়ে আবির্ভূত হয়। পশ্চিম জর্ম্মাণীতে অবস্থিত কেলটিকগণকে টিউটনগণ বিদেশী অপরিচিত আখ্যা দিয়াছিল। এটুকু লক্ষ্য করিবার বিষয়, ব্রিটেনেও অ্যাংগ্লো-স্যাক্সনগণ পরাজিত ব্রিটনদিগকে Walas বা অপরিচিত বিদেশী বলিয়া আখ্যাত করিয়াছিল। তাহা হইতেই তাহাদের ও তাহাদের দেশের নাম Welsh ও Wales হয়। তাহার পর টিউটনজাতির ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ সুরু হইল। খৃষ্ট-পূর্ব্ব চতুর্থ কিংবা তৃতীয় শতাব্দীতে তাহারা

কেল্টিকগণকে রাইন পার করিয়া দিবার প্রয়াস পাইতেছিল। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর উত্তরার্দ্ধে ড্যানিয়ুব নদের সীমান্তে টিউটনেরা প্রবলভাবে চাপিয়া আসিয়াছিল, কিন্তু মার্কাস অরেলিয়াসের জন্য তাহা উৎকট আশঙ্কার ব্যাপার হইয়া উঠে নাই। তার পর গথগণ রোমানদিগের সহিত কৃষ্ণসাগরের নিকট যুদ্ধ করে। পূর্ব্বেই হূনদের হঠাৎ আক্রমণের কথা বলিয়াছি।"

সমাজ যখন বেশ স্থায়ী হয়, তখনও মাঝে মাঝে এক একদল লোক দেশ ছাড়িয়া অন্য দেশে গিয়া বসবাস করে। ইহারই নাম উপনিবেশ-স্থাপন। অবশ্য এক যুগে যে প্রব্রজন হয় তাহাতে লক্ষ লক্ষ লোক যাইতে পারে না। আজকালকার মতো এমন যান ছিল না যে এক জায়গা হইতে লক্ষ লোক উঠিয়া গিয়া অন্য জায়গায় বসবাস করিতেছে। কতকগুলা দেশের উপনিবেশ স্থাপনের কথা পর্য্যালোচনা করিলে তাহার কারণ অনায়াসে নির্দ্ধারিত হইতে পারে। প্রথম গ্রীসদেশীয় উপনিবেশগুলির কথা ধরা যাক্। নাগরিকদিগের মধ্যে অনেক সময় গৃহবিবাদ উপস্থিত হইয়া একটি দলের নির্ব্বাসন হইত। কখনও কখনও লোক-সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে অথবা দৈন্যদশা হইতে পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত—অথবা কু-শাসন হইতে দূরে থাকিবার জন্য অনেকে বিদেশে গিয়া বাস করিত, তাহাতে দেশের মত একটা কড়াকড় বাঁধা ধরা নিয়মের অত্যাচার থাকিত না। সাধারণতঃ যেখানে ব্যবসায়ের সুবিধা হইত সেইখানেই গিয়া তাহারা উঠিত। কখনও কখনও নগরবাসিগণ—দুর্দ্দান্ত যুবক সম্প্রদায়কে নগর হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া স্বচ্ছন্দে থাকিতে চাহিত। রাজনৈতিক হিসাবে নূতন উপনিবেশ ও পুরাতন দেশমাতৃকার মধ্যে কোনও সম্পর্ক থাকিত না—উভয়েই উভয়ের অনধীন। মাতৃরাষ্ট্র ও দুহিতৃ-রাষ্ট্রের মধ্যে অথচ একটি বন্ধন থাকিত—তাহা রাজনৈতিক বন্ধন নয়, পরন্তু অপার্থিব ও মাতৃভক্তির মত কতকটা, আর একটা উভয়ের মধ্যে একই ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিচার আচার। দেশ বদলাইলেও পুরাতন দেব-দেবীর পূজা অর্চ্চনা হইত, পুরাতন যজ্ঞীয় আগুন রক্ষিত হইত। আর যখন মাতৃ-রাজ্যে প্রধান প্রধান ধর্ম্মোৎসব হইত, তখন দুহিতৃ-রাজ্য তথায় প্রতিনিধি পাঠাইয়া মর্য্যাদা রাখিত। অতএব দুই রাজ্যে যুদ্ধ বাধা অনেকে অস্বাভাবিক ও পবিত্র বন্ধনের উল্লঙ্ঘন বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু তথাচ দেখিতে পাই যে (Corinth) করিন্থ ও করকাইরার মধ্যে প্রাচীনতম যুদ্ধ বাধিয়াছিল। নূতন উপনিবেশ স্থানে গিয়া গ্রীকগণ প্রথমেই নগর স্থাপন করিত এবং ধর্ম্ম ও সামাজিক জীবন নির্ব্বাহের নিমিত্ত যে সমস্ত বাড়ী-ঘরের দরকার হইত তাহা নির্ম্মাণ করিয়া ফেলিত। মাতৃ-রাষ্ট্রে যে সমস্ত অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান থাকিত, উপনিবেশেও তাহারই অনুকরণ দেখা যাইত। কাজেই উপনিবেশ-সমূহে অনতিবিলম্বে সুন্দর সুন্দর ধর্ম্মমন্দির, নাগরিকগণের প্রকাণ্ড সভাস্থল, ব্যায়ামাগার ও নাট্যশালা স্থাপিত হইত। তবে ইহাতে বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, উপনিবেশ-সমূহে প্রধানতঃ গণতন্ত্রেরই প্রতিষ্ঠা দৃষ্ট হইত, কখনো কখনো মাতৃরাষ্ট্রের পূর্ব্বেই তাহা

হইত এবং অভিজাত-তন্ত্র বড় একটা সে জমিতে ফলিত না। আর ইহা হওয়াই স্বাভাবিক—যেহেতু প্রথম উপনিবেশ স্থাপনের যে কষ্ট ও গুরুত্ব তাহার সমান অংশ সকলেই লইত; অতএব সাম্যই তাহাদের মন্ত্র হইয়া উঠিত। দক্ষিণ ইতালীতে উপনিবেশ স্থাপিত হইল তাহার নাম হইল বৃহৎ গ্রীস। আরও দেখি যে, নূতন নগর স্থাপিত হইলে পুরাতন নগরের নামানুসারেই তাহার নামকরণ হইত। যথা এশিয়ার Ædlic Cymeএর নামেই ইতালীর Cumae নাম হইয়াছিল।

রোমানদের উপনিবেশ কিরূপ ছিল? মূলতঃ ইহার অর্থ, চাষীদিগের বসবাস; কিন্তু বস্তুতঃ তাহা ছিল না। রোমীয়গণ শত্রুদিগকে পরাজিত করিলে তাহাদিগকে সম্পূর্ণ করলে রাখিবার নিমিত্ত তাহাদের দেশে দুর্গের মধ্যে সৈন্যস্থাপন করিত। ইহাই তাহাদের উপনিবেশ। সাম্রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার ইহাই ছিল তাহাদের অন্যতম উপায়। আর একটি—সুদৃঢ় রাস্তা নির্ম্মাণ। আর ব্রিটেন-জয়ের পরে এই দুই উপায়ই তাহারা অবলম্বন করিয়াছিল। রোমের ইতিহাসে পড়া যায় যে, নাগরিকগণ নূতন জমি পাইবার লোভে গৃহত্যাগ করিয়া দূরে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিত। রোমের নাগরিক হওয়ায় জন্ম তাহাদের যে অধিকার ও সুবিধা থাকিত, তাহা হইতে কেহ বিচ্যুত হইত না; এবং ঘটনাক্রমে রাজধানীতে উপস্থিত হইলে পূর্ব্বের মত তাহারা ভোট দিতে পারিত, যেন তাহারা রোম ত্যাগই করে নাই। সেই সময়েই তাহারা মাতৃরাষ্ট্রের আদর্শ-অনুকরণে নিজে-দের নূতন তন্ত্র গড়িয়া লইত। সকল রকমেই যেন তাহারা একটি ছোটখাট রোমে আসিয়া বাস করিতেছে—এমনি ভাবেই রোমের রাজনীতি তাহারা গ্রহণ করিত।

এখন ভারতবর্ষের কথা আলোচনা করা যাক্। আর্য্যেরা খৃষ্টের জন্মের দুই সহস্র বর্ষ পূর্ব্ব হইতেই ভারতে আসিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। বহু শতাব্দী ধরিয়া তাঁহারা পঞ্চনদে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছিলেন। অবশ্য এই ক্রম-বিস্তার রাজপুতানার মরু ও ঘন বনানীতে ঠেকিয়া গিয়া বাধা পাইয়াছিল। যখন তাঁহারা বেশ এক রকম স্থিত হইয়াছিলেন ও পঞ্চনদে সভ্যতার সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা দক্ষিণ ভারতবর্ষ, লঙ্কা ও ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে উপনিবেশ স্থাপন করিতে বেশ প্রয়াস পাইয়া-ছিলেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ পাঠে অবগত হওয়া যায়, কুমার ভীম বিদর্ভ পার হইয়া আসিয়াছিলেন ও বৈদর্ভকুমার আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন। বিশ্বামিত্রের পঞ্চাশ পুত্র পিতৃকর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া "সীমান্তে" বাস করিয়াছিলেন ও বর্ব্বর আদিম জাতিদিগের সহিত বিবাহ-সূত্রে বদ্ধ হইয়াছিলেন। ইহারাই অন্ধ্র, পুলিন্দ ও শবর প্রভৃতি জাতির পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া খ্যাত হন। মহাভারত ও রামায়ণে ইহারা দক্ষিণ-ভারতবর্ষের জাতি বলিয়া পরিচিত। পালি গ্রন্থ সুত্তনিপাতে লিখিত আছে যে, বয়রিণ নামক একজন ব্রাহ্মণ গুরু উত্তর হইতে আসিয়া অশ্বক রাজ্যে বসবাস করেন। বিশেষজ্ঞেরা বলেন যে, মথুরার নিকট পাণ্ডু বলিয়া এক আর্য্য ক্ষত্রিয় জাতি ছিলেন এবং দক্ষিণে যে পাণ্ড্যদের বিবরণ পাওয়া যায়, তাঁহাদের সহিত এই পাণ্ডুদের

একটা সংযোগ আছে। অধ্যাপক ভাণ্ডারকর বলেন (Carmichael lectures) যে, মেগাস্থিনিস যে বলিয়াছেন যে, দাক্ষিণ পাণ্ড্যদের সহিত যমুনা ও মথুরার একটা সম্পর্ক আছে, তাহা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত; যেহেতু প্লিনি ও টলেমি প্রভৃতি গ্রীক লেখকগণ বলেন যে, দক্ষিণে পাণ্ড্যদের রাজধানী মদুরা। মাদ্রাজ বিভাগের একটি জেলার নামও ঐ। দক্ষিণের পাণ্ড্যেরা যে তাহাদের রাজধানীকে মাধুরা বলিয়া অভিহিত করে, ইহাতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, তাহারা উত্তরের এমন একটি দেশ হইতে আসিয়াছিল যাহার রাজধানী মথুরা। নূতন স্থাপিত উপনিবেশের নামকরণে যে সনাতন প্রথা অনুসৃত হয় তাহারও ব্যতিক্রম হয় নাই অর্থাৎ ঔপনিবেশিকগণ নূতন নগর অথবা বিভাগের নাম পুরাতন নগর ও বিভাগের নামেই রাখিয়া থাকেন।

সিংহলে তৃতীয় 'মথুরা' (Motura) ও পূর্ব্ব দ্বীপপুঞ্জে চতুর্থ 'মদুরা' পাওয়া যায়। সিংহলের পুরাতন নাম তাম্রপর্ণী হইতে বুঝা যায় যে, টিনেভেলি জেলায় যে তাম্রপর্ণী নদী আছে তাহার উপকূলস্থিত ব্যক্তিগণ গিয়াই সিংহলে উপনিবেশ-স্থাপন করিয়াছিল—যেমন সিন্ধুনদ হইতে সিন্ধের নাম হইয়াছে। সেইরূপ বর্ত্তমান নিজামের রাজ্যে পটিট্‌ঠান বা পৈঠান বলিয়া একটী নগর আছে। গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমস্থানে বহু পূর্ব্বে একটী প্রতিষ্ঠান নগর ছিল। উপনিবেশ-স্থাপন কখনো কখনো জয়ের ফলে হইত। যেমন পূর্ব্বের উদাহরণগুলি। শান্তির সময়ে ধর্ম্ম প্রচার ও বিস্তার করে ভ্রমণ ও কোন কারণে নির্ব্বাসন ও অন্যান্য হেতু।

ভাষার সাক্ষ্য (পালি) যদি লওয়া যায় তবে নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায় যে, আর্য্যেরা দক্ষিণ-ভারতে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন ও দ্রাবিড়ীয় ভাষা উচ্ছেদ-সাধনে সমর্থ না হইলেও দাক্ষিণে আর্য্য-ভাষার চলন হইয়াছিল।

প্রাচীন এবং অর্ব্বাচীন দুই যুগেই পুরাতন সহরের নামানুসারে নূতন সহরের নাম-করণ প্রথা একরকম সার্ব্বত্রিক। আপনারা ভাগলপুরের নিকট চম্পা-নগরের নাম শুনিয়া থাকিবেন। চম্পা নদীর উপর ঐ নগর ছিল (এখন তাহার নাম চম্পা নালা হইয়াছে)। এই নগরটী বর্দ্ধিষ্ণু ছিল এবং আমরা জাতকে পাড়ি যে, মগধের সহিত ইহার ঝগড়া ছিল ও পরে ইহা মগধেরই অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়। মিষ্ট অথচ উগ্রগন্ধ চম্পক ফুলের জন্য এই স্থানটী বিখ্যাত ছিল। যখন ভারতীয় ঔপনিবেশিকগণ কোচিন-চায়নায় যান, তখন তাঁহারা একটী উপনিবেশের নাম এই বিখ্যাত নগরের নামেই রাখিয়াছিলেন। এই দ্বিতীয় চম্পার অধিবাসিগণ বৌদ্ধ ছিলেন। এখানে একটা কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, বৌদ্ধেরা চম্পক বৃক্ষকে বড়ই পবিত্র জ্ঞান করিতেন—কেন না, এই চম্পক কাষ্ঠ হইতেই বুদ্ধদেবের বহু মূর্ত্তি গঠিত হইত। স্যাখানে হিসযু নদীর উপকূলে অযুধিয়া নামক নগর। কেহ কেহ বলেন যে, অযুধিয়া = অযোধ্যা ও হিসযু = সরযূ। কম্বোজ হইতে ভারতীয়গণ যাইয়া কাম্বোডিয়া অথবা কাম্বোজ নামক উপনিবেশ স্থাপন করেন। খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতে এই কাম্বোডিয়ায় বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবেশ লাভ করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। খৃষ্ট-পূর্ব্ব ৬৫ অব্দে ভারতীয়গণ যবদ্বীপে যান ও সেই দেশের

গ্রন্থে লিখিত আছে যে, ৭৮ অথবা ১২৮ খৃষ্টাব্দে একজন ভারতীয় রাজকুমার তথায় যান। জানুয়ারী (১৯২০) সংখ্যার Indian Antiquaryতে Sir Richard Temple লিখিয়াছেন যে ১০ ও ৪১৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে যবদ্বীপ, বোর্নিও ও সুমাত্রায় শৈব হিন্দুদের আবির্ভাব হয় ও সুমাত্রায় একটি হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ২৫০ খৃষ্টাব্দে ভারত হইতে যব ও সুমাত্রায় বৌদ্ধ মহাযানতন্ত্র নীত হয় ও ৩৮৪ ও ১০৭৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে যবদ্বীপে হিন্দুবংশ রাজত্ব করে। মহাবংশে আমরা সিংহলে উরুবেলা ও জেতবনারামে দেখিতে পাই। উরুবেলা অথবা বুদ্ধগয়ায় শাক্যমুনি সমাধিলাভ করিয়াছিলেন বোধিদ্রুমের তলায়। জেতবনারামে বুদ্ধদেব বহুবার ধর্ম্মোপদেশ দিয়াছিলেন।

আধুনিক যুগেও আমরা দেখিতে পাই যে, এই উপনিবেশ স্থাপনে, স্পেন, পর্তুগাল ও হল্যাণ্ড অগ্রণী হইয়া পথ দেখাইয়াছে এবং ইংলণ্ড ও ফ্রান্স পদাঙ্কানুসরণ করিয়াছে। ১৫৪১ খৃষ্টাব্দে পেড্রো ডি ভ্যালডিভিয়া চিলিতে স্যানটিয়াগো প্রদেশ স্থাপন করেন। আর্জেন্টাইন রিপাবলিকে একটা কর্ডোবা দেশ আছে নিশ্চয়ই ইহা স্পেনের সুপ্রসিদ্ধ কার্ডোবার নামানুকরণে স্থাপিত হইয়াছিল।

ষোড়শ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে উপনিবেশ স্থাপন করিবার একটা উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়। যেদিন ইংলণ্ড স্পেনের বিরাট আর্ম্মাডা ধ্বংস দিয়া তাহার সমুদ্রাধিপত্য হরণ করিয়া লইল, সেইদিন হইতেই পক্ষান্তরে ইংলণ্ডের উপনিবেশ-স্থাপন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। শীত-প্রপীড়িত নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড প্রদেশে উপনিবেশ স্থাপনে কৃতকার্য্য না হইলেও এতদুদ্দেশ্যে প্রথম উদ্যমের জন্য স্যার হম্‌ফ্রি গিলবার্টের নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। স্যার ওয়ালটার র‍্যালে ফ্লোরিডার উত্তর-উপকূল আবিষ্কার করিয়া তথায় উপনিবেশ স্থাপন-মানসে ঐ জায়গাটী পছন্দ করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথ কুমারী থাকা হেতু ঐ জায়গার নাম দেন ভার্জিনিয়া। ইহা ছাড়া তখনকার আর্চবিশপ হুইট-গিফট্ পিউরিটানদিগের উপর বড় নারাজ ছিলেন; তাঁহার শাসন অতি কটু হওয়া প্রযুক্ত অনেক পিউরিটান স্বচ্ছন্দে ঈশ্বরোপাসনা করিতে পাইবেন বলিয়া দেশত্যাগ করেন। ১৬২০ খৃষ্টাব্দের ৬ই সেপ্টেম্বর মে ফ্লাউয়ার নামক জাহাজে আরোহণ করিয়া শতাধিক নরনারী ও শিশু প্লাইমাউথ বন্দর ত্যাগ করিয়া যায়। তাহারা কেপ কড নামক স্থানে অবতরণ করিয়া উক্ত স্থানটার নাম দেন— নূতন প্লাইমাউথ। এই স্বদেশত্যাগিগণ Pilgrim fathers বলিয়া পরিচিত।

দেশ ত্যাগ করিয়া বিদেশ-গমনের আরও হেতু লক্ষিত হয়। স্বদেশে রাজনীতির বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্য ও স্বদেশের বিরক্তিকর রাজশাসন পরিহারের নিমিত্তও অনেকে দেশ ত্যাগ করেন। ষোড়শ শতাব্দীতে ওলন্দাজ কৃষকগণ এস্থান ছাড়িয়া কেপ অফ গুড হোপ অর্থাৎ উত্তমাশা অন্তরীপে আসিয়া বাস করেন। ইঁহাদের নাম বুয়র। কিন্তু ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে উত্তমাশা ইংরাজদিগের অধীন হইলে সেই জেলার আদিম অধিবাসীদিগের সহিত ইংরেজগণ প্রীতিপূর্ণ

ব্যবহার না করা হেতু উহারা চটিয়া আরও উত্তরে চলিয়া গিয়া নেটালে ও অরেঞ্জ ফ্রী ষ্টেটে এবং ট্রান্সভাল অধিকার করিয়া তথায় বাস করিতে থাকেন।

প্রথম জেম্‌স্‌, ক্রমওয়েল ও দ্বিতীয় চার্লসের সময়ে ইংরেজগণ উপনিবেশ স্থাপন ব্যাপারে বেশ-একটু অগ্রসর হইয়াছিলেন। ১৬৬৩ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় চার্লস্‌ তাঁহার কয়েকজন বন্ধুবান্ধবকে ফ্লোরিডার কিয়দংশ দান করাতে, তাঁহারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া রাজার নামেই উপনিবেশের নাম রাখিলেন, কারোলিনা। "নূতন ইংলণ্ড" নামীয় উপনিবেশের কথা আমরা জানি। আমেরিকাতে "নিউ আমষ্টর্ডাম" নামে ওলন্দাজদের একটী উপনিবেশ ছিল। কিন্তু ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে ইংরেজের দ্বারা অধিকৃত হইলে তাহার নাম পাল্টাইয়া নূতন নাম রাখা হইল নিউ ইয়র্ক। ইংরেজ নৌ-বাহিনীর রণ-পোতাধ্যক্ষ ডিউক অব ইয়র্কের (যিনি পরে দ্বিতীয় জেম্‌স্‌ হইয়া ছিলেন) নামে উহার নামকরণ হয়। ১৬৮১ খৃষ্টাব্দে কোয়েকার ধর্ম্মাবলম্বী উইলিয়ম পেন "সোসাইটী ফ্রেণ্ডস্‌" নামক কতকগুলি বন্ধু লইয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন—পেনের নামেই তাহার নাম হয় পেনসিলভেনিয়া। ১৭৩৩ খৃষ্টাব্দে কতকগুলি ঋণগ্রস্ত ও উৎপীড়িত জার্ম্মান প্রোটেষ্টাণ্টকে আশ্রয় দিয়া জেম্‌স্‌ অগ্‌লথর্প একটা উপনিবেশ স্থাপন করেন ও তদানীন্তন ইংলণ্ডেশ্বর দ্বিতীয় জর্জ্জের নামে উহাকে জর্জ্জিয়া নামে অভিহিত করেন। বিখ্যাত রাণী ভিক্টোরিয়ার নামে অষ্ট্রেলিয়ার ভিক্টোরিয়ার নামকরণ হয়। ইহার রাজধানী তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রীর নামে মেলবোর্ণ বলিয়া অভিহিত হয়। ১৪৯৯ খৃষ্টাব্দে আমেরিগো ভেসপুচি নূতন জগতে গিয়া উপস্থিত হন ও নিজের নামানুসারে উহা আমেরিকা বলিয়া আখ্যাত করেন। উদাহরণ বাড়াইয়া লাভ নাই। ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, কি পুরাতন কি নূতন সব যুগেই উপনিবেশের নামকরণ এই ভাবেই হইয়া আসিতেছে।

অষ্ট্রেলিয়ার উপনিবেশ স্থাপনে কোন কাব্য—কোন 'রোমান্স' নাই। ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে বোটানি বে-তে জেলের কয়েদী পাঠানো হইয়াছিল,—যেমন ভারত হইতে আন্দামানে কয়েদী পাঠান হয়। অতএব উহা কয়েদীদের আড্ডা হইয়া দাঁড়াইল। এক সময়ে কয়েদীদের দ্বারা নিউ-সাউথ ওয়েল্‌স্‌-প্রদেশ পরিপূর্ণ হইয়া পড়িল। কিন্তু বিলাতে যখন স্যার রবার্ট পীল দণ্ডবিধি আইনের সংস্কার করিলেন, তখন কয়েদীর নির্গমন স্রোত কিঞ্চিৎ মন্দীভূত হইয়া পড়িল। অষ্ট্রেলিয়ার উর্ব্বরতা প্রসিদ্ধ, কাজেই সেখানে ঔপনিবেশিকগণের আমদানি ক্রমেই বাড়িয়া চলিল। আর উর্ব্বর ক্ষেত্রে শস্যের অভাব না হওয়াতে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তখন তাঁহারা অষ্ট্রেলিয়াকে কয়েদীদের আড্ডা করার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ জুড়িয়া দিলেন। তখন হইতে টাসমেনিয়াতে কয়েদী চালান হইতে লাগিল। অষ্ট্রেলিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া ক্রমে স্বায়ত্ত শাসন লাভ করিল।

"Deserted Village"এর কবি আক্ষেপ করিয়াছেন যে, ধনী জমিদারগণ নিজেদের প্রমোদোদ্যান করিবার জন্য নিরীহ প্রজাদিগকে উৎপাত করিয়া দেশত্যাগে বাধ্য করিয়াছিলেন। জমিদারের অত্যাচারও উপনিবেশ

স্থাপনের গৌণ কারণ বলিয়া ধরিতে পারা যায়।

ইংলণ্ডের উপনিবেশ-সমূহের দেশ-মাতৃকার প্রতি সশ্রদ্ধ সম্মান লক্ষিত হয়; তাহার প্রমাণ, য়ুরোপের কুরুক্ষেত্র—যাহার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ এখনও সম্পূর্ণ নির্ব্বাপিত হয় নাই। পূর্ব্বে যেমন গ্রীকেরা উপনিবেশ হইতে Olympian অথবা অন্য কোন জাতীয় ক্রীড়োৎসবে যোগ দান করিত, এখনও তেমনি ক্যানেডা বা অষ্ট্রেলিয়া হইতে ক্রিকেট প্রভৃতি খেলিবার জন্য খেলোয়াড়েরা বিলাতে আসিয়া থাকেন।

সংক্ষেপে উপনিবেশ-স্থাপনের কতকগুলি স্থূল কারণ নির্দ্দেশ করিলাম।

শ্রীকালীপদ মিত্র।

অনন্ত জীবন

ভিয়েনার উপকণ্ঠে ছোট একখানি ফিটফাট বাগান। ডানদিকের দক্ষিণে ছোট একখানি বাড়ী, বাগানের দিকে বারান্দা। বারান্দা থেকে নামবার তিনটি সিঁড়ি। দরজার বাঁয়ে সামনের দিকে ছোট একখানি টেবিল, চারদিকে চেয়ার, তার মধ্যে একখানি আরাম-চৌকি। পিছনে বাম [illegible] বাগান আর রাস্তার মাঝে উঁচু রেলিং। দূরে পার্কের গাছপালা আর তৃণাচ্ছাদিত ভূমি। শরতের গোড়া, দিন প্রায় শেষ হয়-হয়। বাগানে গভীর স্তব্ধতা। মালি বোরোমাস ফুলগাছের কেয়ারি তৈরি করছে। বুড়োমানুষ, তার বড়-বড় চুল সাদা হয়ে গেছে। হাউসডেরফের আস্তে আস্তে, বারান্দা থেকে সিঁড়ি দিয়ে নামলেন। তাঁর বয়েস প্রায় ষাট, দাড়ি গোঁফ পরিষ্কার কামানো, সাদাচুল ছোট করে ছাঁটা, চোখদুটি কিন্তু এখনো তরুণ আছে। পরণে একটি সাদাসিদে কালো পোষাক, ঢিলেঢালা গায়ে বেশ মানিয়েছে। মাথায় একটি মস্ত কালো টুপি।

হাউসডেরফের—এই যে বোরোমাস, ভালো ত?

বোরোমাস—নমস্কার মশাই। আজ শহরের দিকে গিয়েছিলেন বুঝি?

হাউস—না।

বোরো—আজ বিকেলে বাগানে কফি খেলেন না, তাই ভাবছিলুম হয়তো বা…

হাউস—না, সহরে যাইনি। বাড়িতেই ছিলুম, সোফার উপর শুয়ে। মাথাটা একটু ধরে ছিল। কি করছ এখন? সমস্ত বাগান তো প্রায় কোপানো হয়ে গেল।

বোরো—না হলে চলে কই? কবে রাত্তিরে তুষার পড়বে বলা যায় না তো। অক্টোবর মাস পড়ে গেল। এখন আর আলাখেড়া দিলে চলবেনা। ৯৩ সালের শরৎ কাল মনে পড়ে তো? সন্ধ্যাবেলা আমরা বাইরে বসে ছিলুম—২৮ অক্টোবর সেদিন, পরদিন ভোর তিনটেয় সে কী তুষারটাই পড়লো! ৮৭, ৮৮ সালেও সেই একই রকম। না মশাই, পরিষ্কার দিন দেখে আর ভুলি না।

হাউস—ঠিক কথা বোরোমাস। (তাঁর কাজ দেখতে লাগলেন) এখানে কি পোঁতা হবে? (গভীর চিন্তায় তিনি মগ্ন হলেন,

বোরোমাস যে কি উত্তর দিলে সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করলেন না)

বোরো—ঠিক ঐ কথাই আপনাকে বলতে যাচ্ছিলুম। আজ ক্লাবের সঙ্গে আখা করতে—

হাউস—(অন্যমনস্কভাবে) কে ?

বোরো—(অবাক হয়ে) আজ্ঞে ক্লাবের কথা বলছি—রাস্তার ওধারে ব্যারন ওআইজ-নেকের মালি। একটু তার গুমর আছে, তা হোক, লোকটি একটু জানে-শোনেও বটে। কেতাবে পড়েছে—তার লেখকের ওপর বিশখানা বা তার চেয়েও বেশী কেতাব আছে। তাই তাকে মাঝে মাঝে দু'একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—তাতে আর এমন দোষ কি—

হাউস—(শুনে) না—হ্যাঁ হ্যাঁ তাই করা উচিত…।

বোরো—আজ্ঞে কি করবো ?

হাউস—সে যা বলেছে। আমার তাতে কিছুমাত্র অমত নেই।

বোরো—(আরো অবাক হয়ে) আজ্ঞে মশাই, আমি তো এখনো কিছু বলিনি।

হাউস—(পূর্ব্বের মত) তাই করাই ঠিক, এতে আর সন্দেহ কি ?

বোরো—(রীতিমত ভয় পেয়ে) আজ্ঞে, মশাই…

হাউস—(যেন জেগে উঠলেন) কি হয়েছে ?

বোরো—আজ্ঞে, বুঝেছি—অপরাধ যদি না নেন তো জিজ্ঞেস করি—কাউনসিলর-গিন্নী কি ভালো নেই ? (হাউসভেরমের নিরুত্তর, বোরোমাস অপ্রস্তুত) আজ্ঞে আমি ভাবছিলুম—তিনি যেদিন বাইরে বেরিয়ে-ছিলেন তারপর প্রায় তিন হপ্তা হয়ে গেল—তাই—

হাউস—তিনি মারা গেছেন—তুমি যে তাঁর খোঁজ নিচ্ছ তাতে খুসি হলুম—কাউন-সিলর-গিন্নী মারা গেছেন, বুঝলে ? (টেবিলের ধারে তিনি বসলেন)

বোরো—(চমকে উঠে, তাড়াতাড়ি মাথার টুপি খুলে) আহা-হা—মশাই—তাইতো —(ক্ষণকাল উভয়ে নির্ব্বাক)

হাউস—হ্যাঁ। আর তিনি কখনো বাইরে আসবেন না বোরোমাস, আমাদের সঙ্গে আখা করতে।

বোরো—আজ্ঞে এও কি সম্ভব। উনি যে এতটা অসুস্থ তা তো ভাবিনি। (মাথা নেড়ে) আর বয়েসই বা এমন কি হয়েছিল।

হাউস—কি বল্লে বোরোমাস ? বয়েস হয়নি ? অবশ্য আমার চেয়েও সাত বছরের ছোট ছিলেন, [illegible] আমার বয়েসও প্রায় ষাট হোল।

বোরো—আজ্ঞে, তা বটে।

হাউস—তবুও, লোকে ওর চেয়েও বেশী দিন বাঁচে।

বোরো—আজ্ঞে তাঁকে মহাশয়া দেখতুম—গত পনেরো বিশ বছর একরকম প্রায় রোজই দেখতুম—তাই—

হাউস—হ্যাঁ বিশ বছর আগে আমরা সবাই অল্পবয়সি ছিলুম বটে।

বোরো—কিন্তু এই গেল বছরেও কৈ তাঁকে তো বুড়ো বলে' মনে হত না। এখানে গরমের সময় তিনি যখন ভারি রোগা আর ফ্যাকাশে হয়ে গেছলেন—তখন লোকের

তাঁরা আশ্চর্য্য ছিল না—আজ্ঞে আমিই একদিন, সন্ধ্যে তখন অনেকক্ষণ উতরে গেছে, ফটক পার হয়ে যেতে যেতে তাঁকে দেখলুম এখানে বসে' রয়েছেন, মনে হল—অপরাধ নেবেন না—তখন মনে হল নিশ্চয়ই কাউন্সিলর-গিন্নীর ছোট বোন বসে' আছেন।

হাউস—(ক্ষণকাল চুপ করে' থেকে) হাঁ বোরোমাস, তারপর আমাদের দেমাকে বন্ধু ক্লাঞ্জ কি বল্লে বল ?

বোরো—আজ্ঞে না না, সে-সব কথা বলে' আর এখন বিরক্ত করবো না। (তাঁর হাত নিয়ে চুমো খেয়ে) এ যে কত কষ্ট তা আমি বুঝি, আমারও একদিন স্ত্রী ছিল, তাকেও মাটির তলায়—(হঠাৎ যা বলেছে তা ভেবে সে শঙ্কিত হয়ে উঠ্‌ল) আজ্ঞে তার মানে—আমি বলছিলুম কি—

হাউস—বুঝেছি বোরোমাস। (আবার ক্ষণকাল সব চুপচাপ)

বোরো—আর ছেলেটি মশাই ?

হাউস—কে ?

বোরো—আজ্ঞে মিষ্টার হেনরির কথা বলছি। ওঃ কী ভয়ানক! যখন তার সারা গেল বছর তিনি তাঁর মাকে কেমন করে' বাইরে আনতেন, তারপর আবার সন্ধ্যে বেলায় আসতেন তাঁকে নিয়ে যেতে—

হাউস—তা বটে! বেচারা!

বোরো—কৈ তিনিও তো আর বাইরে আসেন না ? তাঁরও কি অসুখ না কি ?

হাউস—না না অসুখ কেন হবে ? আমি তো রোজই আশা করছি তিনি আসবেন। তিনি বেড়াতে গিয়েছিলেন, এখানে তো ছিলেন না। এইবার ফেরবার সময় হয়েছে—এলেই হল একদিন। তাঁর বিশ্রাম দরকার হয়েছিল—নিজেকে একটু চাঙ্গা করে' নেওয়া দরকার—আবার তাঁকে কাজে লাগতে হবে তো!

বোরো—আজ্ঞে হ্যাঁ তা বৈকি। বিশেষ তাঁর মত কাজ যে সব লোকের—

হাউস—কাজ বলে' কাজ—কবি! (দাঁড়িয়ে উঠলেন) কবি! তার মানে কি জানো ?

বোরো—আজ্ঞে হ্যাঁ জানি বৈ কি মশায়—

হাউস—না না তুমি জান না—কিছুই জান না। আমরা ও সম্বন্ধে কেউই কিছু জানি না—সাধারণ মানুষ আমরা—আমরা কেবল পারি নিজেদের বাগানে বসে' বকবক করতে—

বোরো—আজ্ঞে সে কি বলেন, আপনি তো এক সময়ে—

হাউস—বলছ এক সময়ে আমিও আর কিছু করতুম ? তা-ও এখন যা করছি তার চেয়ে আর কি ভালো ? সহরে আপিসের ডেস্কে বেলা আটটা থেকে দুটো পর্য্যন্ত, কখনো কখনো তিনটে-চারটে পর্য্যন্ত বসে' থাকতুম, এই তো ?

বোরো—ওঃ রোজ রোজ একই জায়গায় ছ'ঘন্টা ধরে' বসে' থাকা কম কষ্ট নয়! তখন আপনার জন্যে আমার ভারি দুঃখ হোত, বাগানে এসে বসতে আপনার কত দেরী হয়ে যেত! আর তারপর শীতের সময়—

হাউস—কিছু তো করা চাই বোরোমাস! আমার ডেস্কে এখন আর একজন বসছে। আর

আমি যতদিন কাজে লেগেছিলুম সে-ও যদি ততদিন থাকে তো পেন্‌শন্ পাবে, তখন আর একজন তার জায়গায় এসে ভর্ত্তি হবে। ও জায়গাটাতে কে বস্‌বে তাতে কিছুই আসে যায় না, যে-কেউ একজন হলেই হল। কিন্তু কবি—সে তোমার-আমার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ধরণের লোক, বোরোমাস! সে যখন কাজ থেকে অবসর নেয় তখন আর অমন চট্ করে' তার জায়গায় বসাবার লোক খুঁজে পাওয়া যায় না—সে-জায়গা ভর্ত্তি হতে হয়তো বহুকাল কেটে যায়। কবি যে, তার বিশেষ সাবধানে থাকা দরকার, জগতের সবাই তা-ই আশা করে—বুঝলে বোরোমাস?

বোরো—আজ্ঞে হ্যাঁ, বুঝে'চি।

হাউস—বুঝেচ? কিছু বোঝনি। হেনারির মধ্যে অদ্ভুত কিছু দেখেছ?—অসাধারণ কিছু? তার মাথার চারদিকে একটা জ্যোতির মণ্ডল ছাখোনি? না বলছ? তবেই তো, ছাখো, তুমি কিছু বোঝ না এ সব। (বোরোমাস হাসলে, তারপর গম্ভীর হয়ে গেল) আমার সম্বন্ধে অত ভেবো না, বোরোমাস। আমার মাথা ঠিক আছে। ঐ যে জ্যোতির কথা বল্লুম সেটা সত্যিকারের নয়, কাল্পনিক। তুমি তাই দেখতে পাবো না—কিন্তু ওর মা দেখতে পেতেন।

বোরো—আজ্ঞে, আপনি কি বলতে চাইচেন তা বুঝেচি। মিষ্টার হেনরি সম্বন্ধে কাগজে এত কথা লেখে, যদিও তাঁর বয়েস এত অল্প—আর লোকেও তাঁর সম্বন্ধে কত আলোচনা করে—এইতো? (সে মাথার চারিদিকে হাতখানা ঘুরিয়ে আনলে যেন জ্যোতি-মণ্ডল বর্ণনা করছে। গম্ভীর শোকের পরিচ্ছদে হেনার বেড়ার ওপাশ দিয়ে চলে গেল। মাথা নত করে' অভিবাদন করে' সে বাড়ীতে গিয়ে প্রবেশ করলে। হাউসডেরফের তার পিছু-পিছু দৃষ্টি প্রসারিত করলেন, বোরোমাসও চোখ দিয়ে তার অনুসরণ করতে লাগলো।)

বোরো—আজ্ঞে আপনি যদি অনুমতি করেন—আমি এখনো ওঁকে জানাবার অবসর পাইনি, আমি কত দুঃখিত…(হেনরি বাড়ীর মধ্যে থেকে বারান্দায় বার হয়ে এল)

হাউস—যাও না, এখন গিয়ে বলো—বলো ওঁর জন্যে তুমি দুঃখিত। (বোরোমাস হেনরির সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্যে অগ্রসর হল, হেনরি সিঁড়ি দিয়ে বাগানে নেমে এসে বুড়োর হাতখানা ধরলে)

হেনরি—ধন্যবাদ, বোরোমাস—বুঝেচি। ধন্যবাদ। (বোরোমাস ডানদিক দিয়ে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল। হেনরি টেবিলের দিকে এগিয়ে এল। হাউসডেরফের দাঁড়িয়ে উঠলেন, তারপর দু'একপা এগিয়ে গিয়ে তার হাত ধরলেন)

হাউস—আবার ফিরেছ তা হলে?

হেনরি—হ্যাঁ। এত শীগ্‌গির ফিরবো ভাবিনি। বাড়ীতে থাকা বরং ভালো…

হাউস—(ঘাড় নেড়ে) তুমি সেদিন সন্ধ্যেবেলাই চলে' গিয়েছিলে?

হেনরি—হ্যাঁ। সমাধিভূমি থেকে বাড়ী ফিরে কাপড়-চোপড় ব্যাগে পুরেই বেরিয়ে পড়লুম। সে রাত্তির বাড়ীতে কিছুতেই কাটাতে পারতুম না।

হাউস—তা তো বটেই। তা কোথায় গেলে ?

হেনরি—প্রথমে গেলুম স্ক্যাল্‌সবার্গ।

হাউস—সত্যি ?

হেনরি—ওখানে গেলে বড় সুখ পাই। ভারি একটি সান্ত্বনা পাই ওখানে।

হাউস—এরকম সহর আছে না কি ? তাহলে তো ভালো।

হেনরি—আজ্ঞে হাাঁ আছে, তবে অবশ্য অবস্থাবিশেষে। হঠাৎ স্ক্যাল্‌সবার্গে গিয়ে পড়িনি। আমার একটু অভিজ্ঞতা আছে—সাত আট বছর আগেকার, ভারি দুঃখের—আপনি তো জানেন ঘটনাটা—ভেবেছিলুম আর কাটিয়ে উঠতে পারবো না। আমি চলে গেলুম স্ক্যাল্‌সবার্গে। আর সেই দিনই বিকেলে হেলব্রানের চমৎকার বাগানে একলা বেড়াতে বেড়াতে আমার দুঃখটা যেন হালকা হয়ে এল। পরের দিন সকালে যখন জেগে উঠলুম তখন বেশ সুস্থ সবল মনে হল—আবার আমি কাজে লেগে গেলুম।

হাউস—এও কি সম্ভব ?

হেনরি—নিশ্চয়ই। আমার বয়েস তখন কুড়িও হয় নি, আর কালটা ছিল বসন্ত—সে কথা ভুলে চলবে না।

হাউস—ও তা বটে।

হেনরি—কিন্তু এবারে কোনো সুখ পেলুম না—কিছুই না—বরং তার উল্টো।

হাউস—তাহলে এমন সময়ও আছে যখন হেলব্রানও কিছু করতে পারে না ? স্ক্যাল্‌সবার্গে কতদিন ছিলে ?

হেনরি—আমি পরের দিন চলে গেলুম মিউনিচে। ভেবেছিলুম পুরোনো সব ছবি দেখে সান্ত্বনা পাবো। প্রাচীন পিনাকো-থেকে গেলুম—সেখানে আমার প্রিয় ডুরের আর হোলবেয়ের ছবি আছে—সেখানে গিয়ে বহুদিনের মধ্যে যেন কতকটা সান্ত্বনা পেলুম। (কিছুক্ষণ থেমে) এই সব কথা বলছি বলে' কিছু মনে করবেন না। আপনাকে সমস্ত খুলে বলা বিশেষ দরকার হয়ে পড়েছে…

হাউস—(তার হাতখানি ধরে', আগেকার চেয়ে স্নিগ্ধ কণ্ঠে) বেশ তো। বলো, বলো।

হেনরি—ধন্যবাদ। (উপবেশন করলে) দেখুন মিষ্টার হাউসডেণ্ডকের—আমার ভারি দুঃখ হয়—এক আপনি আর আমি—ইদানী যেন আমরা ভারি তফাৎ হয়ে পড়েছি।

হাউস—তার মানে ?

হেনরি—আমি বেশ বুঝতে পারি যে আপনি—অনেকদিন আগে আমি যখন ছোট্ট ছিলুম, আর ঐ মাঠে খেলা করতুম—তখন আমায় যেমন ভালোবাসতেন এখন আর তেমন বাসেন না।

হাউস—হ্যাঁ—সে তো অনেকদিনের কথা হেনরি। আর তুমি অবশ্য স্বীকার করবে যে তুমিই প্রথমে—অবশ্য তুমি যে তোমার ইচ্ছামত করবে এটা কিছু অস্বাভাবিক নয়। এ জায়গাটা তোমার মত অল্পবয়েসি লোকের ভালো লাগা শক্ত—তা ছাড়া তোমার নিজের বন্ধুবান্ধব আছে। কিন্তু আমি তো কখনো তা নিয়ে অনুযোগ করিনি—করেছি কি ?

হেনরি—আজ্ঞে না, তা বলছি না। কিন্তু

আমি আপনাকে বলতে চাই—এবারকার এই নিষ্ফল ঘোরাঘুরির পর—অন্ত সবার চেয়ে আপনি আমার কত অন্তরঙ্গ। আপনি আমার কথা বুঝতে পারবেন। আপনি জানেন আপনার কাছে আমি কি পর্য্যন্ত ঋণী। আমার মা'র যে আপনি কতখানি ছিলেন তা আমি জানি—তাঁর জীবনের শেষ সময়টা আপনি কি সুন্দর সার্থক করে' তুলেছিলেন।

হাউস—(প্রতিবাদের ভঙ্গীতে) আচ্ছা আচ্ছা—সে কথা থাক—তোমার কথা বলো এখন। তুমি মিউনিচে গিয়ে ছবি দেখলে? আর ছবি দেখে সান্ত্বনা পেলে?

হেনরি—হাঁ, যতক্ষণ সেই শান্ত স্নিগ্ধ হলের মধ্যে ছিলুম। পথে যেই বার হলুম, আবার যে-কে-সেই। আর তারপর সন্ধ্যে-গুলো—কী নির্জন, কী দীর্ঘ—যেন তার অন্ত নেই! ভাবতে চেষ্টা করলুম—অসম্ভব! মনে হল আমার মধ্যে সব-কিছু যেন মরে' গেছে। (ক্ষণকাল থেমে দাঁড়িয়ে উঠে) কতকাল এ-ভাব থাকবে কে জানে!

হাউস—ভারি কষ্টকর—বিশেষত কাজ করা যাদের অভ্যাস—

হেনরি—অভ্যাস? বহুকাল অভ্যাস নেই। সেইটেই ত হয়েছে মুস্কিল। দু'তিন বছরের মধ্যে কিছুই করিনি। আপনি তো জানেন—

হাউস—হ্যা জানি।

হেনরি—একেবারে অসম্ভব। যাঁকে ভালোবাসি, দেখছি সেই মা কষ্ট পাচ্ছেন—আর তাও কি যেমন-তেমন কষ্ট—আর তারপর বুঝছি কোনো আশা নেই—আর তিনিও তা বুঝছেন—সেইটেই তো ভয়ানক। সন্ধ্যা সময় তাঁর বিছানার পাশে বসে' পড়ে' শোনাচ্ছি আর তাঁর জলভরা চোখের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি তিনিও নিজের অবস্থা ভালোরকমই বুঝতে পারছেন। (অনেকক্ষণ চুপ করে' থেকে) সে ঘরটা ছেড়ে দিয়েছি।

হাউস—ছেড়ে দিয়েছ? তোমার একলার পক্ষে মস্ত বড় ঘর!

হেনরি—তা ছাড়া ঐ ঘরের মধ্যে আমি এক ছত্রও লিখতে পারতুম না। রাতের পর রাত আমার মনে হোত পাশের ঘর থেকে যেন গোঙানির শব্দ শুনতে পাচ্ছি। সেই শব্দ আমার বুকের মধ্যে যেন কেটে বসে' যেত—কাজ করবার ইচ্ছে বা শক্তি আর কিছুই থাকত না—বেঁচে থাকাও কষ্টকর মনে হোত। হা ভগবান—(স্তব্ধতা) তাঁর মৃত্যুর আগের রবিবারে ডাক্তার এসে আমায় কি বল্লেন জানেন?

হাউস—কি?

হেনরি—তিনি বল্লেন—আরো দু'তিন বছর হয়তো এই ভাবে চলতে পারে।

হাউস—(চমকে উঠে—প্রায় যেন স্বগত-ভাবে) আরো দু'তিন বছর? (সামলে নিয়ে) তিনি বল্লেন আরো দু'তিন বছর ধরে' এরকম চলতে পারে?—

হেনরি—হাঁ। তাহলে কিন্তু অবস্থা আরো খারাপ হোত। তিনি ঘরের বার হতে পারতেন না—বাইরে এসে যে ঘণ্টা কয়েক বসে' থাকতেন তা-ও সম্ভব হোত না—এই বাগানের মধ্যে বসতে তিনি কত ভালো-বাসতেন! (শূন্য আরাম চৌকির পানে দৃষ্টি নত করে' দাঁড়িয়ে রহলো)

হাউস—আমি অবশ্য কখনো কখনো সহরে যেতে পারতুম—কি বল ?

হেনরি—(লজ্জিতভাবে) ঠিক বলেছেন মিষ্টার হাউসডেরকের। আমি কেবল নিজের কথাই বলছি—আমার বয়েস অল্প—আমার একটা ভবিষ্যৎ থাকলেও থাকতে পারে—কিন্তু আপনি—আপনি কতটা হারিয়েছেন !

হাউস—হ্যাঁ আমি অনেক হারিয়েছি।

হেনরি—মা যে আপনার কত অনুরক্ত ছিলেন তা জানি। বরাবরই জানতুম—সেই কত বছর আগেও।

হাউস—তখনও—

হেনরি—আমি তো তখন বিশেষ ছোট নয় যখন তিনি - যিনি আমার বাবা ছিলেন—আমা'দের ত্যাগ করে' যান।

হাউস—হ্যাঁ—হাঁ।

হেনরি—সেদিনের কথা এখনো আমার মনে পড়ে, মা যেদিন বল্লেন বাবা—চলে' গেছেন। যখন তিনি ফিরলেন না তখন ভাবলুম তিনি মারা গেছেন। তাই ভেবে রাত্তিরে এক একদিন ভারি কাঁদতুম। তার পর একদিন তাঁকে রাস্তায় দেখলুম সেই অল্প মেয়েটির সঙ্গে—যার জন্যে তিনি মাকে ত্যাগ করে' যান। খুব ছেলেবেলাতেই বুঝেছিলুম আমার মা স্বাধীন—বিধবা হলে যেমন স্বাধীন হয় তেমনি।

হাউস—তাহলে—বোধহয়—তুমি আমাদের ক্ষমা করেছ ?

হেনরি—(একটু বিরক্তভাবে) মাপ করবেন, আমি হয়তো ঠিকমত মনের ভাব প্রকাশ করতে পারিনি। (আবার উৎসাহিত হয়ে) স্বাভাবিক সোজা কথা আমরা খোলাখুলি ভাবে বলবো না কেন, বিশেষত এইরকম সময়ে। ছেলে যেমন করে' বাপের হাত ধরে তেমনি করে' আপনার হাতখানা চেপে ধরতে ইচ্ছে করছে—আমি তো জানি মা আপনাকে কত ভালবাসতেন ! (অন্ধকার ঘনিয়ে এল। একে একে রাস্তার আলোগুলো জলে উঠলো)

হাউস—ভালোবাসা ? সেটা এমন কিছু নয়। বয়েস যখন তরুণ থাকে তখন সহজেই ভালোবাসা আসে। আমরা বন্ধু ছিলুম হেনরি—দুই বুড়োমানুষের বন্ধুত্ব। তার মানে বোঝ ? না তোমাদের মত তরুণের কাছে ও-কথার কোন মানেই নেই ? ঠিক ঠিক, তুমি কি করে' বুঝবে ? তরুণ তোমরা—সামনে সমস্ত জগৎটা পড়ে' রয়েছে—ভবিষ্যৎ তোমাদের পায়ের তলে—আর তুমি, তোমার শক্তি তোমার মনীষা ভবিষ্যতের আশা-ভরসা নিয়ে কি করেই বা—

হেনরি—আপনি ভুল করছেন মিষ্টার হাউসডেরকের, আমি বুঝি। আমি যদি তাঁকে আপনার কাছে ফিরিয়ে আনতে পারতুম—আমাদের কাছে—আঃ ! মাকে যদি ফিরিয়ে এনে আবার ঐখানে বসাতে পারতুম—অন্তত কেবল একটা সন্ধ্যার জন্যেও—ওঃ তার জন্যে কী-না দিতে পারি !

হাউস—(তিক্তভাবে) কী দেবে শুনি ?

হেনরি—(ইতস্তত করে') আমার এখন মনে হয় আমার সমস্ত ভবিষ্যৎ, যা-কিছু আমি করতে পারি, যা কিছু করবার আশা রাখি সমস্তই ঐজন্যে দিতে পারি।

হাউস—হেনরি, রাগ কোরো না—কিন্তু তুমি নিজে ওকথা বিশ্বাস করোনা।

হেনরি—করতে যদি পারতুম—করবার যদি উপায় থাকতো—

হাউস—না, হেনরি, ও কথা সত্যি নয়—তোমার শক্তি থাকলেও—আমি তোমায় জানি—তোমাদের মত সবাইকে জানি—তোমরা সব আর্টিষ্ট, তোমাদের ধরণ ধারণ বেশ জানি।

হেনরি—আমাদের সবাইকে? আমি আর কারো জবাবদিহি করতে চাই না।

হাউস—না, আর কারো জবাবদিহি তোমায় করতে হবে না। কিন্তু যখন বাক্ আমাদের সবাই, এখন কি করে যাচ্ছি তা ধরতে পারা বেশ হবে। শোন; বছর দুয়েক আগে আমার বাগানে একজন লোক ছিল—অবসর সময়ে সে বাগান নিয়ে থাকতো। একবার তার তৈরী গোলাপ ফুল প্রদর্শনীতে পাঠানো হয়েছিল। লোকটির নাম টমাস। তার একমাত্র ছেলে মারা যায়—বুদ্ধিমান চটপটে একটি সাত বছরের ছেলে—আমি তাকে জানতুম, সে তার বাবার সঙ্গে সঙ্গে প্রায়ই এখানে বেড়াতে আসতো। একদিন রাতে ডিপথিরিয়ায় সে মারা গেল। আমি তাদের এত বড় বিপদে সহানুভূতি জানাবার জন্যে গেলুম। গিয়ে দেখি বাপ দাঁড়িয়ে বাজাচ্ছে আর সেই ঘরের একধারে মরা ছেলে বাক্সের মধ্যে শুয়ে রয়েছে। আমি ঘরে ঢুকলেও সে থামল না, বাজাতেই লাগলো—বাজনাটা আমার দিকে একটুখানি হেলিয়ে অভিবাদন করে ফিসফিস করে সে বল্লে—আমি তখন তার পিছনে গিয়ে দাঁড়ালেম—"শুনুন মিষ্টার হাউসডেরফের—আমার ছেলের উদ্দেশে রচনা—সুরটা এখুনি মাথায় এল।" মরা ছেলেটা কফিনের মধ্যে—ভাবো একবার—আমি তো দেখে শুনে থ মেরে গেলুম—

হেনরি—(খুব আগ্রহের সঙ্গে শুনলে। তারপর ক্ষুদ্রভাবে,) হ্যাঁ—আমার মনে হয় আমি বুঝতে পারি—অনেক ভালো লোক যাঁরা এ সব ব্যাপারে আঁতকে ওঠেন।

হাউস—আঁতকে ওঠেন? হ্যাঁ তা ঠিক বলেছ।

হেনরি—আচ্ছা মিষ্টার হাউসডেরফের, বলুন দেখি আমাকে, এই সব লোকের ওপর কি হিংসা হয় না?—যারা এমন করে দুঃখশোক পরিহার করতে পারে—ডুবিয়ে দিতে পারে নিজের মধ্যে, তাদের আর্টের মধ্যে আশ্রয় নিতে পারে?—এমন কি যাদের এমন কোনো ভোজবাজি জানা আছে যার প্রভাবে, তারা তাদের দুঃখকে একটা সুন্দর মূর্তি দান করতে পারে—কেবল অনেকটা ব্যর্থ অশ্রুপাত না করে?

হাউস—কি বল্লে? দুঃখকে সুন্দর মূর্তি দান করবে? তাতে কি মরা মানুষকে ফিরিয়ে আনা যায়?

হেনরি—তাদের জন্য কেঁদেও ত যায় না। একথা বলছিনে যে প্রিয়জনের মৃত্যুর শোককে কর্মের আনন্দ ছাপিয়ে উঠতে পারে। কিন্তু এই কি আমাদের সম্বল নয়—এই আমাদের কাজ? আপনি কি আগেকার মতন বসে আপনার বাগানের পরিচর্যা করবেন না? আমি তো সেই দিনের অপেক্ষা করছি যখন আবার কাজে লাগতে পারবো, কোনো-কিছু একটা রচনা করতে পারবো। ভগবানের পায়ে মাথা নোয়ানো ছাড়া উপায় কি।

হাউস—ভবিতব্যের পক্ষে—হ্যাঁ সেকথা সত্য হ'তে পারে।

হেনরি—এও তো ভবিতব্য।

হাউস—না—না—

হেনরি—(একটু বিস্মিতভাবে) না তো কি ? ঐ-সব চিন্তা করে' কষ্ট পান কেন ? আপনি তো নিজেই ডাক্তারের সঙ্গে—এই মাসদেড়েক আগে, কথা কয়েছেন—তিনি তো আপনাকে সত্য কথাই বলেছিলেন—মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী ছিল।

হাউস—কিন্তু এত শীগ্‌গির নয়। আরো পরে।

হেনরি—কি করে' আপনি ও-কথা বলতে পারেন মিষ্টার হাউসডেবেকের ? আপনি বলতে চান না নিশ্চয়—যে কোনোরকম যত্নের ত্রুটি ঘটেছিল—

হাউস—না না, তা নয়, আমায় মাপ করো। যা করবার তা সমস্তই করা হয়েছিল।

হেনরি—তবে ?

হাউস—তুমি কি নিজেই আমায় একমাত্র বলোনি যে তিনি আরো দু'তিন বছর হয়তো বাঁচতে পারতেন ?

হেনরি—হ্যাঁ, তা তো বলেছি। কিন্তু ডাক্তার তো বলেই রেখেছিলেন যে মৃত্যু হঠাৎ যে-কোনো দিন ঘটতে পারে। সে-কথা তো আপনিও জানেন।

হাউস—হঠাৎ ? হ্যাঁ-তা হঠাৎ এসেছিল বটে। (ইতস্তত করে'—তারপর মন স্থির করে') তবে স্বাভাবিকভাবে এসেছিল কি না সেটা আলাদা কথা।

হেনরি—(চমকে উঠে) কি ? কেন ? —আপনি এরকম কথা কেমন করে' বলতে পারেন বুঝতে পারিনা—কিছুমাত্র সন্দেহ থাকলে ডাক্তার তো নিশ্চয়ই বুঝতে পারতো—

হাউস—কেন সে বুঝবে ? কেমন করে' ? একটু বেশী মাত্রায় মরফিন—সকালের আগেই মৃত্যু—পরিবারের সকলে তো প্রস্তুতই ছিল—

হেনরি—কথাটা আপনি এমন জোরের সঙ্গে বলছেন—আমার মা কি কখনো ও সম্বন্ধে— ?

হাউস—আমার ভুল হয়নি—এই বয়েস বোধ হয় যথেষ্ট হবে।

হেনরি—আপনি যখন এতটা বলছেন মিষ্টার হাউসডেবেকের, আপনার বোঝা উচিত যে আমি—

হাউস—আমি কি বলছি তা আমি বেশ জানি—বেশী কিছু আর জিজ্ঞেস কোরোনা।

হেনরি—আপনি বলতে চান তাঁর ডেস্কের ওপরের চিঠিখানায়—

হাউস—(ঘাড় নেড়ে) হ্যাঁ। (ক্ষণকাল চুপচাপ)

হেনরি—(শীত সন্দেহান্বিত) সেই চিঠি ? ক—তাতে আর আশ্চর্য্য কি আছে ? সেই সব ভয়ানক রাত্রে আমি যে কতবার নিজেকে প্রশ্ন করেছি—আপনি হয়তো শুনে আঁতকে উঠবেন তবুও আমি এখন স্বীকার করবো—আমি নিজেকে জিজ্ঞাসা করেছি হতভাগ্য মানুষ আমরা এত দুঃখ কেন ভোগ করি—যখন এ সমস্তই এক মুহূর্তে শেষ করে' দেবার উপায় আমাদের হাতে রয়েছে।

হাউস—হেনরি !

হেনরি—আপনি যা বলছেন আমার মা যদি তাই করে' থাকেন তাহলে তিনি ঠিকই করেছেন।

হাউস—হেনরি!

হেনরি—আমার সুস্তিকার মত তাই।

হাউস—কিন্তু হেনরি তুমি জান না যথার্থ ব্যাপারটা তুমি জান না। তিনি বেঁচেই থাকতেন - এত কষ্ট সহ্য করেও—ভগবান যতদিন তাঁকে রাখতেন—তিনি আমার জন্যে আর তাঁর নিজের জন্যে বেঁচেই থাকতেন—এই বাগানের মধ্যে প্রত্যহ ঘণ্টাকয়েক আমার সঙ্গে কাটাবার জন্যে—এই বাগান, যা আমাদের যৌবনের শত স্মৃতিবিজড়িত। তিনি মরেছেন তোমার জন্যে, হেনরি। এখন বুঝলে? তিনি তোমার জন্যে মরেছেন।

হেনরি—(ক্রমশ উত্তেজিত হচ্ছে) আমার জন্যে—আমার জন্যে? আপনার কথা আমি মোটেই বুঝতে পারছিনা। আমার জন্যে? তার মানে?

হাউস—সত্যি বুঝতে পারছ না? কল্পনা করতে পার না? এইমাত্র তুমি নিজে বল্লে না?

হেনরি—কি বল্লুম?

হাউস—এইমাত্র তুমি আমায় বল্লে না বছরখানেক ধরে' তোমার মনে কি ভাব জাগছিল? তুমি কি ভাবো তোমার মা তা টের পাননি?

হেনরি—কি টের পাবেন?

হাউস—যে তিনি পীড়িত হয়ে পড়াতে তোমার কাজের ক্ষতি হচ্ছে?—তুমি আর লিখতে পারনা—তোমার ভাবনা হচ্ছে তোমার প্রতিভা নষ্ট হয়ে গেল—যে তুমি—তুমিই মারা পড়লে—তিনি সে সমস্তই বুঝতে পেরেছিলেন—আর বুঝতে পেরেছিলেন বলে'—

হেনরি—সেই জন্যে? না-না-না, এ কখনো সম্ভব নয়।

হাউস—খুব সম্ভব—তিনি যে তোমার মা ছিলেন!

হেনরি—না-না তা হতে পারে না। মিষ্টার হাউসহোল্ডের, আপনি শোকের তাড়নায় অন্যায় কথা ভাবছেন। অবশ্য আমি স্বীকার করি আমার মানসিক অবস্থা মার অজ্ঞাত ছিলনা—যদিও সেটা তাঁর কাছ থেকে গোপন করতে যথাসম্ভব চেষ্টা করেছিলুম। কিন্তু তার জন্যেই যে তিনি—না-না তা অসম্ভব।

হাউস—(সক্রোধে বাধা দিয়ে) তুমি আমায় বিশ্বাস করছনা কেন? আমি কি তোমার কাছে মিথ্যে কথা বলছি? কি দরকার আমার! (পকেট থেকে একখানা চিঠি বার করে') এই নাও পড়ো—পড়ে' দ্যাখো। সজ্ঞানে লেখা চিঠি—এই চিঠি তাঁর ডেস্কের ওপর পাওয়া যায়। সেই শেষ দিন সন্ধ্যাবেলায় এই চিঠি লেখেন—আর আধ ঘণ্টা পরে—পড়ো, পড়ো, সব কথা এতে আছে—তুমি কষ্ট পাচ্ছ দেখে—বুঝছ? তিনি তোমার কষ্ট দেখে—আমাদের ছেড়ে গেলেন—তাঁর সময় ফুরোবার আগেই। এখন বুঝলে কেন তিনি মারা গেছেন?

হেনরি—(তাড়াতাড়ি চিঠি পড়তে লাগলো) মা! মা! (সে বসে পড়লো, যেন ভেঙে পড়লো) আমার জন্যে—আমার জন্যে—আমি তাহলে তাঁর—ভগবান! মা! ও মা! (আরাম চৌকির সামনে হাঁটু গেড়ে

বসে পড়লো। মাথাটা চৌকির ওপর লুটিয়ে গেল। হাউসডেরফের লক্ষ দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে ধীরে-ধীরে মাথা নাড়তে লাগলেন। বহুক্ষণ উভয়েই নীরব। অবশেষে হেনরি দাঁড়িয়ে উঠে আস্তে-আস্তে বলতে লাগলো)

হেনরি—আমি যাচ্ছি। বুঝতে পারছি আমাকে এখানে দেখা আপনার পক্ষে কত কষ্টকর। এই চিঠি (চিঠিখানা তখনো তার হাতে)—সজ্ঞানে লেখা আর এতে সত্য কথাই আছে। এতে আর সন্দেহ নেই। (একটু ইতস্তত করে') কিন্তু এই একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে পারি কি ?

হাউস—কৈ, কোনটি ?

হেনরি—এই যে, যেখানে মা আপনাকে মিনতি করছেন এ চিঠির বিষয় কখনো আমায় না জানাতে। (পড়তে লাগলো) "আমি মিনতি করি—" তিনি মিনতি করছেন আপনার কাছে, তাঁর মৃত্যু স্বাভাবিক ভাবেই হয়েছে, আমার এই বিশ্বাস যেন অটুট থাকে। এ চিঠি কেবল আপনার জন্যেই লেখা, আমার জন্যে অবশ্য নয়।

হাউস—কিন্তু আমার ইচ্ছে যে তুমি এ-কথা জানো। এর দায়িত্ব আমি নিচ্ছি। কিছু ভেবনা, তুমি এ ধাক্কা বেশ সামলাতে পারবে।

হেনরি—আপনার এই কাজ তাঁর ইচ্ছা-মৃত্যুর, তাঁর মহৎ আত্মত্যাগের সকল গৌরব নষ্ট করে' দিলে। তিনি ইচ্ছা করেননি যে আমি তাঁকে হত্যা করলুম এ-ভাব যেন আমার মনে থাকে—অভিশপ্তের মত আমি জীবন কাটাই। একদিন হয়তো আপনি বুঝতে পারবেন, কতবড় অন্যায় আপনি করলেন। কেবল আমার প্রতি নয়, তাঁর প্রতিও—সে অন্যায় আমার অনুষ্ঠিত অন্যায়ের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়।

হাউস—অন্যায় যদি করে' থাকি তো তা মাথা পেতে নিচ্ছি, হেনরি—তোমার মত লোককে সেকথা অসঙ্কোচে বলতে পারি। ভয় নেই, দু'দিন তুমি নিজেকে দোষী মনে করবেন—বেশ বেঁচেবর্তে থাকবে—কাজ-কর্ম করবে—এ-ব্যাপারটাকে নিয়ে হয়তো সুন্দর কিছু একটা রচনা করে' ফেলবে।

হেনরি—সেটা আমার অধিকার—এখন সেটা আমার কর্তব্য। এখন আমার পক্ষে আর কিছু করবার নেই—হয় আত্মঘাতী হওয়া, কিম্বা প্রমাণ করা যে আমার মার মৃত্যু বিফল হয়নি।

হাউস—হেনরি। এই একমাস আগে তোমার মা বেঁচে ছিলেন, এমন কথা তুমি বলতে পার? তিনি তোমার জন্যে আত্মঘাতিনী হলেন তুমি তা ভাবতে পারবে না? দিন কয়েক পরে কে জানে হয়তো তুমি ভাববে যে তিনি তাঁর কর্তব্যই করেছেন। কেমন ঠিক নয়? তোমরা আর্টিষ্ট—তোমরা সব সমান—ছোট বড় মাঝারি সব এক রকম—দাম্ভিক—গর্বে ভরা। তোমার মা যখন এখানে এই আরাম-চৌকিতে বসে' আমাদের সঙ্গে গল্প করতেন কিম্বা মৌনমুখে বসে' থাকতেন—কিন্তু তিনি এখানে ছিলেন—বেঁচে ছিলেন—তখনকার তাঁর জীবনের সেই রকম একটি ঘণ্টার তুলনায় তুচ্ছ তোমার সব রচনা। তা তুমি যত বড় মনীষিই হও।

হেনরি—জীবন? লোকান্তরিতকে যারা মনে রাখে তারা যতদিন বাঁচে ততদিনই

সেও বাঁচে যে পরলোকে! মৃত্যুর পরেও মানুষের স্মৃতিকে যা অম্লান ও উজ্জ্বল রাখে সে কাজ তুচ্ছ নয় ব্যর্থ নয়! তবে আমি মিষ্টার হাউসডেরকের। আজ শোকের তাড়নায় আপনি আমার ওপর অবিচার করবার অধিকার পেয়েছেন। বসন্তে আপনার বাগানে আবার যখন গাছে-গাছে ফুল ফুটবে, রিক্ত শাখায় সবুজ পাতার বাহার খুলবে, তখন আপনার সঙ্গে ব্যাখ্যা করবো। ভয় নেই, আপনিও বেঁচেই থাকবেন—কিছু মারা যাবেন না! (বারান্দার মাঝ দিয়ে সে চলে' গেল। বাড়ীর দরজা যেই খুল্লে অমনি ঘরের ল্যাম্প থেকে একটি প্রশস্ত আলোর ধারা অন্ধকার বাগানের মধ্যে এসে পড়লো)*

[যবনিকা]

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

কন্দর্পের প্রসার

প্রথম বসন্ত দিনে বন পথে
চলে মনমথ!
মলয়ে মদির—নেশা,—ফুলকুল
চরণে প্রণত!
কুহক কাজল টানা—আকর্ণ সে
দু'টি আঁখি-পাতে;
ফুলের ধনুকখানি, ধর প্রেম-
পুষ্প-শর হাতে!
পিক-কণ্ঠে বণ্টে নিতি সুললিত
প্রেমের প্রলাপ,
রক্তাধরে চুম্বিয়া সে প্রীতি-রাগে
রঞ্জিছে গোলাপ!
যৌবনেরি মধুরিমা ফুলে ফুলে—
বনে বনে ঢালা,
মনমথ চলে পথ,—কামনার
উত্ত তীব্র জ্বালা!

অশ্রুরাগে ধোওয়া ফুল—পথপাশে
ফুটে কত যুথি,
নিরজন বন-পথ—সুনীরব
একান্ত নিশুতি!
সেদিন গাছের ডালে সেই সবে
পিক ডাকে 'কুহু'—
বিরহীর ব্যথা যেন গুমরিয়া
উঠে 'উহু-উহু'!
যুথিকার কথাখানি গুন্ গুনি'
মসোরার কাণে
সেদিন শুনা'ল অলি,—কামদেব
শরের সন্ধানে
তুলিল ধনুকখানি,—বায়ু গেল
মর্ম্মর করি,'
'বাখানিল কত কথা, মুকুলের
চাপা মন হরি'!

---

* অষ্ট্রিয়ার বিখ্যাত ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার Arthur Schnitzler হইতে।

মুকুল-তুলিল মুখ,—খুলে গেল
  গুণ্ঠনখানি,—
বনস্থলে কত ভাষা—কত কথা
  হয় কাণাকাণি।
মধু চেয়ে মিষ্ট আছে, প্রজাপতি
  সেইদিন বুঝে,
সেইদিন পোড়া মন অপরের
  মন মরে খুঁজে!
আপনার ছায়া দেখি' সেই দিন
  ভেবে মরে মন,
দোসর করিব এরে চেখে মোর
  করেছি মনন।
কারো সুখে হাসিবারে, কারো দুখে
  লুটাইতে চায়,
কি জানি কি কথা মন বারে বারে
  জানাইতে চায়।

গোলাপ-বনের কাছে মন্মথ
  দাঁড়া'ল কৌতুকে,
তুলে নিল ধনুখানি, যোজে ফুল-
  শর হাসিমুখে!
সেই পথে চলে বামা—মধুময়ী,
  মদালস আঁখি,
গোলাপী অধরে তা'র সোহাগের
  ঢেউ মাখামাখি;
গোধূলি আঁচলে বাঁধা, রূপসীর
  আলো-করা রূপ—
মদনের আঁখি-পাতে যেন সেই
  করিছে বিদ্রূপ!
চকিতে বকুল মালা খোঁপা হ'তে
  খসে' গেল পড়ি,'
অধরের উশীর-লেপ কোথা দিয়ে
  কোথা গেল ঝরি'!

নোয়ায়ে গোলাপ-শাখা চারু হাতে
  অধরের 'পর
দেখে বামা সবেনা সে—তরুণীর
  প্রণয়ের ভর!
মদনের শর চেয়ে খর শর
  রমণীর চোখে,
শাণিত সে আঁখি-বাণ গেল ছুটি'
  বিজলী ঝলকে,
মন্মথ-ক্রিয়া কত করিল সে—
  আঁখি পালটিতে,
বিস্ময়ে মদন দেব চেয়ে র'ল
  কুণ্ঠা-ভরা চিতে।
ধরে ফুল ধনু, শর অর্ঘ্য দিয়া
  পদে তরুণীর,
চোরা ধন ফিরে চায় কামদেব
  পায়ে কামিনীর।

"কন্দর্প। আমার নাম রতিদেবী"
  হেসে কয় বামা;—
মন্মথ কহে, "প্রিয়া, চমকিত
  করিয়াছ আমা!—
ভ্রূ-ধনু কি মনোরম! পুষ্প-ধনু
  ছার মনে হয়।
খর আঁখি শর কাছে ফুল-শর
  কিছু নয়—নয়!
ত্যক্ত-ফুল ধনু-শর লুকাইছে
  লাজে মরি মরি,
সু-ভ্রূ। তোর টানা ভুরু, মোহনীয়
  দিঠিতে সুন্দরি।
মদনের এই জ্বালা, এ বিরহ,
  এই বাধা সাধ,
যেন আমি ত্রিভুবনে—জনে জনে
  নিখিলে নিরখি।"

বসন্তের কোন্ পাখী অবিশ্রান্ত
গুহ মরে কেঁদে।
রাত্রি কহে, "আপনারি তীর সখা'
আপনারে বেঁধে!"
শিশিরে স্খলিত পাতা গোলাপের—
ছড়ান চৌদিকে,
বিরহের ব্যথাখানি দিকে দিকে
কে রেখেছে লিখে!

স্নিগ্ধগন্ধি শৈবালের মখমলে
বাসনা সুন্দরী ;—
ফাগুনে আগুন জ্বালা কে ছড়া'ল
মুঠা মুঠা ভরি'।
মনমথ অনুরাগে চুমিছে সে
রাতের অধরে,
শত চুমা হাহাকার করে' উঠে
নিখিল অন্তরে!

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

আদর্শের বিড়ম্বনা

বাহিরের চাপে মানুষের মন যখন চঞ্চল হয়ে ওঠে, তখন তার অক্ষমতার আর সীমা থাকে না — তার শারীরিক শক্তি, তার মানসিক বীর্য্য, তার সৃষ্টি করবার ও কল্পনা করবার ক্ষমতা সবই ক্ষীণ হয়ে যায়। মন ও দেহ যখন কোন কল্পনা-বস্তুকে রূপ দেবার চেষ্টা করে তখন একটা আদর্শ তার অন্তরের মধ্যে কল্পনায় মূর্ত্ত হয়ে ওঠে—তাই দেখিয়ে সামাজিক, রাষ্ট্রীয় বা পারিবারিক জীবনের সমস্ত ক্রিয়া কলাপেও আমরা একটা আদর্শ বস্তুকে মনশ্চক্ষে পরতে পরতে খাড়া করে রেখেছি—কাজেই মন যে অক্ষম হচ্ছে আমরা তার প্রমাণ পাই আমাদের কল্পনা-শক্তির হীনতায়, আমাদের আদর্শ সৃষ্টির দৈন্যে।

একদিন যখন ভারতবর্ষে মানুষের মত মানুষ ছিল তারা কল্পনা দিয়ে গড়েছিল সত্যিকার দেবতা, আর পূজা করেছিল প্রাণের প্রবল বিশ্বাসে ও নিষ্ঠায়। তারা গড়েছিল শিবকে—সেই সর্ব্বত্যাগী মহাদেবকে—ইন্দ্রের ঐশ্বর্য্য—স্বর্গরাজ্যের সমস্ত বিলাস-ঐশ্বর্য্য এবং দেবোচিত ভদ্রতার সকল তকমা-তাবিজের গৌরব যার কাছে তুচ্ছ, নগণ্য। এই আদর্শ দেবতা গড়বার শক্তির জন্ম জীবনের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধায়, মোহহীনতায় ও অন্তর-জাত সত্য দৃষ্টিতে। কোন দেশ বা সাহিত্য এমন-ধারা দেবতা কি মানুষ এ পর্য্যন্ত সৃজন করতে পারে নি। প্রলয়ের এই মনমোহন রুদ্রকে তারা কল্পনাও করতে পারে নি—অথচ সেই ভারতবর্ষের শৈব সেই অপূর্ব্ব নিষ্ঠা কোন্ অতলে বিসর্জ্জন দিয়ে ছদ্মবেশী ভণ্ড, মিথ্যা দেবতার পশ্চাতে ছুটে গভীর আত্মপ্রসাদ লাভ করেছে।

একদিন এ দেশের লোক কি করেছিল তা নিয়ে অহঙ্কারে আমাদের মাটীতে আর পা পড়ে না, অথচ সেই মহতী শক্তি ও উচ্চ আদর্শ থেকে বর্ত্তমান অধঃপতনের কথা স্মরণ

করিয়ে দিলে অনেক অনার্য্যের শিরায় শিরায় আর্য্য রক্তের প্রবাহ এত দ্রুত ও প্রচণ্ড হয়ে ওঠে যে লেখকের ঊর্দ্ধতন কয়েক পুরুষকে উদ্দেশ্য করে গালি না দিলে ক্রোধ-উপশমের কোন সম্ভাবনা থাকে না। মস্ত-বড় আশার কথা এই যে এত গালাগালিতেও অনেকে কর্ত্তব্য থেকে ভ্রষ্ট হয়নি।

আমাদের দেহ ও মন যে দুর্ব্বল হয়েছিল তার একটা নিদর্শন আমাদের দেবতা সৃজনের কল্পনা-শক্তির হীনতায়—অসভ্য হটেনটট পুজো করে—প্রাকৃতিক শক্তিকে দেবতা বলে ভুল করে—ভয়ে, আত্মরক্ষার চেষ্টায়, আর মানুষ পূজা করে রক্ত-মাংসের আদর্শ পুরুষকে ভয়ে নয়, শ্রদ্ধায় এবং ভক্তিতে; এবং প্রাণপণ চেষ্টা করে বালক নিষ্ঠায় সে আদর্শকে অনুসরণ করতে।

কিন্তু আমরা সে কথা ভুলে ছিলুম তাই কবিকল্পিত চরিত্রকে দেবতা করে তুলে-ছিলুম—আদর্শপুরুষকে নয়—রামের মত, যুধিষ্ঠিরের মত সাধারণ লোকের মধ্যে যাঁরা বচনে, কর্ম্মে, চারিত্র্যে, সমস্ত জীবনের সঞ্চিত অভিজ্ঞতায় এমন কোন আদর্শের প্রতিষ্ঠা করেন নি—যাকে আমরা সকলেই জীবনের শ্রেষ্ঠ বস্তু বলে আঁকড়ে ধরতে পারি।

যুধিষ্ঠিরের মত আদর্শ পুরুষের জীবন আলোচনা করলেই এ-সব কথার সার্থকতা প্রমাণিত হবে, অন্ততঃ আলোচনার ফলে সত্যবস্তুর সাক্ষাৎও মিলতে পারে। হাজার বছরের পুরানো বলেই যে কোন জিনিষ বা কোন লোককে বড় বলে মানতে হবে—জ্ঞান-যুগের শিক্ষিত মানুষ সে কথা বলবে কোন্ লজ্জায়? সব জিনিষকে যাচাই করা যে তার কাজ—সব জিনিষ বাজিয়ে নেয় বলেই ত তার হাতে সবই সচল হয়ে উঠচে—মেকি আর চলছে না, ঝুটোর কারবার বন্ধ।

একটা কথা এখানে বলা প্রয়োজন। কাব্যের চরিত্র নিয়ে বিচার করুন কাব্যরসিক সমালোচক। আমি সেই যুধিষ্ঠিরকে আসরে নামাতে চাই—যাঁর নাম আমার দেশের আপামরসাধারণ শৈশবেই শোনে এবং আদর্শ পুরুষ-জ্ঞানে যাঁকে নির্ব্বিচারে নিয়ত শ্রদ্ধা নিবেদন করে।

অনেকে বলবেন, dead lionদের নিয়ে ঘেঁষের কাটে খেলাবার আর কি দরকার। অথচ তাঁরা মনে মনে বেশ জানেন তাঁদের শিক্ষিত মন এ জিনিষকে dead বলে মনে করলেও তাঁদের পারিবারিক বা সামাজিক মন সে কথায় আদৌ সাড়া দেয় না—কাজের কথা, "কালো জিভ মেলিয়ে আছেন, তা তিনি মেলিয়ে থাকুন" অবশ্য খুব খাঁটি, তবে আমার বক্তব্য এই, যদি এঁরা dead lion হন তবে এঁদের সম্বন্ধে শেষ কথা বলতে দোষ কি? আর যদি না হন, তবে আমার কথায় কিছু dead হয়ে যাবেন না; চাই কি ঘষে-মেজে তাঁদের প্রাচীনতায় চারদিকে যে কলঙ্কের দাগ জমে উঠেছে তা ধুয়ে-মুছেও যেতে পারে।

জন্মমাত্রেই মা-বাপ মুখ ফেরালেন, ভাব-লেন, এ ত নয়! ধর্ম্মপুত্র জেনেও তাকে বরণ করে নিতে পারলেন না কেন? আমাদের ধর্ম্ম-ভীরু হিন্দুসমাজে মুখরা সংবাদ-পত্রিকার নিন্দা ও গলাবাজির ভয় তাদের ছিল না বোধ হয়।

শিশুর অন্য ভাইদের কথাই, আমরা কেবল শুনেছি, এই বললেন, তাই করলেন, কিন্তু যেহেতু তিনি ধর্মপুত্র, বোধ করি সেই হেতুই তিনি আমাদের গোপালের সুবোধ বালকটির মত সবার পিছনে তাঁর শারীরিক ও মানসিক অস্বাস্থ্য ও দুর্বলতা নিয়ে সারা শৈশব ও যৌবন চুপ করেই কাটালেন।

তারপর আমাদের আদর্শ পুরুষ বড় বয়সে কি করেছেন, তার বিচার করা যাক। যদিও শৈশবের নমুনা দেখেই পরে কেমন হবেন সেটা অনেকটা বোঝা যায়।

যুধিষ্ঠিরের অন্য দুটি ভাই তাঁদের শৌর্য-বীর্য ও অন্যান্য গুণাবলীর জন্যে যত না খ্যাতি অর্জন করেছেন, যুধিষ্ঠির তার বেশী প্রশংসা লাভ করেছেন নৈতিক চরিত্রের দাবীতে। বুদ্ধিমান লোক কোন কিছুর সংজ্ঞা নিয়ে মাথা ঘামান না, এবং আমিও তা করবার চেষ্টা করব না। নৈতিক চরিত্র বলতে কি বোঝায় তা আমি ঠিক জানি না, কিন্তু যুধিষ্ঠিরের বিশেষ গুণের মধ্যে তাঁর সত্যবাদিতার উল্লেখ নিয়ত হয়ে থাকে। কথায় বলে, সত্যবাদী যুধিষ্ঠির। জীবনে সত্যের প্রতি যে মহতী নিষ্ঠা তিনি দেখিয়েছেন, তার পরিচয় তাঁর আচরণে আমরা পাচ্ছি কি?

মিথ্যাবাদীর অখ্যাতি অর্জন করে তারাই, কাজে-অকাজে মিথ্যা বলাই যাদের স্বভাব; কিন্তু বিপদের দিনে আত্মরক্ষার জন্যে মিথ্যা এমন কি অর্দ্ধসত্য বা সত্যের ভাণও যে প্রশংসার বস্তু হয়ে ওঠে, সত্যের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত লোকের কাছে সেটা একটু রহস্যময় নয় কি? এটা কেমন করে সম্ভব হল? সত্যের আদর্শ যদি সেকালে কোনপ্রকারে ক্ষুণ্ণ হোত তবে যুধিষ্ঠিরের এ পতনকে অগ্রাহ্য করা চলতো; কিন্তু অর্জ্জুন-সম্বন্ধে ভীম ব'লে ছিলেন, তিনি পরিহাস ছলেও মিথ্যা বলেননি, অথচ মহাপ্রস্থানের সময় সকলেরই কোন না কোন কারণে পতন হলো—পতন হলো না শুধু বাক্যবাগীশ এক অক্ষম মহাপুরুষের। সাধারণ মানুষের পক্ষে আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট হওয়া যত সহজে ক্ষমা করা চলে, আদর্শ পুরুষের পক্ষে তা সম্ভব নয়, কারণ সম্পদে বিপদে নিজের আদর্শকে অক্ষুণ্ণ ও পবিত্র রাখাই তাঁর জীবনের ব্রত। রামকে আমরা যে কারণে পূজা করি, প্রতাপকে আমরা যে কারণে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি, ঠিক সেই কারণেই কি যুধিষ্ঠিরকে স্মরণ করা চলে, না সত্যবাদী ব'লে প্রশংসা করা যায়?

তখনকার কালে ক্ষত্রিয়ের লক্ষণ ছিল—সভাসু বাকপটুর্না যুধি বিক্রমঃ—মন্ত্রণা-সভায় তাঁর কতখানি বুদ্ধি খরচ হ'ত, তা আমরা কেন, অনেকেই জানেন না, কিন্তু যুদ্ধে তাঁর বিক্রমের উল্লেখ না করাই ভালো! যদি অনেক অক্ষৌহিণী সেনা, অর্জ্জুন, ভীম, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতির বিনা সহায়তায় যুদ্ধ জয় ঘটতো, তবে নৈতিক বলে যুদ্ধ-জয়ের কথা স্বীকার করা যেত। কিন্তু আমরা সকলেই জানি, নৈতিক বলের বক্তৃতায় রাজা-উজীর মারা চলে, সত্যকার যুদ্ধে অস্ত্র বলের বিশেষ প্রয়োজন আছে। যুদ্ধে বিরাগ বা নিরাসক্ত হওয়া সম্ভব অর্জ্জুনের মত বীরের, যুধিষ্ঠিরের নয়—যিনি আজীবন পরের বাহুবলকে আশ্রয় করে ছিলেন—এমন কি বিবাহে পর্যন্তও এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটতে দেননি।

যুধিষ্ঠিরের চরিত্রের আরও দু'একটা দিক

আছে যেটাকে আমরা কোন নীতিবান্ লোকের আদর্শ ব'লে মানতে পারি না। আমি রাজা যুধিষ্ঠিরের কথা বলছি—ভ্রাতৃবৎসল স্বামী যুধিষ্ঠিরের কথা বলছি। ইতিহাসে আমরা এমনধারা ঘটনার কথা খুব কমই পড়েছি, যেখানে রাজা পাশা খেলার পণ রেখেছেন তাঁর রাজ্য এবং এমন দেশও খুব কম দেখেছি যেখানে প্রজারা সে-রাজাকে আদর্শ বলে' পূজা করেছে। আমাদের দেশে রাজ্য ছিল রাজার হাতে ন্যস্ত ধন, সে ধনে রাজার অধিকার ছিল অনেক, কিন্তু পণে বসিয়ে দেবার নয়। তা ছাড়া সুশাসনের জন্যে তিনি রক্ষণ-বেতন পেতেন, কাজেই তিনি ছিলেন রাজ্যের কর্ণধার কর্ম্মচারী—তার পুরো মালিক নন্। হয় যুধিষ্ঠির এ কথা ভুলেছিলেন, কিম্বা তখন হয়ত এ নিয়ম ছিল না। কিন্তু তা হলেও যুধিষ্ঠির রেহাই পান না। কারণ সে রাজ্য তাঁর একার সম্পত্তি নয়; পাঁচ ভাইয়ের। তাদের অনুমতি নেবার অপেক্ষা তিনি রাখেন নি—শুধু তাই নয়—অনুমতি নেবার আগেই সস্ত্রীক ভায়েদের পণে বসিয়ে দিয়েছিলেন! এবং তাঁর ভায়েরা আমাদের দেশের পাঠশালার পড়া সুবোধ সুশান্তের মত পিঞ্জরের মধ্যে দিব্য আসন নিয়ে ভ্রাতৃস্নেহের অক্ষয় ও অনিন্দ্য মহিমায় যথেষ্ট আত্ম-প্রসাদ অনুভব করলেন! স্ত্রীর কথা বলা নিষ্প্রয়োজন বোধ করছি—বলা বাহুল্য, এ স্ত্রীও তিনি স্বয়ম্বর সভার পরীক্ষায় জয়লাভ ক'রে অর্জ্জন করেন নি। নীতি-বিশারদ কিন্তু স্বপক্ষে দু-একটা কথা বলতেও পারেন—তিনি বলতে পারেন যে তাঁর ভাববার সময় নিতান্ত অল্প, অথবা আত্মসম্মান কুলগৌরব যখন অপমানের সীমায় এসে দাঁড়িয়েছে, তখন ঐ কম সময়ের মধ্যেই ভেবে দেখলুম যে, রাজ্য-ভাই সব গিয়েছে, বাকি আছে পাঁচভায়ের একমাত্র স্ত্রী, তাকে পণে বসিয়ে দিলুম—আদর্শ স্বামী নয় কি!

পদে পদে ভ্রান্তমতিত্বের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে আর কথা বাড়াতে চাই না—যুধিষ্ঠির হয়ত তাঁর সমাজ ও কালানুযায়ী কাজ করে ছিলেন, দূষ্য কিছুই করেননি; কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে এমনধারা ভ্রান্তমতি দুর্ব্বল-চিত্ত ঝুটো মানুষকে নিয়ে আমাদের এ কি বিড়ম্বনা! নেই-মামার চেয়ে কাণা মামাই যাদের একমাত্র সম্বল, মানুষের মত মানুষকে পূজা করবার যাদের শক্তির অভাব, এই সব আদর্শকে নিয়ে তারা আত্মপ্রসাদ লাভ করুক; কিন্তু মানুষ যারা,—তেজের উপর সত্যের উপর পবিত্র জীবনের 'পরে যাদের অগাধ ও বলিষ্ঠ শ্রদ্ধা, অন্তরে যাদের সার্থক জীবনের অসীম উৎসাহ, তারা কেমন ক'রে এ মিথ্যাকে এ ব্যর্থতাকে সত্য ব'লে আদর্শ ব'লে মেনে নেবে? যদি প্রাচীন কালে মনের মত আদর্শ না মেলে ক্ষতি কি! নতুন দেবতার প্রতিষ্ঠা কর। ঝুটা নিয়ে আর ভুলে থেকোনা।

প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়।

গান ও প্রাণ

সবারে শুধাই ডেকে, কি দিবি রে দান ?
বলে তারা, দেব গান।…
ভ্রমর গুঞ্জরি' যায়, শিরোপরে পাখী যায় গেয়ে
বেশী কি দিবি রে এর চেয়ে ?
শুনে তারা খাড়িয়ায় পথে।
অশ্বের ঝঞ্ঝনা ওঠে, চক্রের ঘর্ঘর জয়রথে,
গগনের চন্দ্রাতপ-তলে
গ্রহ রবি শশী পলে পলে
পায় পায় চলে তাল দিয়া,
গমকে গমকে কাঁপে মুগ্ধ ত্রাসে ধরিত্রীর হিয়া।

দ্বারে দ্বারে হাত পাতি, বলি, তোরা কে কি দিবি দান ?
বলে তারা, দেব প্রাণ।…
মরণ আসিয়া বলে পারহাসে চোখ ঠেরে হেসে,
—সে ত ঢের দেওয়া হলো যুগ যুগ ধরে দেশে দেশে;
কিছু দাও নিজে পেতে, কিছু নিই কেড়ে,
এমনি করিয়া মোর দিনে দিনে পুঁজি যায় বেড়ে!
শুনে তারা—
তেড়ে গিয়ে মরণেরে করে দেশ-ছাড়া।
হাঁপ ছেড়ে প্রাণ বলে, প্রাণ এল ধড়ে,
কি কাজে লাগিতে হবে, বল ত্বরা ক'রে।

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী।

অবতার

১

যে-সময়ে লাবিন্স্কি-প্রাসাদের ভৃত্যেরা প্রকৃত কৌণ্ট লাবিন্স্কিকে, গাড়িতে উঠাইয়া দেয় এবং কৌণ্ট নিজের ভূস্বর্গ হইতে তাড়িত হইয়া অক্টেভের বাসা-বাড়ীতে আসিয়া উপনীত হন—সেই সময় রূপান্তরিত অক্টেভ ধবধবে-সাদা একটী ক্ষুদ্র বৈঠকখানা ঘরে গিয়া—কখন্ কৌন্টেসের ফুরসৎ হয়, তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।

চিন্ময়ীর আশ্রয়স্থানটা ফুলে ভরা; সেই

চিমনীর সাদা মার্ব্বেল পাথরে ঠেস্ দিয়া, কৌণ্ট-দেহধারী অক্টেভ আপনার প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইল। আয়নাটা সোনালি পায়া-ওয়ালা দেয়ালে-মারা একটা ব্র্যাকেটের উপর মানানসই রকমে বসানো। যদিও অক্টেভ দেহ-পরিবর্ত্তনের ভিতরকার গুপ্ত কথাটা জানিত, তথাপি, তাহার নিজের আকৃতি হইতে এই প্রতিবিম্ব এত তফাৎ যে, সে সহসা যেন বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না, আয়নার এই প্রতিবিম্ব তাহারই মুখের প্রতিবিম্ব কি না। অক্টেভ এই অপরিচিত ছায়ামূর্ত্তিটা একদৃষ্টে দেখিতে লাগিল, উহা হইতে চোখ ফিরাইতে পারিতেছিল না।

সে দেখিল উহা আর একজনের ছায়া-মূর্ত্তি। ইচ্ছা-নিরপেক্ষভাবে সে একবার খোঁজ করিয়া দেখিল, কৌণ্ট ওলাফ চিমনির কাছে তাহার পাশে দাঁড়াইয়া আছেন কি না, এবং তাঁহারই ছায়া পড়িয়াছে কি না। কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইল না। দেখিল—সে একলাই আছে। নিশ্চয়ই এই সমস্ত ডাক্তার শেরবোনোর কাণ্ড।

কয়েক মিনিট পরে, অক্টেভ-দেহ লাবিন্স্কি,—প্রাস্কোভ্যার স্বামীর শরীরের মধ্যে তার আত্মা যে প্রবেশ করিয়াছে এই চিন্তা হইতে বিরত হইয়া তাহার চিন্তার গতিকে বর্ত্তমান অবস্থার কতকটা অনুযায়ী করিয়া তুলিল। সমস্ত সম্ভাবনার বহির্ভূত এই অবিশ্বাস্ত ঘটনা, যাহা স্বপ্নেও কখন ভাবা যায় না, তাহা কি না ঘটিল! এখনই সেই বহুদিনের আরাধ্য দেবীর সম্মুখে আমি উপস্থিত হইব, তিনি আর আমাকে প্রত্যাখ্যান করিবেন না! সেই অকলঙ্ক অনিন্দিতা রূপসীর সংসর্গে আমার চির আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবে!

সেই চূড়ান্ত মুহূর্ত যতই কাছাকাছি হইতে লাগিল, ততই তাহার মনের উদ্বেগ বাড়িতে লাগিল। প্রকৃত প্রেমের যে সঙ্কোচ ও ভীরুতা, তাই আসিয়া আবার দেখা দিল—যেন ঐ প্রেম এখনো অক্টেভের অনাদৃত, ক্ষীণ দেহের মধ্যেই অবস্থিতি করিতেছে।

বাণীর পরিচারিকার আগমনে, এই সমস্ত চিন্তা ও উদ্বেগ অপসারিত হইল। যখন পরিচারিকা নিকটে আসিল, তখন কৌণ্ট-দেহ অক্টেভের বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করিতে লাগিল, তাহার দেহের সমস্ত রক্ত যেন হৃৎপিণ্ডে আসিয়া জমা হইল পরিচারিকা বলিল:—

"বা ঠাকুরাণী, আপনার অভ্যর্থনার জন্ম প্রস্তুত আছেন"।

কৌণ্ট-দেহ অক্টেভ পরিচারিকার পিছনে পিছনে চলিল, কেননা সে এই প্রাসাদের অন্ধিসন্ধি কিছুই জানিত না। পদচালনায় ইতস্তত-ভাব দেখিয়া পাছে তার অজ্ঞতা প্রকাশ হইয়া পড়ে এইজন্ম সে পরিচারিকার অনুসরণ করাই শ্রেয় বিবেচনা করিল। পরিচারিকা তাহাকে একটা ঘরে লইয়া গেল। ঘরটা বেশ একটু বড় রকমের। এটি রাণীর প্রসাধন-কক্ষ। প্রসাধন-টেবিল সমস্ত সুকুমার বিলাস-সামগ্রীতে বিভূষিত। উৎকৃষ্ট খোদাই কাজ-করা কতকগুলা আলমারী; আলমারীগুলা সাটিন, মখমল, মলমল, জরি প্রভৃতি নানাপ্রকার সৌখীন পরিচ্ছদে ঠাসা। ঘরের দেয়াল সবুজ সাটিন

দিয়া মোড়া। মেজের তক্তা বিচিত্র মোলায়েম রঙে রঞ্জিত এক পুরু কোমল গালিচায় আচ্ছাদিত। প্রসাধন টেবিলে সুগন্ধ-নির্য্যাসের স্ফটিক শিশিগুলা বাতির আলোয় ঝিকমিক্ করিতেছে।

ঘরের মধ্যস্থলে একটা সবুজ মখমল-পাদানের উপর অদ্ভুত গঠনের ইস্পাতের কাজ করা একটা বৃহৎ ভূষণ-পেটিকা—তাহাতে বিবিধ রত্নালঙ্কার সজ্জিত রহিয়াছে। কিন্তু এই সব অলঙ্কার পেটিকাতেই প্রায় বন্ধ থাকিত,—কৌনটেস্ কাচিৎ কখন তাহা ব্যবহার করিতেন। নারী-সুলভ আশাঙ্কিত সুরুচি তাঁকে বলিয়া দেয়—বহু অলঙ্কারে রূপসীর প্রয়োজন হয় না। রূপের ছটার কাছে ঐশ্বর্য্যের ছটা অভিভূত হয়।

জানালা হইতে পর্দা পাকে পাকে নিচে লুটাইয়া পড়িয়াছে—সেই জানলার কাছে, একটা বড় আয়না ও প্রসাধন-টেবিলের দুই ডেলে বেঠকী ঝাড়ের দুই বাতির আলোয় উদ্ভাসিত। তাহারই সম্মুখে কৌনটেস্ প্রাণস্ফূর্ত্তি-লাবণ্যময়ী রূপলাবণ্যের ছটা বিস্তার করিয়া উপবিষ্টা এক লঘুস্বচ্ছ বহিরাচ্ছাদনের নীচে কার্পাসের একটা শিথিল বন্ধনহীন নৈশ পরিচ্ছদ। তুষার শুভ্র সুশোভন সুডৌল মরাল কণ্ঠ বহিরাচ্ছাদনের ভিতর হইতে দেখা যাইতেছে। ক্লড দাসীতে মিলিয়া তাহার প্রচুর কেশগুচ্ছ ভাগ করিতেছিল, মসৃণ করিতেছিল, কুঞ্চিত করিতেছিল, কানের ঘর্ষণ না লাগে—এই ভাবে সাবধানে কেশ-রাশি কুঞ্চিত-আকারে গুছাইয়া রাখিতেছিল।

যখন এই কেশ-বিন্যাসের কাজ চলিতেছিল, রাণী জরির কাজ করা সাদা-মখমলের একটা ছোট চটিজুতার অগ্রভাগ মৃদু মৃদু নাচাইতেছিলেন। এখন কখন বহিরাবরণ-বস্ত্রের ভাঁজ একটু সরিয়া গিয়া, তুষার-শুভ্র নিটোল বাহু বাহির হইতেছিল, এবং যেমন কেশগুচ্ছ স্থানচ্যুত হইলে অতি শোভন ভঙ্গীতে হাত দিয়া তাহা সরাইয়া দিতেছিলেন।

তাঁহার সমস্ত শরীরে যেরূপ একটা শোভন এলানো ভাবভঙ্গী ছিল তাহা কেবল প্রাচীন গ্রীক্ পাষাণমূর্ত্তিতেই লক্ষিত হয়। এরূপ অর্দ্ধ শয়নের করুণ সৌন্দর্য্য, সুন্দর গঠন আর কুত্রাপি দেখা যায় না। রবেজের বাগান-বাড়ীতে অক্টেভ কোনটেসকে যখন দেখিয়াছিল তাহা অপেক্ষা এখন কৌনটেস্ আরও চিত্তমোহিনী হইয়াছেন। যদি অক্টেভ পূর্ব্বেই তাঁর রূপে মুগ্ধ না হইতেন, তাহা হইলে তাহাকে এখন দেখিলে নিশ্চয়ই মুগ্ধ হইতেন। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে আরও কিছু যোগ করিয়া অসীমের বৃদ্ধি করা যায় না।

কোন একটা ভীষণ দৃশ্য দেখিলে যেরূপ হয়, কৌনটেসকে এইরূপ মূর্ত্তিতে দেখিয়া, কৌন্টদেহধারী অক্টেভের হাঁটুতে হাঁটুতে ঠেকাঠেকি হইতে লাগিল,—সে একেবারে যেন আত্মহারা হইয়া পড়িল; মুখ শুকাইয়া গেল। মনে হইতে লাগিল, কে যেন হাত দিয়া তার গলা টিপিয়া ধরিয়াছে। লোহিতবর্ণ অগ্নিশিখা যেন তাহার চক্ষের চারিধারে তরঙ্গিত হইতে লাগিল। এবং রূপসী তাহাকে মুগ্ধ করিয়াছে।

এই আত্মহারা ভাব, এই মূঢ়তার ভাব কোন প্রত্যাখ্যাত প্রণয়ীর পক্ষেই সাজে, কিন্তু কোন স্বামীর পক্ষে নিতান্তই হাস্যজনক—এই মনে করিয়া কৌন্টদেহ অক্টেভ সাহস

করিয়া দৃঢ়পদক্ষেপে কৌন্‌টেশের অভিমুখে অগ্রসর হইল। দাসীরা তখন তাঁহার বেণী রচনা করিতেছিল; তাই কৌন্‌টেশ মুখ না ফিরিয়াই বলিলেন, "আঃ! তুমি ওলাফ! কি দেরী করেই এসেছ আজ!" তার পর, বহিরাবরণ-বস্ত্রের ভাঁজ হইতে তাঁর সুন্দর একটি হাত বাহির করিয়া, অক্টেভের দিকে বাড়াইয়া দিলেন।

কৌণ্টদেহ অক্টেভ কুসুম-কোমল এই হাতখানি লইয়া জলন্ত আগ্রহের সহিত দীর্ঘ টানে চুম্বন করিল—যেন তাহার সমস্ত অন্তঃকরণ তাহার ওষ্ঠাধরে আসিয়া তখন কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল।

আমরা জানিনা, কি-এক সূক্ষ্ম বোধশক্তি হইতে, কি এক স্বর্গীয় লজ্জাশীলতা হইতে হৃদয়ের কি এক যুক্তিহীন যুক্তি হইতে, কৌন্‌টেস যেন পূর্ব্ব হইতেই সমস্ত ব্যাপার জানিতে পারিয়াছিলেন; লোহিতবর্ণ উচ্চ গিরিশিখরস্থ তুষাররাশি উষার প্রথম চুম্বনে যেরূপ হয়, সেইরূপ তাঁহার মুখ, তাঁহার কণ্ঠ, তাঁহার বাহু সহসা রক্তিম রাগে রঞ্জিত হইল। অর্দ্ধ অভিমানের ভাবে, অর্দ্ধলজ্জার ভাবে, কাঁপিতে কাঁপিতে তাঁহার হাতখানি ধীরে ধীরে সরাইয়া লইলেন। অক্টেভের ওষ্ঠাধর স্পর্শে তাঁহার মনে হইল, তাঁহার হাতের উপর কে যেন অগ্নি-তপ্ত লোহার ছাঁকা দিল। তথাপি তিনি চিত্তকে সংযত করিয়া, তাঁর সেই শিশুবৎ মধুর হাসিটি মুখে আনিলেন।

"ওলাফ, তুমি কোন উত্তর দিচ্চ না কেন? আমি যে ছয় ঘণ্টার উপরেও তোমাকে আজ দেখ্‌তে পাইনি!" পরে ভৎর্সনা স্বরে বলিলেন—"তুমি আমাকে এখন বড়ই অবহেলা কর, পূর্ব্বে ত তুমি অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত আমাকে এই রকম করে একলা ফেলে থাকৃতে পারতে না। তুমি কি আমাকেই শুধু ভাব ছিলে?"

কৌণ্টদেহ অক্টেভ উত্তর করিল:—

—"তোমাকেই। তোমা ভিন্ন আর কাউকে না।"

—"না, না, সব সময় আমাকে ভাবনি; যে সময়ে তুমি আমার কথা ভাব, আমি দূরে থাকৃলেও তা জান্‌তে পারি। এই মনে কর, আজ রাত্রে আমি একলা ছিলাম, সময় কাটাবার জন্য পিয়ানোয় বসে একটা সুর বাজাচ্ছিলাম। যখন সুরগুলো খুব জমে উঠেছিল, তোমার আত্মা কয়েক মিনিট ধরে' আমার চারিদিকে একবার ঘুর-পাক দিয়েছিল; তারপর কোথায় যে উড়ে গেল, কিছুই জানতে পারলাম না—তার পর সে আর ফিরে আসে নি। মিথ্যে কথা বোলো না। আমি যা তোমাকে বলচি—সে-বিষয়ে আমি খুব নিশ্চিন্ত।"

বস্তুত প্রাস্কোভির ভুল হয় নাই; এই সেই মুহূর্ত্ত, যে মুহূর্ত্তে ডাক্তার শেরবোনোর বাড়ীতে, কৌণ্ট ওলাফ মন্ত্রপূত জলপাত্রের উপর নত হয়ে একাগ্রচিত্তে তাঁহার আরাধ্য দেবীর মূর্ত্তিকে আহ্বান করেছিলেন—তার পরেই তিনি সম্মোহন-নিদ্রার অতল সমুদ্রের মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া পড়েন। তখন তাঁর জ্ঞান, তাঁর ভাব, তাঁর ইচ্ছা—সব বিলুপ্ত হইয়া যায়।

দাসীরা কৌন্‌টেশের নৈশ প্রসাধন সমাপন করিয়া চলিয়া গিয়াছিল। কৌণ্টদেহ অক্টেভ সেইখানে বরাবর সমান দাঁড়াইয়া থাকিয়া কৌন্‌টেশ প্রাস্কোভির উপর জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল। এই লালসা-দীপ্ত দৃষ্টি

সহ্য করিতে না পারিয়া কৌণ্টেস তাঁর সর্বাঙ্গ আলখাল্লায় বেশ করিয়া আচ্ছাদন করিলেন, কেবল মাথাটা খোলা রহিল। ব্রহ্মলোগম নামে সেই সন্ন্যাসীর মন্ত্র-বলে ডাক্তার শের-বোনো দুই আত্মাকে স্থানচ্যুত করিয়াছেন—একথা শুধু প্রাক্সোভি কেন—কোনও মানুষের অনুমান করা অসম্ভব। কিন্তু প্রাস্কোভি, কৌণ্টদেহ অক্টেভের চোখে, ওলাফের সচরাচর চোখের ভাব, সেই দেবোপম বিশুদ্ধ প্রশান্ত ধ্রুব নিত্য প্রেমের ভাব দেখিতে পাইলেন না। কৌণ্টদেহ অক্টেভের ঐ দৃষ্টিতে একটা পার্থিব লালসার আগুন জ্বলিতেছিল। শুধু ঐ দৃষ্টিতে কৌণ্টেস ব্যথিত ও লজ্জিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ঠিক কি ঘটিয়াছে বুঝিতে না পারিলেও তাঁর মনে হইল একটা কিছু নিশ্চয়ই ঘটিয়াছে। নানাপ্রকার অনুমান করিতে লাগিলেন; তবে আমি কি এখন ওলাফের চোখে শুধু একটা সুন্দর রমণী, একজন নীচ বারাঙ্গণা মাত্র—যার রূপের লালসায় তিনি উন্মত্ত হয়েছেন। আমাদের আত্মায় আত্মায় কেমন একটি সুন্দর মিল ছিল—দুই হৃদয়-বীণা কেমন মধুর ভাবে এক সুরে বাজত, না জানি কিসে এই মিলটি, এই ঐক্যতানটি ভেঙ্গে গেল। কিন্তু ওলাফ কি আর বাউকে ভাল বাসত? প্যারিসের পঙ্কিল মলিনতা ঐ অকলঙ্ক হৃদয়কে কি কখন কলঙ্কিত করেছিল?" এই প্রশ্নগুলি তাঁর মনের মধ্য দিয়া দ্রুতভাবে চলিয়া গেল, কিন্তু কোন সন্তোষজনক উত্তর তিনি দিতে পারিলেন না। ভাবিলেন হয়ত আমি উন্মাদগ্রস্ত হয়েছি। কিন্তু তবু ভিতরে ভিতরে যেন অনুভব করিতে লাগিলেন যে, তাঁর বুদ্ধি লোপ পায় নাই। কি-একটা অজ্ঞাত বিপদ তাঁর সম্মুখে উপস্থিত—এইরূপ ভাবিয়া তাঁর অত্যন্ত ভয় হইল। মনে করিলেন আত্মার এই "দ্বিতীয় দৃষ্টির" প্রভাবে যাহা অনুমান হইতেছে তাহা অগ্রাহ্য করা ঠিক নহে।

তিনি বিচলিত ও আকুল-ব্যাকুল হইয়া উঠিয়া পড়িলেন এবং উঠিয়া তাঁহার শয়ন-কক্ষের দিকে অগ্রসর হইলেন। অলীক কৌণ্টও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চলিল। কৌণ্টেস্ দরজার কাছে আসিয়া আবার ফিরিলেন। মুহূর্তের জন্য থামিলেন। তার পর প্রস্তর মূর্তির মত সাদা ও শীতলকায় কৌণ্টেস্, ঐ যুবকের প্রতি ভীতি বিস্ফারিত কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং শুধু করিয়া দরজাটা বন্ধ করিয়া, খিল লাগাইয়া দিলেন।

"ও যে অক্টেভের দৃষ্টি।" এই কথা বলিয়া অর্দ্ধ-মূর্চ্ছিত হইয়া একটা কৌচের উপর শুইয়া পড়িলেন।" চৈতন্য ফিরিয়া আসিলে মনে-মনে বলিলেন:—আচ্ছা এ কেমন করে' হ'ল, সেই দৃষ্টি—যে দৃষ্টির ভাবটা আমি কখনও ভুলবনা—সেই দৃষ্টি ওলাফের চোখে কেন আজ রাত্রে দেখতে পেলাম?" সেই বিষণ্ণ হতাশ হৃদয়ের

আমার স্বামীর চোখের উপর জ্বলে উঠল কি করে'? অক্টেভের কি মৃত্যু হয়েছে? আমার কাছে চিরবিদায় নেবার জন্য তার আত্মা কি মুহূর্তের জন্য আমার সম্মুখে দপ্ করে একবার জ্বলে উঠল। ওলাফ ওলাফ! যদি আমি ভুল করে থাকি, যদি পাগলের মত মিথ্যা ভয়ে আকুল হয়ে থাকি, তবে আমাকে তুমি ক্ষমা কর। কিন্তু দেখ, যদি

আমি আর রাত্রে তোমাকে আলিঙ্গন করলাম, তাহলে আমার মনে হ'ত আমি আর একজনকে আলিঙ্গন করচি।"

খিলটা ভাল করিয়া লাগানো হইয়াছে কিনা,—দৃঢ়-নিশ্চয় হইয়া, মাথার উপর যে লণ্ঠন জ্বলিতেছিল, সেই লণ্ঠনটা জ্বালাইলা, কৌন্টেশ ভীত শিশুর মত গুঁড়ি-শুঁড়ি মারিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িলেন। কি এক অনির্দ্দেশ্য বেদনা তার বুকে চাপিয়া রহিল। সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হইল না। ভোরের দিকে ঘুমাইয়া পড়িলেন। কত অসংলগ্ন অদ্ভুত স্বপ্ন আসিয়া তার গভীর নিদ্রার ব্যাঘাত করিল। আগুনের মত জ্বলন্ত সেই অক্টেভের চোখ—কুয়াসার ভিতর হইতে—তাহার উপর একদৃষ্টে চাহিয়া আছে এবং তাহার উপর আগুনের হল্কা নিক্ষেপ করিতেছে। আর সেই সময় তাহার খাটের পাশে একটা কালোমূর্ত্তি—মুখ বাল-রেখায় আচ্ছন্ন,—উবু হইয়া বসিয়া আছে, অপরিচিত ভাষায় বিড়বিড় করিয়া কি বলিতেছে, এই অদ্ভুত স্বপ্নের মধ্যে ওলাফও আছেন—কিন্তু তাঁর নিজের আকৃতিতে নয়—অন্য আকৃতি ধরিয়া।

অক্টেভ যখন দেখিল, তার সম্মুখেই দরজা বন্ধ হইল, ভিতরকার অর্গলের ক্যাঁচ-কোঁচ শব্দ শুনা গেল, তখন সে কিরূপ হতাশ হইয়া পড়িল, তাহা আমরা আর বর্ণনা করিব না। তাহার সেই চূড়ান্ত মুহূর্ত্তের চরম আশা অন্তর্হিত হইল। মনে মনে বলিল :—"আমি কি করিলাম! এক নারীর হৃদয় জয় করিবার জন্য এক যাদুকরের হাতে আত্ম-সমর্পণ করে আমার ইহকাল পরকাল সমস্তই নষ্ট করলাম—ভারতবর্ষের ডাইনী মন্ত্রে সেই নারী অসহায় ভাবে আমার কাছে ধরা দিয়েছিল কিন্তু আবার পালিয়ে গেল। আমি পূর্ব্বে প্রেমিক হয়ে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলাম, এখন আবার স্বামী হয়ে প্রত্যাখ্যাত হলাম। পাতিব্রত্যের অজেয় সতীত্ব, যাদুকরের সমস্ত নারকী কুমন্ত্রণা-জাল ছিন্ন করে দিয়েছে। শয়ন-কক্ষের দ্বারদেশে এক দেবীমূর্ত্তি আবির্ভূত হয়ে যেন কলুষিত-চিত্ত কোন দুরাত্মাকে দূর করে দিলেন।

অক্টেভ সমস্ত রাত্রি এই অদ্ভুত অবস্থায় আর থাকিতে পারিল না। সে কৌন্টের মহলটা খুঁজিতে লাগিল। সারি সারি অনেক ঘর পার হইয়া অবশেষে দেখিতে পাইল,—কাঠের খুঁটি-বিশিষ্ট একটা উচ্চ পালঙ্ক—তাহাতে সংলগ্ন ঝুটিদার চিত্রবিচিত্র পর্দা। কায়িক শ্রমে ও মনের আবেগে পরিশ্রান্ত হওয়ায় কৌন্ট-দেহ অক্টেভ সেই পালঙ্কের উপর শুইয়া পড়িল,—শেষবেলার উপর অভিশাপ বর্ষণ করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িল। সৌভাগ্যক্রমে, সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনের অবস্থা একটু ভাল হইয়া উঠিল। সে প্রতিজ্ঞা করিল,—"এখন হতে আমি একটু সংযত হয়ে চলব; ওরূপ জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তার মুখের পানে চেয়ে থাকব না; স্বামীর ধরন-ধারণ অবলম্বন করব।" কৌন্টের পরিচারকের সাহায্যে অক্টেভ একটু গম্ভীর ধরনের সাজসজ্জা করিয়া, ধীর-পাদবিক্ষেপে খাবার ঘরে প্রবেশ করিল। সেইখানে কৌন্টেশ প্রাতর্ভোজনে তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

চয়ন

ষ্টিভেনসনের প্রিয়তমা



ষ্টিভেনসন

When my wife is far from me,
The undersigned fails all at
sea. R. L. S.

বিখ্যাত ঔপন্যাসিক রবার্ট লুইস ষ্টিভেনসন নিজের স্ত্রী-সম্বন্ধে এইভাবে নিজের মনের প্রেমকে ব্যক্ত ক'রে গেছেন। তিনি তাঁর এক বন্ধুকে লিখেছিলেন, "আজ যে আমি এতটা উন্নতিলাভ করতে পেরেছি, তার একমাত্র কারণ আমার সহধর্মিনী। যখন আমার ভিতরে ঠক্‌ঠকে হাড় আর খক্‌খকে কাশি ছাড়া আর-কিছু দেখবার-শোনবার বিষয় ছিল না, যখন আমাকে দেখলে বাসরের বরের বদলে খাটের মড়া ব'লেই মনে হোতো, এই করুণাময়ী মহিলা সেই দুর্দ্দিনেই আমার কণ্ঠে বর-মাল্য অর্পণ করেছিলেন।"

বাস্তবিক, ফ্যানি অসবোর্ণের সঙ্গে বিবাহের সময়ে ষ্টিভেনসনের অর্থভাগ্য ও স্বাস্থ্যভাগ্য দুইই শোচনীয় হয়ে উঠেছিল। বিবাহের আগে ফ্যানি অসবোর্ণেরও সুখী হবার কোন কারণ ছিল না। সতেরো বৎসর বয়সে প্রথমে যে পুরুষের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়েছিল—সে লোকটি ছিল একটি একের নম্বরের দুরাচার। অসবোর্ণ স্বামী ত্যাগ ক'রে নিজের তিনটি সন্তান নিয়ে য়ুরোপে পালিয়ে এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে ষ্টিভেনসনের আলাপ হয় ফ্রান্সে এবং তিনি প্রথম দৃষ্টিতেই অসবোর্ণের প্রেমে পড়ে যান।

ষ্টিভেনসনের বয়স তখন ছাব্বিশ আর অসবোর্ণের ছাত্রিশ। ষ্টিভেনসনের শারীরিক দুর্ব্বলতা ও যত্ন করবার লোকের অভাব দেখে, অসবোর্ণের মাতৃহৃদয়ে মমতার ক্ষুধা জেগে উঠল। সেই মমতা ক্রমে গভীর প্রেমের আকারে দেখা দিলে। ষ্টিভেনসন তখন ভীষণ যক্ষ্মাকাশে আক্রান্ত এবং বড়-জোর মাসকতকের বেশী তাঁর বাঁচবার আশা ছিল না। কিন্তু অসবোর্ণ তবু তাঁকে বিবাহ করতে ইতস্তত করলেন না এবং বিবাহের পরেও একমাত্র তাঁরই সেবা-যত্নে ষ্টিভেনসনের নির্ব্বাণপ্রায় জীবন-দীপটির শিখা চোদ্দবৎসর কাল উজ্জ্বল হয়েছিল।

ফ্যানি অসবোর্ণের বাপ-মা ছিলেন ওলন্দাজ। আমেরিকার ইণ্ডিয়ানোপোলিস নগরে তাঁর জন্ম হয়।

বিবাহের পর যে চোদ্দবৎসর ষ্টিভেনসন বেঁচে ছিলেন, সেই সময়ের মধ্যেই সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি অমর কীর্ত্তি অর্জ্জন করেন। তাঁর ভালো ভালো বইগুলি এই সময়েই লেখা।

স্বাস্থ্যলাভের জন্যে ষ্টিভেনসন তাঁর সহধর্ম্মিণীকে নিয়ে প্রায় সারা পৃথিবী পর্য্যটন ক'রে বেড়ান। তারপর তিনি প্রশান্ত মহাসাগরের স্যামোয়া দ্বীপে গিয়ে স্থায়ী হন। এবং এইখানেই, আজ থেকে ছাব্বিশ বৎসর আগে তাঁর মৃত্যু হয়।

দক্ষিণ-সাগরের দ্বীপে দ্বীপে তিন বৎসরকাল ভ্রমণের সময়ে, তাঁর প্রেমময়ী স্ত্রী যে কত কষ্ট সহিয়াও স্বামীর প্রত্যেক অভাবটি পূরণ করেছিলেন, সে কাহিনী শুনলে সকলকেই অভিভূত হ'তে হবে। ধারাবাহিক ভ্রমণের সমস্ত জিনিষ গুছানো, নির্জ্জন দ্বীপের মধ্যে খাবার যোগাড় করা, জাহাজের খোঁজ নেওয়া, অনেক দূর থেকে রুগ্ন স্বামীর দেহ বহনের জন্যে নিজেই গাড়ী-ঘোড়া ডেকে আনা, জাহাজের আগুন থেকে স্বামীর পাণ্ডুলিপির প্যাট্‌রা বাঁচানো,—এম্‌নি কত ব্যাপারে অসবোর্ণ ছাড়া অসহায় ষ্টিভেনসনের আর দ্বিতীয় গতি ছিল না।

এই নিঃস্বার্থ প্রেমের উপরে শেষটা হঠাৎ একদিন যবনিকা পড়ে গেল। তখনো সন্ধ্যার আহার সুরু হয়নি। বাংলোর বারান্দায় বসে ষ্টিভেনসন খুব খুসি মনে স্ত্রীর সঙ্গে গল্পগুজব করছিলেন। আচম্বিতে আপনার মাথায় তিনি দুই হাত রেখে চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন, "এ কি হোলো ?" তারপর তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করলেন, "আমার চেহারা কি অদ্ভুত দ্যাখাচ্ছে ?"—ব'লেই তিনি স্ত্রীর পাশে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন। আজ কত বৎসর ধ'রে শান্তি-সুখ-আরামের জন্যে এম্‌নি ভাবেই তিনি স্ত্রীর স্নেহ-ভরা কোলের ভিতরে আশ্রয় চেয়ে এসেছেন।—দেখতে দেখতে তাঁর মুখের উপরে মরণের অন্ধকার ঘনিয়ে এল এবং স্ত্রীর আলিঙ্গনের ভিতরেই তাঁর বক্ষ ভেদ ক'রে অন্তিম নিঃশ্বাস বেরিয়ে গেল।

নরওয়ের ভাস্কর

চার পাঁচ বছর আগে "ভারতীর" চরনে নরওয়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভাস্কর গুস্তাভ ভিগেলাণ্ডএর সামান্য পরিচয় দেওয়া হয়েছিল। গেল কয় বছরের মধ্যে তাঁর হাতের কাজ নিয়ে আরো অনেক আলোচনা হয়েছে। পাথরের উপরে এমন ক'রে কবিতা লিখতে,—খালি নরওয়ে কেন,—একমাত্র রোদাঁ ছাড়া এ-যুগের আর কোন ভাস্কর পারেন নি।

তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনী এই। চুয়াল্লিশ বৎসর আগে, পশ্চিম নরওয়েতে তাঁর জন্ম। বিদ্যালয়ের লেখাপড়া সাঙ্গ ক'রে তিনি প্রথমে আইন শিখতে যান। কিন্তু চব্বিশ বৎসর



সিণ্ডিং

বয়সের সময়ে আইন ছেড়ে তিনি ললিত কলার আশ্রয়ে আত্মসমর্পন করেন, জার্মানীর ব্যালিন সহরে গিয়ে ভাস্কর ভোল্‌ফের কাছে সিণ্ডিং শিল্পশিক্ষায় প্রবৃত্ত হন। ছয় সাত বছর সেখানে থেকে, ভাস্কর্যে হাত অনেকটা দুরস্ত ক'রে নিয়ে, তিনি আধুনিক ললিত কলার কেন্দ্র প্যারী সহরে আগমন করেন।

প্যারীতে থাক্‌তে থাক্‌তে ছাত্র-অবস্থাতেই সিণ্ডিং তাঁর অদ্বিতীয় মূর্ত্তি Valkyrie গঠন করেন।

একবার একটি পাহাড়ে উঠবার সময়ে আচম্বিতে সিণ্ডিংয়ের চারপাশে গভীর গর্জ্জনে ঝটিকা জেগে উঠেছিল। তাঁকে বার বার ধাক্কা মেরে তীরের মতন ঝোড়ো হাওয়া বয়ে



বন্দিনী মা



রণরঙ্গিণী

বেজে লাগ্‌ল—সঙ্গে সঙ্গে নিবিড় ধারায় বৃষ্টি নেমে এল। সেই ঘন ঘন বিদ্যুতের চমকানি ও পাহাড়ের গুহায় গুহায় প্রতিধ্বনিত বাজের ঝনঝনানির মাঝে সিণ্ডিংয়ের ভাবুক প্রাণের ভিতরে ঝড়ের যে রুদ্র মূর্ত্তি ফুটে উঠেছিল, এই "রণরঙ্গিণী" বা Valkyrie তে তারই স্থায়ী প্রকাশ আছে।

য়ুরোপের কলা-রাজ্যে সিণ্ডিংএর স্থান কোথায়, তাই নিয়ে এখন আলোচনা চলছে। কলাজগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভাধরদের সঙ্গেই সকলে সিণ্ডিংএর নাম উচ্চারণ করছেন। বিখ্যাত জার্মান ভাস্কর কুহনের মতে "রোদাঁর সঙ্গে তুলনায় সিণ্ডিং কিছুমাত্র খাটো হবেন না। রোদাঁর সঙ্গে সত্য সত্যই তার গঠন-পদ্ধতিরও অনেকটা মিল আছে। অধিকন্তু সময়ে সময়ে রোদাঁর খেয়ালের খেলায় যে সব অসঙ্গতি প্রকাশ পেয়েছে, সিণ্ডিংএর হাতের কাজে তেমন খাপছাড়া কোন-কিছুও নজরে পড়ে না।"

নর ও নারীর মধ্যে পরস্পরের প্রতি



রাত্রি

যে গভীর আকর্ষণ আছে, রোদাঁর মতন সিণ্ডিংও তা শিলাপটে চমৎকার ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন। তাঁর রচিত 'রাত্রি'তে আমরা এই ভাবেরই ছবি দেখি। 'রাত্রি'র মধ্যে নিদ্রিত পুরুষের মুখের ও হাতের ভাব-ভঙ্গিতে কতটা প্রেমের ও স্নেহের, এবং ঘুমন্ত মেয়েটির সর্ব্বাঙ্গে কতখানি আত্ম-সমর্পনের রূপ বিকসিত হয়েছে!

রোদাঁর শিল্প-জীবনের অধিকাংশ সংগ্রামে পরিপূর্ণ। লোকে তাঁকে সহজে চিন্‌তে পারে নি। চারিদিক থেকে নানা বাধা-বিঘ্ন, হিংসা-নিন্দা, অনাদর ও প্রতিবাদের ভিতর থেকে রোদাঁ বহুকষ্টে নিজের পথ কেটে নিয়ে লক্ষ্যস্থানে পৌঁছোতে পেরে ছিলেন। আধুনিক জগতের তিনি শ্রেষ্ঠ ভাস্কর বটে,—কিন্তু এ সম্মান পেয়েছিলেন তিনি প্রায় জীবনের সায়াহ্নে।

যদিও প্রতিভা-মাত্রেরই স্বরূপ চিন্‌তে দেরি লাগে, তবু এ-কথা সত্য যে, স্বদেশে নিজের নামকে প্রতিষ্ঠিত করতে, সিণ্ডিং তেমন বেশি কষ্ট পান নি। নরওয়ের আধুনিক শিল্প-সমাজে সিণ্ডিং গুরুর মতন আদর ও সম্মান লাভ করেছেন। এবং সমগ্র স্কাণ্ডিনেভিয়ায় নবীন কোন শিল্পীই সিণ্ডিংয়ের প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারেন-নি।

ভাবুকতার ক্ষমতা

আফ্রিকার কয়েনজোরি আল্‌স্‌ পর্ব্বতের উপরে; চির-তুষারের সাম্রাজ্য। তার তলায় ঝিকিনো আগ্নেয়-গিরির পাথর-গলানো উত্তাপ; এই আগ্নেয়গিরির পাদমূলে যে নিবিড় অরণ্য, তার মধ্যে থাকে গরিলার দল।

এইখানে যে পুরুষ-গরিলাকে বন্দী করা হয়েছিল, নীচে তার ছবি দেওয়া গেল। এই জীবটি মাথায় আটফুট উঁচু, ওজনে পাঁচমণ পঁচিশসের; তার বুকের বেড় একষট্টি ইঞ্চি। চল্লিশজন পালোয়ান মানুষ একসঙ্গে আক্রমণ করলেও সকলকেই সে একলাই মেরে-ধরে তুলো ধুনে দিতে পারে,—গায়ে তার এত জোর!

ছবির গরিলার ডানধারে, ওপরের হাত-দুখানা গরিলার; আর নীচের হাত-দুখানা মানুষের। এই দু-জোড়া হাতের ভিতরে আসল তফাৎ হচ্ছে বুড়ো-আঙুলে। চিন্তাশক্তির দ্বারা মানুষের কপালের মতন, হাতের বুড়ো-আঙুলও ক্রমেই বিকাশলাভ করেছে।

গরিলার ডানধারে একটি মানুষের মূর্ত্তি।

বৈজ্ঞানিকদের মতে, এই দুটিই দুই ভায়ের মূর্ত্তি; এবং দশলক্ষ বৎসর আগে থেকে এই দুই ভাই পরস্পরের কাছ থেকে আলাদা হয়ে আছে।

গরিলার ভিতরে কতক পরিমাণে মনুষ্যত্ব এবং মানুষের ভিতরে কতক পরিমাণে "গরিলাত্ব" আছে। কথাটা শুনতে অনেকের ভালো লাগবে না—কিন্তু মূলে এটি সত্য কথা।

হিংসা-দ্বেষ ক্রোধের সময়ে মানুষের মুখ প্রায়ই এই গরিলার মুখের মতন দেখতে হয়। তারো গরিলা-সুলভ সংস্কারের বিরুদ্ধে মানুষের মনে অবিরাম সংগ্রাম চলছে—তাই তার মুখের উপরে আজ একটি প্রশান্ত শান্তির কান্তি ফুটবার অবকাশ পায়।

গরিলার দেহের ভিতরে হাড় ও অন্যান্য শারীর-যন্ত্রের সংস্থান অবিকল মানুষের মতন। এমন-কি উভয়ের মস্তিষ্কের গঠন পর্য্যন্ত প্রায় একরকমই দেখতে।

দশলক্ষ বৎসর বা আরো আগে এই মানুষ



গরিলা ও মানুষ

আর গরিলার ভিতরে মনের পার্থক্য ছিল অত্যন্ত অল্প।

গরিলার গায়ের জোর ভয়ানক,—সে অনায়াসে সিংহের সঙ্গে লড়্তে পারে। দাঁতের আর হাতের জোরে সে কারুকেই কেয়ার করে না! অতএব সে শুধু দাঁত আর হাত এবং পাশব শক্তিকেই সম্বল ক'রে রইল। সে কখনো চিন্তাশক্তির ছায়া মাড়ায় নি, কারণ চিন্তার সার্থকতা কখনো সে অনুভব করে-নি।

কিন্তু সেই আদিম যুগে,—গরিলার ভাই, অর্থাৎ যে মানুষের আকার লাভ করে, সে, গায়ের জোরে আর লম্বায়-চওড়ায় গরিলার চেয়ে ঢের ছোট ছিল। হিংস্র জন্তুরা অনায়াসে তাকে বধ কর্তে পার্ত। সে-সব জন্তু দেখে মানুষ ভয়ে সারা হয়ে উঠ্ত—এখনো ওঠে। কাজেই এই দুর্ব্বল মানুষ-জন্তু গিরি-গুহায় ঢুকে, গাছের টঙে চড়ে নানান-রকম বুদ্ধি খাটিয়ে আত্মরক্ষা কর্ত। তাই চিন্তাশক্তির দ্বারা তাকে দেহ-শক্তির অভাব পূরণ ক'রে নিতে হয়েছিল। এইখানেই তার ক্রমোন্নতির সূত্রপাত।

এই ছবিতে আঁকা গরিলা আর মানুষ একই সমস্যা পূরণের চেষ্টা করছে। গরিলা ভাবছে—"আমি যাকে দেখতে পাচ্ছিনা, তাকে কি ক'রে তাড়িয়ে দেব?......হত্যা কর্‌ব?" দেখুন, দুইহাত তুলে গরিলা শত্রুকে ধ্বংস কর্‌তে উদ্যত। কেননা এ-ছাড়া আর-কোন পদ্ধতি তার অজ্ঞাত।

মানুষ ভাবছে:—"স্নায়ু ও মানস-শক্তির দ্বারা কেমন ক'রে আমি পাশব-শক্তিকে দমন কর্‌ব?"—এ সমস্যা মানুষ সমাধান করেছে তার মস্তিষ্কের চিন্তাশক্তিকে কাজে খাটিয়ে। ফলে আজ সে নায়াগ্রা প্রপাতকে—দশলক্ষ গরিলার জোর যার কাছে তুচ্ছ—অনায়াসেই বেঁধে ফেল্‌তে পেরেছে। যে বিদ্যুৎ দেখ্‌লে গরিলা পর্য্যন্ত ভয়ে কুঁক্‌ড়ে পড়ে, মানুষ সেই বিদ্যুৎকেও অনায়াসে নিজের গোলাম ক'রে রেখেছে। দুর্ব্বল মানুষের এই চিন্তাশক্তির কাছে মহাবল গরিলা আজ তৃণের মত তুচ্ছ।

শত শত যুগ আগে মানুষের আর গরিলার মুখে বিশেষ কোন তফাৎ ছিল না। চিন্তাশক্তির অভাবে গরিলার মুখ আজও যে-কে-সেই আছে; কিন্তু চিন্তাশীলতার গুণে মানুষের মুখের চেহারা আজ কত উন্নত!

চিন্তাশক্তি যে কি অসাধ্য সাধন কর্‌তে পারে, ছবির এই মূর্ত্তিদুটি তারই জ্বলন্ত প্রমাণ।

একশো-বচ্ছরের বর

ডাক্তার মরিসন আমেরিকার একজন বিখ্যাত লোক। তাঁর বয়স পাক্কা একশো বছর।

মিস্ বার্ণির বয়স অন্তত বাহাত্তর বৎসর। "অন্তত" বল্লুম এইজন্যে যে, মিস বার্ণি নিজের বয়সের কোনই হিসাব রাখেন না! তিনি নানাদেশী চিকিৎসা-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত।

সংপ্রতি এই একশো বছরের বরের সঙ্গে এই বাহাত্তর বৎসরের কুমারী কন্যার বিয়ে হয়ে গেছে!



বর আর বউ।

মিস্ বার্শি বলেন, "আমি অল্পবয়সের বিয়েতে বিশ্বাস করি না। যৌবন-বিবাহের 'রোম্যান্স' সম্বন্ধে যে গল্প-গুজোব শোনা যায়, তাতেও আমার কোন আস্থা নেই। আমার মতে, বিবাহের দ্বারা মানুষ তার দোসর—সুখ-দুঃখের অংশীদার সংগ্রহ করে—এক মাত্র। ডাক্তারের সঙ্গে আমি যে বিবাহের চুক্তিপত্রে সই করেছি, তার কারণ আমাদের দুজনের রুচি ও প্রকৃতি একরকম,—কাজেই আমরা পরস্পরকে সাহায্য করতে পারব।"

ডাক্তার রবিসন দীর্ঘজীবন সম্বন্ধে বলেন, "মানুষ তার মনের ধারাকে বদ্ধ ক'রে দেয় এবং ফলে তার দেহের কল-কব্জায় মর্চে ধরে যায়। নানান্ ভাষার আলোচনার দ্বারা আমি আমার মনকে সর্ব্বদাই সতর্ক রাখি ও কাজে খাটাই। গ্রীক, লাটিন, হিব্রু ও সংস্কৃতের শব্দকোষ স্মরণ রাখতে এবং ফরাসী, ইতালীয় ও স্পেনীয় ভাষায় অনেকটা-একরকম বিভিন্ন বাগ্‌ধারাকে মনের ভিতরে পরস্পর থেকে আলাদা ক'রে রাখতে পারলে, মানুষের মন যোদ্ধার তরোয়ালের মতন মার্জ্জিত হয়ে থাকে। অলস সাধারণ লোকেরা নিজেদের মন ও দেহকে অকেজো রেখে রেখে শেষটা মর্চে ধরিয়ে ফেলে; আবার ব্যবসায়ী ও পেশাদার লোকেরা আপনাদের সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে এমন বিশেষ ভাবে নিজেদের আবদ্ধ রাখেন যে, সে সংকীর্ণতা 'অ্যাসিডে'র মতন তাঁদের মনের 'স্প্রিং'কে ক্ষইয়ে দেয়। আমার পেশা ডাক্তারী। কিন্তু সেজন্যে সঙ্গীতালাপ করতে আমি বিমুখ হইনি বা আমার ডাক্তারীকে আমি আমার প্রেত-তত্ত্ব, জ্যোতিষশাস্ত্র ও মনোবিজ্ঞান আলোচনাতেও বাধার মতন হ'তে দিইনি। এমনি নানান বিষয়ে আকৃষ্ট থাকার দরুণ আমার মনের ভাবও সবদিকেই সমান হয়ে আছে। দীর্ঘজীবন লাভের আর-একটি মস্ত উপায় হচ্ছে, প্রতিদিন হাসি-খুসির

ব্যবস্থা ক'রে রাখা। আমি সহজে রেগে উঠি না। আমি সাদাসিধে 'পোষ্টাই' খাবার খাই এবং আমার খাদ্যসামগ্রীতে খুব-বেশী starch বা protein থাকে না। আমার মতে, অধিকাংশ লোকই যেমন বেশী খায়, তেমনি বেশী ঘুমায়।"

ডাক্তার মরিসন তাঁর স্ত্রীর সাহায্য নিয়ে এখন এমন একখানি পুস্তক-রচনায় প্রবৃত্ত আছেন, যা প্রকাশিত হ'লে চিকিৎসা-শাস্ত্রে যুগান্তর উপস্থিত হবে। মিস বার্গি তাঁর চতুর্থ-পক্ষের স্ত্রী।

হাড়ের 'কলম'

গেল কয়-বছরের মধ্যে অস্ত্র চিকিৎসার বিভাগটা অত্যন্ত উন্নত হয়ে উঠেছে। সুতরাং প্রায়ই নতুন নতুন উদ্ভাবনার কথা শোনবার জন্যে জনসাধারণ যে উদ্গ্রীব হয়ে থাকবে, এটা কিছুমাত্র বিচিত্র নয়।

পাশ্চাত্য অস্ত্র-চিকিৎসায় আজকাল হাড়ের কলম বসাতে ডাক্তাররা আশ্চর্য্যরকম কেরামতি দেখাচ্ছেন। সংপ্রতি উইলিয়ম কস্‌গ্রোভ নামে একজন গাড়োয়ানের দেহ নিয়ে অস্ত্র-চিকিৎসকরা যে কার্য্য সাধন করেছেন, আপনারা তা শুনলেও অবাক হবেন। অনেকদিন আগে পিঠের ওপর ঘোড়ার লাথি খেয়ে তার শিরদাঁড়াটা আহত হয়ে যায়। ফলে তার দেহে আংশিক পক্ষাঘাত দেখা দেয়।

হাসপাতালের ডাক্তাররা তার আহত শিরদাঁড়ার খানিকটা বাদ দিয়ে, সেখানে গরুর পাঁজরার একখানা হাড় বসিয়ে দিতে চাইলেন। কস্‌গ্রোভ তাতে রাজি হয়ে গেল।

তখন একটি অল্পবয়সী গরু বেছে নিয়ে আগে পরখ ক'রে দেখা হ'ল, সে নীরোগ কিনা? গরুটির বয়স অল্প না হ'লে তার হাড় তেমন নরম ও নমনীয় হ'ত না, আর মানুষের দেহে তেমন খাপ খাইয়ে বসানোও চল্‌ত না।

গরুর দেহ থেকে চোদ্দ-ইঞ্চি লম্বা একখানা হাড় কেটে নিয়ে, প্রথমে আটচল্লিশ ঘণ্টা ধ'রে সেখানা সিদ্ধ করা হ'ল। তারপর উকো দিয়ে ঘসে ঘসে ডাক্তাররা হাড়খানার গড়নটা মানুষের দেহের উপযোগী ক'রে তুললেন।

এদিকে যথাসময়ে কস্‌গ্রোভের দেহে অস্ত্রপ্রয়োগ করা হ'ল। ডাক্তাররা ছুরি চালিয়ে তার পিঠ চিরে মেরুদণ্ডের সমস্তটাই বার ক'রে ফেল্‌লেন। তারপর নানান রকম অস্ত্রের দ্বারা চিকিৎসকরা কস্‌গ্রোভের আহত মেরুদণ্ডের চোদ্দ-ইঞ্চি কেটে নিয়ে, সেই চোদ্দ-ইঞ্চি গো-হাড়খানা তার দেহে বসিয়ে দিলেন।

গেল যুদ্ধের সময়ে ফ্রান্সের বিখ্যাত অস্ত্র-চিকিৎসক আলেক্সিস কারেল সাহেব এর-চেয়েও অদ্ভুত কাজে সিদ্ধ হয়েছেন। জেনারেল কেবাস্নের ভাগ্নের হাতখানা বেলজিয়মের রণক্ষেত্রে কামানের গোলার চোটে উড়ে গিয়েছিল। কারেল সাহেব তখনি সাংঘাতিক রূপে আহত



মানুষের পিঠে গরুর হাড়

একটি সৈনিকের ডানহাত কেটে নিয়ে, সেই হাতখানা সেনাপতির দেহে বসিয়ে জুড়ে দিয়েছেন। হয়ত খুব-শীঘ্রই আমরা এও শুনতে পাব যে, রামের মাথা শ্যামের ধড়ে বসে পরমানন্দে হাসছে, দুলছে, খেলছে!

অস্ত্রচিকিৎসায় আজকাল অনেক নতুন উন্নতি হচ্ছে বটে, কিন্তু এ ব্যাপারটা মান্ধাতারও আগের আমোল থেকে পৃথিবীতে চলে আসছে। বিশেষজ্ঞরা প্রমাণ দিয়েছেন যে, সেই শিলা-যুগের (stone age) আদি মানুষরাও এ-বিষয় নিয়ে কিছু কিছু চেষ্টা করতে ছাড়ে নি।

শ্রীপ্রসাদ রায়।

মঙ্গল মঠ

আমাদের আড্ডার দেশজোড়া নামডাক ছিল। সেখানে যে এসে আধঘণ্টার জন্ত বসেছে, তাকেই বলতে হয়েছে—হাঁ একটা আড্ডার মতন আড্ডা বটে! এক-একটি লোকের হালচাল এক এক-রকমের, কোন দুটি লোকের স্বভাবে মিল পাবার যো ছিল না। তবে এক জায়গায় আমাদের সবারই মিল ছিল, আমরা সবাই ছিলুম লক্ষীছাড়া। হাড়-লক্ষীছাড়া না হলে সেখানে কেউ পাত্তা পেত না। লোকে এই আড্ডার নাম দিয়েছিল "লক্ষীছাড়ার দল।"

ভৈরবচন্দ্র ছিলেন আমাদের মধ্যে সব থেকে বাবু। শান্তিপুরে ধুতি, রেশমের ফতুয়া, ঢাকাই আদ্দির পাঞ্জাবী, ডাল বার্ণিশের লপেটা এ সব ছাড়া সে এক-পা-ও নড়ত না। তার এই সব বিলাসিতার বিরুদ্ধে আমাদের বলবার কিছু ছিল না, তবে তার মাথার সেই শাঁস বার করা থাক্-কাটা চুল ছাঁটা দেখলেই আমাদের মেজাজ যেতো চটে। ভৈরবকে এই চুল ছাঁটা সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলেই সে বলত—লোকের স্বাধীন ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাঁড়ান তোমাদের কেমন একটা বদ অভ্যেস—

বিলাস কুমার ছিল ভৈরবের ঠিক উল্টো। সে পরত গেরুয়া বসন, রুক্ষ কচ্ছ, নেড়া মাথা,

খালি পা—বিলাস দিন কতক সন্ন্যাসীও হয়েছিল, সম্প্রতি জঙ্গল ছেড়ে আবার সে সংসারী হয়েছে। হঠাৎ তার এই মত পরিবর্ত্তনের কারণটা আমাদের কাছে ব্যক্ত করেনি

বাইরে এদের যেমন পার্থক্য ছিল তেমনি অন্তরেও তারা দুই বিভিন্ন ভাবের বাক্যে বিচরণ করত। ভৈরবের মুখে ছিল দিনরাত বেদান্তের ছড়াছড়ি। শান্তিপুরে ধুতির কোঁচান কোঁচাটী বাঁ হাতে আলগোছে ধরে যখন সে বেদান্তের ব্যাখ্যা করত তখন সেটা শোনবার না হোক্ একটা দেখবার জিনিষ হত বটে। আবার ওদিকে গেরুয়া বসন পরা বিলাস যখন নেড়া মাথা চাপড়ে চার্কাক দর্শনের সরল অর্থ ব্যাখ্যা করত তখন আমাদের আড্ডাধারী তরুণ চার্ব্বাকের একজন উঁচুদরের শিষ্য হলেও রুল হয়ে বলে উঠত—বিলাস দা একটু সামলে—

মহেন্দ্রর বয়স ছিল প্রায় সত্তর। আমরা সবাই তাকে দাদা বলে ডাক্তুম। ভৈরব ও বিলাসের অন্তর বাইরের এত তারতম্য নিয়ে যখন আমাদের মধ্যে কথাবার্ত্তা হত, মহেন্দ্র দা তখন বলত—কি জানিস্। ওরা মাঝে মাঝে পাষাণ ভেঙ্গে দাঁড়িপাল্লাটাকে ঠিক করে নেয়—

এত রকমের লোক থাকা সত্ত্বেও রোজই একসঙ্গে মেলামেশার জন্ম আড্ডা মধ্যে মধ্যে বৈচিত্র্যহীন হয়ে পড়ত সেই সময় আমরা যে-যার এক একদিকে চলে যেতুম, দিনকয়েক আড্ডাঘরের দরজায় চাবি পড়্ত।

ঠিক এম্নি একটা সময়ে যখন সবারই মনে পালাই পালাই ডাক দিতে আরম্ভ করেছে সেই সময় একদিন ভৈরবচন্দ্র নতুন বেশে আড্ডায় এসে হাজির হলেন। আমরা ত তার চেহারা দেখে একেবারে অবাক। তার মাথায় সেই একখানা পনেরো আনা চুল কি করে চৌরস হয়ে কদম ছাঁটে পরিণত হয়েছে। গায়ে ফিনফিনে আদ্দির পাঞ্জাবীর বদলে একটা মোটা কুর্ত্তা, আর তার উপরে একখানা বোম্বাই বিছানার চাদর, পরনে একখানা মোটা থান ধুতি পায়ে সাদা বেলো-য়ারী চামড়ার একজোড়া চটি আর হাতে শঙ্কর দর্শনের এক খণ্ড।

ভৈরব বলে—বাস, সংসারের সঙ্গে তার ইতি হয়ে গেল। সে শীগ্‌গীরই হিমালয়ের মঙ্গল মঠের সেবক হয়ে সেখানে চলে যাচ্ছে। মঙ্গল মঠের প্রতিষ্ঠাতা একজন ঘোরতর অদ্বৈতবাদী ছিলেন। তার মনের মধ্যে এখন এক দ্বৈতাদ্বৈতের ভয়ানক লড়াই চলেছে, সেই সন্দেহটা কেটে গেলেই একদিন সে বেরিয়ে পড়বে।

ভৈরবের মুখে এইসব লম্বা-চওড়া কথা ইতিপূর্ব্বে আমরা অনেক শুনেছি কিন্তু তেমন মনোযোগ কখনো দিইনি। আমরা জানতুম দুনিয়াশুদ্ধ লোক মিথ্যেবাদী আর আমরা সত্যবাদী। ও-সব দ্বৈতবাদী, অদ্বৈতবাদী মায়াবাদীর ধার কখনো ধারতুম না। মহেন্দ্র দাদা বলত ও গুলো মিথ্যেবাদীদেরই নামান্তর মাত্র।

আমাদের এই অবহেলায় ভৈরবচন্দ্র কিছু মাত্র বিচলিত না হয়ে দিনে দিনে আরও উৎসাহিত হয়ে উঠছে দেখে আমরা তাকে গুরু বলে ডাকতে আরম্ভ করে দিলুম। প্রথমে দিনকয়েক সে এই ডাকে কিছুমাত্র আপত্তি জানায় নি, তারপর হঠাৎ একদিন ঘোরতর

আপত্তি জানিয়ে বল্লে—আড্ডায় আসা তা'হলে ত্যাগ করতে হল—

ভৈরবের আপত্তির মূলে একটু ইতিহাস ছিল। একদিন আমরা তাকে ভণ্ড বলা মাত্র নফর তার প্রতিবাদ করে বল্লে—কেন তোমরা ওকে ভণ্ড বল ?

নফরটা ছিল কিন্তু ভণ্ড চূড়ামণি। তার মন ভাবত এক কথা, আর মুখ বলত আর এক কথা। তার এই অসাধারণ গুণের জন্য আড্ডা থেকে সর্ব্ববাদীসম্মতিক্রমে তাকে উপাধি দেওয়া হয়েছিল—অন্তঃসলিলা। সে এইরকম করে একজনের পক্ষ নিয়ে তাকে গরম করে দিত, তারপর তর্ক অর্থাৎ ঝগড়াটি যখন বেশ পাকিয়ে উঠ্‌ত তখন নিশ্চিন্ত মনে অন্য লোকের সঙ্গে গল্প জুড়ত।

নফরের কথা শুনে আমাদের সবারই মনে হয়েছিল—তাইত, ভৈরবকে ভণ্ড বলাটা বোধ হয় উচিত হচ্ছে না। তাই তাকে একটু আপ্যায়িত করবার জন্যে আমরা বল্লুম—ভয় নেই ভৈরব, ও ভণ্ড সাজতে সাজতে সাধু হয়ে যায়—

নফর বল্লে—কখনই না—

নফরের কথা শুনে ভৈরব আরও উৎসাহিত হয়ে উঠল। সে বল্লে—অসত্য যার ভিত্তি তার উপরে কখনো কোন ভাল কাজ হতে পারে না—

তর্কটি জমিয়ে দিয়ে নফর চন্দ্র সরে পড়্‌লেন। ভৈরব তখন সংস্কৃত, বাংলা, হিন্দী, ইংরেজী বয়েৎ ছেড়ে তার কথার সত্যতা প্রমাণ করবার চেষ্টা করতে লাগল। বিলাস একমনে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে আফিংয়ের নেশায় ঢুলছিল। থেকে থেকে তার মাথাটা কোলের ওপর লুটিয়ে পড়ছে—এই রকম অবস্থা। হঠাৎ ভৈরবের একটা হুঙ্কারে সে চম্‌কে উঠে বল্লে—ব্যাপার কি। ভৈরব এত চেঁচাচ্ছে কেন হে ?

ভৈরবের মুখে তর্কের কারণ শুনে বিলাস বল্লে—আচ্ছা আমাদের পক্ষে যদি আমরা প্রমাণ খাড়া করতে পারি ?

ভৈরব বল্লে—তা হলে অন্ততঃ তর্কে হেরে গেলুম এটা স্বীকার করব।

বিলাস বল্লে—তবে শোন—

আমরা বিলাসকে ঘিরে গোল হয়ে বসলুম। অতুল মনে করলে বিলাস হয়ত চার্ব্বাক দর্শনের কোন একটা অপ্রকাশিত অধ্যায়ের ব্যাখ্যা সুরু করবে, তাই সে একটু ভয়ে ভয়ে বল্লে—বিলাস দা একটু আস্তে ভাই, বাড়ীর ভেতরে যেন শুনতে না পায়—

বিলাস বল্‌তে লাগল—তোমরা সবাই জান যে তপেন আমার সহোদর, কিন্তু তা নয়। আমি বাপের একছেলে, তপনও বাপের একছেলে, আমরা দুজনে মাসতুত ভাই। আমার মাতামহ গোষ্ঠি খুব ধনী ছিলেন। আমি যে আজ চার্ব্বাক দর্শনে এত বড় একজন পণ্ডিত হয়ে উঠেছি—এই পাণ্ডিত্য বংশ পরম্পরায় আমি আমার মাতামহের দিক থেকে পেয়েছি। তবে তাঁরা চারু বাক্যগুলির সঙ্গে চারু কার্য্যগুলিকেও বেশ সুচারুরূপে সম্পন্ন করতেন। বাক্য ও কার্য্য বিজ্ঞানের প্রথম এবং সর্ব্বপ্রধান স্বতঃসিদ্ধ হচ্ছে, ঐ-দুটো জিনিষের মিলন যেখানে সেইখানেই অনর্থ পাত। এক্ষেত্রেও সে নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নি। মাতামহের পূর্ব্বপুরুষেরা এই বাক্যগুলিকে কার্য্যে পরিণত করে করে তাঁদের

বিশাল বিষয়ের বোঝাটি যখন আমার মাতামহের পিঠের ওপর চাপিয়ে দিয়ে সরে পড়লেন তখন দেখা গেল যে, বিষয়ের খোলসটি ঠিক আছে বটে কিন্তু তার ভেতরটায় ঘুণ ধরে গেছে।

মাতামহের পুত্র সন্তান ছিল না। গরিবের ঘরে দুই মেয়ের বিয়ে দিয়ে জামাইদের তিনি নিজের বাড়ীতে এনে রেখেছিলেন। জামাইরা গরীবের ছেলে, বড়লোক শ্বশুর বাড়ীতে এসে দু-দিনেই তাঁদের বনিয়াদি চাল চলন আরম্ভ করে ফেল্লেন। আরম্ভ করলেন বটে কিন্তু গরীবের হাড়ে তাঁদের সেটা আর সহ্য হল না। কাজেই আমাকে আর জপেনদাকে জ্ঞান হবার আগেই পিতৃহীন হতে হয়েছিল। আমাদের মাতামহ মারা যাবার আগেই মার আর মাসীমার মৃত্যু হয়েছিল তাই দাদামশায়ের মৃত্যুদিনেই পাওনাদারদের হাতে বাড়ীখানা ছেড়ে আসবাব সময় নিজের ভাবনা ছাড়া আর কারো ভাবনা ভাবতে হয় নি!

আগেই বলেছি, পিত্রালয় কখনো দেখিনি, দাদামশায়ের বাড়ীকেই নিজের বাড়ী বলে জানতুম। তার প্রত্যেক থাম, এমন-কি প্রত্যেক ইঁটখানার সঙ্গে আমাদের দুই ভাইয়ের এমন পরিচয় ছিল যে, কেউ যদি আমাদের চোখ বেঁধে দিয়ে বাড়ীর মধ্যে নিয়ে যেত ত আমরা দেওয়াল স্পর্শ করে বলে দিতে পারতুম—এটা ঠাকুর দালান, এটা দাদামশায়ের বসবার ঘর—

ছেলেবেলার এই খেলাঘর যেদিন ছাড়তে হল সেদিন আমি চোখের জল ধরে রাখতে পারিনি। আমার চোখে জল দেখে জপেন দা সেদিন বলেছিল—চলে আয় বিলে কাঁদিস নি, আমি বেঁচে থাকলে তোকে পঞ্চাশখানা বাড়ি বানিয়ে দেব।

সেই দিন থেকে কিন্তু জপেনদার সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। আমার বাবার দুই সহোদর ছিলেন, তাঁরা আমায় নিয়ে গেলেন। জপেনদার পিতৃপুরুষের কেউ ছিল না, তাকে নিতেও কেউ এল না। সেই সময়ে সে যে কোথায় গেল, কার কাছে আশ্রয় নিলে তা জানি না!

এই ব্যাপারের দশ বারো বছর পরের কথা বলছি—আমি তখন লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে কোন একটা সওদাগরি আপিসে পঁচিশ টাকা মাইনের কেরাণীগিরি করি। একদিন গড়ের মাঠে কিসের একটা মেলা দেখতে গিয়ে জপেন দাদার সঙ্গে দেখা—তাকে দেখে ত আমি চিনতেই পারিনি। তার দুইহাতে গোটা-দশেক হীরের আংটি, ঘড়ির চেন, সোনা বাঁধান ছড়ি—

দাদা জিজ্ঞেস কল্লে—বিলে কি কচ্ছিস? পঁচিশ টাকা মাইনের চাকরী করি শুনে সে বল্লে—দুর দুর চাকরী ছেড়ে দিয়ে আমার সঙ্গে বেরুতে আরম্ভ কর। বিশ্বাস করতে পারি এমন একটা লোক পাইনে, বড় মুস্কিলেই পড়েছি—

মেলায় একটুখানি ঘুরে তার গাড়ীতে গিয়ে উঠলুম। প্রকাণ্ড কালো জুড়ি। গাড়ীর পা-দানিতে পা দেওয়া-মাত্র ভেতরে বিজলী বাতি জলে উঠল। আমার ত দেখে শুনে তাক্ লেগে যাবার উপক্রম হল!

একটুখানি পরে গাড়ীখানা একটা প্রকাণ্ড ফটক পার হয়ে এক বাড়ীর মধ্যে

ঢুকল। প্রাসাদের মত বাড়ী, যেমন বাড়ী তেমনি তার আসবাব-পত্র। তপেনদা বল্লে কোন এক ইংরেজের সাজান বাড়ী সে কিনেছে, দাম কত—পঁচিশ না পঞ্চাশ লাখ কত বল্লে ঠিক মনে নেই। দাদার সঙ্গে অনেক কথা হল। সে দালালীতে বিস্তর পয়সা রোজগার করে, তবে তার একজন সহকারী না হলে আর চলচে না। বিশ্বাস করে কার হাতেই বা কাজের ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়, মাসতুত ভাই হলেও আমি তার সহোদরেরই মতন ইত্যাদি—

নানা কথাবার্ত্তার পর সে বল্লে—কি খুড়োদের ওখানে পড়ে আছিস, আমার এখানে চলে আয়, দুই ভাইয়ে মিলে আবার আগেকার মতন থাকা যাবে।

পরদিন খুড়োদের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে দাদার বাড়ীতে চলে এলুম। দুই-এক দিনের মধ্যেই তার সঙ্গে মোটর গাড়ী করে কাজে বেরুতে আরম্ভ করা গেল। দাদা দু'হাতে পয়সা রোজগার করত, আমাকে পেয়ে তার রোজগার আরও বেড়ে গেল। দুই ভাইয়ে মিলে আফিস খোলা হল। দালালীটা ছিল আমাদের প্রধান ব্যবসা, তবে তার সঙ্গে জাল জুচ্চুরি, বাটপাড়ি, জুয়া, ঘোড়দৌড় ইত্যাদি অনেক রকমে পয়সা উপায় হতে লাগল। দাদা বলত—দুনিয়াময় পয়সা ছড়ান রয়েছে শুধু কুড়িয়ে নিতে জানতে হয়।

বছর দুয়েকের মধ্যে ধনী বলে আমাদের নাম জাহির হয়ে গেল। ব্যবসা অর্থাৎ জুচ্চুরিতে আমরা যে অদ্বিতীয় সে কথা সহরের আপামর সবাই জেনে গেল।

পয়সা যে কি রকম আমদানী হতে লাগল তা বল্লে তোমরা বিশ্বাসই করবে না। এক একদিন আমরা লাখ টাকা পর্য্যন্ত রোজগার করেছি। যেমন আমদানী প্রত্যহ তেমনি অজস্র পয়সা খরচও করতুম। রোজ রাত্রে আমাদের বাড়ীখানা যেন ইন্দ্রপুরী হয়ে থাকত। শ্যাম্পেনের ফোয়ারা, বাইজীর নাচগান আর বন্ধু-বান্ধবদের হল্লায় সেই প্রাসাদের মতন বাড়ীখানা একেবারে জমজম করত। কোথায় কোন দেশে এক বাইজী ভাল নাচতে পারে, কোন রাজার কাছে একজন ভাল গাইয়ে আছে এই সব খবর জুটিয়ে আনবার জন্যে আমাদের মাইনে করা মোসাহেব ছিল, তারা সব খবর আনত আর যত টাকা লাগে তাই দিয়ে তাদের নিয়ে আসা হত। নবাব সিরাজউদ্দৌল্লা লক্ষ টাকা মুজরা দিয়ে দিল্লী থেকে বাইজী আনিয়ে ছিল শুনে তোমাদের তাক্ লেগে যায়, আর আমাদের ইতিহাস যখন লেখা হবে তখন দেখো লক্ষ টাকা মুজরা দিয়ে ও-রকম দশটা বাইজী আমরা আনিয়েছি। আজকে আমার এই সিরীষ-কাগজের মতন খোসামেস গায়ের চামড়া দেখে তোমরা সব ঠাট্টা কর, একদিন দুধ আর গোলাপ জল দিয়ে এই চামড়া পরিষ্কার করা হত, আর এর পালিশ ঠিক রাখবার জন্য কত রকমের যে মলম লাগানো হত তার নাম করতে গেলে এখন একটা বড় অভিধান হয়ে যাবে।

ব্যবসা যত জোর চলতে লাগল জাল জুচ্চুরিতেও ততই পাকা হতে লাগলুম। মাসতুত ভাইয়ের সম্বন্ধ নিয়ে যে একটা বচন প্রচলিত আছে লোকে আমাদের দুই ভাইকে দেখিয়ে সেই বচনের সত্যতা প্রমাণ করত।

একবার দাদার একটা চালের ভুলে আমাদের ভয়ানক লোকসান হয়ে গেল। এত ব্যাপারে ব্যাঙ্কে যা-কিছু নগদ ছিল তা, আর বাড়ীখানা চলে গেল। টাকা যেমন জলের মতন আসত তেমনি জলের মতন বেরিয়ে গেল। লোকসান সামলে একটু দাঁড়াতে না দাঁড়াতে আবার লোকসান খেলুম। লোকসানের সময় লোকের মাথার ঠিক থাকে না, বুড়ো-ধাড়ী ব্যবসাদারেরাও ডিগবাজী খায় ত আমরা—আমাদের তুজনের কারোই তখন হিশ পার হয়নি।

জাল, জুচ্চুরি, বাটপাড়ি ইত্যাদিতে কোন দিক দিয়ে সামলাতে না পেরে একদিন আমরা তুজনে পাওনাদারদের ফাঁকি দিয়ে সরে পড়লুম। দাদার এক মাড়োয়ারী বন্ধু বড়বাজারে থাকত তার বাড়াতে মাস কয়েক গা-ঢাকা দিয়ে বসে থেকে একদিন সন্ধ্যে বেলা তুজনে বেরিয়ে পড়া গেল। পালিয়ে কোথায় যাওয়া হবে সেটা দাদা আগেই ঠিক করে রেখেছিল, আমি জিজ্ঞেস করাতে সে একটা ধমক দিয়ে বল্লে—কিছু জানতে চাস্‌নে এখন, সোজা চলে আয়—

তুজনে সন্ন্যাসীর ভেক নিয়ে গোরক্ষপুরের তুখানা টিকিট কিনে রেলে উঠে বসলুম। দিন তুই পরে এক সন্ধ্যেবেলা গোরক্ষপুরে নেমে এক ধর্মশালায় রাতটা কাটিয়ে পরদিন সকাল থেকে আমরা হাঁটতে আরম্ভ করলুম। দাদার হালচাল দেখে মনে হল তার এ-সব রাস্তা যেন বেশ চেনা আছে। খানিকক্ষণ হাঁটার পর আমি আবার তাকে প্রশ্ন করায় সে বল্লে—আমাদের প্রায় সাতদিন হাঁটতে হবে। হিমালয় পাহাড়ে স্বামী সচ্চিদানন্দ নামে এক সন্ন্যাসী আছেন আমরা গিয়ে তাঁর শিষ্য হব, সেইখানেই থাকব। ভাবলুম—এ মন্দ হলনা, অনেক পাপ করা গেছে, এবার সন্ন্যাসীই হওয়া যাক্—

কয়েকদিন অনবরত হেঁটে আমরা সচ্চিদানন্দ স্বামীর মঠে গিয়ে পৌঁছলুম। চারিদিকে ছোট বড় পাহাড় সব আকাশ ফুঁড়ে উঠেছে, তারই মাঝখানের উপত্যকায় ছোট্ট খানকয়েক বাড়ী—সন্ন্যাসীদের থাকবার মতন জায়গা বটে।

দাদা গিয়েই আর কোন কথাবার্তা না বলে সচ্চিদানন্দের পা-তুটো জড়িয়ে ধরে বল্লে—প্রভু আমরা মহাপাপী আমাদের কি উদ্ধার হবে না—

স্বামীজি তখন কি একটা বই পড়ছিলেন, দাদা ও-রকম হাউমাউ করে গিয়ে পায়ের ওপর পড়াতে তিনি চমকে দশহাত পেছিয়ে গেলেন। তারপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমাদের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে একটু হেসে বল্লেন—বৎস, তোমাদের কিছু ভয় নেই, অনুতাপে পাপের ময়লা কেটে যায়, তোমাদের অনুতাপ এসেছে, কিছু ভয় নেই—

সন্ন্যাসী সচ্চিদানন্দ অদ্ভুত লোক ছিলেন। যেমন তাঁর গৌরবর্ণ সুকোমল দেহ, তেমনি তাঁর কণ্ঠস্বর। তাঁর কণ্ঠস্বরে এমন একটা মোহিনী শক্তি ছিল যে একবার শুনলেই মোহিত হয়ে যেতে হত। কি তাঁর গভীর জ্ঞান, অথচ শিশুর মতন সরল। বক্তৃতা করবার তাঁর যে অদ্ভুত ক্ষমতা দেখেছি আজ পর্যন্ত তা কারো দেখিনি।

মঠে আমরা পাঁচ সাত জন সেবক ছিলুম। সকাল বেলা ঘণ্টাকয়েক শাস্ত্রপাঠ হত

তারপর আর কোন কাজ ছিল না, আমরা যে-যার পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াতুম।

আমাদের মঠ থেকে দূরে একটা পাহাড় দেখা যেত তার মাথায় সব সময়েই বরফ জমে থাকত। পাহাড়ীরা এই পাহাড়টার নাম দিয়েছিল সতী। এই সতী নানা ছলে আমাকে এই পাহাড়ের বুকে আঁকড়ে রাখবার চেষ্টা করত। তার দিকে যখনই তাকিয়েছি তখনই দেখেছি,সে নতুন সাজে সেজে রয়েছে। সকালে সূর্য্য ওঠবার আগেই তার চূড়োটা সলজ্জ নববধূর মুখের মতন গোলাপী রংয়ে রঙিন হয়ে উঠত। আমার মনে হত মহেশ্বরের প্রথম প্রণয় সম্ভাষণে নববধূ সতী যেন লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠেছে। কোন কোন দিন দুপুর বেলা সূর্য্যের লাল রশ্মি পড়ে পাহাড়টা এত লাল হয়ে উঠত যে, তার দিকে চাওয়া যেত না। সে সময়ে তার চেহারা দেখে মনে হত যেন দক্ষের দরবারে সতী দেবী পতি নিন্দা শুনে ক্রোধে লাল হয়ে উঠেছে এখুনি তার ব্রহ্মরন্ধ্র ফেটে প্রাণটা বেরিয়ে যাবে, আর তার বুকের তরল আগুন চারদিকে ছিটিয়ে পড়ে পৃথিবীতে প্রলয় কাণ্ড সুরু হবে। অমাবস্যার অন্ধকারে যখন পৃথিবীর আর কিছুই দেখা যেত না তখনও তার দিকে চেয়ে দেখেছি, মনে হয়েছে, সতী যেন একটা গাঢ় নীল রংয়ের ওড়নায় সর্ব্বাঙ্গ ঢেকে কার সন্ধানে বেরিয়ে পড়েছে, ওড়না ভেদ করে ধবধবে সাদা রং ফুটে বেরিয়েছে। ক্রমে এই মঠ আর দূরের ওই সতী আমার সমস্ত মন প্রাণ গ্রাস করে ফেলতে লাগল। আমার অতীত যেন আমার মন থেকে মুছে যেতে আরম্ভ করল। কয়েকদিন আগেই আমি যে একটা মস্ত শয়তান, মস্ত জোচ্চোর ছিলুম সে কথা আমি নিজেই ভুলে যেতে লাগলুম। সময়ে সময়ে আমার মনে হত যে, আমি যেন চিরকাল এই পাহাড়ের কোলেই বেড়ে উঠেছি, আমার চারদিকে এই যে ছোট বড় সব পাহাড় ওরা আমারই আত্মীয়। আমারই মতন একদিন তারাও এই বুকে খেলে বেড়াত হঠাৎ কোন যাদুকরের মায়াদণ্ডের স্পর্শে তারা এই রকম নিশ্চল অসাড় হয়ে পড়েছে, আবার কবে কে এসে সোনার কাঠি ছুঁইয়ে তাদের জাগিয়ে দেবে সেই আশায় তারা দিন গুণছে।

দাদার কিন্তু সেখানে গিয়েও কোন পরিবর্ত্তন হল না। সে রোজ সন্ধ্যে বেলা আমাকে দিয়ে আফিং আনিয়ে খেত। পাহাড়ীদের ঘরে গিয়ে তাদের সঙ্গে রকম বে-রকমের নেশা করত। তা ছাড়া আমি তার সঙ্গে মাঝে মাঝে দুই একটা পাহাড়ী মেয়েকেও দেখেছি। অবশ্য, সচ্চিদানন্দ কিংবা তাঁর কোন শিষ্য ঘুণাক্ষরে এ-বিষয়ে জানতে পারত না। বরং সে দিন-কয়েকের মধ্যেই স্বামীজির প্রধান শিষ্য হয়ে দাঁড়াল।

সচ্চিদানন্দের নিয়ম ছিল যে পাঁচ বছর অন্তর তাঁর প্রত্যেক শিষ্যকে তাঁর কাছে জীবনের পাপ স্বীকার করতে হবে। আমরা সেখানে থাকবার কিছুদিন পরে সেই পাপ স্বীকারের দিন এগিয়ে এল। সেদিন মঠে নিজেদের মধ্যেই একটা উৎসব করা হত। পাপ স্বীকারের ব্যবস্থা শুনে আমি ত চঞ্চল হয়ে উঠলুম, দাদা কিন্তু নির্ব্বিকার। দেখলুম সে আফিংয়ের মাত্রাটা একটু বাড়িয়ে দিলে মাত্র।

স্বীকার-উৎসবের দিন দুই আগে দাদা আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বল্লে—আমায় একটু ধুনো জোগাড় করে দিতে পারবি ?

আমার কাছে মঠের ভাঁড়ার থাকত, হঠাৎ এত জিনিষ থাকতে তার ধুনোর কি দরকার পড়ল তাই ভেবে তাকে জিজ্ঞেস করলুম—ধুনো দিয়ে কি হবে ?

—সে তো খানিকটা ধুনো, একটা ওষুধ তৈরী করতে হবে।

ভাঁড়ার থেকে খানিকটা ধুনো তাকে দিয়ে আমি তক্কে তক্কে ফিরতে লাগলুম। দেখলুম যে, দাদা নিজের ঘরে গিয়ে ধুনোটাকে গুঁড়িয়ে তিন চারটে গুলি পাকিয়ে টপ্ টপ্ করে গিলে ফেল্লে।

পরদিনই দাদা অসুস্থ হয়ে পড়ল। তার দু'দিন পরে মঠের উৎসব। উৎসবের দিন দাদার অবস্থা রীতিমত খারাপ হয়ে দাঁড়াল। তার অসুখের জন্য আমায় তার কাছে থাকতে হল বলে পাপ স্বীকারের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে গেলুম। সন্ধ্যার একটু পরে দাদার অবস্থা শোচনীয় হয়ে দাঁড়াল। ক্রমে তার চোখ দুটো লাল হয়ে কোটর থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসতে আরম্ভ করলে। অবস্থা দেখে আমার মনে হতে লাগল যে, এখুনি তার প্রাণ বেরিয়ে যাবে।

দাদা আমায় বল্লে—স্বামীজিকে একবার ডাক। তাঁর কাছে পাপ স্বীকার না করলে আমি শান্তিতে মরতে পারব না। দাদা পাপ স্বীকার করলে আমার অবস্থাটাও বিশেষ সুবিধের হবে না ভেবে তাকে বল্লুম—দাদা এ সময় আর কেন—

সে বোধ হয় আমার মনের কথাটা বুঝতে পেরে বল্লে—তোর কিছু ভয় নেই, তুই স্বামীজিকে ডেকে নিয়ে আয়।

স্বামীজিকে ডেকে আনলুম। তিনি কাছে এসে দাদার অবস্থা দেখে শিউরে উঠলেন। দেখলুম তার কষ্ট দেখে তাঁর চোখ জলে ভরে উঠল। কাতরস্বরে দাদাকে ডেকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন—তপেন বড় কষ্ট হচ্ছে বাবা ?

দাদা হাঁপাতে হাঁপাতে বলতে লাগল—প্রভু, দেবতা, আমার বোধ হয় সময় হয়ে এসেছে, কিন্তু যাবার আগে আমি যে পাপ করেছি তা আপনার কাছে স্বীকার করে না গেলে আমি মরেও সুখ পাব না—

সচ্চিদানন্দ বল্লেন, তাঁর সেইগুলো মনে পড়লে আজও আমার শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। তিনি বল্লেন—তীর্থযাত্রার আগে আর উপদেষ্টাকে প্রণাম কেন বাবা—পাপ স্বীকার করার উদ্দেশ্য, চোখের সামনে নিজের কীর্তির একখানা জলন্ত ছবি রেখে দেওয়া ভবিষ্যতে জীবনযাত্রার পথে ঠিক হয়ে চলবার একটা উপায় মাত্র। তোমার আত্মা এখন অনন্তের পথে পাখা বিস্তার করেছে, দেহীর নিশ্বর ওজনের পাপ পুণ্যের বিচারে সেখানকার কোন লাভ নেই। তুমি নিশ্চিন্ত হও।

সচ্চিদানন্দের এত সব কথা শুনেও দাদা পাপ স্বীকার করবার জন্য জেদাজেদি করতে লাগল। তার সেই কাণ্ড দেখে আমার তখন ইচ্ছে হচ্ছিল—দিই গলাটা টিপে, পাপ স্বীকারের মজাটা একবার বার করে দিই।

দাদার জেদ দেখে স্বামীজি তাকে প্রশ্ন

করলেন—নিজের পত্নী ছাড়া কখন অন্য কোন স্ত্রীলোকের—

সচ্চিদানন্দের কথা থামিয়ে দিয়ে দাদা বল্লে—প্রভু আমি অবিবাহিত, তা ছাড়া মাতৃগর্ভ হতে ভূমিষ্ঠ হবার পর শিশু সে বিষয়ে যেমন নির্দ্দোষ থাকে ঐ বিষয়ে আমিও সেই রকম নিষ্কলঙ্ক।

দাদার কথা শুনে ত আমার মাথাটা লাট্টুর মত ঘুরতে লাগল। ওঃ কী ভয়ানক। জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে যে এরকম মিথ্যে কথা বলতে পারে তার গুণ নির্দ্দেশ করবার মতন বিশেষণ বোধহয় পৃথিবীর কোন ভাষার অভিধানের মধ্যে পাওয়া যায় না।

কথাটা শুনে বোধহয় স্বামীজিরও মাথা ঘুরে গিয়েছিল। তিনি একটু চুপ করে থেকে তাকে বল্লেন—বৎস, এ বিষয়ে তুমি আমার চেয়ে ঢের উন্নত। তুমি ধন্য।

তিনি আবার প্রশ্ন করলেন—আমি শুনেছি তুমি ব্যবসাদার ছিলে। ব্যবসায় অনেক সময় অনেক অসৎ উপায় অবলম্বন করতে হয়, তা ছাড়া অর্থের ওপরেও লোভ অত্যন্ত বাড়ে। তুমি কি কখনও সেই লালসায় অভিভূত হয়েছিলে?

প্রশ্ন শুনে দাদা বিকট একটা হাসির আওয়াজ করলে, কিন্তু এক মুহূর্ত্ত পরেই বুঝতে পারলুম যে সেটা হাসি নয়, কান্না! হাউ হাউ করে কেঁদে সে বলতে লাগল—প্রভু আমি অতি লোভী, বিবাহ না করলেও আমার সংসার ছিল খুব বড়, কিসে কেমন করে আমি আমার বাপ মা, ভাই, বোনদের সুখে স্বচ্ছন্দে রাখতে পারবো রাত-দিন কেবল সেই চিন্তাই করেছি, আর সেই লোভে তন্ময় হোয়ে অর্থ উপার্জ্জন করেছি। আমার কি মুক্তি হবেনা? এই বলে সে সচ্চিদানন্দের পা জড়িয়ে ধরলে।

স্বামীজি তাকে আশ্বাস দিতে লাগলেন, কিন্তু সে সব কথা কি তার কানে যায়—সে থেকে থেকে গুমরে গুমরে কেঁদে ওঠে আর বলে—প্রভু আমার কি হবে?

সচ্চিদানন্দ আর কোন প্রশ্ন না করে তার বুকে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন উত্তেজনায় তার শ্বাস-প্রশ্বাসের ভয়ানক কষ্ট হতে লাগল। আস্তে আস্তে চোখ দুটো বুঁজিয়ে ফেলে সে একটুখানি শান্ত হল।

কিছুক্ষণ এই রকম স্থির হয়ে পড়ে থেকে আবার সে ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠল। আমি ভাবলুম—আবার কি হল।

দাদা আবার সুরু করলে—প্রভু আমি অতি পাপী, আমি অতি চোর, জোচ্চোর—যখন ব্যবসা করতুম তখন একদিন হিসেব মিলিয়ে বাড়ী যাবার সময় দেখি যে, কয়েকটা টাকা তবিলে বেশী পড়ে রয়েছে। বোধহয় কেউ ভুলে বেশী দিয়ে গিয়েছে মনে করে আমি আমার কর্ম্মচারীদের টাকাটা আলাদা করে রেখে দিতে বলেছিলুম। আজ মনে হচ্চে টাকাটা ত কাউকে দেওয়া হয় নি! আমার কি হবে?—বলে সে কপাল চাপড়াতে লাগল আর থেকে থেকে উঠে বসতে আরম্ভ করলে।

সামনে একটা নরহত্যা হয় দেখে স্বামীজি সেখান থেকে উঠে বাইরে চলে গেলেন।

দাদার আগ্রহে আবার তাঁকে ডেকে আনতে হল। এবার সে তাঁকে কি বল্লে

স্থান ?' বিলাস একবার গলাটা সাফ করে ভৈরবের দিকে চেয়ে একটু নীচু গলায় বল্লে—এবার সে কি বল্লে জান ? এবার দাদা বল্লে—প্রভু আপনি বলুন আমার দ্বারা পৃথিবীর কোন উপকার হতে পারবে কি ? আমার ইচ্ছা যে আমি এইখানেই আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে যাই। আপনি যদি আশ্বাস দেন ত এবারের মতন আমি মৃত্যুকে ফিরিয়ে দিতে পারি। আপনার আশীর্ব্বাদে আমার সে শক্তি আছে।

দাদার এই কথা শুনে আমার মাথার ভেতরে কি রকম একটা অস্বাভাবিক যন্ত্রণা হতে লাগল। সেখানে আর দাঁড়িয়ে থাকা চলল না। কোন ক্রমে দেয়াল ধরে ধরে বাইরে চলে এলুম।

সমস্ত রাত্রি ঘরে স্বামীজিতে আর দাদাতে কি কথাবার্ত্তা হল জানিনে। সকালবেলা উঠে দেখি সে দিব্যি হেঁটে ফিরে বেড়াচ্ছে। আমার সঙ্গে দেখা হতেই সে আমায় ডেকে বলে দিলে—ধুনোর কথাটা কাউকে বলিস নি—

আমি মনে মনে ভাবলুম—ও বাবা ! ধুনোর এত গুন !

এই ব্যাপারের মাসখানেক পরে আমি আর আমাদের মঠের আর একজন সেবক ত্রিকুট মঠের একজন সন্ন্যাসীকে দেখতে গিয়েছিলুম। সেখানে আমরা প্রায় ছ-মাস ছিলুম। এই ত্রিকুট মঠ আমাদের মঙ্গল মঠ থেকে মাসখানেকের রাস্তা। এই ত্রিকুট মঠে বসেই আমরা শুনতে পেলুম যে আমাদের মঠে আনন্দ স্বামী নামে একজন মস্ত অদ্বৈতবাদী পুরুষ এসেছেন। সচ্চিদানন্দ এই সন্ন্যাসীকে গুরু করেছেন। দেশ-বিদেশ থেকে লোকে এই মহাত্মাকে দেখতে আসছে। তিনি অনেক দুরারোগ্য ব্যাধিও সারিয়ে দিয়েছেন।

নিজেদের মঠে এমন একজন মহাত্মার সমাগম হয়েছে শুনে আমরা সেইদিনই ত্রিকুট ত্যাগ করে মঙ্গল মঠের দিকে যাত্রা করলুম।

মঠে এসে দেখি সেখানে চারিদিকে ধুম ধাড়াক্কা লেগে গিয়েছে। সেবকদের থাকবার জন্য বড় বড় বাড়ী হচ্চে। একদিকে একটা বড় আতুর-আশ্রম খোলা হয়েছে, লোকে লোকারণ্য। তার মধ্যে বড় লোকই বেশী। স্বামী সচ্চিদানন্দ সম্প্রতি গুরুর আদেশে প্রচারে গিয়ে অনেক অর্থ ও অনেক শিষ্য সংগ্রহ করে এনেছেন। আনন্দ স্বামীর থাকবার জন্য সুন্দর একখানা শ্বেত পাথরের মন্দির হয়েছে, স্বামীজি তার মধ্যে ধুনী জ্বালিয়ে বসে আছেন।

মন্দিরে ঢুকে স্বামীজিকে প্রণাম করে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে দেখি—হরি ! হরি ! আনন্দ স্বামী আর কেউ নন, আমার দাদা—শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—

মঠের একজন সেবককে ব্যাপার কি তা জিজ্ঞেস করে জানলুম—স্বামীজি একজন ছদ্মবেশী মহাপুরুষ, সচ্চিদানন্দের তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে ছলনা করতে এসেছিলেন। সচ্চিদানন্দ একদিন স্বপ্নে এই কথা জানতে পেরে সকালে উঠে তাঁর পায়ের ওপর পড়াতে তিনি সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে শিষ্যত্বে বরণ করে নিয়েছেন। ক্রমে শুনলুম যে আমার অবর্ত্তমানে সেখানে অনেক কাণ্ড হয়ে

গিয়েছে। আনন্দকে একদিন সাপে ছোবল মেরেছিল, আসল জাত সাপ। তিনি ধ্যানস্থ হয়ে সে বিষ নামিয়ে দিয়েছেন। এই রকম অনেক অলৌকিক কাণ্ড তিনি এই কয়েক-মাসের মধ্যে করে ফেলেছেন।

দেখে শুনে আমার মনে অহঙ্কার হল যে, এমন দাদার ভাই আমি। কিন্তু সচ্চিদা-নন্দের মতন অমন মহাপুরুষের সঙ্গে এই রকম ব্যবহার আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারলুম না। একদিন দাদাকে আড়ালে পেয়ে আমি খুব গালাগালি দিলুম। গাল খেয়ে সে আমায় গোটাকয়েক হীরের আংটি দিয়ে বল্লে—এ-গুলো নিয়ে তুই সংসারে ফিরে যা, বিক্রী করে যা হবে তাতে তোর সারাজীবন সুখে কেটে যাবে।

বুঝলুম তার চক্ষুলজ্জা এখনও কাটেনি।

মঙ্গল মঠ আর আনন্দ স্বামীর নাম দিনে দিনে চারিদিকে প্রচার হয়ে পড়তে লাগল। মঠ থেকে অনেক সৎকার্য্য হতে লাগল, চারিদিক থেকে নতুন নতুন সেবক এসে জুটতে আরম্ভ করল। এত গোলমালের মধ্যেও দাদার অহিফেন সেবন ও মাঝে মাঝে রাত্রে লুকিয়ে বেরিয়ে যাওয়া চলতে লাগল। একবার হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে তিন দিনের জ্বরে আনন্দ পঞ্চত্ব পেলেন।

সেবকেরা বল্লে—স্বামীজি দেহত্যাগ করলেন—বাংলা খবরের কাগজওয়ালারা লিখলে—একে একে নিভেছে দেউটী—সমস্ত ভারতবর্ষ বল্লে—দেশের একজন মহাত্মা অকালে চলে গেলেন।

আমি সেইদিনই মঠ ছেড়ে কলকাতায় চলে এলুম। কলকাতার বীডন-কুঞ্জে মহতী সভা হল। অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় পড়ে আমায় সেই সভায় দাঁড়িয়ে একঘণ্টা ধরে আনন্দের গুণাবলী ব্যাখ্যা করতে হয়েছে। আনন্দ স্মৃতি-সমিতি হল, আনন্দ ধনভাণ্ডার খোলা হল। ভাণ্ডার-রক্ষকটী মাসকয়েক হল টাকা-কড়ি মেরে দিয়ে ফেরার হয়েছেন।

এখনও এই আনন্দ স্বামীর নামে মঠ চলেছে, দেশ-বিদেশে এই মঠের শাখা পর্য্যন্ত স্থাপিত হয়েছে। দলে দলে রোগী তার সমাধির পাশে হত্যে দিয়ে পড়ে থাকে, তারা ওষুধও পায়, শুনেছি তাতে রোগও সারে।

বিলাসের গল্পের পর আমাদের সেদিনকার মতন আড্ডা ভাঙল। পরদিন ভৈরব এসে বল্লে—সে ত্রিকূট মঠে যাবার সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক করে ফেলেছে।

শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী।

হিন্দুস্থান

(মহম্মদ ইক্‌বল)

দুনিয়ার মাঝে যত ঠাঁই আছে
  সব-সেরা কোন্ ঠাঁই ?
হিন্দুস্থান ! হিন্দুস্থান !
  হিন্দুস্থান ! ভাই !

হাজার ফুলের ফুল-বাড়ী সে যে
  নন্দন-সমতুল,
সে যে শতদল গোলাপের দেশ
  মোরা তারি বুলবুল্ !
যে দেশেতে যাই থাকি না যেথাই
  যত ধন-মান পাই,
মন পড়ে থাকে হিন্দুস্থানে,
  হৃদয় ভারতে ভাই !
হৃদয় আমার যেখানে গিয়েছে
  সেথা যেতে আমি চাই,
হিন্দুস্থান ! হিন্দুস্থান !
  হিন্দুস্থান ! ভাই !

হিন্দুস্থানে বিরাজে সে গিরি
  জগতে যে অতুলন !
হিম-চূড়া যার স্বর্গদুয়ার
  ছুঁয়ে আছে অনুখন !
সান্ত্রী মোদের সেই হিমালয়,
  জুড়ি কেহ নাহি যার;
জগৎ হ'য়েছে অবাক শোভায়
  ভারত-গোলেস্তাঁর !
কল-কল্লোলে ভারতের কোলে
  খেলে শত নদী নদ,
ঈর্ষায় দহে স্বর্গও যার
  হেরি রূপ-সম্পদ !

সাগর পারায়ে যত দিই পাড়ি
  যত দূরে দূরে যাই
টানে মর্ম প্রাণ হিন্দুস্থান,
  হিন্দুস্থান, ভাই !

গঙ্গা ! তোমার সুধাই আজিকে
  ওই তব কিনারায়,—
কত যুগ ধার বাস মোরা করি
  মনে কি আছে গো তায় ?
পুরাণ পন্থী কোরাণ-পন্থী
  ছিলে মোদের ঘর,
ধরমের বাণী না শেখায়, জানি,
  কলহ পরস্পর।
দুষ্মনি মোরা হারাম জেনেছি,
  চিনেছি ভ্রাতৃ-প্রেম,
হিন্দের মোরা চির-বাসিন্দা
  হিন্দু ও মোসলেম।
সময়-সাগরে বুদ্বুদ হেন
  কত জাতি কত দেশ
দর্পে ফুলিয়া কাঁপিয়া ফাটিয়া
  হইল স্বপ্ন-শেষ !
মিশর বাবিল মৃতের সামিল
  গ্রীস আর নাই গ্রীস,
হারায়ে আপন সাধনার ধারা
  খুঁজিছে অহর্নিশ !
মানী রোম আর হিস্পানীয়া,
  দেহ আছে প্রাণ নাই,
চির-প্রাণবান প্রাচীন মহান্
  হিন্দুস্থান ! ভাই !

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ।

বারোয়ারি উপন্যাস

২৯

বাল্মীকির বাঙালী দোহার কৃত্তিবাস ওঝা সতীশের মনের কাণে বল্‌তে যাচ্ছিলেন "অগ্নি-পরীক্ষা!" কিন্তু কমলার "না হ'তে দহন তনু পতন হইল আগে!" সতীশের মনের চোর-কুঠুরীর অন্ধকারে একটা অনাহূত দ্বিধা যেমন নিমেষের মধ্যে উদয় হ'য়েছিল তেম্‌নি নিমেষের মধ্যেই তলিয়ে গেল। অন্তর্য্যামী বল্লেন, "অগ্নি-পরীক্ষা নয়, অজ-বিলাপ।"

উচ্ছ্বসিত চোখের জলের প্রথম বেগটা সাম্‌লে নিয়ে মূর্চ্ছাহত কমলার মূর্চ্ছা ভাঙাবার জন্তে, তার ঘোম্‌টা-মুক্ত মাথাটি আস্তে আস্তে তাল-পাকানো উড়্‌নীর বালিশের উপর নামিয়ে রেখে, সতীশ, একটু জলের চেষ্টায় ওঠ্‌বার উদ্যোগ করছিল। ঠিক এই সময়ে একটা পাৎলা মেঘ স'রে গিয়ে, একরাশ চাঁদের আলো, কমলার নির্ম্মল মুখের উপর এসে পড়্‌ল। সতীশ উঠ্‌তে গিয়ে মুগ্ধের মতন বসে পড়্‌ল।...

সেই কমলা! বিয়ের আগে, ঘাটের পথে যার পদ্মফুলের মতন শুচি-সুন্দর মুখখানি দেখে সতীশের সন্ন্যাসী মন সংসারী হ'য়েছিল। সেই কমলা!...তেম্‌নি সুন্দর, তেম্‌নি নির্ম্মল! বিয়ের রাতে শুভদৃষ্টির সময়, তার উপবাসক্লিষ্ট কচি মুখখানি যেমন দেখে ছিল, সতীশের মনে হ'ল, আজও সে মুখ তেম্‌নিই আছে, তেম্‌নি নির্ম্মল, তেম্‌নি নিষ্কলঙ্ক। বিয়ের দ্বিরে-বছর, ভরা-বসন্তের সময়, বাপের বাড়ী থেকে এসে এম্‌নি একদিন কমলা, সতীশের জ্যোৎস্নাপ্লাবিত বিছানার উপরে ঘুমিয়ে পড়েছিল। সেদিন সতীশ বন্ধুদের মজ্‌লিস্ থেকে, তাদের কাছে নিজের মনের জোর দেখাবার জন্তে, বেশ-একটু বেশী রাতেই বাড়ী ফেরে। ছেলেমানুষ কমলা, দরজা খোলা রেখে, ঢুলে ঢুলে, শেষে ঘুমিয়ে পড়েছিল। নিদ্‌-মহলে, জ্যোৎস্না-সায়রে এই কমলকে দেখে সেদিন যেমন সতীশের স্বপ্নাবিষ্ট হৃদয় তার কুঞ্চিত ঠোঁট-দুটিকে ঘুমন্ত কমলার পুষ্পাধরের দিকে অতর্কিতে আস্তে আস্তে টেনে নিয়ে গিয়েছিল, সতীশ বুঝতে পারলে, আজও ঠিক তাই ঘট্‌তে বসেছে। আর এ-কথাও বেশ বুঝতে পার্‌লে, যে, যা ঘট্‌তে ব'সেছে, তা' রোধ করবার শক্তি, আত্মানন্দ বাবাজীর প্রিয় শিষ্য বৈরাগ্য-বাগীশ সতীশচন্দ্রের এক-কড়াও নেই। ঘুমন্ত-ছবি কমলার পুরন্ত ঠোঁটদুটির দুরন্ত আকর্ষণে বৈরাগী সতীশের ঘাড় তিলে তিলে ঝুঁকে পড়তে লাগল। গেরুয়ার গোলাপীর আমেজ্ দেখা দিলে। মনমোহন সুপ্ত বীণার সমস্ত তার একসঙ্গে হঠাৎ স্পন্দিত হ'য়ে উঠ্‌ল। এই একটা মুহূর্ত্তের এক-ফোঁটা আতরে হাজার জ্যোৎস্না-রাতের হাজার হাজার যুঁই-চামেলি, যেন, কাতার দিয়ে ফুটে উঠ্‌ল।

ঠিক এই সময়ে মূর্চ্ছিত কমলার নিস্পন্দ দেহ একটু ন'ড়ে উঠ্‌ল। স্বপ্নাবিষ্ট সতীশের হুঁস হ'ল, সে দেখ্‌লে কমলা চোখ মেলেছে; মূর্চ্ছা-নাগিনীর নাগপাশ খুলে গেছে। তার অসমাপ্ত চুম্বনের চুম্বক আকর্ষণে

কমলা চেতনার রাজ্যে ফিরে এসেছে। সতীশ ফিশ্‌ফিশ্‌ স্বরে ডাক্‌লে, "কমলা!" কমলা কিছু বল্‌তে পারলে না, বোধ হয় বলবার শক্তিও তার ছিল না। তার খোলা চোখ-দুটো কেবল জলে জলে ভ'রে উঠল। আর তারপর টস্‌ টস্‌ ক'রে জল গড়িয়ে পড়ল।

বক্তব্যকে চাপা দিয়ে কান্নার বেগ এবং কান্নাকে চাপা দিয়ে বক্তব্য কথা, ক্রমাগত ঠেলাঠেলি ক'রে, আগে বেরিয়ে পড়বার ব্যর্থ চেষ্টা ক'রে, সতীশের কণ্ঠের সমস্ত শিরা-উপশিরা-গুলোকে ব্যথায় টনটনিয়ে তুল্‌লে। সে কিছু না বল্‌তে পেরে কেবল উচ্ছ্বসিত চোখের জলে কমলাকে অভিষিক্ত কর্‌তে লাগল। এইরকম ক'রে ভাবের প্রথম আবেগ কতক পরিমাণে শান্ত হ'লে সতীশ ভাঙা গলায় বল্‌লে, "কেঁদ না। কমল, আমি ক্ষিতীশবাবুর কাছে সমস্ত শুনেছি।"

কমলা তার হরিণের মতন আয়ত চোখ বিস্ফারিত ক'রে বল্লে, "শুনেছ?...এমন বিপদ যেন শত্রুরও না হয়।" ব'লে সে ধীরে ধীরে উঠে বসল এবং তার কলকেতা প্রবাসের ইতিহাস বল্‌তে সুরু কর্‌লে। সতীশের মন তার অজ্ঞাতসারে কমলার রিপোর্টের সঙ্গে ক্ষিতীশবাবুর রিপোর্ট প্রাণপণে মিলিয়ে চলছিল এবং মিল দেখে খুশী হচ্ছিল, কিন্তু যে মুহূর্ত্তে এই ব্যাপারটা সতীশের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল, সে যেন নিজের কাছে নিজে লজ্জিত হয়ে বল্‌লে, "থাক্‌, থাক্‌, তোমার কষ্ট হচ্ছে, তুমি এখন ক্লান্ত আছ, আর ও-সব আমি শুনেছি...সমস্তই শুনেছি।"

চাণক্য, সতীশকে তর্জ্জনী তুলে বলছিলেন "বিশ্বাসং নৈব কর্ত্তব্যং স্ত্রীষু"

কিন্তু তার ফিরে-পাওয়া সুন্দরী স্ত্রীর সুন্দর মুখের সাম্‌নে সে চাণক্যের ঐ কথাটা কিছুতেই মান্‌তে পার্‌লে না। সুন্দরকেই সতীশ সত্য ব'লে গ্রহণ করলে।

কমলা কিন্তু তার এই কথায় যেন ঈষৎ সঙ্কুচিত হ'য়ে বল্‌লে, "তা হ'লে তুমি আমায় ...ঘেন্না কর না?...আমায় অবিশ্বাস কর'না?" শেষ-কথাটা উচ্চারণ কর্‌তে তার গলা কেঁপে গেল, চোখ আবার ছল্‌ছলিয়ে এল। সতীশ স্নিগ্ধ অথচ দৃঢ়স্বরে বল্‌লে, "মোটেই না, অবিশ্বাস করলে, আগ্রা থেকে, ধুলো পায়ে তোমার সন্ধানে কালি-ঘাটে আস্‌তুম না।"

কমলা সোজা হ'য়ে সহজ হ'য়ে বসল। অপমানে, লাঞ্ছনায়, ধিক্কারে, অনাহারে, যার দেহ-মন ভেঙে পড়বার জো হ'য়েছিল, সতীশের এই কটি কথায় সে যেন মৃত-সঞ্জীবনী লাভ করলে। তার সমস্ত ক্লান্তি, সমস্ত কষ্ট যেন চোখের নিমেষে অন্তর্ধান হ'য়ে গেল। কমলার মনে হ'ল, সে তার পুরোনো অধিকার ফিরে পেয়েছে। তাই তার প্রথম প্রশ্ন হ'ল, "আগ্রা থেকে আস্‌ছ,...তা হ'লে খাওয়া হয়নি?"

সতীশ বল্লে, "সে হবে এখন, তোমার? তোমারও বোধ হয় হয়নি।"

কমলা চুপ ক'রে রইল। দুজনে খানিকক্ষণ নীরব হ'য়ে রইল। তারপর হঠাৎ, বিনা জিজ্ঞাসায়, সতীশ তার দীর্ঘ বিচ্ছেদের সুদীর্ঘ ইতিহাস বল্‌তে সুরু কর্‌লে, উড়ো চিঠির কথা, তীর্থ পর্যটনের কথা, আগ্রার কথা, ক্ষিতীশের কথা। সতীশ কিছুই গোপন কর্‌লে না, সে স্পষ্টই বল্‌লে, "সত্যি কথা

বল্‌ছে কি উড়ো-চিঠিতে তোমার সম্বন্ধে যে সব কুৎসিত কথা লেখা ছিল, সে সব ঠিক বিশ্বাস না হ'লেও, মনে কেমন যেন একটা ধোঁকা জমেছিল। কিন্তু ক্ষিতীশ যখন বল্‌লে যে তার মায়ের চরিত্র সে যেমন নির্ম্মল, যেমন নিষ্কলঙ্ক ব'লে মনে করে, তোমার চরিত্রও ঠিক তেম্‌নি ব'লেই মনে করে, তখন, তার সেই কথা, তার চোখের নিঃসঙ্কোচ দৃষ্টি, তার স্বরের দৃঢ়তা সমস্ত মিলে, দক্ষিণে হাওয়া যেমন ঘোলাটে কুয়াসা কাটিয়ে দেয়, তেম্‌নি ক'রে আমার মনের ধোঁকা কাটিয়ে দিলে। যার সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে, তার চরিত্রের সঙ্গে কেউ নিজের মায়ের চরিত্রের তুলনা দিতে পারে না, এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস।"

"তা হ'লে তুমি আমায় বিশ্বাস করো?"

সতীশ বল্‌লে, "নিশ্চয়।"

"আগেকার মতন?"

"নিশ্চয়।"

কমলা প্রণাম ক'রে পায়ের ধুলো নিতে গিয়ে চোখের জলে সতীশের পা ভাসিয়ে দিতে লাগ্‌ল। খানিক পরে নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে চোখ মুছে সে বল্‌লে, "তুমি অবিশ্বাস কর না, এই আমার যথেষ্ট, এখন ম'লেও আর দুঃখ নেই

সতীশ বল্‌লে, "থাক্ ও-সব ছাই কথা, চল্ বাড়ী যাই।"

কমলার বুকের ভিতরটা ছাঁৎ ক'রে উঠল। সে বল্‌লে, "বাড়ী?...বাড়ীতে কি মা আমায় জায়গা দেবেন?"

"আমায় যদি স্থান অবিশ্যি তোমাকেও দিতে হবে।...ভালো কথা, মায় অসুখ শুনে, তুমি শুন্‌লুম, বাড়ী গিয়েছিলে... তা'রপর?"

কমলা খুব দ্রুত অথচ খুব ছোট্ট ক'রে ঘাড় নাড়্‌লে, জ্যোৎস্নায়, তার চোখ ছল্‌ছল্ ক'রে উঠ্‌ল।

সতীশ বল্‌লে, "ও! বুঝেছি, মা তোমার সেবা গ্রহণ করেন নি। আচ্ছা সে সব ঠিক হ'য়ে যাবে এখন।...তুমি যখন বাড়ীতে যাও, তখন মা একলা ছিলেন, না আর কেউ ছিল? ...ছিল,...হু বুঝেছি,... পাড়ার গুল্‌মুখী গোবর-সোহাগীর দল কাছে থাক্‌লে মা যেন আর এক মানুষ হ'য়ে যান...এই স্থাখনা, মা তো তোমায় অত ভালোবাস্‌তেন, কিন্তু, ওদের মন্ত্রণায় আমার আবার বিয়ে দেবার ধুয়ো তুলেছিলেন। কি সম্পচার, না বউএর ষোলো বছর উৎরে গেল অথচ ছেলে হ'ল না।... যাক্,...আমি সে সব ঠিক ক'রে নেব। শুচিবাই ছোঁয়াচে রোগ; গোবর-সোহাগীদের আব-হাওয়া থেকে সরিয়ে আন্‌তে পার্‌লেই মা যেমন স্নেহময়ী ছিলেন, আবার তেম্‌নিই হবেন; তুমি দেখে নিও। মায়ের মত করবার ভার আমার—এখন চল—চল্‌তে পার্‌বে ত?"

কমলা মুখে বল্‌লে "পারব", কিন্তু গ্রামের রাস্তা ধ'রে চল্‌তে চল্‌তে প্রতিপদেই সতীশ বুঝ্‌তে পার্‌ছিল যে, কমলা আর পারছে না। তাই সে প্রস্তাব করলে, "আজ হাট-বার; হাটের ফির্‌তি গোরুর গাড়ীর জন্যে মোড়ে এগিয়ে অপেক্ষা করা যাক্।"

মৈত্র-মশায়ের বাড়ী দূর নয়, কিন্তু সতীশ সে কথার উল্লেখ পর্য্যন্ত কর্‌লে না এত রাত্রে কমলাকে জগদীশপুরের পথে দেখে, সে

ষ্ট বুঝ্‌তে পেরেছিল, বাপের বাড়ী কমলা ত্রর পায় নি। একবার ভাবলে সোজা রনে পশ্চিমেই যাবে, কিন্তু এত রাত্রে শ্চিমের কোনো গাড়ীই বেলতলাতে থামে না, াজেই জগদীশপুরের রাস্তা ধ'রে দুজনে পা নে টেনে চল্‌তে লাগ্‌ল।

ধুৎরো ফুলের ঝোপে গোটা-কয়েক নাকী লুকোচুরি খেলছে। ঝিঁঝিঁ কছে। ফুরফুরে বাতাসে বকুল গাছের াতাগুলো গা-টেপাটেপি করছে। আর দহ স্থির জ্যোৎস্নার অকূল পাথারে াড়ি দিয়ে চলেছে দুটি প্রাণী; অশ্রান্ত, নষ্কলঙ্ক, নিঃসঙ্কোচ। কমলার মনে জাগছিল াদের বিয়ের রাতের কথা, মিলন-রাতের থা, সেদিনও এমনি জোৎস্না। তার নে হচ্ছিল এ যেন ঠিক সেইদিন। সারাদিন উপবাসের পর সেদিনও শরীরটাকে এমনি হাল্কা বোধ হচ্ছিল, মন জুড়ে ছিল আশঙ্কার সঙ্গে আশার আনন্দ, আজও ঠিক তাই।

সতীশের মনেও যে ঐ কথাই উঠ্‌ছিল তা' তার কথাতেই প্রমাণ হ'য়ে গেল; সে বল্‌লে, "কমলা, আজ তোমারও উপোষ আমারও উপোষ; মনে পড়ে বিয়ের দিন?—সেদিনও এমনি দুজনেরই উপোষ ছিল, আজ আমাদের নতুন বিয়ে—ফিরে-ফিরাত।"

কমলা মৃদু হেসে বল্‌লে, "হ্যাঁ ফিরে-ফিরতি।"

হঠাৎ দূরে গলার আওয়াজ পাওয়া গেল, কে প্রাণপণ চেঁচিয়ে গাইছে—

"ওহে দীনবন্ধু হরি!
একবার ভাখা দাও, রাঙা চরণ দু'খানি॥

গোরুর গাড়ীর খবরাখবর পাবার আশায় সতীশ ও কমলা থমকে দাঁড়াল। লোকটা িকটে এলে, সতীশ বল্‌লে, "ওহে মোড়লের পো, এদিকে গোরুর গাড়ী-টাড়ী আসতে খেছ?"

লোকটা গানের রসভঙ্গ হবার ভয়ে শুধু কটা "না" ব'লেই পূর্ববৎ চেঁচাতে চেঁচাতে লে গেল।

সতীশ কমলাকে বল্‌লে, "লোকটাকে নে পেয়েছে।"

কমলা বল্‌লে, "চাঁদের আলো দেখে ফুর্ত্তি লেগেছে।"

সতীশ বল্‌লে, "হুঁ-উঁ-উঁ, ফুর্ত্তি ব'লে ফুর্ত্তি, একেবারে স্বভাব-কবি দাঁড়িয়ে গেছে, 'দীনবন্ধু হরি'র সঙ্গে "রাঙা চরণ-দুখানি" মিল্‌ দিচ্ছে, দেখ্‌ছ না।"

কমলা ছন্দ-মিলের ধার ধারত না, কিন্তু এই স্পষ্ট গরমিলটা সতীশ যখন দেখিয়ে দিলে, তখন সেও হেসে উঠ্‌ল।

চলবে কি ঐখানেই দাঁড়িয়ে গাড়ীর অপেক্ষা করবে ঠিক করতে না পেরে দুজনেই ইতস্তত করছে এমন সময়ে কমলা বল্‌লে, "ঐ শোনো,—আবার গান—এবার কিন্তু গোরুর গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে চাকার শব্দও শুনতে পাচ্ছি।"

সতীশ কান পেতে শুনলে সত্যিই গাড়ী আসছে। গাড়োয়ান গাইছে,

"যাও হে, যাও হে, ও কালাচাঁদ!
তুমি আর এস না আমার বাড়ী।
এবার এলে আমার বাড়ী
দেব তোমায় ঝ্যাংরার বাড়ী।"

বিংশ শতাব্দীর কালাচাঁদের এই রকম

বীভৎস অভ্যর্থনায় সতীশ হাসবে কি কাঁদবে ঠিক করতে পারলে না। এমন সময়ে গাড়ী মোড় ফিরে প্রায় কাছে এসে পড়ল, তখন গাড়োয়ান গাইছে—

"বাইরে তোমার লম্বা-কোঁচা
ঘরেতে চড়েনা হাঁড়ি।
(তোমার) খেতে মাখতে তেল জোটেনা
কা—রা—সিনে
বাগাও তেড়ি—ই—ই!"

এই গাড়োয়ান-কুলের তানসেন নিকটে এসে অনেক কাকুতি-মিনতি ক'রে, শেষে এক টাকায় রফা ক'রে, সতীশ কমলাকে নিয়ে ছইয়ের ভিতরে গিয়ে বসল এবং "পথে একবার নকুড়ো ময়রার দোকানে গাড়ীটা যেন দাঁড় করানো হয়," এই ব'লে গাড়ী ছেড়ে দিতে বললে।

গাড়োয়ান "এজ্ঞে" ব'লে, বৈয়াকরণদের উপর টেক্কা দিয়ে মূর্দ্ধায় সযত্নে জিহ্বা টঙ্কৃত ক'রে বলদ দু'টোকে শাকটায়ণ-কৃত মূর্দ্ধণ্য ক-এর উচ্চারণ শেখাতে শেখাতে, কানের বদলে বেচারাদের ল্যাজ মলতে মলতে জগদীশ-পুরের রাস্তায় রওনা হ'ল।

৩

বিনাদোষে বারবার লাঞ্ছনা সহ্য ক'রে হরেনের মনটা অনেকদিন থেকেই বিদ্রোহী হ'য়ে উঠেছিল। কিন্তু আজকের এই পিতৃ-কৃত অপমানে তার শরীরের সমস্ত রক্ত যেন বিষ হয়ে উঠল। সমস্ত শিরা-উপশিরাগুলো যেন বিদ্যুৎ-ভরা তারের মতন তাকে প্রকাশ-হীন বিহ্বলতার যন্ত্রণায় অস্থির ক'রে তুলতে লাগল। চিরকালের সংস্কারের বশে সে বাপের কথায় কোন জবাবই দিতে পারলে না। ঠোঁটের উপর ঠোঁট চেপে কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে চ'লে গেল। এতক্ষণ ধ'রে সে সমস্ত অবিচার সমস্ত অপমান সহ্য করেছে, কিন্তু আর পারলে না। তার সমস্ত আবেগ, বজ্রের মতন কারো উপরে প'ড়ে, কিছু একটা ভেঙে-চুরে, তছ্‌নছ্‌ ক'রে ফেলবার জন্যে তাকে পাগল করে তুলছিল। তাই যখন সকলের আক্রোশ কমলার উপর গিয়ে প'ড়েছে তখন সে নিজেকে একটা কুৎসিত অকাণ্ড থেকে বাঁচা-বার জন্যে, কিছু না ভেবে-চিন্তে ত্যাবড়া হাউইয়ের মতন অন্ধ বেগে বেরিয়ে পড়ল। হঠাৎ মনে পড়ে গেল শশী মুখুয্যেকে; সেই মিথ্যাবাদী—সেই শয়তানই তো যত নষ্টের মূল। হরেন তার সঙ্গে বোঝাপড়া করবার জন্যে,তার রাগের খাপ্‌রা মাথার মধ্যে জ্বালিয়ে নিজেদের কাছারী-বাড়ীর দিকে একরকম ছুটে গিয়ে হাজির হ'ল। সেখানে গিয়ে শুনলে শশী অসুখের অজুহাতে ছুটি নিয়ে বাড়ী চলে গেছে; একজন আম্‌লা এইসঙ্গে এটাও হরেনকে জানিয়ে দিলে, যে, অসুখ অছিলা-মাত্র। রাতের ট্রেণে ম্যাজিষ্ট্রেট কাশীগাঁয়ে আসছেন, কাজেই সকলকে একটু বেশীমাত্রায় আজ দৌড়-ঝাঁপ করতে হবে; শশী কিন্তু দৌড়ঝাঁপ মোটেই পছন্দ করেনা, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ল্যাজ নাড়তে খুব পারে, পরের উপর মোড়লী করতে ওস্তাদ কিন্তু কাজের বেলায় ঢুঢু। তাই আগে-ভাগে অসুখের অছিলায় সরে পড়েছে। হরেন শেষ-পর্য্যন্ত না শুনেই শশীর বাড়ীর দিকে রওনা হ'ল। সেখানে হাজির হয়েই হরেন হাঁক দিলে "মুখুয্যে!" ত্যালা-কুচোর লতায় ঢাকা একটা ছোট্টো জান্‌লা ঈষৎ ফাঁক হ'য়েই বন্ধ হয়ে গেল। কেউ

জবাব দিলে না। কিন্তু হরেন খড়মের শব্দ স্পষ্ট পেয়েছিল। সে বেশ বুঝতে পারলে শশী বাড়ীতেই আছে, তাই ফের ডাকলে, "ওহে মুখুয্যে বাড়ী আছ, না জেগে ঘুমুচ্ছ!" অনেক চেঁচামেচির পর, কানে-হাঁটা কইমাছের মতন একটা ঘুন্সি-পরা ন্যাংটাছেলে, শুকতলার মতন একটা আমসত্ত্বের ফালি লালায় ভিজাতে ভিজাতে তড়াং তড়াং ক'রে বেরিয়ে এল।

হরেন বল্লে, "এই পটলা, তোর বাবা কোথায়?"

ছেলেটা আমসত্ত্বের দিকে জিভ্ বাড়াতে বাড়াতে ধীরে-সুস্থে বললে, "বাবা?—অ্যাঁ?—বাবা?—বাবা ঘরে—না, না, বেড়িয়ে গেছে।"

"তবে যে শুয়োর, মিছে কথা?" ব'লেই হরেন যেমন তার কান ধরতে যাবে অমনি ছেলেটা চট্ ক'রে মাথাটা নাবিয়ে নিয়ে সমস্ত আমসত্ত্বটা একসঙ্গে মুখে পুরে দিয়ে দুড়্ দুড়্ ক'রে বাড়ীর ভিতর ঢুকে দরজা বন্ধ ক'রে দিলে।

হরেন দরজায় একটা লাথি মেরে "লুকিয়ে ক'দিন থাকবে?" এই কথাটা চীৎকার-স্বরে জানিয়ে দিয়ে একটু তফাতে গোঁ-ভরে একটা আমগাছের ছায়ায় গিয়ে বসল।

এমনি অনেকক্ষণ বসে রইল। গাছের ছায়াগুলো মাথার উপর থেকে, পূবে হেলে, আস্তে আস্তে লতিয়ে চড়কে সন্ন্যাসীদের মতন দণ্ডী কাটতে কাটতে এগিয়ে ক্রমশঃ লম্বা হয়ে মিলিয়ে যেতে লাগল। সূর্য্য ডুবল। হরেন বিরক্ত হয়ে উঠে পড়ল। যাবার সময় আরেকবার শশীর দরজায় লাথি মেরে, হন্ হন্ ক'রে বড় রাস্তার দিকে মোড় নিলে। তেমাথায় এসে হরেনের হুঁস হ'ল, যে, রাগটা কমার সঙ্গে খিদেটা আবার যেন বেশ-একটু স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তাই থমকে দাঁড়িয়ে ষ্টেশনে গিয়ে সোজা রেলে উঠে বসবে কি তার আগে হাট থেকে কিছু খাবার সংগ্রহের চেষ্টা দেখবে, এ বিষয়ে একটা মীমাংসার জন্যে মনিব্যাগটার ভিতরের খবর শুধিয়ে দেখছে, এমন সময় পিছন থেকে কে ডাকলে, "হরেন দা!"

হরেন চমকে উঠল, ফিরে দেখলে অরুণ।

"অরুণ!"

"হ্যাঁ হরেন দা', দিদিকে খুঁজছি,—তাকে তুমি এদিকে দ্যাখনি?"

"কেন? সে বাড়ীতে নেই?"

অরুণ মুখ ফ্যাকাশে ক'রে বললে, "না, বাবা তাকে বার ক'রে দিয়েছেন; আমাদের কাউকে, তাকে খুঁজতে পর্য্যন্ত যেতে দেননি, তিনি বাড়ী থেকে বেরুলে তবে বেরুতে পারলুম।—কিন্তু তাকে খুঁজে তো কোথাও পাচ্ছি নি। যাবার সময় বাবা দিদিকে বলেছিলেন "চুলোয় যা"—দিদি বড় অভিমানী—সে কি সত্যি সত্যিই—" অরুণ আর বলতে পারলে না, তার চোখ ছলছল্ ক'রে উঠল, সে মুখ ফিরিয়ে নিলে।

হরেন রাস্তার মাঝখানে ধুলোর উপর বসে পড়ল, সে যেন সমস্ত ভাবনার সূত্র হারিয়ে ফেলেছে, কিছু বুঝতে পারছে না, কেবল ফ্যাল্ফেলে তাকানি অরুণের মুখের উপর সমবেদনার প্রলেপ বুলিয়ে দেবার ব্যর্থ চেষ্টা করছে।

খানিকক্ষণ স্তব্ধ থেকে অরুণ নিজেকে একটু সাম্‌লে নিয়ে বল্‌লে, "পাড়ার কারো-বাড়ী যাবেনা, তাই কারো বাড়ী খোঁজ করিনি, তবে খিড়কীর বাগান, পঞ্চানন তলা, ঝোপ-ঝাড় জঙ্গল সমস্ত উট্‌কে পাট্‌কে দেখেছি, কোথাও নেই।"

হরেন বল্লে, "বিনা দোষে কি শাস্তি, দ্যাখো।" ব'লেই আবার ভাবনার অতলে যেন তলিয়ে গেল। মিনিটখানেক পরে ব'লে উঠল, "ষ্টেশনের দিকে যায় নি তো ?— চল, ষ্টেশনের দিকটা একবার খুঁজে দ্যাখা দরকার।"

"ষ্টেশনের দিকে বাবা এইমাত্র গেলেন, আমি যাব না, আমায় দেখ্‌লে রেগে উঠবেন।"

হরেন বল্লে, "কেন? ষ্টেশনে কেন ?"

"ষ্টেশনে ঠিক নয়, রেল-লাইনের ওপারে, কে একজন যজমান নাকি মরণাপন্ন। তার অঙ্গ-প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তে হবে, তাই ডেকে নিয়ে গেল।—আমি ওদিকে যাব না,—তোমারও ওদিকে যাওয়া—"এই পর্য্যন্ত ব'লেই অরুণ থেমে গেল।

হরেন ভুরু কুঁচ্‌কে কি-যেন ভেবে নিয়ে বল্লে, "আমার জন্যে ভাব্‌তে হবে না, তুই চল্। আর তিনি তো সেখানে দাঁড়িয়ে নেই, তোরই বা ভয় কি ?"

অরুণের পা-দু'টো যেন ইতস্ততঃ কর্‌তে কর্‌তে হরেনের পিছন পিছন চল্‌তে লাগ্‌ল। খানিক দূরে গিয়ে হরেনকে সম্বোধন ক'রে সে বল্‌লে, "হরেন দা', তোমার খাওয়া দাওয়া হয়নি বোধ হয় ?"

"না—তুই ?—তোরা খেইছিস্ ?"

"উহু, আমরা কেউই খাইনি, দিদি মুখের গ্রাস্ ফেলে চলে গেল,—তাই মা সমস্ত অঘটন-ঘটনকারী লোককে ধ'রে দিয়েছেন।"

"তাহ'তো অরুণ,—আমার জন্যে ভাবিনি,— তুই ছেলেমানুষ সমস্ত দিন খাস্‌নি— চল্, হাট থেকে কিছু খেয়ে নিবি চল্। আজ হাট-বার, ফল-টল, খাবার-টাবার সব টাট্‌কা।"

"আর তুমি ?"

"সে হবে এখন—ষ্টেশন থেকে এসে" এই ব'লে দু'জনে আবার নীরবে চল্‌তে লাগ্‌ল।

হরেন আর অরুণ ষ্টেশনের পথে যেতে হাটের কাছে যখন পৌঁছল তখন সন্ধ্যা হ'য়ে গেছে। এক জায়গায় জনকয়েক লোক তাড়ি খেয়ে খুব মাদল পিটছে, তার মধ্যে একজন পেশাকরদের মতন ফেরুতা দিয়ে কাপড় প'রে গোঁফ দাড়ির উপর আড়-ঘোমটা টেনে অঙ্গভঙ্গী সহকারে গান ধরেছে :—

"খুব হ'ল নাচন্ দাদি !
বাবুরা হুকুম দিলে, লেগে গেল
নাচ-গানের গাঁদি।
(আমায়) নাচ্‌তে ব'লে সবাই মিলে
কর্‌লে সাধাসাধি।
(তাই) নেচে নেচে ধর্‌ল মাজা
(এখন) নাচ্‌তে বল্‌লে কাঁদি।"

মাতালের ভিড় দেখে হরেন অরুণকে দাঁড়াতে মানা কর্‌লে। তাড়ির গন্ধ নাকে যাওয়ায়, দুজনেই ক্রমাগত থুথু ফেল্‌তে ফেল্‌তে এগিয়ে চল্‌ল। মাঝে মাঝে ম্যাজিষ্ট্রেটের শুভাগমনের জন্যে নারকোল পাতার তোরণ তৈরী হ'চ্ছে, কলাগাছের কবন্ধের উপর আলোর ব্যবস্থা হচ্ছে। হরেনের লোককে

খেয়াল নেই, সে অরুণকে কিছু খাইয়ে নেবার জন্যে টাটকা ফলের সন্ধানে চোখদুটো বিস্ফারিত ক'রে চলেছে।

খানিকদূর এগিয়ে দেখ্‌লে, আবার ভিড়। এবার একেবারে লোকারণ্য, ভাঙা হাটে হঠাৎ এমনধারা লোক-সমাগম কেন, তা জান্‌বার জন্যে, ছেলেমানুষ অরুণ আবার ভিড়ের ভিতর সেঁধিয়ে পড়ল, পিছনে পিছনে হরেনও ঢুক্‌ল। ভিড় ঠেলে একটুখানি এগিয়েই দেখ্‌লে, কপালে ফেট্টি-বাঁধা একজন স্ত্রীলোক কাঁদ্‌ছে আর গালাগালি দিচ্ছে।

"চ'লে আয় অরুণ, কি দেখ্‌বি" ব'লে হরেন অরুণকে নিয়ে বেরিয়ে আস্‌বে, এমন সময় শুন্‌তে পেলে মাতালের গলায় কে বল্‌ছে, "খবর্দার চৌকীদার। বাগ্‌দী হ'য়ে বামুনের গায়ে হাত। হুঁস নে বলছি, খবর্দার। যমের বাড়ী যেতে হবে না ভেবেছিস্‌। বামুনের গায়ে হাত। পাপ-মন্ত্রির ভয় নেই? খবর্দার!"

হরেনের মনে হ'ল চেনা গলা। পর মুহূর্ত্তেই, দেখতে পেলে লোকটা আর কেউ নয়, শশী মুখুয্যে। শশীর গলা শুনেই যে স্ত্রীলোকটী ব'সে ছিল সে কাঁড়োস্‌ সাপের মতন খাড়া হ'য়ে উঠল, এবং কোমরে হাত দিয়ে চেঁচিয়ে ব'লে উঠল, "ওঃ, উনি বামুন, ওঁর শাপের ভয়ে লোকে তো ভরিয়ে গেল!

শাপে বামুন শাপে
আমার নথের ঝুপি কাঁপে,
আমার চোখের ভোঁয়া কাঁপে।
আমার ভুরুর রোঁয়া কাঁপে।

বাঁধ চৌকীদার বাঁধ। ছুঁড়ীকে একেবারে খুন ক'রে ফেলেছে গা!"

'খুন' শুনে হরেন ভিড় ঠেলে বাঘের মতন লাফিয়ে গিয়ে শশীর গলা টিপে ধর্‌লে!

ঝাঁকানি দিতে গিয়ে, হরেন চম্‌কে গেল, লোকটা যেন শোলার মতন হাল্কা, তার রাগের বেগ অর্দ্ধেক ক'মে গেল। ভিড়ের ভিতর একটা অস্ফুট কলরব উঠ্‌ল—"ছোট বাবু!" "ছোট বাবু!"

চৌকীদারকে ধমক দিয়ে এবং শশীকে আর একবার ঝাঁকানি দিয়ে হরেন চেঁচিয়ে বল্‌লে, "তোরা এই অপদার্থটাকে এতগুলো লোকে গ্রেপ্তার কর্‌তে পারছিস্‌ নে? নে, বাঁধ্‌।"

কলরব শুনে যারা পাড়ার গোট বাঁধতে বাঁধ্‌তে হাতাবেড়ি আর কাটারি হাতে মজা দেখ্‌তে এসেছিল, তাদেরি একজন দড়ি জুগিয়ে দিলে। চৌকীদার ছোটবাবুকে দেখে সাহস পেয়ে শশীকে বেশ শক্ত ক'রেই বেঁধে ফেল্‌লে।

হরেন শশীকে চৌকীদারের হাতে সঁপে দিয়ে অরুণকে কি বলবার জন্যে পিছন ফিরতেই শশী অস্ফুট স্বরে ঠোঁট উল্‌টে ব'লে উঠ্‌ল, "হম্‌!—এই যে! বাপের তেজ্যি-পুত্তুর।—তেজ্যিপুত্তুর—না তেজচন্দর!"—কথাগুলো হরেনের কানে পৌঁছবার আগেই সেই আধাবয়সী স্ত্রীলোকটি হাত জোড় ক'রে হরেনের পায়ের কাছে বসে প'ড়ে কাকুতির স্বরে বলতে লাগ্‌ল, "রক্ষা কর ছোটবাবু, রক্ষা কর! এই সর্ব্বনেশে বিট্‌লে বামুন আমার বোনকে খুন ক'রেছে। আমার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। এই ভাখো। তোমরা মনিব, তোমরা ভাখো, তোমাদের জানাচ্ছি, তোমরা বিচার কর।"

হরেন বললে,"খুন ক'রেছে তো শুনছি— তোমার বোন্‌কে ?—লাশ কোথায় ?"

"এই যে দাদা, এইদিকের এই ঘরে দেখে যাও একবার, কি কাণ্ড করেছে !"

হরেন স্ত্রীলোকটির পিছন পিছন যেতে যেতে অরুণকে বললে, "অরুণ, লাশ পুলিশে চালান দেবার আগে তুমি, ভাই, একবার দৌড়ে ডাক্তারবাবুকে খবর দাও।"

অরুণও তাই চাইছিল, সে মৃতদেহ দেখতে নিতান্ত নারাজ। কারণ তার ভূতের ভয় বেশ একটু প্রবল। হরেনের কথায় তার ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে গেল, সে ঊর্দ্ধশ্বাসে ভিন্ন দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

৩১

যে আধাবয়সী স্ত্রীলোকটি লাশ দেখাবার জন্যে হরেনকে ডেকে নিয়ে গেল, সে হচ্ছে মাতির বোন কাতি, অর্থাৎ মাতঙ্গিনীর বোন কাত্যায়নী। এই মাতঙ্গিনীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার জন্যেই হরনাথ মৈত্র একদিন শশী মুখুয্যেকে একঘ'রে করতে চেয়েছিলেন। হরনাথের আন্দোলনের ফলে শশী মুখুয্যের সঙ্গিনী রামী অর্থাৎ কৈবর্ত্তদের মাতঙ্গিনী, জমীদারের কড়া-হুকুমে গ্রাম ছেড়ে হাটতলায় ঘর নিতে বাধ্য হ'য়েছিল।

সঙ্গে সঙ্গে মাতঙ্গিনীর দিদি কাত্যায়নীর মুদিখানার দোকানটিও, স্থান-পরিবর্ত্তনের নোটিশ না দিয়েই হাটতলায় এসে হাজির হ'য়েছিল। কাত্যায়নীর তাতে শাপে বর হ'ল। তিনখানা গাঁয়ের লোক তার খরিদ্দার হ'ল, তা ছাড়া ষ্টেশনের রাস্তার উপর ব'লে ছোট-বড় সবারই পায়ের ধুলো তার দোকানে পড়তে লাগল। আর অনেক যেচে গেল। কিন্তু বাহাদুরীটা নিলে শশী মুখুয্যে। সে বলত তার জন্যেই তো এখানে দোকান হ'ল। নিরীহ কৈবর্ত্তর মেয়েরা শশীর এ-কথায় প্রতিবাদ করত না। কথাটা শুনতে শুনতে তাদের একরকম বিশ্বাসই জন্মে গিয়েছিল। ঠিক কথাই তো, শশীর জন্যেই তো সব, নইলে এমন লোকের জায়গায় দোকান হবে, এ স্বপ্নের অগোচর।

জায়গাটা শশী মুখুয্যের পক্ষে একটু দূর-পাল্লা হ'লেও আনাগোনা বন্ধ হ'ল না।

মাতঙ্গিনী ছিল কর্ত্তাভজা, শশী ছিল তার ভজনের কর্ত্তা। কর্ত্তার সমস্ত আবদার, সমস্ত উপদ্রব সহ্য ক'রে তার সেবা ক'রে যেতে হয়, এই হ'ল কর্ত্তাভজা ধর্ম্মের মর্ম্ম-কথা। কিন্তু ধর্ম্মের এই সুস্পষ্ট আদেশসত্ত্বেও ইদানীং কিছুদিন থেকে মাতঙ্গিনীর একটু ভাবান্তর উপস্থিত হয়েছিল। সে আর আগেকার মতন তেমন মনের সঙ্গে মুখুয্যের সেবা করতে পারত না। এতে মাতঙ্গিনীকে বিশেষ অপরাধ দেওয়া যায় না। মাস-কতক আগে মাতঙ্গিনী তার কলকেতা-প্রবাসী মরণাপন্ন মাসীর টেলিগ্রাম পেয়ে তার সেবার কলকেতায় যায়। কাত্যায়নী দোকানের লোকসান হবে ব'লে, যেতে পারলে না। তাই ছোটো হ'লেও, দিদি থাকতে মাতঙ্গিনীকেই সেই শশীর সেবা ছেড়ে মাসীর কন্না করতে যেতে হ'ল।

সেখানে চূড়ামণি-যোগে স্নান ক'রে এবং মাসীর ৺হাসপাতাল-প্রাপ্তির পর, উত্তরাধিকার-সূত্রে, তার সোনার দানা, সোনার তাগা, রূপোর চাবি-শিকলি, থান-ছয়-সাত

গিনি, ও শ'-দেড়েক নগদ টাকা অকলঙ্ক ক'রে মাতঙ্গিনী গাঁয়ে ফেরে।

ফিরে এসে মাতঙ্গিনী শশীকে যেদিন প্রথম তার ধন-দৌলৎ দেখালে, সেইদিন থেকেই শশী জিনিসগুলি হস্তগত করবার জন্যে টোপ ফেল্‌তে সুরু করলে। শেষে অনেক জপিয়ে, সুদে খাটিয়ে টাকা বাড়িয়ে দেবার নাম ক'রে জিনিসগুলি বিক্রী ক'রে, সেই টাকায় শশী নিজের নামে বিঘে-কতক জমী, যোগেন মিস্ত্রিদের একজন দেনদার প্রজার কাছ থেকে দাও-মাফিক বাগিয়ে নিলে। কিন্তু মাতঙ্গিনীকে এ-সব কথা ঘুণাক্ষরেও জান্‌তে দিলে না। সে বেচারা সুদের জন্যে শশীকে তাগিদ দিলে, শশী তাকে সুদের সুদ আদায় ক'রে দেবে ব'লে স্তোক দিত। কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত।

এ বিষয়টার একটা হেস্তনেস্ত ক'রে ফেল্‌বার জন্যে মাতি আর কাত্তিতে অনেক যুক্তি পরামর্শ হ'য়েছে, কিন্তু সে শেয়ালের যুক্তি। শশীর কাছ থেকে একটা খোলসা জবাব নেবার জন্যে অনেকবার মৎলব আঁটা হয়েছে; কিন্তু ম্যাও ধরে কে? শশীর মুখের কাছে এগোয় কে? জমীদারী-সেরেস্তার লোক, কলমের আঁচড়ে হয়-কে নয় করতে পারে, ওকে ঘাঁটিয়ে লাভের চেয়ে লোক্‌সানের সম্ভাবনাই বেশী। এই-সব সাত-পাঁচ ভেবে কথাটা ধামা-চাপাই থেকে যেত। তা' ছাড়া কাত্তি বল্‌ত, "মাসী ভালোবেসে তোকে সর্ব্বস্ব দিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু কপালে না থাক্‌লে ভোগে হয় না। সবই কপাল। আমায় কেউ কিছুই দায়নি, তবু যা হোক্, দোকানের দৌলতে, ভাতের পাতে নিত্যি মাছের মুড়ো, দুধের বাটি না জুটুক, দু'বেলা দু'মুটো জুট্‌ছে তো।"

এতে মাতি আরো চ'টে যেত, সে ঠেস্-দেওয়া কথা মোটেই সইতে পারত না। হয় দু'জনে ঝগড়া বেধে যেত, নয় তো মুখ অন্ধকার ক'রে মাতি দুম্‌দুম্ শব্দে নিজের ঘরে গিয়ে খিল্ এঁটে দিত। আজও অম্‌নি বোনের সঙ্গে শশীকে টাকা তাগিদ দেওয়ার কথা নিয়ে খিটিমিটি ক'রে, মাতঙ্গিনী নিজের ঘরে ঢুকে যেমন কপাট দিয়েছে, অম্‌নি শশী এসে দরজায় ধাক্কা দিলে।

মাতঙ্গিনী ধড়াস্ ক'রে খিলটা খুলে দিয়েই মুখ ফিরিয়ে, হারিকেনের সাম্‌নে সুপুরি কাট্‌তে বস্‌ল।

মাতঙ্গিনীর গড়নটি বেঁটে, চেহারাটি একটি বিপুল কচ্ছপের মতন। তার ধড়খানা একটা প্রকাণ্ড কচ্ছপ, মুখখানি মাঝারি কচ্ছপ; ফুলো-ফুলো হাত-পাগুলি বাচ্ছা কচ্ছপ। নামে আর রূপে মিলিয়ে একেবারে গজ-কচ্ছপী ব্যাপার। তার কানে গোটা-আষ্টেক রিং-মাকড়ী, নাকে লঙ্গফুলী নাক-ছাবি। গলায় তুলসীর কণ্ঠী, মাঝে মাঝে মুড়কীর সাইজের সোনার মাদুলি। নীচে-হাতে সবুজ কাঁচের রেশ্‌মী চুড়ি, তার সঙ্গে সরু রূপোর আটগাছা ক'রে বোলোগাছা গোখ্‌রি। উপর-হাতে তারকনাথের তাগা, তাতে গুটি-দুই পলা, গুটিচারেক মাদুলি, একটা নিমুখোর কল, আর-একটা পঞ্চমুখী রুদ্রাক্ষ। তাগার ময়লা সুতোটা আধহাত লম্বা হ'য়ে ঝুলছে।

ঘরে আস্‌বাবের মধ্যে কেওড়া কাঠের তক্তপোষ। একখানা জল-চৌকি, একটি

কড়ি-বাঁধা কলি হুঁকো, লাট্টুর মতন বিচিত্র রঙের একটি আল্না, তাতে পাঁচপেড়ে, তিনপেড়ে, হাতীপেড়ে, মাছপেড়ে, ফুলপেড়ে শাড়ীর সঙ্গে বেগ্নী রঙের একখানা খেজুর-ছড়ি কাপড়, আট-পাটি দাঁত মেলিয়ে যেন হাস্ছে। দেয়ালে খানকয়েক ফ্রেমে-বাঁধানো কালীঘাটের পট। একটাতে কালীয়-দমন, একটাতে গোপীদের বস্ত্রহরণ। একখানাতে ছুঁচোর কীর্ত্তন, তাতে একটা লোক লম্বা কোঁচা ঝুলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তার পিছনে গোটা-পাঁচেক ছুঁচো পিছনের পায়ে ভর দিয়ে গম্ভীর ভাবে খোল-কর্ত্তাল বাজিয়ে কীর্ত্তন সুরু করেছে। আর একখানায়, মালিনী ফুল শুঁকিয়ে একটি বাবু-রকমের মানুষকে ভেড়া বানাচ্ছে। যে বাবুটিকে ভেড়া করা হচ্ছে তার মুণ্ডুটি এখনো মানুষের মতোই আছে, বাঁকা সিঁথের দুইপাশে চোম্রানো গোঁফ-জোড়াকে টেক্কা দিয়ে দিব্বি একজোড়া শিং জাগা দিয়েছে। বাবুর দেহটি কিন্তু এক-জোড়া শাল হবার উপযুক্ত ঘন পশমে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে।

শশী যখন মাতঙ্গিনীর ঘরে ঢুকল, তখন সন্ধ্যা। হরনাথ মৈত্রের খিড়্কীর বাগান থেকে ফিরে এসে পর্য্যন্ত তার মনটা কেমন যেন একটা অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে আন্চান্ করছিল। সে মনে করেছিল কমলা ডুবেছে। এতে তার খুসী হবার কথা, কারণ, কমলা হরনাথের মেয়ে, হরনাথ শশীকে একঘরে করতে চেয়েছিল। কমলার মৃত্যুতে শশীর সেই অপমানের প্রতিশোধ। শশী মনে করছিল, শশী খুসীই হয়েছে; যা' একটু অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল তা' বোধ হয় খুসী জানাবার দোসর পাচ্ছিল না বলেই। সে অনেক আগেই মাতঙ্গিনীর কাছে আনন্দ জ্ঞাপন করতে আস্ত, কিন্তু যোগেন মিস্ত্রির হোঁৎকা ছেলেটা দরজায় ধর্না দিয়ে তাকে হক্-নাহক্ দেরী করিয়ে দিলে। হরেন চ'লে যেতেই শশী গলি-রাস্তায় লোকের আনাচ-কানাচ দিয়ে মাতঙ্গিনীর বাড়ী এসে হাজির হ'ল এবং ঘরে ঢুকেই উড়ুনি-জড়ানো সাজান পরী বেগম ওরফে ধান্যেশ্বরীর বোতলটি বার ক'রে চুকচুকু সুরু ক'রে দিলে।

তিন চার পাত্র পেটে পড়েও যখন নেশা জম্ল না, তখন শশী মাতঙ্গিনীকে একপাত্র প্রসাদ দিয়ে তরিবৎ ক'রে গাঁজা সাজ্তে বল্ল। মাতঙ্গিনীর মন ভালো ছিল না, সে শশীর দিকে পিছন ক'রে পাত্র উপুড় ক'রে সমস্ত প্রসাদটুকু ডাবরে ঢেলে দিলে।

শশী ততক্ষণে কল্কের সাপি জড়িয়ে, ক'সে গুটি-তিনেক দম লাগিয়ে, কল্কে উপুড় ক'রে দিয়ে আপনার খেয়ালে হাস্তে সুরু ক'রে দিয়েছে।

মাতঙ্গিনী মুখ ঘুরিয়ে শশীর আপাদ-মস্তক একবার তীব্র দৃষ্টিতে দেখে নিয়ে বল্লে, "মরণ আর কি, শুধু শুধু হেসে মরা হচ্ছে কেন?"

শশী চোখদুটো শিবনেত্র ক'রে সমস্ত শরীরটা ঈষৎ দুলিয়ে বল্লে, "খুসী হ'লেই হাসি, হাসি হ'লেই খুসী, হাসি-খুসী, হাসিখুসী।"

মাতঙ্গিনী বল্লে, "হাসিখুসী যে খুব দেখ্ছি,—এখন টাকাটার কি হ'ল বল দেখি?"

শশী বললে, "আরে টাকা কি বলছিস্—এমন খবর তোকে দিতে পারি—যার দাম লাখ টাকা,—টাকার কথা কি বলছিস্?—আজ কি হ'য়েছে তা জানিস্?... জানিস্ নি; তবে শোন্—সেই খোলা-কাটা নরেন্দ্র ব্যাটার মেয়ে...কমলি রে কমলি...ডুবে মরেছে;...তিনকুলে কেউ জায়গা দিলে না...শাশুড়ী না—মা-বাপ না,—যাবে কোথায়—পুকুর-জলে ডুবে মরেছে—আমি স্বচক্ষে এই দেখে আসছি।"

যদিচ শশী কমলাকে ডুবতে ছাখেনি, তবু সে জোর-গলায় বললে, "স্বচক্ষে দেখেছি"। শশীর মতন যারা পাকা খেলোয়াড় লোক, তারা নিজের চালের ও নিজের বুদ্ধির উপর অগাধ বিশ্বাস রাখে এবং নিজেদের একরকম দিব্য দৃষ্টি-সম্পন্ন ব'লেই মনে করে। আত্ম-অবিশ্বাস এদের কুষ্টিতে লেখেনি। এ বিষয়ে শশী শয়তান, শকুনি, কাইজার, কালনেমি, ক্লাইভ, কোটিল্য, হেষ্টিংস্, চিত্তেনবাগের ভায়রা-ভাই বা মাসতুতো ভাই। মনের মতন কল্পনাকে সে কলে-কৌশলে অনেকবার ফলিয়ে তুলতে পেরেছে ব'লেই, সে ঠিক ক'রে রেখেছে, তার যা মনের মতন তা ফলবেই। সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল, কমলা মরেছে, নির্ঘাৎ মরেছে, ডুবে ম'রে ভেসে উঠেছে। তাই সে বললে "আমি স্বচক্ষে দেখেছি।"

মাতঙ্গিনী চোখ কপালে তুলে খানিকক্ষণ হাঁ ক'রে থেকে ব'লে উঠল, "বল কি মুখুয্যে! ছুঁড়ি ডুবে মরেছে?"

"হুঁ, ডুবে মরেছে—আত্মহত্যা করেছে—পেত্নী হবে—ফের টাকার তাগাদা করিচিস্ কি তোর ঘাড় ভাঙবে!—হুঁ হুঁ, বামুনের কথা মিথ্যে হয় না!"

মাতঙ্গিনী চ'টে উঠে বললে, "ঘাড় আমার ভাঙবে না তোমার ভাঙবে?—তুমিই তো বামুনের মেয়ের নামে—হয়-না-হয় বদনাম দিয়ে এই কাণ্ড ঘটালে!—আহাহা!—ছুঁড়ি বেঘোরে মারা গেল গা—ইস্তিরি হত্যে— ব্রহ্ম হত্যে—ছিঃ!"

শশী ভাবছা ভাবে একটা কটাক্ষ হেনে বললে, "শান্ত। তুই মাতাল হইচিস্!"

মাতঙ্গিনী ঝঙ্কার দিয়ে বললে,"মুখে আগুন মাতালের,—তোমার মদ ঐ ডাবরে—ইচ্ছে হয় শুঁকে ছাখো;—ছিছি!—এত অনাচার ধর্ম্মে সইবে না—ছিঃ!—মানুষকে খানে-খারাপ করা—ছিঃ—ছিঃ, বামুনের মস্তির ভয় নেই—"

শশী ক্রমশঃ তেতে উঠছিল, সে তার খোলা চোখ টাকে বিকট রকম ঘুরিয়ে এবং মুখ বেঁকিয়ে বিদ্রূপের স্বরে বললে—"বামুন—হঃ! বামুন খোলা কাটা বামুন—ভারি বামুন—আমার কাছে আবার বামুন কোন্ ব্যাটা? কুলের মুখুটি নসী মুখুয্যের নাতি শশী মুখুয্যে, আমায় কিনা ব্যাটা বলে একঘরে করবে? ব্যাটা পিণ্ডিখোর পুরুৎ—এত-বড় আস্পর্দ্ধা পুরুৎ বামুনের?—বামনাই ফলায় আমার কাছে? এখন সামলাও ঠেলা!"

মাতি মনে মনে তার মা-গোঁসাইকে নমস্কার ক'রে স্বগত বললে, "অপরাধ মাপ কোরো মা-গোঁসাই, আমি এ নচ্ছারের ওপর আর ভক্তি-শ্রদ্ধা রাখতে পারলুম না। এতে আমার যা পাপ হয় তা' হবে।" প্রকাশ্যে বললে, "যাও, যাও, আর বড়াই করতে হবে না।

উচিত কথা বল্‌ব; তাতে বন্ধু বেগ্‌ড়ান, বেগ্‌ড়াবেন। বলে—

'অশেষ পাপের পাপী পঞ্চম পাতকী
তাহার অধিক পাপী বিশ্বাসঘাতকী'

তুমি আবার বামুন, তুমি মহাপাপী। যে মানুষ ইহকাল-পরকাল খুইয়ে অ্যাদ্দিন ধ'রে তোমার ঠাকুর-সেবা কর্‌লে, তার সর্ব্বস্ব সুদের লোভ দেখিয়ে ফুস্‌লে বার ক'রে নিয়ে ফাঁকি দিলে, মেয়েমানুষের টাকা হজম কর্‌লে; তারপর আর এক ভালো-মানুষের মেয়ের নামে মিছি-মিছি বদ্‌নাম দিয়ে তার একাল-আখের খেয়ে দিলে, তার আবার বাম্‌নাই?—মুখে আগুন তার;—গলায় দড়ি, সে আবার মানুষ?"

শশী বল্‌লে, "ভাখ্‌, মাতি, রাগাস্‌ নি বলছি,—আমি মিছিমিছি বদনাম দিইছি? স্বচক্ষে দেখিছি।"

মাতি বল্‌লে, "মরণ আর কি, বলে

'জেনে শুনে মিথ্যে বলে,
তার দোলা নরকে দোলে'!'—

মিছে ক'রে বদনাম দাওনি কম্‌লির নামে? মাসীর অসুখের সময় কল্‌কেতায় সোহাগ ক'রে চিঠি লেখা হয়েছিল যে—তাতে কি লিখেছিলে মনে নেই?—দাওনি মিছি-মিছি বদ্‌নাম?—নও মিথ্যেবাদী?"

শশী মুখুয্যে রাগে গিরগিটির মতন মাথা ক'রে গরগর্‌ কর্‌তে লাগ্‌ল।

মাতি বল্‌লে, "কি, গিরগিটির মতন খাড়া হ'য়ে উঠছ কেন? চোখদুটো খুব্‌লে নেবে নাকি?"

চোখ খোব্‌লানোর কথায় কাণা-শশীর তেঁা ক'রে মাথা ঘুরে গেল। ধাঁ ক'রে একটা চড় বসিয়ে দিয়ে সে কর্কশ কণ্ঠে ব'লে উঠল, "তবে রে পাজী, ছোটলোক, ক্যাওট, বড়-বড় মুখ, বড়-বড় কথা!—আমি গিরগিটি?"

"খবর্দ্দার বামুন, বেরিয়ে যা' ঘর থেকে, গায়ে হাত তোল্‌বার তুই কে?—সর্ব্বস্ব হজম ক'রে—এখন 'ক্যাওট—ক্যাওটের ভাত মেরে এখন ক্যাওট—বলে 'ভাত-কাপড়ের খোঁজ নেইক, নাক কাটবার ঠাকুর!' দূর হ'য়ে যা ঘর থেকে!"

"ভাখ্‌, মাতি তুই বড় বাড়িয়েছিস্‌; জমীদার চাল কেটে দেশ-ছাড়া ক'রে দিচ্ছিল, আমি যার ব'লে ক'রে হাটতলায় জায়গা দেওয়ালুম, তাই মাথা গুঁজে থাক্‌তে পেইছিস্‌।—আমার উপর ট্যাক্‌ ট্যাক্‌?—সবুর কর্‌—মাথায় ঘোল ঢেলে দেশ-ছাড়া কর্‌ছি—সবুর কর্‌।—বল্‌ছি জমীদারকে—বড় বাড় বেড়েছিস্‌।"

ঘোল-ঢালার কথায় মাতি তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠ্‌ল, সে বল্‌লে, "জমীদার?—যা'না জমীদারের কাছে,—আমিও সেখানে যেতে জানি,—যাব—বল্‌ব—সব ফাঁস ক'রে দেব—তার ব্যাটার নামে মিথ্যে বদ্‌নাম দিয়ে তাকে তেজ্যিপুত্তুর করিয়েচিস্‌—সব বল্‌ব—অন্দরের ভিতর গিয়ে গিন্নিঠাকরুণকে বল্‌ব।—আমায় তুই চিনিস্‌ নি।"

"যা, যা; যা'না, কস্‌বীর কথায় কে বিশ্বাস করবে? হেঃ, যা'না, গিয়ে একবার মজাটা ভাখ্‌ না।"

মাতঙ্গিনীর রোখ চেপে গিয়েছিল, সে বল্‌লে, "বিশ্বাস করে কি না করে, সে আমি বুঝব,—কল্‌কেতার দরুণ সেই চিঠি নিয়ে যাব, গিয়ে গিন্নি-ঠাকরুণকে দেব,—বাবুদের ভাখাব,—সে চিঠি আমি ফেলিনি—কোনো

কাগজ আমি ফেলি নি—সব আছে—তা জানিস্।"

হঠাৎ নরম হ'য়ে শশী বল্লে, "মাতি, রাগ কর্লি ?"

মাতি বল্লে, "রেখে দে তোর সোহাগ, কাতির বোন্ মাতি তোর শুক্নো আদরে আর ভুল্ছে না।"

শশী বল্লে, "সে চিঠিটা কোথায় রেখেছিস্ দেখা না।"

"ইস্!—কেন?…না দেখাব না; কি কর্বি তুই বামুন,—তোর বিষ-দাঁত আমি ভাঙ্ব,—আমার বুক-ভরা সোনা হজম করেছিস্—আমার সর্ব্বস্ব খেয়েছিস্—সব বল্ব —জোচ্চোর—বাটপাড়—বেইমান বামুন!"

শশী রাগে ফুলতে ফুলতে বল্লে, "দিবি নি?"

মাতঙ্গিনী মুখ ঘুরিয়ে বল্লে, "না দেব না।"

"দিবি নি?"

"না।"

"দিবি নি?"

মাতঙ্গিনীর জিদ্ বেড়ে গেল, সে বারবার তিনবার বল্লে "না।" মদে গাঁজায় শশীর মগজ একেই ভয়ঙ্কর তেতেছিল, তার উপর মাতঙ্গিনীর এই-সব কাটা কাটা কথায় ও চাকরী যাবার ভাবী সম্ভাবনায় সে একেবারে আগুন হ'য়ে উঠ্ল। চালাকি ক'রে, সময় মত চিঠিটা বার ক'রে নেবার তার আর তর্ সইল না। ক্ষিপ্ত শশী হঠাৎ গোঁয়ারের মত মাতঙ্গিনীকে একেবারে চিৎ ক'রে ফেলে, তার বুকের উপর দুই হাঁটু দিয়ে জেঁকে ব'সে গলাটা সজোরে টিপে দমক দিতে লাগ্ল। মাতঙ্গিনীর আর্ত্তনাদে ও গোঁ গোঁ শব্দে কাত্যায়নী দোকান ছেড়ে যখন মাতঙ্গিনীর দরজা ঠেলে ঘরে ঢুক্ল, তখন মাতঙ্গিনীর দম-বন্ধ হ'য়ে গেছে।

"ছাড়্, ছাড়্, খুন কর্লে হতভাগা, খুন কর্লে" ব'লে কাত্যায়নী চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করছে দেখে শশী মাতঙ্গিনীকে ছেড়ে বোতল ছুঁড়ে কাত্যায়নীকে ঘায়েল করে। কাত্যায়নী ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে চেঁচিয়ে, গাল দিয়ে কেঁদে সরগরম ক'রে তুল্লে। শশী এই সুযোগে স'রে পড়্ছিল, কিন্তু একে হাট-বার তায় ম্যাজিষ্ট্রেটের অভ্যর্থনার জন্যে হাটবাট দোকান-পাট সাজানো হচ্ছে দেখে, অনেক হাটুরে ও নিষ্কর্ম্মা লোক সন্ধ্যা হ'য়ে গেলেও জটলা ক'রে হাকিম দর্শনের অপেক্ষায় ছিল। জন-দুই চৌকীদারও পুলিশের তরফ থেকে সাজানোর কাজ তদারক করছিল, কাজেই শশীর মনের ইচ্ছা মনেই রয়ে গেল। সে জমীদার-সরকারের লোক ব'লেও রেহাই পেলে না। ধর্ম্মের কল নেহাৎ বাতাসেই নড়ে গেল।

৩৩

যে গাড়ীতে ম্যাজিষ্ট্রেটের কালীগ্রামে আসবার কথা ছিল, সে গাড়ীতে তিনি আসেন্ নি। যোগেন মল্লিক ষ্টেশনে গিয়ে দেখ্লেন, তার বদলে তাঁর নামে এক তার এসে হাজির। তাতে যা' লেখা আছে তার মর্ম্ম হচ্ছে এই যে, হঠাৎ অসুস্থ হওয়ায় সাহেবের 'গ্রাম পরিদর্শনে' আসা হ'ল না, সেজন্যে তিনি দুঃখিত। তবে আশা করেন, যে, দু'চার দিনের মধ্যেই তিনি সেরে উঠ্বেন এবং কালীগ্রামে পায়ের ধুলো দেবেন।

সমস্ত আয়োজন পণ্ড হওয়ায় এবং খরচ ফোকর হবার সম্ভাবনায় যোগেন মিস্তির মনে মনে হুজুরমতন বিরক্ত হ'য়ে, হাতীটা ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হুকুম দিয়ে স্বয়ং টম্ টম্ হাঁকিয়ে আগেই গাঁয়ের দিকে রওনা হ'লেন। খানিকদূর গিয়ে চাঁদের আলোয় হঠাৎ মৈত্র-মশাইকে দেখে গাড়ী থামালেন।

"প্রাতঃপ্রণাম মৈত্র-মশাই, এত ধাত্রে ?"

"রেলের ওপারে ডোমাই-চণ্ডীতলায় একটু দরকার ছিল,—একজন যজমানের অঙ্গ-প্রায়শ্চিত্তের জন্যে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল, লোকটি অনেকদিন থেকে ভুগ্‌ছিল।—তা গিয়ে শুনলুম, মারা গিয়েচে—তাই ফিরছি।"

যোগেন মিস্তির বল্‌লেন, "আসুন আমার গাড়ীতে।" মৈত্র-মশাই একটু ইতস্ততঃ কর্‌তে কর্‌তে গাড়ীতে উঠে পড়্‌লেন। গাড়ী রশি-খানেক গিয়ে পাকা রাস্তা ছেড়ে গাঁয়ের কাঁচা রাস্তা নিলে। তখনো হাটের ফিরতি দু'একখানি গোরুর গাড়ী, নিদ্রোত্থিত বেতো রুগীর মতন, আর্ত্তনাদ কর্‌তে কর্‌তে, প্রচুর ধুলো উড়িয়ে হোঁচট খেতে খেতে গ্রামান্তরে চলেছে।

যোগেন মিস্তির স্বয়ং গাড়ী হাঁকাচ্ছিলেন, হঠাৎ তাঁর সিগারের তৃষ্ণা প্রবল হওয়ায়, রাশ, চাবুক, সিগার,দেশলাই নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে উঠ্‌লেন, এবং জমীদার হ'য়েও বিধাতা যে কেন তাঁকে চতুর্ভুজ করেন নি, তা বুঝ্‌তে না পেয়ে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে গাড়ী থামালেন। তারপর অনেক রকম কায়দা ক'রে মেঠো হাওয়ার ফুস্ মন্তর থেকে দেশলাইয়ের শিখাটিকে বাঁচিয়ে সিগারটি প্রায় ধরিয়েছেন এমন সময়ে "রাখো! রাখো!" শব্দে তাঁর চমক ভাঙ্‌ল। সাম্‌নে, দেখ্‌লেন ডাক্তারের পাল্‌কী। ডাক্তার বাবু পাল্‌কী থেকে নেবে প'ড়েই একেবারে টম্‌টমের কাছে হাজির হ'লেন। সিগারটা দাঁতে চেপে রাশ-চাবুক একসঙ্গে নাক বরাবর উঁচিয়ে যোগেন মিস্তির বল্‌লেন, "প্রাটঃপ্রণাম, ডাক্‌টার বাবু যে।" (দন্ত-পাটির ফাঁকে কলের মধ্যে সিগার থাকলে তবর্গ স্থানে টবর্গ হয়,—ইতি তাম্রকূট কৌমুদী।)

ডাক্তার বাবুটি কালীগ্রামে নতুন এসেছেন, ওঁরা ব্রাহ্মণ, তাই বয়সে যোগেন মিস্তিরের চেয়ে ঢের ছোট হ'লেও কায়স্থ জমীদারের প্রাতঃপ্রণামের জবাবে তিনি ঠিক আশীর্ব্বাদ করলেন কি 'বক' দেখালেন, তা' স্পষ্ট রকম বোঝা গেল না। যজ্ঞি বাড়ীতে খাওয়ার পর লোকের ঠেলাঠেলিতে এঁটো হাতের উপর গায়ের শাল খ'সে পড়বার সম্ভাবনা হ'লে হাতের যে অপরূপ ভঙ্গী হয়, ডাক্তার বাবুর হাতের ভঙ্গীও দেখতে অনেকটা সেই রকমই দাঁড়াল। চক্রাকার মুখখানিতে অহেতুকী-প্রফুল্লতার খাজার ভাঁজ যেন কায়েম হ'য়ে থাক্‌বার জো হ'ল। তিনি বল্লেন, "একবার ডোমাই-চণ্ডীতলায় যেতে হবে, একটি রুগী আছে।"

যোগেন মিস্তির বল্লেন, "সে আর কষ্ট ক'রে কেন যাবেন, তাঁর হ'য়ে গেছে। এই যে মৈত্র মশায় সেখান থেকে আসছেন।"

মৈত্র-মশায় বল্লেন, "ডোমাই-চণ্ডীতলার চৌধুরীদের ন'কর্ত্তা তো—তাঁর হ'য়ে গেছে।"

ডাক্তারের চাঁদসই খাজার মতন মুখখানি হঠাৎ বেগুন-পোড়ার মতন লম্বা হ'য়ে ঝুলে

পড়্‌ল। তিনি কিন্তু বে-পরোয়া ভাবে বল্লেন, "যাক্!"

বাড়ীর দিকে ফিরবেন কি চৌধুরীদের দেউড়ি পর্য্যন্ত গিয়ে সহানুভূতি জানিয়ে আসবেন, ঠিক কর্‌তে না পেরে, মিনিট-খানেক ডাক্তার বাবু 'ন যযৌ ন তস্থৌ' অবস্থায় টম্‌টমের ঘোড়ার পুচ্ছ পর্য্যবেক্ষণ করলেন। হঠাৎ ডাক্তারের মগজের ভিতর তৃতীয় পন্থা খুলে গেল। তিনি বলে উঠ্‌লেন, "ভালো কথা, বল্‌তে ভুলেছি, থাজাঞ্চি-খানার শশী মুখুয্যের বড় বিপদ, লোকটা পুলিশের হাঙ্গামায় পড়েছে।"

যোগেন মিত্তির বিস্মিত হয়ে বললেন "কি রকম? সে তো অসুখের নাম ক'রে ছুটি নিয়ে গেছে; আবার আমলা পুলিশের হাতে কি-রকম?"

তখন ডাক্তার ভিজিটের শোক ভুলে পরম প্রগল্‌ভতার সঙ্গে আদ্যোপান্ত সমস্ত বল্‌তে সুরু করলেন।

তিনি যা বল্লেন তার মর্ম্মটা এই রকম;—

চৌধুরীদের ন-কর্ত্তাকে দেখ্‌তে যাবার জন্যে বাড়ী থেকে বেরিয়ে প্রায় হাট-তলার কাছ-বরাবর এসেছেন, এমন সময়, মৈত্র-মশায়ের ছেলে অরুণ হাঁপাতে হাঁপাতে মাঝপথে তাঁকে গ্রেপ্তার ক'রে হঠাৎ একটা জরুরি কেসের নাম ক'রে ডেকে নিয়ে যায়। তিনিও জরুরি কেস শুনে, তার ভিজিটের টাকা কে দেবে, সে কথা না ভেবে'চিন্তে, ডাক্তারের যা' কর্ত্তব্য তাই করেন। সেখানে যাকে দেখ্‌বার জন্যে তিনি গিয়েছিলেন, সে একজন স্ত্রীলোক। প্রথমে তাকে মৃত ব'লেই মনে হয়েছিল, কিন্তু, পরে অনেক ধস্তাধস্তি ক'রে তার চৈতন্য-সম্পাদন করা হয়।

আরেকটি স্ত্রীলোক, বোধ হচ্ছে তার বোন হবে,—সে বললে যে শশী মুখুয্যে, মাতাল অবস্থায় বোতল মেরে তার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। এর আঘাত তেমন মারাত্মক নয়। প্রথমোক্ত স্ত্রীলোকটিকে ঐ-রকম মাতাল অবস্থাতেই গলা টিপে মেরে ফেলছে দেখে সে ধরতে গিয়েছিল, এই তার অপরাধ। ডাক্তার বাবু দারোগাকে খবর পাঠান, তিনি এসে দু'জন স্ত্রীলোকেরই এজেহার লিখে নিয়েছেন। ডাক্তার বাবু এ সব ব্যাপারের বিন্দু-বিসর্গও জানতেন না; কারণ ঘটনার সময়ে তিনি কালিগ্রামে কপাগ্রহণই করেন নি। এজেহারে যা' শুনেছেন তাই বলছেন। সুতরাং মৈত্র-মশাই যেন কিছু মনে না করেন। এজেহারে প্রকাশ,শশী মুখুয্যের সঙ্গে প্রথমোক্ত স্ত্রীলোকটির প্রসক্তি ছিল এই কথাটা ক্রমশঃ রাষ্ট্র হ'য়ে যাওয়ায় মৈত্র-মশাই নাকি শশীকে একঘ'রে করবার চেষ্টা করেন। শশীর রাগ ছিল। তাই মৈত্র-মশায়ের মেয়ে যখন কলকেতায় হারিয়ে যায়, তখন মৈত্রকে জব্দ করবার জন্যে শশী একটা মিথ্যা-কলঙ্ক রটিয়ে দায়। আজ নাকি সেই সব কথা নিয়ে দুজনে কি বচসা হয়। স্ত্রীলোকটি শশীর এই সমস্ত কীর্ত্তির কথা ফাঁস ক'রে দেবে বলে। তাই নেশার ঝোঁকে রাগের মাথায় শশী তার গলা টিপে ধরে। স্ত্রীলোকটি বলে, চূড়ামণি-যোগের সময় যখন সে তার মাসীর কাছে কলকেতায় যায়, তখন নাকি শশী তাকে তার এই কীর্ত্তির কথা জানিয়ে এক চিঠি লেখে। মৈত্র-

মশাইকে জব্দ করবার সে যে অদ্ভুত উপায় উদ্ভাবন ক'রেছে তা' সবিস্তারে লেখে। সে চিঠি সে ফেলেই দিত, কিন্তু মাসীর দরুণ টিনের তৈরী গহনার বাক্সটার তলায়,যে কাগজখানা পাতা ছিল,তা মর্চে লেগে ক্ষ'য়ে যাওয়ায় ও হাতের কাছে অন্য কোনো কাগজ না থাকায় সে গহনার বাক্সর তলায় শশীর ঐ চিঠিখানা বি'ছয়ে তার উপর গহনাগুলি রেখে ছিল। সে চিঠিও পাওয়া গেছে।

ডাক্তার বাবুর রিপোর্ট শেষ হ'লে যোগেন মিত্তিরের ভুরু-দুটোর মাঝখানে যে ভ্রুকুটিটা এতক্ষণ কামড়ে বসেছিল, সেটাকে উপরের দিকে ঠেলে কপালময় ছড়িয়ে দিয়ে,তিনি ব'লে উঠ্‌লেন, "হারামজাদার এত বড় আস্পর্দ্ধা, বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা! জেলে পচাব! ব্যাটাকে চাম কেটে দূর ক'রে দেব। তবে আমার নাম যোগেন মিত্তির।—ওঃ এত বড় শয়তান!"

মৈত্র-মশাইএর মুখ লাল, চোখে জল, কপালের শিরাগুলো সমস্ত ফুলে উঠেছে; দুঃখ-সুখের দোটানায় তাঁর ঠোঁটের চেহারা অদ্ভুত হয়ে উঠেছে। তিনি ভাঙা গলায় শুধু বল্লেন "পাষণ্ড", আর কোনো কথা তাঁর মুখ দিয়ে বেরুল না।

যোগেন মিত্তির ডাক্তারকে পিছনে আস্‌তে ব'লে, বেগে টম্‌টম্ হাঁকিয়ে দিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

সমালোচনা

সহজ স্বাস্থ্যরক্ষা—প্রথম ভাগ। ডাক্তার হারাধন বসু, এম-বি প্রণীত। প্রকাশক, এস্., কে, দত্ত, ২৭।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ভারত মিহির প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য চারি আনা মাত্র। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি বালক-বালিকাগণের জন্য রচিত। ইহাতে খুব সহজ ভাষায় স্বাস্থ্যরক্ষাসম্বন্ধে প্রয়োজনীয় প্রায় সকল কথাই মোটামুটি বিবৃত হইয়াছে। স্বাস্থ্যরক্ষার যে সাধারণ নিয়মগুলি লেখক নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা পালন করিতে অর্থব্যয় হইবে না, অথচ সেগুলি বেশ সহজ ও একেবারে বাঙালী গৃহস্থ জনসাধারণের পক্ষে নিতান্তই অমোঘ ধরণের। মেলেরিয়া, কলেরা, প্লেগ, বসন্ত, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা, কৃমি, প্রভৃতি রোগ ও তাহার প্রতিকারের সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনাটুকু বিশেষ উপকারে আসিবে; আলোচ্য বিষয় বুঝিবার সুবিধাকল্পে কয়েকখানি চিত্রও গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থখানি প্রত্যেক বিদ্যালয়ে পাঠ্য-তালিকাভুক্ত হওয়া উচিত।

প্রধীকর্ম্মকার।—বা কর্ম্মার ক্ষত্রিয় Researcher প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীযুক্ত রাধারমণ রায় বর্ম্মণ, ৫।৪ রক্ষিত লেন কলিকাতা। মূল্য কোথাও লিখিত দেখিলাম না। এই গ্রন্থে লেখক শাস্ত্র ও ইতিহাস হইতে প্রমাণ করিয়াছেন, "যাঁহারা লৌহস্বর্ণাদি ধাতু-রত্নঘটিত শিল্প-বিজ্ঞান-কর্ম্মে অলৌকিক গুণকর্ম্মশালী হইতেন, তাঁহাদের 'কর্ম্মার' (অর্থাৎ ধীকর্ম্মা বা প্রধীকর্ম্মকার) এই গৌরবাত্মক উপাধি হইত। পরিশেষে চতুর্ব্বর্ণ সৃষ্টি হইলে সামরিক ও গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র-যন্ত্র-তৈজস-আভরণাদির রচনা-কর্ম্মকুশল এই কর্ম্মার আখ্যা ব্রাহ্মণমণ্ডলী প্রধানতঃ ক্ষত্রিয়বর্ণে স্থান পাইয়াছিলেন। প্রাচীনকালে ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে যেমন অধিকাংশ অসিচালক, যোদ্ধা বা রাজন্য ছিলেন, সেরূপ কতকাংশ অসিকারক স্বর্ণকার কুশিক ছিলেন।" কর্ম্মকার জাতি বর্ণসঙ্কর নহে, ক্ষত্রিয়েরই একটি শাখা বিশেষ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছি। এই জাতীয় আন্দোলনের দিনে বাঙলায় সকল জাতিই যে

ভেদাভেদরাশের মধ্য দিয়া আপনাদিগের লুপ্ত পরিচয় উদ্ধার করিয়া দেখাইতে চাহিতেছেন, যে বিষয়টায় তাঁহাদের দাবী কতটা, ইহা সুলক্ষণ, ভবিষ্যৎ উন্নতির শুভ সূচনা। এ গ্রন্থ শুধু কর্মকার সম্প্রদায় কেন সমস্ত বাঙালীই পাঠ করুন,—পাঠ করিলে এ কথা সকলকে বলিতেই হইবে, আমাদের কেহ তুচ্ছ নয়।

পাশ্চাত্যধর্ম্ম ও বর্ত্তমান সভ্যতা।—শ্রীযুক্ত সুকুমার হালদার প্রণীত। কলিকাতা, বুকল্যান্ড প্রেসে মুদ্রিত। প্রকাশক শ্রীযুক্ত সনৎকুমার হালদার, রাঁচি। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে লেখক ইহাই বুঝাইয়াছেন, "ইউরোপের সভ্যতা কোনো কালেই খ্রীষ্টানধর্ম্মের বিশেষ মুখাপেক্ষী ছিল না, বরং খ্রীষ্টান ধর্ম্মের কাছে অনেক সময়ে গুরুতর বাধা পেয়ে এসেছে। আপাততঃ যে ভাবে ইউরোপে ও আমেরিকায় ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা এগিয়ে চলেছে সেরূপ যদি বেশী দিন চলে, তাহলে প্রচলিত খ্রীষ্টানধর্ম্ম যে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা বলা কঠিন।" এই গ্রন্থপাঠে লেখকের প্রগাঢ় স্বদেশপ্রেম জ্ঞান ও চিন্তাশীলতার প্রচুর পরিচয় পাই। লেখক এই প্রসঙ্গে বার্ণার্ড শ'র যে উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা সকলেরই আলোচনার যোগ্য। সে উক্তিটি এই—

To offer a Hindoo so crude a theology as ours in exchange for his own, or our Jewish canonical literature as an improvement on Hindoo scripture is to offer old lamps for older ones in a market where the oldest lamps like old furniture in England are the most highly valued

হিন্দুনারী।—শ্রীযুক্ত এবনে সুর প্রণীত। প্রকাশক, শেখ মোহম্মদ ইদরিস আলী, কোহিনুর লাইব্রেরী, কলিকাতা। বঙ্গনুর প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য পাঁচ সিকা। এখানি উপন্যাস, ইহার লেখক মুসলমান—অথচ গ্রন্থের নাম 'হিন্দুনারী'—কাজেই অনেকখানি কৌতূহল লইয়াই গ্রন্থখানি পাঠের উদ্যোগ করিয়াছিলাম; তাহার উপর গ্রন্থের মুখপত্রে লেখক সাড়ম্বরে যখন বলিয়াছেন, এ গ্রন্থ তিনি লিখিয়াছেন শুধু হিন্দু-মুসলমানে সৌহার্দ্দ স্থাপনের জন্ত, অপর কোন উদ্দেশ্যে নয়। এ উদ্দেশ্য সত্ত্বেও এই মুখপত্রের শেষের দিকে দেখিলাম, বঙ্কিমচন্দ্রকে লেখক অনর্থক বেশ একহাত লইয়াছেন! তারপর গ্রন্থখানির প্রথম পরিচ্ছেদেই দেখি, শিষ্টাচারের যে একটা স্বাভাবিক নিয়ম সকল সমাজে প্রচলিত আছে, লেখক তাহার মাথায় লগুড়াঘাত করিয়াছেন। তার পর এক মহর্ষির শিষ্যদ্বয়কে আসরে নামাইয়া তাঁহাদের মুখ দিয়া যে ভাষায় যে সকল কথা বলাইয়াছেন, তাহাতে লেখকের রুচি ও সাহিত্যজ্ঞানের যে পরিচয় পাই, তাহা আজিকালিকার দিনে খুলিয়া না বলাই ভালো। লেখক উপন্যাসের ঘটনা স্থাপন করিয়াছেন, হিজরী পঞ্চম শতাব্দীতে আর সেই সময়কার কথায় বলিতেছেন—'সে সময় ভারতের কোন স্থানেই রমণীগণ সতীত্ব-রক্ষা কর্ত্তব্য বলিয়া যে মনে করিত এরূপ মনে হয় না। এমন কি সমাজ, পরিবারেও ব্যভিচারের স্রোত বেশ প্রকাশ্যে প্রবল বেগেই প্রবাহিত হইত। সেকালে নর-নারীগণ পশুবৎ ব্যবহার করিত।' ইত্যাদি। ইহার পর আর এ গ্রন্থ পড়িবার প্রবৃত্তি থাকে না। লেখকের ভাষা ও সাহিত্যজ্ঞানের পরিচয় গোড়ার কয় পৃষ্ঠাতেই যাহা পাই, তাহা একেবারে অপূর্ব! ইতিহাসেও এমনি জ্ঞান যে সাদা চোখে ইতিহাসের পাতা কয়খানা শুধু উল্টাইয়া গেলেও বস্তু এমন বীভৎস দাঁড় করানো কঠিন হয় বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। এই জঘন্য রুচির গ্রন্থ বাহিরে প্রকাশ করিলে সাহিত্যের আদালতে সাজার কোন ব্যবস্থা নাই বটে, কিন্তু রাজদ্বারে এই গ্রন্থ দেখাইয়া এই শ্রেণীর গ্রন্থ-প্রকাশের একটা সীমা এখনও মাপিয়া দেওয়া যাইতে পারে। তবে এই আইন-আদালতের দিনে যে যা-খুসি লিখিয়া চালানো যায় না—এ বোধ যাহার নাই, তাহাকে সুবুদ্ধি বা পরামর্শ দিতে যাওয়া শুধু বাতাসে অসি-প্রহার মাত্র।

ঘর ও পর।—শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। বিশ্ব-ভাণ্ডার, বসন্ত কুটীর, গোন্দলপাড়া চন্দননগর, কলিকাতা সাথী প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা। এখানি সন্দর্ভ পুস্তক। লেখক এই গ্রন্থে ক্ষুদ্রত্বের গণ্ডী কাটাইয়া মানুষকে এক বিরাট মহামানবতায় পরিণত করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। তাঁহার আলোচনা

ইতিহাসের ধারাকে অবলম্বন করিয়া দার্শনিকতা ও সামাজিকতার লক্ষ্য হারায় নাই। সর্ব্বপ্রকার লৌকিক সুবিধার দিক দিয়াও তিনি এই বিশাল সহধর্ম্মিতার যৌক্তিকতা দেখাইতেও ত্রুটি করেন নাই। চিত্তের ও দেহের সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশেই প্রকৃত মনুষ্যত্ব, সেই মনুষ্যত্ব লাভের দিকেই সকলের লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য, তাহাতেই মানুষের উন্নতি ও সুখ—মোটামুটি ইহাই এই সন্দর্ভের প্রতিপাদ্য। এ সন্দর্ভে লেখকের ভাবুকতা ও চিন্তাশীলতার পরিচয় গ্রন্থের সর্ব্বত্রই পাই; সঙ্গে সঙ্গে যে যুক্তি-তর্কের অবতারণা হইয়াছে তাহাও যেমনি নিপুণ তেমনি অকাট্য।

শ্রীভাগবত-মাহাত্ম্যম্।—পণ্ডিত শ্রীমৎপ্রভু গৌরসুন্দর ভাগবত দর্শনাচার্য্যেণ সংশোধিতম্। ভাগবত সেবক শ্রীরাধিকাপ্রসাদ দাস ঘোষেণ সম্পাদিতং। শ্রীযুক্ত প্রমথচরণ দেবশর্ম্মা কর্ত্তৃক দেওঘর অবধচারা হইতে প্রকাশিত। মূল্য আট আনা মাত্র। ইহাতে ভাগবত গ্রন্থের উত্তর খণ্ড মূল ও পয়ার ছন্দে রচিত তাহার বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। অনুবাদের ভাষা খুব সহজ—যাঁহারা সামান্য লেখা-পড়া জানেন, তাঁহারাও অনায়াসে এই অনুবাদ-পাঠে মূলের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিবেন—ইহাই এ গ্রন্থের বিশেষত্ব। ছাপা কাগজ ভালো। ভূমিকায় প্রকাশক মহাশয় বলিয়াছেন উৎসাহ পাইলে বহু-ব্যয়সাধ্য এই 'শ্রীগ্রন্থ' তিনি সমগ্র প্রকাশ করিতে পারিবেন।

বিজ্ঞানের গল্প।—শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় প্রণীত। এলাহাবাদ ইণ্ডিয়ান্ প্রেসে মুদ্রিত। প্রকাশক, ইণ্ডিয়ান্ পাব্লিশিং হাউস, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা মাত্র। এই গ্রন্থখানিতে বিজ্ঞানের কতকগুলি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কথা, এমন চমৎকার সহজ ভাষায় সুললিত ভঙ্গীতে ও বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে, যে ছেলেরা ইহাকে গল্পের বইয়ের মতই সমাদরে পাঠ করিবে। সূর্য্য, সূর্য্যের তাপ ও আলো, আলোর উৎপত্তি শব্দের উৎপত্তি, রঙিন আলো, রঙের খেলা, মেঘ ও বৃষ্টি, মেঘের আকৃতি ও প্রকৃতি, গাছের ঘুম, মশা, ব্যাঙাচি, ব্যাঙ, মাছ, আমাদের খাদ্য ও শরীরের বিষ—এই কয়টি বিষয় এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। বিজ্ঞানের মত নীরস বিষয়ও কিরূপ মনোরম ভঙ্গীতে বলিবার ক্ষমতা জগদানন্দ বাবুর অসাধারণ, এ গ্রন্থে সে পরিচয় সর্ব্বত্র পাই। এ গ্রন্থখানি শুধু ছেলেমেয়েরা কেন, তাহাদের অভিভাবকেরা অবধি পাঠ করিয়া আনন্দ পাইবেন, উপকৃত হইবেন। যে যে গৃহে ছেলে মেয়ে আছে, সেই-সেই গৃহমাত্রেই এ গ্রন্থ বিরাজ করুক। পাঠের বিভীষিকা ত ছেলেরা বুঝিবেই না—আনন্দের সহিত শিক্ষাও তাহারা প্রচুর পাইবে। বহিখানির ছাপা কাগজ চমৎকার—অনেকগুলি ছবিও বহিখানিতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, ছবিগুলি বর্ণনীয় বিষয়গুলিকে আরো সুপরিস্ফুট করিয়া তরুণ পাঠক পাঠিকার তরুণ চিত্তে জ্ঞানের সুস্পষ্ট রেখা পাত করিবে।

দিবারাত্রি।—শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্ কলিকাতা। চোরবাগান, কলিকাতা, বাণী প্রেসে মুদ্রিত মূল্য পাঁচ সিকা। এখানিকে ঠিক উপন্যাস বলিতে পারা যায় কিনা বলিতে পারি না, তবে উপন্যাসেরই মত। কয়েকখানি পত্রচ্ছলে গ্রন্থকার ইহাতে "আমাদের সমাজের বর্ত্তমান সৎ এবং অসৎ ভাবের ধারাগুলি দেখাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন।" পত্রগুলিকে অবলম্বন করিয়া একটি প্লটও মন্দ ফোটে নাই। লেখকের লোক চরিত্রে অভিজ্ঞতা আছে—বর্ত্তমান যুগে যে সব তত্ত্ব অনেকেরই চিত্তে আন্দোলন তুলিয়াছে, তাহার তরঙ্গ পত্রগুলির মধ্য দিয়া বহিয়া গিয়াছে। লেখক ভাবুক—তাঁহার প্রাণে কবিত্ব আছে—পত্রগুলি পড়িবার সময় পাঠকের চিত্তে বহু চিন্তার উদ্রেক হয়, বহু ভাবে সারা চিত্ত দুলিয়া ওঠে। পত্রগুলিতে এত বিভিন্ন ভাবের ধারা ছুটিয়াছে যে উপন্যাসের দিক দিয়া বিচার করিতে হইলে এ কথা বলিতেই হইবে যে তাহাতে উপন্যাসের গতি স্থানে স্থানে মন্দ করিয়া রসভঙ্গ করিয়াছে, তবে বিভিন্নভাবে ধরিলে পত্রগুলি চিন্তাকর্ষক ও আর্টিষ্টিক হইয়াছে। গ্রন্থখানিতে লেখকের শক্তির পরিচয় পাইয়াছি,—মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণে তাঁহার বেশ পারদর্শিতা আছে। মোটের উপর বলিতে পারি, গ্রন্থখানি উপভোগ্য হইয়াছে।

সৃষ্টিতত্ত্বে পুরাণ ও বিজ্ঞান।— জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস প্রণীত। প্রকাশক শ্রীযুক্ত অনাথনাথ মুখোপাধ্যায়, ১১ নং ক্লাইভ রো কলিকাতা, কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে গ্রন্থকার তাঁহার অপূর্ব্ব অধ্যবসায়ের বলে পুরাণ ও বিজ্ঞানের ছায়ায় সৃষ্টিতত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন।

কর্ম্মফল। শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন রায় প্রণীত। প্রকাশক, রায় এম, সি, সরকার বাহাদুর এণ্ড সন্স, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। এমারেল্ড প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত। মূল্য দেড় টাকা। এই গ্রন্থে "অহিংসা পরমোধর্ম্ম" এই বৌদ্ধ মতবাদের সমালোচনা করিয়া গ্রন্থকার কর্ম্মফল নামে একটি বৌদ্ধ আখ্যায়িকা বিবৃত করিয়াছেন। সেটি উপন্যাস নয়, আখ্যায়িকা মাত্র; তবে আখ্যায়িকাটী ঠিক অনুবাদও নয়। উপাখ্যানটি বেশ কৌতূহলোদ্দীপক এবং লেখক তাহাতে কোনরূপ উচ্ছ্বাস বা বাক্যের আড়ম্বর বিন্যাস করেন নাই। এই 'উপাখ্যানটির' ঐ হিসাবে মূল্যও আছে যথেষ্ট; উপাখ্যানটি হইতে আমরা প্রাচীন ভারতের সামাজিক ও রাষ্ট্রনীতির প্রচুর পরিচয় পাই— বৌদ্ধযুগের সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন একটি লৌকিক আদর্শেরও সন্ধান মিলে। এ আদর্শটি বর্ত্তমান মনুষ্য সমাজের ও শ্রেষ্ঠ আদর্শ—স্বেচ্ছাচারী রাজশক্তির উপর জনসাধারণের মতের প্রাধান্য ও প্রভাব এই উপাখ্যানে সুস্পষ্ট হইয়া ফুটিয়াছে, অথচ এ আদর্শের ভিত্তি ইতিহাস; কল্পনা নয়।

নূতন উপনিবেশ। শ্রীমতী চারুবালা সরস্বতী প্রণীত। প্রকাশক শ্রীযুক্ত অনাথনাথ মুখোপাধ্যায় ১১নং ক্লাইভ রো, কলিকাতা। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসে মুদ্রিত, মূল্য ছয় আনা। এখানি ছেলে-মেয়েদের জন্য রচিত গল্পের বই। গল্পটি মামুলি রূপকথা নয়; জন্তু-জানোয়ার লইয়া লেখিকা ইহাতে নূতন রকমের বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। রচনার ভঙ্গী সহজ, সরল, ছেলেমেয়েরা পড়িয়া বিশেষ কৌতুক ও আনন্দ বোধ করিবে। কয়েকখানি ছবিও বইয়ে আছে— ছবিগুলি চমৎকার হইয়াছে। বহিখানির ছাপা-কাগজ ভালো।

ষড় অবতার। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত। প্রকাশক শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্ কলিকাতা। ষ্টাণ্ডার্ড ড্রগ প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য বারো আনা। এই গ্রন্থে ছয়টি ছোট গল্প সংগৃহীত হইয়াছে। ছোট গল্প বলিলে যাহা বুঝি এগুলি সে শ্রেণীর নয়। ছোট গল্পের মাপ-কাঠিতে মাপিলে এগুলির যাচাই ঠিক হইবে না; খোস গল্পের হিসাবে বলিব, নতুন জামাই ও গোড়ায় গলদ গল্প দুইটি বেশ কৌতুক-কর, মজার। তবে গোড়ায় গলদে আইনের একটু গলদ আছে,—পুলিশের কাছে চুরির নালিশ করিয়া মামলা চালাইব না বলিলেই কাজ চোকে না, মিথ্যা নালিশ করার চার্জ্জে পড়িতে হয়; গল্পের শেষে নায়ক যত সহজে আপনাকে রেহাই দিয়াছেন, তত সহজে রেহাই পাওয়া যায় না। 'বিষম স্বদেশী' গল্পে মজা আছে বটে, তবে সমরেন্দ্রর আকস্মিক পরিবর্ত্তনের কোন কারণ পাওয়া যায় না, কারণ দেওয়া উচিত ছিল। "কলির কানাই", "খুড়োর বরাত" ও "নকলে আসল" গল্প তিনটি বিশেষত্ব-হীন। বহিখানির ছাপা-কাগজ ভালো।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

চক্র

৬

কিসে যে কি ঘটিয়া যায় কেহ জানে না। সেই যে সেদিনকার ঐ ঘটনাটা ঘটিল, ইহার পূর্ব্বে এমন কাণ্ড ত কতই হইয়া গিয়াছে। ঝগড়া-ঝাঁটি নালিস ফরিয়াদ এ বালক-দম্পতীর মধ্যে সেই বিবাহের রাত্রি হইতে কবেই বা না হইয়াছিল? তবে এবারই বা কি এমন বিশেষ ঘটনা ঘটিয়াছে যে তার জন্য সবটাই ওলোটপালোট হইয়া যায়?

সেই যে সেদিন ঊর্ম্মিলা শ্বশুরকে ঘড়ি ভাঙ্গার কথা জানাইয়া স্বামীকে লাঞ্ছিত করাইয়াছিল তাহার পক্ষে এ কিছু নতুন নয়;

এমন কতবারই হইয়াছে, কিন্তু এবারে এ কাজটা সে যে কি অশুভক্ষণেই করিয়া ফেলিয়াছিল, তাহা তাহার ভাগ্য-নিয়ন্তা যিনি তাহার বুদ্ধিকে ওই পথে পরিচালিত করিয়াছিলেন, তিনিই জানেন; তবে ইহার ফলটা যে অকস্মাৎ এতখানি কটু হইয়া দেখা দিবে সে যদি সে বিষয়ে একটু সন্দেহ রাখিত তো নিশ্চয়ই এমন কর্ম সে করিতে যাইত না। সেই যে সেদিন সুগভীর ঘৃণাভরে গুপ্তচর বলিয়া বিনয় তাহাকে নিজের ঘরে ঢুকিতে নিষেধ করিয়াছিল, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই ঊর্ম্মিলার দুই পায়ে কে যেন জোর করিয়া একগাছা মোটা লোহার বেড়ি আঁটিয়া দিয়াছে। বিনয় সেই একটিবার মাত্র গর্জ্জিয়া উঠিয়া বিদ্যুতের ঝিলিক হানিয়াই সেই যে আবার পিছন ফিরিয়া বই লইয়া বসিয়াছিল, সেই যে বিদ্যুৎ সে হানিয়াছিল তার কাছে জগতের আর কোন রকমের মৃত্যুবাণই বেশী নির্ঘাত নয়। শুনা যায় তাড়িতের প্রবাহের মতন অত শীঘ্র মানুষ মারিবার শক্তি নাকি আর কাহারও নাই! বিদ্যুৎস্পর্শে এক মুহূর্ত্তের চেয়েও অল্প সময়ে দেহের প্রত্যেক লোমকূপটিকে পর্য্যন্ত স্থির রাখিয়াই জীবন চলিয়া যায়, তাহার দিকে চাহিয়া দেখিবার মত কেহ সেখানে ছিল না তাই, থাকিলে দেখিতে পাইত যে এই মেয়েটীরও অবস্থা ঠিক সেই রকমই হইয়াছে। ওই একটী মুহূর্ত্তের প্রচণ্ড তিরস্কারের অব্যথ লজ্জায় তাহার বুকটা যেন কালো হইয়া পুড়িয়া গেল তাহাকে মরিয়া যাইবার জন্য যেন প্রলয়-ঝড়ের গর্জ্জনেই অনুজ্ঞা প্রদান করিল। এর চেয়ে সে যদি ছুটিয়া আসিয়া তাহার কর্ণভূষা-সমেত কানদুইটা বেশ কঠিন হস্তে মুচড়াইয়া ধরিত,—যেমন কতবারই করিয়াছে—চুলের মুঠি চাপিয়া ধরিয়া পিঠে অজস্র ধারায় কিল-ঘুষি লাগাইত—বুঝি, ঠিক এইটী ছাড়া আর যা-কিছু করিত, তাহাতে ঊর্ম্মিলাকে এমন করিয়া মরার বাড়া হইতে হইত না। কতক্ষণ সে সেই দরজাটা ধরিয়া আড়ষ্ট আকাট হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল,—সে যে কতটা সময়, সে অনুভব শক্তিও বোধ করি ঠিক তাহার ছিল না। তারপর সেইরূপ থাকিয়া অনেকক্ষণ পরে কতকটা আত্মস্থ হইয়া যখন সে মুখ তুলিল, তখনও তাহার আততায়ীকে তাহার সেই নিজস্থানেই ঠিক সেই একই অবস্থায় নিবিড় মনোযোগের সহিত পাঠমগ্ন দেখিয়া সহসা তাহার সেই মৃত্যুবাণাহত অন্তরের উপর যেন আবার একবার নূতন করিয়া তপ্ত শেলের আঘাত লাগিল। এই অকথ্য লজ্জার যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া এবার সে ধীরে ধীরে নিঃশব্দ পদে সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল এবং নিজের ঘরের মধ্যে গিয়া একেবারে অন্ধকারে বিছানার মধ্যে শুইয়া পড়িল।

বিপিনবাবুকে আজ আর কেহ আহার করিতে ডাকে নাই। জগদ্ধাত্রী কাজকর্ম্মের তদারক সারিয়া মালা লইয়া যেমন বসেন, তেমনি বসিয়াছিলেন, উঠিবার কোন তাগিদ নাই। মালার পর মালা ফিরিয়াই চলিল। বামুন-মেয়ে রান্নাঘরে রান্না সারিয়া ঘুমে ঢুলিতে ঢুলিতে বিরক্তিতে অস্থির হইতেছে, শেষকালে আর থাকিতে না পারিয়া রান্নাঘরে ঝীকে বিড়াল তাড়াইবার জন্য বসাইয়া গৃহিণীর উদ্দেশ্যে উঠিয়া আসিয়া

হাঁক পাড়িল, "বলি, হ্যাঁগা মা, আজ আমাদের বৌরাণী কি বাড়ী নেই? সব খাওয়া-দাওয়া হবে কখন?"

গৃহিণীরও মনটা যেন এই রকম একটা কিসের সন্দেহের আবেগে জপের সংখ্যা ভুল করিতেছিল; তিনি তৎক্ষণাৎ 'মায়ের' মালা যোড়-কর-শুদ্ধ মাথায় ঠেকাইয়া উঠিয়া পড়িলেন এবং আহ্নিকের সজ্জা যথাস্থানে তুলিয়া রাখিতে রাখিতে প্রশ্নের উত্তরে ঈষৎ চিন্তিতভাবে জবাব দিলেন, "কি জানি মেয়ে, আমিও তো তাই ভাবছি। বলি, পাগলীর বেটী আজ গেল কোথায়?"

তল্লাসে যখন জানা গেল যে উর্ম্মিলা তার শয়ন-কক্ষে নিদ্রিত, তখন গৃহিণীর আর ভয় ভাবনার পরিসীমা রহিল না। ওই দস্যি মেয়েটার চক্ষে ঘুম যে কত কষ্টেই আনিয়া দিতে হয়, সে ত তাঁহার বিলক্ষণই জানা আছে, নিশ্চয়ই বড়-বেশী অসুস্থ হইয়াছে সে এমন অসময়ে ঘুমাইয়া পড়িয়া থাকিবে। স্থূল শরীর ও ব্যস্ত মন লইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে উপরতলায় উঠিয়া "উর্ম্মিলা" "উর্ম্মিলা" হাঁক পাড়িতে পাড়িতে তিনি তাহার ঘরে আসিলেন। উর্ম্মিলা বোধ করি ঘুমাইয়াছিল, ডাকাডাকিতে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল; এমনভাবে গা ভাঙ্গিয়া নিদ্রালস-জড়িত কণ্ঠে "উঁ" বলিয়া একটা উত্তর দিয়াই সে আবার ভালো করিয়া শুইল এবং শাশুড়ীর অজস্র প্রশ্নের অনুরোধের শাসনের উত্তরে শুধুমাত্র জবাব দিল যে, তার বড় অসুখ করিয়াছে; সে আজ খাইবে না, উঠিবে না।

মা গায়ে হাত দিয়া দেখিয়া বলিলেন, "নে বাপু, ভঙ্গি রাখ্, গা'তো তোর কন্‌কন্ করছে। অসুখ করেছে না ছাই হয়েছে। সারাদিন দস্যিবৃত্তি করিস, তাই ঘুমিয়ে পড়েছিস্। ওই জন্যেই তো বলি বাছা যে, বড় হচ্চিস্, দুপুর বেলা আমার কাছে এসে দুদণ্ড শো' বোস্, তা ত তোর কুষ্টিতে লেখেনি!"

উর্ম্মিলা শাশুড়ীর হাতখানা অঙ্গ হইতে ঝটকা দিয়া সরাইয়া দিল, এবং একটু চুপ করিয়া থাকিয়া পরে বলিল, "জ্বর তো আর আমার হয়নি যে গা হাতড়াচ্চো! আমার পেট ব্যথা করছে।"

গৃহিণীর বিলম্ব দেখিয়া অসহিষ্ণু হইয়া বামুন-মেয়ে উঁহাদের সন্ধানে আসিয়া এই সময়ে ঘরে ঢুকিয়াছিল, সে অমনি ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, "কামড়াবে না পেট! বলি, পেট তো আর ক্যাম্বিসের ব্যাগ নয়, যে যা খুশী তাতে ভরে দিলেই হলো! বলবো কি মা, তোমার বল্লে না পেত্যয় যাবে, দাদাবাবু আর এই আমাদের বৌরাণীটী মা আর জন্মে যে কে ছিলেন তা দেবতারাই জানে, এমন-সব অখাদ্যি দেখিনে যা ওঁদের পেটে যায় না। কাল দেখি না আমড়া পাতাগুলোই ছিঁড়ে ছিঁড়ে নুন দিয়ে খেতে লেগেছেন। আমি বারণ করলুম বলে বৌরাণী তো আমায় ভেংচে ঠেংরে এক করলে, দাদাবাবু আবার বলে কি, জানো? বলে কি না, খেয়ে দেখতো বামুন-মেয়ে, এ খেলে আর কখনো ভুলতে পারবে না। তা, ও-সব খেলে আর পেট-ব্যথা—"

উর্ম্মিলা হাত-পা ছুঁড়িয়া অধৈর্য্য সহকারে চেঁচাইয়া উঠিল, "মাগো, বাবাগো, সব্বাই মিলে এই ঘরের মধ্যে চেঁচাতে ঢুকলো! যাও

শীগ্‌গির, না হলে আমি ছাদে গিয়ে দোর বন্ধ করে শুয়ে থাকবো, তা বলে দিচ্ছি। কয়েচে বল্‌চি, তা একটু ঘুমুতে দেবে না।"

জগদ্ধাত্রী একটু সরিয়া আসিয়া বলিলেন, "তাহলে একটু জোন্‌-মুনে খা দেখি, না হয় তো—"

বধূ এবার উঠিয়া বসিয়া সরোদনে "না হয় তো খানিকটা উনুনের ছাই এনে দাও, খাচ্ছি —" বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া পুনশ্চ বিছানায় পড়িয়া বালিসে মুখ গুঁজিল; এবং কান্না-ভাঙ্গা স্বরে বলিতে লাগিল, "বলচি আমার কিছু ভালো লাগচে না, আমায় ছেড়ে দাও, সে হবে না। আমার অত আদরে দরকার নেই, যাও দেখি তুমি আমার ঘর থেকে।"—বলিতে বলিতেই পুনশ্চ দ্বিগুণ বেগে সে কাঁদিয়া ফেলিল।

তখন অপ্রাস্তভের একশেষ হইয়া স-পার্ষদ গৃহকর্ত্রী বধূর ঘর ছাড়িয়া বাহিরে আসিলেন, কিন্তু সে রাত্রের অবশিষ্ট কাজ-কর্ম্মের মধ্যে আর যেন তিনি নিজের মনটাকে কোনমতেই লাগাইতে পারিলেন না। কর্ত্তা সন্ধ্যাবেলায় আপিস যাইতে পান নাই, তাঁহার শরীর বিষম বে-এক্তার হইয়া রহিয়াছে— পদসেবা হয় নাই, বাতের শরীর, ব্যথায় আড়ষ্ট, তার উপর বধূর অসুস্থতার সংবাদ, মনটা যেন তাঁহার কি রকম হইয়া গেল। খাওয়ার মধ্যে কোন রসই পাইলেন না,— সাতবার করিয়া গৃহিণীকে বলিতে লাগিলেন, "হ্যাঁগা, পাগলী বেটির যদি সত্যি সত্যি বেশী অসুখ হয়? হ্যাঁগা হারাদাস ডাক্তারকে না হয় একবার ডাকাওই না।"

গৃহিণীর মনটা এ-রাত্রে শুধু একটু পেট ব্যথার জন্যে ডাক্তার ডাকার হাঙ্গামা আর পোহাইতে দিল না। তিনি বলিলেন, "দেখা যাক, চুপ করে থেকে ঘুমিয়ে যদি সেরে যায় তো আর অত লেঠা কেন?"

কেবল বিনয়ই শুধু এ বাড়ীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা নিশ্চিন্তভাবে আহার কার্য্য সমাধা করিয়া নিজের স্বতন্ত্র শয়নাগারে নিদ্রা দিতে চলিয়া গেল।

৭

ইহার পর হইতে চক্রের গতি যে কেমনই সহসা পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল, সে যেন এক ইন্দ্রজাল! উর্ম্মিলা সে দিনের সেই অপ্রত্যাশিত দুঃসহ লজ্জার বেদনায় এমনই মুষড়িয়া পড়িল এবং নিজের মনের সঙ্কোচে বিনয়ের সান্নিধ্যকে এমন করিয়াই পরিহার করিয়া বেড়াইতে লাগিল যে, এক এক সময়ে তাহার নিজের কাছেই এটা আশ্চর্য্য প্রহেলিকার মত ঠেকিল। বিস্ময়ে তাহার চিত্ত পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। যা কেহ কখন পারে নাই, কেমন করিয়া সে এই এত বড় দুরূহ কার্য্য আপনা হইতে সে করিতে পারিতেছে; ইহা ভাবিতে গিয়া তাহার বুকের মধ্যটা যেন এক প্রচণ্ড ব্যথায় টলটল করিতে থাকে; কতবারই বিষয়টাকে অবজ্ঞায় ঠেলিয়া ফেলিয়া চিত্তকে লঘু করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছে, মনে মনে হাসিয়া নিজেকে ভীরু বলিয়া গালি দিয়াছে, নিতান্ত সহজভাবেই ঝড়ের মত ছুটিয়া বিনয়ের পাঠাগারে ঢুকিয়া পড়িয়া ভালোয়-মন্দে কলহে-কাতরতায় এই বিষম আত্মশপ্ত মৌন-বিদ্রোহের একটা চরম নিষ্পত্তি করিয়া ফেলিবার জন্য যে সে নিজের সমস্ত শরীর-মন-প্রাণকে কিরূপ উদগ্র

আগ্রহে উন্মুখ করিয়া ধরিয়াছে, তাহা তাহার অন্তর্যামী ব্যতীত বুঝি সে নিজেও তাহা ভাল করিয়া জানিতে পারে নাই। কিন্তু সেই যে সেদিনের বজ্রপাত করিবার পর হইতে বিনয়ের মুখখানা নিরেট মেঘের মতই কঠিন হইয়া আছে, অত গোপন মন্থপণে সেই মুখখানার দিকে চোখ তুলিলেও উর্মিলার শটল হৃদয় কেনই যে পদ্মপত্রের সঞ্চিত জল-বিন্দুর মত টলমল করিতে থাকে সে কথাও ঠিক বুঝা যায় না। আসল কথা যে কখনো সত্যকার পাপ করে নাই, সে যদি একটা যথার্থ অন্যায় আচরণ করিয়া বসে তো পরে শাস্তি যতটা বাহির হইতে সে পায়, তদপেক্ষা শতগুণ ভোগ করিয়া থাকে সে নিজের মনে! এই যে অজ্ঞাত তাড়না সে অহরহ ভোগ করিয়া চলিল, এটা বিবেকের তাড়না।

আবার ও দিকে ইংলণ্ড ভক্তির জাতক্রোধে বিশ্বাসঘাতকতার দণ্ডের বহর দেখিয়া সে সম্বন্ধে বিনয়ের মতটাও বেজায় কড়া হইয়া উঠিয়াছিল। সে একেবারে বজ্রের মত কঠিন হইয়াই স্থির করিল যে, এই অমার্জনীয় অপরাধের জন্য ইতিহাস-সম্মত ভাবে যখন প্রাণদণ্ড দিবার উপায় নাই, তখন অন্ততঃ উহারও কাছাকাছি পৌঁছানো প্রয়োজন। গুপ্তচরকে ছেলেরা একেই একটু বিশেষরূপে ঘৃণা করিয়া থাকে, তার উপর বিনয়ের আবার সেই ঘৃণার মাত্রা একটু অতিরিক্ত সীমায় পৌঁছিয়াছিল। তার উপর আবার যখন সে দেখিল দিনের পর দিন কাটিলেও সেই অপরাধিনী ঘৃণিত জীব তাহার দুই পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাহিতে আসিল না, বরং তেজ দেখাইয়া সরিয়া রহিল, তখন সে সেই অসম্বন্ধ তার ঘৃণা-বিদ্বেষের বশে একরকম পাগল হইয়াই নিজের মনের কাছে শপথ করিয়া বসিল যে এ জন্মে আর কখনো উর্মিলাকে তাহার ক্ষমা করা হইবে না। এই প্রতিজ্ঞার পর হইতেই অসম্ভব মনোযোগসহকারে সে বিদ্যালাভে যত্নবান হইয়া রাত্রি জাগিয়া বই পড়িয়া গৃহবাসী সকলের ও স্কুল-মাষ্টারদের চমক লাগাইয়া দিল।

ইহার পূর্বে আর কখনো তো এমন ঘটে নাই, তাই এত বড় কাণ্ডটা ঘটিতে থাকিলেও এই বালক-দম্পতীর প্রবীণ অভিভাবকদ্বয়ের চিত্তে কোন সন্দেহের রেখাপাত করিতে পারে নাই। উর্মিলা মুখ ফুলাইয়া থাকে, বেশীর ভাগ সে বিছানাতেই পড়িয়া থাকে, এই বলে পেট ব্যথা, এই বলে মাথার যন্ত্রণায় প্রাণ গেল; ভালো কথাটি বলিতে গেলেও কাঁদিয়া ফেলিয়া দশটা মন্দ কথা শুনাইয়া দেয়; শ্বশুর-শাশুড়ী তো বউ লইয়া বিপন্ন হইয়া পড়িলেন। ছেলের যে আজকাল পাঠ্য-পুস্তকে অখণ্ড মনোযোগ সঞ্চার হইয়াছে, কোনোরকম বদমায়েসীর মধ্যেই আজকাল আর তাহার সাড়া পাওয়া যায় না; হঠাৎ একদিন এই তত্ত্বটা আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই যখন ইহার মূল তথ্যটা যে তাহার ঘাড়ের অবিজ্ঞাটার স্কন্ধ ত্যাগ করাইয়াছে এ টুকুও জানিতে বাকি রহিল না,—তখন এই একমাত্র কারণেই শুধু প্রিয়তমা বধূটীর 'ন্যাকামি' পড়াটাকে তাঁহারা কথঞ্চিৎ সহনীয় করিয়া লইতে পারিলেও মনে মনে তাহার জন্য তাঁহাদের আর উদ্বেগের অন্ত রহিল না। যোগের কষ্টেই যে সে তাহার স্বামী-বন্ধুটিকে ভূতের মত অনুসরণ করা হইতে মুক্তি দিয়াছে,

এ বিষয়ে সন্দেহের ছিলই বা কি? ইহাদের বিবাদ-বিসম্বাদ সে কবি-বাক্যকে সার্থক প্রমাণ করিয়া তাহাদের "যখন কতো ঝগড়া-ঝাঁটি, কতো পায়রা লাঠালাঠি,—গালিক দেখে ছুটোছুটি পাড়ার লোকে পুলিশ ডাকতো"—গোছের হইয়াছে। আজ সহসা তাহারা এত কি বড় হইল যে—

ব্রিনয় আসিয়া বলিল, "বাবা, আমি শিবপুরে গিয়ে ইঞ্জিনীয়ারী পড়তে চাই, আমাদের স্কুল থেকে চারজন ছেলেকে পাঠাচ্চে, আমারও খুব জানা আছে, যেতে দিন।"

বিপিন-বাবু ভাবিয়া-চিন্তিয়া পরামর্শ করিয়া স্কুলের হেড-মাষ্টারের সঙ্গে দেখা করিয়া অনুমতি দিয়া ফেলিলেন।

জগদ্ধাত্রী কাঁদো-কাঁদো গলায় বলিলেন, "হ্যাগা, ছেলেটাকে আমার ত্যাগ করে-ছাড়া করতে চাইচো। তোমার কি ভয় নেই প্রাণে একটুও।"

বিপিনবাবু মাথার টাকে হাত বুলাইতে বুলাইতে সন্দিগ্ধভাবে বলিতে লাগিলেন, "সে ত বটেই, সে ত বটেই; কিন্তু কি জানো, ছেলেটা পড়াশোনায় তো তেমন নয়, অথচ এদিকে বেশ একটু শক্তি আছে, দেখলে না, সেদিন চট্ করে সেই ভাঙ্গা ঘড়িটাকেই কেমন কাজ-চলা-গোছ মেরামত করে ফেল্লে। আর ওর মাষ্টাররাও সববাই বলচেন যে ওদিকে ওর যখন একটা স্বাভাবিক শক্তিই রয়েছে, তার ও বিষয়ে আবার এমন একটা সুযোগও উপস্থিত, তখন আর বাধা দেওয়াটা উচিত হয় না। দেখ, গোবিন্দ কি আর বারে-বারেই আমাদের কাঁদাবেন। তাঁর নাম নিয়ে যাতে ওর মঙ্গল হয় তাই হতে দাও।"

তথাপি মায়ের মন প্রবোধ মানিল না। মা ছেলের কাছে কাঁদিয়া গিয়া পড়িলেন; বলিলেন, "আমি কাকে নিয়ে থাকবো রে? তোর মুখ দেখেই যে শুধু পাষাণে প্রাণ বেঁধে রয়েচি।"

ছেলে মা'র মুখে জবাব দিল, "কেন, তোমার বৌ আর একজন রয়েছে। আমায় যেতেই হবে।"

শুনিয়া উর্ম্মিলা চিলের ছাদের পাশে পা ছড়াইয়া বসিয়া খানিক কাঁদিল, তারপর দিনে রাতে এদিক-সেদিকে উসখুস্ করিয়া ফিরিতে লাগিল যে, যদি এই বিদেশ-যাত্রা উপলক্ষেও তাহাদের মধ্যকার এই নিষ্ঠুর অথচ তাহার মধ্যে যেন প্রায়চ্ছন্ন বিরাট মৌনতার নিষ্ঠুর প্রাচীরটা কোন মতে ভাঙ্গিয়া পড়ে। যদি তেমন ঘটিতে পারে, তার স্বামী উর্ম্মিলার কাছে এই দীর্ঘ দিনের ছাড়াছাড়ির নিদারুণ ভীতিও আনন্দ সংবাদের মতই মধুর হইয়া উঠে।

কিন্তু তাহা ঘটিল না। উর্ম্মিলার বিষম লজ্জার বেদনাকে প্রচণ্ড গর্ব্ব বাজনা ভুল করিয়া যা তাহার বিশ্বাসঘাতকতাকে সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর ঐতিহাসিক গুপ্তচরের কার্য্যের সহিত তুলনা করিয়া তুলিয়া বিনয়কুমার স্ত্রীর নিকটে নিষ্ঠুর নিঃশব্দ বিদায় গ্রহণ করিয়া শিবপুর যাত্রা করিল।

ক্রমশঃ

শ্রীঅনুরূপা দেবী

কলিকাতা—২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীকালাচাঁদ দালাল কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।



ভারতী

৪৪শ বর্ষ] চৈত্র, ১৩২৭ [১২শ সংখ্যা

অবতার

১০

কৌণ্ট-বেশে অক্টেভ খানসামার পিছনে পিছনে নীচে নামিয়া আসিল। অক্টেভ আপনাকে বাড়ীর মালিক মনে করিলেও, বাড়ীর মধ্যে 'খাবার ঘরটা কোথায়,' সে জানিত না। খাবার ঘরটা খুব বড়—একতালায় অবস্থিত। সেখান হইতে প্রাঙ্গণ দেখা যাইতেছে। দেয়ালে সুন্দর ঘর-কাটা-কাটা কাঠের কাজ। দেয়ালের গায়ে ঋতুর পর্য্যায় অনুসারে প্রত্যেক ঋতু-সুলভ শিকার-লব্ধ হত জীব জন্তুর দেহাবশেষের নিদর্শনসকল রক্ষিত হইয়াছে। ভোজন-শালার দুই প্রান্তে বড় বড় কাষ্ঠমঞ্চ, তাহার উপর লাবিনস্কি-বংশের পুরাতন রূপার বাসন-কোসন সাজান রহিয়াছে। দেয়ালের দুই ধারে সারি সারি সবুজ মরক্কো চর্ম্মে মণ্ডিত কেদারা। ঘরের মাঝখানে খোদাই-কাজ-করা পায়া-বিশিষ্ট খাবার-টেবিল। মাথার উপরে একটা বৃহৎ বেলোয়ারি ঝাড় ঝুলিতেছে।

টেবিলের উপর, রুশীয় পরিবেশনের ধরণ-অনুসারে একটা নীল রজ্জু ঘেরের মধ্যে নানাবিধ ফল পূর্ব্ব হইতেই স্থাপিত এবং মাংসাদি সমস্ত খাদ্য ঢাক্‌নি ঢাকা বাসনের মধ্যে রক্ষিত হইয়াছে। পালিস-করা ধাতব ঢাকাগুলা ঝিক্‌মিক্ করিতেছে। টেবিলের মুখামুখী দুই আরাম-কেদারা,—তাহার পিছনে দুইজন খানসামা নিশ্চল ও নিস্তব্ধভাবে দণ্ডায়মান—ঠিক্ যেন সাক্ষাৎ গার্হস্থ্যের দুই পাষাণ-মূর্ত্তি।

অক্টেভ ঘরের সমস্ত খুঁটিনাটি এক নজরে দেখিয়া লইল; পাছে এই-সব অপরিচিত নূতন সামগ্রী দেখিয়া তাহার মুখে কখন অনিচ্ছা-ক্রমেও বিস্ময়ের ভাব প্রকাশ পায়। এমন-সময় পাথরের মেঝের উপর হইতে একটা সর সর্ শব্দ,—রেশমি-কাপড়ের একটা খস্‌খস্ শব্দ উঠিল। অক্টেভ পিছন ফিরিয়া দেখিলেন,—কৌনটেস্ আসিতেছেন। অক্টেভ বসিলে পর, বন্ধুভাবে অভিবাদনস্বরূপ

ছোট-খাটো ইঙ্গিত করিয়া, তিনিও বসিলেন। কোণ্টেশ্‌ একটা রেশমী পরিচ্ছদ পরিয়াছিলেন। কপালের দুই পাশে রাশীকৃত কেশ-গুচ্ছ একটা বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া ছবি-জড়ান বেণীর আকারে গ্রীবাদেশে লুটাইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার মুখের স্বাভাবিক গোলাপী রং, গত রাত্রির মনের আবেগে ও নিদ্রার ব্যাঘাতে একটু ফ্যাকাশে হইয়া গিয়াছে, তাঁহার যে চোখ সচরাচর কেমন শান্ত ও নির্মল— সেই চোখের চারিদিকে ঈষৎ কালিমা রেখা পড়িয়াছে। তাঁহার মুখে একটা শ্রান্ত ক্লান্ত অবসন্ন ঢুলু ঢুলু ভাব লক্ষিত হইতেছে। এইরূপ ম্লান আকার ধারণ করায় তাঁর সৌন্দর্যচ্ছটা যেন আরও মর্মভেদী হইয়াছিল, তাহাতে যেন একটু মানবী ভাব আসিয়াছিল। এখন যেন সামান্য রমণী হইয়া পড়িয়াছেন, স্বর্গের পরী পাখা গুটাইয়া উড্ডয়নে বিরত হইয়াছেন।

অক্টেভ এইবার একটু সাবধান হইয়াছে, সে তাহার চোখের আগুনকে ঢাকিয়া ও মনের উচ্ছ্বাসকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া একটা ঔদাসীন্যের ভাব ধারণ করিল। অরের ঈষৎ কম্পনের ন্যায় স্কন্ধদেশ একটু নাড়াইয়া কোন্‌টেশ তাঁহার স্বামীর উপর স্থিরদৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন। এখন তিনি অক্টেভ্‌কে আপন স্বামী বলিয়াই মানিয়া লইয়াছেন। কেন না রাত্রে যে-সব ভয়-ভাবনা, পূর্বসূচনা, বিভীষিকা তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিয়াছিল, দিবালোকে সে-সব অন্তর্হিত হইয়াছে। কোণ্টেশ কোমল মধুর স্বরে সতী স্ত্রীর সমুচিত একটু 'আদুরে-পনা' করিয়া পোলাণ্ড দেশের ভাষায় অক্টেভকে কি-একটা কথা বলিলেন।

মন-খোলাখুলি মধুর ঘনিষ্ঠতার সময়, বিশেষতঃ ফরাসী ভৃত্যদের সন্নিধানে কোণ্টেশ অনেক সময় কোণ্টের মাতৃভাষায় কোণ্টের সহিত কথা কহিতেন। ফরাসী ভৃত্যেরা পোলোনী ভাষা জানিত না।

প্যারিস নগরবাসী অক্টেভ, লাটিন ভাষা স্পেনীয় ভাষা ও ইংরেজীভাষার কতকগুলি শব্দ জানিত; কিন্তু "স্লাভ্‌" জাতির ভাষা মোটেই জানিত না। পোলোনী ভাষায় স্বরবর্ণের বিরলতা ও ব্যঞ্জনবর্ণের প্রাচুর্য্য থাকায় ইচ্ছা করিলেও তাহাতে দন্তস্ফুট করিতে পারিত না। ফ্লোরেন্স নগরে কোণ্টেশ অক্টেভের সহিত বরাবর ফরাসী কিংবা ইটালীয় ভাষাতেই কথা কহিতেন।

ঐ পোলায় ভাষায় কথিত বাক্য, কোণ্টদেহে অক্টেভের মস্তিষ্কের ভিতরে গিয়া এক অদ্ভুত কাণ্ড করিয়া বসিল:—প্যারিস্‌-বাসী ফরাসীর অপরিচিত ও অশ্রুতপূর্ব্ব ধ্বনিসমূহ "স্লাভ" জাতীয় কাণের মধ্য দিয়া মস্তিষ্কের এমন জায়গায় পৌঁছিল, যেখানে ওলাফের আত্মা উহা গ্রহণ করিয়া চিন্তার আকারে অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং একপ্রকার ভৌতিক ধরণের স্মৃতি জাগাইয়া তুলিল, ঐ সকল ধ্বনির অর্থ গোলমেলে-ভাবে অক্টেভের মাথায় আসিল; শব্দগুলা মস্তিষ্কের পাকচক্রের ভিতর দিয়া স্মৃতির গুপ্ত দেরাজের মধ্যে আসিয়া গুণ গুণ করিতে লাগিল—যেন উত্তর দিবার জন্য প্রস্তুত; কিন্তু সাক্ষাৎ আত্মার সহিত ঐ সকল অস্পষ্ট পূর্বস্মৃতির যোগাযোগ না হওয়ায় উহা শীঘ্রই অন্তর্হিত হইল।

আবার সমস্ত অস্বচ্ছ হইয়া পড়িল।

প্রেমিক বেচারা ভয়ানক মুস্কিলে পড়িল। কোণ্ট ওলাফ-লাবিন্স্কির শরীর গ্রহণ করিবার সময় অক্টেভ এই-সব গোলযোগের কথা ভাবে নাই। এখন বুঝিতে পারিল, অন্যের শরীর ধারণ করায় অনেক বিপদ আছে।

কোণ্টেশ অক্টেভের নীরবতায় বিস্মিত হইলেন। ভাবিলেন, আর কোন চিন্তায় মন বিক্ষিপ্ত হওয়ায় হয় ত অক্টেভ তাঁর কথা শুনিতে পান নাই, এই মনে করিয়া কাণ্টেশ সেই বাক্যটা আবার খুব ধীরে ধীরে ও উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন।

ঐ শব্দগুলার ধ্বনি শুনিতে পাইলেও, অক্টেভ এবারো তাহার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল না। উহার অর্থ ধরিবার জন্য সে প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু পারিল না। কোন ফরাসী, ইটালীয় ভাষার কথা আন্দাজে কিছু কিছু বুঝিতে পারে, কিন্তু এই ধরণের পোলীয় ভাষার সম্বন্ধে সে একেবারেই বধির।— অনিচ্ছাসত্ত্বেও, তাহার গাল লাল হইয়া উঠিল, নিজের ওষ্ঠ দংশন করিতে লাগিল, এবং মুখরক্ষার জন্য তাড়াতাড়ি ছুরি দিয়া প্রচণ্ডভাবে প্লেটের মাংসখণ্ড কাটিতে আরম্ভ করিল।

কোণ্টেশ বলিলেন—(এইবার ফরাসী ভাষায়):—

"ওগো! তুমি দেখছি আমার কথা শুনছ না, কিংবা কিছুই বুঝতে পারছ না, হ'ল কি তোমার?.."

কোণ্টদেহে অক্টেভ কি বলিবে ঠিক্ করিতে না পারিয়া আমতা-আমতা করিয়া বলিল:—এই লক্ষ্মীছাড়া ভাষাটা এমন শক্ত!

—শক্ত! হাঁ, বিদেশীর কাছে শক্ত ঠেকতে পারে, কিন্তু ঐ ভাষা যাকে মায়ের কোলে আনন্দ দিয়েছে, প্রাণবায়ুর মত প্রবাহের মত যার মুখ দিয়ে আজন্ম নিঃসৃত হয়েছে, তার পক্ষে এই ভাষা শক্ত নয়।

—হাঁ, সে কথা সত্য, কিন্তু এমন এক এক মুহূর্ত্ত আসে যখন আমার মনে হয় ঐ ভাষা আমি কিছুই জানি না।

—তুমি কি বলছ ওলাফ? কি! তোমার পিতৃ-পিতামহের ভাষা, তোমার পবিত্র জন্মভূমির ভাষা, যে ভাষায় তোমরা স্বজাতীয় ভাইদের চিনতে পার, যে ভাষায় সর্ব্বপ্রথমে আমাকে বলেছিলে—"আমি তোমায় ভাল বাসি," সেই ভাষা তুমি ভুলে যাবে, এ কি সম্ভব?

কোণ্টদেহে অক্টেভ আর কোন সঙ্গত উত্তর খুঁজিয়া না পাইয়া বলিল "আর এক ভাষা ব্যবহারে অভ্যস্ত হওয়ায়" ..

এবার ভর্ৎসনার স্বরে কোণ্টেশ বলিলেন—

"ওলাফ, আমি দেখছি প্যারিস্ তোমাকে বিগড়ে দিয়েছে, সেই জন্যেই তখন প্যারিসে আসতে আমার ইচ্ছে ছিল না। তখন কে জানত যে মহামহিম কোণ্ট লাবিন্স্কি যখন তাঁহার স্বরাজ্যে ফিরে যাবেন, তখন তাঁর প্রজাদের অভিনন্দনে তিনি নিজ ভাষায় উত্তর দিতে পারবেন না?"

কোণ্টেশের সুন্দর মুখখানি একটু বিষণ্ণ ভাব ধারণ করিল। দেবপ্রতিম নির্ম্মল ললাটে এই সর্ব্বপ্রথম একটা দুঃখের ছায়া পড়িল। এই অদ্ভুত বিস্মৃতি, তাঁহার আত্মার মর্ম্মস্থল স্পর্শ করিল; ইহাকে তিনি একপ্রকার বিশ্বাসঘাতকতা বলিয়া মনে করিলেন।

আহারের অবশিষ্ট সময়টা নিস্তব্ধভাবে অতিবাহিত হইল; কোণ্টেশ, যাকে কৌণ্ট মনে করিয়াছিলেন সেই অক্টেভের উপর অভিমান করিলেন। অক্টেভের মনে এখন একটা বিষম যন্ত্রণা হইতেছিল; তার ভয় হইতেছিল, পাছে তার উত্তর দিতে না পারে।

কোণ্টেশ গাত্রোত্থান করিয়া আপন মহলে চলিয়া গেলেন।

অক্টেভ এখন একলা,—একটা ছুরির বাঁট লইয়া ক্রীড়াচ্ছলে নাড়াচাড়া করিতেছিল; এক-একবার ইচ্ছা হইতেছিল, ঐ ছুরি নিজের বুকে বসাইয়া দেয়;—তার অবস্থাটা এতই অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। সে মনে করিয়াছিল, হঠাৎ এক নূতন জীবন-ক্ষেত্রে সে প্রবেশ করিবে; কিন্তু এখন দেখিল, এই অজ্ঞাত জীবনের অন্ধিসন্ধি তার জানা নাই; কৌণ্ট ওলাফের শরীর ধারণ করিতে গেলে, পূর্ব্ববর্ত্তী সমস্ত ধারণা ও সংস্কার, নিজের ভাষা, শৈশবের সমস্ত স্মৃতি, মানুষের 'আমি' জিনিসটা যেসকল অসংখ্য খুটিনাটি দিয়া গঠিত, নিজের অস্তিত্ব যাহা অন্যান্য অস্তিত্বের সহিত বিশেষ সম্বন্ধ সূত্রে আবদ্ধ—এই সমস্ত বিসর্জ্জন করা আবশ্যক; এবং এই সমস্তের জন্য ডাক্তার বালথাজার-শেরবোনোর বুজ্‌রুকি যথেষ্ট নহে। এ কি বিড়ম্বনা! এই স্বর্গের ভিতর প্রবেশ করিলাম, অথচ উহার দ্বারদেশ দূর হইতেও দেখা আমার পক্ষে একপ্রকার ধৃষ্টতা! কৌন্‌টেসের সহিত এক গৃহে বাস করিব, তাঁহাকে দেখিব, তাঁহার সহিত কথা কহিব, অথচ তাঁর সতীত্বের লজ্জা ভাঙ্গিতে পারিব না, এবং প্রতি মুহূর্ত্তে এক-একটা মূঢ়তার কাজ করিয়া নিজমূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া ফেলিব! কোণ্টেস আমাকে কখনই ভাল-বাসিবে না—ইহা আমার অখণ্ডনীয় অদৃষ্টের লিপি! তথাপি মানব-গর্ব্বকে ধূলায় লুণ্ঠিত করিয়া 'আমি' যার-পর-নাই ত্যাগ-স্বীকার করিয়াছি। আমি নিজের 'আমি'কে বিসর্জ্জন দিয়া, অপরের শরীর ধারণ করিয়া অন্যের প্রাপ্য আদর-যত্ন দাবী করিতে সম্মত হইয়াছি!"

অক্টেভের মনে-মনে এইরূপ স্বগতোক্তি চলিতেছিল। এমন সময় একজন সহিস্ আসিয়া মাথা নোয়াইয়া গভীর ভক্তি সহকারে জিজ্ঞাসা করিল:—

"আজ কোন্ ঘোড়াটা হুজুরকে এনে দেখাব?" প্রভু উত্তর করিতেছেন না দেখিয়া,—পাছে ধৃষ্টতা প্রকাশ পায়, ভয়ে-ভয়ে—অতি মৃদুস্বরে গুজ্‌গুজ্ করিয়া সহিস্ আবার বলিল—"ভুলটুর"কে আন্‌ব না "য়োস্তমকে" আন্‌ব? আট দিন ওদের সোয়ারি হয় নি।"

এইবার অক্টেভ উত্তর করিলেন-"য়োস্তমকে"।

অক্টেভ, স্নায়ুর উত্তেজনা মুক্ত-বায়ু সেবনে প্রশমিত করিবার জন্য ঘোড়ায় চড়িয়া বোয়া-দে-বুলং-এ বেড়াইতে গেলেন।

য়োস্তম উচ্চকুলোদ্ভব প্রকাণ্ড ঝাঁকালো ঘোড়া; তাকে কাঁটার আঘাতে উত্তেজিত করিবার কোন আবশ্যকতা ছিল না। সে সোয়ারের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইবামাত্র তীরের মত ছুটিল। দুই ঘণ্টা প্রচণ্ড বেগে ছুটাছুটি করিয়া, অশ্ব ও অশ্বারোহী প্রাসাদে ফিরিয়া আসিল।

বেড়াইয়া আসিয়া অক্টেভের মস্তিষ্ক একটু ঠাণ্ডা হইল। ঘোড়ার নাসারন্ধ্র রক্তিম হইয়াছে ও গাত্র হইতে বাষ্পধূম উত্থিত হইতেছে।

তথা-কথিত কোণ্ট, কৌণ্টেসের গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিল, কোণ্টেস্, তাঁর বৈঠক-খানায় আছেন। একটা সাদা রেশমের পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছেন। আজ কিনা বৃহস্পতি-বার; তাই আজ অভ্যাগত লোকদিগকে অভ্যর্থনা করিবার জন্ত গৃহেই আছেন।

একটু মধুর হাসি হাসিয়া—(অমন সুন্দর ওষ্ঠাধরে অভিমানের স্থান বেশীক্ষণ থাকিতে পারে না) কোণ্টেস অক্টেভ বলিলেন;—

"বোয়ার উপবন-পথে ছুটাছুটি ক'রে তোমার স্মরণ কি আবার ফিরে পেলে?"

অক্টেভ উত্তর করিল—

—"না; লাবেনস্কি; একটা গোপনীয় কথা তোমার কাছে প্রকাশ করা আবশ্যক।"

—"আমি তোমার গোপনীয় মনের কথা পূর্ব্ব হতেই কি সব জানিনে? আমাদের মধ্যে এখনো কি কিছু ঢাকাঢাকি আছে?"

—"যে ডাক্তারের কথা লোকের মুখে এত শোনা যায়, কাল আমি সেই ডাক্তারের বাড়ী গিয়েছিলাম।"

—"হাঁ, সেই ডাক্তার বাল্থাজার শেরবোনো যে অনেকদিন ভারতবর্ষে ছিল। সে নাকি ব্রাহ্মণদের কাছ থেকে খুব আশ্চর্য্য গুপ্তবিদ্যা শিখে এসেছে। তুমি তাকে একদিন আমার কাছে নিয়ে আস্তেও চেয়েছিলে। কিন্তু ও-বিষয়ে আমার কোন কৌতূহল নেই; কেন না আমি বেশ জানি, তুমি আমাকে ভালবাস। এই বিজ্ঞানই আমার পক্ষে যথেষ্ট।"

—"শুনি' আমার সামনে যে সব ব্যাপার পরীক্ষা প্রয়োগ করে' দেখিয়েছিলেন, আশ্চর্য্য কাণ্ড করেছিলেন, তাতে আমার মন এখনো বিচলিত হয়ে আছে। এই অদ্ভুত ডাক্তার কি-একটা অনিবার্য্য শক্তি প্রয়োগ করে' এমন-এক গভীর চৌম্বক-নিদ্রায় আমাকে নিমজ্জিত করলেন যে, যখন আমি জেগে উঠলাম, তখন দেখি আমার সমস্ত মনো-বৃত্তি লোপ পেয়েছে। অনেক জিনিসের স্মৃতি আমার নষ্ট হয়েছে। আমার অতীতটা যেন একটা গোলমেলে কোয়াসার ভিতর ভাস্‌চে। কেবল, তোমার উপর আমার যে ভালবাসা—সেইটি অক্ষুণ্ণ রয়েছে।"

—"ওলাফ! তোমার ভারী ভুল করেছিল,—ঐ ডাক্তারের হাতের মধ্যে কি যেতে আছে? ঈশ্বর যিনি আত্মাকে সৃষ্টি করেছেন, আত্মাকে স্পর্শ করবার অধিকার একমাত্র তাঁরি আছে। মানুষের এইরকম চেষ্টা করা মহাপাপ; আশা করি, তুমি আর কখনও সেখানে যাবে না। আর, যখন আমি পোলীয় ভাষায় কোন ভালবাসার কথা বল্‌ব, তখন আশা করি তুমি আবার পূর্ব্বে-কার মত তা বুঝতে পারবে।"

অক্টেভ যখন ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়াইতেছিল তখনই সে এই মৎলব আঁটিয়াছিল যে, ডাক্তারের চৌম্বক শক্তির দোহাই দিয়া তাহার এই-সমস্ত ভ্রম-প্রমাদ-জনিত বিপদ হইতে সে আপনাকে উদ্ধার করিবে। কিন্তু এই

খানেই বিপদের শেষ হইল না।—একজন ভৃত্য, দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া খবর দিল।

"সাভিলের সম্ভ্রান্ত গৃহস্থ অক্টেভ।"

কোন-না-কোন দিন এইরূপ সাক্ষাৎকার ঘটিবে মনে মনে জানিলেও, ঐ সাদাসিধা শব্দগুলি শুনিবামাত্র প্রকৃত অক্টেভের মুখ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল; মনে হইল তাহার কাণের কাছে, হঠাৎ যেন "অন্তিম-বিচারের" তুরী-নিনাদ হইল। সাহসের উপর খুব ভর করিয়া, মনে মনে ভাবিল, এখনো এমন অবস্থা দাঁড়ায় নাই যাহাতে আপনাকে একেবারে নিরুপায় বলিয়া মনে হইতে পারে। অতর্কিতভাবে অক্টেভ একটা কৌচের পৃষ্ঠ-দেশ ধরিয়া ফেলিল, এবং তাহার উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া বাহ্যতঃ মুখে একটা শান্ত ও দৃঢ়তার ভাব রক্ষা করিতে সমর্থ হইল।

অক্টেভ-দেহধারী প্রকৃত কৌণ্ট ওলাফ কৌণ্টেশের দিকে অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে খুব নত হইয়া অভিবাদন করিল।

অক্টেভদেহে কৌণ্ট, ও কৌণ্টদেহে অক্টেভ ইহাঁদের পরস্পরের মধ্যে পরিচয় করিয়া দিয়া, কৌণ্টেশ বলিলেন;—

"ইনি লাবিনস্কির কৌণ্ট—ইনি সাভিলের অক্টেভ—।"

এই দুই ব্যক্তি পরস্পরকে ঠাণ্ডা ভাবে অভিবাদন করিয়া লৌকিক ভদ্রতার মুখসের ভিতর হইতে পরস্পরের প্রতি একটা চোখা কটাক্ষ হানিল

চির-পরিচিত বন্ধুর ভাবে কৌণ্টেশ বলিলেন:—

"দেখ অক্টেভ, আমি যখন ফ্লরেন্সে ছিলাম তখন হতেই আমার সঙ্গে তোমার বন্ধুত্ব। তোমার সেই বন্ধুত্বের বন্ধন এখনো পর্য্যন্ত একটুও শিথিল হয় নি। তুমি আমার সেই বাগান-বাড়ীতে তখন নিত্য যাতায়াত করতে। আমার তুমি আপনাকে আমার বন্ধুবর্গের একজন ব'লে মনে করতে।"

অলীক অক্টেভ ও প্রকৃত কৌণ্ট একটু বাধো-বাধো স্বরে উত্তর করিলেন:—

—"দেখুন, কৌণ্টেশ, আমি অনেক ভ্রমণ করেছি, অনেক কষ্ট সহ্য করেছি, এমন কি পীড়িতও হয়েছিলাম—আপনার সদয় নিমন্ত্রণ-পত্র পেয়ে মনে করলাম, এই সুযোগ ছাড়ব কি না। কিন্তু আমার একটু আশঙ্কাও হ'ল, পাছে স্বার্থপর বলে আমার মত উদাস-চিত্ত ব্যক্তি আপনার নিকট গিয়ে আপনার অনুগ্রহের অপব্যবহার করে।"

কৌণ্টেশ উত্তর করিলেন:—

—"উদাস-চিত্ত? হ'তে পারে। না, না, উদাস-চিত্ত নয়। তুমি কখন বিষাদ রোগগ্রস্ত ছিলে। কিন্তু তোমাদের একজন কবি এই কথা বলেন নি কি?:-

"আলস্যের পরে ইহাই সব-চেয়ে মারাত্মক ব্যাধি।"

অক্টেভ দেহধারী কৌণ্ট বলিলেন:—

"অন্যের দুঃখকষ্টে পাছে মমতা করতে হয় এই-জন্যই সুখী লোকেরা এই গুজব রটিয়েছে।"

কৌণ্টেশ অনিচ্ছাক্রমে তার মনে যে প্রেমের উদ্রেক করিয়াছিলেন তজ্জন্য যেন ক্ষমা চাহিতেছেন—এইভাবে কৌণ্টেশ অক্টেভ দেহধারী কৌণ্টের উপর একটি অতীব মধুর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন তারপর বলিলেন:—

"তুমি যে-রকম মনে কর আমি ততটা মমতা-শূন্য লঘুচিত্ত নই। প্রকৃত দুঃখ দেখলে আমার দয়া হয়, আর সে দুঃখকষ্টের লাঘব না করতে পারলেও অন্তত তার জন্য সমবেদনা দেখাতে পারি। দেখ অক্টেভ, তুমি সুখী হও এই ইচ্ছা আমি করতে পারতাম, কিন্তু কেন বল দেখি, তুমি নিজের বিষণ্ণতার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে একগুঁয়ের মত জীবনের সমস্ত সুখ, জীবনের সমস্ত মাধুর্য্য, জীবনের সমস্ত কর্ত্তব্য বিসর্জ্জন দিলে? আমার বন্ধুত্ব বা কেন তুমি প্রত্যাখ্যান করলে?"

এই সাদাসিধা সরল ভাবের কথাগুলি উক্ত শ্রোতা বিভিন্নভাবে গ্রহণ করিল।

—অক্টেভ বুঝিল,—বাগান বাড়ীতে কোণ্টেশ তার উপর যে দণ্ডাজ্ঞা জারী করিয়াছিলেন, ইহা তাহারই দৃঢ় সমর্থন মাত্র। কেন না, ঐ সুন্দর ওষ্ঠাধর মিথ্যাবাদে কখনও কলুষিত হয় নাই।

এ দিকে কৌণ্ট ওলাফ, ঐ কথাগুলির মধ্যে কোণ্টেশের অপরিবর্ত্তনীয় সতীত্বের আর-একটা প্রমাণ পাইলেন। ভাবিলেন, কোন সয়তানি চক্রান্ত ব্যতীত, সে সতীত্বের কখনই পতন হইতে পারে না। এই কথা মনে হইবামাত্র তিনি ক্রোধে উন্মত্ত হইলেন। আর এক আত্মার দ্বারা অধিকৃত নিজের মূর্ত্তিকে দেখিয়া এবং সেই অলীক ব্যক্তি নিজের বাড়ীতে অধিষ্ঠিত হইয়াছে দেখিয়া, তিনি ছুটিয়া গিয়া ঐ জালিয়াত কৌণ্টের টুটি চাপিয়া ধরিলেন।

"চোর, ডাকাত, পাজি,—ফিরে দে আমার শরীর!"

এই আশ্চর্য্য কাণ্ড দেখিয়া কোণ্টেশ ঘণ্টা বাজাইয়া দিলেন; কতকগুলি ভৃত্য ছুটিয়া আসিয়া কৌণ্টকে ধরিয়া লইয়া গেল।

কোণ্টেশ বলিলেন:—

"অক্টেভ বেচারা পাগল হয়ে গেছে!"

প্রকৃত অক্টেভ উত্তর করিল:—

"হাঁ প্রেমে পাগল। কোণ্টেশ, তোমার ধীপলাবণ্য নিশ্চয়ই অসাধারণ!"

(ক্রমশঃ)

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ভাষার উৎপত্তিতত্ত্ব

(প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মত)

আচার্য্য মোক্ষমুলর ভাষাতত্ত্বে অপর জীব হইতে মনুষ্যের বিশেষত্ব দেখিতে পাইয়া ইহাকে মনুষ্য ও অপর জীবের মধ্যে অনুল্লঙ্ঘনীয় ব্যবধান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং ভাষাতত্ত্বের মধ্যেই যে মনুষ্যত্বের প্রকৃত রহস্য নিহিত রহিয়াছে—তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি এবং ভাষাতত্ত্ব উদ্ঘাটিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যে মনুষ্যত্বের আদিরহস্যও উদ্ঘাটিত হইবে তাহাও আমরা বুঝিতে পারিতেছি। মনুষ্যত্বের মূলীভূত এই ভাষা কিরূপে বিকাশ লাভ করিয়াছে তাহার তত্ত্ব জানিবার জন্য মনুষ্য

মাত্রেরই মনে বিশেষ কৌতূহল হওয়া সম্পূর্ণ ই স্বাভাবিক। আমরা এই স্বাভাবিক কৌতূহলেরই বশবর্ত্তী হইয়া তৎপরিতৃপ্তির জন্য এখানে এতৎ সম্বন্ধে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মতের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

ভাষা-নিরপেক্ষ চিন্তা সম্ভবপর নয়, ইহা যুক্তি-শাস্ত্রের প্রথম স্বতঃসিদ্ধ। ভাষা ও চিন্তার এই সাপেক্ষ-ভাবটীকে আচার্য্য মোক্ষমূলর এইরূপে বিশদভাবে প্রকাশ করিয়াছেন "উচ্চৈঃস্বরের চিন্তার নামই ভাষা এবং অনুচ্চস্বরের ভাষার নামই চিন্তা।" ("Speaking is thinking high and thinking is speaking low.")

ভাষা ও চিন্তার মধ্যে এই সম্বন্ধ হইতে আমরা ভাষা সম্বন্ধে এই মূল সত্যটী লাভ করিতে সমর্থ হইতেছি যে, চিন্তার বিকাশই ভাষার প্রকৃত উদ্বোধক। এইজন্যই চিন্তার বিকাশের অনুপাতেই ভাষার বিকাশ দেখিতে পাই। অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে চিন্তার বিকাশ যেমন কম তাহাদিগের মধ্যে শব্দ-সংখ্যাও তেমনই কম; সভ্যজাতিদিগের মধ্যে চিন্তার বিকাশ অধিক বলিয়া তাঁহাদের মধ্যে শব্দসংখ্যারও আধিক্য। চিন্তা যে মনুষ্যের একটী বিশিষ্ট লক্ষণ, সংস্কৃত মনু, মনুষ্য, এবং ইংরেজী man প্রভৃতি নামেই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। চিন্তা দ্বারা যেমন মনুষ্য, মনু বা man হইয়াছে চিন্তা দ্বারাই তেমন মনুষ্যের ভাষা "বাচ্" বা voice হইয়াছে।

চিন্তা প্রথম ভাষাতেই আকার প্রাপ্ত হয়, তাহাতেই চিন্ময় ব্রহ্ম "শব্দব্রহ্ম" হইয়াই সৃষ্টি আরম্ভ হয়। পাশ্চাত্য Logosও শব্দব্রহ্মেরই নামান্তর মাত্র। খ্রীষ্টধর্ম্মের বাইবেলের সৃষ্টি-প্রকরণে ঈশ্বর কর্ত্তৃক সৃষ্ট বস্তুসকলের নামকরণের যে বর্ণনা আমরা প্রাপ্ত হই, তাহা হইতে ভাষা যে সৃষ্টির পূর্ব্ববর্ত্তী এবং ইহা যে ঐশ্বরিক নিয়মে গঠিত তাহাই আমরা বুঝিতে পারি। মনু-সংহিতাতেও আমরা সৃষ্টির প্রারম্ভে বেদ হইতে বস্তুসকলের নামকরণ হয় বলিয়া উল্লেখ পাই যথা;—

"সর্ব্বেষাঞ্চ স নামানি কর্ম্মাণি চ পৃথক্ পৃথক্।
বেদশব্দেভ্য এবাদৌ পৃথক্ সংস্থাশ্চ নির্ম্মমে॥২১॥"

মনুসংহিতা ১ম অধ্যায়।

'পরমেশ্বর সৃষ্টির প্রথমে বেদশব্দ সকল হইতেই বস্তুসকলের নাম, কার্য্য ও পৃথক্ শ্রেণী বিভাগ করিলেন। বেদভাষা স্বাভাবিক শব্দরাশি বা ভাষাই আমরা বুঝি। 'বেদ অপৌরুষেয়' ও 'শব্দনিত্য' প্রভৃতি তত্ত্ব ভাষার স্বাভাবিক ঈশ্বর-নির্দ্দিষ্ট গঠন-উদ্ভবই বুঝাইয়া থাকে বলিয়া আমরা মনে করি। যুক্তিশাস্ত্রে বস্তুসকলের সংজ্ঞা ও শ্রেণীবিভাগ তাহাদের গুণ ও কর্ম্মবোধক ভাষা দ্বারা হওয়ার যে নিয়ম আছে এখানে আমরা তাহারই আভাস পাইতেছি।

চিন্তাকে মূল করিয়াই ভাষার বিকাশ হইয়া থাকে; চিন্তার পরিণত অবস্থা হইলে ভাষারও পরিণত অবস্থা হয় এবং চিন্তার অপরিণত অবস্থা হইলে ভাষারও অপরিণত অবস্থা হয়। এই প্রকারেই পৃথিবীতে মানসিক অবস্থার তারতম্যানুসারে ভাষার পূর্ণতা ও অপূর্ণতা হইয়াছে। বৈদিক ঋষিগণ যে ভাষার এই তত্ত্ব সম্পূর্ণরূপেই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন বেদের ভাষা উৎপত্তির

বিবরণেই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। এখানে আমরা সেই বর্ণনা হইতে উদ্ধৃত করিতেছি :—

"বৃহস্পতে প্রথমং বাচো যৎ প্রৈরত নামধেয়ং দধানাঃ।
যদেষাং শ্রেষ্ঠং যদরি প্রমাসীৎ প্রেণা তদেষাং নিহিতং
গুহাবিঃ ॥১॥

সক্তুমিব তিতউনা পুনন্তো যত্র ধীরা মনসা বাচমক্রত।
অত্রা সখায়ঃ সখ্যানি জানতে ভদ্রৈষাং লক্ষ্মীর্নিহিতাধি
বাচি ॥২॥

যজ্ঞেন বাচঃ পদবীয় মায়ন্তামন্ববিন্দন্নৃষিষু প্রবিষ্টাম্।
তামাভৃত্যা ব্যদধুঃ পুরুত্রা তাং সপ্ত রেভা অভিসংনবন্তে ॥৩॥
উত ত্বঃ পশ্যন্ন দদর্শ বাচমুত ত্বঃ শৃণ্বন্ন শৃণোত্যেনাম্।
উতো ত্বস্মৈ তন্বং বি সস্রে জায়েব পত্য উশতী সুবাসাঃ ॥৪॥

ঋগ্বেদ ১০।৭১।

"হে বৃহস্পতি! বালকেরা সর্ব্বপ্রথম বস্তুর নামমাত্র কহিতে পারে, তাহাই তাহাদিগের ভাষা শিক্ষার প্রথম সোপান। তাহাদিগের যাহা-কিছু উৎকৃষ্ট ও নির্দ্দোষ জ্ঞান হৃদয়ের নিগূঢ় স্থানে সঞ্চিত ছিল, তাহা বাগ্দেবীর করুণা-ক্রমে প্রকাশ হয়।

"যেমন চালনার দ্বারা শক্তুকে পরিষ্কার করে, তদ্রূপ বুদ্ধিমান্ বুদ্ধিবলে পরিষ্কৃত ভাষা প্রস্তুত করিয়াছেন। সেই ভাষাতে বন্ধুগণ বন্ধুত্ব, অর্থাৎ বিস্তর উপকার প্রাপ্ত হয়েন। তাহাদিগের বচন রচনাতে অতি চমৎকার লক্ষ্মী সংস্থাপিত আছে।

"বুদ্ধিমান্‌গণ যজ্ঞদ্বারা ভাষার পথ প্রাপ্ত হয়েন। ঋষিদিগের অন্তঃকরণমধ্যে যে ভাষা সংস্থাপিত ছিল, তাহা তাঁহারা প্রাপ্ত হইলেন। সেই ভাষা আহরণ পূর্ব্বক তাঁহারা নানাস্থানে বিস্তার করিলেন। সপ্তছন্দ সেই ভাষাতেই স্তব করে।" রমেশবাবুর অনুবাদ।

এখানে ভাষা যে হৃদয় বা মনের মধ্য হইতে বাহিরে পরিস্ফুট হইয়াছে তাহা আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছি। পাশ্চাত্য ভাষা-বিজ্ঞানে ভাষার প্রাকৃতিক জীবন স্বীকৃত হইয়াছে অর্থাৎ ইহা যে স্বাভাবিক বিকাশ, কৃত্রিম গঠন নহে তাহাই সিদ্ধান্তিত হইয়াছে।

হৃদয়ের ভাব প্রকাশ করিবার প্রবল আবেগের দ্বারাই প্রথম ভাষার অভিব্যক্তি হয়। যেমন তন্ত্রীবাদ্যযন্ত্রের উপর বায়ুর কার্য্যদ্বারা স্বতঃই ধ্বনি উৎপাদিত হয়, তেমনই আমাদের প্রবল হৃদয়াবেগের দ্বারা প্রেরিত হইয়া প্রাণবায়ু যখন বাগ্‌যন্ত্রের উপর আঘাত করিতে থাকে তখনই তাহা হইতে শব্দ নির্গত হইয়া থাকে। এই শব্দ ব্যক্ত বা অর্থযুক্ত হইলেই তাহা ভাষা বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। পশুপক্ষীদিগের মধ্যে হর্ষ-বিষাদ ভয় প্রভৃতির আবেগ দ্বারাই শব্দ প্রকাশ পাইতে দেখা যায়। ইহাদের শব্দ ব্যক্ত না হইলেও স্বর-বৈলক্ষণ্যের দ্বারা ব্যক্ত শব্দেরই ন্যায় তাহার ভাব স্বভাবতঃই বোধগম্য হইয়া থাকে। সুতরাং ইহাকে আমরা একপ্রকার "সহজভাষা" (Natural language) বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারি। মনুষ্যের প্রাণীসাধারণ প্রকৃতি হইতে প্রাণী সাধারণ সহজাত ভাষারই প্রথম বিকাশ আমরা তাহাদিগের মধ্যে দেখিতে পাই। এই সহজাত ভাষার শব্দসকলই আমাদের ব্যাকরণে 'অব্যয়' Interjection প্রভৃতি নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। এই প্রকারের সহজাত ভাষা যে মনুষ্য-সাধারণেরই ভাষা হইবে তাহা সাধারণ যুক্তিতেই বুঝিতে পারা যায়। বস্তুতঃ মনুষ্যদিগের "ব্যক্ত ভাষা" পরস্পর

ভিন্ন হইলেও এই সহজাত ভাষার দ্বারা পরস্পরের মনের ভাব বোধগম্য হইতে পারে।

যেমন পূর্ব্বোক্ত স্বাভাবিক শব্দদ্বারা আমাদের মনের ভাব প্রকাশিত হইতে পারে, তেমনই আবার বাহ্য আকারের পরিবর্ত্তন বা অঙ্গভঙ্গীর দ্বারা ও অপর স্বাভাবিক উপায়ে আমাদের মনের ভাব প্রকাশিত হইতে পারে। প্রথমটীকে আমরা স্বাভাবিক স্বরমূলক ভাষা (Sound-Language) ও দ্বিতীয়টীকে স্বাভাবিক সঙ্কেত-মূলক ভাষা (Gesture Languag.) বলিয়া অভিহিত করিতে পারি এবং উভয়কে এক নামে সহজাত ভাষা (Natural language) নামে অভিহিত করিতে পারি। ইহা সকলেই জানেন যে অনেক সময়ে শব্দ দ্বারা যাহা প্রকাশ করা যায় না, হাব ভাব বা আকার ইঙ্গিতে তাহা প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই উভয় ভাষাই ব্যক্ত ভাষার পূর্ব্ববর্ত্তী। ইহাদের অপূর্ণতা দূর করিবার আবশ্যকতা হইতেই ব্যক্ত ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে। স্বরমূলক ভাষা দ্বারা আমরা সীমাবদ্ধ কয়েকটী ভাবকেই মাত্র প্রকাশ করিতে পারি। সঙ্কেতমূলক ভাষার ব্যবহার আলোকের মধ্যে ও সন্নিকটবর্ত্তী স্থলেই মাত্র সম্ভবপর হয়। ব্যক্ত ভাষা ইহাদের উভয়েরই স্থলবর্ত্তী হইয়াছে। এইজন্যই ব্যক্ত ভাষার অব্যয়শব্দে, স্বরমূলক ভাষার এবং অনুকার ও রূপক শব্দে সঙ্কেতমূলক ভাষার যথেষ্ট নিদর্শনই বর্ত্তমান দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে আমরা ভাষাতত্ত্ববিৎ পাশ্চাত্য পণ্ডিত সুইটের (Swect) এ সম্বন্ধে মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

"It is evident therefore, that ideas must from the beginning have been expressed by a Combination of gesture and sound. As gesture is only available in the light of day or of the campfire and when the speakers are face to face, there would also be a tendency from the first to develop the more convenient sound signs and to extend their use as much as possible, till at last they constituted the majority of the words and what was at first an easily learnt natural language, became a complex traditional one of infinitely greater convenience and range of expression p. 4—

We have already seen that language proper or "traditional language" was preceded by what we may call "natural language" which consisted partly of gestures, partly of sounds and sound-groups directly associated with the ideas they represented. There are three principal ways in which such associations can be formed, yielding three classes of imitative, interjectional and symbolic words, all of which have left numerous traces on traditional language. p 33.

History of Language, by Henry Sweet M. A. (Temple Primer)

কিন্তু কেবল শব্দের দ্বারা ভাষা হয় না। শব্দ সকল পরস্পর সম্বদ্ধ হইয়া যদি কোন পূর্ণার্থের প্রকাশক হয় তবেই তাহাদের দ্বারা ভাষা গঠিত হইতে পারে। পূর্ণার্থ প্রকাশক এইরূপ শব্দ-সমষ্টির নামই বাক্য, সুতরাং ভাষায় আমরা শব্দ ও বাক্য এই দুইটী মূল উপাদান পাইতেছি। যুক্তি-শক্তির বিকাশ ব্যতীত এইরূপ সম্বন্ধযুক্ত শব্দ প্রয়োগ দ্বারা বাক্যরচনা কখনও সম্ভবপর হইতে পারে না। যুক্তি-শক্তির দ্বারা বাক্য হইতে শব্দকে মনুষ্য যেমন ভেদ করিতে পারে তেমনই শব্দকে বাক্যে যোজনাও করিতে পারে। এইজন্যই মনুষ্যে ভাষার বিকাশ হইয়াছে, কিন্তু ইতর প্রাণিতে এই যুক্তি-শক্তির সম্যক্ বিকাশ হয় নাই বলিয়া তাহারা যেমন বাক্য হইতে শব্দের ভেদ বুঝিতে অসমর্থ, তেমনই শব্দ যোজনা দ্বারা বাক্যরচনা করিতেও অসমর্থ। এই জন্যই তাহাদের মধ্যে ভাষার বিকাশ হইতে পারে নাই। ভাষা-বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত সুইট এই সম্বন্ধে যে সারবান্ মন্তব্য করিয়াছেন তাহা আমরা এখানে উদ্ধৃত করা কর্ত্তব্য বোধ করি :—

"Language, then, implies differentiation of words and sentence. It is evident that until it has reached this stage, it cannot claim to be an efficient expression or instrument of thought: This differentiation has not been attained by animals. They can express ideas by sounds but they cannot combine these sounds together to express corresponding combination of ideas. Thus they can make a sound which serves whether intentionally or not to warn their companions of danger, but they can not as far as we know combine other sounds with it to indicate the nature of danger and if they indicate the source or locality of the danger, it is only by instinctive movements or glances." The History of Language, by Henry Sweet M. A. P. 2. (Temple Primer)

মনুষ্যের মধ্যেই মাত্র যে ভাষার অভিব্যক্তি সম্ভবপর তাহা আমরা প্রতিপাদন করিলাম। এক্ষণে মনুষ্যের মধ্যে এই ভাষার প্রথম বিকাশ কিরূপে হয় তাহাই আমরা আলোচনা করিব। ভাষার শব্দ ও বাক্য এই দুইটি উপাদানের কথা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ইহাদের মধ্যে শব্দেই ভাষার প্রথম বিকাশ কি বাক্যেই ভাষার প্রথম বিকাশ এই সম্বন্ধে ভাষা-বিজ্ঞানবিৎ-দিগের মধ্যে মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। এক সম্প্রদায় শব্দেই ভাষার প্রথম বিকাশ দেখিতে পান—অপর সম্প্রদায় বাক্যে ভাষার প্রথম বিকাশ দেখিতে পান। আচার্য্য মোক্ষমূলর প্রথম সম্প্রদায়ের অগ্রণী এবং অধ্যাপক সেইস (Sayce) দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের

পূর্ব্বোক্ত উভয় মতেই সত্য আছে বলিয়া আমাদের মনে হয়। ভাষা যখন 'সহজাত' অবস্থায় ছিল তখন মূলভাব একটী মাত্র অপরিস্ফুট শব্দ দ্বারা প্রকাশিত হইয়া অবান্তর বা আনুষঙ্গিক ভাবগুলি অঙ্গ-সঙ্কেত দ্বারা প্রকাশিত হইত। কিন্তু ভাষা যখন প্রকৃত 'ব্যক্ত' অবস্থা প্রাপ্ত হইল তখন সমস্ত ভাবই বাক্যাকারে প্রকাশিত হইল। সুতরাং বাক্য বা বাক্‌ ব্যক্ত ভাষার আদি হইতেছে।

প্রাচ্যগণ এই তত্ত্বটী সম্যক্‌রূপেই অবগত ছিলেন বলিয়া বোধ হয় তাহাতেই সংস্কৃতে ভাষার এক নাম বাক্‌ পাওয়া যায়, যথা অমরকোষ অভিধানে

"ব্রাহ্মীতু ভারতী ভাষা গীর্ব্বাগ্‌ বাণী সরস্বতী ॥"

আমরা ঋগ্বেদের ভাষা-উৎপত্তির যে বর্ণনা উপরে উদ্ধৃত করিয়াছি তাহাতেও ভাষার পরিবর্ত্তে বাক্‌ শব্দটীরই ব্যবহার দেখা যায়। ইংরেজীতে মনুষ্য শব্দের বাচক যে Voice শব্দ প্রচলিত আছে এবং ইহার মূল Latin ভাষার যে Vox, Vocis শব্দ পাওয়া যায় তৎসমস্তই মূলে বাচ্‌ শব্দের সহিত একই প্রাকৃতিক শব্দ। এই voice শব্দে মনুষ্য ভাষা-উৎপত্তির ইতিহাস যেন অতি স্পষ্টাক্ষরে মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে। এই Voice শব্দ হইতে আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে মনুষ্য প্রথম যে শব্দদ্বারা ব্যক্ত ভাষার সূত্রপাত করে তাহা বাক্যরূপ শব্দ, কারণ Voice ও বাক্‌-এ মূলতঃ কোনও ভেদ নাই।

প্রথম ভাষা গঠন যে অখণ্ড বাক্যাকারে ছিল কিন্তু খণ্ড খণ্ড শব্দাকারে ছিল না সংস্কৃত 'ব্যাকরণ' শব্দেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় বলিয়া আমরা মনে করি। ব্যাকরণ শব্দের অর্থ বিশ্লেষণ। অখণ্ড বাক্যকে বিশ্লেষণ করিয়া তদন্তর্ভূত শব্দ সকলকে পৃথক্‌ভাবে প্রদর্শন ও তাহাদের পৃথকভাবে সম্বন্ধ নির্দ্দেশ ইহাই ব্যাকরণের প্রধান কার্য্য।

তৈত্তিরীয় সংহিতায় ব্যাকরণ রচনার আদি ইতিহাস ও তৎ-প্রসঙ্গে ভাষার প্রথম প্রকাশের যে বৃত্তান্ত পাওয়া যায় তাহাতে আমাদের বক্তব্যের সম্পূর্ণ সমর্থনই পাওয়া যায়। আমরা বিশ্বকোষ হইতে এতদ্বিষয়ক আলোচনা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

"তৈত্তিরীয় সংহিতায় দেখিতে পাই যে, সেই অতি পূর্ব্বকালে ব্যাকরণ রচিত হইয়াছিল এবং ইন্দ্রই সর্ব্বাদি শাব্দিক। যথা—

"বাক্‌বৈ পরাচী অব্যাকৃতা অবদৎ। তে দেবা অব্রুবন্‌ ইমাং নো বাচং ব্যাকুরু। সোঽব্রবীৎবরং বৃণৈ মহ্যং চৈব বায়বে চসহ গৃহ্যতা ইতি। তস্মাদৈন্দ্রঃ বায়বঃ সহ্যতে। তামিন্দ্রো মধ্যতোঽবক্রম্য ব্যাকরোৎ। তস্মাদিয়ং ব্যাকৃতা বাগুদ্যতে তদেতদ্ব্যাকরণস্য ব্যাকরণত্বম্‌ ॥" "অস্ত পরাচী পুরাতনী বাক্‌ বেদরূপিণী অব্যাকৃতা মেঘধ্বনিতবদখণ্ডাকারা অবিদিত-পদ-বাক্য-প্রভেদেতি যাবৎ। তামিন্দ্রো মধ্যতোঽবক্রম্য বিচ্ছিন্ন এতাবদিদং বাক্যং বাক্যে চৈতানি পদানি পদেষু চৈতাঃ প্রকৃতয়ঃ এতেচ প্রত্যয়াইত্যেব মবক্রমণং বাচোবিভেদনং কৃতবেত্যাদি ॥" (ভাষ্য)

তাৎপর্য্য এইরূপ "পুরাতনী বাক্‌ অর্থাৎ বেদরূপ বাক্য প্রথমে মেঘ গর্জ্জনের ন্যায় অখণ্ডাকারে আবির্ভূত ছিল। তন্মধ্যে কতটা বাক্য, কতটা পদ তাহা কেহ বুঝিত

না। তখন দেবগণ প্রার্থনা করেন যে বাক্য প্রকাশ করুন। ইন্দ্র বেদরূপ বাক্যকে মধ্যে মধ্যে বিচ্ছিন্ন করিয়া বাক্য, পদ, প্রত্যেক পদের প্রকৃতি, স্পষ্ট করিয়াছিলেন।" বাক্য, পদ পদের অন্তর্গত প্রকৃতি প্রত্যয় নিষ্পন্ন শব্দ বিশেষরূপে ব্যক্ত করাই ব্যাকরণের কার্য্য।"

তৈত্তিরীয় সংহিতার উপরের বর্ণনায় আমরা বাক্যই যে ভাষার প্রথম উৎপত্তি তাহার স্পষ্ট উল্লেখই পাইতেছি।

শব্দ সকলই ভাষার মূল উপাদান। সুতরাং শব্দ সকলের মূল গঠন সম্বন্ধে আলোচনা এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া বিবেচিত হইবে না। শব্দের গঠনে আমরা ব্যাকরণে প্রকৃতি, প্রত্যয় ও বিভক্তি এই কয়েকটী প্রধান উপকরণের উল্লেখ পাই। শব্দের মূল ধাতু বা প্রকৃতির সহিত প্রত্যয় যোগ করিয়াই শব্দ নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। শব্দের সহিত বিভক্তিযুক্ত হইলেই তাহা সুবন্তপদ রূপে পরিণত হইয়া বাক্যের কারকাংশ গঠন করিয়া থাকে, ধাতুর সহিত অন্যপ্রকার বিভক্তিযুক্ত হইলে তাহা তিঙন্তপদরূপে পরিণত হইয়া ক্রিয়াংশ গঠিত করিয়া থাকে। এইরূপেই বাক্যের গঠন সম্পাদিত হয়, যথা "সুপতিঙন্তচয়ো বাক্যং ক্রিয়া বা কারকান্বিতঃ॥" পূর্ব্বোক্ত প্রকৃতি, প্রত্যয় ও বিভক্তি সকল প্রথমে ভাষায় কি আকারে বর্ত্তমান ছিল তাহা নির্ণয় করা সহজসাধ্য নহে। বর্ত্তমান আকারে ইহারা কখনও ভাষায় পৃথক্‌ভাবে বর্ত্তমান ছিল বলিয়া সম্ভবপর বোধ হয় না। ভাষা-বিজ্ঞানবিৎদিগের মতে ইহাদের সকল গুলিই এক সময়ে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র শব্দ ছিল এবং স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে ব্যবহৃত হইত কিন্তু কালে বিশেষ বিশেষ শব্দের বিশেষ বিশেষ শব্দের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধবশতঃ সংযোগ হইতে ইহারা বিকৃতি ও রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া বর্ত্তমান আকার গ্রহণ করিয়াছে। ক্রিয়া-বিভক্তি-সকলকে ভাষা-বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ বিভিন্ন পুরুষীয় সর্ব্ব-নামেরই রূপান্তর বলিয়া মনে করেন। পূর্ব্বোক্ত রূপান্তরিত সর্ব্বনাম যোগে ক্রিয়া একটী সঙ্ক্ষিপ্ত বাক্যে পরিণত হইয়াছে। ক্রিয়ার বর্ত্তমান ধাতু অংশটী পূর্ব্বে একটী স্বতন্ত্র ক্রিয়া-শব্দই ছিল, সর্ব্বনাম ইহার সহিত যুক্ত হইয়া যেমন বিকৃত হইয়া বিভক্তিরূপ প্রাপ্ত হইয়াছে তেমনই ইহাও বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়া ধাতুরূপে পরিণত হইয়াছে। সমাসবদ্ধ পদসকল পূর্ব্বে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বাক্য ছিল, সঙ্ক্ষিপ্ত হইয়া সমাসের আকার ধারণ করিয়াছে। পাশ্চাত্য ভাষা-বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত হুইটের "ভাষার ইতিহাস" (History of Language) নামক পুস্তকে পূর্ব্বোক্ত তত্ত্ব-সকল পরিষ্কাররূপ বিবৃত হইয়াছে, এখানে আমরা তাহা হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

"An impartial study of the morphological development of languages makes it tolerably certain that all inflectional languages must once have been isolating and have passed through the agglutinative stage." p. 67.

"This period, again, must have been preceeded by one of more or less agglutination, in which the

cases were mere post—positions, and this period was preceded in its turn by an isolating period, in which grammatical relations were indicated by word order and the use of particles p. p. 110—111.

Composition and derivation, though the result of the fixed order of words in sentences, are thus word forming and not sentence forming processes p, 42

If we define inflection as "agglutination run mad" we may regard incorporation as inflection run madder still! It is the result of attempting to develop the verb into a complete sentence p. p. 65—6.

Composition—This "pre-adjunct—" order putting the adjunct or modifying word—before its head word that is, the word whose meaning it modifies is evidently very old in Aryans, for it is the basis of the Aryan method of forming compound words. Such compounds as the Sanskrit raja-putra, "king's son", Greek hippo-damos "horse taming" theo-dótos, "god-given, given by god" are simply fragments of sentences—they were originally groups of words preserved from the pre inflectional period of Aryan, in which grammatical relations were shown by merely putting the adjunct word before its head word; in the above compounds the first elements are equivelent respectively to genitives, accusatives and instrumentals or ablatives. As the connection between the members of such groups began to be more more intimate, the whole group came at last to have only one accent, as if it were a single word, hence, when it became the rule that every noun and adjective must have its relations to the other words in the sentence shown by inflection the first elements of these groups were passed over and allowed to remain uninflected, and being regarded now as only parts of words, they lost their freedom of position in the sentence, and so, such a form as hippo could only form part of a word, and was no longer an independent word" p. 41.

উদ্ধৃত মন্তব্য সকল হইতে বাক্যই যে ভাষার আরম্ভ তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আমরা প্রাপ্ত হইলাম। আমরা উপরে শব্দ-সম্বন্ধে যে আলোচনা করিলাম, তাহাতে শব্দ সকল যে অর্থযুক্ত হইয়া বাক্যে প্রযুক্ত হয় তাহার

উল্লেখ আমরা করি নাই। অর্থ প্রকাশের জন্যই শব্দ প্রয়োগ হয়—সুতরাং বাক্যের কোন শব্দই নিরর্থক হইতে পারে না, সকল শব্দই সার্থক। অতএব—শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ নিত্য। তাহাতেই কালিদাস এই উপমা দিয়াছেন, "বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ"। শব্দার্থের এই নিত্য-সম্বন্ধ ঐশ্বরিক নিয়মেই হইয়াছে, তাহাতেই দুর্গাকে শব্দের আধার ও শিবকে অর্থের আধার রূপে শাস্ত্রে বর্ণিত দেখা যায়, যথা "শব্দজাতমশেষন্তু ধত্তে সর্ব্বস্য বল্লভা। অর্থরূপং যদখিলং ধত্তে মুগ্ধেন্দুশেখরঃ॥"

পূর্ব্বোক্ত কল্পনায় আমরা শব্দ ও ভাষা উৎপত্তির বিশেষ কৌতূহলজনক ইতিহাস সন্নিবদ্ধ দেখিতে পাই। শব্দের উপাদান বর্ণ বা অক্ষর। অক্ষর সকল বা সমগ্র বর্ণমালা আমরা "মাতৃকা" নামে শাস্ত্রে অভিহিত দেখি। মাতৃকা-দেবী দুর্গার এক নাম। মাতৃকা হইতে উৎপন্ন বলিয়া বর্ণের নাম মাতৃকা। ইহাতে শাস্ত্রের ব্যাখ্যা যেমন হয়, এই ব্যাখ্যাতে দুর্গা যে শব্দের আধার বলিয়া পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, তাহার সহিতও সামঞ্জস্য হয়। কিন্তু আমরা এই শাস্ত্রের ব্যাখ্যা অপেক্ষাও ইহার মধ্যে যে একটী ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা আছে তাহা হইতে অধিক সত্যলাভের আশা করি। বর্ণ বা বর্ণাত্মক শব্দ সকল প্রথম মাতার দ্বারাই উচ্চারিত হয় বলিয়াই উহাদের নাম 'মাতৃকা' হইয়াছে ইহাই আমাদের নিকট ইহার প্রকৃত ব্যাখ্যা বলিয়া বোধ হয়। বস্তুতঃ সন্তানের নিকট নিজের মনোভাব প্রকাশ করিয়া তাহার সহিত আলাপের প্রয়োজনীয়তা হইতেই মাতাকর্ত্তৃক শব্দ ও ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে ইহাই ভাষার প্রথম ইতিহাস বলিয়া আমাদের মনে হয়। মাতা ও সন্তানের যেরূপ ঘনিষ্ঠতা এরূপ আর কাহারও নহে। সুতরাং সন্তানের সহিত সর্ব্বদা সংসর্গ হেতু এবং সন্তানের লালন-পালন ও শিক্ষা মাতারই কর্ত্তব্য বলিয়া এই সমস্ত প্রয়োজন সুসাধন জন্য যে মাতাতেই প্রথম ভাষার বিকাশ হইবে তাহা অযৌক্তিক বলিয়া বিবেচিত হইবে না। আমরা প্রথম মাতার নিকট হইতে ভাষা শিক্ষা করি বলিয়া আমাদের শৈশবের ভাষা "মাতৃভাষা" বলিয়া কথিত হয় তাহা সকলেই অবগত আছেন। বাঙ্গালার মাতৃকা নামের অনুকরণে "মাতৃভাষা" নাম কল্পিত হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। ইংরেজী mother tongue কথাটিও এই ভাবে কল্পিত হইয়াছে।

মাতার দ্বারা বর্ণাত্মক শব্দ ও শব্দাত্মক ভাষা প্রথম প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু পিতার দ্বারা শব্দের বা ভাষার প্রকৃত অর্থ প্রথম আবিষ্কৃত ও প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতেই শিব অর্থের আধার রূপে বর্ণিত হইয়াছেন। মাতা ভাষার প্রথম গঠন প্রদান করিয়াছেন; কিন্তু পিতা ইহার প্রথম বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যারই নাম ব্যাকরণ বা শব্দ-শাস্ত্র, সুতরাং পিতা হইতেই ব্যাকরণ বা শব্দ-শাস্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছে আমরা বুঝিতে পারিতেছি। ইহার প্রমাণস্বরূপ আমরা উল্লেখ করিতে পারি যে, শিবকে আমরা অর্থের অধিষ্ঠাতা দেবতা দেখিতে পাই, তাঁহাকেই আমরা ব্যাকরণেরও প্রণেতা দেখিতে পাই। তাঁহাতেই তৃতীয় মহেশ নামে

"মহেশ ব্যাকরণের" উল্লেখ পাওয়া যায়। পাণিনি স্বকীয় ব্যাকরণে মহেশ ব্যাকরণের প্রত্যাহার-সূত্র সকল উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই প্রত্যাহার-সূত্র সকলে বর্ণসকলের যেরূপ শৃঙ্খলা দেখিতে পাই, তাহাতে বুঝিতে পারা যায় যে ঐ ব্যাকরণ রচনার পূর্ব্বেই বর্ণসকল বিদ্যমান ছিল। ইহা মাত্রা হইতে বর্ণোৎপত্তির অন্যতর প্রমাণ বলা যাইতে পারে। মহেশ ব্যাকরণ যে পাণিনি ব্যাকরণ অপেক্ষা কেবল প্রাচীন নহে, উৎকৃষ্টও ছিল, নিম্নোক্ত সুপ্রচলিত বাক্যদ্বারাই তাহা প্রমাণিত হয়, যথাঃ—

"যান্যুজ্জহার ব্যাসোমাহেশাদ্ব্যাকরণার্ণবাৎ।
কিন্তানি পদরত্নানি সন্তিপাণিনি গোষ্পদে॥"

"ব্যাসদেব মাহেশ ব্যাকরণরূপ সমুদ্র হইতে যে সমস্ত রত্ন উত্তোলন করিয়াছেন সেই সমস্ত পদরত্ন কি পাণিনি রূপ গোষ্পদে আছে?"

কেবল যে পতি-কর্ত্তৃকই ব্যাকরণ বিরচিত হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায় তাহা নহে, পুত্র কর্ত্তৃক ব্যাকরণ বিরচিত হওয়ারও প্রমাণ পাওয়া যায়। কাতন্ত্র ব্যাকরণ কুমার বা কার্ত্তিকের হইতে প্রাপ্ত বলিয়াই ইহার নাম কলাপ বা কৌমার ব্যাকরণ হইয়াছে। ইহাতেও বর্ণসকলকে "সিদ্ধ" (বর্ত্তমান) বলিয়াই ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। তাহাতেই ইহার প্রথম সূত্র হইয়াছে "সিদ্ধো বর্ণসমাম্নায়ঃ॥" ইহাতেও বর্ণসকলের সহিত যেন মাত্রার যোগের প্রমাণ পাওয়া যায়।

এই প্রকারে জগতের আদি পিতামাতার সহিত ভাষা ও অর্থের যোগ হইতে তাহাদেরই বর্ত্তমান প্রতিরূপ আমাদের পিতামাতার সহিতও তাহাদের যোগ হইয়াছে। এখানে জগতের আদি পিতামাতার সহিত কবিগুরু কালিদাসের ভাষায় আমাদের পিতামাতাকে, আমাদের ভাষা ও অর্থের জন্য বন্দনা করিয়া আমরা আমাদের প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি:—

"বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থ প্রতিপত্তয়ে।
জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্ব্বতী পরমেশ্বরৌ॥"

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

সাদেকা

অতুল রূপসী কৃষক-বালিকা
কথা কয় ভাঙা ভাঙা,
নাকেতে বেসর, নয়নে সুর্ম্মা,
হস্ত মেহেদী-রাঙা।
বিবাহ না হ'তে, জানিতে পেরেছে,
ইসুফ তাহার বর,
দেখিলে লাজেতে করে মাথা হেঁট,
এক-পাড়াতেই ঘর।

বিবাহের সব হইয়াছে ঠিক,—
সে সকল কথা থাক্,
প্রণয়ী ইসুফে সহসা পড়িল
সমরে যাইতে ডাক।
নিটোল গঠন, জোয়ান যুবক,
বিশাল বরাট বুক,
সমরে যাইতে তবুও কি জানি
মলিন হলো যে মুখ।

সোহাগে সাথীর কবজুটি ধরি
    পরশি অধর তার,
গোপনে বলিল "হয়ত সখিরে
    হবে না কো দেখা আর।"
কহিল কিশোরী "কবরে গেলেও
    পেলে এ পরশ্ তব,
নবীন জীবন লভিয়া আমি যে
    অঙ্গে জড়ায়ে রব।"
*   *   *
পাঁচটি দীর্ঘ বরষ কেটেছে
    ফিরছে যুবক গ্রামে,
হৃদয় তাহার ব্যাকুলি উঠিছে
    শুধু সাদেকার নামে।
প্রবেশছে গ্রামে, রক্তা বাসে ঢাকা
    কার মৃতদেহ যায়,
সারা বুক তার কেপে উঠে কেন?
    মুখে উঠে হায় হায়।
গেহে গিয়া যুবা শুনিল তথায়
    "সাদেকা গিয়াছে মারা,
এখন তাহার সমাধির পর
    কাঁদিছে সকল পাড়া।
তাহারি অমতে পিতা দিল তার
    বিবাহ অপর সনে,
তাহাতেই বুঝি উপজিল রোগ
    দারুণ বিধির মনে।
দুদিনের এক তনয় রাখিয়া
    চলে গেল ধরা ছাড়ি,
লাভ হ'ল বুঝি, সেথাইতে মুখ
    ইসুক ফিরেছে বাড়ী।
রটায়েছে লোকে ইসুক মরেছে,
    "কুতএল্-আমার' রণে,
দুদিন ধরিয়া সাদেকা কেঁদেছে
    কি প্রীতি তাহার সনে।

গভীর নিশীথে গোপনে ইসুক
    একাকী সমাধি খুঁড়ে,
চাকেরের মত, একি এ কাণ্ড!
    মৃতের মাথার পুরে।
কতবার তার কাঁপি উঠে হাত
    ভাবে দেখিতেছে কেহ,
মাটী হতে ধীরে বাহির করিল
    তরুণীর মৃতদেহ।
কাঁদিয়া অধরে চুম্বন দিল
    আছে কি সংজ্ঞা লেশ?
বুকেতে জড়ায়ে রমণীর দেহ
    ইসুক ত্যজিল দেশ।
প্রাতে 'মাতোয়ালি' চোখ সমাধিটী
    পুন লেপি দিল মাটী,
রাখিল এ-সব প্রকাশিতে নাই
    'জিনের' কাণ্ড খাঁটী।

সাত-বরষের পরে যে আবার
    ইসুক এসেছে ঘুরি,
সঙ্গে তাহার রূপসী পত্নী
    সজীব কনক ছুরী।
গ্রামে কাণাকাণি করিছে সবাই
    এই ত সাদেকা বটে,
মরা মানুষের ঘরে ফিরে আসা
    কেমন করিয়া ঘটে।
সাদেকার স্বামী প্রিয়ারে তাহার
    পুনরায় ফিরে পেতে,
ইসুকের নামে নালিশ করিল
    অচিরেই আদালতে।
জানালো সাদেকা, জনম তাহার
    সুদুর জোয়ান-পুরে,

ও স্বামীরে কই, চেনেনা জানেনা,
দেখেনি জীবন ধরে।
স্বামী বলে তায় "চিনি ওই রূপ,
কপালেতে সেই তিল,
সেই বটে মোর আর কেহ নয়
হুবহু যে সব মিল।
সমাধি তাহার তুলিয়া দেখেছি
অস্থিও নাই তাতে,
বুঝিতে পারিনে কেমনে জুটিল
হেতা ইস্থকের সাথে।"
বিচারক ক'ন "মৃত বটে সে ত
নাহি সন্দেহ-রেখা,
সমাধি হইতে উঠিল কি মৃত
করিতে আবার 'দেখা' ?
হেকিম দেখেছে বলিয়াছে মৃত
প্রোথিত করেছে সবে,
এক্‌রূপ হয়ে দুইটী প্রতিমা
থাকিতে নাহি কি ভবে ?"
চতুর সে স্বামী কিছু নাহি বলি
ছাদকে সেখানে রাখি,
জননীর ছবি শিশু বালকেরে
নিকটে আনিল ডাকি।
দেখি রমণীরে একমুখ হাসি'
শিশু কাছে গেল সরি',
নাহি চেনা তবু দাঁড়ালো তাহার
সাড়ীর আঁচল ধরি।
কোর মুখ তার সহসা রমণী
ঢলিয়া পড়িল খুমে,
এবার ইস্থক জাগাতে নারিল
শতবার মুখ চুমে!

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

জহর খাওয়া

(গল্প)

বোগদাদ সহরের সীমান্তে সে বন—যেমন ঘন তেমনি শ্যামল। বনের পাশ দিয়ে অজগরের মত দেহটী বেঁকিয়ে বয়ে গেছে ক্ষীণা ঝালানদী,—তন্‌তরে তার ধার, টলটলে তার জল। বনের বুকে বুকে হাওয়া যখন ক্ষেপে ওঠে, নদীরও বুকে ঢেউ-গুলো তখন মাতালেরই মত মত্ত-উচ্ছ্বাসে ফুলে উঠে পাহাড়ের পায়ের উপর আছাড় খেয়ে পড়ে।

নদী-পাহাড়ির উপর ছোট্ট কুঁড়েখানি—ছাউনির উপরটা তার আগাগোড়াই লতায় লসিত পাতায় সবুজ; বেড়াখানি বেয়ে বেয়ে বন-ধুঁধুলের গাছ ঘরের ভিতর অবধি গিয়ে পৌঁছেচে। মটকার উপর বসে বসে ঘুঘুটা যখন-তখনই তার প্রিয়ার কাণে কাণে প্রাণের গোপন কাহিনী শোনায়—কোণায় বাসা বেঁধেছে একজোড়া পায়রা, তারা মুখো-মুখি বসে ডাকে,—"বগ্‌বকম-বগ্‌"—আর ভোর না হতেই এসে চুমো খেয়ে যায় ওই লতার মুখে এক রাশ সোনার আলো! কুটীরের

সাম্‌নে উঠানখানি ঘন সতেজ ঘাসে ঘাসে একটানা সবুজ। দেখ্‌লে মনে হয় স্বভাব-লক্ষ্মী বুঝি কোন্ সুনীল পাতে স্নান ক'রে এসে সিক্ত শাড়ীখানি তার এইখানে মেলে দিয়ে গেছে—ঝালা নদীর নীলা-রেখায় সে কাপড়ের ঝলমলে রূপুর কস্তা পাড়টী মানানো।

এই কুঁড়েখানি জুড়ে একটা শিকারীর সাধের ঘরকন্না পাতা। শিকারী আর তার বৌ—বুকে বুকে গাঢ়-টানা চল ভালোবাসায় যুগল বাহুর নিবিড় বেষ্টনে প্রাণে প্রাণে এক সুখে-দুঃখে সমানই শান্তিতে সেইখানে বাস করে—আজ আট বছর।

শিকারীর নাম বার্—বউকে সে ডাকে "দুরারী" বলে। দুরারী সত্যই সুন্দরী। গোলাপ ফুলের মত টকটকে তার রঙ বিদ্যুৎ ভেঙ্গে চুনিয়ে বাঁধা বুঝি তার অঙ্গ। ফোটা পদ্ম সদ্য তুলে যত্নে গড়া তোড়াটীর মত ঢল ঢল তার মুখখানি। নিটোল দুখানি গাল ঈষৎ একটু তোলা তোলা, মাঝখানটীতে কে বুঝি-ফাগ-গোলা কুঙ্কুম ছুঁড়ে মেরেছে। ডাগর দুটী টানা চোখ কালো কালো; তরুণের বুকে ভালোবাসার প্রথম শিহরণের মত চঞ্চল তার দৃষ্টি। একরাশ চুল মিশ্‌মিশে কালো, উঁচু নাক, সুডোল হাত-পা,—আরো আরো সব এম্‌নি যা,—সে আর বলা যায় না। মরালীর মত বাঁকা গ্রীবাটীতে একগাছি মুক্তা রঙের পুঁতির মালা। কোমল বাহুর মূলে পিতলের বাজু, মণিবন্ধে তারি দুগাছি সরু সরু কাঁকণ আঁটা। পাকা জামের রঙের নীলাম্বরীখানি পরে দুরারী যখন দাওয়ায় এসে বসে, তখন দেখে মনে হয়, সেই স্বপ্ন-সুকুমার তনুখানিও বুঝি তার বনান্তের বাতাসে ফুলের মতই দুলে উঠছে। তার সমস্ত রূপখানি ছেয়ে একটা স্বাধীনতার আলো সারাদিন খেলা করে—সে সৌন্দর্য্য সেই টাইগ্রীস আর ইউফ্রেটীস নদীর ধারা-ধোয়া গোলাপ-ফুলের স্বপ্ন-রাজ্যেই শুধু গড়ে ওঠবার।

বনের উপর দুপুর বেলাটী তপ্ত হয়ে এলে বার্ চারটী খেয়ে শিকারে বেরোয়। বনের হরিণীটীর মতন স্বাধীন দুরারী সেই কুটীরখানির ছায়ায় ঝালা-তীরে এসে বসে; সুগৌর পিঠের উপর দিয়ে ভিজে ভিজে চুলের গোছা ছড়িয়ে শুকোতে দেয়। ঝালার স্রোতের উপর তপ্ত কিরণ ভরা যৌবন নিয়ে খেলা করে; নদীর ও-পারে সবুজ ক্ষেতের ধার দিয়ে হরিণটা ছুটে পালায়; ঝোপের ঘন আড়ালে কোনোখানে বা একটুক্‌রো মেঘের মতন সাদা খরগোষটা ঘুমিয়ে থাকে, ঝোপের নীচে স্বচ্ছ ছায়াখানা গাছের পাতায় সবুজ বুকে করে চক্ চক্ করে—তার উপরে আঙুর-লতার বুকের সোনা ঝলক-মারা রোদের ফাঁকে টুক্‌রো হয়ে এলিয়ে পড়ে; লতার মুখে রস লীলায়িত ললিত; গাছের মাথায় কি সুঘন শ্যামলতা, ফুলের গন্ধে সেই কোন অজানা কারিকরের নিপুণ তুলির টান—সেই কোন্ অগোচরের সংগোপন খবর বলে যায় যে বর্ণ-রেখা, দুরারী তাকিয়ে তাকিয়ে সেই সব দেখে; কখনো বা পাতার উপর ছবি আঁকে, আলতার লাল আর পেস্তা পাতার সবুজ দিয়ে সে লেখার রঙ ফলায়। আবার হয়তো কখনো দেওয়ানা বুলবুলটার অফুরান কাঁদা-কাটা শুনে

শুনে আর পারে না, চোখ দুটী তার জলে ভরে আসে—পাখীটার প্রাণের সুরে আপন অনুভব মিলিয়ে কি এক অব্যক্ত ব্যথায় বুকখানা তার ভরিয়ে তোলে।

এমনি করে বান্নুর ঘরের প্রেমের দুলাল দুয়ারী আপন মনের নির্ভীক সুখে সারাটা দীর্ঘ বেলা কাটিয়ে দেয়; আস্তে আস্তে গোধূলি-লগ্ন ফুরিয়ে গেলে দুয়ারীর চোখের সামনে বনের সন্ধ্যা কালো হয়ে আসে;—স্বামীর আশায় পথের দিকে চেয়ে চেয়ে—"সে এখুনি আস্‌বে"—পাখীটা উড়ে গেল "ঐ বুঝি সে এলো"! হরিণটা ছুটে পালায়—"তারই তো পায়ের শব্দ"!—এম্‌নি ভেবে ভেবে মুগ্ধ বেদেনী তার একান্ত হৃদয়খানা প্রাণেশের ভাবনায় ভরে তোলে। বনের আলো নিবে গেলে সারাদিনের পর বান্নু ঘরে ফিরে তার পটের মতন উঠোনখানির ছায়ায় দাঁড়িয়ে ডাকে—"দুয়ার"—দুয়ারীর বুকের ভিতর আবেগ কেঁপে কেঁপে নেচে ওঠে। সে অম্‌নি ছুটে এসে বান্নুর শ্রান্ত চক্ষু দুটির সাম্‌নে দাঁড়াতেই দুজনে দুজনের মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলে। দুয়ারীর মুখের সে হাসি অগাধ হৃদয়ের কন্দর ভেঙে উৎসের বেগে বেরিয়ে এসে বান্নুর গায়ে শ্রান্তি-হরা, আবেশ-ভরা তৃপ্তির পরশ বুলিয়ে দেয়—তার সারাদিনের ভ্রমণ-পরিশ্রম সার্থক হয়ে যায়—আর দুয়ারীর সারা-দুপুরের চিন্তা-ম্লান কপোলদুটীতে তখনি দুটী চুম্বন গোলাপ ফুলের মত ফুটে উঠে সেখানকার সমস্ত কালো দাগটুকুকে লাল ক'রে দেয়—সে স্বামীর শিকারে-ধরা পাখীগুলোকে কুটীরে নিয়ে যায়।

এমনি করে দিন-ভরা বিরহে, আর রাত-ভরা মিলনে শিকারি-দম্পতীর আনন্দের ঘর-সংসার অনেক দিন চল্‌লো—তারপর একদিন দুয়ারীর রূপ তার সুখের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বস্‌লো! অদৃষ্টের ক্রুর আকাশে তার সাদা হাসি রক্ত-মেঘ সেজে বান্নুর সাজানো বাগানে তুফান তুলে দিলে—হতভাগা বান্নু নিজেকে বাঁচিয়ে চল্‌বার জন্য তোয়ের হবার অবসরও পেলে না।

বসন্ত-প্রান্তের রক্ত বরণ বনলক্ষ্মীর পল্লব-রাগে মিশে তরু-শিরে যেন কোনো তরুণীর চরণ-লিপ্ত অলক্তক-লেখা রেখে দিয়েছে। ফুটন্ত মঞ্জরীর ঘুমন্ত মুখে চুমো খেতে চরণ ধরে তার ভ্রমর-বঁধুর গুরু গুঞ্জরণ বাঁশীর তারের মতই ঝঙ্কৃত হয়ে উঠেছে।

বাদশাজাদা আজ সকালে শিকারে এসেছেন—তাঁবু পড়েছে হাজার দু'হাজার। আমোদ ক'রে পশু বধ, তাই আবার শাজাদার খেয়াল-ভরা চিত্ত তলের বছর-পরের সখ! হুকুম করবামাত্রই সব তামিল হয়েছে—হাজার হাজার হাতী-ঘোড়া, লোকজনে সহর-তলীর উচ্চ কোলাহল এসে লেগেছে এই নিবিড় বনের নীরব সীমানায়।

বাদশাজাদা হরিণ, বাঘ, পাখী অনেক শিকার করলেন। শিকারের পিছনে ছুট্‌তে ছুট্‌তে শিবির ছেড়ে অনেক দূরে এসে পড়লেন—এদিকে বনের স্নিগ্ধ সকাল-বেলা দিক্‌-চক্রবালের আড়ালে গড়িয়ে যেতেই দুপুরের আগুন জ্বলে উঠ্‌লো। ধূসর একটা খরগোষ তখন প্রাণের ভয়ে তার কোমল দুটী চোখের তারা বড় বড় করে বাদশাজাদার লুব্ধ চোখের সামনে দিয়ে ছুটে গেল।

বাদশাজাদার নিষ্ঠুর বুকে সে করুণতা-ভরা দৃষ্টি এতটুকুও ব্যথা জাগিয়ে দিতে পারলে না—তিনি তীর-ধনুক নিয়ে সেই ছোট্ট খরগোশটার মধুরতম অন্তরালের সমস্ত প্রাণটুকুর জন্য ছুটলেন। বেচারা নিরীহ প্রাণী, প্রাণপণে দৌড়লো—বুঝি তার শঙ্কার মৌন নিবেদন সেই মৌন দেবতার চরণ-তলে গিয়ে পৌঁছেছিল—অনেক দূরে গিয়ে একটি পাহাড়ে ঝোপের পাতার আড়ালে কোথায় সে মিলিয়ে গেল, বাদশাজাদা আর তাকে দেখতে পেলেন না। তাঁর ব্যর্থ হৃদয় ক্ষুব্ধ হয়ে খুব—ক্লান্ত দেহে তিনি সেইখানে বসে পড়লেন। কাছেই ক'টা বড় বড় বাদাম গাছ মাথার উঠানখানিতে ছায়া বিছিয়ে দাঁড়িয়েছিল, তার কচি-কচি সব কিশলয়গুলো পাখার মত দুলে উঠে বাদশাজাদার শ্রান্ত দেহে হাওয়া করে গেল—বনলতার সবুজ বোঁটা ভেঙে গোটাকতক শাদা ফুল তাঁর পায়ের নীচে ঝরে পড়ে তাদের সম্রাট-নন্দনের আতিথ্য অভিনন্দন করলে।

বাদশাজাদা কৌতুকে কুতূহলে বড় অনেকক্ষণ ছুটেছিলেন বেশ দূর এসে পড়েছেন—অবসন্ন দেহখানা আয়াসে বয়ে কতদূরের সেই মৃগয়া-শিবিরে ফিরে যাবার আর তাঁর ইচ্ছা হল না—বলও পেলেন না,—ক্ষুধা-তৃষ্ণার জ্বালায় সমস্ত দেহ-মন অবসন্ন কাতর হয়ে উঠলো।

বায়ু তখন—রোজই যেমন যায়—বনে বার হয়ে গেছলো। সে দিন্ন যেন কেমন ডুবারীর জিউ ভাল লাগছিল না—সে খাওয়া-দাওয়া কোনোমতে মিটিয়ে কুটীরের মেঝেয় বিছানাখানি পুরু করে পেতে শুয়ে পড়েছিল। দরজার ফাঁক দিয়ে সে রূপের জেল্লা বাদাম গাছের মাচকার ছায়া অবধি বেরিয়ে এসে রৌদ্র রেণুর স্বর্ণ-বর্ণকে মলিন করেও দিচ্ছিল বুঝি—বাদশাজাদার উৎসুক নয়নের দৃষ্টিটাকে কিন্তু সে এড়াতে পারলে না। তিনি শ্রান্ত পায়ে ধীরে ধীরে চলে বায়ুর ছোট কুঁড়েখানির কাছে গিয়ে পৌঁছুলেন, পৌঁছে ডাকলেন, "এখানে কে আছো?" কেউ উত্তর দিলে না। বাদশাজাদা আবার বললেন—"ওগো একজন শ্রান্ত মুসাফেরকে তোমরা কেউ একটু আশ্রয় দেবে?"

স্বপ্ন চকিত কুরঙ্গিনীটির মত ডুবারীর প্রাণখানা হঠাৎ চমকে উঠলো, কণ্ঠরটি যেন অন্তরের বেড়ার শীর্ণ ফাঁকে সেই কাজল-কালো টানা টানা দুটা চোখের ব্যাকুল দিঠি বার করে দিয়ে আঁতদিকে একবার সে দেখে নিলে—স্বেদ-সিক্ত কপোলের উপর তাঁর ক্লান্তির চিহ্ন কালো হয়ে উঠেছে দেখে রূপসীর বুকখানা করুণায় টলটলিয়ে উঠলো—কিন্তু পারপূর্ণ আশার মত সে ভরা যৌবনের পুলক-ভরা দৃষ্টির নেশা নয়নে নিয়ে অমন সুরূপ তরুণ মুসাফেরের তৃষ্ণার্ত চক্ষুর সামনে দাঁড়াতে সরমে ভয়ে সে শিউরে উঠলো ভাবলে, একথা সাকীর সেবার পেয়ালা পূর্ণ পেয়ে মুসাফেরের প্রাণের ঢেউ যদি কূল ছাপিয়েই কেঁপে ওঠে—সে যদি পাগল হয়ে গিয়ে একটা ভয়ানক কিছুই করে বসে।

বাদশাজাদা ক্লান্ত কণ্ঠে আবার ডাকলেন, "ওগো—" কেউ উত্তর দিলে না দেখে পরিচয় দিয়ে বললেন, "তোমরা কি তোমাদের বাদশাজাদাকে এক পেয়ালা পানীয় দিতে

নারাজ, গো? সে বড় শ্রান্ত, তেষ্টায় তার ছাতি ফেটে যাচ্ছে।"

এবার ডুরারীর নারী-হৃদয়ে আঘাত পড়লো—আর ধৈর্য্য মানলে না। সে বিছানার উপর উঠে বসে তন্দ্রা-শিথিল কালো শাড়ীখানা টেনে টেনে পরলে—তারপর নিদ্রা-অলস চোখের উপর দিয়ে ভুরুর মোটা টানটা বাঁচিয়ে পালকের চাইতেও কোমল তার হাতের মোলায়েম স্পর্শখানি বুলিয়ে নিয়ে ভয়ে ভয়ে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল।

বাদশাজাদা দেখলেন, দূর বনান্ত-রেখার চেয়েও কালো চুলের এলো রাশ গোছায়-গোছায় ঘন বেঁধে উঠে তরঙ্গেরই মত লহর খেলে গেছে। বনের ভিতর বাস করে এক বেদেনী—তার মুখের উপর কে এ অপরূপ রূপের রক্তময় দীপটী জ্বেলে দিয়ে গেছে, কার জীবনের আঁধার-রাতে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে গো? বাদশাজাদার প্রাণের উপর দিয়ে স্পন্দন ছুটে গেল বিদ্যুতের মত—রক্তের প্রবাহ ফুঁপিয়ে উঠলো তরঙ্গের মত। তার চরণ-ক্ষেপের লঘু তালে তিনি শুনলেন, এক প্রেমের গানের সলয় ছন্দ—তার আঁচল খানার মৌন মর্ম্মরে তিনি শুনলেন, কোন্ স্বপ্নলোকের নটী-কণ্ঠে-গাওয়া গানের লাবণীল মুর্চ্ছনা—এক মুহূর্ত্তে মুগ্ধ হয়ে তিনি একটা কি ভেবে ফেললেন—সেই সময় ডুরারী মাটীর দিকে আঁখির তারা নীচু করে বল্লে, "আমি যে বেদেদের মেয়ে—শিকারীর ঘরের বউ। আমার হাতের—"

"তাতে বয়ে গেছে—শাজাদার। আমার আভিজাত্যের গৌরব নষ্ট করবে কে সে ক্ষমতা? সুন্দরি, একটু পানীয়—আমি বড় পিপাসিত।"

ডুরারী বললে—"এ আমার বড় মান,—শাজাদা! স্বামী আমার শিকারে বেরিয়েছে—মুসাফেরকে আজ আমারই হাতের সেবা নিতে হবে।"

"মোসাফের ধন্য হয়ে যাবে—"

অমি দেরী নয়,—ডুরারী তার যা-কিছু শোভন, সরস, খাঁটী, মিঠা,—তাই দিয়ে অতিথিকে তুষ্ট করলে—বাদশাজাদা আছেন শুধু ঐ মুখখানির দিকে তাকিয়ে তার বুক খানার উপর কটাক্ষ হানতে—কফোনীর কাছে হাতের বাঁকটা অমন করে প'ড়ে—সে শিল্পী কেন এ রূপ তৈরি করলে!—ভাবতে লাগলেন।

এমনি ক'রে কুটীরখানার ছায়ায় বসন্তের বিকেলটা স্নিগ্ধ হয়ে এলে ঐ পরীর মতন মুখখানার দিকে ফিরে ফিরে তাকাতে তাকাতে বাদশাজাদা বিদায় নিলেন—ডুরারীর চোখে কিন্তু সেই লালসা-নীচ দৃষ্টিটা ভাল ঠেকলো না।

তার পর একদিন ফাল্গুনের সূর্য্য যখন আগুনের হল্কা তুলে দিনের মাঝ-বুকে ছুঁড়ে মারছিলেন, সেই সময় শাজাদার আরাম-বাগের অন্দর-মহল থেকে খোজা এসে তার হাতীর দাঁতের কাজ-করা তাঞ্জামের ভিতর তুলে—ডুরারীকে জোর করে ধরে নিয়ে গেল। ডুরারী কত মিনতি করলে, সেধে সেধে পায়ে ধ'রলে, তার সবুজ উঠান খানির উপর কেঁদে কেঁদে লুটিয়ে পড়ল—কিন্তু হতভাগিনীর কাঁদা-কাটা শোনবার প্রাণ তাদের কই?

বাদশার রংমহালের পাশে বাদশাজাদার যে মহলটীর চূড়া আকাশ-পানে উঁচু হয়ে উঠেছিল, তারা তাকে সেইখানে নিয়ে চল্লো,—তার সারা দুপুরের সাথী পোষা পায়রাটীও তাঞ্জামের উপরে উপরে উড়ে দুরারার সঙ্গে গেল।

সন্ধ্যাবেলা হতভাগা বান্নু এক প্রাণ আশা আর এক খাঁচা পাখী নিয়ে ঘরে ফিরলো। বাড়ীর নীচে দাঁড়িয়ে রোজই যেমন ডাকে, আজও তেমনি করেই ডাকলে—"দুরারি—" কিন্তু দুরারী তো আজ উত্তর দিলে না! বন-বনের সুদূর শেষে শুধু একটা প্রতিধ্বনি কি যেন এক ভয়ানক খবর বলে উঠলো। বান্নুর বুকখানা কেঁপে উঠলো—সে আবেগ-উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে আবার ডাকলে, "দুরারি!" কৈ, না! কাজল-টানা চোখের পাতায় আনন্দের বিদ্যুৎ চমকিয়ে—তার প্রণয়ের বাণী তো সেই তার অবসন্ন চোখের সামনে দেখা দিলে না! বান্নু ভাবলে, আজ দুরারার কি হলো, তা'হলে?

বান্নু কুটীরের সামনে গেল—কুটীরের দরজা খোলা! বান্নুর আধখানা বুক শুকিয়ে উঠল—চোখের পাতায় জল এসে তার উৎকণ্ঠিত দৃষ্টীটাকে ভিজিয়ে তুললে।

বান্নু আস্তে আস্তে কম্পিত পায়ে কুটীরে ঢুকলো—দেখে মেঝের উপর পাতা বিছানাখানা খালি পড়ে আছে—কুটীরের কোনোখানেই দুরারী নেই। তার বুকের মধ্যে একটা তীব্র হাহাকার ভয়ঙ্কর বেদনায় আর্তনাদ করে উঠলো।

সে একটা বড় মশালে আগুন জ্বালিয়ে নিয়ে কুটীরের চার ধারে,—নদীর তীরে তীরে তার আদরের দুরারীর খোঁজ করলে, সমস্ত বনটা তন্ন তন্ন করে হাতড়ালে—আঁতিপাঁতি করে দেখ্লে—তৃষ্ণা-শুষ্ক-কণ্ঠে "দুরারি, দুরারি," বলে কত ডাকা-ডাকি করলে—কিন্তু হায়রে, বেচারা! তার সে ডাকে সেদিন কেউ সাড়া দিলে না!—ক্লান্ত চোখের সম্মুখে এসে দুরারী ত ফুটে উঠলো না।

তখন আশাহারা তার ভাঙা বুকখানার উপর কেবলই একটা হায় হায় নিয়ে ঘরে ফিরে এসে দুরারীর পাতা সেই বিছানার উপর সে শুয়ে পড়লো—বিনিদ্র চোখ বুজে কত কি ভাবতে লাগলো—ভাবতে ভাবতে সারাটা রাতই সে পুইয়ে ফেললে।

পরদিন সকালে বান্নু যখন বিছানা ছেড়ে বাইরে এল, তখন পূব আকাশের সোনালি আঁচলায় রক্তরঙের ধূপছায়া কাজ করে সূর্য উঠেছে—কেলুগাছের পাতায় পাতায় তার দোদুল্যমান রঙ-নৃত্য চঞ্চল হয়ে উঠে সবুজের ফাঁকে ফাঁকে সিঁদুরের ঝরণা ঝরাচ্ছিল। আর বান্নুর বুকে তখন রক্তের ঢেউ জমাট বেঁধে উঠে নিশ্বাসটা রোধ করে ধরতে চাইছিল; এমন সময় সে দেখলে,—কেলুর লাল পল্লবের উপর ছোট্ট ছোট্ট পা দুটী পেতে দুরারার পোষা পায়রাটী বসে আছে। তাকে দেখে বান্নু পাগলের মত চেঁচিয়ে উঠলো—"দুরারী কই? আমার দুরারী—বুকের দুরারী—আমার কলিজার দুরারী—কই?" পায়রাটী আস্তে আস্তে উড়ে এসে বান্নুর হাতে বস্লো। কেলু[illegible]ই তার

লাল ছোট ছোট চোখ দুটীতে ছোট্ট ছ'ফোঁটা জল—আর ডানার সঙ্গে বাঁধা একখানা কাগজ—ঐ একমাত্র বার্ত্তা।

বান্দুর বুকে আশায় চমক ছড়াক্ করে উঠ্‌লো—সে তাড়াতাড়ি কাগজখানা খুলে দেখে—একটী ছবি আঁকা—আগাগোড়াই তার জুরারীর হাতের সেই পরিচিত তুলির টান—তার রেখায় রেখায় হতভাগা শিকারীর দুঃখ-দুর্দ্দিনের সুখ-সৌভাগ্যের জীবন মরণের চিরসাথী জুরারীর চাঁপার গুচ্ছ আঙুলের কটীর স্পষ্ট চিহ্ন ফুটে উঠে প্রাণের গোপন কোণের লুকোনো ব্যথার কাহিনী লিখে পাঠিয়েছে—প্রথমটা একটা পিঞ্জরে—তাতে সোনার শিক, মণির দাঁড়—ইরাণী আখ্‌রোট কাবুলী পেস্তা, কাশ্মীরী আঙুর অঢেল—পিঞ্জরের মাঝে একটা ময়না—ঘাড় বাঁকিয়ে মুষড়ে পড়েছে—এ সব সম্পদ সে তুচ্ছ করে পিঁজ্‌রে ভেঙে ফেলে বেরিয়ে আস্‌তে চায় ঐ উদার অবাধ একটানা আকাশের ঘন নীলিমার নীচে কিন্তু প্রহরী বড় সতর্ক—বড় কড়া তার দৃষ্টি—সে দিন রাত অষ্টপ্রহর নজর রাখ্‌ছে—ময়নাটী নিরুপায় হয়ে শুধু চোখের জলে বুক ভিজুচ্ছে। প্রাচীন এসিরীয় প্রহরীর চেহারার নীচে অস্পষ্ট অক্ষরে লেখা আছে—"শাজাদা।"

ছবি দেখ্‌তে দেখ্‌তে ঘৃণায় বান্দুর মন ছি-ছি করে উঠ্‌লো—রাগে জ্বলে উঠে তার আসল ইস্পাতের চক্‌চকে ভোজালিখানা বার করে আপন মনে সেই মাটীর উপর কোপাতে লাগলো—শেষকালে লজ্জায় ভয়ে কেমন যেন অবসন্ন হয়ে তার সমস্ত শরীর নিস্তেজ হয়ে এল—ভোজালির চোট্‌ আর চাল্‌লো না—চোখের সে ধক্‌ধকানি শুধু তখনো গেলো না—সে কেবল ফুলের গালা দিয়ে ছবির উপর ছবি আঁক্‌লে—একটা ভরা তীর-দার বাণ। পিঞ্জরের গোড়া থেকে শাজাদার বুকে গিয়ে পৌঁচেছে।

ছবি আঁক্‌তে আঁক্‌তে মনটায় তার কি জানি কি আকুলি বিকুলি উদ্দাম হয়ে উঠ্‌লো—বাদশাদের আচকান এঁটে পাখীর পালকের বাহার দেওয়া পাগড়ী চড়িয়ে সে সহরের দিকে বার হয়ে গেল—কিন্তু পায়রাটা যে সেই ছবিখানা মুখে করে আবার আরাম বাগের পানে উড়ে গেল—সে খবর বান্দু রাখলে না।

বাদশার পুরী—শ্বেত পাথরের চৌমহলা চক্‌চকে তেল-তেলা—গম্বুজ তার আকাশের নীল ছুঁতে সুরু হয়ে উঠেছে—দ্বারে শান্ত্রী ওয়ে যাল ঝল্‌মল্ করে, জেল্লাদার পোষাক ঝক্‌মকিয়ে, আঠারো হাত লম্বা উষ্ণীষ মাথায় জড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে—পাথরের উপর ঠক্-ঠকাৎ তার নাগরার শব্দ নিষেধের চেয়েও কড়া—আঘাতের চেয়েও মর্ম্মান্তিক হয়ে—পথিক বা অচেনা পরদেশীর পথ-রোধের বিজ্ঞাপন জারি করছে। বান্দু শিকারী সেই মহলের সাম্‌নে দাঁড়াতেই প্রহরীর রক্ত চক্ষু আজ আরও বক্রিম হয়ে উঠ্‌লো—কঠোর কণ্ঠ অত্যন্ত গম্ভীর করে সে বল্‌লে—"এইখো দাঁড়াও, তোমার কোতল হবে।"

রাজপুরীতে সব চুপচাপ,—দূর থেকে দেখে মনে হয়—এ ভয় মুখের দিকে তাকিয়ে

আছে। গম্বুজের নহবত-রাগিণী বন্ধ, গাড়ী-ঘোড়া চল্‌ছে না, দোকানপাট খোলে নি—সমস্ত রাজধানীটার উপর দিয়ে যেন এক কালো ছায়া আসন্ন হয়ে এসেছে—বাম্‌ আসতে আসতেই তা অনুভব করেছিল,—কিন্তু সে যে আজ মরিয়া—স্পষ্ট করেই নির্ভয়ে সে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—"আজ সব নীরব কেন, শান্ত্রী?" লোকটা বাম্‌র মুখের দিকে ক্রুর কটাক্ষে একবার তাকিয়ে ক্রুদ্ধ গলায় জবাব দিলে—"নির্বোধ, কোতল হবে তোমার। কোনো প্রশ্ন করো না।"

বাম্‌র প্রাণের ভয় নেই,—সে বল্লে, "কোতল কবুল। সব নীরব কেন, বল?"

এবার যেন প্রহরী কি ভেবে একটু নরম হল—বাম্‌র কানের কাছে মুখ নীচু করে বল্লে, "শাহাজাদা খুন হয়েছেন।"

বাম্‌র বুকের রক্ত হঠাৎ বাধা পেয়ে বুঝি থমকে গেল। সে চমকে উঠে শুধু বল্লে, 'আঁা—" বড় বড় চোখ দুটো তার তখন ধকধক করে জ্বলে উঠছে শান্ত্রী কিছু না বুঝে বল্‌লে, "হ্যাঁ—কিন্তু বাদশার কড়া হুকুম, আজ কেউ পথে বেরোতে পার্বেনা—তুমি কি ক'রে এলে, হতভাগ্য এই পুরীর দরজায়?—তোমার কোতল হবে।"

"কোতল হবে" ছাড়া সে কথার আর এক হরফও বাম্‌র কানে পৌছুলো না—সে শুধু বল্‌লে-"কোতল হবে আমার। খোদা! কোতল কবুল! শাহাজাদা খুন হয়েছেন?—কে খুন করলে তাঁকে, শান্ত্রী?"

"খবর পাওয়া যায় নি এখনো—কিন্তু আমি এই খুনের রক্তের উপর আবার নিরপরাধের হত্যায় রক্ত ফেল্‌তে চাইনে—তুমি পালাও।"

লোকটা ভাল। এর মধ্যে পুরীর ভিতর একটা অস্ফুট কোলাহল শোনা গেল—তার পর একটু স্পষ্ট—তার পর বেশ পরিস্ফুট—একজন অন্তঃপুর-চারী খোজা যাচ্ছিল—দ্বারের প্রহরী তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলে, "কি হয়েছে?" সে গম্ভীর স্বরে বললে—"বাদশাজাদাকে খুন করেছিল যে কসবী দুরানী বেগম, সে কারার ভিতর জহর খেয়েছে। বাদশা যাচ্ছেন তাকে দেখতে।"

বাম্‌ গুপ্ত আঘাতে আহত হতভাগ্যের মত একটা বিকট চীৎকার করে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে পালালো—প্রহরী দুজন দুজনের মুখের দিকে তাকিয়ে খানিকক্ষণ অবাক হয়ে থেকে শেষ একটা চাপা নিশ্বাসের সঙ্গে দুজনেই বললে—"এ কি!"

কুটীরের দাওয়ায় দুরানী যেখানে আঁচল খানি বিছিয়ে শুয়ে শুয়ে সন্ধ্যার আকাশে লাখো হাজার মাণিকের টুকরো একে একে ফুটে উঠতে দেখতো—তমাল লতার কচি বুক বেঁকিয়ে গড়া আকবার পাঁজর ভেঙে জোৎস্না যেখানে বেরিয়ে এসে খুনের রক্তের মতই লাল দুরাণীর ঠোঁট দুখানির উপর এবং আর রূপালি আঙুলের পলকা বেথায় হালকা ছায়ার আলপনা টান্‌তো, ঠিক সেইখানটায় এসে বাম্‌ আছাড় খেয়ে পড়লো, হাউ হাউ করে কাঁদলে—বুকের উপর চাপড় মেরে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো—লুটোপুটী খেয়ে পড়তে লাগলো। আবার দু' হাতে বুকখানা চেপে

অনুভব করলে—হতাশার ব্যথায় তপ্ত রক্তের স্রোত সমুদ্রের জোয়ারের মতই বুঝি ফেনিয়ে ফুঁপিয়ে চলেছে—তার পর চিৎ হয়ে শুয়ে, চুপ করে কি খানিকটা ভাবতে ভাবতে আবার চেঁচিয়ে উঠ্লো—"জহর খেয়েছে, জহর খেয়েছে—অসাড়, হিম, নীল হয়ে গেছে সে—নীল তার আঁখির তারা বিষে সুরছে,—ঠোঁটের লাল ফ্যাকাশে হয়ে গেছে—চোখের যে আর পলক পড়ে না—প্রাণের যে সাড়া নেই—একেবারে নেই—চিরদিনের জন্য নেই—হায়, হায়! হায় হায়! উঃ ফেটে গেল—বুকখানা ফেটে গেল—"

পাগল হয়ে গেল বুঝি বেচারা—দুই হাত শক্ত করে দিয়ে নিজের বাহুমূল জড়িয়ে ধরলে সে—দূরে আখরোট গাছটা নিস্পন্দ দাঁড়িয়েছিল—সেই দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখতে লাগ্লো—"ঐ তো—বেগুনে ডুরে পরে বসে আছে দুয়ারী—ঐ যে তার গলায় বনতুলসীর সবুজ মঞ্জরীর মালা দুল্ছে—ঐ যে সোনা রঙ গুটি খোঁপে আস্ছে—সোনালী চুলের কালো ফাঁকের ভিতর দিয়ে"—ছুটে গিয়ে চেপে ধরে চেঁচিয়ে উঠ্লো—"দুয়ারী", "দুয়ারী"—আলিঙ্গনের মধ্যে খালি দিলে ধরা—ছায়া। ঝালার নীরে হরিণটা এসেছিল জল খেতে—ঐ তো ঝালার জল ছল ছল কর্ছে—পাথরের উপর শিং লেগে ঠন্ ঠন্ কর্ছে—ঐ না তারি কাঁকণের কন্ কন্—হ্যাঁ দুয়ারী—আছে, আছে—ঐ যে—দুয়ারী, দুয়ারী, পেয়ারী, মেরে জান, আমার কালজা"—অমনি ঝাঁপিয়ে ধুয়ে পড়লো! হায়রে, শোক-ব্যাকুল, কেমন খেপা প্রেমিক—দুয়ারী কি আর আছে—পার্ব্বত্য নদীর স্ফটিক-ভাঙ্গা জল—শীতল বরফ—তোমার শুধু হাহাকার।

তার পর থেকে রোজই এম্নি যায়, যেখানে-সেখানে শুধু দেখে দুয়ারী—প্রাণের ভিতর তাঁর দুয়ারী, বাহুর বাঁধনের ভিতর অনুভব করে—দুয়ারী—আকাশে, বাতাসে, রৌদ্রে, শিশিরে—ভিতরে-বাহিরে—দুয়ারী, শুধু দুয়ারী।

বাঘ আর শিকার করে না—খাঁচা ভেঙে পাখী সব উড়িয়ে দিয়েছে, বিছানা-খানা ঝালার জলে ভাসিয়ে দিয়েছে, বন-কপোতের জন্যে চেঙারী বেঁধে বাসা গড়ে দিয়েছে—তারা জোড়ায় জোড়ায় সেখানে রাত কাটায় আর নিজে সে বেচারা রাত্রে কোথায় থাকে তা কেউ জানে না।

দুপুর রাত্রে যখন হীরে-মহলের চূড়ায় বাবচার পাগল চন্ চনিয়ে ওঠে, তখন হঠাৎ বাদশার ঘুম ভেঙে যায়। পশমের চেয়েও মোলায়েম তাঁর বিছানার উপর কিসের যেন তাহৃৎ স্পর্শে খাস্তটাকে সব উঠিয়ে নেয়—একটা বিষম যন্ত্রণা কাঁটায়-বোনা তার ধারালো আঁচলে বেঁধে বাদশার সমস্ত ঘুমটুকু চুরি করে পালায়! মখমলের বালিস ছেড়ে তিনি খাটের বাজুর উপর মাথা রেখে এক মনে শোনেন—দূরে বাদশা মহলের গোলাপ বাগিচার প্রান্ত রেখায় সীমাবদ্ধ সুদূর মাঠেরও ওধার থেকে হাওয়ায় ভেসে আসে সে সুর—করুণার বন্যায় স্নান করানো তার আবেগ বুঝি নীড়ের বিশে মিশে, মূর্চ্ছনায় উচ্ছ্বাসে বুক-ভাঙা কান্নার ঝরণা ঝরিয়ে দেয়—রোজই ঠিক ঐ একই সময়ে কে গায়,—

"বনের পাশে ফুটেছিল সেই একটী গোলাপ—নিষ্ঠুর তুমি ওগো পথিক, ঝড়ের মত নিমেষে এসে পাপড়ি কটী তার ছিঁড়ে ছুঁড়ে ঝরিয়ে দিয়ে গেলে? হা নির্দ্দয়!

"অনন্ত আকাশের সুনীলিম বিস্তার বেয়ে, অনন্তেরই যাত্রী সে বুলবুল, গান গেয়ে পাখা মেলে স্বাধীন স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিমায় উড়ে চলেছিল—ক্রুর ব্যাধ, তোমার বুকে একটুকু ব্যথা বাজ্‌লো না—অমন বিষাক্ত বাণ মারলে তাকে তুমি, মর্ম্মহীন!

"শুধু আমারি শিষে শিষ্ দিত আর এক ব্যাধের মোটা আঙুলের কড়া ছুঁড়তেই নাচতো সে দোয়েল—পিঞ্জরে ভেঙে তাকে নিয়ে বন্দী করলে, খাস-মহলের সোনার ফটকে,—ব্যাধকে ফাঁকি দিয়ে রে বেইমান,—সে কি টেঁকে?—সে যে আমারি পিঞ্জরের পোষা দোয়েল—জীবনে-মরণে সে আমার!

"তার জহর-খাওয়া মরণের তীব্র নীল তোমার খুনের রক্তে মিশে বেগুনে বিষের সৃষ্টি করবে—জর্জ্জরিত করবে তোমার আত্মাকে, উচ্ছন্ন দেবে তোমাদের সাম্রাজ্যকে,—শ্মশান করবে তোমাদের মহলকে,—হতভাগা, দরিদ্রের বুকখানা খালি করে মোতির মালা-গাছি নিয়ে গেছ! দুনিয়ার মালিক তার একান্ত আত্মার আধার পাঁজ্‌রা কখানা গুঁড়ো করে—তারি একমুঠো ধ্বংসের তেজে গলিয়ে অভিশাপ গড়ছেন,—সে জন্ম-জন্মান্তর ফিরবে তোমারি পিছনে, ফুল দিয়ে গড়া মধুর গন্ধ-মাখা ফুলের ভিতর তোমারি মৃত্যুবাণ লুকিয়ে নিয়ে।"

সারারাত ধরে কে যে এই গান গায়, কেউ তা বুঝ্‌তে পারে না।—বাদশার হুকুমে হাজার গোয়েন্দা অনুসন্ধানে লাগলো কিন্তু তাকে ধর্‌তে পারলে না।—রক্তে বাদশার শঙ্কা হয়েছে—মৃত্যুর খবর তাঁর বুকের নীচে পর্য্যন্ত একটা তরোয়ালের আঘাত পৌঁছে দেয়—এ গান তাঁকে উন্মাদ করে তুল্‌লে—কিন্তু কি এ, কে সে গায়ক ছায়ার মত অলক্ষ্যে এসে বেহেস্তের মদিরা-মাখানো সুরে ফুলে-পড়া দেহের, টুটে-পড়া প্রাণের কাহিনী এমন করুণ সুরে বলে যায়! আচ্ছা, দেখ্‌তে হবে,—কেউ পেলে না সে গায়কের খোঁজ? না। সবাই খুব লক্ষ্য করে গোপনে গোপনে এগিয়ে যায়—গানও দূর হতে দূরান্তরে অবারিত মাঠের সুদূর শেষে—আকাশ যেখানে বাঁকা হয়ে মিশেছে—সেই দিক পানে সরে-সরে যায়।

সে দিন বাদশা নিজেই বেরোলেন—ছদ্মবেশে—সঙ্গে কেউ নেই। নিস্তব্ধ রাতের নির্জ্জন প্রহর কাঁপিয়ে মিঠা কণ্ঠের লহর-তোলা সুর-কল্লোলে সে গান হাওয়ায় হাওয়ায় ঊর্দ্ধে উঠে বুঝি ঐ আকাশের ওপারকার কোন্ অগোচর দেশের শাহান-সার কাছে—কার কাতর প্রাণের নিবেদন নিয়ে ছুটেছে!

বাদশা প্রথমটা একমনে লক্ষ্য করে জায়গাটার নিশানা নিলেন—তার পরে একটানা চলে গিয়ে পৌঁছুলেন—প্রায় আধ ক্রোশ দূরের একটা বট গাছের আবছায়া অন্ধকার-তলায়। গান তখন সেখান থেকে অনেক দূরে গিয়ে উঠেছে। বাদশা টের পেলেন—এ গায়কের ওস্তাদি! সে হরবোলা—এই কাছে, এই দূরে, এমনি করেই সুর তোল্‌বার সে সাধনা করেছে।

বাদশা গাছের ঝুরি ধরে

উপরে উঠতেই দেখেন—একখানা বাঁকানো ডালের উপর ঝাপসা পাতার আড়ালে বসে কে একজন। বাদশা শাসকের দৃঢ়কণ্ঠে অধীশ্বরের গাম্ভীর্য্যে জিজ্ঞাসা করলেন—"কে তুমি—রাত্রির স্তব্ধতা ভেঙে রোজ গান গাও?"

আর লুকোচুরি চলবে না—আর গোপন করা মিছে বুঝে বান্দা আস্তে আস্তে বল্লে, —"আমি ব্যথা-হত, প্রিয়া-হারা উন্মাদ—আমাকে কেন?"

"উন্মাদ তুমি নও,—উন্মাদ তোমার প্রেম। কিন্তু যে গিয়েছে, তাকে কি আর পাওয়া যায়—হতভাগা। যাও, কুটীরে ফিরে যাও—"

"পাওয়া যায় না? কে বল্লে পাওয়া যায় না? এই যে সে আমার বুকের ভিতরে—এই গানের সুর তার অশরীরী আত্মা বয়ে এসে আমার বাহু-বন্ধনের ভিতর মুক্ত করে দিয়ে গেছে।"

"তুমি তা অনুভব করছ?"

"অনুভব নয়, প্রত্যক্ষ করছি—এই যে তার প্রস্ফুট অধরের প্রান্তে আমার একান্ত চুম্বন ঘুমন্ত তার চোখের পাতা আস্তে আস্তে মেলে দিচ্ছে—আধ-ফুটন্ত গোলাপের রক্ত-বরণ পাপড়ি দুটীরই মত।"

"এত প্রেম।—অগাধ—অতলস্পর্শ—এ যে মহান্। প্রেমিক, গৃহে ফিরে যাও—আর নিত্য নিশি জেগে এমন আকুল কান্না কেঁদো না। খোদা তোমার এ ভালোবাসার বখশিশ করবেন, নইলে তিনি খোদাই নন্। এস, নেমে এস, মুসাফের—তোমার প্রণয়ের রাণীর সোহাগ-ভরা বুকের মধ্যে নিশ্চিন্তে নিশি যাপন করবার জন্য—সেই বিশ্ব-শিল্পী কেমন বেঁধে ইমারত গড়ে দেবেন।"

বাদশার সঙ্গে সঙ্গে খানিকদূর এসে বান্দা তাঁর আরজি-ভরা অনুরোধ এড়াতে না পেরে বনের দিকে চলে গেল। বাদশা অন্দরে ঢুক্‌লেন।

তার পর দিন থেকে হাজার হাজার মজুর দিন-রাত খেটে জঙ্গল কেটে কালো পাথরের ইমারত গড়ে তুলতে লাগ্‌লো, বান্দার ঐ কুঁড়েখানার পাশে—কেউ বুঝলে না—কেন? সবাই বল্‌লে—বাদশার দৌলতের বিকার।

বাড়ী শেষ হয়ে গেছে। জ্যোৎস্না রাত্রির সন্ধ্যা সেদিন পূর্ণিমার আলো নিয়ে বনের সবুজ রাজ্যের বুকে নেমে এল। বেচারা প্রেমিক কুঁড়ের দাওয়ায় এলিয়ে পড়ে চোখ বুজে স্বপ্ন দেখ্‌ছিল—গরীব বান্দা থেকে প্রাণ ফিরিয়ে নিয়ে দুরারী তার বুকের উপর ফিরে এল। সে ব্যাকুলতা-ভরা চিত্ত-হারা আবেগে দুই হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে দুরারীর স্থলপদ্মের মত গোলাপী ঠোঁটে—হঠাৎ ঘুম ভেঙে গিয়ে—"আঁ! দুরারী। দুরারী? না, না, মিছে কথা।"

পিছন থেকে বাদশা বল্লেন—"হাঁ, এ দুরারী—মিছে নয় প্রেমিক, এই তোমার প্রেমের রাণী দুরারী—এই তার রাজা—ঐ রাজ-পুরী—আমি গড়ে দিয়েছি—আর দশলক্ষ আসরফি—আমি বাদশা—তোমার প্রেমের জহর খেয়েছি আমি।"

বান্দা বল্‌লে, "চাইনে, চাইনে—ফিরিয়ে নিয়ে যাও শাহানশা—শুধু কুঁড়েখানা দিয়ে যাও—কোটী কোটী কত কোটী-লক্ষ যে তার লেখা-জোখা হয় না—এমনো আসরফি রয়েছে এই আমার বুকের ভিতর!"

শ্রীবিমলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

আখেরী

বকেয়া হিসাব চুকিয়ে দে রে বছর-শেষের শেষ দিনে,
মজ্জাগত গোলাম-সমর শেষ ক'রে দে, শেষ ক'রে দে।
কেউ কারো দাস নয় দুনিয়ায়, এ' কথা আজ বল্‌ব জোরে,
মিথ্যা দলীল তাদের, যারা জীবকে জ্ঞানে তুচ্ছ ক'রে।
দলীল তাদের বাতিল, যারা মানুষকে চায় ক'রতে খাটো,
হাম্‌রভাই এর সংহিতা-কোড্‌ বেবাক কাটো, বেবাক কাটো।
সবাই সমান এই জগতে কেউ ছোটো নয় কারোই চেয়ে,
কার কাছে তুই নোয়াস্‌ মাথা, রক্তচোখে কম্প্রদেহে?
সবাই সমান আঁতুড় ঘরে, বলের দেমাক মিছাই করা,
সবাই সমান শ্মশান-ধূলে, সভাই ধুয়া মিছাই ধরা।
মিথ্যা গরব গোত্র কুলের মিথ্যা গরব রঙ্‌ বা ঢঙের,
ভেদের তিলক তকমাতে লোক সংখ্যা বাড়ায় কেবল সঙের।
গরজ ব'লেও গরব যাদের,—চায় নারীদের দল্‌তে পায়ে,
তৈমুরও যার গুজে মানুষ মরদ সে কি? আয় সুধায়ে।
চেঙ্গিজও যার পীযূষ কাঙাল পুরুষ সে কি? জিজ্ঞাসা কর;
মাংসপেশীর পেষণ-বলে হয়না মহৎ হয়না ডাগর।

* * * *

কংস-জরাসন্ধ-রাবণ-সেকেন্দার ও মিহিরকুলে
দেখে নে তুই কল্পনাতে প্রসব-ঘরে শ্মশান-ধূলে।
মিছের ঝুলে আকাশ জুড়ে জাল প'ড়ে যে জমছে কালি,
পুড়িয়ে দে তুই সেই লূতাজাল দুহাতে তুই মশাল জ্বালি।
পুড়িয়ে দে তুই স্বর্গ-নরক পুণ্য-পাতক ছাই ক'রে দে,
লোভের চিঠা ভয়ের বোঝা জ্বালিয়ে দে একসঙ্গে বেঁধে;
মেকীর উকীল মেকলে আর ভারত-মহা মনুর পুঁথি
স্বার্থ-ক্লিষ্ট যে লোক ঘৃণ্য বহ্নিকুণ্ডে দে আহুতি।
আর্য্যামি আর জিন্মোপনায় ছাই দিয়ে দে, কিসের দেরী?
ছাই হ'য়ে যাক্‌ মর্দ্দ-গরব, আজ আখেরী, আজ আখেরী।

* * * *

প্রণাম দাবী করছে কারা মুনি ঋষির দোহাই পেড়ে ?
স্পষ্ট বলি পৈতা গলায় ও দোষ দিনে চক্ষে ছেড়ে।
থাউকো দরে আদব ক'রে অমানুষের দল বেড়েছে,
থাক-বাঁধা জাত মিছার আবাদ, বিচার-বুদ্ধি দেশ ছেড়েছে।
হাজার হাজার বছর পরে দেশ-ছাড়া কেউ ফিরছে দেশে,
ভয় ভেঙেছে উষার আগেই দেশ জেগেছে স্বপ্ন-শেষে।
দেশ জেগেছে অবিচারের বন্যাতে বাঁধ দেবার আশে,
পাইকারী প্রেম থাউকো ভক্তি উড়িয়ে দেব অট্টহাসে।
প্রণাম কারো একচেটে নয়, শ্রদ্ধেয় যে শ্রদ্ধা পাবে,
দধীচ মুনি মহৎ ব'লে অর্ঘ্য ভবানন্দ খাবে ?
ঘুষ খেয়ে যে ডুবিয়ে দিলে সোনার বাঙ্লা অন্ধকারে,
বামুন ব'লেই পূজ্ব কি সেই ঘরের কুমীর মজুন্দারে ?
বামুন ব'লেই করব ভক্তি চাঁদ-রোদারের পুরোহিতে
অন্নদাতার কন্যাকে যে মুসলমানে পারলে দিতে ?
বামুন ব'লেই করব খাতির কুলশেখের ঘৃণ্য পিতায়
কাড়কাটে যে নিজের ছেলে বাঁধ্তে রাজী, ধন যদি পায়।
ঘুষের রাস্তা বন্ধ দেখে বাঙলায় ডেকে যজ্ঞশালে
পুত্র-বলির যুক্তি যে দ্যায় পূজ্ব কি সেই খণ্ডকালে ?
বামুন ব'লেই পূজ্বে হিন্দু ভণ্ডকুলের মস্তকাত ?—
কৃষ্ণ-প্রেমিক পূজ্বে তাদের কৃষ্ণে যারা মাথায় লাথি ?
ভিক্ষু শ্রমণ চাইতে কিছু দক্ষিণা কম মিল্ল ব'লে
হর্ষেরে খুন করতে যে যায়, অশান্ত তাদের কষ্ট কি ছলে ?
গুপ্ত রাটেতে আব্রু নিয়ে দাঁত খিঁচিয়ে পরস্পরে
স্বদেশ যেজন পরকে দিলে পূজ্ব কি সেই বিপ্রবরে ?
রাজপুতানার গড় ঘিরে যে, মুসল্মানের আহ্বানে,
বাঁধ্তে গরু যুক্তি দিলে, পূজ্ব কি সেই বুদ্ধিমানে ?
"দুর্গপথে তুলসী ছড়াও, মাড়াতে তায় নারবে মোগল"
এমন যুক্তি যাদের তারাও ভক্তি-ভাজন ? হায়রে পাগল।
কিন্দুচূড়া নন্দ-কুমার,—যে পবালে তাঁরেও ফাঁসী,
গলায়-দ'ড়ে রাম-ফাঁসুড়ে তারেও দেব অর্ঘ্যরাশি ?
জুড়্তে যার শান্লোনাকো আন্তে হ'ল গিলোটিনে
স্ত হ'তে বঙ্গভূমে, সেও বেঁধেছে বিপ্র-ঋণে ?

পুলিশ-টাউট্ নেশায় আউট্ গঙ্গাজলী-সাক্ষ্যে দড়
বিট-বিদূষক ভেড়ুয়া পাচক বামুন ব'লেই মান্য বড়?
কালিদাসের কাব্য অমর তাঁর গুণে দেশ আছেই কেনা
তাই ব'লে পাঁউরুটি-ওলার পায়ের ধুলো কেউ নেবে না।

* * * *

জাতের খাতায় সাফ সুকৃতি দেখিয়ে শুধুই মস্ত হবে?
দুষ্কৃতি যে 'দেউলে' ক'রে খায় ঠকিয়ে অগৌরবে,—
তারো হিসাব চাচ্ছে জগৎ, দাখিল করো নাহক দেরী,
প্রণাম দাবী ছাড়তে হবে নাহক দেরী, আজ আখেরী।
শ্রদ্ধা ভাজন সত্য যেজন তারেই মানুষ শ্রদ্ধা দেবে,
রাহাজানি করলে ভক্তি বিশ্বমানব হিসাব নেবে।
পাহকারীতে তরাবে না আর জাতের টিকিট মাথায় এঁটে
সে যুগ গেছে সে দিন গেছে, সে কুয়াশা যাচ্ছে কেটে।
সেক্সপীয়ারের স্বজাত ব'লে পুছবে না কেউ কিপলিঙেরে
চোটাপটে শক্তি করার যোগটা ক্রমে আসছে সেরে।
বার্ক শেরিডান মহৎ ব'লে হেস্টিংস ক্লাইব পুছবে কেবা?
জেয়ার বেথুন স্মরণ ক'রে হোঁৎকা গোরার চরণ সেবা?
কর্জনেরে কেউ দেবে না লর্ড ক্যানিঙের প্রাপ্য কভু,
লর্ড সাহেবের মর্যাদা কি লুটবে ডিগো পাদ্রী প্রভু?
হৈমবতী উমার অর্ঘ্য কাড়বে ও হাড় চণ্ডী কি হায়?
বেসান্ট্ সে নৈবেদ্য নেবে অর্পিত যা নিবেদিতায়?
বং দোধয়েহ ভড়কে দেবে? তেমন শিশু লাং ফ্রনিয়া,
ভিক্টোরিয়ার প্রাপ্য নেবে ডায়ার প্রেমী কিচিরিয়া?
মন্দ ভালো গুলিয়ে দেবে এমনি কি মাহাত্ম্য থাকে?
কর্তা বলেই করব খাতির চক্ষু-গুড় মহত্বকে?
দোকানী যে দেশ কী কুড়াল,—শাক তুলে রাজ-কায়দা করে
তারেও কি রাজভক্তি দেব? রাখবো কী মন বাজারে জুড়ে?
অন্তত যে রেলগাড়ীতে, অথবা যে খেলার মাঠে,
তারেও নাকি করব খাতির অকথ্য যে রাস্তাঘাটে?
নিশীথে যার হারেম-শীকার, কর শীকার দিন দুপুরে,
যার পরশে কুলির প্লীহা বিস্ফুরকের মতন ফুরে,

রাস্তাতে যে বুকে হাঁটায়, নিরন্নে যে খাওয়ায় খাবি,
ঘোম্‌টা খুলে তায় যে থুতু রাজপূজা সেও করবে দাবী ?
সাহেব ব'লেই করব সেলাম ? মন্দ ভালো বাছ্‌ব নাকো ?
অন্যায়ে যে করবে কায়েম বল্‌ব তারে সুখে থাকো ?
খুনীরে যে দেয় খোলসা আইন্ গ'ড়ে রাতারাতি
প্রশস্তি তার পড়ব কি হায়, প্রকাশ ক'রে দন্তপাঁতি ?
গোরা ব'লেই গৌরবে কি দিতে হবে শ্রীবুট মুড়ে ?
বামুন ব'লেই নাহক প্রণাম করতে হবে হস্ত জুড়ে ?
মরদ ব'লেই মর্দ্দানি কি সইবে নীরব মাতৃজাতি ?
আল্লালাডের প্রসাদ-পবন জাগ্‌ছে রে, আঁধ নাইক রাতে।
সঙ্কুচিত চিত্ত জাগে দেখিস্ কি আর ঠিঠার চোরি,
হিসাব নিকাশ করতে হবে, আজ আখেরী, আজ আখেরী।

* * * *

বুঝ্-সমঝের বইছে হাওয়া গোলাম-সমঝ্ যাচ্ছে টুটে,
সাবালকীর করছে দাবী সব দুনিয়া দাঁড়িয়ে উঠে !
মুরুব্বিদের করছে তলব চাইছে হিসাব চাইছে চাবী,
মানুষ ব'লেই সকল মানুষ ইজ্জতেরি করছে দাবী ;
তাবৎ জাবে শিব যে আছেন রুদ্র তিনি অবজ্ঞাতে
নিখিল নরে রন্ নারায়ণ পুণ্য-পাঞ্চজন্য হাতে।
তাঁর সাড়া আজ সকল প্রাণে বর্ণ-জাতি-নির্ব্বিশেষে
বিশ্বে নিকাশ-আখেরী আজ নূতন যুগে, যুগের শেষে।
চিনি ব'লে চুণ যে খাওয়ায় চল্‌বে না তার সওদাগরী
নিখুঁত হিসাব তৈরী করো রেখোনা ভুল খাতায় ভরি।
খাদ কষে দাম চুকিয়ে দেবার দিন এসেছে এবার দেশে
মদের গেলাস আছড়ে ভাঙো মুরুব্বিদের ওডাও হেসে।
মন খুলে বল্ মনের কথা জম্‌তে বুকে দিস্‌নে ঘৃণা,
মন্দকে বল্ মন্দ সোজা, পালিস বিনা রসান্ বিনা।
দাম-নিরূপণ পাল্‌টিয়ে কর রদ্দি যে তায় ফেল্ রে ছুঁড়ে ;
মধুফলে মিল্‌লে পোকা ঠাঁই হবে তার আঁস্তাকুড়ে।
সত্য কথা বল্ খোলসা, করিস্‌নে ভয় নিন্দা-গালি,
মিথ্যাবাদী নাম যারা তায় তাদের মুখে দে চুণকালি।

পাওনা-দেনা ঠিক দিয়ে নে দিল-গোলামীর নিকাশ ক'রে,
মানুষ আবার মানুষ হবে বিশ্বে বিশ্বনাথের বরে।
রুদ্ধ দিনে পাতায় পাতায় খরচ্ জমা তৈরী রাখো
ভাঙ্গা-ভুঙ্গুর ভয় কোরো না, টিক্ দিয়ে ঠিক্ তৈরী থাকো।
নতুন খাতার বেদীর পাতায় স্বস্তিকে কে সিঁদুর দেবে,—
তৈরী থাকো; অরুণ-ঊষায় নতুন জীবন আসবে নেবে।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

পাঁচটা টাকা

চৈত্র মাসের সংক্রান্তি। নবদ্বীপে গঙ্গা-স্নানে পুণ্যলাভের জন্যে দলে দলে লোক এসে জমা হয়েছে। দিনকতক আগে এসে যারা ঘাটের উপর ছোট ছোট কুঁড়ে ঘর বেঁধে কতকটা গুছিয়ে নিয়েছে, তাদের ঘরেও নূতন অতিথির আবির্ভাব হয়ে শান্ত নির্জ্জন গঙ্গাতীরকে কোলাহল-চঞ্চল করে তুলেছে। ঘরে ঘরে সকলকার মুখেই এই যাত্রীদের কথা ছাড়া আর কোনো আলোচনা নাই।

ষ্টেশনের মাল-বাবু ফণিভূষণ রায়ের স্ত্রী মণিমালা রান্নাঘরের দালানে বসে তরকারী কুটছিল। এমন সময় পাড়ার ঝি মঙ্গলা সেই সকাল বেলাতেই একমুখ পাণ চিবুতে চিবুতে বাজার করে ফিরে আসতেই ঘর থেকে বাবুর মা বলে উঠ্লেন, "হ্যাঁরে মঙ্গলা, তোর এত দেরী হ'ল কেনরে? কোন্ চুলোয় বসে গল্প কর্‌ছিলি বুঝি? রান্নাবান্না আজ হবে কখন, বল্ দেখি!"

মঙ্গলা হাতের মাছটা নামিয়ে রেখে বল্লে, "হ্যাঁ মা আজ একটু দেরী হয়ে গেছে, বাজার থেকে ঘুরে আবার ঘাটে গেনু কিনা, তাই—"

"আবার ফিরে ঘাটে গেলি কেন?"

মঙ্গলা হাসিমুখে ঘাড় বাঁকিয়ে বল্লে, "সে যে এক মস্ত কাণ্ড হয়ে গেছে গো মা।"

গিন্নি রাগ ভুলে গেলেন, খুব আগ্রহ করে বল্লেন, "কি হয়েছে রে?"

কথাটা ভালো করে শোনবার জন্যে মণিমালাও বঁটির উপর থেকে হাত তুলে সরে বস্‌ল। মণিমালার এই অল্প কিছু দিন আগেই বিয়ে হয়েছে, একে নিতান্ত গরিবের ঘরের মেয়ে, তাতে একটু বেশী বয়সে বিয়ে হয়েছে বলে সে একেবারেই ঘর করতে আরম্ভ করেছে, তবু বাপের বাড়ীর বিচ্ছেদ-ব্যথাটা তীক্ষ্ণ খোঁচার মত বুকে বিঁধে আছে, সেটা সে কিছুতেই ভুলতে পারেনি।

মঙ্গলা বল্লে, "হয়েছে কি শোন মা, ঘাটে কোন্ যাত্রীদের মধ্যে নাকি ওলাউঠা হয়েছে বলে কাল রাত্তিরে তো হুড়মুড় করে অর্দ্ধেকের চের বেশী লোকই পালিয়েছে, তা গঙ্গার বালির চরে একটা কাচ মেয়ে পড়েছিল, বলবো কি গো মা, মেয়েটা যেন পদ্মফুলের মত সুন্দর

মণিমালা বলে উঠ্‌লো, "কতটুকু মেয়ে? খুব ছোট্ট?"

"ছোট্ট নয় আবার! সবে জন্মেছে, নাড়ও কাটানো হয়নি,—চৌকিদার সব কুঁড়ে খুঁজে খাব মেয়ে ওকে ধরবে বলে ঘুরছিল, ডাক্তার বসে ছিলেন, রাজ্যির লোক জমা হয়েছে।"

গিন্নি বললেন, "ওমা,—তারপর? পেলে মাগীকে?"

"তা আর পাবেনা! ছেঁড়া কাঁথায় মুখ গুঁজে পড়ে পড়ে কান্না হচ্ছিল, চৌকিদার গিয়ে ধরলে, ডাক্তার বাবু গিয়ে দু'চারটে ধমক দিতেই মেয়ে কোলে তুলে নিলে।"

গিন্নি আশ্চর্য্য হয়ে গালে হাত দিয়ে বললেন, "অবাক কাণ্ড! মা, মা, রাক্ষসী গো!"

শাশুড়ী একটু সরে গেলে মণিমালা বললে, "সে মাগীটা কি রকম মঙ্গলা? এই সব বোষ্টম মাগীদের মতন?"

মঙ্গলার দেরী করে আসার অপরাধটা এই সময় কৌতূহলে চাপা পড়েই গিয়েছিল, একেবারেই কিছু মুস্কিল হল। কেননা সে ওই মাগীটাকে নিজের চোখে দেখবার সুবিধে মোটেই করতে পারেনি, দেখতে গিয়ে কেবল লোকের মুখে শোনা তার কাহিনী টুকুই সংগ্রহ করে এনেছিল মাত্র, কাজেই মণিমালার কথার উত্তরে কি যে বলে তা সে ভেবে পায় না, তবু বুদ্ধি জুটিয়ে তাচ্ছিল্য দেখিয়ে বললে, "তা ওমনিই হবে বই কি! মুয়ে আগুন! পোড়ারমুখী মরতে আর ঠাঁই পায়নি—"

মঙ্গলা মাছ কুটতে বসলো, বামুন ঠাকরুণ কেমন ব্যস্ত হয়ে হাঁড়ি উনুনে বসিয়ে দিয়ে বললেন, "ওগো বৌঠাকরুণ, তুমি বলো যাকে —আমিও ঘাট থেকে একটু দেখে আসিগে!"

মণিমালার উত্তর শোনবার অপেক্ষা না করেই তিনি ত চলে গেলেন; মণিমালার শাশুড়ী শুনে ছুটে এসে বললেন, "বামুন ঠাকরুণ আবার গেলেন কোন্ আক্কেলে? ভাল এক তামাসা হয়েছে বাপু!"

কিন্তু হতাশ হয়ে কিছুক্ষণ পরেই বামুন ঠাকরুণও ফিরলেন; দেখ্‌তে পাননি, তাই বললেন, "না, সে অভাগী মেয়ে নিয়ে ঘরে দুয়ার দিয়ে বসে আছে, কিছুতেই খুলো দেবেনা।"

মঙ্গলা ঘাড় ফিরিয়ে বললে, "ও অমন করে আর কদিন থাকবে? পেট জ্বললে পরে আপনিই বেরুবে তখনই দেখো।"

বামুন ঠাকরুণ বললেন, "কত লোকেই যে কত কথা বলছে, ঠিক কথা কি তা বোঝবার যো নেই।"

এমনি করে বেলা দুপুর হতে না হতে পতিতপাবনী গঙ্গার সৈকতে সেই বদ্ধ কুঁড়ের ভিতরকার সদ্যপ্রসূত ও ভাগিনীর নামে কুৎসিত আন্দোলনে সারা দেশটা তোলপাড় হয়ে উঠ্‌লো কিন্তু সেই মজা দেখার জীবটি আর তিন দিনের মধ্যেও দুয়ার ছেড়ে বেরিয়ে কাউকে দেখা দিলে না।

যারা তামাসা দেখ্‌তে এসেছিল, তারা সেই বদ্ধ ঘরখানার আশে-পাশে ঘুরে ফিরে গেল, মধ্যে মধ্যে ক্ষুধার্ত্ত শিশুর কান্নার শব্দও কেউ কেউ শুনে গেল, কিন্তু সে মায়ের গলা কেউ শুনতে পেলে না।

যখন দর্শনার্থীর দল যাওয়া-আসা কমাল, তখন কেবল গঙ্গার তরঙ্গ-ধ্বনির সঙ্গে একটা

বুক-ফাটা কান্নার শব্দ শোনা গেল। তবে সে খুব চাপা গলার সুর, সহজে ধরা যায় না।

২

আরো ক'দিন কেটে গেল। সেদিন ঠিক দুপুর বেলা। চারদিক নির্জ্জন নিস্তব্ধ। আমের গুটি-ভরা আম গাছের ডালে লুকিয়ে শেষ বসন্তের কোকিলের কুহুন-ধ্বনি ছাড়া আর কোনো সাড়া-শব্দ কোথাও নেই। প্রখর রোদ যেন আগুন বর্ষণ করছিল, সজনে গাছের কটার মত পাকা ডাঁটাগুলো পট্‌ পট্‌ করে ফেটে পড়ছিল।

সেদিনটাও রবিবার। যদিও ষ্টেশনে রবিবার-সোমবারের বিচার না থাকলেও সেদিন ফণি-ভূষণ বাবুর শরীরটা ভাল ছিল না বলে তিনি ছুটি নিয়ে বাড়ীতে মশারির ভিতর দিবা-নিদ্রায় মগ্ন ছিলেন।

মণিমালার দিনে ঘুমানো অনভ্যাস, তাই সে ঘুমায়নি। অন্য ঘরে জন-কয়েক সমবয়সী মেয়েদের নিয়ে সে 'চক' কেটে কড়ি খেলতে বসেছিল। বাড়ীর পাশেই ডাক্তার বাবুর বাড়ী; তাঁর মেয়েও মণিমালার সমবয়সী, সে সম্প্রতি শ্বশুর বাড়ী থেকে এসেছে, তারাও সেই ঘাটের কড়ভাগিনীর কথা নিয়ে খুব হাসাহাসি করছিল, স্বামীটার কাল্পনিক রূপ বর্ণনাও বাদ যায় নি,—তার যে সারা গায়ে মাটী দিয়ে না-হয় সাদা চন্দনের রাধাকৃষ্ণ নামের ছাপ আছে আর কপালের উপর লম্বা ধরণের বৈষ্ণব তিলক আছে, এ-বিষয়ে আর কারো সঙ্গে কারো মতের অমিল হল না।

নানা কথায় তাদের গল্পের গতি অন্যদিকে ফিরল। একটি মেয়ে মণিমালাকে জিজ্ঞাসা করলে, "তুমি কি এখন বাপের বাড়ী যাবে নাকি ভাই?" মণিমালা একটা নিশ্বাস ফেলে বল্‌লে, "কি করে জানি,—জানিনে তো, এরা পাঠাবেন কি না পাঠাবেন!"

ডাক্তার বাবুর মেয়েটি বল্‌লে, "কতদিন এসেছ তুমি ভাই, বেশী দিন ত নয়!"

মণিমালা একটু হেসে বললে, "কেন, যত-দিন বিয়ে হয়েছে ততদিনই ত আছি!"

হঠাৎ বাইরের দিকে চেয়ে একসঙ্গে সবাই মিলে বলে উঠলো, "ওমা, ও কে ভাই?"

মণিমালা মুখ ফিরিয়ে দেখলে যে, একটী পনেরো ষোলো বছরের ফুটফুটে সুন্দরী মেয়ে এসে তাদের উঠানের এ-পাশে গোয়াল ঘরের দাওয়ার উপর বসে পড়েছে। তার ছোট মুখখানি ঘিরে রেশমের মত নরম কালো চুলের গোছা ঝুলছিল। বড় বড় চোখ দুটি তার গভীর যাতনায় ভারি। বিষাক্ত শরে মরণাহত চোখে যে আর্ত্ত করুণ কাতরতা ফুটে ওঠে, তার মুখে সে দাগ রেখায় রেখায় ফুটে উঠেছিল।

অসহ্য রোদে পথ হেঁটে এসে সে ক্লান্ত-ভাবে শ্বাস ফেলছিল। মেয়েরা সব তার কাছে আসতেই সে বল্‌লে, "এইটেই কি এখানকার ডাক্তার বাবুর বাড়ী?"

মণিমালা বল্‌লে, "না,—কেন?"

মেয়েটী ব্যথিত কণ্ঠে বল্‌লে, "কেন? তাঁর সঙ্গে আমার ঢের কথা আছে যে! এই বোঝাটাকে যে আমায় বইতেই হবে।"

এতক্ষণে সকলে দেখলে যে তার কোলে যোদে-ফোটা মল্লিকার মত একটা শুভ্র সুন্দর ঘুমন্ত শিশু। মুহূর্ত্তের মধ্যে তারা বুঝে নিলে যে, তিনদিনকার উপোসের পর সমস্ত।

সঙ্কোচের মাথা খেয়ে আজ এই অভাগিনী মেয়েটা পথে বেরিয়ে পড়েছে।

কিন্তু কল্পনাতে রং ফলিয়ে তারা এর আর যে ছবি এঁকেছিল, আসলটার সঙ্গে তার এতটুকুও তো মিলল না। এর গায়ের কোন-খানেই কোনো নামের ছাপ নেই, তিলক্‌-ফোঁটা কাটাও নেই, বরং মাথার এলো-মেলো চুলের মাঝে দিন দশ-বারো আগেকার পরা সিন্দুরের চিহ্নও দেখা যায়। হাতে সধবার চিহ্ন লোহাও আছে, কিন্তু এ সব ব্যবস্থার সঙ্গে তার অবস্থাটা এমনি বেমানান যে ও চিহ্নগুলোর দিকে যেন ও সঙ্গে চোখে পড়ে না। এ যে নিতান্ত কচি, সংসার জ্ঞানহীনা বালিকা মাত্র।

ডাক্তার বাবুর মেয়ে বল্লেন, "ডাক্তার বাবু তার কি করবেন, বল?—মেয়ে কি তোমার নয় নাকি? তবে তুমি তখন নিলে কেন? বল্লেই ত পারতে—"

মেয়েটা হাঁপাতে হাঁপাতে বল্লে, "না, না, এ আমারই, সে জন্তে আমি কিছু বলতে আর চাইনে, তবে মানুষ করতে হলে যে এর অনেক কিছুই দরকার।"

একটী মেয়ে ফস্ করে বলে বস্‌লো, "কেন, মেয়ের বাপ গেলেন কোথায়?"

সকলে মনে করেছিল যে এই মর্ম্মান্তিক খোঁচা খেয়ে মেয়েটি বুঝি লজ্জায় মুখ ঢাকবার ঠাঁই খুঁজে পাবে না, কিন্তু সে তা কিছুই করলে না, মাথাটা নীচু করে চুপ করে বসে রইল।

চারিদিক থেকে অজস্র অপমান-বিদ্রূপের শাণানো বাণ তার উপর বর্ষণ সুরু হলো।

... মাথায় ভিজে গামছা চাপিয়ে কেমন ...

কোথায় বেড়াতে গিয়েছিল, ফিরে এসে বাড়ীতে পা দিয়েই এই অপরূপ শ্বেত-শতদলের মত রূপসীটিকে দেখে অবাক হয়ে দাঁড়াল। একটু পরে মেয়েদের সঙ্গে কথায় বার্ত্তায় বুঝতে পেয়ে বল্লে, "তুমি এসেছিলে কার সঙ্গে গা? এই মেলার দিনে গঙ্গার ঘাটে একা তো আসোনি।"

ছল ছল্‌ চোখে মেয়েটি বল্‌ল, "মার সঙ্গে এসেছিলুম, মা কলেরায় মারা গেছে, আমি একা বাড়ী যেতে পারছিনে।"

"তোমার বাড়ী কোথায় গা?"

"কালনায়—"

"কালনায়! কি কপাল! কালনায় আর তুমি নিজে যেতে পারবে না? যাবে? আমি লোক দিতে পারি।"

"না—" বলে সে একবার সকলের মুখ পানে চেয়ে দেখলে, তারপর নিজের মুখখানা কাঁচুমাচু করে নখ দিয়ে মাটি খুঁটতে লাগলো। বোধ হয় এতক্ষণে সে বুঝতে পেরেছিল যে, এদের এসব কথা বার্ত্তায় নিছক দয়া ছাড়া ঠাট্টায় ঢাকা মজা দেখাও ঢের রয়েছে। একে তো ক্ষুধা তৃষ্ণায় তার সর্ব্বশরীর যেন এলিয়ে পড়ছিল তার উপর মনেও তো কম দুঃখ ছিল না। কাজেই মুখে আর সে এদের কি বলবে।

মেয়েটার দশা দেখে নলিনবালায় কিন্তু তখন ভারী দয়া হল। এ দয়াটা করা তার উচিত কিনা সেটা আর তার ভাববার অবসর হল না। মেয়েটার শুকনো ম্লান মুখের পানে চেয়ে সে বল্লে, "তুমি কিছু খাবে? তোমরা তো বোষ্টম?"

মেয়েটার করুণ দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌লো,

সে বললে, "না, আমরা বোষ্টম নই, আমরা ব্রাহ্মণ—"

"তা—আমরাও তো বামুন, খাবে আমাদের রান্না ?"

সে কথায় কোনো জবাব না দিয়ে হাঁটুর উপর শিথিল মাথা রেখে সে ক্লান্তি ভরা সুরে বললে, "আঃ মাগো।"

নাড়া পেয়ে কোলের কচি মেয়েটী ককিয়ে কেঁদে উঠলো তখন সে আবার সোজা হয়ে বসে সেটাকে বুকে চেপে নিলে। এলিয়ে পড়লে আর তার চলে না।

ঘর থেকে বাড়ীর গিন্নির গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। তাঁর ঘুম ভেঙ্গে কানে কচি ছেলের কান্নার শব্দ গিয়েছে, তিনি বলবেন, "মঙ্গলা, ও কার ছেলে কাঁদে, ভাখ তো রে,— এ যে আমাদের বাড়ীতেই মনে হচ্ছে, ভাখ তো কে কাঁদে!"

মণিমালা তাড়াতাড়ি নিজের ঘরের দিকে চাইলে, পাছে তার স্বামীরও ঘুম ভেঙ্গে গিয়ে থাকে! শীগ্‌গির শীগ্‌গির ওকে বিদায় করবার জন্য সে ঘরে গিয়ে ঢুকলো, পাড়ার অন্য যে মেয়েরা ছিল, তারাও সেই সময় নিজেদের বাড়ীর দিকে চলে গেল। মণিমালার শাশুড়ীর অখণ্ড প্রতাপ ছিল, সবাই তাকে ভয় করতো।

৩

একখানা কাপড় আর খুচরো কিছু পয়সা দিয়ে ভিখারীকে বিদায় করবার জন্যে মণিমালা ঘরে ঢুকেছিল; কিন্তু ঘরে গিয়ে সে দেখলে, তার স্বামীর ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছে, তিনি বালিশে হেলান দিয়ে চোখ চেয়ে বসে আছেন; মুখখানি এমনি অন্ধকার যেন এই মাত্র তাঁর ফাঁসির হুকুম হয়েছে।

স্বামীর সামনে কাপড় বা পয়সা বের করতে গেলে পাছে তিনিও আবার কারণ জিজ্ঞাসা করে বসেন, এই ভয়ে সে বাক্সের কাছে দাঁড়িয়ে কি যে করবে তাই ভাবছিল। আঁকা বাঁকা বিদ্যুতের ঝলকের মত অনেক কথাই তার মনে হল।

মেয়েটীর উপর তার দয়া হয়েছিল, তাকে নিয়ে যদি স্বামীও কিছু বলেন, এই ভয়ে সে স্বামীর কাছে কিছু বলতে পারছিল না। মেয়েটী আবার তার বাড়ী বলেছে, কালনায়। এই কালনার সঙ্গে যে ফণিভূষণের কতখানি যোগ আছে তা মণিমালা জানতো।

মণিমালাকে বিয়ে করবার আগে ফণিভূষণের চরিত্রের সুনাম বড় ছিল না। চরিত্র-দোষেই বাপের কাছে লাঞ্ছিত হয়ে মামার বাড়ী কালনায় গিয়ে সে অনেকদিন ছিল। সেখানে একটী নিতান্ত গরীব অনাথা বিধবার মেয়েকে বিয়ে করতে সে বাধ্য হয়, মামা মামী তার তখন এ বিয়েতে যোগ দিয়েছিলেন বলে আজও একরকম একঘরে-গোছ হয়ে আছেন।

মণিমালার শাশুড়ী এ কথা স্বীকার করবার পাত্র নন, স্বামীকে বলতেই ভরসা হয় না তবু দেশশুদ্ধ সবাই এ কথা বলতো, কাজেই নিঃসংশয়ে বিশ্বাস না করলেও মণিমালার মনে একটী গোপন জ্বালা ছিল।

স্বামীর দিকে পিঠ দিয়ে তোরঙ্গর চাবি খুলতে খুলতে সে বললে "কি গো, অমন চুপ করে বসে আছ যে।"

ফণিভূষণ ঘাড় নেড়ে বল্লে, "এমনিই—কি বের করবে ?"

মণিমালা একটু থতমত খেয়ে বল্লে, "এই একখানা পুরোনো কাপড় !"

কথাটা বলেই মণিমালার ভয় হল, স্বামী যদি আরো কিছু জিজ্ঞাসা করে বসেন ! কিন্তু ফণিভূষণ আর কিছু না বলে চুপ করেই রইল।

সহসা শাশুড়ীর তীব্র কণ্ঠের ঝঙ্কার শুনে ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে মণিমালা ঘর থেকে বেরিয়ে দেখলে যে শাশুড়ী রোদ লাগবার ভয়ে দালানের দুয়োরের কাছে ছায়ায় দাঁড়িয়ে বলছেন, "হাঁা মঙ্গলা, কি তোদের আক্কেল বাছা,—ছি ছি, গেরস্তোর বাড়ী-ঘর, দে ওকে উঠিয়ে দে,—বালহারি মেয়ে, মাগো, লজ্জাও করেনা একটু !"

মেয়েটি পা দিয়ে মাটি চেপে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, মুখখানা মড়ার মত সাদা ; হরিণের মত নিরীহ সুন্দর চোখে ভয়-বিহ্বল দৃষ্টি যেন লক্ষ্য-হারা ! অনাহার-অনিদ্রা-ক্লিষ্টা সদ্য-প্রসূতি বালিকার শরীরে আর এমন বিন্দু-মাত্র শক্তিও সঞ্চিত ছিল না যে তার পা দুখানিকে সে ইচ্ছার বেগে চালিয়ে দেয় ! সে দাঁড়িয়ে কাঁপছিল দেখে মণিমালা বল্লে, "বসো, বসো, তুমি পড়ে যাবে যে !"

গিন্নি বল্লেন, "তা বসো গে বাছা, ঐ গাছ-তলাতে, এ গেরস্তো-বাড়ী আর বস্তে হবে না—"

মঙ্গলা বল্লে, "[illegible] দেবে ওকে, দিয়ে দাওনা মা, অত বকা-ঝকার দরকার কি [illegible] । ভিক্ষে চাইতে এসেচে, ভিক্ষে দিয়ে দাও, [illegible] কথা !"

কেমন [illegible]

গিন্নি বল্লেন, "সেই ভাল, যা মঙ্গলা, ঘর থেকে দুমুটি চাল এনে দে ওকে !"

মঙ্গলা চাল আন্তে ভাঁড়ার ঘরে ঢুকতে যাবে, এমন সময়ে ও ঘর থেকে ফণিভূষণ তাকে ডাকলে, "মঙ্গলা, শুনে যা !"

এই ডাক শুনেই ত সে ভিখিরী মেয়ে চমকে চারিদিকে চেয়ে দেখতে লাগলো ; এ যে তার সেই "হারা বাঁশীর সাড়া"র মত অতি-পরিচিত প্রিয় কণ্ঠ !

সব অপমান, লজ্জা ও গ্লানির কথা এই একটু সাড়ায় যেন নিমেষে একেবারে তাকে ভুলিয়ে দিলে ; মঙ্গলা ফিরে এসে তার হাতে পাঁচটা টাকা গুণে দিলে ; বদ্ধ ঠোঁটে তার বিশ্রী শ্লেষের হাসি।

গিন্নি চোখ কপালে তুলে বল্লেন, "ওমা, ও কি ! পাঁচ-পাঁচটা টাকা হল ভিক্ষে ! বার-ব্রতো করতে ও আমি চাইলে অত পাইনে কক্ষনো ! ছেলেদের এ আমীর মেজাজ বোঝা দায়, দেখচি !"

মঙ্গলা বল্লেন, "তা ওঁদের দয়া মা, যখন যার ওপর দয়া করেন"—

"হুঁ, তাইতো। দয়ার আর পাত্তর খুঁজে পেলেননা ! মরুকগে, ওঁদের যা খুসী করুন, ভুগবেন এর পর নিজেরাই !"

ভিখিরী তখনো টাকা-হাতে করে দাঁড়িয়ে ছিল। যেন ঐ তার চেনা গলার স্বরে তাকে যাদুমন্ত্রে পাষাণ না কাঠের পুতুল করে দিয়েছে,—বদ্ধ ঘরের দিকে চেয়ে সে আর যেতে পারছিল না !

কড়া রোদের আঁচ সইতে না পেরে গিন্নি আবার ঘরে ঢুকে পড়লেন। দিনের ঘুমটুকু তাঁর তখনো শেষ হয়নি, তাই

বাকীটুকু শেষ করতে তিনি আবার শুয়ে পড়লেন।

মাথা হেঁট করে আস্তে আস্তে মণিমালাও গিয়ে তখন ঘরে ঢুকলো, পাছে ওর কাছে থাকতে দেখলে শাশুড়ী কি স্বামী রাগ করেন।

মঙ্গলা ত আর কোন কথা না বলে একরাশ এঁটো বাসন নিয়ে মাজতে বসে গেল। সে অনেক দিনের ঝী, বাবুর দুয়ার এক বাড়ীতে বছর রেখে গিন্নির চেয়ে সেও বড় কম জ্বলে যায়নি, তবে কিনা তখনো বাবু ঘরেই শুয়েছিলেন, কাজেই মুখ বন্ধ করেই আপনার রোখটা সে চেপে ছিল।

বাসনে হাত দিয়ে একবার আড়চোখে সে চেয়ে দেখলে যে ভিখারীটা তখনো হাঁ করে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে,—সে আর কিছু বললেনা, কেবল মনে মনে ভাবলে, আরো কিছু চায় নাকি।

৪

ঘরের ভিতর খাটের উপরে হাত দুখানা উপর পানে তুলে তাকিয়া বালিশ ঠেসান দিয়ে ফণিভূষণ যেমন বসে ছিল, তেমনিই রইল, স্ত্রীকে আসতে দেখেও সে তাকে কিছুই বললে না।

একসঙ্গে পাঁচ-পাঁচটা টাকা দান করে ফেলে তাঁর মত পঁচিশ-ত্রিশ টাকা মাইনের লোকের যে স্নিগ্ধ তৃপ্তির আভাস জাগে তার মুখে তার একটু রেখাও ছিল না। মণিমালা হাসি মুখে বললে, "তুমি তো দেখছি মস্ত একজন দাতা হয়ে পড়লে, মা কিন্তু এতে মোটেই খুসি হন নি।"

ফণিভূষণও কোনো উত্তর দিলে না যেমন চুপ করে ছিল তেমনিই রইল, দেখে মণিমালা চটে গেল, সে বললে, "আচ্ছা এমন চুপ করে আছ কেন, বল দেখি?"

"না কি করবো?"

"কেন, করবার বুঝি আর কোনো কাজ নেই। এই তো এখুনি দান করলে, সে তো একটা কাজ হল।"

"তা হল।"

"না, না, সত্যি করে বল না গো, শুধু শুধু অত দাতা হলে কেন?"

"কেন আবার! টাকা হাতে থাকলেই লোকে দাতা হয়, এর আর সত্যি মিথ্যে কি। তোমার হাতে কাপড় ছিল দিতে চাইছিলে, আর আমার হাতে টাকা ছিল, দিলাম, মন্দ কি করেছি।"

"মন্দ করেছ এমন কথা ত আমি বলিনি, —কিন্তু যদি তুমি তোমার দানের পাত্রটিকে দেখতে—"

"আচ্ছা, থাক্"—ফণিভূষণের মুখ একেবারে লাল হয়ে ঘেমে উঠলো।

"তা তো না হয় থাক। কিন্তু তুমি এখনো শুয়ে থাকবে নাকি?"

"না, এই উঠি—কটা বাজলো দেখতো।"

মণিমালা ঘড়ি দেখে বললে, "পাঁচটা,—একেবারে কাঁটায় কাঁটায়!"

"উঠি তা হলে,—ও গান করছে কারা?"

"ডাক্তার বাবুর বাড়ীর ছেলেরা, জানলাটা খুলে দেব?"

"দাও" বলে ফণিভূষণ উঠে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। ডাক্তার বাবুর বাড়ীর ছেলেরা তখন গাইছিল,

"আমি নিশিদিন তোমায় ভালবাসি,
তুমি অবসর-মত বাসিও।"

পাঁচ-পাঁচটা টাকা। অপ্রত্যাশিত আশার অতিরিক্ত ভিক্ষে পেয়েও যে সেই ভিখারিণীটা এখনো দাঁড়িয়ে থাকবে, এমন সন্দেহ তখন অবশ্য কারো মনেই ছিল না।

বাইরে রোদের ঝাঁঝ তখন কমে এসেছে, উত্তর আকাশে ঘন কালো মেঘের সজল আভায় একটি চোখ জুড়ানো স্নিগ্ধতা মাখা। ডাক্তার বাবুর ফুলবাগানে সমস্ত ফুলগাছগুলির মাথায় রোদ লেগে সেগুলিকে যেন বৃষ্টির আশায় উন্মুখ দেখাচ্ছিল।

ফণিভূষণের চোখ পড়লো উঠানের মাঝখানে, যেখানে বিকশিত পদ্মফুলটার মত মুখে, ভিজে ভ্রমরের মত দুটি বিপন্ন সজল চোখ তার পানেই অতৃপ্ত দৃষ্টিতে চেয়ে আছে, —সে চোখ যেন পলক-হারা!

হত্যা-কাণ্ড শেষ করে খুনে যেমন নিজের ফাঁসির ভয়ে পালায়, তেমনি উদ্ভ্রান্ত ব্যাকুল হয়ে ফণিভূষণ জানলার কাছ থেকে সরে দাঁড়াল। তার চোখ-মুখের সমস্ত দীপ্ত তখন একটা কদর্য্য দুর্ব্বলতায় ঢেকে গেল! সে—এখানে—এ বেশে—।

তার সরে যাবার রকম দেখে মণিমালা দেখতে গেল, ব্যাপারটা কি? তার ফলে তার সন্দেহটাই যেন চোখের উপর রূপ ধরে ফুটে উঠলো। অপ্রিয় সত্যের আবিষ্কার করে তার মুখও বেশ গম্ভীর হয়ে উঠলো।

একটু বিমূঢ় ভাবে দাঁড়িয়ে থেকে সে যখন ছুটে উঠানে এসে নামলো, তখন মেয়েটি চলে গিয়েছে। চিনতে পেরে চোখে দেখেও সে তার প্রিয়তমের অনিচ্ছা অনাগ্রহ বুঝে তার সুখের বাধা হ'য়ে থাকলো না। মণিমালার চোখ ফেটে জল এসে পড়লো, —হায়রে, এই তার স্বামী।

মণিমালা অনেকক্ষণ কাঠের পুতুলের মত স্থির হয়ে সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইল,—তারপর যখন হঠাৎ হুঁস হল, তখন সে দেখলে, তার সামনেই একটু-দূরে দিনান্তের পড়ন্ত রোদের লাল আভায় রক্তমাখা ফুলের মত টাকা পাঁচটা পড়ে আছে!

শ্রীনীহারবালা দেবী।

চুড়ির আওয়াজ

চুড়ির আওয়াজ, আর কিছু নয়, একটু কনিঝুনি—
কতবার যে কতই সুরে বাজে তাহাই শুনি।
সোনার হাতে সোনার চুড়ি, কে কার অলঙ্কার?
নয় সে শোভা, বধুই জানে চুড়ি কি ধন তার!
ঘুরিয়ে দিয়ে ছোট্ট দুটি কোমল কর-মূল
আড়াল থেকে চমকে দিয়ে করায় কত ভুল!
শঙ্ক-তাড়িত প্রাণের তারে জানায় কত কথা,
কেউ জানেনা লাজুক বধুর চুড়ির মুখরতা!

নিশীথ-রাতের গোপন-গভীর মিলন-মধু'র আশে
তরুণ যুবার নিদ্রাকাতর নয়ন মুদে' আসে ;
চমকে ওঠে, কোথায় যেন বাজ্‌ল কাঁকণ কার !
কই—কোথা নয় ! ওই যে বাজে, শুনছি পরিষ্কার !
সকল নীরবতার মাঝে কি-ওই বাজে কানে ?
দুয়ার-পাশে ওই যে বাজে, বাজ্‌ছে সে কোন্‌খানে ?
কাণ সে বাজায় আপন মনে, শাসন নাহি মানে,
সত্যি-বাজায় মিথ্যা-বাজায় প্রভেদ নাহি জানে।

এমন সময় ঝুন্‌ঝুনিয়ে বাজল বারান্দায়
চুড়ির আসল সাতভারটি, তন্দ্রা ছুটে যায়।
কি সুর বাজে সকল শিরায় শিরশিরিয়ে যে !
একটু শুধু রুনঝুন্ আর রিন্‌ঝিনিয়ে রে।
গুমট-ভাঙা দম্‌কা-হাওয়ায় পরশ লাগে গা'য়,
সকল ফুলের সকল সুবাস আস্‌ল লহমায় !
আঁধার ঘরে আচম্বিতে জ্যোৎস্না ফিনিক্ ফোটে,
শীতের শেষে প্রথম যেন কোকিল ডেকে ওঠে।

মানভরে আজ আছেন তিনি কথা নাইক' মুখে,
তিনটি দিনের পরে বোধ হয় প্রাণ গলেছে দুখে।
দোষটি আমার ছিল যাহা, দেখেন তাহা নিজের,
বুকের ব্যথা বাড়ছে, তবু যায় কি মানের সে জের !
ঘন ঘন বাজিয়ে চুড়ি সাম্‌নে দিয়ে যাওয়া,
আমার ঘরেই খুঁজ্‌তে আসেন যায় না কি যে পাওয়া !
চুড়ি বলে, 'একবারটি কওনা কথা ডেকে,
জুড়াই ব্যথা বুকের 'পরে মাথা বারেক রেখে।'
কইব কেন ? হ'বই আমি হ'বই বেরসিক,
শুনব চুড়ির মধুর আওয়াজ, থাক্‌ব এখন ঠিক।
বাজুক এখন ঝন্‌ঝনিয়ে, বাজুক রেগে কেঁদে,
বাজুক আবার নরম সুরে—'থাম্‌ছ কেন বেঁধে ?'
মিথ্যে করে' ঘুমিয়ে যখন পড়ব ধীরে ধীরে,
এটা-সেটা রাখার ছলে বাজুক ঘুরে ফিরে।

হাতের চুড়ি এমন যখন বল্‌ছে মুখের বোল,
কাজ কি কথায়? শুনছি বেশ এই মধুর গণ্ডগোল!

মনে পড়ে, শেষবার সেই একাদশীর পড়া—
দুই.ঘরেতে দু'জন আছি, শাসন বড়ই কড়া।
বল্‌লে ডেকে, 'কাল সকালে ঘুমটি ভাঙার পর
মুখটি তোমার দেখার যেন পাই গো অবসর।
থাক্‌ব আমি দুয়ার ধরে' তোমার উঠার চেয়ে,
দেখ্‌ব শুধু একটি পলক লাজের মাথা খেয়ে।'
রাত্রি জেগে' ভোরের সে-ঘুম ভেঙেও ভাঙে না,
কাণে আসে কিসের আওয়াজ? থেমেও থামে না!
বুকের ভিতর কেমন বাজে চুড়ির ঝিনাঝিনি,
ভোরের ভজন এ কোন্ সুরে গাইছে ভিখারিণী!
আকুল হ'য়ে কাঁদন যেন ফিরছে নিরাশায়—
"ওগো জাগো, ডাকছি আমি, সময় বয়ে যায়!"
দুয়ার খুলে' তাকিয়ে দেখি, বিউনি খোলার ছলে
ভোমরা-কালো চুলের মূলে আঙুল দ্রুত চলে।
একে একে সাপ-কাঁটা আর চিরুণ, প্রজাপতি,
সব নেমেছে, খোঁপার সে কি অপূর্ব্ব দুর্গতি!
খুলছে না ক' ফিতার গেরো, ফাঁসটি ধরে' টানে,
অমনি চুড়ি বালার 'পরে কি ঝঙ্কারই হানে!
অবাক হ'য়ে দেখ্‌নু চেয়ে চোরের চতুরালি,
দুষ্ট চুড়ির দুষ্টামী সে, নূতন দূতয়ালী!
চুড়ির আওয়াজ, আর কিছু নয়, একটু রুনিঝুনি—
কতই সুরে কতবার সে বাজে তাহাই শুনি।

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার।

বৈদ্যুতিক বিশ্লেষণ

(Electrolysis)

উনবিংশ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে বৈজ্ঞানিকদিগের মন এক অভিনব ঘটনাদ্বারা আকৃষ্ট হয়। ঘটনাটি "তড়িত বা বৈদ্যুতিক বিশ্লেষণ।" কোন কঠিন বা তরল পদার্থের মধ্যে যদি তড়িত-প্রবাহ প্রবাহিত হয়, তবে সেই পদার্থের মধ্যে এক রকম রাসায়নিক ক্রিয়া (chemical action) দেখিতে পাওয়া যায়। কঠিন বা তরল পদার্থ ধাতু (metal) হইলে রাসায়নিক ক্রিয়া (chemical action) হয় না। রাসায়নিক ক্রিয়াসম্ভূত পদার্থ, যে সঞ্চালকদ্বয়দ্বারা তড়িত-প্রবাহ কঠিন বা তরল পদার্থে যথাক্রমে প্রবেশ ও বাহির হইয়া যাইতেছে, সেই সঞ্চালকদ্বয়ে আসিয়া দেখা দেয়। অর্থাৎ যে সঞ্চালক (conductor)* দ্বারা তড়িত প্রবাহ তরল পদার্থে প্রবেশ করে, সেই সঞ্চালকে কতকগুলি তড়িত বিশ্লিষ্ট পদার্থ আসিয়া উপস্থিত হয়, এবং যে সঞ্চালকদ্বারা তড়িত প্রবাহ (current of electricity) কঠিন বা তরল পদার্থ হইতে বাহির হইয়া যায়, সেই সঞ্চালকে অপর কতকগুলি তড়িতবিশ্লিষ্ট পদার্থ (যথা ধাতু ও অক্সিজেন বা হাইড্রোজেন গ্যাস) আসিয়া দেখা দেয়। যে সকল দ্রব্য ধাতু (metal) নয়, সেগুলি তড়িত-বহনে অসমর্থ অর্থাৎ তড়িত-প্রবাহ তাহাদের উপর দিয়া যাইতে পারে না। যদি তাহাদের মধ্য দিয়া তড়িত প্রবাহ (electric current) প্রবাহিত হয়, তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত ভাবের কোন এক রকমের রাসায়নিক ক্রিয়া বা বিশ্লেষণ ঘটিয়া থাকে।

যে পদার্থের মধ্য দিয়া তড়িত প্রবাহ প্রবাহিত হইলে তাহার বিশ্লেষণ ঘটে, তাহার নাম "তড়িত বিশ্লেষ্য" (electrolyte) পদার্থ। যে সঞ্চালক (conductor) দ্বারা তড়িত প্রবাহ বিশ্লেষ্য পদার্থের (electrolyte) মধ্যে প্রবেশ বা বাহির হইয়া যায়, তাহার নাম "তড়িদ্দ্বার" (electrode)। যে সঞ্চালক দ্বারা "বিশ্লেষ্য পদার্থ" মধ্যে তড়িত প্রবাহ প্রবেশ করে, তাহার নাম "সুদ্বার" (anode), আর যে সঞ্চালক দ্বারা তড়িত প্রবাহ বাহির হইয়া যায়, তাহার নাম "কুদ্বার" (cathode)। যে প্রণালী দ্বারা তড়িত প্রবাহ-বলে কোন দ্রব্যকে বিশ্লিষ্ট করিতে পারা যায়, সেই প্রণালীর নাম "তড়িত বা বৈদ্যুতিক বিশ্লেষণ।" সকল ধাতুই (metals) বৈদ্যুতিক বিশ্লেষণের পর "কুদ্বারে" (cathode) আসিয়া দেখা দেয়। আর এ্যাসিড, র‍্যাডিকল্ "সুদ্বার" (anode) হইতে উৎপন্ন হয়; সঙ্গে সঙ্গে

* যাহা দ্বারা তড়িত প্রবাহ কঠিন বা তরল পদার্থে প্রবেশ লাভ করে, সেই সঞ্চালককে (Conductor) কহে।

তড়িতদ্বারে (electrodes) আর একটি প্রতিক্রিয়া চলিতে থাকে। এই প্রতিক্রিয়াবলে, বিশ্লেষণে উৎপন্ন পদার্থ, (products of Electrolysis) হয় বিশ্লেষ্য পদার্থের সহিত গুলিয়া যায়, (dissolved) নচেৎ তড়িদ্বারের (electrode) সহিত রাসায়নিক যোগে মিশিয়া যায়। তড়িদ্বারের সহিত রাসায়নিক যোগে (chemically) মিশিয়া গেলে আর তাহাকে মুক্ত (free) অবস্থায় পাওয়া যায় না; তড়িদ্বারের অঙ্গীভূত হইয়া যায়। এখন একটি উদাহরণ লইয়া বিচার করা যাক্। গুধাম্লিকাম্লের (সাল্‌ফিউরিক্‌ এ্যাসিডের) ডাইলিউট্‌ দ্রবণ * মধ্যে (solution of sulphuric acid) খানিকটা জলে ফোঁটা কয়েক খাঁটি (strong) সাল্‌ফিউরিক এ্যাসিড্‌ মিশাইলেই সাল্‌ফিউরিক্‌ এ্যাসিডের ডাইলিউট্‌ "দ্রবণ" প্রস্তুত হয়—তড়িত-প্রবাহ চালাইলে গুধাম্লিকাম্ল (সাল্‌ফিউরিক্‌ এ্যাসিড), বিশ্লিষ্ট হইয়া যায়।

$$H_2SO_4 = H_2 + SO_4$$

যদি প্ল্যাটিনাম প্লেটদ্বয় (electrodes) রূপে ব্যবহার হয়, তবে "কুদ্বারে" (kathode) আর্দ্রজন (হাইড্রোজন) গ্যাসের বুদ্বুদ (bubbles) দেখিতে পাওয়া যায় ও "সুদ্বারে" (anode) এ্যাসিড্‌ র‍্যাডিক্যল্‌ (radical) আসিয়া উপস্থিত হয়। "কুদ্বারে" আর্দ্রজন (হাইড্রোজেন) যেমন মুক্ত অবস্থায় (free) দেখিতে পাওয়া যায়, "সুদ্বারে" তেমনি এই এ্যাসিড্‌ র‍্যাডিকলটী (SO_4) দেখিতে পাওয়া যায় না। দ্রবণে (solution) যে জল থাকে তাহার সহিত রাসায়নিক ক্রিয়াবশতঃ এই এ্যাসিড্‌ র‍্যাডিক্যলটী আবার এ্যাসিডে পরিণত হয়। যথা

$$2\,SO_4 + 2\,H_2O =$$

(এ্যাসিড্‌ র‍্যাডিকল) (জল)

$$2\,H_2SO_4 + O_2$$

(সালফিউরিক এ্যাসিড) (অক্সিজেন গ্যাস বা অম্লজন)

এ্যাসিড্‌ র‍্যাডিকেলের বদলে অক্‌সিজেন গ্যাস "সুদ্বারের" প্লাটিনাম প্লেটে বুদ্বুদ্‌রূপে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু "সুদ্বার" (anode) প্লাটিনাম প্লেট না হইয়া যদি তামার প্লেট হইত, তাহা হইলে এ্যাসিড র‍্যাডিকেল (SO_4) তামার সহিত রাসায়নিক যোগে (chemically) মিশিয়া তুঁতেরূপ (তাম্র গুল্‌বেত Copper sulphate $CuSO_4$) ধারণ করিত। অম্লজন অক্‌সিজেন বাহির হইত না।

মহামতি ফ্যারাডে সাহেব বৈদ্যুতিক বিশ্লেষণ (electrolysis) সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অমানুষিক সহিষ্ণুতা সংবলিত পরীক্ষা ও ধীর পর্য্যবেক্ষণ-ফলে তিনি বৈদ্যুতিক বিশ্লেষণ সম্বন্ধে দুটী সূত্রবিধি (law) জগতে প্রচার করেন। বিজ্ঞান

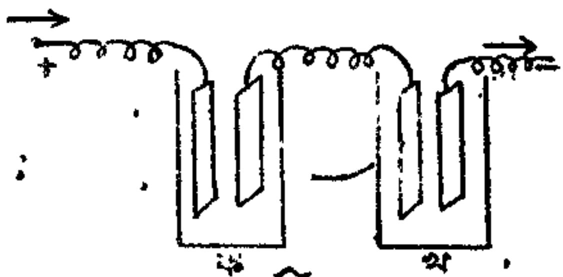
* কোন তরল পদার্থের সহিত অন্য কোন কঠিন বা তরল পদার্থ মিশালে যে মিশ্র তরল পদার্থ হয় তাহাকে "দ্রবণ" (solution) বলে। বলা বাহুল্য উক্ত পদার্থ বেশ গুলিয়া যাওয়া চাই। আমি যাহাকে কেমন [illegible] আচার্য্য রামেন্দ্র বাবু তাহাকে "দ্রবীকরণ" বলিয়াছেন।

জগতে এই দুটী বিধি "ফ্যারাডে বিধি" নামে প্রসিদ্ধ।

ফ্যারাডে বিধি—প্রথম বিধি। বিশ্লেষণে উৎপন্ন পদার্থের পরিমাণ (১) প্রবাহ-বেগের (strength of current) ও (২) যে সময় ধরিয়া প্রবাহ বহিতে থাকে সেই সময়ের সহিত আনুপাতিক (proportional)।

দ্বিতীয় বিধি। এক সময় ধরিয়া প্রবাহিত, একই তড়িত প্রবাহদ্বারা উৎপন্ন ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর পরিমাণ সেই বস্তুর "রাসায়ণিক সমতা"র (chemical equivalents) সহিত আনুপাতিক (proportional)।

এ দুটী বিধি বিশেষ করিয়া পর্য্যালোচনা করিলে আমরা জানিতে পারি যে, যদি নির্দ্দিষ্ট সময়ব্যাপী নির্দ্দিষ্ট তড়িত-প্রবাহ প্রসূত কোন একটা পদার্থের বিশ্লেষণ-পরিমাণ জানা থাকে এবং যদি অন্য কোন পদার্থের রাসায়ণ সমতা (Chemical equivalent) জানা থাকে, তবে সেই দ্বিতীয় পদার্থের বিশ্লেষণ-পরিমাণ বাহির করিতে পারা যায়। আর একটু বিশদরূপে বলিতেছি। প্রথমে রসায়ণ সমতা (Chemical equivalent) কাহাকে বলে দেখা যাক। কোন এক মূল পদার্থের (element) পরমাণু গুরুত্বকে (atomic weight) তাহার মিলনাঙ্ক দ্বারা (valency) ভাগ করিলে যাহা পাওয়া যায় তাহাকে রাসায়ণ সমতা বলে। মনে কর, কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ তড়িত-প্রবাহ



চিত্র ১

(যে তড়িৎ-প্রবাহের পরিমাণ আমরা জানি) কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য দুটি ভিন্ন ভিন্ন পাত্রস্থিত, (ক, খ, চিত্র ১) ভিন্ন ভিন্ন বিশ্লেষ্য পদার্থের মধ্যে প্রবাহিত হয়, 'ক'-পাত্রের কুধারে উৎপন্ন বিশ্লিষ্ট পদার্থ-পরিমাণ যদি আমরা জানিতে পারি, এবং 'খ'-পাত্রস্থিত কুধারে উৎপন্ন পদার্থের রাসায়ণ-সমতা যদি আমাদের জানা থাকে, তবে 'খ' পাত্রস্থ 'কু'ধারে উৎপন্ন পদার্থ পরিমাণ আমরা গণনা দ্বারা স্থির করিতে পারি। এক সেকেণ্ড-ব্যাপী, এক এম্পিয়ার পরিমিত তড়িত-প্রবাহ প্রসূত কোন পদার্থের পরিমাণকে তাড়িত রাসায়ণ সমতা (electro-chemical equivalent) বলে। তাহা হইলে, একটি পদার্থের তাড়িত-রাসায়ণ-সমতা জানিতে পারিলে অন্যান্য পদার্থের তাড়িত-রাসায়ণ-সমতা স্থির করিতে পারা যাইবে। কিন্তু ঐ এক বস্তুর তাড়িত-রাসায়ণিক-সমতা অতি সূক্ষ্মরূপে জানা চাই; নচেৎ অপর পদার্থের তাড়িত-রাসায়ণ-সমতা সূক্ষ্মরূপে বাহির হইবে না। বড় বড় বৈজ্ঞানিক মহাশয়েরা রৌপ্যের তাড়িত-রাসায়ণ সমতা অতি সতর্কতার সহিত অতি সূক্ষ্মরূপে নির্ণীত করিয়াছেন।

পরীক্ষালব্ধ রৌপ্যের তড়িত-রাসায়ণ সমতা = '০০১১১৮৩। ইহাকে উপলক্ষ্য করিয়া আমরা অন্যান্য পদার্থের তাড়িত-রাসায়ণ-সমতা অতি সুক্ষ্মরূপে নির্ণয় করিতে পারি। যথা, দস্তার মিলনাঙ্ক (valency) = ২। দস্তার অণু ওজন (atomic weight) = ৬৫.৩৭। রৌপ্যের অনু-ওজন = ১০৭.৯। রৌপ্যের মিলনাঙ্ক = ১

দ্বিতীয় বিধি অনুযায়ী

$$\frac{\text{দস্তার তাড়িত-রসায়ণ সমতা}}{\text{রৌপ্যের তাড়িত রসায়ন সমতা}} = \frac{\text{দস্তার রসায়ণ-সমতা}}{\text{রৌপ্যের রসায়ণ সমতা}}$$

$$= \frac{\frac{৬৫.৩৭}{২}}{\frac{১০৭.৯}{১}} = \frac{৬৫.৩৭}{২ \times ১০৭.৯}$$

$\therefore$ দস্তার তড়িত-রাসায়ন-সমতা =

$$\frac{'০০১১১৮৩ \times ৬৫'৩৭}{২ \times ১০৭'৯} = '০০০৩৩৮৭$$

এইরূপে প্রত্যক্ষ প্রমাণে ফ্যারাডে বিধির নিত্যতা প্রমাণ হইয়াছে। ফ্যারাডে বিধির নিত্যতা (constancy of Faraday's laws) সম্বন্ধে আর কাহারও সন্দেহ নাই। ধাতুজ পদার্থ হইতে ধাতু-অংশটী তড়িত প্রবাহ দ্বারা অনায়াসে অতি সহজে বিশ্লিষ্ট হয়। ফ্যারাডে বিধির নিত্যতা হেতু ও তড়িত প্রবাহ দ্বারা ধাতুজ পদার্থ হইতে ধাতু বিশ্লেষণে প্রয়াস হীনতা-হেতু পদার্থ বিদ্গণ তড়িৎ প্রবাহ মাপিবার জন্য "তড়িত বিশ্লেষণ প্রণালী" প্রয়োগ করিয়া থাকেন। যে যন্ত্র সাহায্যে কোন বৈদ্যুতিক পদার্থকে তড়িত প্রবাহ দ্বারা বিশ্লিষ্ট করিয়া বিশ্লেষণ সম্বন্ধীয় মাপযোগ করা হয় সেই যন্ত্রকে ভল্‌টা মাপক (voltameter) বলে। নির্দ্দিষ্ট সময় ধরিয়া তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থ মধ্য দিয়া তড়িত প্রবাহ প্রবাহিত করা হয়; এবং বিশ্লিষ্ট পদার্থের ওজন স্থির করা হয়। এবং সেই বিশ্লিষ্ট পদার্থের তাড়িত-রাসায়ন সমতা যদি জানা থাকে, তাহা হইলে নিম্নলিখিত অঙ্কপাত হইতে তড়িত প্রবাহ পরিমাণ স্থির করা যাইতে পারে। যদি তড়িত প্রবাহ পরিমাণকে 'ত' বলা হয়, তাড়িত-রাসায়ন সমতাকে যদি 'র' বলা হয়, বিশ্লিষ্ট পদার্থের ওজন যদি 'ও' হয়, সময়ের পরিমাণ যদি 'স' সেকেণ্ড হয় তবে

$$\text{ও} = \text{ত} \times \text{র} \times \text{স}$$

এই চারিটি রাশির মধ্যে তিনটি জানা থাকিলেই চতুর্থটী বাহির করিতে পারা যায়। বিজ্ঞানাগারে সাধারণতঃ 'ত' ও 'র' এই দুটি রাশি স্থির করিবার জন্য শিক্ষার্থী-দিগকে বলা হয়। 'ত' স্থির করিবার জন্য

$$\text{ত} = \frac{\text{ও}}{\text{র} \times \text{স}}$$

সমীকরণ (equation) ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আর 'র' স্থির করিবার জন্য

$$\text{র} = \frac{\text{ও}}{\text{ত} \times \text{স}}$$

সমীকরণ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ভিন্ন ভিন্ন ধাতুর পরমাণু-ওজন (atomic weight), মিলনাঙ্ক (valency) রাসায়ন-সমতা ও তাড়িত-রাসায়ণ সমতা নিম্নলিখিত চক্রে (table) প্রদত্ত হইল।

তড়িৎ-রসায়ন-সমতা

মূল পদার্থ	মূল পদার্থের ইং সঙ্কেত	অণু ওজন Atomic weight	মিলনাঙ্ক Valency	রসায়ন-সমতা Chemical Equivalents	তড়িৎ-রসায়ন-সমতা in Practical units
অ্যান্টিমণি	Sb	১২০·২	৩		
অক্স জন বা অক্সিজেন	O	১৬·০০	২	৭·৯৩৮	·০০০০৮২৮৫
এলুমিনিয়াম	Al	২৭·০	৩	৮·৯৬	·০০০০৯৩৪৫
ক্লোরিণ (ক্লোরিণ) গ্যাস	Cl	৩৫·৪৬	১	৩৫·১৭	·০০০৩৬৮২
তাম্র	Cu	৬৩·৩	১	৬৩·০৯	·০০০৬৫৮৭
তাম্র	〃	〃	২	৩১·৫৪	·০০০৩২৯৩
দস্তা	Zn	৬৫·৩৭	২	৩২·৬৪	·০০০৩৩৮৭
পোটাসিয়াম্	K	৩৯·১৫	১	৩৮·৮৪	·০০০৪০৫৫
নিকেল	Ni	৫৮·৭	২	২৯·১১	·০০০৩০৪০
রৌপ্য	Ag	১০৭·৯৩	১	১০৭·০৭৩	·০০১১১৮৩
লৌহ	Fe	৫৫·৯	২	২৭·৭৩	·০০০২৮৯৫
লৌহ	〃	〃	৩	১৮·৪৮৫	·০০০১৯৩০
স্বর্ণ	Au	১৯৭·২	৩	৬৫·২১	·০০০৬৮০৮
সোডিয়াম্	Na	২৩·০৫	১	২২·৮৭	·০০০২৩৮৭
অর্ডজন (হাইড্রোজেন) গ্যাস	H	১·০ ৪	১	১	·০০০০১০৪৪

ভল্টা মাপক

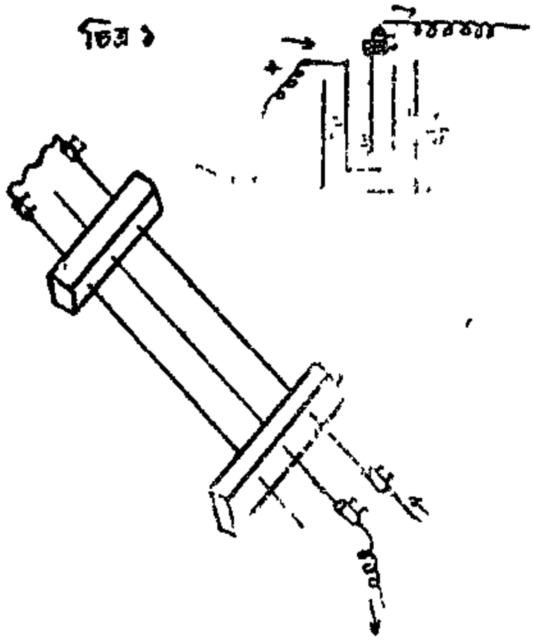
(VOLTA METER)

সাধারণতঃ বিজ্ঞানাগারে তিন রকম ভল্টা মাপক (Volta meter) ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা তাম্র-ভল্টামাপক রৌপ্য-ভল্টামাপক ও জল-ভল্টামাপক। এই তিনটি ভল্টা মাপকের বিশদ বর্ণনা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। তাম্র ভল্টামাপক ঃ

একটি কাচ পাত্রে (চিত্র ১,ক) তুঁতে গোলা জল রাখা হয়। পরিষ্কার পবিত্র তুঁতে দানা (crystals of Copper Sulphate) তাহার চারগুণ ওজন জলে গোলা হয়। এই প্রকারে প্রস্তুত তুঁতে দ্রবণে (Solution) কয়েক ফোঁটা গাঢ় সাল্‌ফিউরিক্ এ্যাসিড্ মিশাইয়া

চিত্র ১



রাখা হয়। একখানি পাতলা তামার চাদর হইতে কুথার প্রস্তুত হয়। এই কুথারের মাপ আন্দাজ দুই ইঞ্চি চওড়া ও পাঁচ ইঞ্চ লম্বা। তাহার কোণগুলি উকাঘাবা ঘষিয়া গোল করিয়া দেওয়া উচিত; নচেৎ সেইস্থানে তামার কণাগুলি রেল গাড়ীর ডেলি প্যাসেঞ্জারদের মত কোণে কোণে বসিতে বড় ভাল বাসে; সকলেই সেই দিকেই দৌড়ায়। কাজেই কোণ-স্থিত আলগা কণাগুলি ধুইবার সময় পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা। কুথারটি, কু, একটি একটু-মোটা শক্ত তাম্র তার হইতে ঝুলান থাকে। এই দুই পাতের একদিকের কালি (area) কুথারের কালির সহিত সমান। যে দুই তার হইতে এই দুই পাত ঝুলান আছে, তাহারা কোন ধাতব পদার্থে সংযুক্ত। এই দুই পাত একত্র যোগে সুথাররূপে বর্ত্তমান। যে তিনটি তার হইতে তাম্র পাত তিনটি ঝুলানো হইয়াছে, সেই তিনটী তার দুটী সরু সরু কাঠের মধ্য দিয়া চালাইয়া দেওয়া হয়। এই দুটী কাঠ কাচ পাত্রের উপর স্থাপিত। এখন তাড়িত প্রবাহ যদি আস্তে আস্তে সুথার (anode) হইতে কুথারে (kathode) প্রবাহিত হয়, অর্থাৎ তড়িত প্রবাহের বেগ (strength) যদি খুব বেশী না হয়, তাহা হইলে কুথারে তামার কণাগুলি বেশ সমভাবে ও দৃঢ়রূপে বসিতে পারে। কিন্তু যদি তাড়িত প্রবাহে বেগ খুব বেশী হয়, তবে অনেক তামার কণা তাড়াতাড়ি গাদাগাদি করিয়া কুথারে বসিতে যায়, কাজেই পরস্পর পরস্পরকে ভাল করিয়া আঁকড়াইয়া ধরিবার সুবিধা পায় না। কুথারটি ধুইবার সময় আলগা তামার কণাগুলি পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা। সেই জন্য তড়িত বিশ্লেষণে মন্দ-বেগী তড়িত প্রবাহ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কুথারের প্রত্যেক ৫০ বর্গ সেন্টিমিটার পক্ষে এক এম্পিয়ারের অধিক প্রবাহ ব্যবহার করা উচিত নহে। বিশ্লেষ্য পদার্থ মধ্যে দিবার পূর্ব্বে কুথারকে বেশ পরিষ্কার করা আবশ্যক। খুব মিহি বালির কাগজ দিয়া প্রথমে কুথারের দুই পিঠ ঘষিয়া পরিষ্কার করিতে হয়। তারপর তাহাকে গুটিকয়েক সালফিউরিক্ এ্যাসিড্ মিশানো জলে কয়েক মিনিট ডুবাইয়া রাখিবার পর পরিষ্কার জলে

ধুইয়া ফেলিতে হয়। যদি কুঞ্চারে তামার অক্সাইড যথার পরেও লাগিয়া থাকে তবে সাল্‌ফিউরিক এ্যাসিডের তাহার উপর রাসায়নিক ক্রিয়া হওয়ায়, অক্সাইড সলফেট্ হইয়া যায়, তখন জলে ধুইলে সলফেট্ জলে গুলিয়া যায় ও তামার পাতটী বেশ পরিষ্কার হয়। অক্সাইড্ তাড়াইবার জন্যই সাল্‌ফিউরিক এ্যাসিড ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তার পর একখানা সাদা ব্লটিং কাগজের উপর কুঞ্চারটীকে খাড়া করিয়া খানিকক্ষণ ধরিয়া থাকিলে জলটি ব্লটিং কাগজে শুষিয়া যাইবে তখন তাহাকে স্পিরিট ল্যাম্পের শিখার প্রায় একফুট উপরে কিছুক্ষণ ধরিলে কুঞ্চারটি বেশ শুকাইয়া যাইবে। শিখার নিকটে থাকা উচিত নয়। কেননা, তাহা হইলে তামার অক্সাইড হইবার সম্ভাবনা। কুঞ্চারের সহিত সমকালে-বিশিষ্ট অপর একখানি তাম্রপাত কুঞ্চার রূপে বিশ্লেষণ কোষের (electrolytic cell) মধ্যে রাখিয়া তড়িত প্রবাহ পরিমাণ উপযুক্ত রূপে নিয়ন্ত্রিত করা হয়। তার পর তাম পাতটি তুলিয়া রাখা হয়। এদিকে পূর্ব্বোক্ত পরিষ্কার কুঞ্চারটির ওজন স্থির করা হয়। মনে কর, এখনকার উহার ওজন 'ও' গ্রাম। ওজন স্থির করিবার পর কুঞ্চারটিকে বিশ্লেষণ-কোষে বসাইয়া দেওয়া হয় ও সেই মুহূর্ত্তে ঘড়িটি দেখিয়া রাখা হয়। তার পর কিছুক্ষণ পরে (যথা আধ ঘণ্টা) ঘড়ি পুনরায় দেখিয়া কুঞ্চারটী তুলিয়া লইয়া ধীরে ধীরে পরিষ্কৃত জল-ধারায় তাহাকে ধুইয়া ফেলা হয়। এখন তাহাতে ইটের ন্যায় লাল তাম্র কণা সমস্ত প্লেটটিতে যতখানি তরল পদার্থের মধ্যে ছিল—জমা হইয়াছে। তাহার পর ব্লটিং কাগজের উপর খাড়া করিয়া কিছুক্ষণ রাখিবার পর তাহাকে পূর্ব্বোক্ত উপায়ে শুকাইয়া লওয়া হয়। শুকাইবার পর তাহাকে আবার ওজন করা হয়। এখনকার ওজন, মনে কর, 'ও′' গ্রাম। যদি ঘড়ি-দৃষ্ট সময়-দ্বয়ের অন্তর 'স' সেকেণ্ড হয়, ও তামার ০·৩৩ রাসায়নিক—সমতা যদি 'র' হয়, তবে তড়িত প্রবাহ পরিমাণ, ত, নিম্নলিখিত অঙ্কপাত হইতে বাহির করিতে পারা যায়।

$$ত = \frac{ও - ও'}{স \times র}$$

ত = তড়িন্মাপক (Galvanometer)

ক = বর্ত্তক (Commutator)

ব = ব্যাটারি

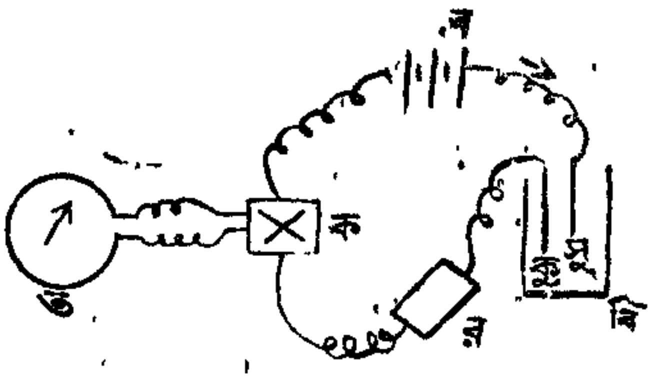
বি = বিশ্লেষণ-কোষ

কু = কুঞ্চার

সু = সুঞ্চার

র = রোধ-ভাণ্ডার (resistance-box)

বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় কপার সাল্‌ফেট তড়িত প্রবাহ দ্বারা দুইভাগে বিশ্লিষ্ট হয়। কপার (তামা, cu) ও সাল্‌ফেট্ (SO_4) দুই বিশ্লিষ্ট অংশ। তামাটি কুঞ্চারে (cathode) জমা হয়, আর সাল্‌ফেট্ (SO_4) সুঞ্চারে আসিয়া উপস্থিত হয়। সুঞ্চারটি তামার প্লেট বলিয়া সাল্‌ফেটে (SO_4) তামার সহিত রাসায়নিক যোগে যুক্ত হইয়া কপার সাল্‌ফেটে পরিণত হয়। কপার সাল্‌ফেট জলে দ্রবণীয় বলিয়া জলে গুলিয়া যায়। তাহা হইলে দেখ, সাল্‌ফেটের একটি অণু (molecule) দুই



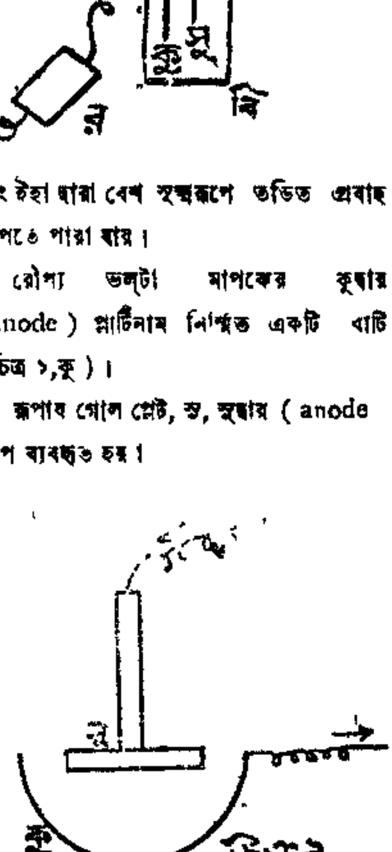
দ্বারা বিশ্লিষ্ট হইয়া তাম্র পরমাণুকে কুধারে ছাড়িয়া দিয়া সুধার হইতে অপর একটি তাম্র পরমাণু লইয়া আবার কপার সালফেটের একটি অণুতে পরিণত হয়। সুতরাং তুঁতে জলের বা তুঁতে দ্রবণের তুঁতের পরিমাণের হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না।

সুধারের ক্ষয় কুধারের বৃদ্ধির সহিত ঠিক সমান নহে। কারণ সুধার যখন ক্ষয়িতে থাকে, তৎসংলগ্ন ময়লা (impurities) আলগা হইয়া যাওয়ায় তাহাও পড়িয়া যায়। কুধারের বৃদ্ধি কেবলমাত্র তামা জমা হইবার দরুণই হইয়া থাকে কিন্তু সুধারের ক্ষয় = তামার ক্ষয় + ময়লা। কাজেই সুধার-ক্ষয় কুধার-বৃদ্ধির সহিত সমান হইতে পারে না। সুধার ক্ষয় কুধার-বৃদ্ধি অপেক্ষা অধিক হইবে। সুতরাং তড়িত প্রবাহ মাপবার সময় কুধারে বৃদ্ধি না ধরিয়া সুধার-ক্ষয় ধরিয়া গণনা করিলে ভুল হইবে।

পূর্ব্ব-বর্ণিত ভলটা-মাপক বিজ্ঞানাগারে এম্-মাপক (am-meter) ও ট্যানজেণ্ট গ্যালভান মার্ক যাচাই করিবার জন্য প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তাহার কেমন [illegible] সহজেই প্রস্তুত করা যায়, এবং ইহা দ্বারা বেশ সূক্ষ্মরূপে তড়িত প্রবাহ মাপিতে পারা যায়।

রৌপ্য ভলটা মাপকের কুধার (anode) প্লাটিনাম নির্ম্মিত একটি বাটি (চিত্র ১,কু)।

রূপার গোল প্লেট, সু, সুধার (anode রূপে ব্যবহৃত হয়।



চিত্র ১

১৫ হইতে ২০ গ্রাম বিশুদ্ধ সিলভার নাইট্রেট ($AgNO_3$)

১০০ গ্রাম পরিষ্কার (pure) জলে গোলা হয়।

এই সিলভার নাইট্রেট গোলা জল বা সিলভার নাইট্রেট দ্রবণ (solution) রৌপ্য

তলটা খাপকে বিশ্লেষ্য পদার্থরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সিলভার নাইট্রেট দ্রবণ প্লাটিনাম বাটিতে রাখা হয়। এই দ্রবণের মধ্যে কুথারকে, সু, ঝুলাইয়া রাখা হয়। তড়িত প্রবাহ দ্বারা সিলভার নাইট্রেট বিশ্লিষ্ট হইয়া সিলভার (রৌপ্য) কুথারে প্লাটিনম বাটির ভিতর দিকে জমা হইয়া থাকে। আর নাইট্রেট (NO_3) কুথারে আসিয়া কুথার হইতে রৌপ্য পরমাণু লইয়া আবার সিল্ভার নাইট্রেটে পরিণত হয়। সিলভার নাইট্রেট দ্রবণীয় বলিয়া নবজাত সিলভার নাইট্রেট জলে গুলিয়া যায়। কাজেই দ্রবণের দ্রবণ-বল (Strength of the solution) ঠিক থাকে; তাহার হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না। যখন রৌপ্য প্লেট হইতে রৌপ্য পরমাণু একএক করিয়া যেমন রাসায়নিক ক্রিয়া-যোগে সিল্ভার নাইট্রেটে পরিণত হইতে থাকে, তৎপার্শ্বস্থ ময়লাগুলিও (impurities) আলগা রৌপ্যকণা খসিয়া প্লাটিনাম বাটিতে পড়া সম্ভব। যে রৌপ্য তড়িত প্রবাহ দ্বারা বিশ্লিষ্ট হইয়া প্লাটিনাম বাটিতে জমা হইয়াছে, তাহার ওজন আমাদের চাই। কিন্তু ময়লা বা আলগা রৌপ্যকণা রৌপ্যপ্লেট হইতে খসিয়া প্লাটিনাম বাটিতে পড়িলে, তড়িত বিশ্লিষ্ট রৌপ্যের ওজন শুদ্ধরূপে পাওয়া যাইবে না। কাজেই যাহাতে ময়লা বা রৌপ্য-কণা কুথার হইতে খসিয়া প্লাটিনাম বাটিতে পড়িতে না পারে তাহার একটা ব্যবস্থা করা আবশ্যক। কুথারটি ফিল্টার কাগজে জড়াইয়া রাখিলে ময়লা বা রৌপ্য-কণার খসিয়া পড়িবার সম্ভাবনা থাকে না। অথচ দ্রবণ (solution) ফিল্টার কাগজের মধ্য দিয়া যাতায়াত করিতে পারায় তড়িত প্রবাহের গমনের পথে কোন বাধা পড়ে না। তড়িত প্রবাহের পরিমাণ কুথারের প্রতি বর্গ-সেন্টিমিটারের পক্ষে ·০৩ এ্যাম্পিয়ারের অধিক ব্যবহার করা উচিত নহে।

প্রথমে পরিষ্কৃত প্লাটিনাম বাটির ওজন দেখিয়া রাখ—মনে কর, উহার ওজন 'ও' গ্রাম; তাহার পর সিলভার নাইট্রেট দ্রবণ উহাতে ঢালিয়া দাও। কুথার যেন দ্রবণে ডুবিয়া থাকে ও কুথারে না ঠেকিয়া যায় এ বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে। পরে ঘড়ি দেখিয়া তড়িত প্রবাহ চালাইয়া দাও। ইচ্ছামত সময়-বাদে আবার ঘড়ি দেখিয়া তড়িত প্রবাহ থামাইয়া দাও। তাহা হইলে যতক্ষণ তড়িতপ্রবাহ বিশ্লেষ্য পদার্থ মধ্যে প্রবাহিত হইল, ঘড়ি সাহায্যে এই সময়টি পাওয়া যাইবে। মনে কর, এই সময় 'স' সেকেণ্ড তাহার পর কুথারটি অর্থাৎ প্লাটিনম বাটিটি পরিষ্কৃত জলে ধুইয়া, সামান্য তাপে শুকাইয়া, আবার ওজন কর। এখনকার ওজন ও' গ্রাম। রৌপ্যের তড়িত রসায়ন সমতা (electro-chemical equivalent) চক্র (table) হইতে দেখিয়া লও। তার পর নিম্নলিখিত অনুপাত সাহায্যে তড়িতপ্রবাহ পরিমাণ স্থির কর। যদি ত = তড়িত প্রবাহ পরিমাণ, 'র' তড়িত রসায়ন সমতা হয়, তবে

$$ত = \frac{ও - ও'}{র \times স}।$$

শ্রীকালীদাস ভট্টাচার্য্য।

লাজ

হে দেবতা,
কি কহিতে চাহি আমি, কি আজি কব তা
জানো তুমি আগে,
তাই ত কহিতে কিছু ভালো নাহি লাগে।
আমার এ গান,
কুড়ানো মূর্চ্ছনা শুধু একটি তন্ত্রীতে কম্পমান
অসীমের শত তন্ত্রী হতে।
হৃদয়ের পরতে পরতে
যা-কিছু সমৃদ্ধি আছে, কিছু লয়ে চলে না গরব,
কার এ খুসির দান, খেয়ালে পোষাতে পারি সব,
এ জীবন এত বড় ফাঁকি।

তুমি মোরে নিয়ে এলে ডাকি'
ঢে মায় সভার মাঝে, গুণীজন সনে
পরিচয় ক'রে দিলে, তা'রপর বসায়ে আসনে
কোলে মোর সম্ভ্রমে সাদরে
বীণাটি তুলিয়া দিলে আপনার করে,
ধন্য হ'নু আমি।

তবুও কি বেদনায় আজি মোর গান গেছে থামি'
জানো না তুমি তা।
তুমি যে গো অসীমের পিতা,
—তুমি সব;
কি আছে আমার, আমি কি ল'য়ে জুড়িব কলরব
এত আদরে?

তোমার ভাঁড়ার ঘরে
যত ধন যত বস্তু আছে,
সকল মেলিয়া দিলে অধমের কাছে,
এত দয়া তব!
হাতটি বাড়ায়ে কিছু ল'ব
নাহি সে শকতি;
হে অনন্ত ঐশ্বর্য্যের পতি,
চিরকাল তুমি দাতা, চিরকাল আমি যে ভিখারী
এ লাজ সহিতে না কি পারি।

চাহি না সে ধন,
হোক সে উজাড়-করা ধরণীর মাণিক রতন,
প্রতিভার বরমাল্য, প্রেয়সীর বাহুমাল্য আর,
চিরজনমের তরে যাহার 'পরে নাহি অধিকার,
লভি শুধু তব অনুগ্রহে।

— মোর এ ত এক জন্ম নহে!
কে বলেছে চিরকাল যাবে শুধু তব দয়া পেয়ে?
হয় ত জনম ল'ব হয়ে কোথা পতিতার মেয়ে,
অস্পৃশ্য অধম জাতি, জন্মান্ধ ভিখারী,
পঙ্গু, বিকলাঙ্গ, কিবা পূর্ণঅঙ্গী ভারতের নারী।

বুকে চন্দনের ভরা ... আগুনের মাঝখান দিয়া
যদি নাহি যেতে পারি, পাশ ঘেঁষে গিয়া
নিজ ক্ষুদ্র সুখ ল'য়ে পাব না তৃপতি।
অনন্ত জীবন ধ'রে যত দুঃখ ক্ষতি
সহিয়াছে কোটি জীব, সব আমি স'ব,
কীট হয়ে পিষ্ট হব,
কুকুর হইয়া খাব ডাণ্ডা,
হিন্দুর বিধবা হয়ে আঁখিজলে নিশা হবে সারা,
দিন যাবে অনাদরে, অবজ্ঞায়, শ্লেষে।

আমার সে কোটি জন্ম তোমার দুয়ারতলে এসে,
ভিড় করে ওগো মহারাজ!
ক্ষমা কোরো মোরে তুমি আজ,
এ বোবা-কালার হাটে বাঁশী যদি বেসুরেই বাজে
স্বর যদি বেধে যায় লাজে
কণ্ঠের নিকটে এসে, খঞ্জের খেলায়
স্বচ্ছন্দ নৃত্যের ছন্দে তাল কেটে যায়,
অন্ধের আলয়ে
যদি লাজ বাসি আমি পশিবারে হাতে
আলো ল'য়ে।

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী।

বারোয়ারি উপন্যাস

১২

আজ বৎসরাবধি কাল ধরে আমরা মাসের পর মাস পালায়-পালায় আপনাদের যে গল্প বলে আসছি, এতদিনে তার পরমায়ু ফুরিয়ে এসেছে, অর্থাৎ গল্পটি এগার হাতে মানুষ হয়ে অবশেষে আমার হাতে এসে পড়েছে তার সমাপ্তি লাভ করবার জন্য।

এ পৃথিবীতে মানুষের জীবনের গল্প শেষ হয় এক মৃত্যুতে; কিন্তু আমাদের মনগড়া গল্প শেষ হয় নানা রকমে। কোনটি শেষ হয় হত্যায়, কোনটি আত্মহত্যায়, কোনটি বিবাহে, কোনটি সন্ন্যাসে, কোনটি কান্নায়, কোনটি হাসিতে। কিন্তু আমাদের মনগড়া গল্পও আমরা যেমন খুশি তেমন করে শেষ করতে পারি নে। কেন না গল্পের পরিণতিও গল্পের নিয়তির অধীন।

আপনারা মনে ভাবতে পারেন যে, কমলার উপাখ্যান ১১শ মাসেই শেষ হয়ে গেছে। কিছুদিন ধরে অদৃষ্ট কমলা ও সতীশকে যে লুকোচুরি খেলাচ্ছিল সে খেলা একদিন অদৃষ্টই বন্ধ করে দিলে, পথের মাঝে দুজনকে পরস্পরের কাছে ধরিয়ে দিয়ে। এ ধারণা এক হিসেবে ঠিক হলেও সম্পূর্ণ সত্য নয়। পৃথিবীর যে কোন ব্যাপার হোক না কেন, তার জের না মিটলে তা খতম হয় না। আমার পালা হচ্ছে এ গল্পের জের মেটানো।

আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিই যে, আপনাদের সঙ্গে কমলা ও সতীশের যখন শেষ দেখা হয় তখন তারা একখানি গরুর গাড়িতে সোয়ার হয়ে কালীঘাটাভিমুখে ধীরে-ধীরে অগ্রসর হচ্ছেন। গো-শকটের এই মন্থরগতি আরোহী যুগলের কাছে মোটেই বিরক্তিকর বোধ হয়নি। এ গাড়ী সগড় না হয়ে মোটর হলে—কমলার কথা, কমলা বলবার ও সতীশ শোনবার সুযোগ পেত না। আর বলা বাহুল্য কমলার বলবার কথা অনেক ছিল আর সে তার স্বামীর কাছে তার জীবনের নূতন ইতিহাস তন্ন তন্ন করে বলতে ত্রুটি করেনি। সে বিবরণ এস্থলে লিপিবদ্ধ করার একমাত্র ফল হবে পুঁথির পাতা বাড়ানো। আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত শুনে সতীশ মনে-মনে বল্লেন—"গল্প ত আগেই শুনেছি; এ ত ক্ষিতীশের রিপোর্টের অক্ষরে অক্ষরে কাপি।"

কিন্তু কপি হলেও ক্ষিতীশদত্ত বিবরণের সঙ্গে এ বিবরণের পার্থক্য অবশ্য ছিল। একই জিনিষ পুরুষের হাতের লেখায় এক চেহারা আর মেয়ের হাতের লেখায় আর-এক চেহারা ধরে। কমলার বর্ণনার লাইন-গুলো আঁকা-বাঁকা ও অক্ষর গুলো ছোট বড় ছিল। এই কাঁচা হাতের বর্ণনায় কৌশলের লেশমাত্র ছিল না বলে ক্ষিতীশের কথার চাইতে কমলার কথা সতীশের মনে বেশি করে বসে গেল। সে কথা যে সত্য সে বিষয়ে সতীশের মনের কোন কোণে তিলমাত্র সন্দেহও আর রইল না। সতীশ মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলে যে, যে যাই ভাবুক, যে যাই বলুক, সতীশ স্বীকার

বনবাসের পুনরভিনয় প্রাণ থাকতেও করবে না। সতীশের ব্যবহারে, তার কথায় বার্ত্তায়, তার কণ্ঠস্বরে, তার ভাব-ভঙ্গীতে কমলা বুঝলে যে তার স্বামীর পূর্ব্ব বিশ্বাস সে আবার ফিরে পেয়েছে। তখন তার মনে হল যে, সে সেই গঙ্গাস্নানের দিন পথশ্রান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছিল এইমাত্র সে জেগে উঠেছে। ইতিমধ্যে যে সব ঘটনা সে মনে ভাবছে ঘটেছে, সে সব দুঃস্বপ্ন মাত্র।

৩৫

এই ত গেল তাদের মনের খবর। কিন্তু মানুষের দেহ বলেও একটা জিনিস আছে—যার দাবী সুখে-দুঃখে কোন অবস্থাতেই মানুষ উপেক্ষা করতে পারে না। এই একটা দিনের ঘটনা মনে করলেই পাঠক সহজেই অনুমান করতে পারবেন, শ্রান্তি সতীশ ও কমলার দেহকে কতদূর অভিভূত করে ফেলেছিল, ও ক্ষুধা তাদের কতদূর পীড়া দিচ্ছিল। গাড়ী বাড়ীর যত কাছে আসতে লাগল তারা দুজনে ততই আহার ও নিদ্রার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠতে লাগল।

কিন্তু কি আহার কি নিদ্রা ভগবান সেদিন তাদের কপালে লেখেন নি। বলা বাহুল্য সে রাত্তিরে বাড়ী তারা অবশ্য পৌঁচেছিল, কেন না গরুর গাড়ীর আর যাই দোষ থাক্—একটা মহাগুণ আছে। গরুর গাড়ীতে আর গরুর গাড়ীতে কখন কলিসন হয় না—আর যদিও হয় তা হলে ব্যাপার তেমন মারাত্মক হয় না।

সতীশ কমলা সে রাত্তিরে তাদের নিজের বাড়ীতে আশ্রয় পায় নি।

অনেক বকাবকির পর দুর্গাসুন্দরী ছেলেকে শেষ-কথা বল্লেন এই যে কমলার হাতে জল তিনি কিছুতেই খাবেন না, তার সঙ্গে একত্রে বাস কিছুতেই করবেন না। সুতরাং সতীশকে হয় তার স্ত্রীকে ঘর থেকে বার করে দিতে হবে—নয় তার মাকে।

কমলার চরিত্রে কলঙ্ক স্পর্শ করে নি এ কথা দুর্গাসুন্দরী কিছুতেই বিশ্বাস করলেন না, কেন না সতীশের কথা শুনে তাঁর মনে এই বিশ্বাস অতি বদ্ধমূল হল যে, বউ তাঁর ছেলেকে যাদু করেছে। সতীশ কাকুতি মিনতি করে রাগ দেখিয়ে ধমক দিয়েও যখন দেখলে যে তার মা কমলার নির্দ্দোষিতায় কিছুতেই বিশ্বাস করবেন না, তখন তাঁর মুখ থেকে হঠাৎ এই কথা বেরিয়ে গেল যে কমলা সতীই হোক আর অসতীই হোক আমি ওকে কিছুতেই ত্যাগ করব না।

এ কথা শুনে দুর্গাসুন্দরী কিছুক্ষণের জন্য স্তম্ভিত হয়ে থেকে পরে অতি ধীরে বল্লেন,

"ভগবান যদি আমার কপালে তাই লিখে থাকেন ত তাই হোক। আমি ছেলে ত্যাগ করতে পারব—কিন্তু ধর্ম্ম-ত্যাগ করতে পারব না।"

কমলা এতক্ষণ পটে-আঁকা-ছবির মত এক পাশে দাঁড়িয়েছিল। একটি কথাও কয় নি। যখন তার বাবা তাকে ঘর থেকে বার করে দিয়েছেন তখন তার শাশুড়ী যে তাকে ঘরে তুলে নেবেন না, এতে আশ্চর্য্যের বিষয়ই বা কি, দুঃখের বিষয়ই বা কি? সতীশচন্দ্র যখন মাকে প্রণাম করে উঠে

বললেন—"চল কমলা, আমরা যাই" তখন কমলা জিজ্ঞেস করলে "কোথায় ?" উত্তর এল, "দেশ ছেড়ে।" কমলা বললে "দেশ ছেড়ে, সমাজ ছেড়ে, মা ছেড়ে বেরবার আগে নিজের মনে বুঝে দেখো যে কাজ করতে যাচ্ছ তার শেষ রক্ষে করতে পারবে কি না।"

"আমি মনস্থির করেছি, এ গ্রাম থেকে এই মুহূর্তেই বেরিয়ে পড়ব; তোমাকে সঙ্গে নিয়ে। শেষে যা হয় তা হবে; তার ভাবনা ভাববার এখন সময় নেই।" এর পর সতীশ তার পৈতৃক ভিটার দিকে পিঠ ফিরিয়ে কমলার হাত ধরে সেই অন্ধকারের ভিতর নিরুদ্দেশভাবে বেরিয়ে পড়লেন।

৩৬

অজানা পথের পথিক হওয়া পুরুষের পক্ষে স্বাভাবিক হতে পারে কিন্তু মেয়ের পক্ষে তা নয়। স্ত্রীলোক যদি এক ঘর থেকে বেরয় ত সে আরেক ঘরে ঢোকবার জন্য। তাই কমলা সতীশের নিরুদ্দেশ-যাত্রার একটা লক্ষ্য নির্দেশ করে দিলে। স্থির হলো তারা দুজনে সতীশের কর্মস্থল লক্ষ্ণৌয়ে ফিরে যাবে, কলকাতা হয়ে। লক্ষ্ণৌ দুদিন পরে পৌছনতে কোনোও ক্ষতি নেই—কেননা সতীশের ছুটি আজোও ফুরোয় নি। তা ছাড়া কমলা যে ইহলোকে আছে এবং তার স্বামীর আশ্রয়ে—এ সংবাদটা সে তার মা বাবাকে না জানিয়ে দেশ ছেড়ে যাওয়াটা সঙ্গত মনে করলে না। পথিমধ্যে স্বামী-স্ত্রীতে পরামর্শ করে স্থির করলে যে, তারা কলকাতায় হরেনের সঙ্গে দেখা করে তাকে দিয়েই খবরটা দেশে পাঠিয়ে দেবে। হরেনকে খুঁজে বার করতে তাদের কোনও কষ্ট পেতে হবে না। কমলা হরেনের বাসার ঠিকানা জানত।

তারা বেলতলীতে শেষ-রাত্তিরে ট্রেন ধরে সকাল বেলা কলকাতায় গিয়ে পৌছল। তার পর, এক ঠিকে-গাড়ীতে আরোহী হয়ে বরাবর বৌবাজারে হরেনের বাসায় গিয়ে উপস্থিত হল। সতীশ গাড়ী থেকে নেমে হরেনের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন, আবার পাঁচ মিনিট পরেই ফিরে এসে খবর দিলেন যে হরেন সে-বাসায় আর নেই। কিছুদিন আগে তার বাবা এসে সেখান থেকে তার মালপত্র যা কিছু ছিল সব নিয়ে চলে গেছেন।

কমলা জিজ্ঞেস করলে—"হরেন এখন কোথায় থাকে মেসের কেউ কি তা বলতে পারে না ?"

সতীশ আবার ফিরে গিয়ে হরেনের হাল-সাকিনের সন্ধান নিয়ে এল। কমলা রাস্তার নাম ও বাড়ীর নম্বর শুনে বললে—"ও ত ক্ষিতীশ বাবুর বাসা।" সতীশ প্রস্তাব করলে, "চল সেখানেই যাওয়া যাক্।" কমলা তাতে কোনোও আপত্তি করলে না। সত্য কথা বলতে গেলে অস্বীকার করা চলে না যে, কমলা যখন কলকাতা ঘুরে লক্ষ্ণৌ যাবার প্রস্তাব করে তখন মনের কোণে এ আশা ছিল যে কলকাতায় গেলে চাইকি ক্ষিতীশ বাবুর সঙ্গে তার আর-একবার সাক্ষাৎ হলেও হতে পারে।

৩৭

ক্ষিতীশের বাসায় পৌছবা মাত্র সতীশের সঙ্গে প্রথম বার সাক্ষাৎ হলো হচ্ছে কমলার ভাই অরুণ। কমলা গাড়ীতে বসে আছে, সতীশের মুখে এই কথা শুনে অরুণ আনন্দে

এতই অধীর হয়ে পড়্ল যে সে ছুটে গিয়ে তার দিদির কাছে যা বক্‌তে লাগল, তাকে পাগলের প্রলাপ ছাড়া আর কিছু বলা চলে না ; কেননা সে-সব কথার ভিতর কোনরূপ গাঁথুনি, কোন রূপ বাঁধুনি ছিল না। কিন্তু অরুণ এই সব এলো-মেলো বকুনির ভিতর থেকে সতীশ ও কমলা এই মোটা কথাটা উদ্ধার করলে যে সমস্ত গোল চুকে গিয়েছে, শশি মুখুয্যের জাল ধরা পড়েছে—আর গাঁয়ে কমলা কোনো আশ্রয় না পেয়ে মৈত্রমহাশয়, যোগেন মিত্তির, করেন ও অরুণ কাল বাড়িতে এখানে এসে পৌঁচেছে। নির্দ্দোষা কমলা তাদের দোষেই পথে দাঁড়িয়েছে এই জ্ঞান হওয়া মাত্র মৈত্রমহাশয় ও মিত্তির মহাশয় উভয়েরি একসঙ্গে বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পেল। উপস্থিত ক্ষেত্রে কিংকর্ত্তব্য কিছুই স্থির করতে না পেরে তাঁরা অরুণ ও করেনের পরামর্শ মত চলতে স্বীকৃত হ'লেন। এরা দুজনে তাঁদের এখানে নিয়ে এসে উপস্থিত করেছে। এরা বুঝে নিয়েছিল যে কমলা যদি আত্মহত্যা না করে থাকে তাহলে সে ক্ষিতীশের হাবস্থ হবে, কেননা, ক্ষিতীশ ছাড়া আর কারও কাছে আশ্রয় পাবার তার কোনই সম্ভাবনা ছিল না। মানুষ যখন জলে পড়ে ডুবে মরবার ভয় পায় তখন সে হাতের গোড়ায় যাকে পায় তাকে ধরে বাঁচতে চেষ্টা করে। তার পর অরুণ "দিদি এসেছে, দিদি এসেছে" বলে চীৎকার করতে-করতে কমলার হাত ধরে হিঁচড়ে টেনে কমলাকে ক্ষিতীশের সেই ঘরে নিয়ে গিয়ে তুললে—যেখানে অপর সকলে গালে হাত দিয়ে বসে ছিলেন।

হাসি-কান্নার ভিতর দিয়ে কমলার সঙ্গে তার গুরুজনদের মিলন হয়ে গেল। দৈব-দুর্ব্বিপাকে একটা ভেঙে-যাওয়া পরিবার দৈবের কৃপায় আবার যেমন ছিল তেমনি জুড়িয়ে উঠল। প্রত্যেকে—যার যেখানে জায়গা সে সেইখানে বেমালুম বসে গেল। খালি তার বাইরে রয়ে গেল একমাত্র ক্ষিতীশ। এই মিলনোৎসবের ক্ষেত্র থেকে ক্ষিতীশ যে সরে পড়েছিল অনেকক্ষণ কেউ তা লক্ষ্যই করে নি। শেষটা মিত্তিরমহাশয় করেনকে দিয়ে ক্ষিতীশকে ডেকে পাঠালেন। ক্ষিতীশ এলে তাঁকে সম্বোধন করে যোগেন মিত্তির ভদ্রতা করে বললেন—"দেখুন ক্ষিতীশবাবু, এত বিভ্রাটের জন্য আমরা "ওল্ড ফুল্‌রাই" সম্পূর্ণ দায়ী।"

ক্ষিতীশ হেসে উত্তর করলে—"আপনাদের চাইতে বোধ হয় বেশি দায়ী আমরা "ইয়ং ফুল্‌রা"। আমি যদি কমলাকে নিজের বাসায় না এনে হাঁসপাতালে পৌঁছে দিতুম তাহলে এই ছোটখাটো ট্র্যাজেডিটি মোটেই ঘটত না।"

এ কথাটা এতই সত্য যে কেউ আর তার প্রতিবাদ করলেন না। ক্ষিতীশ অপ্রতিভ ভাবে নীরব হয়ে রইল। শেষে করেন বললে—"যা ঘটেছে তার জন্য দায়ী তুমি নও, আমিও নই; দায়ী আমাদের হতভাগা সমাজ।" সতীশ বললে—"দোষ সমাজেরও নয়। দোষ আমাদের স্বভাবের। আমরা যৌবনকে ভয় করি আর স্ত্রীলোককে বিশ্বাস করিনে।"

সতীশের এ কথা শুনে বুড়োরা কে কি মনে করলেন তার কোনো আভাস দিলেন না এবং এ আলোচনা চাপা দেবার জন্য যোগেন মিত্তির সতীশকে জিজ্ঞাসা করলেন—"বাবাজী, এখন কি করবে স্থির করলে?" সতীশ

বল্লে—"আজ রাত্তিরেই লক্ষ্ণৌ রওনা হব।"

"তোমার মাকে খুশখবরটা জানিয়ে যাবে না?"

"আপনারা জানাবেন, আমি বললে তিনি বিশ্বাস করবেন না।"

"কমলা একবার তার বাপ্‌র সঙ্গে দেখা করে যাবে না?"

কমলা বল্লে—"এ যাত্রা নয়। এখন আমি গ্রামে যেতে পারব না। আমার শরীর-মন এতটা অবসন্ন হয়ে পড়েছে যে আমি এখন কিছুদিনের জন্য বিশ্রাম চাই; সে বিশ্রাম আমি দেশে পাবনা।"

কথাটা শুনে কমলার গুরুজনদের মনে একটু খট্‌কা লাগল। কিন্তু তাঁরা কমলার প্রতি যে ব্যবহার করেছেন তারপর কমলার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে জোর করে কিছু করাবার অধিকার তাঁরা যে হারিয়েছেন সে জ্ঞান তাঁদের জন্মেছিল; তাই তাঁরা কমলার কথায় কোনো প্রতিবাদ না করে গম্ভীর হয়ে রইলেন।

এই নীরবতার ভিতর সকলেই একটু অসোয়াস্তি বোধ করতে লাগলেন দেখে কমলা আবার বল্লে—

"তবে সত্য কথা বলি। এই ক'দিনের ঘটনায় আমার মনের যে বদল হয়েছে তাতে আমি আর খাঁচার পাখী হয়ে থাকতে পারব না। এরপর আমি যে স্বাধীনতা চাই তা দেশে গেলে আমি পাবনা।"

এর উত্তরে মৈত্র মহাশয় বললেন,—

"বেশ তাহলে এখানেই আর দুদিন থেকে যাও। তোমার মাকে এখানেই আমরা নিয়ে আসি। তার পর তাঁর কাছে বিদায় নিয়ে তুমি লক্ষ্ণৌ চলে যেয়ো।"

কমলা হেসে বল্লে—"ক্ষিতীশবাবুর বাড়ীতে বহুদিন বাস করেছি, আর এক দিনও আমার থাকা উচিত নয়। শুনেছি দেবালয়েও অতিথি দু-রাত্তিরের বেশি আশ্রয় পায় না।"

যখন সকলে বুঝলে যে কমলাকে বাধা দেবার চেষ্টা বৃথা তখন তার প্রস্তাবেই সকলে সম্মত হলেন। শুধু অরুণ ধরে বল্লে যে সে তার দিদির সঙ্গে লক্ষ্ণৌ যাবেই-যাবে। এতে কারো বিশেষ আপত্তি হলনা। শেষ স্থির হলো যে, সতীশ কমলা আর অরুণকে গাড়ীতে তুলে দিয়ে মৈত্রমহাশয়, মিত্র মহাশয় ও হরেন রাত্তিরের গাড়ীতে বাড়ী ফিরে যাবে।

ক্ষিতীশ সেদিন তার অতিথিদের জন্য যে মধ্যাহ্ন ভোজনের ব্যবস্থা করেছিল তাকে বিবাহের ভোজ বল্লেও অত্যুক্তি হয় না।

আহারান্তে কমলা, মৈত্রমহাশয় ও মিত্র-মহাশয় ঘুমুতে গেলেন। ক্ষিতীশ আর সতীশ দাবা খেলতে বসলো, হরেন ও অরুণ তাদের খেলা দেখ্‌তে লাগ্‌ল। ক্ষিতীশ সতীশের কাছে বাজির পর বাজি হেরে শেষটা এই বলে খেলা ছেড়ে দিলে যে, তার বেজায় মাথা ধরেছে তাই সে মন দিয়ে খেল্‌তে পারছে না। এতক্ষণে প্রায় সন্ধ্যে হয়ে এসেছে দেখে সতীশ ক্ষিতীশবাবুকে বাঁশি বাজাতে অনুরোধ করলে; সে অনুরোধ রক্ষা করতে ক্ষিতীশ কিছুতেই রাজি হল না। সে জানত আজকে তার বাঁশি বাজবে সাহি-সুরে, তার প্রতিছিদ্র দিয়ে পড়বে শুধু তার

চোখের জল।—আজকের দিনে নিজের দুর্ব্বলতার পরিচয় দেবার সাহস ক্ষিতীশের দেহে ছিল না।

রাত্তির নটার সকলে মিলে হাওড়া ষ্টেসনে গিয়ে সতীশ, কমলা ও অরুণকে গাড়ীতে তুলে দিলেন। গাড়ী ছেড়ে গেলে মৈত্রমহাশয়, মিত্রমহাশয় ও দরেন একটি ট্যাক্সীতে চড়ে সেয়ালদহ অভিমুখে রওনা হলেন। ষ্টেসনে একা পড়ে রইল ক্ষিতীশ। কেননা শ্বশুরগৃহে ফেরবার দিকে তার মোটেই লোভ ছিল না। হঠাৎ ক্ষিতীশের মনে হল যে, এ পৃথিবীতে সে নিতান্তই একা। এই কথা মনে করে তার কি-রকম একটা ভয় হল। সে নিজের মোটরে চড়ে কলকাতা সহরের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে ছুটে বেড়াতে লাগল—যেন সে নিজের কাছ থেকে পালাবার চেষ্টা করছে।

ক্রমে তার জ্ঞান হল যে, একটা কোন কাজ হাতে না নিলে সে এ পৃথিবীতে মিছা মিছি শুধু ছুটে বেড়াবে—তাতে তার মনের অশান্তি বাড়্বে বই কমবে না। কিন্তু কি কাজ সে হাতে নেবে তা ভেবে কিছুতেই ঠিক করতে পারলে না। কেননা ইতিপূর্ব্বে জীবনে সে কোনো কাজই করেনি, এবং কোনোও কাজ করবার কি শক্তি, কি প্রবৃত্তি কিছুই অর্জ্জন করে নি। তার কাছে এই সত্য ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠল যে, নিতান্তই সে অকর্ম্মণ্য এবং তার সমগ্র শিক্ষাদীক্ষা তাকে আদর্শ নিকর্ম্মা পুরুষ করে তুলেছে।

যখন এই সত্য তার কাছে আর বিন্দুমাত্র গোপন থাকল না তখন তার কানে এল—"মহাত্মা গান্ধিকি জয়।" সে মুখ ফিরিয়ে দেখলে এক পাল স্কুলের ছেলে ঐ জয়ধ্বনি করতে-করতে সার বেঁধে রাস্তা দিয়ে চলেছে।

এই জয়ধ্বনি শোনবামাত্র ক্ষিতীশ মোটরের ভিতরেই লাফিয়ে উঠে বল্লে—"Thank God। আমার উপযুক্ত কাজ পেয়েছি। আমি কালই কলেজ থেকে নাম কাটিয়ে নন্-কো-অপারেটার হয়ে যাব।" বলা বাহুল্য সে করলেও তাই, কেননা কোনো বিষয়ে নিজের ইচ্ছা দমন করবার কষ্ট ক্ষিতীশ অদ্যাবধি কখনও স্বীকার করে নি।

সমাপ্ত

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

বাহবা বেড়ে!

সেদিন রাত্রে তুমুল তর্ক,
রাম-এর্কদিকে, শ্যাম বিপক্ষ,
খড়ি পাতে কারো নাহিক লক্ষ্য,
এগারোটা বাজে-বাজে,

শ্যাম রেগে কয়—হারে সে অন্ধ!
বলেছে কি তাথ্ সুরেন বন্দ্যো,
শ্যাম তত পাড়ে গালি ও মন্দ,
থেকে থেকে মাঝে মাঝে।

ক্রমশঃ ব্যাপার হোলো সঙ্গীন,
গুটার উত্তরে সার্টে আস্তিন,
হাঁ হাঁ করে এসে ধরিল নবীন
দুদিকে দুহাত দিয়ে ;
নইলে সে দিন মাথা ফাটাফাটি
হোতো এক চোট অতি পরিপাটি,
রাজনৈতিক কথা কাটা-কাটি
চোড়তো চরমে গিয়ে।

রাম বলে—ছাড়ো। ওটা পাপিষ্ঠ,
কী বোঝে দেশের ইষ্টানিষ্ট ?
ছাখো দিল মোরে অতি অশিষ্ট
ভাষায় কিরূপ গালি।
কহিল সে পুনঃ ফুঁসিয়া রুষিয়া,
নাকে কিঞ্চিৎ নস্ত ঠুসিয়া,
"গু ফাটাম মাথা উহার ঘুসিয়া
তুমি বাধা দিলে খালি।

এত বড় ওটা পাষণ্ড ঘোর
বলে কিনা নেতা সব ব্যাটা চোর,
খায় খালি যান যত শুধু ওঁর
গান্ধি চিত্ত সেন!
এই যে অর্দ্ধ-শতাব্দী ধরে
দাড়ি পাকাইল দেশ দেশ করে
ছাইল কীর্ত্তি ভুবন ভিতরে
চায়না হইতে পেরু,

সেই বক্তৃতা-মঞ্চের বীর,
সার স্বরেন্দ্র ধীর গম্ভীর
পাইল যে পদ দেশ-মন্ত্রীর
নতুন রিফর্ম দিয়ে,

তারে অপমান তারে কিনা হেলা
করে বেইমান গুরু-মারা চেলা
এক জোট মিলে একজাঈ মেলা
লেগেছে পিছনে ফিংএ!

আরাম-কেদারা দিয়ে পিঠে ঠেস
স্বদেশ-উদ্ধার কল্পনা বেশ—
ভাবিয়া দেখেছ এই কংগ্রেস
কাহার হাতের গড়া ?
রাজনৈতিক ফুটবল-খেলা—
প্রথম সে বলে মারিল কে ঠেলা
খেয়াল খবর নেই তার বেলা
কথা আছে চড়া চড়া।"

কালো কুচ্‌কুচে চিক্কণ চন্দ্র
ছাইল বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম
মুছিয়া রুমালে কহিল—"ধর্ম্ম
একটা তবুও আছে ;
গগনে চন্দ্র তারকা স্থর্য্য
উঠচে এখনো নবীন বুধ্‌চো
লজ্জার লেসো পূজ্যাপূজ্য
কিছুই নাহি বাছে!

নহিলে বয়েছে মস্তিষ্কর
বলে নেতাদের কিসের জন্ত
ভীমরথি আর কত কি অন্ত
যা আসে মুখে তা কয়!
শুনে জলে ওঠে সর্ব্ব অঙ্গ
শপথ করিয়া উহার সঙ্গ
ছাড়িলাম আজি এ পণ ভঙ্গ
জীবন থাকিতে নয়!

দল বেঁধে দেশে তুলো হুলস্থূল্
বলে—স্বরাজের গোড়া-পত্তন
করতেই হবে, বিলাতী শাসন
অতি হীন অতি হেয়;
অতএব ছাড় কলেজ খেতাব
ঘোরাও চরকা পোড়াও কেতাব
দাও করে আড়ি রেখো নাকো ভাব
ইংরেজ সাথে কেহ।

এইরূপে যদি থাকি স্বতন্ত্র
জপিয়া দেশের ইষ্ট মন্ত্র
দুদিনে ব্রিটিশ শাসন যন্ত্র
অচল বেকল হবে,—
তল্পি তল্পা লইয়া বগলে
সাগরের পার যাবে ওরা চলে
স্বরাজ আসিবে মোদের দখলে
ভাবনা আর না রবে।

মূর্খ উহারা বোঝেনাক কভু
চিরকাল দাস মোরা—ওরা প্রভু
ওরা আছে তাই বাঁচোয়াটা তবু
এখনো মোদের আছে;
নইলে ছিন্নভিন্ন আহত
উলোট-পালোট খাইত নিয়ত
কাণ্ডারীহীন তরণীর মত
অকূল সাগর মাঝে।

এ রকম করে যদি একধারী
মনিব উহারা ওদের ক্যাপাই
সৈন্য শান্ত্রী পাহারা সেপাই
পিছনে ছাড়িয়া দেবে;
তখন কে আসি করিবে রক্ষে .
সর্ষের ফুল দেখিবে চক্ষে
নয়নের ধারা বহিবে বক্ষে
সে কথা দেখেছ ভেবে?

খুসী হয়ে ভাই যা পাও তা নাও
সদা উহাদের জয় গান গাও
দেখেছ কখনো ভিখিরী কোথাও
কাঁড়া কি আকাঁড়া বাছে?
মন্টেগু তবু সন্দেস বাদাম
দিয়েছে মোদের ছাটা ও মোলাম
আমাদের মত নিমকহারাম
আর কি কোথাও আছে?

কেমন মোদের কাঙলা স্বভাব
কিছুতেই আর ঘোচে না অভাব
সিন্‌হে বেহারে করিল নবাব
বাদসা বিলেতবাসী;
তবুও মোদের গেল না দুঃখ
হায় বেইমান কায় রে মূর্খ
সুখ ভার-ভার মেজাজ রুক্ষ
লালচ বিশ্বগ্রাসী।

অন্নবস্ত্র অগ্নিমূল্যে
যদিও মানুষ কেপিয়ে তুলে
তবুও চলে না এ কথা ভুলে
মোগল পাঠান যুগে
বিজ্‌লীর আলো জ্বলতো না রেতে
ট্রেণে ও মোটরে চড়তে না পেতে
অসুখে-বিসুখে ঠায় মারা যেতে
হাতুড়ের হাতে ভুগে।

মোট কথা এই তাদের আমলে
সুখ কি শান্তি ছিল না আসলে
অত্যাচার ও পীড়নে সকলে
হাড়-ভাঙ্গা-ভাঙ্গা হোতো।
আপিসে চাকরী করিয়া এখন
সুখে শান্তিতে রয়েছি কেমন
অন্তিম কালে আধা-পেনসন্
পাব স্ফুর্তি চাবি শত!

মিছে গোলমাল কর হৈ চৈ
মধুরে ফলবে মেওয়া নিশ্চয়ই
এখন আমড়া আমড়াই সই
কামড়া-কামড়ি ছেড়ে।"
হইল রামের বক্তৃতা শেষ
কেহ 'এনকোর' কেহ বলে 'বেশ'
কেহ বা তাকিয়া দিয়ে পিঠে ঠেস
বলিল বাহবা বেড়ে।

এত শুনি শ্যাম উঠিল জ্বলিয়া
বলিল দুকান দিতেম মলিয়া
নেহাৎ গুরুর আদেশ বলিয়া
চুপ করে শুধু রই;
রেখোরে ফেরেপ করিনে টাপেন্স
মটো আমাদের নন্‌-আওরেন্স
নচেৎ উহার এত ননসেন্স
কান পেতে আমি সই?

রাজ্য জুড়িয়া প্রেতের নৃত্য
চলেছে এই যে নিত্য নিত্য
দেখিয়া শুনিয়া যাহার চিত্ত
ক্ষিপ্ত নাহিক হয়,
ধিক্ সে তাহার জীবনে স্বস্তি
নাই নিস্তার মরণ ভিন্ন
স্বদেশের ভালে কালিমা চিহ্ন
সম'সে লাগিয়া রয়।"

কিঞ্চিৎ কাল নীরব থাকিয়া
টানিয়া কোলেতে লইল তাকিয়া
সজোরে হুটান চুরুট চাখিয়া
কহিল আবার ফিরে—
"আর্য্য গরিমা প্রাচীন কীর্ত্তি
সে মহামহিমা অতুল দীপ্তি
ভুলিয়া আমরা দাস্য বৃত্তি
কলঙ্ক বহি শিরে,

বসনে ভূষণে সাজসজ্জায়
করেছে প্রবেশ হাড়ে-মজ্জায়
দাসত্বপনা মরি লজ্জায়
হায় মা ভারত-ভূমি!
নাহিক আত্ম-সম্মান জ্ঞান
করে বিদেশীর স্তুতিগুণগান
কেমন করিয়া হেন সন্তান
বক্ষে বহিছ তুমি?

সৈন্য-শান্ত্রী পাহারা সেপাই
লালমুখে মাগো মোরা না ডরাই
অন্তরে যদি সাক্ষাৎ পাই
শক্তিরূপিণী তোরে!
হিমালয় সম অচল অটল
বক্ষ অসাধি সন্তান দল
সেব বুকে যত দোনা গুলি বল
'সোল্ ফোর্সের' জোরে

ঘৃণ্য শত্রু শোণিত-সিক্ত
করিব না বাহু কলুষ-লিপ্ত
মার খেয়ে মোরা রহিব তৃপ্ত
মারিব না তবু কভু
ষোল-আনা পাপ হইলে পূর্ণ
পশু-বল হবে আপনি চূর্ণ
করিবেন বিচার পাপ ও পুণ্য
দুনিয়ার যিনি প্রভু।"

ঈষৎ থামিয়া কহিল সে পুনঃ
"বলিতেছি কথা মন দিয়া শুন
সব দ্রব্যের দর তিন-গুণো
না খাইয়া লোকে মরে,
পাঁচ সিকে ক'রে পোনা মাছ সের
সাত টাকা জোড়া দাম কাপড়ের
অথচ বাড়তি নেই মাইনের
ম্যালেরিয়া ঘরে ঘরে,

গোয়ালিনী এত দুধে ঢালে জল
গৃহিণী করিছে নিয়ত কোঁদল
মেজ-আনিটা এমনি প্রবল
মানে নাক কেউ জাতি;
ছেলেগুলো সব বেজায় বেয়াড়া
সাত চিৎকারে দেয় নাকো সাড়া
বেড়িয়ে বেড়ায় এ পাড়া ও পাড়া
টো টো করে দিন-রাতই

থাকিতে চায়না আর নিজ গ্রামে
সহরে আসিয়া চড়ে ট্রামে ট্রামে
সিনেমা অথবা থিয়েটার নামে
জিহ্বায় আসে জল;
কচি ছেলেরাও নাহি রয় স্থির
চুল ছিঁড়ে দেয় কোলে উঠে ঝির
ব্রিটীশ-শাসনশোষন-নীতির
—এই সমস্ত ফল!

ছোকরারা আর পায়ে নাহি হাঁটে
আট আনা খরচে চুল দাড়ি ছাটে
কব্জিতে তারা হাত-ঘড়ি আঁটে
এমনি বিলাসীপনা,
মেয়েরাও হায় এমনিই বাবু
কুটিতে পারে না কুমড়ো অলাবু
জানেনা রাঁধিতে বালি কি সাবু
ঘরে দিতে আলপনা;

রাঁধুনী চাকরে সব খায় লুটে
পয়সায় আনে ছ-গণ্ডা ঘুঁটে
তবু তারা যদি একটুও উঠে
একবার-খানি চায়!
ঘর-সংসার শ্রীহীন মলিন
হয় না এমন দিনকের দিন
কেরাসিন তেল পুরো একটিন
তিন দিনে নাকি যায়।

এই বিলাসীতা এই বাবুয়ানী
রূপোর বদলে নিকেল চুয়ানি
মামলা, মড়ক, পথে রাহাজানি
পরাধীনতার ফল।
দেশেতে পড়েছে শনির দৃষ্টি
খেজুরের রসে নেই সে মিষ্টি
আকাশে সময়ে হয় না বিষ্টি
অসময়ে হয় জল;

ছোটে পলাবে রক্তের ধার
তুর্কের প্রতি হোলো অবিচার
দিতে প্রতিশোধ নিতে প্রতীকার
চরকা কিনিয়া লাগো;
লাট-কৌন্সিলে না যাইও কেহ
স্বদেশের তরে পাত কর দেহ
দেশবাসী প্রতি যদি থাকে স্নেহ
ঘুমাও না আর জাগো

অর্থাৎ ধর বর্জ্জন-নীতি
ইংরেজ সাথে রেখোনাকো প্রীতি
গাও স্বরাজের বন্দন'-গীতি
সকল কর্ম্ম ছেড়ে।"
হইল গ্রামের বক্তৃতা শেষ
কেহ 'এন্‌কোর' কেহ বলে 'বেশ'
কেহ বা তাকিয়া পিঠে দিয়ে ঠেস্‌
বলিল 'বাহবা বেড়ে!'

শ্রীকিরণধন চট্টোপাধ্যায়।

চয়ন

দান্নুনসিও

একহাতেই অসি আর মসী নিয়ে ইতালীয় কবি-যোদ্ধা দান্নুনসিও যেমন নাম কিনেছেন, আজকালকার আর কোন সাহিত্যসেবী তেমনটি পারেননি।

লড়ায়ের আগেই দান্নুনসিওর রচনা বিশ্বসাহিত্যে স্থানলাভ করেছিল। সাহিত্য-সেবায় টাকাও তিনি এত রোজগার করেছেন যে, অনেক ধনকুবেরের ভাগ্যেও তা ঘটে না। কিছুদিন আগে কয়েক লক্ষ টাকার লোভ দেখিয়ে তাঁকে আমেরিকায় বক্তৃতা দেবার জন্যে আহ্বান করা হয়। কিন্তু দান্নুনসিও সে আহ্বান অগ্রাহ্য ক'রে জবাব দেন, "তোমরা যত টাকা আমায় দেবে বলেছ, তাতে আমার তামাক খাবার খরচই কুলিয়ে উঠ্‌বে না।"

জবাব শুনে অনেকেই অবাক হবেন বটে, কিন্তু কথাগুলো ঠিক দান্নুনসিওরই উপযোগী হয়েছে। কারণ, যে-শ্রেণীর লোক বিলাসের বিয়েতে লাখটাকা খরচ করতে পিছপাও নন, দান্নুনসিওর চরিত্রের একদিকটা ঠিক তাঁদেরই মতন। লর্ড বায়রণ ও অস্কার ওয়াইল্ড প্রভৃতি অনেক কবিই বিলাসী



দান্নুনসিও

ছিলেন বটে, কিন্তু দান্নুনসিও তাঁদের উপরেও টেক্কা মেরেছেন। সাহিত্যক্ষেত্রে, রণক্ষেত্রে এবং ব্যক্তিগত জীবনক্ষেত্রে,—দান্নুনসিওর অপূর্ব্বত্ব সর্ব্বত্র। বলতে কি, তাঁর এই অপূর্ব্বত্বের মাত্রা আবার সময়ে সময়ে এতটা অতিরিক্ত হয়ে ওঠে যে, তাতে আন্তরিকতার চেয়ে অভিনয়ের কৃত্রিমতাই বেশী ব'লে সন্দেহ হয়!

প্রথমে তাঁর সাজপোষাকের কথাই ধরুন। তিনি নিজের মুখেই মেনেছিলেন যে, লড়াইয়ের আগে তাঁর পলাবন্ধ ছিল একশো বাহাত্তোটি, নানা আদর্শের বিভিন্ন পোষাকের 'সুট' বাহাত্তরটি, দস্তানা বাহাত্তর-জোড়া, দিনের কামিজ বাহাত্তরটি, রাতের কামিজ আটচল্লিশটি, রুমাল ছইশো চল্লিশখানা আর জুতো চল্লিশ জোড়া। যুদ্ধের পরে তাঁর পোষাকের সংখ্যা বোধ হয় অসংখ্য হয়ে উঠেছে। তাই তিনি যখন-তখন জাঁক দেখিয়ে বলেন, "আমার মতন সাজঘর আর কোন লেখকের নেই!"

দান্নুনসিও যে পোষাক প'রে কবিতা লিখতে বসেন, সেটি অমূল্য বললেও চলে। সে পোষাকটির আগাগোড়া শলমা-চুমকির কাজ করা!

তাঁর কাব্যের মত জীবনও প্রেম-বিলাসে ভরা,—সম্ভ্রান্ত ঘরের অনেক সুন্দরীর সঙ্গে তাঁর প্রেমের কাহিনী ইতালির পথে-ঘাটে প্রচলিত আছে। কিন্তু অদৃষ্টের অভিশাপে তাঁর সুন্দর চেহারায় একটি মস্তবড় খুঁৎ হয়ে গেছে। তাঁর মাথায় এখন একটি বিদঘুটে টাকের সঞ্চার হয়েছে। অনেক মহিলা-ভক্ত কবির স্মৃতি-চিহ্ন রাখবার জন্যে টুকিটাকি জিনিষ, হাতের লেখা প্রভৃতি চেয়ে পাঠান। এ-সব তিনি খুসি মনেই দেন, কিন্তু মাথা দু-এক গাছি চুল চাইলেই তিনি ভারি চটে যান। গত যুদ্ধের সময়ে তাঁর একটি চোখও নাকি কাণা হয়ে গেছে!

তাঁর খামখেয়ালিরও অনেক গল্প আছে। একবার দুর্লভ একটি গোলাপফুল চয়ন করবার জন্যে, ইতালী থেকে জলপথে তিনি সুদূর সাইপ্রাস দ্বীপে যেতেও কুণ্ঠিত হন নি।

দান্নুনসিওর একটি পোষা লালমাছ ছিল। তাকে এক হোটেলওয়ালার জিম্মায় রেখে কবিকে একবার বিদেশে যেতে হয়েছিল। বিদেশ থেকে তিনি খবর পেলেন যে, তাঁর লালমাছটি ম'রে গেছে। তিনি তখনি টেলিগ্রামে হুকুম দিলেন যে, লালমাছটিকে যেন খুব ঘটা ক'রে কবর দেওয়া হয়। সেইসঙ্গে সমাধি-শিলার উপরে লিখে রাখবার জন্যে তিনি একটি কবিতা রচনা ক'রেও পাঠালেন। কিন্তু সেই হুকুম পেয়ে হোটেলওয়ালা মহা ভাবনায় প'ড়ে গেল। কারণ মরা লালমাছটাকে সে ফেলে দিয়েছিল। পাছে দান্নুনসিও টের পান, সেই ভয়ে সে তাড়াতাড়ি তখনি বাজার থেকে একটা লালমাছ কিনে এনে, তাকেই মেরে কবর দিলে। দান্নুনসিও ফিরে এসে নিজের মাছ মনে ক'রে সেই কেনা লালমাছের কবর দেখতে গেলেন এবং মৃত আত্মার প্রতি সম্মান দেখাবার জন্যে টুপী খুলে, মাথা হেঁট ক'রে নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন!

দান্নুনসিওর নাটকে যে-সব নট-নটী ভূমিকা গ্রহণ করেন, তাঁদেরও বড় কম ব্যস্ত থাকতে হয় না। একবার নাটকের চরিত্রের উপযোগী চেহারা করবার জন্যে, দান্নুনসিওর হুকুমে

একটি অভিনেত্রীকে মাসের পর মাস ধ'রে নিয়মিত আহার-বিহারের দ্বারা নিজের দেহ-কে-দেহই বদ্‌লে ফেল্‌তে হয়েছিল!

আর-একখানি নাটকের একটি 'চরিত্রে'র দাঁত ছিল না। সেই ভূমিকাটি যে অভিনেত্রী গ্রহণ করলে, দায়ানসিও তাকে বললেন, "তোমাকে সাম্‌নের একটা দাঁত তুলে ফেলতে হবে।"

বলাবাহুল্য, অভিনেত্রী তাতে রাজি হলো না।

দায়ানসিও রেগে টং হয়ে বল্‌লেন, "বা! দাঁত তুল্‌বে না, বটে! দাঁত তোলা তো তুচ্ছ কথা, আমার নাটকে ভূমিকার উপযোগী হবার জন্যে, এক অভিনেত্রী তার একটি চোখ পর্য্যন্ত উপ্‌ড়ে ফেল্‌তে রাজি হয়েছিল, সে খবর তুমি রাখো কি?"

এত-বড় দৃষ্টান্তেও ঐ অভিনেত্রী কাঁচা দাঁত তুল্‌তে আগ্রহ দেখিয়েছিল কিনা, তা প্রকাশ পায়নি।

সভ্য অসভ্যতা

বিলাতী সমাজে মানুষের দেহে এতদিন সাজপোষাকের ভার ছিল এদেশের তুলনায় ঢের বেশী। য়ুরোপ শীতপ্রধান দেশ, কাজেই সেখানে বস্ত্রবাহুল্য দেখে বিস্মিত হবার কোন কারণ নেই।

কিন্তু ফ্যাসনের গোলামি এখন সেখানে



"বল দেখি আমার গায়ে কি?"

এতদূর বেড়ে উঠেছে যে, বিলাতী মহিলা-সমাজে লজ্জাশরম ও সুরুচির ঠাঁই আর নেই বললেও অত্যুক্তি হবে না। ক্লফাজের নগ্ন পদ দেখে যে কালের সুন্দরীরা লজ্জায় মূর্চ্ছা যান, তাঁরাই আজকাল উচ্চসমাজের মধ্যে এমন সব সাজপোষাক আমদানি করেছেন, যার কাছে এদেশের প্রবাদ-বিখ্যাত "গাওয়ার কাপড়ও" হার মানতে বাধ্য।



আঁকা গয়না

তাঁদের পা এখন স্বচ্ছ মোজার আবৃত (?) হয়ে "আবরণের" নামরক্ষা মাত্র করছে, ঘাঘরা ক্রমেই খাটো হয়ে উপরদিকে উঠছে, আর গায়ের জামা বুক-পিঠকে একেবারে নগ্ন রেখে নীচের দিকে নামছে।

নীতিবাগীশের কথা আমরা ধরি না, কিন্তু স্বাধীনতারও একটা সীমা তো নির্দ্দিষ্ট আছে! কাজেই য়ুরোপেও শিষ্ট লোকেরা এই নির্লজ্জ যথেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে প্রবল আপত্তি তুলেছেন এবং ডাক্তাররাও বলছেন যে, এই শীত-প্রধান দেশে এমন পোষাক স্বাস্থ্যের পক্ষেও মারাত্মক। কিন্তু উৎকট ফ্যাসনের বন্যায় তাঁদের আপত্তি, যুক্তি ও বিরক্তি খড়কুটোর মতন ভেসে যাচ্ছে।

বিলাতের লর্ডের ঘরের যুবতী মেয়েও এখন রঙ্গালয়ে ল্যাংটো হয়ে নাচলে কোন দোষ হয় না এবং নগ্ন ও কামোদ্দীপক ভঙ্গি-ইঙ্গিত-বহুল নৃত্যও (যার সঙ্গে সৌন্দর্য্যের কোনই সম্পর্ক নেই) যে আজকাল অত্যন্ত বেড়ে উঠেছে, বিলাতী কাগজ-পত্রের আন্দোলন ও প্রতিবাদ দেখে তা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে।

একজন বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত

ইতিহাস থেকে অনেক উদাহরণ তুলে দেখিয়েছেন যে, পৃথিবীতে যখনি কোন ভীষণ সময় উপস্থিত হয়েছে, যুদ্ধের অব্যবহিত পরে তখনি সমাজের মধ্যে এমনি অশ্লীলতা, কুরুচি ও লাম্পট্য আত্ম-প্রকাশ করেছে। তাঁর মতে, য়ুরোপীয় সমাজের বর্ত্তমান অধোগতির প্রধান কারণও তাই।

আর-একজন পণ্ডিতও ঐতিহাসিক প্রমাণের সাহায্যে দেখিয়েছেন যে, যখনি কোন অতি-উন্নত ও সভ্য জাতির মধ্যে এমনি সব দুর্নীতি ও ব্যভিচারের লক্ষণ ফুটেছে, তখনি তার পতন হয়েছে।



পৃষ্ঠ-পটে চিত্র-পতঙ্গ

কিন্তু এ-সব ঐতিহাসিক প্রমাণের কথা থাক্—আসলে ব্যাপারটা যে বড়ই কদর্য্য, তাতে আর কোনই সন্দেহ নেই।

রোম থেকে খবর এসেছে, সেখানে খালি যুবতীরা নয়—সত্তর-আশী বছরের বুড়ীরা পর্য্যন্ত বুক নগ্ন রেখে পোষাক পরতে সুরু ক'রে দিয়েছেন! দৃশ্যটা একবার মনের চোখে ভেবে দেখুন। এটা খালি অশ্লীল নয়, বীভৎসও বটে!

আমরা এখানে একেলে পোষাকের অপেক্ষাকৃত সভ্য-নমুনা দিলাম। লক্ষ্য করলে দেখবেন, একখানি ছবিতে দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে, আদুড় পিঠের ওপরে একটি পতঙ্গও আঁকা রয়েছে।

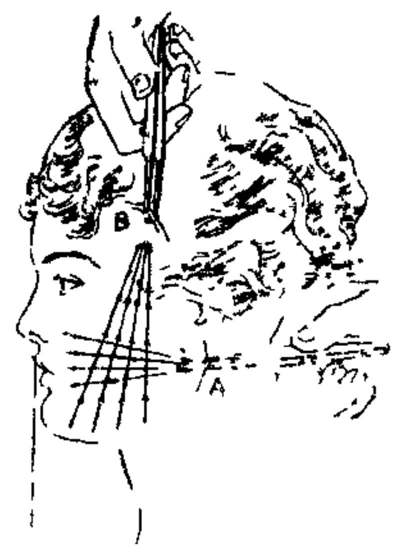
আর-একখানি ছবিতে নূতন ফ্যাসনের মধ্যেও অতিরিক্ত বৈচিত্র্য আছে। চিত্র-লিখিত যুবতীর কণ্ঠের, বাহুর ও পায়ের সমস্ত গহনাই আসল নয়, নকল সোনারও নয়—একেবারে, হাতের তুলিতে আঁকা!

কিন্তু সবাইকে টেক্কা মেরেছেন ঐ মেয়েটি—পিঠে যাঁর জিজ্ঞাসার চিহ্ন। উনি ঐ চিহ্ন দ্বারা প্রশ্ন করেছেন—"বল দেখি আমার গায়ে কি?"—দেখেও যাঁরা জবাব দিতে পারবেন না, তাঁরা জেনে রাখুন,—ঐ যুবতীর গায়ে জামাকাপড় যা দেখা যাচ্ছে, তা বাস্তবিক নয়, কাল্পনিক—অর্থাৎ, চিত্রকরের তুলিতে রং দিয়ে আঁকা! এঁরাই বিলাতের ভদ্রমহিলা এবং এঁরাই এদেশে এসে ভারতবাসীর নগ্নপদ দেখে লজ্জায় আঁৎকে ওঠেন!

চিরযৌবনের প্রথম ধাপ

বৈজ্ঞানিক চিকিৎসকরা অনেক দিন থেকেই মানুষের যৌবনকে স্থায়ী রাখবার জন্যে চেষ্টা করছেন। সংপ্রতি কেউ কেউ দাবী করেছেন যে, তাঁদের চেষ্টায় যৌবনকে বাঁধবার উপায় আবিষ্কৃত হয়েছে। তবে এ-সব উপায়ের দ্বারা যৌবন যথার্থই স্থায়ী হয় কিনা, তার চাক্ষুষ পরিচয় পেতে দেরি লাগে।

কিন্তু এখানে একদল অস্ত্র চিকিৎসক কেবলমাত্র অস্ত্রপ্রয়োগের দ্বারা বুড়োকে যথার্থই ছুঁড়ো ক'রে তুলতে পেরেছেন। মানুষের নাক, কপোল, চিবুক ও চোয়াল প্রভৃতির উপরে বা আশেপাশে যে-সব বলি রেখা পড়ে, তার জন্যেই মানুষকে বুড়ো দেখায়। অস্ত্রচিকিৎসকরা যন্ত্রের দ্বারা মুখের এই-সব ঝোলা মাংস টেনে ধ'রে, ছুরি দিয়ে কেটে তা বাদ দিচ্ছেন। তারপর ক্ষতের জোড় এমন সুন্দর কায়দায় সেলাই ক'রে দেওয়া হচ্ছে যে, অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন মোটেই বোঝা যায় না। অস্ত্রপ্রয়োগের সময় যন্ত্রণাও হয় না—কারণ ঔষধের গুণে মুখ



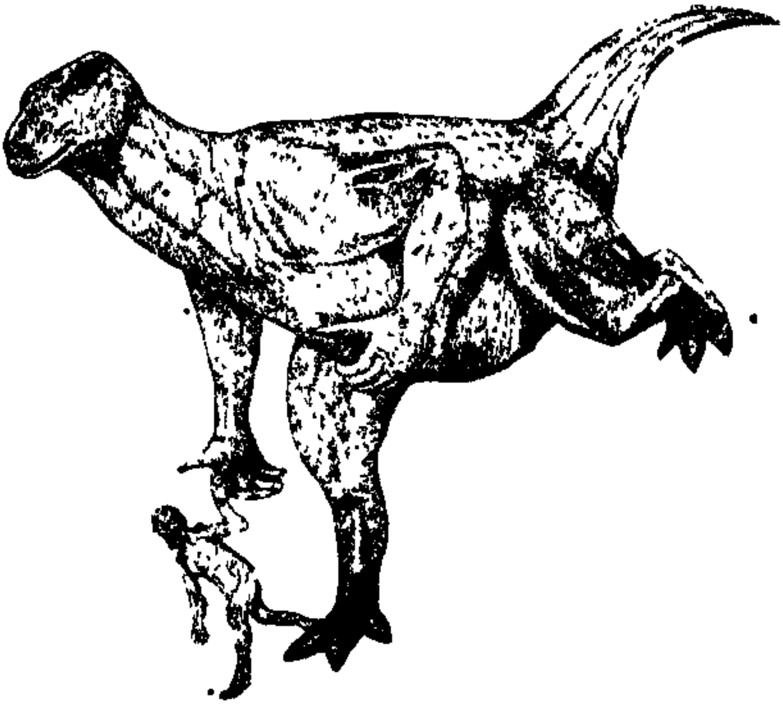
অস্ত্র দিয়ে কোঁচকানো ত্বক টেনে ধরা হচ্ছে

তখন অসাড় হয়ে থাকে। এই নূতন উপায়ে ভাঁটা-পড়া যৌবনে আবার জোয়ার বওয়াবার জন্যে বিলাতী মেয়েরা তাঁর ক্ষেপে উঠেছেন। ফলে সপ্তাহখানেক আগে যারা ছিল প্রৌঢ়ের মতন দেখতে, আজ তাদের চেহারা হয়ে দাঁড়িয়েছে ঠিক নবযুবতীর মতন।

সেকালের দানব

রূপকথায় অনেক দানবের কথা পড়া যায়,—তবে বৈজ্ঞানিকরা এতদিন তাদের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারেন নি। কিন্তু বেলজিয়ামের একটি কয়লার খনিতে, ১০৩৮ ফুট নীচে সেকালের এমন ভীষণ দানবের কঙ্কালাবশেষ পাওয়া গেছে, যারা বেঁচে থাকলে পৃথিবী আজ মানুষের দখলে আসত না।

এই দানবের নাম ডাইনোসর ইগুয়ানোডন। এরা উঁচুতে ছিল কুড়ি ফুট। এদের বাহু, হাত, আঙুল ও বুড়ো-আঙুল কিছুরই অভাব ছিল না। এ হাতগুলো প্রায় মানুষের মতনই



ইগুয়ানোডন ও আদি মানব

দেখতে। এরা মানুষের মতন দুই পায়ে ভর দিয়ে হাঁটত। এদের পায়ে তিনটে ক'রে আঙুল ছিল। তারা মিনিটে অন্তত এক-মাইল বেগে ছুটতে পারত।

এই নব-আবিষ্কৃত ইগুয়ানোডনের আসল বিশেষত্ব তার হাতের বুড়ো-আঙুলে। হার্বার্ট স্পেনসার বলেছেন, হাতের বুড়ো-আঙুলের পরিণতি দেখেই মানুষের ক্রমোন্নতির পরিমাণ বুঝা যায়। কারণ, মানুষ জীবন-সংগ্রামে জয়ী হয়েছে তার হাতের ব্যবহারের দ্বারা এবং বুড়ো-আঙুল না থাকলে তার হাত অকেজো হয়ে থাকত।

ইগুয়ানোডন যদি হাতের বুড়ো আঙুলের সদ্ব্যবহার করত, তবে কালে সে নিশ্চয় গাছে চড়তে, ইট ছুঁড়তে, লাঠি ও ধনুক-বাণ ধরতে পারত। ফলে অভিব্যক্তির নিয়ম অনুসারে, তার এই প্রায়-মানুষের-মত হাতের জোরে আজ সে পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ জীব হয়ে দাঁড়াত। ক্রমাভিব্যক্তির ধারায় মানুষের মত তারও ল্যাজ একদিন অদৃশ্য হয়ে যেত। তখন তার কাছে কিছুতেই মানুষ টিকতে পারত না। টিকলেও, আমাদের সকলকে হয়ত ইগুয়ানোডনের আলয়ে বাঁধা থাকতে হোতো—বুদ্ধিমান ও কেজো জীব ব'লে ঘোড়া ও কুকুর আজ যেমন মানুষের দ্বারে বাঁধা আছে।

কিন্তু ভাগ্যে ইগুয়ানোডন তার হাতের বুড়ো-আঙুল ব্যবহার করতে শেখে নি।

তাই তার বুড়ো-আঙুল ক্রমে অকেজো ও আড়ষ্ট হয়ে এসেছিল। ফলে জীবন-যুদ্ধে বেশীদিন বেঁচে অভিজ্ঞতা-সঞ্চয়ের আগেই ইগুয়ানোডনের পতন হয়। মানুষ বড় মানে মানে বেঁচে গেছে।

ছবিতে ইগুয়ানোডনের ও আদিম মানুষের চেহারা দেওয়া হোলো। ইগুয়ানোডনের আত্মলোপের প্রায় দেড় কোটি বৎসর পরে পৃথিবীতে এই-জাতীয় মানুষ বিচরণ করত!

প্রসাদ রায়।

ত্রয়ী

(বিশ্ব)

অবাক চোখে তোমার মুখে চাহিয়া আছে স্থির,
কে লীলাময় বিশ্ব মহা, প্রবলতম বীর!
সুনীল ভীম শূন্য হতে গরজি' দুলি' তান
ধরার কোটি, ভুবনে লয়ে আকুলি অফুরান
ছুটেছে মহা-জীবন স্রোতে আলোড়ি' যুগ-যুগ
লক্ষ প্রাণ বক্ষে তুলি' মাখিয়া সুখ দুখ।

(জীবন)

সে লীলা-পাশে ভুবন জাগে, জাগিছে কত প্রাণ,
সে প্রাণমাঝে বিশ্ব নিতি করিছে গতি দান।
হরষে সুখে দ্বন্দ্বে দুখে বিপুল আলোড়ন,
ধরার জীবে জীবন এ কি চপল, বিভীষণ!
আর্ত্ত, ভাঙা, অন্ধ মাঝে বিকাশি' শত রূপ
জীবন জাগে প্রণয়ে স্নেহে গরিমাময় স্তূপ!

(মানুষ)

বিশ্বমাঝে ভুবন-বুকে জীবন-পারাবার,
তাহারি' পরে মানব দোলে ঢেউর সম তার।
ভাঙিয়া পড়ে, উঠিয়া চলে পাগল আগুয়ান,
কিরণে অরুণ বিভাসি' উঠি' মরণে অবসান।
বিশ্ব-নিতি ভুবনে ঝুঁকি' জীবনে ছুটে যায়,
জীবন নিতি মানুষে লয়ে খেলিছে মহিমায়।

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত।

সঙ্কলন

বর্ত্তমানের সমস্যা

এ যুগটা ওলট-পালটের যুগ। এই ওলটপালট যে কেবল বাহিরের জগতে খুব বিরাটে চলিয়াছে তা নয়; বন্দুক কামান লইয়া গায়ের জোরে যে ঠেলাঠেলি মারামারি দাঙ্গা করা চলিয়াছে তা ত সকলে স্বচক্ষে চোখের সামনে দেখিতেছেন। কিন্তু মানুষের অন্তরে তার স্বভাবে আর সংস্কারে যে তাণ্ডব উঠিয়াছে সেইটাই আসল জিনিষ, আর সেইটার দিকেই সমস্যাবাদের নজর আমরা ভাল করিয়া ফিরাইতে চাই। মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম বলিয়া যে সব জিনিষ বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছি যাদের সম্বন্ধে মনে করিয়াছি তাহারা সনাতন যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ ঠিক সেই সব জিনিষই যেমন টলমল করিয়া উঠিয়াছে সে সব টাই আজকালকার দিনের প্রধান খাদ্য। সমাজের মানুষের একেবারে গোড়া ধরিয়াই টানাটানি পড়িয়াছে। [illegible] চলিয়া আসা [illegible] সব চিরদিন [illegible] কোন [illegible] নাই। [illegible] দিনে কেবল [illegible] মানুষ যতই আপনার বলিয়া বোধ করুন না কেন, তাহা ছাড়িতে মানুষের প্রাণে যতই ব্যথা হউক না কেন কোন জিনিষকেই তেমন অটুট নিশ্চল সত্য বলিয়া মানিয়া লওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হইবে না। [illegible] জিনিষের উপরেও [illegible] আলোক ফেলিতে হইবে, নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতে হইবে [illegible] কতখানি, সত্য কতখানি। নতুবা পদে পদে [illegible] এইজন্য চোখ বুজিয়া পুরাতন পরিচিতকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে চেষ্টা করিবে বিপদের হাত সে এড়াইতে পারিবে না। কঠোর অগ্নিপরীক্ষায় সীতাদেবীকে উত্তীর্ণ হইতে হইবে। এ ছাড়া আর উপায় নাই।

সভ্য সমাজের অতি পুরাতন ও অতি [illegible] একটা সংস্কার হইতেছে বিবাহ। ইউরোপে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠিয়াছে বিবাহ কি এতই প্রয়োজনীয় বরণীয় জিনিষ? এটি ছাড়া মানুষের সভ্যতা, তাহার শিক্ষা-দীক্ষা কি এবে বারেই পাওয়া যায়? এ প্রশ্নে শুধু শিহরিয়া উঠিলে চলিবে না। সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইবে, [illegible] আলোচনা করিয়া নির্ভয়ে মীমাংসা করিতে হইবে। ভারতবর্ষে এ সমস্যার প্রশ্ন এখনও আসে নাই। এখানে তরুণদলে দেখা দিয়াছে এই অপেক্ষাকৃত অব্যাহতপূর্ণ প্রশ্নটি। বিবাহকে বাদ দিলেও চলে কি না তাহা নয় প্রশ্ন হইবে স্বাধীন ইচ্ছায় বিবাহ, ভালবাসার পরে বিবাহ আত্মীয়স্বজনের দেওয়া বিবাহ অপেক্ষা ভাল কি না। পুরাতনের দিক হইতে বলা হইয়া থাকে যুবক যুবতীর প্রেমের বিবাহ বাস্তবিক পক্ষে হইতেছে কামের বিবাহ, স্বাধীন ইচ্ছায় বিবাহ হইতেছে স্বেচ্ছাচারের বিবাহ। অভিজ্ঞ বয়োধিক গুরুজনেরা চারিদিক দেখিয়া শুনিয়া স্বভাব [illegible] সব যথাযথ গ্রহণ করিয়া, যে পাত্র ও পাত্রীর মিলন ঘটাইয়া দেন তাহাই হইতে পারে,—অন্ততঃ বেশী [illegible] তাহাই হইবার সম্ভাবনা আছে—[illegible] মিল রাজযোটক। ভালবাসার নামে স্বাধীনভাবে যে মিলন সেটা [illegible] মোহ, দুই দিনেই কাটিয়া যায়, পরে আরম্ভ হয় ঘোরতর অমিল। ইউরোপে যেমন দাম্পত্য কলহ, বিবাহবন্ধন (divorce) [illegible] ভারতে কি তেমন আছে? [illegible] দল বলিলেন, স্বাধীনভাবে যাহা করা যায় তাহারই একটা মূল্য আছে, হউক না কাম, হউক না ক্ষণিকের মোহ কিন্তু সেটা আমার স্বাধীনতার ফল। পরাধীনভাবে অন্ধভাবে ঠিক পথে চলা অপেক্ষা স্বাধীনভাবে ভুল পথে চলাও অনেক ভাল কারণ এখানে আছে অন্তরাত্মার জাগরণ আর ওখানে অন্তরাত্মার মৃত্যু, এখানে জীবনের চাঞ্চল্য আর ওখানে মরণের শান্তি। তারপর নিজের পাওয়া ও দেওয়া ভালবাসাটা কাম আর পরের হাতে পাওয়া ও লওয়া জিনিষটার কাম নাই তাই বা কে বলিতে পারে? দুইটি অজানা অচেনা জীবকে যে একসঙ্গে করিয়া দেওয়া হয়, সেখানে ত

প্রথমে দুইটি শরীরকে, শরীরের স্থূলতম পর্দাকে এক-সাথে বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে প্রাণের মনের মিল ত সেখানে আদর্শ মাত্র ধরিয়া লওয়া হইয়াছে, পরস্পরে জানা শুনার ফলে যে দুইটি জীব এক সাথে থাকিতে চায় সেখানে অন্ততঃ জ্ঞানতন্ত্রের মিল থাকেও একটা মিল। নতুবা এক সাথে থাকিতে তাহারা চাহিবে কেন? তারপর দাম্পত্য কলহ—সেটা আমাদের পরিবারে একই কি চলতি জিনিষ? ইউরোপে সেটা না ফুটিয়া ফাটিয়া বাহির হইতেছে, কিন্তু আমাদের সমাজে সেটা বাহির হইবার পথ না পাইয়া ভিতরে ভিতরে থাকিয়া চলিয়াছে সেটা কি কাহারো চক্ষে পড়ে নাই?

আমাদের দেশে বিবাহটা ব্যক্তিগত জিনিষ নয়, ওটি সমাজগত জিনিষ। অর্থাৎ আমি বিবাহ করি আমার জন্য নয় কিন্তু আমার পরিবারের জন্য, আমার আত্মীয় স্বজনের জন্য, সমাজের জন্য। এই জন্যই হইয়াছে বাল্যবিবাহের ব্যবস্থা। বয়সের সাথে সাথে মানুষের ব্যক্তিত্বটা বাড়িয়া যায়, তাই আমাদের মধ্যে স্বাধীন মত, স্বাধীন ইচ্ছা ফুটিবার আগেই পুরুষ ও মেয়েকে বাঁধিয়া দেওয়া হয়, পরিবারের সমাজের ঢালা ছাঁচের মধ্যে পড়িয়া যাহাতে তাদের ব্যক্তিত্ব নষ্ট হইয়া যায় পৃথক অস্তিত্ব আর না থাকে, পরিবারের সমাজের সাথে একীভূত হইয়া যায়। পুরুষের পক্ষে তাহা হইতে অবকাশ যদিও বা মেলে মেয়ের পক্ষে তাহাও সম্ভব নয়। জ্ঞান হইবার আগে মেয়েকে পরের ঘরে যাইতে হয়, শ্বশুরের ঘরে তাহাকে গড়িয়া পিটিয়া তৈয়ারি করিয়া লওয়ার জন্য। বড় হইলে আপনা জন্মে, আকাঙ্ক্ষা জন্মে। ইচ্ছামত আর গড়া পেটা চলে না। নিজের নিজের ইচ্ছামত যদি প্রত্যেকে চলে তবে যে যা খুসী তাই করিতে পারে ইহাতে আসে, সমাজে বিশৃঙ্খলতা। সমাজে শান্তি, শৃঙ্খলা, সুব্যবস্থা রাখিবার জন্য সমাজই আমার জীবনের সাথীটিকে পছন্দ করিয়া দেয়। কন্যাপক্ষ বরের দেখেন বিদ্যাধন, বরপক্ষ কন্যার দেখেন রূপ গুণ—কিন্তু কুলশীল স্বভাব চরিত্র এ সবের সাথে হৃদয়ের আত্মার মিলের সম্বন্ধ কি? ব্যক্তির "মনের প্রেরণা সমাজের সুবিধার কাছে, না সমাজের মঙ্গলের কাছেই হইল, তাই বা বলি কিসে এ কোন কথা? সমাজ বড় না ব্যক্তি বড়? ব্যক্তিকে খর্ব করিয়াই কি সমাজের শ্রীবৃদ্ধি? উভয়ের সামঞ্জস্য নাই? ব্যষ্টি ও সমষ্টির সম্বন্ধ, ব্যষ্টির দাবী কি দায়িত্ব কি, আর সমষ্টির বা দাবি কি? দায়িত্ব কি—এই গোটার ভয় লইয়া গোলমাল, ইহাও আজকালকার যুগের একটা মস্ত সমস্যা। আমরা তর্কের মধ্যে যাইব না তবে প্রকারান্তরে একরকম ইহারই একটা উদাহরণের কথা বলিব। কথাটা সমাজে পুরুষ ও নারীর সম্বন্ধ।

আজ কালকার সমাজ পুরুষের সমাজ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সমাজে নারীর স্বাধীন স্বতন্ত্র স্থান নাই, তাহার ধর্ম কর্ম সমস্তই পুরুষের সেবায় পুরুষের সুখ-সুবিধা উপভোগের জন্য নির্দিষ্ট নিয়োজিত। সমাজে স্বাধীন সজীব জীব যদি কেহ থাকে তবে সে পুরুষ। নারী যেন পুরুষের ধনসম্পত্তির অঙ্গীভূত। ব্যবস্থা আছে বাল্যকালে মেয়েরা পিতার জিনিষ, যৌবনকালে পতির জিনিষ আর বৃদ্ধকালে পুত্রের জিনিষ। অন্য-ভাবে [illegible] পুরুষের [illegible]। পাশ্চাত্যের দার্শনিক পণ্ডিত Des Cartes স্ত্রীজাতির অন্তরাত্মা আছে বলিয়া বিশ্বাস করিতেন না। আমাদের মনে হয় নারীদের সম্বন্ধেও আমাদের সমাজ ব্যবস্থাপকদেরও যেন সেই মতই ছিল। নারীদের যে স্বতন্ত্র কোনও বক্তব্য থাকিতে পারে না বা তাহাদিগকে কেবলই তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা হয়, এমন কথা অবশ্য বলা চলে না। কিন্তু সে সব যাহা করা হইয়াছে বা করা হয় তাহা যেন অনেকটা দয়ার দান, মেয়েদের নিজেদের দাবির জোরে নয়। অন্ততঃ বলা যাইতে পারে মেয়েরা যে স্বাতন্ত্র্যের যোগ্য নয় তার কারণ তাদের স্বভাব। নারীর স্বভাবই হইতেছে পুরুষের আশ্রয়ে পুরুষকে ধরিয়া চলা, তাহারা হইতেছে অবলা জাতি (weaker sex), কাহাকেও না ভর করিয়া দাঁড়াইতে পারে না আর তাদের স্বভাবের মধ্যে অনেক খারাপ জিনিষ আছে, পুরুষ যদি তার রাশ টানিয়া না ধরে তবে সহজেই বিগড়াইয়া যায়।

দ্বিতীয় কথা, স্বাতন্ত্র্যের যোগ্য হইলেও নারীকে স্বাতন্ত্র্য দেওয়া উচিত নয়, সমাজের কল্যাণ-কল্পে। কারণ মেয়েরা হইতেছে ঘরের লক্ষ্মী। তাহাকে কেন্দ্র করিয়া পরিবারের সমাজের জালা বাঁধিয়া উঠিয়াছে; মূলে, ঘরে কেন্দ্রে যদি স্বাতন্ত্র্য দেওয়া হয়, মেয়েরা যদি স্বৈরচারিণী হয় তবে পরিবার বলিয়া কিছু থাকে না, সমাজ ভাঙিয়া চুরমার হইয়া যায়। পুরুষের পক্ষে স্বাধীনতা স্বাতন্ত্র্য, স্বেচ্ছাচার, এমন কি উচ্ছৃঙ্খলতা অনেক সহ্য করা যায়—তাতে সমাজের বিশেষ কিছু আসে যায় না—পুরুষের কারবার যে বাহিরের জগৎ লইয়া; কিন্তু মেয়েদের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতা জন্মিলে যে সমাজের ভিতরে প্রাণের মধ্যে মিলন-গ্রন্থীতে একেবারে ঘুণ ধরিতে আরম্ভ করে। এখন প্রশ্ন, মেয়েরা যে স্বাতন্ত্র্যের যোগ্য নয়, বা হইতে পারে নাই সেটা বাস্তবিক পক্ষে তার জন্মগত স্বভাবের দোষের ফল না শুধু সংস্কারের অভ্যাসের ফল? একটা বিশেষ ব্যবস্থার মধ্যে পড়িয়া, একটা বিশেষ শিক্ষা-দীক্ষার ফলে নারীর স্বভাব স্বধর্ম এইরকম হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু এইটিই তার সনাতন ধর্ম—এষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ—তাই কে বলিতে পারে? অন্যরকম ব্যবস্থা, অন্যরকম শিক্ষা-দীক্ষার ফলে নারীর ধর্ম্ম-কর্ম্ম অন্যরকমও হইতে পারে না? আর তা যদি সম্ভব হয় তবে, নারীর স্বাতন্ত্র্যের পূর্ণ স্বাধীনতার মধ্য দিয়াই সমাজ বা পরিবার আর একরকম ব্যবস্থায় সুব্যবস্থা-তেই গড়িয়া উঠিতে পারে না? কিন্তু বাস্তবিক যদি ফলে কোন সুব্যবস্থা নাই হয়, তবুও জিজ্ঞাসা করা যায় সমাজের কি অধিকার আছে যে একটা বিশেষ অঙ্গের উপর সে অন্যায় অত্যাচার করিতে পারে? পাছে উচ্ছৃঙ্খলতা হয় বলিয়া স্বাধীনতা স্বাতন্ত্র্যটুকু হইতে নারী বঞ্চিত হইবে কেন? সমাজের মধ্যে আছি বলিয়া, নারী হইয়াছি বলিয়া কি নিজের ইচ্ছা জিনিষটিকে সমূলে নির্ম্মূল করিতে হইবে? সমাজের একটি অঙ্গকে এই রকম নির্বীর্য্য মরণাহত করিয়া রাখিলে সমাজে শৃঙ্খলা পাইতে পারে, শান্তি পাইতে পারে, কিন্তু জীবন পাইবে, পুষ্টি বৃদ্ধি পাইবে?

এখানে কথা উঠিবে, তবে ঠিক সেই রকম শিক্ষা সেই রকম দীক্ষা—শুধু স্বাধীনতা স্বাতন্ত্র্য বলিয়া চীৎকার করিলে হইবে না, আর সেইজন্যই প্রাচীন ব্যবস্থাকারও বলিয়া গিয়াছেন পুত্রের মত কন্যাকেও অতি যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে। নূতন আর আমরা কি বলিলাম? নূতন জিনিষ এই প্রাচীন শিক্ষা মেয়েদের দাসত্ব জিনিষটাকেই ভাল করিয়া সুচারুরূপে করিতে শিখাইত, কেবল এই দাসত্বকে ঢাকিয়া রাখিতে চেষ্টা করা হইত বড় বড় কথা দিয়া—যথা সেবা, আত্মোৎসর্গ, বিনয়, লজ্জা; কিন্তু নূতন শিক্ষার লক্ষ্যই হইবে আত্মপ্রতিষ্ঠা, নিজেকে জানা, স্বাধীনতাকে নিজের ভিতরের ভগবানকে ফুটিয়া উঠিতে দেওয়া। শিক্ষা আগে পরে স্বাধীনতা, একথা সত্য হইতে পারে; কিন্তু এর চেয়েও বড় সত্য হইতেছে, আগে স্বাধীনতা পরে শিক্ষা। স্বাধীনতার ভিতর দিয়া জীবন্ত শিক্ষা ফুটিয়া উঠে।

কিন্তু অপর পক্ষ বলিতে পারে, নারীর অবস্থা যে সমাজে এ রকম হইয়াছে, সে যে স্থান পাইয়াছে, যে ধর্ম্ম-কর্ম্ম অনুসরণ করিতেছে, এটা কি শুধুই বাহির হইতে আরোপ, শুধুই পুরুষের কারসাজি? সমাজ বুঝি করিয়া কোন্ দিন এরকম অত্যাচার আরম্ভ করিল? বলা যায় না কি, নারীর এ রকম ব্যবস্থায় সম্পূর্ণ অনুমতি ছিল, কেবল অনুমতি নয়, এইটার মধ্যেই ছিল তার স্বভাবের আনন্দ, নতুবা এ রকম ব্যবস্থা আদৌ উৎপন্ন হইল কেমন করিয়া, দেশে দেশে যুগে যুগে ঠিক এক রকম ব্যবস্থা এ যাবৎ চলিয়া আসিল কেমন করিয়া? একটা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত না হইলে শুধু মায়া শুধু মিথ্যা শুধু জুয়াচুরির উপরই এত বড় জিনিষটা গড়িয়া উঠিয়াছে? পুরুষ যেমন স্বাধীন স্বতন্ত্র হইতে চায়, আপনার ব্যক্তিত্বকে ফুটাইয়া তুলিতে যায়, নারীও কি ঠিক তেমনি চায়? এ চাওয়াটা যদি নারীর সত্য হইত তবে তাহা কি সমাজে, সমাজের ব্যবস্থার মধ্যে ফুটিয়া উঠিত না? সমাজটা পুরুষের সমাজ হইল কেন? নারী পুরুষের ছায়া হইয়া থাকিতেই চায়, অধীন হওয়াটাই নারীর স্বাধীন ইচ্ছা, এইজন্যই কি নয়?

আমাদের মনে হয় আসল সত্যটা এই রকমের

প্রাচীন কালে এক সময়ে সমাজের গতি অনুসারে একটা আদর্শ ফুটিয়াছিল—যুগ-ধর্ম্মের বশে পুরুষ ও নারীর উভয়েরই এক একটা সত্তা প্রতিষ্ঠিত হইয়া আপন সার্থকতা পাইয়াছিল, সমাজকে একটা বিশেষ বিধি-ব্যবস্থা দিয়া সার্থক করিয়া তুলিয়াছিল। সীতা-সাবিত্রীর যুগে নারী আপন ব্যক্তিত্বকে স্বেচ্ছায় পুরুষের ব্যক্তিত্বের মধ্যে ডুবাইয়া দিয়াছিল, তাহার অন্তরাত্মা আপনাকে নিঃশেষে ঢালিয়া দিয়া, পুরুষের অন্তরাত্মাকেই উপচিত করিয়া চলিত। নারী ছিল দাতা পুরুষ ছিল গ্রহীতা। পুরুষ ছাড়া আপনার ভিন্ন-অস্তিত্ব নারী উপলব্ধি করে নাই, করিতে চায় নাই, তার কোন প্রয়োজনও অনুভব করে নাই। সেইটাই সেই যুগের ছিল ধর্ম্ম। কেন এই রকম ধর্ম্ম হইল, সমাজের বিবর্ত্তনের কি রকম স্তরে অথবা মানবাত্মার কোন্ প্রেরণাকে কোন্ সত্যকে প্রকাশ করিবার জন্য, সে কূট-সমস্যা আমরা আলোচনা করিব না। শুধু বলিব, তখনকার দিনে পুরুষের ও নারীর সম্বন্ধ ছিল তাহাদেরই ভিতরের একটা জীবন্ত আদর্শ, একটা সত্য ধর্ম্মের ফল; সমাজের ব্যবস্থাও ছিল সেইটিকেই ফলাইয়া ধরিবার জন্য সজীব কাঠাম। পরে কিন্তু সে আদর্শ সে ধর্ম্ম লোপ পাইতে লাগিল, সমাজের ব্যবস্থাটা কিন্তু তেমনি অটুট রহিল; শুধু তাই নয়, অস্তমান আদর্শটিকে ধর্ম্মটিকে বাঁধিয়া রাখিবার জন্য সে ব্যবস্থাকে আরও বিশদ করিয়া খুঁটিনাটিতে ভরিয়া কঠোর করিয়া তোলা হইতে লাগিল। প্রথমে যে সম্বন্ধটা ছিল সহজ ও আনন্দপূর্ণ, পরে তাহা হইল শুধু অভ্যাসের কর্ত্তব্যের। প্রথমে নারী যে জিনিষটা দিত স্বেচ্ছায় সানন্দে, পুরুষও লইত পূজার দান রূপে, পরে পুরুষ লইতে আরম্ভ করিল দাবীরূপে, নারীও দিতে আরম্ভ করিল অজ্ঞানের সংস্কারের বশে। কেন এ-রকম হইল সে প্রশ্ন তুলিবার প্রয়োজন নাই, কিন্তু এ জিনিষটি যে স্বাস্থ্যকর নয়, পুরুষ ও নারীর জন্য, সমাজের জন্য যে ইহার পরিবর্ত্তন চাই, শুধু তাই নয় আর একটা সত্য আর একটা ধর্ম্ম আর একটা আদর্শ যে পুরাতন জীর্ণ কাঠাম ভাঙ্গিয়া ফুটিয়া উঠিতেছে তাহাই আমাদের বুঝিবার দেখিবার জিনিষ।

সেটা হইতেছে পুরুষের ব্যক্তিত্বের উদ্বোধন, সেই সঙ্গে নারীরও ব্যক্তিত্বেরই উদ্বোধন। পুরুষের ছায়া মাত্র হইয়া নারী যে সত্যকে পরিপূর্ণ করিয়াছে, তাহা অতীতের কথা। ভবিষ্যতের কথা, নারী পাইবে আপনার কায়া, ফেলিবে আপনার ছায়া। পুরুষের সম্পর্ক ছাড়াও নারীর যে আছে একটা নিজস্ব সত্তা—নাই কি? তার পরিস্ফুরণ বর্ত্তমান যুগের একটা প্রধান সমস্যা। এই সমস্যা সমাজকে পূরণ করিতে হইবে, পুরুষকেও সে বিষয়ে সাহায্য করিতে হইবে। প্রাচীন ব্যবস্থা উল্টাইতে গেলে সমাজে একটা বিষম গোলমাল হইবে, ওলট-পালট ভাঙ্গাচুরা হইয়া যাইবে, পুরুষ তার সনাতন অনেক সুখের অধিকার হইতে বিচ্যুত হইবে—এ সব কারণ দেখাইয়া শান্তি স্বস্তিকে চরম আদর্শ করিয়া থাকা বুদ্ধিমানের কাজ হইবে না, মঙ্গলপ্রদও হইবে না।

নারায়ণ ফাল্গুন, ১৩২৭। শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত।

সমালোচনা

সদাচার শিক্ষা।—শ্রীযুক্ত স্বামী দয়ানন্দ প্রণীত। শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের শাস্ত্রপ্রকাশ বিভাগ দ্বারা প্রকাশিত। কলিকাতা ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুলে মুদ্রিত। মূল্য ছয় আনা। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে হিন্দুশাস্ত্রানুমোদিত আদর্শানুযায়ী আচার-ব্যবহারের নিয়মাবলী সংগৃহীত হইয়াছে, কোন্ সময়ে শয্যাত্যাগ করিতে হয়, শয্যাত্যাগের পর শারীরিক ও মানসিক কৃত্যাদি গুরুজন ও ভাই ভগিনীর প্রতি কেমন আচরণ করিতে হয়, আহারের নিয়ম ও খাদ্যাখাদ্য বিচার ব্যায়ামচর্চ্চা প্রভৃতির যে আলোচনা করা হইয়াছে, তাহা অনুশীলনযোগ্য। এখনকারদিনে এই নিয়মগুলি কতটা পালন করা যাইতে পারে, সে বিষয়ে মতভেদ থাকিলেও যাঁহারা গোঁড়ামি রক্ষা করিতে চান, তাঁহারা এই গ্রন্থ হইতে অনেক উপকার পাইবেন।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

কলিকাতা—২২, স্থকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীকালাচাঁদ দালাল কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।